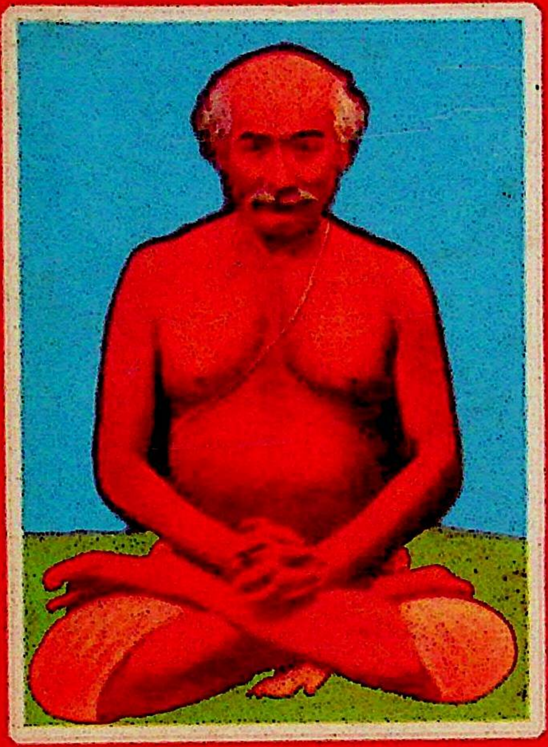

জগৎ
ও
আমি

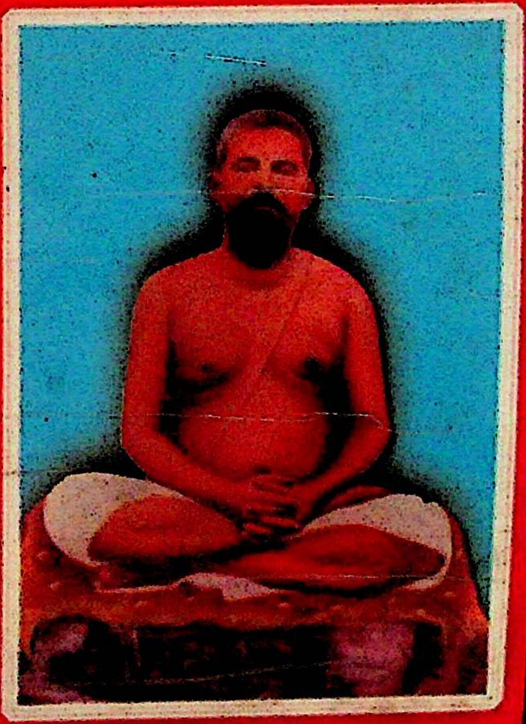

পঞ্চানন
ভট্টাচার্য্য

3·3

জগৎ ও আমি

(দুইখণ্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ)

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
মহাশয়ের শিষ্য

যোগাচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম গিরিজা সংস্করণ
শুভ দোলযাত্রা, ১৪১৬
ফেব্রুয়ারী, ২০১০

প্রকাশক
[illegible] শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
স্বা. গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২২৪১-৫৪৬৮

টাইপ-সেটার
প্রদ্যুৎ সাহা
৭ কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

[illegible]
[illegible]
[illegible]
মুদ্রণে
নিউ প্রিন্টার্স
কলকাতা-৭০০ ০১০

প্রাপ্তিস্থান :

গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মূল্য : ২৫০ টাকা

পূর্ব্ববর্তী সংস্করণের ভূমিকা

এই "জগৎ ও আমি" নামক পুস্তকখানির জগৎ ও আমি নাম যে কেন হইয়া এবং এই "জগৎ ও আমি" উপাধির অর্থ যে কে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিতে পারি না, "জগৎ ও আমি" উপাধির মর্মে শুধু বর্তমান (ব্রহ্মাণ্ডরূপ) জগৎ ও সাধারণ "আমির" পরিচয় মাত্র নাই। এই জগৎ আমিতে সাধারণ আমির ভাব প্রকাশের সহিত লেখকরূপী আমির জীবনের পরিচয় বা তৎ শরীররূপে ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ ইঙ্গিতচ্ছলে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। (এই পুস্তকে লেখক নিজের বর্তমান দেহ, পূর্ব দেহ এবং ভবিষ্যৎ দেহের পরিচয় পর্যন্ত প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন), যে দেহ জগতের প্রতি একান্ত কৃপা পরবশ হইয়া এই অমৃত রসস্বরূপ "জগৎ ও আমি" লেখনীমুখে নিঃসৃত করিয়াছেন, সেই দেহের (১৩২৬ সালে) অদর্শন হওয়াবধি এই অমৃত মেঘে আচ্ছাদিত শশধরের ন্যায় ঢাকা পড়িয়াছিল। এমন প্রাণাপেক্ষা যত্নের সামগ্রী বা গীতা পাঠের ন্যায় নিত্য পাঠ্য ও সর্বদা আলোচনার বিষয়, গুরুপদেশপূর্ণ অমূল্যরত্ন স্বরূপ বস্তুতে ক্রিয়াবানগণ এ পর্য্যন্ত কেহই উৎসাহান্বিত বা ইহার আলোচনায় রত হন নাই, সকলেই অমৃতে অবহেলা ভাব দেখাইয়াছেন, অথচ এই জগৎ আমির মধ্যস্থিত উপদেশ মালা নিত্য আলোচনা করিয়া গেলে আজ যে "জগৎ আমি" প্রকাশকের দেহের অদর্শনে তৎসদুপদেশ বি[illegible] রূপ বাক্যের কিছুমাত্র অভাব হইয়াছে বা সেই মহাত্মার অদর্শন হইয়াছে ইহা উপলব্ধিই হয় না। সেই গুরুরূপী—যেন সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববৎ সেই হিতোপদেশ রূপ মৌখিক বাক্যের অমৃতবর্ষণ অদ্যাপিও করিতেছেন বলিয়াই উপলব্ধি হয়। গুরুর অমৃতভাণ্ড ঘরে বর্তমান, কিন্তু শিষ্যগণ যেন কস্তুরী মৃগের ন্যায় "কোথায় সে উপদেশ শ্রবণরূপ বস্তু পাইব" এইরূপ মৃগ তৃষ্ণায় ঘুরিয়া সতত অভাব দশা ভোগ করিতেছেন, কেহবা কাঁচকে কাঞ্চন বোধে সেই দিকেই ধাবিত হইতেছেন। তাই এতদিনে বুঝি কাতর বৎসল গুরু, একান্ত কাতরদিগকে করুণাবারি প্রদানার্থেই গৃহস্থিত অমৃত বাহিরে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। লেখকের এই গ্রন্থখানি সংসার বা জগৎ তত্ত্বের বিবরণী রূপ ভূগোল স্বরূপ এবং লেখকের ৫২ বিঘা রূপ বাহ্যিক কার্য্য ক্ষেত্রের ভূমি যাহা দৃশ্যমান আছে, উহা জগৎ চিত্রেরই নকল-অঙ্কিতরূপ ভূচিত্র নকল স্বরূপ।

উক্ত ৫২ বিঘা রূপ কার্য্য ক্ষেত্রে লেখক ভূচিত্ররূপে বর্তমান জগতেরই চিত্রাভাষ চিত্র চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এই চিত্রে বহির্জগতের চিত্রসহ সমুদয় দেহ তত্ত্বেরও চিত্র চিত্রিত করতঃ (ত্রৈলোক্যে জানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহতঃ বৎ) ভিতর তত্ত্বই পলে পলে দেখাইয়াছেন এবং জগৎ আমিরূপ গ্রন্থে ভূগোল স্বরূপ সমুদয় জগৎ তত্ত্বের ব্যাখ্যাসহ দেহতত্ত্বের মিলন করতঃ লেখকের নিজ দেহতত্ত্বের বিবরণী বিশদরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার নিগূঢ় মর্ম সাধারণে অবগত নহেন, যদি কেহ অবগত থাকিতেন তাহা হইলে ক্রিয়ান্বিত মহোদয়গণ ঐ ভূগোল ও ভূচিত্র স্বরূপ উভয় চিত্রের বস্তুতে সকলেই বিশেষ আগ্রহবান হইতেন। জহুরী ব্যতিরেকে জহরের মর্ম অবগত হওয়া সকলের সম্ভবপর নহে, একারণ কেহই ইহাতে যত্নবান বা আগ্রহবান হন নাই। যে জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃ ইহতে এই "জগৎ ও আমির" প্রকাশ, আজ তাঁহারি প্রভাতি কিরণরূপ জ্যোতিঃ বিস্তারহেতু মেঘাচ্ছাদন তিরোহিত চন্দ্র রশ্মি প্রকাশের ন্যায় তৎ জ্যোতিতেই আজ এই জগৎ আমির প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে॥

ভূমিকার পরিশিষ্ট

এই পুস্তকে না আছে এমন বিষয় নাই। ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংসারের আধি-ব্যাধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-কর্ম ও ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল বিষয়েরই যাঁর যখন যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে, তৎসমুদয় উপদেশই গ্রন্থ মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন।

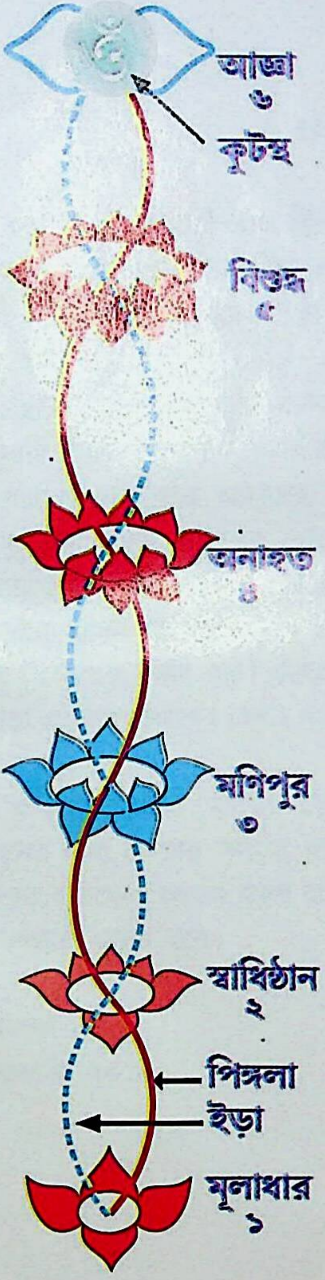
ॐ
আজ্ঞা
৬
কূটস্থ
বিশুদ্ধ
৫
অনাহত
৪
মণিপুর
৩
স্বাধিষ্ঠান
২
পিঙ্গলা
ইড়া
মূলাধার
১

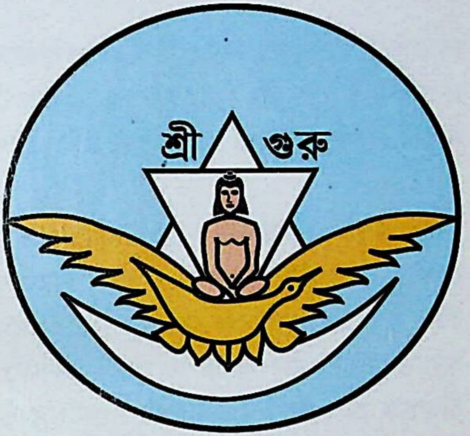

সহস্রার

হংস

পীঠ – ব্রহ্মপীঠ
চরণযুগল – ইড়া / পিঙ্গলা
ডানা – আগম / নিগম
ঠোঁট – প্রণব
গ্রীবা – কামকলা

প্রকাশকের কথা

'জগৎ ও আমি' যোগিরাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য যোগাচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ। এই অমূল্য সম্পদের প্রামাণিকতা রক্ষার তাগিদে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়ভাবেই বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করা হল।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমানকালে লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগ-সাধন পথের অনুসারী সাধক শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে সহযোগিতা করে ও পরামর্শ দান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়া, এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসকল অসংখ্য ব্যক্তি নানাভাবে তাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তাঁরা হলেন ডাঃ অরুণ গণ, ডাঃ বিশ্বনাথ মণ্ডল, শ্রীসমীর দাস, শ্রীতাপস রায় এবং শ্রীঅশোক কুমার রায়। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা আন্তরিকভাবে ঋণী। এছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি ও সংস্থাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

'জগৎ ও আমি' মূলতঃ যোগ-সাধকদের অত্যন্ত আদরণীয় গ্রন্থ হলেও জীবনের নানা ক্ষেত্রের অসংখ্য ব্যক্তি অতীতেও এই মহৎ গ্রন্থটি দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। আমরা আশা রাখি পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও মানুষের কাছে গ্রন্থটি সমানভাবে আদৃত হবে।

কলকাতা-৯
ফেব্রুয়ারী, ২০১০

মুখবন্ধ

সনাতন ধর্মের মেরুদণ্ডই হল যোগ। বর্তমানে যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যাঁর নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী। তাই সমগ্র মানব সমাজ শ্যামাচরণকে জানবার জন্য আগ্রহী। শ্যামাচরণই তাঁর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর গোপন দিনলিপিতে লিখেছেন—"আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। আমি অক্ষরপুরুষ। আমিই কৃষ্ণ। আমিই মহাদেব। আমিই চতুর্ভুজ নারায়ণ। আমার রূপ থেকেই জগতের প্রকাশ। সর্বব্যাপী আমিই আছি। আমি ছাড়া এ জগতে আর কিছু নেই। কূটস্থরূপে সবার ভেতর আমিই আছি। কূটস্থই আমার রূপ, কূটস্থকে দেখলেই আমাকে দেখা হয়। যা আত্মসূর্য্য তাই ব্রহ্ম তাই আমি শ্যামাচরণ। আমিই আদি পুরুষ ভগবান। আমি স্বয়ং ভগবান।"

এমন যে ভগবান কৃষ্ণ শ্যামাচরণ তাঁর বহু আত্মজ্ঞানী শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ছিলেন অন্যতম। সনাতন ধর্মের অমর যোগসাধনকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের প্রতি পণ্ডিত পঞ্চাননের অবদান অপরিসীম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর কলকাতার বাবুরাম ঘোষ লেনে সপরিবারে বাস করতেন। যোগিরাজের আদেশে তিনি আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন স্থাপন করে বহু ছাত্রের বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দেওঘরে ৫২ বিঘা জমি ক্রয় করে মনোরম পরিবেশে ফুল চাষ শুরু করেন এবং নিজেকে কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত করেন। বর্তমানকালে ঐ স্থানটি ৫২ বিঘা নামে সুপরিচিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন যোগিরাজের প্রথম দিকের শিষ্য। তিনি যোগসাধনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন বলে অবিভক্ত বাংলা এবং বিহার অঞ্চলের যত মানুষ যোগিরাজের কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হতেন যোগিরাজ তাদের সকলকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। যোগিরাজও তাঁকে সম্মান করে 'আপনি' সম্বোধন করতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন সুরধূণী দেবীকে। এই সুরধূণী দেবীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব নামে এক মাত্র পুত্রের জন্ম হয়।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ১২৬০ সালের ২৮শে কার্ত্তিক এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারে আবির্ভূত হন। পিতার নাম ঠাকুরদাস এবং মাতার নাম জগদম্বা দেবী। তিনি ১৩২৬ সালের ৭ই ভাদ্র তিরোধান করেন। শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায় এবং মহান

যোগিরূপে পরিচিতি লাভ করায় তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করা হয়, কিন্তু তিনি তা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ভবিষ্যৎ যোগীদের উপকারার্থে 'জগৎ ও আমি' এবং 'ধর্ম ও পূজাদিমীমাংসা' নামে দুইখানি অমর যোগশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যোগপ্রিয় মানুষের কাছে এই দুই খানি বই অমূল্য সম্পদ। 'ধর্ম ও পূজাদিমীমাংসা' বইখানি ইতিমধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন কিন্তু 'জগৎ ও আমি' বইটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত না হওয়ায় বহু মানুষ বিশেষ করে ক্রিয়াবান ভক্তগণ অভাব বোধ করছিলেন। বর্তমানে এই প্রকাশন সংস্থা সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টা করায় সমস্ত ক্রিয়াবান ভক্ত এবং যোগপিপাসু মানুষ প্রচুর উপকৃত হবেন বলে মনে করি। এই দৃশ্যমান জগৎ এবং এই জগতের প্রাণী হিসেবে, কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, আমার কি করা উচিত, এই স্থূল জগতের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে যে বিজ্ঞান সম্মত যোগ আলোচনা করেছেন তা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। বর্তমানে ধর্মের এই অবক্ষয়ের সময়ে যখন প্রায় সব মানুষই অন্তর্মুখী ভাব থেকে সরে গিয়ে টেলিভিশন-রাক্ষসের খপ্পরে পড়েছে তখন এই বইখানি মানুষকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

—অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

'ঊষালোক'
২৬এ/৯, এস. বি. নিয়োগী গার্ডেন লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৩৬.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ—

বিষয় ত্যাগ ও বর্তমানকালের সাধু ১৯
ঊর্দ্ধরেতা ঃ বর্ণন ২৭
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত গোস্বামী ২৮
পতি পত্নীর আচরণ ২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

গীতারহস্য ৩৬
মৃত্যুকাল বর্ণন ও যম, চিত্রগুপ্ত, যমালয় ৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

জগন্নাথ ও শ্রীক্ষেত্র ৫৫
প্রকৃত সম্পত্তি কি ৫৬
সাকার নিরাকার বাদ ও বাহ্য পূজা ৬১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

রাসলীলা * ৭০
রাধা কৃষ্ণ ৭৪
বৃন্দাবন ও গোলকধাম ৭৬
মথুরা ৮০
অক্রূর-সংবাদ ৮১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

শরীর রূপ সেতার ও নারদের সেতার বাজান ৮৩

---

* এইবার দোলের বর্ণন দেখ—১২৫ পাতায়।

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

উৎপত্তি ও গর্ভবাস ৮৯
শরীরস্থ ব্রহ্মযোনি স্থান ৯১
পুত্র বা কন্যা কিরূপে জন্মে ৯৪
কৈবল্য ও সহজাবস্থা ৯৫
নাভি বর্ণন ৯৬
ভূমিষ্ঠ অবস্থা ৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ—

মধ্যাবস্থার বর্ণন ৯৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ—

দ্বিতীয় দশা বা শৈশবভাব ১০২
ভব কারাগার ১০৫
সূতিকাগার ১১৫
সেটেরা পূজা ১১৭
দোল যাত্রা ১২৫
ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রলোভন ১৩৩
জনক জননী ১৩৪
প্রকৃত ভালবাসা ১৪৩
মাতৃদুগ্ধ পান ১৫৩
পিতৃ মাতৃ ভক্তি ১৫৫

নবম পরিচ্ছেদ—

দুর্গোৎসব ১৫৭

দশম পরিচ্ছেদ—

চণ্ডী রহস্য ১৬৬

বিষয় পৃষ্ঠা

একাদশ পরিচ্ছেদ—

বাহ্য পূজার উৎসব ১৮৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—

প্রকৃত পূজা ১৯৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ১৯৮

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—

কলাবউ ২০১

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—

সপ্তমী পূজা ২১০

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অষ্টমী পূজা ২৩৩

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—

সন্ধি পূজা ২৪৫

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—

নবমী পূজা ও বলিদান ২৫৫

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—

বিজয়োৎসব ২৬০

বিংশ পরিচ্ছেদ—

প্রাণ ২৭৭

একবিংশ পরিচ্ছেদ—

প্রকৃত বিদ্যা ২৮০

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—

বিদ্যারম্ভ এবং পৌগণ্ড অবস্থা বর্ণনা ২৮৩

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—

যোগ ৩০১

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—

আর্য্যাবর্ত্ত ও চারিবর্ণ ৩০৯

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—

বিদ্যারম্ভ ৩১২

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ—

শিশুবোধ পুস্তক ৩২২

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—

শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন ৩২৫

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ—

প্রহ্লাদ চরিত্র ৩৩৩

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ—

আধুনিক শিক্ষা ৩৩৫

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—

কৃষি ও বাণিজ্য ৩৪১

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ—

স্ত্রী শিক্ষা ৩৫৩

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ—

নারীজাতির কর্তব্য ৩৬৩

সাধন কর্মের অভ্যাসীর যদি কর্ম সমাধান না করিয়া দেহান্ত ঘটে তবে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হয় তাহার বর্ণনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৫৭ পাতায় এবং ৬১৭ পাতায় দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয় ... পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ—

স্বপ্ন ও লিখন পঠন ৩৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

ইন্দ্রিয় ও রিপু ৩৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

রামপ্রসাদ ৪১৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

বিদ্যাসুন্দর ৪৩২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

তিথিতে নিষিদ্ধ ভোজন ৪৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

স্বপ্ন ও খেলাঘর ৪৪৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ—

যোগ ৪৬৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ—

বঙ্গের সিদ্ধবংশ ৪৭৮

নবম পরিচ্ছেদ—

চতুর্ব্বিধ যোগ ৪৭৯

দশম পরিচ্ছেদ—

বিজয় কুমারের গল্প ৫০৬
মাতৃবাক্যে বিশ্বাস সম্বন্ধে ৫১৮

একাদশ পরিচ্ছেদ—

স্বর্গ ও সুদর্শন চক্র ৫৩০

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—

ওঁকার রূপ রথ ও বৃহৎ কূটস্থবর্ণনা ৫৪০

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—

রাজভক্তি ৫৬০

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—

আত্মধর্ম্ম ৫৮০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ৬১২

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—

নর নারীর কর্তব্য ৬১৮

অতিরিক্ত সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

সংসার পরিত্যজ্য নহে ২৫

সকল কর্মের অভ্যাস এবং
সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থাকা দরকার ৮৪

সদ্য প্রসূত হইয়া ভূমে পতিত অবস্থা বর্ণন ১০২

শিশুর দেয়ালা বর্ণন ১০৫

ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নানের পরের অবস্থা বর্ণন ১১০

ভূমিষ্ঠ অন্তে স্তনপান অবস্থান বর্ণন ১১২

প্রসূতির ব্যবস্থাবলি ১১৪

নাড়িকাটা ও সেক্‌তাপ ১১৫

সুষুপ্তি বর্ণন ১৭২

নারীজাতি অল্পায়াসেই সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন ১৭৩

মহিষাসুর বধ ১৭৫

বিষয় পৃষ্ঠা

অসি ও বরুণা নদী ১৭৫
দুর্গা প্রতিমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশের বর্ণন ১৭৭
মা দুর্গার বোধন ১৯৬
লঙ্কা ও রাবণ এবং রামসীতা সম্বন্ধীয় রামায়ণ তত্ত্ব ১৯৮
দুর্গার অধিবাস ২০১
মাতৃকা ন্যাস ও পীঠন্যাস ২৪১
বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণ রাখার বিষয় ২৭২
বাড়ীতে চুরি ও জাগা ঘরে চুরি হয় না ২৭৮
বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা ২৮৩
বেদ ও পুরাণ ২৮৭
সাঙ্খ্য দর্শন ২৯১
ত্রিতাপ কাহাকে বলে ২৯১
পাতঞ্জল দর্শন ২৯২
বেদান্ত দর্শন ২৯৩
ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা ২৯৪
উপনিষদ' ৩০০
প্রাণায়াম ৩০১
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ৩০২
অষ্টাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ যোগ ৩০৩
গোকুল, ব্রহ্মপুরী ও গোপীভাব বর্ণন ৩২৬
হরি শব্দের তাৎপর্য্য ৩৩৪
দেশের সামগ্রী আমদানী রপ্তানী ৩৪৩
মাড়োয়ারীদের কার্য্যশক্তির পরিচয় ৩৪৪
ভুঁইয়ার বাভন জাতি ৩৪৭
বালিকা বিদ্যালয় ৩৫৫
নরনারীর কিরূপ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত ৩৬৪

বিষয় পৃষ্ঠা
গুণবান ও দয়ার বর্ণন ৩৬৯
সঙ্গদোষে দৈবীগুণ্ যুক্ত পিতার দৈবীগুণ সম্পন্ন সন্তানও পশুভাব প্রাপ্ত হয় ৩৭০

অতিরিক্ত সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যয়ন, লিখন, যজন, যাজন ৩৭৫
আত্মক্রিয়ায় নিজে সম্যক পারদর্শী না হওয়া পর্যন্ত— ঐ ক্রিয়াদানে ব্রতী না হওয়া ৩৭৬
অতি কষ্টের অবস্থায় পড়িলে কি ভাবে থাকা উচিত ৪১৩
মাংস ভক্ষন ৪৩৮
চা পান ৪৪০
শিশুদের যকৃত জনীত পীড়ার কারণ ৪৪৩
শিশুদের দুগ্ধপাক সম্বন্ধে ৪৪৪
প্রসূতির ব্যবস্থাবলি ৪৪৫
লেখকের পূর্ব পুরুষের ও নিজের পরিচয় ৪৭৪
যিশু ৫০৩
ত্রিলোক ও গঙ্গা ৫১৭
মাতৃবাক্যে বিশ্বাস ৫১৯
ব্রহ্মযোনিরূপ দ্বারযন্ত্র ও ঐ যন্ত্রের কুঞ্চিকা ৬০৮
* মাতৃ বিষয় বর্ণন ৬২৩
কিরূপ পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য ৬২৮
কর্তব্য ও অকর্তব্য কাহাকে বলে ৬২৮
প্রকৃত কর্তা কাহাকে বলে ৬২৯

---

* মাতৃ বিষয় ১ম খণ্ডের সূচীপত্র'য় দ্রষ্টব্য

জগৎ ও আমি

প্রথম খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]

দ্বিতীয় খণ্ড

[illegible]
[illegible] না হওয়া
[illegible]— ঐ [illegible] না হওয়া [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রথম পরিচ্ছেদ

জগৎ ও আমি এই দুইটি শব্দ যাহা প্রায় সর্বদাই নিজ মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকি, অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই, উভয় শব্দেরই গুঢ় ভাব আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির দুর্জ্ঞেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে জগৎ এই প্রথম শব্দের স্থূল ভাব বা বাহ্যিক অর্থ যে কি তাহা যে আমার জানা নাই তাহা নহে; আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে জগৎ জানি না তাহা বলি না। জগৎ জানিনা একথা বলাও আমার উচিত নহে, কারণ আমি জগতের বক্ষেই দণ্ডায়মান রহিয়াছি এবং আমার চতুর্দ্দিকে জগৎ আপন শোভা বিস্তার করিয়া আমাকে যেন রহস্য করিবার ছলে বা মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে নানাভাবে ও নানারূপে আমার সম্মুখ দেশেই মোহিনীরূপে হাস্যবদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আবার কোথাও বা বিকটভাবে বিকট হাস্যে জগৎ যেন আমাকে উপেক্ষা করিতেছে। কোন স্থলে বা জগৎ যেন করাল বদন বিস্তার করিয়া আমাকে গ্রাস করিবার ছলে ধাবিত হইতেছে। এইরূপে আমি জগতের নানাভাবে কখন ত্রাসিত কখন মোহিত কখন বা জগতের নিকট উপেক্ষিত হইতেছি। এমত অবস্থায়, আমি কেমন করিয়া বা বলি যে জগৎকে জানি না, তবে ইহা ধ্রুব সত্য, যে, আমি জগতের স্থূলভাব অবগত আছি বলিয়াই জগতের সম্মুখে কখন মোহিত, কখন ত্রাসিত, কখন উপেক্ষিত হইতেছি।

জগতের গূঢ়ভাব বা গূঢ় রহস্য আমার জানা থাকিলে, জগতের উপরি উক্তভাবে আমাকে নিশ্চয়ই মোহিত হইতে হইত না। জগতের এই বাহ্যিক স্থূলভাব আমি অবগত থাকায়, আমার লাভের মধ্যে কেবল জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমার এই বর্ত্তমান জগতের গূঢ় ভাব জানিবার যে ইচ্ছা নাই তাহা নহে। জানিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি দৃশ্যমান জগতের তত্ত্ব খুঁজিয়া না পাইয়া জগতের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে না।

তবে দৃশ্যমান জগতের মূল অনুসন্ধান করিলে জগতের মূল বা বীজ বাহির হইতে যে পারে না, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ সমস্ত বিষয়ের মূলে একটি বীজ নিহিত থাকে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সাধারণ বস্তু বা বিষয়সমূহের দুইটি রূপ দেখা যায়; একটি স্থূলরূপ, অপরটি বীজরূপ; বীজরূপটি সাধারণতঃ সূক্ষ্মই হইয়া থাকে, এই দৃশ্যমান জগতের বীজরূপটি সূক্ষ্ম থাকায়, আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির আগোচর হওয়ায়, আমার নিকট

জগতের গূঢ়ভাব যতক্ষণ না প্রকাশ পাইবে, ততক্ষণ জগতের গূঢ় রহস্য প্রকাশ হইবার নহে।

এক্ষণে যদি বলা যায়, জগৎ ও আমার আমি এই উভয়েরই বীজ, জগৎপতি জগদীশ্বর, তাহাতে ক্ষতি কি? বস্তুতঃ ইহাতে আমার বাল্য সংস্কার বশতঃ [সংস্কার যাহা সঙ্গে জন্মে] স্বতঃই আমার ক্ষণিক মনে হয় যে আমার বলা ঠিক হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য হইলেও আমার নিকট উক্ত জগদীশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাভাব বশতঃ আমার মনের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না। সন্দেহ ভঞ্জন না হওয়ায় আমার মন যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে ছিল সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিল, কিছুই প্রকাশ পাইল না। প্রকাশ অভাবে আমার অন্ধকাররূপ অজ্ঞান ঘনীভূত হইয়া অমানিশার ন্যায়, তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এমত অবস্থায় আমার জগৎ ও জগৎপতি জগদীশ্বরকে বুঝিতে যাওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি জগতের গূঢ়ভাব, জগতের বীজ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, জগৎপতি জগদীশ্বরকে জগতের আদি বীজ, ইহা আমার বাল্য-সংস্কারবশতঃ অনুমান করিলেও তাহার প্রত্যক্ষাভাব হওয়ায়, জগতের মায়িক স্রোতে উহা ভাসিয়া যায়; আমার জগৎ বোঝাও হইল না; জগৎপতি জগদীশ্বরকে জানাও হইল না বরং আমার বোঝা ভারে পরিণত হইল। এই ভার আমার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এই বোঝারূপ ভার বাড়িবার কারণ আমি জগৎ ও জগৎপতি সম্বন্ধে নানা বাদের কথার ভারে ও নানা লোকের কথার ভারে আমার বোঝারূপ ভারের জন্য আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; আমার স্কন্ধে আর এরূপ গুরুভার সহ্য হয় না।

কেহ কেহ বলেন জগৎ নাই, জগৎপতি মাত্র আছেন। আবার কেহ কেহ বা জগৎ ও জগৎপতি, উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকরা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইঁহারা বলেন যে জগৎপতির অস্তিত্ব থাকিলেও তাঁহাকে জানিবার আবশ্যক নাই এবং জানাও যায় না। আবার কোন কোন বাদে (বাদ পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর যে বিচার তাহাকেই বাদ কহে) এইরূপ কহিয়া থাকেন, জগতের অস্তিত্ব আছে ও থাকিবে। জগৎপতি নাই, এই দৃশ্যমান জগৎ আপনাপনি স্বভাবের দ্বারায় হইয়াছে। আমি এখন যাই কোথায়? বা কি অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া থাকি?

আমি জগতের ব্যাপার দেখিতেছি এক রকম, আর লোকের প্রমুখাৎ শুনিতেছি অন্য-রকম; আমি যখন যাহার নিকট গিয়া থাকি, তিনিই আমাকে যুক্তি দ্বারা নানা কৌশলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারায় জগৎ ও জগৎপতি এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্থাপনের জন্য তর্ক ও বিচার দ্বারা আমার মনের বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য বিশেষ আয়াস ও যত্ন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বা দ্বৈতবাদ স্বীকার না করিয়া অদ্বৈতবাদের পোষকতা করিয়া অদ্বৈতবাদই একমাত্র অভ্রান্ত মত বলিয়া

সকলকেই সেই মতের আশ্রয় লইতে বলিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় আমার মন যে প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতিত অপর কোন বিষয় মানিতে চায় না, তাহা কেহই বোঝে না, আমি যখন যেমন তখন তেমন ভাবের উপর নির্ভর করিয়া যিনি যেমন লোক এবং যাঁহার যেমন পদমর্য্যাদা তদনুযায়ী তাঁহাদের কথা মৌখিক স্বীকার করিয়া যাই মাত্র, কোন বিষয়ে বিশেষরূপে নির্ভর করিতে পারি না। কারণ আমার মন প্রত্যক্ষ ব্যতীত মানিতে চায় না। আমার সম্মুখে জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা নাই কেমন করিয়াই বা বলি; বরং জগৎপতি সম্বন্ধে আমার মনে সময়ে সময়ে নানারকম সন্দেহ উপস্থিত হয়, জগৎপতি সম্বন্ধে সন্দেহ হইবার কারণও রহিয়াছে এবং সেই সন্দেহ দিন দিন ঘনীভূত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমস্ত বস্তুর দুইটি করিয়া ভাব রহিয়াছে, একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। আমি স্থূলভাবে যে কোন বিষয় দেখিতে যাইব, তাহাতে আমার সন্দেহ ও জ্বালা বৃদ্ধি হইবে বই কমিবে না, বর্ত্তমানেও আমার তাহাই হইয়াছে, কারণ শাস্ত্রাদিতে স্থূলভাবে ভগবল্লীলা যাহা বর্ণনা আছে, তাহা সত্য হইলে, ভগবচ্চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা হয় ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

এইরূপ স্থূলভাবের নানা ভ্রান্তভাবে পড়িয়া আমার মনে ভয়ানক বিসম্বাদই জন্মিয়া গিয়াছে। যাহার যেমন কল্পনা শক্তির প্রবলতা আছে, তিনি সেই সেই ভাবের অনুযায়ী একটি একটি দল বাঁধিয়া, নিজের দলকে পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, নানারকম কৌশল বিস্তার করিয়া লোক সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লন। সকলেই সুমধুর শব্দে গগন মাতাইয়া থাকেন, আমারও কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, সেই ফাঁকা শব্দে মুগ্ধ হইয়া শেষে প্রাণের ভয়ে অন্তর্জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে দৃশ্যমান জগতের শ্রোতে ভাসিয়া যাই; ধরিয়া থাকিবার অবলম্বন আমাকে কেহ দেন নাই যে সেই অবলম্বনই আমাকে টানিয়া রাখিবে। সুতরাং অবলম্বন অভাবে আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না; সকলেই আকাশ কুসুমের ন্যায় অবলম্বন ধরিতে দেন। তাহা যে ধরা যায় না বা তাহা দ্বারা বর্ত্তমান জগতের স্রোতের টান আমাকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না, তাহা না আমার জানা আছে, না তাঁহাদেরই জানা আছে। আমি লোভের বশীভূত হইয়া আকাশ কুসুমবৎ অবলম্বন হস্তে লইয়া সময় সময় এক এক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ লাভ যে নাই তাহা নহে, সে লাভ অপর কিছুই নহে, উহা চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্রব্য অনায়াস লভ্য হইয়া থাকে; আজকালের দিনে ইহাই বা মন্দ কি? ইহার উপর আর একটু লাভ আছে, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তি যে নাই তাহা নহে, তাহার সহিত সম্মান লাভও আছে; আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

এইরূপে নানা সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া নানা দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও নানাপ্রকার সাধুসঙ্গ করিয়াও আমার আর কোন বিষয়েরই মীমাংসা কাহার দ্বারায় হইল না। সকলেই প্রায় আমার মত নিরেট বুদ্ধিযুক্ত ; মুখে সকলেই মধুরভাষী কিন্তু অন্তর সকলকারই প্রায়

বিষে ভরা—আমার যাহা প্রয়োজন তাহার মীমাংসাও কোথাও পাইতেছি না। সাধুসঙ্গ দ্বারা বা শাস্ত্রচর্চা দ্বারা আমি ল্যাভের মধ্যে কতকগুলি নানা বাদের শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র আর কিছুই হয় নাই আমার যে অশান্তি ও জ্বালা তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, বর্ত্তমানে তদ্রূপই রহিয়াছে আমার এ জ্বালা শুনেই বা কে? আর জানেই বা কে? আমার জ্বালা কেবল আমিই জানি আমার জ্বালা অপরের জানাও অসম্ভব, কাহারও কাছে না গেলেও চলে না এবং কাহারও সহিত আলাপ না করিলেও চলে না; কারণ একা বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব; তাই লোকের কাছে গিয়া চডুকে হাসি হাসিয়া বেড়াই মাত্র। বলা বাহুল্য আমার আমির সহিত জগতের কোন সিদ্ধান্ত না করিতে পারায় আমার অশান্তিরূপ ব্যাধি এতই প্রবল হইয়াছে যে কোন বিষয়েই নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছি না। আমার এ ব্যাধির চিকিৎসক বর্ত্তমানে অপ্রতুল নাই, অনেকেই চিকিৎসক সাজিয়া বসিয়া আছেন; রোগী আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকেই আমার রোগের ব্যবস্থা দিতে চান কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনিও আমার মতন রোগী, তিনি তাহা জানিয়াও স্বার্থের খাতিরে অহংমদে মাতোয়ারা হওয়ায় নিজভাব বিস্মৃত হইয়া নিজে চিকিৎসক সাজিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য বসিয়া আছেন। যদি দৈবাৎ আমার মত কোন রোগী পান তাহা হইলে আর আনন্দের সীমা থাকে না, আনন্দ হইবার কারণ বিনা বেতনে বা পেট ভাতায় ক্রীতদাসের বা ক্রীতদাসীর ন্যায় লোক পাইলে কাহার না আনন্দ হয়?

তাহার পর এমন ব্যবস্থা দেন যে সময় সময় রোগ ও রোগী উভয়েই আরোগ্যধাম প্রাপ্ত হয়। তাহার মধ্যে কোন কোন চিকিৎসক উপস্থিত বাহবা লইবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধের নাম স্মরণ করিতে দেন; যে ব্যাধির যে ঔষধ তাহা সেবন ব্যতীত তাহার নাম স্মরণে যে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায় না তাহা আমার জানা নাই, চিকিৎসক মহাশয়েরও জানা নাই; ইহা জানা না থাকায় কেবলমাত্র ঔষধের নাম মাত্র মৌখিক আবৃত্তিরূপ স্মরণ করিতে দেন। তাহার পর সিদ্ধিলাভের জন্য চিকিৎসক মহাশয়ের রুচি অনুযায়ী শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গাছের পাতা সিদ্ধি বা অহিফেন, গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের ব্যবস্থা দ্বারা উপস্থিত অশান্তি নাশের চেষ্টা বিধিরূপে করিয়া দেন। ইহাতে যে ব্যাধি বাড়ে বই কমে না তাহা আমারও জানা নাই চিকিৎসক মহাশয়েরও জানা থাকিয়াও জানা নাই।

আমিও জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভের আশায় চিকিৎসক মহাশয়ের পরামর্শানুযায়ীক উপরিউক্ত মাদক দ্রব্যাদি সেবনরূপ সাধন, কার্য্যে পরিণত করি। দুঃখের বিষয় নেশায় আমার বুদ্ধিবৃত্তির চৈতন্য রহিত হইয়া ক্ষণিক আমার সকল জ্বালা নিবারণ হয় সত্য, কিন্তু নেশা কতক্ষণ থাকিতে পারে? নেশার অবসান হইলে আবার দ্বিগুণ ভাবে আমার পূর্ব্বের অশান্তি আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া দেয়।

গুরুরূপ চিকিৎসক উপস্থিত আছেন, তিনি ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া দিবার পরামর্শ দেন এবং নেশার এমন মোহিনী শক্তিও আছে যে ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া আপনা-আপনিও অনেক সময় মাত্রা বাড়াইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া মাদক দ্রব্যের মাত্রা খুবই বাড়িয়া গিয়া আর ছাড়িবার উপায় থাকে না। আমিও নকল চিকিৎসকগণের সঙ্গের ফলে এখন একজন চিকিৎসক হইয়া পড়িয়াছি, আমিও যে রোগী তাহা আর আমি কাহারও নিকট স্বীকার করি না; মনে মনে আমার রোগের জ্বালা নিজেই সহ্য করিয়া থাকি।

আমার রোগের কারণ জগৎ ও আমি, এই জগৎ ও আমার আমিকে জানিতে গিয়াই আমার যত জ্বালা বা অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; জগৎ ও আমার আমি কে, ইহা জানিতে যাইবার পূর্বে যে আমার জ্বালা বা অশান্তি ছিল না তাহা নহে; এখন উপস্থিত জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িয়াছে মাত্র। আমার এই অশান্তিরূপ জ্বালা যাহা জন্মিয়াছে সময় সময় উহার বিষয় যখন চিন্তা করি তখন আমার বোধহয় আমার এ অশান্তি কিসের জন্য বা কাহার? অনুসন্ধান করিতে গেলে আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমার এই অশান্তি যাহা হইয়াছে উহা আমার মনের অশান্তি; উহা আমার মনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে, ইহাও বলা ঠিক নহে, কারণ মন যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না, কেবল বিষয় উপলক্ষে মন এই শব্দ কতবার নিজ মুখে উচ্চারণ করিতেছি, অথচ তাহা যে কি পদার্থ, তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে বা সে থাকে কোথায় তাহার কিছু অবগত নহি; শাস্ত্রাদিতে বা সাধুসঙ্গের দ্বারা যাহা শুনিয়াছি তাহাও বোধগম্য নহে। বোধগম্য না হইবার কারণ মন অর্থে—যে সকল শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাতে যে অর্থ বলা হইতেছে সেই শব্দের বিষয় নির্ণয় না হইয়া ঐ স্থলে অপর একটি কটমট শব্দ বলা হয় মাত্র। যেমন মন বলিতে কোন কোন মতে সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক অন্তরেন্দ্রিয়, আবার কোন কোন মতে বা মন শব্দের অর্থ, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি ইহাই বলিয়া থাকেন। ইহাতে মন যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় হইল না বরং চক্ষে ধূলি প্রয়োগ করা ব্যতীত আর কিছুই হইল না উহার দ্বারা আমার মনের কোন নিরাকরণ হইল না, যতক্ষণ কোন শব্দের বিষয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ কোন শব্দের প্রকৃত জ্ঞান হয় না, আমারও এই সকল শব্দার্থ শুনিয়া ক্রমশঃ জ্বালাই বাড়িয়া যাইতেছে; কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব হইলে জ্বালা বাড়িয়া থাকে; ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। মনকে কেহ কেহ চিত্ত বলিয়া থাকেন, চিত্ত কি তাহাও জানি না, সে যে কি বস্তু তাহাও আমার জানা নাই। কেবল কল্পনা করিয়া এক একটি উপস্থিত নিজের কতক প্রবোধের জন্য একটি কাল্পনিক অর্থ করিয়া লইয়া থাকি মাত্র। নচেৎ প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান আমার নাই, চিত্ত অর্থে—যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকে চিত্ত কহে। এখানে যদি প্রশ্ন করা যায় কাহার দ্বারা জানা যায়? তাহা

হইলে ইহার উত্তরে বলিব, চিত্ত অর্থে মন আর মন অর্থে চিত্ত ইহা ব্যতীত আর আমার কিছুই বলিবার নাই, ইহা ব্যতীত অপর যদি কিছু বলিতে যাই তাহা হইলে আমার পাণ্ডিত্য বা সাধুতা প্রকাশ হইয়া যাইবে, সুতরাং ইহার বেশী আর আমার এখন উপস্থিত বুদ্ধিতে কুলায় না। যাহা হউক এক্ষণে না হয় মানিয়া লইলাম আমার মনেরই অশান্তি, এই মানিয়া লওয়াটাও আমার নিজের অন্তরের কথা নহে সকলেই বলে মনের জ্বালা, মনের অশান্তি একারণ আমিও উপস্থিত বলিয়া থাকি আমার মনের অশান্তি, অবশ্য ইহা আমার লোকের নিকট হইতে ধার করা কথা মাত্র।

আমার উপস্থিত বিচারে আমার মনেরই যে অশান্তি হইয়াছে তাহাই বা বলি কি প্রকারে? কারণ আমার যে সকল বিষয় দ্বারা অশান্তি জন্মিতেছে বা হইয়াছে, সে সকল বিষয় আমার মন নহে। আমার সম্মুখে যদি কোন বিষয় না থাকিত তাহা হইলে আর আমার মনের অশান্তি হইত না। অতএব আমার উপস্থিত বিচারে আমার মনকে বড় দোষ দিতে পারি না; আরও বিশেষ আমার মনের দোষ আমি দিতে পারিই না, কারণ আমি যখন আমার নিজের দোষ নিজে দেখিই না, তখন আমার মনের দোষই বা আমি কেমন করিয়া লোকের কাছে বা নিজের কাছে বলি; সুতরাং আমরা মনের যে দোষ তাহা আমি বলিতেই পারি না; এ কারণ আমি আমার মনের দোষ না দেখিয়া বিষয়ের দোষ দেখিতেছি। এই বিষয়ের দোষ দেখা হেতু আমি বিষয় হইতে দূরে থাকিতে চাহি কিন্তু আমি বিষয় হইতে যত দূরেই থাকিতে চাহি না কেন, বিষয় যে আমার দূরে যাইবার অগ্রেই আমার সম্মুখ দেশের অগ্রে যাইয়া উপস্থিত থাকিবে তাহা আমার জানা নাই এই জানা আমার না থাকায় আমি লোকের কথায় ও আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির বিচারে বিষয় ত্যাগ করিতে গিয়া বা ত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার কষ্টের উপর কষ্ট, জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া থাকি মাত্র। বিষয় যে ত্যাগ হইবার নহে, বা ত্যাগ করিবার নহে বা বিষয় হইতে যে দূরে থাকা যায় না তাহা আমার শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা বা সাধুসঙ্গ দ্বারা জানা হয় নাই এবং কাহারও নিকট হইতে এরূপ কথা শ্রবণও করি নাই। বরং বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে এবং বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইবে ইহাই শ্রবণ করিয়াছি ও বর্ত্তমান কালের সাধুগণের নিকট জানিয়াছি।

অবশ্য আমার এ "জানিয়াছি" বলাটা শুনা কথার মধ্যে, প্রকৃত জানা নহে; জানা হইলে আর আমার কোনও গণ্ডগোল থাকিত না। আমি শুনা কথাকে অধিকাংশ সময় আমার সংস্কার বশতঃ জানা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা আমার ভ্রম ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আমি যাহাদের নিকট হইতে বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়াছি; দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিষয় ত্যাগ করিতে দেখি নাই; বরং তাঁহাদিগকে বিষয়ের কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার অপেক্ষা তাঁহাদের বিষয় সম্ভার লক্ষ লক্ষ গুণে বেশী অথবা সেই সমস্ত বিষয় নিজের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জিত

নহে। তাহা সমস্তই পরধন; বাক্যরূপ কৌশল দ্বারা ধর্ম্মের নামে বা জড়ি বুটীর (ঔষধাদির) সাহায্যে উপার্জ্জিত। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে দেখিলে ইঁহারা তাহাকে বিষয়ভোগী বিষয়াসক্ত ইত্যাদি নানারূপ গ্লানি করিয়া থাকেন। আমাকে বিষয় ত্যাগের উপদেশ দিয়া নিজে সমস্ত বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকেন; কেবল আমার ন্যায় বিবাহিতা স্ত্রী নাই, সুতরাং পুত্র থাকাও অসম্ভব। আবার কেহ কেহ বা স্ত্রী পুত্র আছে বলিয়া সকলকার নিকট প্রকাশ করেন না। প্রকাশ না করিবার কারণ ব্যবসা মারা যাইবার ভয়। পিতা মাতা থাকিয়াও নাই; কারণ তাঁহাদের নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন না। পিতামাতাকে পরম শত্রু বিবেচনা করিয়াই থাকেন। নিজেকে চিরকুমার বা স্ত্রী বর্জ্জিত বলিয়া আমার নিকট প্রশংসা পাইবার আশায় শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া স্ত্রীগণের কলুষিত ভাব এবং স্ত্রী-জাতি মাত্রেরই স্বভাব ঘৃণিত ও তাহারা নরকের দ্বার স্বরূপ ইত্যাদি বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া অথবা স্ত্রী জাতির নিন্দা করতঃ নিজের সাধুতা মৌখিক প্রকাশ করিয়া থাকেন। অথচ ভিতরে ভিতরে গোপনভাবে ঘৃণিত ভাবের অভিনয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে আমারই ন্যায় অপরিনামদর্শী তাহাতে আর আমার সন্দেহ মাত্র নাই। আমি এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি, এক্ষণে আমি করি কি তাহাই আমার বিবেচ্য। আমি যদি লাল কাপড় বা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া সাধুর সাজে সাজি, তাহা হইলে হয় আমাকে ব্যভিচারী হইতে হইবে নচেৎ মিথ্যাচারী হইতে হইবে। কারণ স্বভাবের নিয়মানুযায়ী না চলিলে আমাকে নিশ্চয়ই ব্যভিচারগ্রস্ত হইতে হইবে; আর যদি স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমি প্রকৃতির নিগ্রহ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ও জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া সংসারে থাকিতে হইবে; কারণ প্রকৃতির নিগ্রহ করাই পাপ, পাপকার্য্যের ফল কখন শুভ হইতে পারে না। আমি বাহ্যিক স্ত্রী বর্জ্জিত ভাবকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি; সুতরাং তাহা আমার দ্বারা হইবে না এবং হওয়াও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার উপদেষ্টাগণের আচার ব্যবহার দেখিতেছি এক রকম, শাস্ত্রাদি পাঠে দেখিতেছি অন্য রকম। শাস্ত্রাদিতে যে সকল ঋষিগণের বা দেবগণের নাম উল্লেখ আছে তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রায় স্ত্রী বর্জ্জিত ছিলেন না বা বাল্যকাল হইতে আজীবন কৌমার অবস্থায় ছিলেন না। ঋষিগণের মধ্যে আবার কাহারও কাহারও একের অধিকও বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। দেবগণের মধ্যেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহারা সকলেই স্ত্রী গ্রহণ করিয়া যে পুত্র কন্যা উৎপন্ন করিয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ব্যাসদেবও স্ত্রী বর্জ্জিত ছিলেন না, তৎপুত্র শুকদেবও স্ত্রী বর্জ্জিত ছিলেন না। শুকদেবের পুত্র ও কন্যা উভয়ই ছিল।

তাঁহার পর অষ্টাবক্র, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কপিল নারদ প্রভৃতি সকলেই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষিরা সকলেই সত্যপ্রিয় ছিলেন, তাঁহারা গোপনভাবে স্ত্রী গ্রহণ

না করিয়া প্রকাশ্যভাবেই দ্বার পরিগ্রহ করিতেন, তাঁহারা কেহই প্রকৃতির নিগ্রহ করিতেন না। যদি দ্বার পরিগ্রহ করাটা পাপ কার্য্য হইত, স্ত্রী-জাতি মাত্রেই নরকের দ্বার স্বরূপ হইত, বা স্ত্রী-জাতি যদি মোক্ষ মার্গের কণ্টক স্বরূপ হইত তা হইলে বোধহয় ঋষিগণ নিশ্চয় দ্বার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করিতেন না। তাঁহারা আমার ন্যায় বোকা বা অজ্ঞানী সাধু ছিলেন না।

স্ত্রী-জাতি মাত্রেই যদি নরকের দ্বার স্বরূপ হয়, এবং মোক্ষ প্রাপ্তির বিরোধী হয়, তাহা হইলে ঋষিরা কেহই মুক্ত নহেন বা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল।

ইহাতে প্রকারান্তরে ঋষিদিগকে কলঙ্কিত করা হয় মাত্র। আমার অপরিণাম দর্শিতার ফলে আমি ত' নিজে কলঙ্কিত হইয়াছি, তাহার সহিত ঋষিগণকেও সঙ্গে লইতে চাহি।

আমি যেন শনি মঙ্গলবারে শবের ন্যায় দোসর খুঁজিতেছি। দুই-দশটা বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া সমগ্র স্ত্রী-জাতিকে নরকের দ্বার স্বরূপ বলা আমার বাতুলতা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আমার মত কু-পুত্রেরই মুখে মাতৃনিন্দা শোভা পায়। আমি কুপুত্র না হইলে কি আর সমগ্র স্ত্রী-জাতিকেই নরকের দ্বার স্বরূপ বলি? এই স্ত্রী-জাতির মধ্যে আমার পবিত্রা মাতাও ত' আছেন।

আমার বুদ্ধির দোষে আমি আমার মাতৃ দেবীকেও নরকের দ্বার স্বরূপ বলিতে কুণ্ঠিত হই না। আমার প্রবৃত্তির সহিত আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তির সম্বন্ধই যে নরকের দ্বার স্বরূপ এবং তৎকর্তৃকই যে আমি নরকের কীট স্বরূপ হইয়াছি, আমি মোহান্ধ হওয়ায় তাহা একবারও ভাবি না। সুতরাং আমার জননীরূপা সমগ্র স্ত্রী-জাতির অযথা নিন্দা করা বাতুলের উক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আমি নিজের দোষ দেখি না বলিয়া দোষ দেখিতে যাই এবং কোন জাতি-বিশেষকে দোষ দিতে গেলেই একটা প্রমাণের সহিত বলা উচিত এ কারণ কোন আধুনিক রচিত শাস্ত্র হইতে প্রমাণ বাহির করিয়া স্ত্রী-জাতি মাত্রেরই নিন্দা করিয়া থাকি।

বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে পুত্র কলত্রের ভরণ পোষণ করিতে হয়, এবং তাহাদের জন্য সংসারের কিছু কার্য্য কর্মও করিতে হয়। তাহা ছাড়া দায় আদায়ও আছে। এই সব নানাকারণে তাহাতে হঠাৎ স্বীকৃত হই না। আমার পশুভাব বলবান থাকায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধ না হইলেও, যাহাতে আমার কোনও অভাব না থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখি এবং তাহাতে আমার পশুভাব চরিতার্থের কোন বাধা না হইয়া বরং ভ্রমরের ন্যায় নিত্য নব-নব ফুলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান হয় অথচ কোনও দায়ই প্রায় ভুগিতে হয় না, আমার বরং পশুর ন্যায় স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করা হয় এবং তাহাতে আমার সাধুতার প্রশংসাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং আমিও নিজেকে সংযমী পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সুবিধা পাই।

এই সকল বাসনা আমার উপস্থিত কালের সৎসঙ্গের দ্বারা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি আমার মতের অনুকূল অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ও সংসার আশ্রমের বিরোধী মত সকল শাস্ত্র সকলের প্রক্ষিপ্ত অংশ হইতে বাহির করিয়া নিজেকে লোকসমাজে সাধু বা সংযমী বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করি।

আমি যে সকল প্রমাণ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত অংশ। ঐ সকল সংসার আশ্রমের বিরোধী মত নিশ্চয়ই কোন অনার্য্য সম্প্রদায়ের সাধু কর্ত্তৃক ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদিতে নিজেদের মতের অনুকূল শ্লোক রচনা করিয়া যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সন্দেহ নাই বলিবার কারণ আমি শাস্ত্রাদিতে দেখিয়াছি ঋষিগণ সকলেই আপন আপন স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই বসবাস করিতেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে তাঁহাদের কার্য্যের বিরোধী মত থাকা নিতান্ত অসম্ভব। ইহাতে যদি বলা যায় যে যাঁহারা এ সকল বিরোধী মত সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহাতে লাভ কি হইতে পারে?

তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যাহারা সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বিরোধী বা যাহারা গুপ্তভাবে সনাতন ভাবের উচ্ছেদ সাধন মানসে বাহ্যিক সাধুর সাজে সাজিয়া সাধনমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুষ্ক দ্বৈতাদ্বৈত বাদ লইয়া বিচারপটু এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী এতাদৃশ সাধুগণই ঋষিগণের উপদেশ বাক্যের ও কার্য্যের সামঞ্জস্য রহিত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবে। ইহাতে ঋষিগণকে আপন অপেক্ষা নিম্ন স্তরে রাখা হইল। কারণ ঋষিগণ যখন স্ত্রী হইতে পুত্র উৎপন্ন করিতেন, তখন আমি বা আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য সমস্তই সম্ভব হইতে পারে।

আরও বিশেষ আমার এই বিবাহিত স্ত্রী বর্জ্জিত অবস্থায় আমি আমাকে ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। আমি মনে করি সকলেই আমার মত অন্ধ, আমার ভাব কেহ অবগত নহে এবং ইহা অবগত হইবারও নহে।

স্ত্রী গ্রহণ না করিলেও রেতঃপাত স্বভাবের নিয়মানুযায়ী হইবেই, আমি মনে করি যে সাধারণে তা হয়ত জানে না। এ কারণ আমাকে কেহ ঊর্দ্ধরেতা বলিলে তাহা অস্বীকার করি না বরং তাহাতে আমার মনে মনে আনন্দই হইয়া থাকে। এদিকে প্রকারান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান মহাদেব ইঁহারা যোগীশ্বর; ইহাদের পুত্র কন্যা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকেও ঊর্দ্ধরেতা বলা হইল না। ঊর্দ্ধরেতা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমার জানা থাকিলে আর তাহা মুখে আনিতাম না। রেতঃ শব্দে শুক্রকে বুঝায়, এই শুক্র ধাতুই প্রাণ (শুক্র ধাতুঃ ভবেৎ প্রাণ) এই প্রাণের যিনি ঊর্দ্ধে স্থিতি করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ঊর্দ্ধরেতা পদ বাচ্য। তাহা ঋষিগণেতেও ছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণেতেও ছিল। এ কারণ ইঁহারা কেহই স্ত্রী বর্জ্জিত ছিলেন না। এবং বর্ত্তমান

কালের প্রাচীনতম সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রায় কাহাকেও স্ত্রী বর্জ্জিতভাবে থাকিতে শুনা যায় না।

যেমন গুরু নানক, গুরু কবির প্রভৃতি। গুরু নানকের দুই পুত্র। গুরু কবিরের এক পুত্র ও এক কন্যা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইঁহার দুই বিবাহ। নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোস্বামী প্রভুরাও আমার ন্যায় বাহ্যিক ভাবের স্রোতে পড়িয়া গৈরিক ধারণ করিয়া প্রথমে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক বেশধারী সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। তাহারপর নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া পুনরায় মহাত্মা ঋষিগণের পথানুসরণ করিয়া স্ত্রী পুত্রগণের সহিত সংসারে থাকিয়াই সিদ্ধ মুক্ত হইয়াছিলেন।

কেবল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব অকালে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হওয়ায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় তিনি আর পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার অকালে দেহত্যাগ না হইলে তিনিও গৃহে আসিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির ন্যায় যে স্ত্রী গ্রহণ করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতেই স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে সনাতন আর্য্যেরা স্ত্রী বর্জ্জিত অবস্থায় থাকিতেন না। কোন অনার্য্যসেবিত পন্থার দ্বারা এই ঘৃণিত স্ত্রী বর্জ্জিত অবস্থা আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। স্ত্রী বর্জ্জিত অবস্থাকে ঘৃণিত বলিবার অভিপ্রায় এই যে উপরোক্ত স্ত্রী বর্জ্জিত অবস্থায় অনায়াসেই মনুষ্যগণ ব্যাভিচারগ্রস্ত হইতে পারে এবং এরূপ হইতে দেখাও যায়; যে দেশে বিবাহ বন্ধন প্রথা শিথিল থাকে সে দেশের নর-নারী উভয়েই অনেক সময় উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কাল কবলে পতিত হইয়া থাকে। এ কারণ কি সাধারণের কি সাধু আখ্যাধারীর সকলের পক্ষেই স্ত্রী বর্জ্জিত অবস্থা কখনই প্রশংসনীয় নহে। যে কার্য্য দ্বারা ব্যাভিচারগ্রস্ত হইতে হয় ও পাপ আশ্রয় করে, তাহাকে ঘৃণিত কার্য্য ব্যতীত আর কি বলিব।

আমি নারী জাতিকে মোক্ষ মার্গের বিরোধী না নরকের কীট ইহা কিছুতেই বলিতে পারি না, কারণ ঋষি বাক্য রহিয়াছে "সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ" অর্থাৎ সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম আচরণ করিবে। স্ত্রী-জাতি যদি মোক্ষ মার্গের বাস্তবিক বিরোধী হইত তাহা হইলে সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করিতে হইবে ইহা কখনও লিখিত থাকিত না।

আমার বিবেচনায় নারী জাতি মোক্ষ মার্গের বিশেষ সাহায্যকারিণী বলিয়াই অনুমিত হয়। তবে আমার প্রবৃত্তি যদি পশুভাবের হয় তাহা হইলে আমার পত্নীও পশু ভাবাপন্না হইবেন। যেমন নিম্ব বৃক্ষের গোলঞ্চলতা নিম্বের গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তিন্তিড়ী বৃক্ষের গোলঞ্চলতা তিন্তিড়ীর (তেঁতুলের) গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং স্ত্রী-জাতিও লতার ন্যায় যিনি যেমন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তিনি সেইরূপ পুরুষের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি নরকের কীট হইলে আমার পত্নী কি আর নারায়ণের লক্ষ্মী হইবেন? তাহা আশা করাও আমার বিড়ম্বনা। বরং যদি তিনি নারায়ণের লক্ষ্মীর মত স্বভাব যুক্তা হয়েন, তাহা হইলে আমার এই পশুভাবের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমার ন্যায় নরকের কীট হইতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রী-জাতি মোক্ষ মার্গের প্রধান সাহায্যকারিণী। ইহাতে আমার বর্ত্তমান অবস্থাতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে স্ত্রী-জাতি আবার মোক্ষমার্গের কি সাহায্য করিবে বা করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহা আমার মনে হওয়া অসম্ভব নহে, বরং সম্ভব বলিয়াই বোধহয়। বাস্তবিক পক্ষে স্ত্রী-জাতি মুক্তি মার্গের কণ্টক স্বরূপও নহেন বা নরকের দ্বার স্বরূপ ও নহেন। বর্তমান সময়ের নারী জাতির মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোককে যদিও বিষয়াসক্তা এবং মুখরা, অপ্রিয় ভাষিণী এবং কলহপ্রিয়া ইত্যাদি প্রকারে দোষযুক্তা দেখিতে পাওয়া যায় বা বলা যায় তাহা কিন্তু আমারই দোষে ঘটিয়া থাকে। আমি নিজের দোষ দেখি না, তাহা আমার এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, এ কারণ আমি অহরহঃ অপরের বা কোনও জাতি বিশেষের দোষ অনুসন্ধান করিয়া থাকি। ভাল বা মন্দ ইহারা উভয়েই গুণের মধ্যে। যে জীব তিন গুণের মধ্যে রহিয়াছে তাহার ভাল মন্দ গুণ থাকিবেই, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। গুণের বাহিরের ভাব প্রাপ্ত না হইলে পুরুষই হউন আর স্ত্রীই হউন, সকলেই ভাল মন্দে মিশ্র। তবে কাহারও বা ভালর ভাগ বেশি মন্দের ভাগ কম। ওজনের তারতম্যে সবই প্রায় সমান। এই ভাল মন্দের মাথা না খাইলে আর কেহ গুণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। স্ত্রী-জাতিরা ভালয় মন্দয় মিশ্র।

আমি যখন ভালয় মন্দে মিশ্র ভাবে রহিয়াছি, তখন তাহারা (স্ত্রী-জাতিরা) আর কি দোষ করিল? আমি নিজে বিষয়াসক্ত বা কামাসক্ত হওয়ায় আমার স্ত্রী তাহাতে অনাসক্ত হইতে পারে না, আর যদি তিনি উক্ত বিষয়াদিতে অনাসক্ত ভাব প্রকাশ করেন বা করিতে যান তাহা হইলে আমি নানা উপায় দ্বারা তাঁহাকে আমার নিজের মতন করিয়া লইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকি। এইরূপ যত্ন করিতে করিতে স্ত্রীও বাধ্য হইয়া নিজ স্বামীর সন্তোষার্থে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আরও বিশেষ হিন্দু স্ত্রীগণ জানেন পতি যে রূপই হউন না কেন, তাঁহারা (স্ত্রী-জাতিরা) পতিকে গুরু অপেক্ষা ন্যুন দেখেন না। এরূপ অবস্থায় পতি যে বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার ভাল মন্দ না দেখিয়া পতির সন্তোষার্থে তাহা পালন করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের জানা আছে "পতিরেকো গুরুঃস্ত্রীণাং"। বর্ত্তমানে আমার নিজেরই সৎ শিক্ষা নাই তা অপরকে কি শিক্ষা দিব? বরং আমার শিক্ষার দোষে জানা হইয়াছে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্যই কেবল বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। তদ্ব্যতীত বিবাহে যে অপর কোন মহান উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমার শিক্ষার দোষে জানা হয় নাই। এ কারণ সর্ব বিষয়েই ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া সমস্ত ব্যাভিচারে পরিণত করিয়াছি। কোনও কোনও স্থলে আবার "পতিরেকো গুরুঃস্ত্রীণাং" বাক্যের পরিবর্ত্তে "পত্নীরেকে গুরুঃনৃণাম" করিয়া নিজ পত্নীকেই গুরু করিয়া রাখিয়াছি। ইহা না করিলে আমার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না। সুতরাং আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তির অনুরোধে আমি নিজ পত্নীকে নরকের দ্বার স্বরূপে পরিণত করিয়াছি। এ দোষ কাহার? আমার দোষ আমি নিজে কখনও স্বীকার করি না, ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং বলিয়া থাকি যে

নারী জাতিরা বিশ্বাসঘাতক এবং স্বর্গের ও মোক্ষের অর্গল স্বরূপ। আরও এইরূপ নানাপ্রকার কটুবাক্য নারী জাতির প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকি। বাস্তবিক নারী জাতিরা সকলে তাহা নহে। তবে দুই-চারিটা বা দুই-দশটা সকল বিষয়েরই বিপর্য্যয়, ঘটনা-চক্রে হওয়া অসম্ভব নয়। বরং তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। সেরূপ পুরুষ জাতির মধ্যেও শত শত ব্যাভিচারগ্রস্ত রহিয়াছে। ভাল মন্দের পরিমাণ উভয় জাতির মধ্যেই সমান ভাবে বিরাজ করিতেছে, এমন স্থলে কোন জাতি বিশেষকে ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত নয়। বরং কোন জাতি বিশেষকে ঘৃণার চক্ষে দেখাটাই ঘৃণার বিষয় এবং তাহা পাপ কার্য্য।

যদি এমনি বলা হয় যে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বামী অত্যন্ত সৎ স্বভাবান্বিত কিন্তু তাহার পত্নী অত্যন্ত অবাধ্য ও ক্রুর প্রকৃতি এবং ধর্ম কার্য্যে নিয়ত বাধা দিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে, এবং সতত কলহপ্রিয়া ইত্যাদি দোষযুক্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না যে তাহা নহে। যে যে স্থলে ঐরূপ দেখা যায়, তাহার মূলে নিশ্চয়ই পুরুষের দোষ নিহিত থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রী-জাতিরা আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না এবং স্বাধীনভাবে থাকা তাহাদের উচিতও নহে। স্বাধীনভাবে থাকিলেও বিপদ অবশ্যম্ভাবী একারণ ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র মর্হতি" অর্থাৎ স্ত্রী-জাতি স্বেচ্ছাচারিত্বভাবে থাকিবে না বা স্বাধীনভাবে থাকিবে না। বর্তমানে এই অবস্থা আমার দোষে নষ্ট হওয়ার যত অনিষ্ট হইয়াছে। যে যে স্থলে স্ত্রীর স্বামীকে সৎ স্বভাবান্বিত দেখা যায়, তথায় স্ত্রীকে অবাধ্য বা দোষযুক্তা দেখিলে বুঝিতে হইবে সৎ স্বামী স্ত্রীর প্রতি যাহা কর্ত্তব্য স্বামীর হয়ত সেই কর্ত্তব্যের জ্ঞান নাই, বা তিনি তাঁহার নিজ স্ত্রীকে বাধ্য করিতে জানেন না বা স্ত্রীকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তাহা তাঁহার (স্বামীর) জানা নাই। অনেক স্থলে আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকায় স্বামীর অপরিণামদর্শী বালস্বভাব প্রযুক্ত নিজ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ মানসে নানাপ্রকার কুৎসিত ভাবের অভিনয় করিয়া থাকেন; যথার্থ সৎ স্বামীর কর্ত্তব্য তাঁহার জানা না থাকায় স্বামীর স্থলে উপপতির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, ইহাতে স্ত্রীও অশিক্ষিতা, স্বামীও অশিক্ষিত; সুতরাং স্বামী যা করিতেছেন তাহা ভাল বোধেও নিজ স্বামীর অনুরোধে স্বীকার হইয়া পশুভাবেরই অভিনয় করিয়া থাকে। শেষে স্বামীর যৌবনভাব গত হইবার উপক্রমে বা কাহারও তাহার কিছু পূর্বে স্বামীর মনে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী কিঞ্চিৎ শ্মশান বৈরাগ্যের সহিত ধর্মভাব উদয় হইবার উপক্রমে নিজ স্ত্রী হইতে পৃথক হইবার বা থাকিবার চেষ্টা করা হয়।

ঐ চেষ্টা হইবার কারণ স্বামীর বর্ত্তমান কালের সাধু সঙ্গ দ্বারা শোনা হইয়াছে যে "স্ত্রী বন্ধের কারণ।" স্ত্রী বর্জ্জিত না হইলে মোক্ষ বা ভগবৎ লাভ হইবে না। এই ভ্রম ধারণার বশবর্তী হওয়ায় পরস্পরের মতের অনৈক্যবশতঃ গণ্ডগোলের সূত্রপাত আরম্ভ

হয়। ক্রমশঃ এইভাব ঘনীভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অবাধ্য হইয়া বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। ইহাতে স্ত্রী জাতির দোষ কি? সে প্রথমে বাল্য বয়সে নিজ স্বামীর নিকট এক রকম শিক্ষা পাইয়া তাহার সংস্কার এক রকম গঠিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই পূর্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে চলা যে কত কঠিন তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। তাহা হইলেও স্ত্রী-জাতিরা স্বামীর অনুরাধে নিজ নিজ সংস্কারের পরিবর্ত্তন করিতে যে অক্ষম তাহাও নহে, বরং নিজ নিজ সংস্কারের পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। সময়ে সময়ে তাহা দেখাও যায়। দুঃখের বিষয় তাহা থাকিলে কি হইবে তাহারাও দেখে যে আমার স্বামী মিথ্যা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম রক্ষা করা বা আমার ভরণপোষণ করাকে বা আমাকে সঙ্গে রাখা সম্বন্ধে পাপ বলিয়া মনে করিতেছেন তখন আর তিনি আমার স্বামীর মত ব্যবহার আমার প্রতি কি করিতেছেন। উপপতিতে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা যেমন স্ত্রীলোকের জাতি কুল নষ্ট করিয়া শেষে তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে উপস্থিত ক্ষেত্রে নিজ পতিকেও সেইরূপ দেখায় স্ত্রীও উপপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আরও বিশেষ পূর্বে বলা হইয়াছে স্ত্রী-জাতি আশ্রয় ব্যতীত থাকিতেই পারে না। স্ত্রী যদি জানিত আমার স্বামী ব্যতীত অপর আশ্রয় আর নাই, তাহা হইলে তাহাকে অগত্যা স্বামীর বশ্যতাপন্ন হইয়া থাকিতে হইত। তাহা না হইয়া স্ত্রী নিজ স্বামী সম্বন্ধে স্বামী বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন স্বামীর কর্ত্তব্য স্বামী পালন করিতেছেন না ইত্যাদি নানা কথা নিজ নিজ পিতা মাতা বা অপর আত্মীয়গণের মুখে শুনিয়া এবং নিজ পতিকে কালে হারাইতে হইবে ভাবিয়া নানারকম কারণে শেষে অবাধ্য হইয়া পড়েন। ইহাতে আর স্ত্রী-জাতির দোষ কি হইতে পারে? আমি আমার নিজের দোষ দেখি না বলিয়াই পরের দোষ দেখিতে যাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রী-জাতি মোক্ষ মার্গের বিরোধী নহে, বরং স্ত্রী-জাতি মোক্ষ মার্গের সাহায্যকারী; ইহাতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে স্ত্রী-জাতি আবার মোক্ষ মার্গের কি সাহায্য করিতে পারে?

বস্তুত বর্ত্তমান সময়ে তাহা মনে হওয়াও অসঙ্গত নহে। বরং আমার বুদ্ধি শক্তির অভাববশতঃ তাহা সম্ভবপর হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই জীব শব্দ বাচ্য, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। আকারের গঠন ভেদে স্ত্রী বা পুরুষ উপাধি প্রয়োগ করা যায়; এবং দেহ ভেদে কার্য্যেরও ভেদ দেখা যায় জীব পক্ষিরূপী; স্ত্রী দেহ বা পুং দেহ উভয়েই জীবের উভয় পক্ষ। পক্ষীর যেমন একটি পক্ষ কাটিয়া দিলে সে আর শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারে না এবং শূন্যমার্গে উড়িতে না পারায় তাহাতে বিড়াল কুক্কুরের ভক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়, তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতি বা স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের বিচ্ছিন্নভাব ঘটিলে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে, জীবরূপী

পক্ষী পক্ষহীন হইয়া শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মমার্গে উড়িতে না পারিয়া ক্ষিতিতলে পড়িয়া কাম-ক্রোধরূপী বিড়াল কুক্কুরের ভক্ষ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা অপেক্ষা কষ্টকর বা লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে বা হইতে পারে? যদি বলা যায়, আমার ব্রহ্মমার্গে যাইবার প্রয়োজন নাই আমি ক্ষিতিতলে সংসারেই থাকিব। কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ সংসার ধর্মই হউক আর ব্রহ্মমার্গই হউক, স্ত্রীবিহীন অবস্থায় আমার কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহাতে আমার আজীবন অশান্তিরূপ ঝড় থামাইতে থামাইতেই কালাতিপাত করিতে হইবে। সাংসারিক গৃহ কার্য্যও গৃহিণী ব্যতীত অচলপ্রায় হইয়া থাকে। সাংসারিক লোকের পত্নী বিয়োগ হইলে, গৃহশূন্য হইয়াছে বলিয়া সে লোকের নিকট স্ত্রী বিয়োগ বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকে। শাস্ত্রে গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া উল্লেখ আছে। "গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে" অর্থাৎ পত্নীকেই গৃহ বলা হয়। বস্তুতঃ গৃহিনী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, আমার দোষে বা পত্নীর পিতা মাতার শিক্ষার দোষে স্ত্রী যদি অলক্ষ্মীরূপা হন, তাহাতে আর সমগ্র স্ত্রী-জাতির কি দোষ হইতে পারে, তাহা আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির অগোচর বলিয়া বোধ হয়। পূর্বে স্ত্রীগণ বাল্যাবস্থায় নিজ পিতা মাতার নিকট এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজ পতির নিকট যেরূপ সৎশিক্ষা পাইতেন এক্ষণে তাহা না পাওয়ায় কোন কোন স্থলে স্ত্রী লোকের আচার ব্যবহার কথঞ্চিত দূষণীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহা যে কেবল স্ত্রী-গণের মধ্যেই ঘটিয়াছে তাহা নহে ; স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই জন্মিয়াছে; ইহা বলিয়া সে সকলকেই স্ত্রী বিহীন হইয়া থাকিতে হইবে বা স্ত্রী-জাতিরা নরকের দ্বার স্বরূপ ইত্যাদি বলা, ইহা কদাচ যুক্তি সঙ্গত নহে। বরং যাহাতে স্ত্রীগণ পত্নীগণের মতন হন বা দেব-পত্নীগণের আচার ব্যবহার শিক্ষা পান তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত।

এ ব্যবস্থা আমার ন্যায় বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়া আমি যেমন কোন বিষয়েই সংযমশীল হইতে পারি নাই, কেবল বাক্য পটু হইয়াছি। তদ্রূপ এই বিদ্যা শিক্ষার ফলে কালে স্ত্রীগণও আমার ন্যায় হইবে। তাহাতে আর লাভ কি? বরং যাহা আছে তাহাই ভাল; বর্ত্তমানকালের বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাহাও থাকিবে না। ধর্ম, কর্ম, সব নষ্ট হইয়া যাইবে। এমত স্থলে আমার কর্ত্তব্য যাহাতে বর্ত্তমানকালের স্ত্রীগণ ঋষি পত্নীগণের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পারেন, আমার বিবেচনায় আমার তাহাই যত্ন করা উচিত। তাহা না করিয়া মাতৃস্বরূপা স্ত্রী-জাতির নিন্দা করিলে ঋষিগণকে ও মাতৃস্বরূপা স্ত্রীগণকে কলঙ্কিত করা ব্যতিত অপর কিছুই হয় না। অতএব মানুষ মাত্রেরই ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া চলা উচিত। তাঁহারা স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতেন না, সেইরূপ ভাবেই থাকা উচিত। যেমত যেখানে বশিষ্ঠ সেইখানেই অরুন্ধতী। অরুন্ধতী ক্ষণকালও বশিষ্ঠ হইতে পৃথকভাবে থাকিতেন না, বশিষ্ঠও তদ্রূপ। মানব মাত্রেরই এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা উচিত। নচেৎ কোথায় কোন সাধুর নিকট কোন অপ্রাসঙ্গিক শাস্ত্র কথা শুনিয়া মনকে

বিচলিত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেমত আধুনিককালের রচিত অবধূত গীতাতে স্ত্রীগণের নিন্দা কথিত আছে তাহা অযৌক্তিক।

অবধূত গীতা ৮ম অঃ ১২ শ্লোক—"ন জানামি কথং তেন নির্ম্মিতা মৃগলোচনা বিশ্বাস ঘাতকীং বিদ্ধি স্বর্গ মোক্ষ সুখার্গলাম" অর্থাৎ কেন যে বিধাতা মৃগলোচনা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানি না, তাহাদিগকে বিশ্বাস ঘাতকী স্বর্গ ও মোক্ষের অর্গল স্বরূপ জানিও ইত্যাদি আরও কতিপয় অশ্লীল শ্লোক দ্বারায় গ্রন্থখানিকে কুরুচি সম্পন্নই করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ দ্বারা প্রথমতঃ দত্তাত্রেয়কে জীবন্মুক্ত পদ হইতে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে। দত্তাত্রেয় ঋষিপদ বাচ্য। তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় কথা বলিতে পারেন না, আর যদি তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে না। উপরোক্ত শ্লোক যদি তাঁহার কথিত হয় তাহা হইলে তিনি নিজেই বলিতেছেন আমি জানি না কেন বিধাতা মৃগলোচনার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে স্ত্রী-জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার (দত্তাত্রয়ের) কোন জ্ঞান ছিল না। এমতস্থলে তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ কিরূপে বলা যাইতে পারে তাহাতে বুঝিতে পারি না। আমার বিশ্বাস জীবনমুক্ত পুরুষগণ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণতা লাভ হয় নাই তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বা ঋষি পদবাচ্য বলিতে পারি না। এই অবধূত গীতাখানি নিশ্চয়ই কোন অপরিণামদর্শী সাধু বেশধারী পণ্ডিতের দ্বারায় রচিত হইয়া জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবৎতুল্য দত্তাত্রেয়কেও কলঙ্কিত করিয়াছে। বাস্তবিক উক্তরূপ অজ্ঞানের কথা মুক্ত পুরুষেরা কখনও বলেন না। সংস্কৃত ভাষা অসংস্কৃত ব্যক্তির দ্বারায় রচিত হইলেই তাহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ না হইয়া স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ এবং সম্বন্ধ রহিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষাকে দেব ভাষা কহে। ঋষিগণ সকলেই আত্ম সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেন; সুতরাং তাহা ভ্রান্ত বাক্য হইতে পরে না, বা অজ্ঞানীর ন্যায় বাক্য হইতে পারে না। এ কারণ যে যে শাস্ত্রের যে যে স্থানে যুক্তিবিরুদ্ধ বা অসামঞ্জস্য ভাব দেখিতে পাওয় যায় উহা নিশ্চয়ই কোনও অসংস্কৃত ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়া শাস্ত্রের স্থানে স্থানে নিজের অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি নিজে অসংযত আমার আত্মসংস্কার দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত ও শুদ্ধি হয় নাই।

আত্মা কি তাহাও জানি না আত্মা শব্দ মাত্র মুখে বলিয়া থাকি। আত্মা শব্দ যে আত্মা নহে তাহাও বোধ নাই। যেমন জল এই শব্দ জল নহে, জল জল এই শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন পিপাসা দূর হয় না তদ্রূপ আত্মা এই শব্দ মুখে বলিলে আত্মার জ্ঞান বা আত্মার সংস্কার হয় না। সুতরাং তাহার দ্বারায় আমার বর্ত্তমান বুদ্ধিও মার্জ্জিত হয়

না। আমার বর্ত্তমানে যে বুদ্ধি আছে তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আমি তাহা কাহারও নিকট বলিনা বা স্বীকার করি না। কিন্তু আমার যে একেবারে বুদ্ধি নাই তাহাও নহে, আমার আত্ম-সংস্কারের অভাব হেতু আমার আত্ম বিষয়িণী বুদ্ধিই নাই। কিন্তু আমার দুষ্ট বুদ্ধির যে অভাব আছে তাহা নহে বরং উহা যথেষ্ট আছে। আবার আত্ম বিষয়িণী বুদ্ধির অভাব হেতু আমি যাহা করণীয় নহে তাহাকেই মুখ্য বোধে করণীয় মনে করিয়া আদর ও যত্নের সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং বাস্তবিক জীব মাত্রেরই যাহা করণীয় তাহাকেই সময় সময় নিজের স্বার্থের খাতিরে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমি জগতের এই সব ব্যাপার দেখিয়া আমার যাহা কিছু বুদ্ধি ছিল তাহাও হতবুদ্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

যাহা হউক আমি কথার প্রসঙ্গে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহা ন্যায়ই হউক আর অন্যায়ই হউক, কথার প্রসঙ্গক্রমে যখন হইয়াছে; তখন আমাকে মার্জ্জনা করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়। আমি পূর্বে বিষয়ের দোষ দেখিতে গিয়া এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। দূরে আসিয়া পড়িলেও ইহাতে যে আমার কথঞ্চিৎ লাভ বা উপকার হয় নাই তাহা আমি বলিতে পারি না; কারণ এক্ষণে আমি বুঝিলাম যে, বিষয় পরিত্যাগ হইবার নহে, ও তাহা পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকও নাই। এক্ষণে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা যে আমার সম্যক বোঝা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কারণ ইহা দ্বারা আমার জ্বালা নিবারণ হইল কৈ? পূর্বেও আমার যে জ্বালা ছিল বর্ত্তমানেও আমার সেই জ্বালাই রহিয়াছে। যদি বিষয়ের দোষ না থাকে বা বিষয়ের দোষ না হইল তাহা হইলে আমার জ্বালা বা অশান্তি দূর হয় না কেন? আমি দেখিতেছি আমার এ জ্বালা যাইবার নহে, কারণ আমার জ্বালার বা অশান্তির মূল কারণই "জগৎ ও আমি"। জগৎ ও আমার আমি বর্ত্তমান থাকতেই যে জ্বালা বা অশান্তি তাহা আমার বর্ত্তমান স্থূল বুদ্ধির অগোচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার বিবেচনায় জগৎকেও আমার জ্বালা বা অশান্তির কারণ বলিয়া মনে হয় না। কারণ জগৎও একটা বিষয়ের মধ্য। সমস্ত বিষয়ই যখন জ্বালার কারণ নহে, তখন জগতের দ্বারাই বা আমার জ্বালা বা অশান্তি হইবে কেন? তাহা সম্ভবপর নহে। তবে আমার ইহাই কথঞ্চিৎ অনুমান হয় যে হয়ত আমার এই বর্ত্তমান জগৎ দেখায় যত জ্বালা ও অশান্তির উৎপত্তি হইয়াছে। আমি যদি জগৎ না দেখিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার জ্বালা বা অশান্তি হইতে পারিত না। ইহাও আমার যুক্তিসঙ্গত বলা হইল না। কারণ যাহারা জন্মান্ধ তাহারা ত' এই বর্ত্তমান জগৎ দেখে নাই।

জগৎ না দেখায় যদি জ্বালা বা অশান্তির অবসান হইত তাহা হইলে অন্ধদিগকও চির শান্তি ভোগ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহাত' দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহাদিগকে আমা অপেক্ষা অধিকরত জ্বালা বা অশান্তিগ্রস্তই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন দেখিতেছি যে জগৎ দেখাতে যে জ্বালা আর জগৎ না দেখাতেও সেই জ্বালা, এমত স্থলে জগৎ না দেখাতেও যখন জ্বালা যখন জগৎ দেখাতেও জ্বালা এবং না দেখাতেও জ্বালা হইতেছে তখন আর আমি বলিতে পারি না যে বর্ত্তমান জগৎ দেখাতেই আমার জ্বালা বা অশান্তি জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ জগৎ দেখা বা না দেখা আমার পক্ষে উভয়ই তুল্য, কারণ আমার জগৎ দর্শন করা বা দর্শন না করা ইহা আমার জ্বালা বা অশান্তির কারণ নহে। এমন অবস্থায় স্বতঃই মনে হইতে পারে যে তাহা হইলে আমাল, এ জ্বালার বা অশান্তির কারণ কি? ইহার উত্তরে যদি বলি আমি নিজেই আমার অশান্তিরূপ জ্বালার কারণ; ইহাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না, কারণ আমি অহং মদে মত্ত থাকায় আমার কোনও প্রকার দোষ আছে তাহা বলিতে বা দেখিতে ইচ্ছা করি না। আরও বিশেষ আমি কি ও আমি কে তাহাই আমি জানি না, আমি আমি করিয়া বেড়াই মাত্র। আমি আমাকে না জানিয়াই বা আমার দোষ বলি কি প্রকারে? তাহার পর আর এক কথা, আমার দোষ আমি নিজে দেখিতে গেলেই আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি গম্ভীরভাবে বলিতে থাকে আমার দোষ কিছুমাত্র নাই। আমার উভয় সঙ্কট হইয়াছে। এমন স্থলে আমার বলিবার কিছু না থাকিলেও কিছু না বলাও ভাল দেখায় না; কারণ তাহাতে শেষে নিজের দোষই সাব্যস্থ হইয়া পড়ে। একারণ মধ্যে মধ্যে এই রকম স্থলে যখন কোনও কিছু বলিতে গেলে নিজের দোষ প্রকাশ হইবার আশঙ্কা থাকে, তখন প্রায়ই বলিয়া থাকি দোষ আমার কিছুমাত্র নাই, দোষ আমার বরাতের। আমার বরাতের দোষ বলাটা নিতান্ত মন্দ নহে, কারণ বরাত কেহ দেখিতে পায় না এবং বরাত কি তাহাও জানি না। বরাতের দোষ বলিলে নিজের দোষও লোকের নিকট কতকটা কাটিয়া যায়। লোকেও বুঝে উহার কোনও দোষ নাই, সমস্তই উহার বরাতের দোষ। আমিও "যা শত্রু পরে পরে" ভাবে অব্যাহতি পাইলাম। বরাতের দোষ দিয়া লোক সমাজে চড়ুকে হাসি হাসিয়া বেড়াই মাত্র, কিন্তু অন্তরে সুখ নাই, সদাই ভিতরে ভিতরে অন্তর জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি। যাহা হউক "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" এইরূপ ভাবের উপর জেদ রাখিয়া জগতের ব্যাপারটা কি তাহাই একবার বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেখি যে বর্ত্তমান জগৎ কোথা হইতে প্রতিভাসিত হইতেছে। এখন তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক। আমি এই পর্য্যন্ত এই পরিদৃশ্যমান জগতের বহিঃরূপই দেখিয়া আসিতেছি এবং বহিঃরূপেরই বিচার করিতেছি। বহিঃরূপ দেখিয়া জগতের বিচার করিতে যাইলে জগতের মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া বিচার বা মীমাংসা উড়িয়া যায়। মীমাংসা ত' হয়ই না, মীমাংসা না হইয়া বরং জগতের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়; যেমন আমাকে ভাসিয়া যাইতে হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি প্রথমে জগতের মূল বা বীজ দেখিতে গিয়া জগৎপতি জগদীশ্বরকে জগতের বীজ বলিয়া আমার সংস্কারবশতঃ যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা সত্য হইলেও প্রত্যক্ষভাবে এবং নানা সম্প্রদায়ের কথার ভাবে না নানা বাদের কূট তর্কে এবং শাস্ত্রের টীকাকারদিগের টিপ্পনীর জ্বালায় আমার জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িয়া গিয়া দিনের দিন সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইতেছে। জগদীশ্বর সম্বন্ধে আমার যে কোনও জ্ঞানই হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে আমি এখনও একেবারেই নাস্তিক হইতে পারি নাই কিন্তু নাস্তিক ভাব আসিবার আর বড় বেশী বিলম্বও দেখিতেছি না। বর্ত্তমানে আমি মানিয়া চলিতেছি মাত্র। বস্তুতঃ উহার দ্বারা আমার জানাও হইতেছে না এবং জানা হইতেও পারে না। কথায় চিঁড়ে ভিজে না। সব আছে কেবল জল থাকিয়াও আমার কাছে নাই। জলের অভাব হেতু আমার নিকট সব শুষ্ক বোধ হইতেছে। আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে আর তাহা হইত না।

কল্পনা দ্বারা জানা হইতে পারে না। আমি কল্পনাকেই সত্য বোধে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছি মাত্র। এরূপ ভাবে চলিলে পরমার্থ বিষয়ের জ্ঞান আমার কখনই লাভ হইবে না। আমার বোধহয় যে আমি যদি প্রথমতঃ কোনও বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাহা হইলে আর আমার কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না। আমি যে একেবারে কোনও বিষয়েরই কারণ অনুসন্ধান করি না তাহাও নহে। তবে তাহার সম্যক কারণ বা মূলীভূত কারণ না দেখিয়া তাহার গৌণ কারণ দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকি, যেমন ঘট দেখিয়া ঘটের কারণ কুম্ভকার ইহা নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হই; অপর কিছুই দেখিতে চাহি না। মনে হয় ইহাতেই আমার জানার শেষ হইল, বস্তুতঃ ইহাতে যে আমার জানার শেষ হইল তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। ঘটের কারণ কুম্ভকার হইলেও কুম্ভকারের অদর্শন হেতু কুম্ভকার সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান হইল না। ঘটের কারণ কুম্ভকার ইহা না হয় স্বীকার করিলাম, এখানে সেই কুম্ভকার স্ত্রী-জাতি কি পুরুষ জাতি কিম্বা তাহার আকার অবয়বরূপ গুণ সমস্তই অজ্ঞাত রহিল। আমি না হয় খাতিরে পড়িয়া বা যিনি বলিতেছেন তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়িক মানিয়া লইলাম ইহাতে যে আমার জানা হইল না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই জানা না হওয়ায় আমার যে চির অশান্তি

ও জ্বালা তাহা দূর হইল না। তবে লোকলজ্জা ভয়ে লোকে আমাকে নাস্তিক কহিবে বা অভক্ত বলিবে ইত্যাদি আশঙ্কায় একজন বা কতকগুলি কুম্ভকার তুল্য জগদীশ্বরের অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করিয়া যাই এবং স্বার্থের খাতিরেও সময়ে সময়ে দৃঢ়তার সহিত তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করি। স্বীকার না করিলে আমার ব্যবসা মারা যায় সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ যতক্ষণ না মূলীভূত কারণ প্রকাশ পাইবে ততক্ষণ কোনও তত্ত্বই অবগত হওয়া যাইবে না। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় অন্ধের ন্যায় সকল বিষয়েরই কল্পনার স্রোতে ভাসিতেছি। এই কারণেই আমার কোনও বিষয়েরই মুখ্য কারণ জানা না হইয়া তাহা হইতে অনেক দূরে পতিত হইয়া কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া পড়ি। এই কারণেই আমার জ্বালা বা অশান্তির অবসান হয় না। এক্ষণে 'কারণ' শব্দের অর্থ কি? যাহার সহযোগ ব্যতীত কোনও কর্ম নির্ব্বাহ হয় না, বা যাহার দ্বারায় কার্য্য বা কর্ম উৎপন্ন হয় তাহাই কারণ শব্দবাচ্য। ঘট প্রস্তুত করিলে যে কেবল কুম্ভকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত হইতে পারে তাহা নহে। ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে জল মৃত্তিকা দণ্ড চক্র ও কুলাল একত্র সম্মিলন না হইলে বোধহয় কোনক্রমহে ঘট প্রস্তুত হইতে পারে না। জল মৃত্তিকা দণ্ড ও চক্রের অভাব থাকিলে কেবল কুম্ভকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। আবার যদি কুম্ভকার বর্ত্তমান না থাকেন তাহা হইলে জল মৃত্তিকা ইত্যাদি দ্বারাও ঘট প্রস্তুত অসম্ভব। ইহা দ্বারা স্পষ্টবোধ হইতেছে যে একাকী কাহারও দ্বারা ঘট প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নহে। এমতস্থলে জল, মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও কুলাল ইহাদের কাহাকেও ঘটের মুখ্য কারণ বলা যাইতে পারে না এবং বলাও উচিত নয়। ইহাদের সকলগুলিকেই ঘটের গৌণ কারণ বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমার বিশ্বাস ঘট নির্ম্মাণের মুখ্য কারণ স্বতন্ত্র, উহা 'জগৎ' ও আমার 'আমি'র মধ্যে নিহিত আছে। নচেৎ কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎপতির জ্ঞান লাভ করা এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা দ্বারা আমি আরও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সময়ে সময়ে জগৎপতি জগদীশ্বরকে যাত্রার সং সাজাইয়া নিজেই তাহার অভিনয় করিয়া থাকি। আমি যদি মূলীভূত কারণ অবগত থাকিতাম তাহা হইলে আর আমার জানার বাকি থাকিত না। আমি শাস্ত্র পাঠ দ্বারা যে সমস্ত বিষয় জানিয়াছি, বলিতেছি, তাহা সমস্তই ভ্রমে পরিপূর্ণ থাকায় আমার প্রকৃত জানা হয় নাই; জানা না হওয়ায় আমার জানিবার পিপাসাও কিছুতেই মিটিতেছে না। পিপাসা বর্ত্তমান থাকায় জল ভ্রমে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছি এবং সময় সময় বোধ হইতেছে নিকটেই যেন জল রহিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা জল নহে, মরুভূমির মরীচিকার ন্যায় বলিয়া বুঝিয়া লইতেছি। আমার মরুভূমির জ্ঞান নাই, মরীচিকাও কখনও দেখি না। তবে এই জগৎকে অনেকে মরীচিকা বলেন বলিয়া, মরীচিকা শব্দটি শুনিয়াছি; নচেৎ মরীচিকার জ্ঞানও আমার নাই। জগৎ যে মরীচিকাবৎ তাহা সত্য হইলেও আমি বর্ত্তমানে তাহা বিশ্বাস করিনা, কারণ মরীচিকা মরুভূমিতেই হইয়া থাকে।

আমি যে জগতে রহিয়াছি তাহা ত' মরুভূমির ন্যায় বালুকাময় ভূমি দেখিতেছি না। সুতরাং ইহাকে অপরের কথাতেই বা কেমন করিয়া মরুভূমি বলিয়া মানিয়া লই? বরং আমি যে জগতে রহিয়াছি তাহাকে উর্ব্বরা ভূমি বলিতে পারি; কারণ ইহার সকল স্থানেই নানাজাতীয় শস্য,-বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষী ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং নানাবিধ শস্যাদি ও উৎকৃষ্ট ফল মূলাদি উৎপন্ন হইতেছে। এমন অবস্থায় পরের কথায় আমি এই জগৎকে মরুভূমি বা মায়া বলিয়া স্বীকার করিলেও আমার মন তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। মনই বা তাহা কিরূপে স্বীকার করে? কারণ মন যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কিছুই মানিতে চাহে না। যদি কেহ আমাকে বা আমার মনকে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দিতেন তাহা হইলে আমি বা আমার মন উহা কখনই অস্বীকার করিতে পারিত না। কেবল কথাই শুনিয়া আসিতেছি, কাজে কিছুই নাই। আরও বিশেষ মরুভূমি সর্ব্বত্রে থাকে না, তাহার পরপার নিশ্চয়ই থাকিবে। মরুভূমিতেই মরীচিকা দর্শন হওয়া সম্ভব, কিন্তু মরুভূমির পরপারে ত' আর মরীচিকা থাকিতে পারে না, বা মরুভূমি পার হইলেও আর মরীচিকা থাকা সম্ভবপর নহে। দুঃখের বিষয় আমাকে সকলেই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে খুব তৎপর, কিন্তু আমাকে মরুভূমি হইতে পার করিয়া আমার ভ্রম দূর করিতে কেহই চান না বা প্রত্যক্ষভাবে মরুভূমির পর-পার-রূপ দাঁড়াইবার স্থানও কেউই দেখাইয়া দেন না। যিনি দেখাইবেন, তিনিও আমার ন্যায় মরীচিকা দর্শন করিতেছেন; তবে কতকগুলি ধার করা কথা সংগ্রহ করিয়া ফাঁকা শব্দে আমার ন্যায় বোকা পক্ষীকে বশীভূত করিতে চান মাত্র আর কিছুই নহে। পরের নিকট হইতে বা শাস্ত্র হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া নিজে না জানিয়া বা না বুঝিয়া কাহাকেও কোন কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। আমি যে কোন মরুভূমিতে দন্ডায়মান হইয়া সমগ্র জগৎকে মরীচিকাবৎ বোধ করিতেছি, আমাকে সেই স্থান দেখাইয়া দেওয়া চাহি, কথার কথা বলিলে আমার মন জানিবে না। উহা প্রত্যক্ষভাবে দেখান উচিত, নতুবা আমার মন মানিবে না। তদ্রূপ মরুভূমির পরপাররূপ স্থানও আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখান উচিত। কারণ যখন আমি মরুভূমির পর-পাররূপ স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিব যে জগৎ আর দেখিতে পাইতেছি না তখন আমি প্রকৃতরূপে বুঝিব যে এই স্থানটা মরুভূমি, এই স্থানে থাকিলে মরীচিকা দর্শন হইয় থাকে। আরও বুঝিব যে এই স্থানটা মরুভূমির পরপার, এই স্থানে থাকিলে মরীচিকা থাকিয়াও আমার নিকট অদৃশ্য। তখনই আমার ভ্রম দূর হইতে পারে, নচেৎ কথা দ্বারা বা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা সে ভ্রম যাইবার নহে! এই জগৎ যদি মরুভূমির মরীচিকাই হয়, তবে নিশ্চয়ই এমন একটি স্থান আছে যে যেথায় যাইলে বা স্থিতি হইলে আমার মরীচিকা দর্শন দূর হইতে পারে। তবে সে স্থান পাইয়াও যদি আমি সে স্থানে লক্ষ্য এবং অবস্থিতি না করি তবে সে দোষ আমার; সে দোষ অপরের হইতে পারে না। আমাকে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে মরীচিকা বা মায়ার পর পার আছে উহা উত্তীর্ণ হইতে হইলে স্ত্রী-পুত্র বিষয়াদি

পরিত্যাগ করিতে হয়। উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিলে উত্তীর্ণ হইবার অপর উপায় নাই। দুঃখের বিষয় যাঁহারা আমাকে এইরূপ কহিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজে কেহই তাহা পালন করেন না। বাহ্যিক সব ঠিক আছে, কিন্তু চেলা হইয়া এবং বিশ্বাসী হইয়া কিছুদিন তাঁহাদের সহবাসে অবস্থান করিলে জানিতে আর কিছুই বাকি থাকে না। যে যাহা হউক, উপরোক্ত ব্যবস্থা মত চলিলে রোগ রোগী দুই-ই চির বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে। অগ্রে সকলেই ঝড় থামাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। ঝড় যে থামিবার নহে তাহাতে দৃষ্টি অনেকেরই নাই। যেমন সমুদ্রের ঝড় বা তুফান হওয়া ইহা সমুদ্রের স্বাভাবিক ধর্ম। আমার যদি সমুদ্রের পরপারে যাইবার আবশ্যক হয় এবং আমি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দর্শনে ভীত হইয়া যদি আমি কাহারও নিকট সমুদ্র পারে যাইবার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি; তদুত্তরে আমার পরামর্শদাতা যদি বলেন "বাপু! তুমি সমুদ্রের তরঙ্গ থামাইয়া বা সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হইলে পরপারে যাইও"। এমন স্থলে আমার কি কোনও কালে সমুদ্রের পরপারে যাওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বোধহয় কখনই নহে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা বুদ্ধিমান নাবিক উক্তরূপ পরামর্শ দিবেন না। তিনি বলিলেন সমুদ্রের ঝড় বা তরঙ্গ উহা স্বাভাবিক, বন্ধ হইবার নহে এবং ঝড় বা তরঙ্গ থামান কাহারও সাধ্যায়ত্তও নহে। ঐ তরঙ্গের মধ্য দিয়াই আপন তরণীর হালের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তরণীর হালের উপর ভর করিয়া পাল তুলিয়া দিয়া সমুদ্রের তরঙ্গের গোড় কাটাইয়া যাইতে হইবে, নতুবা পরপারে যাওয়া হইবে না। আর যিনি অগ্রে ঝড় থামাইতে যাইবেন বা তরঙ্গ থামিলে যাইব মনে করিবেন, তাঁহাকে সমুদ্রের তীরে বসিয়াই চিরকাল কাঁদিতে হইবে, পরপারে আর যাওয়া হইবে না। আমিও পরামর্শ দাতাগণের পরামর্শ অনুযায়ী অগ্রে ঝড় থামাইবার জন্যই ব্যস্ত। ঝড় যে থামিবার নহে এবং ঝড় যে থামাইবার আবশ্যক নাই তাহাও আমার জানা নাই। যাহা অস্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধ তাহাই আমি অগ্রে করিতে ব্যস্ত। যাহা অস্বাভাবিক বা প্রকৃতির বিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতির নিগ্রহ করা যে অনাবশ্যক এবং প্রকৃতির নিগ্রহ করাই যে পাপ তাহা আমার জানা নাই। জ্ঞানিগণ প্রকৃতি নিগ্রহ করেন না এবং কাহাকেও করিতে পরামর্শ দেন না। প্রকৃতির নিগ্রহ হইতেও পারে না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম সাধন করিলেই যে সংযতেন্দ্রিয় হইলাম, ইহা মনে করা বিষম ভ্রম। বরং তাহা মিথ্যাচারে পরিণত হইয়া থাকে। মনে মনে বিষয়াদি চিন্তা করিতেছি ইহা কি আমার মিথ্যাচার নহে? যাহা হউক আমার বিষম জ্বালাই হইয়াছে। আমার যত জ্বালা বা অশান্তি উপস্থিত "জগৎ ও আমি"-কে লইয়া। আমি যে কি বা আমি কে তাহার ত' এ পর্য্যন্ত কোনও খবরই পাইলাম না, এবং জগৎ যে কি তাহাও কাহারও দ্বারা নির্ণীত হইল না। জগৎ সম্বন্ধে মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়াছি। যাঁহার যা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাকেন আমি কিন্তু কোনও কথাতেই আস্থা করিতে পারিতেছি না। কারণ আমি জগৎ পূর্বেও যেমন দেখিয়াছিলাম বর্ত্তমানেও তাহাই দেখিতেছি, এমত অবস্থায় কেমন করিয়াই বা

আস্থা স্থাপন করিতে পারি। আমার কিন্তু বিষম জ্বালা, কারণ এ জগৎকে না জানিলেও আমার কোন বিষয়েই তৃপ্তি হইতেছে না। আমার জগৎ সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা হইল না। আমার আমিরও কোনও কূল কিনারা কাহারও নিকট হইতে পাইলাম না। আমার আমি সম্বন্ধেও নানা বাদের কথা শুনিয়াছি তাহাতেও আমার তৃপ্তি হয় নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন আমি আত্মাস্বরূপ অথচ আমার আত্মা শব্দের অর্থবোধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত অনেক শব্দই শুনিয়া আসিতেছি; আত্মা শব্দও উহাদিগের মধ্যে একটি, যে সকল শব্দ এ পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি তাহাদের অর্থবোধক বস্তু সকলও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আত্মা শব্দ শুনিয়াই আসিতেছি। কিন্তু আকাশ কুসুম বা সোণার পাথর বাটীর ন্যায় ইহা কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইবে কোথা হইতে? আবার এই আত্মাকে অবিনাশীও বলা হইয়া থাকে। যদি আত্মা অবিনাশী হন এবং আমি যদি আত্ম স্বরূপই হই তাহা হইলে আমার মৃত্যু হওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ আমি জগতের মধ্যে এই মৃত্যুকেই একমাত্র নিশ্চিত বলিয়া দেখিতেছি, অপর সমস্তই অনিশ্চিত। কিন্তু মৃত্যু যখন সকলকার একদিন নিশ্চয়ই হইয়া থাকে এবং ইহা যখন অবশ্যম্ভাবী, এমন স্থলে আমি আত্মা হইলে আমার অবিনাশীত্ব কোথায় গেল? আবার আত্মা যদি অবিনাশী হন তাহা হইলে আমি যে আমার পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকি তাহা কাহার শ্রাদ্ধ কে করে? মৃত ব্যক্তিরই ত' শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মা যখন অবিনাশী তখন আমি শ্রাদ্ধ করি কার? আমার যখন আত্মা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তখন আমার আত্মাকে বিনাশশীল বা অবিনাশী কিছুই বলা উচিত নহে। দুঃখের বিষয় আমি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মা অবিনাশীই বলিয়া থাকি, আমি ইহা বলিলেও আমার জ্বালার বা অশান্তির বিরাম নাই। ইহাতেই আমার অনুমান হয় যে আমার আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে আমার নিশ্চয়ই অশান্তি ও জ্বালা তিরোহিত হইত। তাহা না হইয়া জ্বালায় উপর জ্বালা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আমার বিশ্বাস, আমার এই 'আমি' বোধ থাকিতে সে জ্বালা যাইতে পারে তাহাও বুঝিতে পারি না। এই আমি বোধ যায়ই বা কিসে তাহা জানি না, আমি আত্মা, আমি আত্মা বা সোহহং সোহহং শব্দ মাত্র জপ করিলাম কিছুতেই আমার জ্বালা বা অশান্তি যাইল না। এক্ষণে দেখিতেছি আমি বা জগৎ যায় যাউক তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আমার জ্বালারূপ অশান্তির অবসান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছি এমন সময় আমার মন শয়তানের (আসুরিক ভাবের) বশীভূত হইয়া আমাকে মোহিত করিয়া বলিয়া উঠিল, তবে আর তোমার ভাবনা কি? তোমার জ্বালা বা অশান্তি এখনি নিবারণ হইতে পারে তাহাতে বহুকালব্যাপী সাধনারও প্রয়োজন হইবে না এবং এদেশ সেদেশ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীর্থাদিও পর্যটনা করিতে হইবে না, এখনি তোমার একেবারে সব জ্বালা চুকিয়া গিয়া মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে আয়োজনও

কিছু বেশী করিতে হইবে না। কেবল একগাছা ভাল এবং মোটা দড়ির দরকার মাত্র এবং ঐ দড়িগাছটা কোনও একটা উচ্চ স্থানে বাঁধিয়া তাহার পর ঐ দড়িতে একটা ফাঁস লাগাইয়া নিজের গলায় লাগাইয়া দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়। তবে সরু দড়ি বা পচা দড়ির দ্বারায় কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, তাহাতে কার্য্য হানি হইবে, এবং কাল বিলম্বও করিও না কারণ "বিলম্বে কার্য্য হানিঃ স্যাৎ" বিলম্ব করিলে কার্য্যহানি হইতে পারে। বিশেষ তুমি যখন আত্মা অবিনাশী বলিতেছ তখন আর মৃত্যুই বা কাহার হইবে। আত্মার অবিনাশিত্ব আমার শয়তানের (আসুরিকভাবের) এই যুক্তি দ্বারা পরীক্ষাও করিতে পারিবে যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হও, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত হইবে, নচেৎ নির্ব্বাণ মুক্তিও নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে অতএব আর দেরী না করিয়া তৎপর মুক্তিলাভ কর। আমার আসুরিক ভাবাপন্ন বর্ত্তমান মনের অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অগত্যা আমার আসুরিক ভাবাপন্ন বর্ত্তমান মনের উপদেশ মত কার্য্যসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি বর্তমান বুদ্ধির সহিত ব্যস্তসমস্ত ভাবে আমার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া আমাকে কথঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া শান্ত করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। আমার প্রবৃত্তি-স্ত্রী-রূপা, প্রবৃত্তি স্বয়ং প্রকাশ হইয়াই, আমাকে যেন সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— "না না তুমি এমন কার্য্য কদাচ করিও না; ছি ছি আত্মহত্যা করিও না ইহাতে নরহত্যার প্রশ্রয় পাইবে, ইহাতে দেখিতেছি তোমার "লাভঃ পরং গো-বধঃ" মাত্র হইবে; এমন কার্য্য কদাচ করিও না। যাহারা ভ্রান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন তাহারাই ঐরূপ আত্মহত্যা কার্য্যে রত হইয়া থাকে এবং যাহারা ভ্রান্ত তাহারাই বলিয়া থাকে মরিয়া গেলেই মুক্তি লাভ হয়। অতএব তুমি কদাচ ভ্রান্ত ব্যক্তির কথায় আত্মহত্যারূপ নরহত্যার প্রশ্রয় দিও না। যদি বল আমি আত্মহত্যা করিব তাহাতে আর নরহত্যার প্রশ্রয় দেওয়া কিসে হইবে; ইহার উত্তরে আমি ইহাই বলিতেছি যে তোমার এই আত্মহত্যা করার অনুকরণ যদি অপরে করিয়া বসে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদিগের পথ প্রদর্শক হইলে না? সুতরাং তুমিই তাহার কারণ হইলে। অতএব এমন ঘৃণিত কার্য্য কদাচ করিও না, এই আত্মহত্যা করায় তোমাকে আত্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে এবং এই আত্মহত্যা-পাপজনিত তোমাকে উৎকট নরকভোগ অনন্তকাল ভুগিতে হইবে। কর্মক্ষয় না হইলে আত্মোন্নতি বা মুক্তিলাভ কাহারও হইতে পারে না ইহা নিশ্চয় জানিও, অতএব তুমি নিজে আত্মহত্যা করিয়া নরহত্যার প্রশ্রয় দিও না, তুমি এখনও নরের মধ্যে মনুষ্যপদবাচ্য হও নাই সুতরাং আত্মহত্যা করিয়া নরহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হইও না। 'ইহাই আমার তোমার প্রতি একমাত্র অনুরোধ" এই সমস্ত কথা বলিয়া আমার প্রবৃত্তি নিরস্ত হইলেন। আমার আসুরিক ভাবাপন্ন মনও ছাড়িবার পাত্র নহেন, আমার মন প্রবৃত্তির সমস্ত কথা শুনিয়া আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তিকে ও বর্ত্তমান বুদ্ধিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, প্রবৃত্তি! তুমি এ আবার একটা নূতন কথা কোথায় পাইলে? তুমি বলিতেছ আত্মহত্যা হইবে; আত্মা যে হত হন ইহা

আমি কোন শাস্ত্রেই পাঠ করি নাই, আমার বেদান্ত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিত্য পাঠ্য বিষয়, কই তাহাতে তো আত্মা হত হন একথা কোথাও পাঠ করি নাই. বরং আত্মা অবিনাশী ইনি হতও হন না, হত্যাও করেন না, ইনি অজ-জন্ম রহিত, ইঁহার মৃত্যু কিরূপে সম্ভবে? আমি দেখিতেছি তুমি যাহা বলিতেছ তাহা স্ত্রী-জাতি-সুলভ বাক্যই বলিতেছ, তোমরা স্ত্রী-জাতি তোমরা ত' মোক্ষ-মার্গের বিরোধী। তোমরা যে আমাকে মোক্ষলাভে বাধা দিবে তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি তাহা হইলেও আমি তোমাদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, আমি যখন মোক্ষলাভের এমত সহজ উপায় পাইয়াছি তখন আর তোমরা আমাকে এরূপ ভ্রান্ত বাক্যের দ্বারায় ভুলাইও না, ইহা বলিয়া আসুরিকভাবাপন্ন আমার মন কিঞ্চিৎ মৌন ভাবাপন্ন রহিলেন। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি মনের সম্মুখেই উপস্থিত আছেন ইহারাও সহজে মনকে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তবে এই অবসরে আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির ও প্রবৃত্তির কিঞ্চিৎ গুণাগুণের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তির গুণ অসাধারণ সাক্ষাৎ চপলা, উপস্থিত রমণীর ভাব দেখাইয়া তাহাতে আসক্ত করিতে প্রবৃত্তির মতন আর দ্বিতীয় কেহ নাই। আমার এই প্রবৃত্তির সহিত আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি যাহা জুটিয়াছেন, তিনি প্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বভাবসিদ্ধ স্থির হইলেও বর্ত্তমানে চঞ্চলা ও মলিনা, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, দৃঢ়তার নামও নাই। আমার প্রবৃত্তির অনুকূল মত সমস্ত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পূর্ব বলা হইয়াছে আমার প্রবৃত্তি সাক্ষাৎ চপলা অর্থাৎ বেশ্যার ন্যায়, আবার আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তির গতিও চপলার ন্যায় অর্থাৎ বিদ্যুত-গতির ন্যায়, আমার বর্ত্তমান মনের যখন যেরূপ অবস্থা দেখিতে পান তখন আমার মনের গতি অনুযায়িক মনকে ফিরাইতে বা মনকে স্ববশে আনিতে বিশেষ দক্ষ। আমার প্রবৃত্তি যখন নিবৃত্তি উপাধি ধারণ করিয়া মনকে কৌশল দ্বারায় আপন অধিকারেই রাখিয়া থাকেন আমার বর্ত্তমান অবস্থার বোকা মন তখন বোধ করে যে আমার প্রবৃত্তির লেশ মাত্রও নাই, নিবৃত্তির অবস্থাই আসিয়াছে। দুঃখের বিষয়ে আমার বর্ত্তমান অবস্থার বোকা মনের নিবৃত্তি মূলেই যে আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহা আমার বোকা মন বুঝিতে একরকম অক্ষম। মন প্রবৃত্তির ধোকায় পড়িয়া প্রবৃত্তির রূপান্তরের ভাব অবগত হইতে পারেনা, আরো আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি প্রবৃত্তির অনুকূল থাকায় মনের তাহা গ্রাহ্য হয় না। মনের গ্রাহ্য না হইবার কারণ, মন যাহা গ্রাহ্য করে বা অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত মনের অনুভব হয় না, বর্ত্তমান মন বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ই গ্রাহ্য বা অনুভব করিতে পারে না। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি বর্ত্তমান প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া, প্রবৃত্তির অনুকূলে সমস্ত মত প্রায় দিয়া থাকে। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি যুক্ত বুদ্ধি বা শুদ্ধবুদ্ধি নহে। আমার যাহা বুদ্ধি আছে তাহা মলিনা এবং চঞ্চলা এবং তাহাও আবার প্রবৃত্তির অনুগামী। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রায় কোন মত প্রকাশ করে না। দুঃখের বিষয় আমি ইহা জানিয়াও জানি না। আমি জানি আমার মন সমস্তই করিতেছে, বস্তুতঃ

তাহা নহে। কারণ কোন একটা বিষয় বা বস্তু নিরাকরণ করিতে হইলে বুদ্ধির সংযোগ ব্যতীত কোন বিষয় নির্ণয় করা মনের ক্ষমতার অতীত। মন স্ফটিকের ন্যায়, যখন যে রকম রং মনের উপর পড়িতেছে আমার বুদ্ধিও মনের সহিত মনের ছায়ারূপে উপস্থিত থাকায়, বর্ত্তমান বুদ্ধির বিচারে উহা যেরূপ ধারণা হইতেছে, মনও তাহাই নিজের কৃত বলিয়া মানিয়া লইয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইতেছে; আমার অজ্ঞানতা বশতঃ আমি এ চক্র বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক পূর্বে বলা হইয়াছে মন নিজের বক্তব্য বিষয়ে শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিলে পর, আমার মনকে আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি মনের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে উদ্যত হইলে, আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি আমার প্রবৃত্তিকে মনের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধা দিয়া, নিজেই মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; বুদ্ধি বলিতেছেন "মন! তুমি যে বলিতেছ আত্মা অবিনাশী এবং সেই আত্মা হতও হন না হত্যাও করেন না, ইহা আমি বেদান্তাদি শাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাঠ করিয়া জানিয়াছি। আত্মা অবিনাশী এবং সেই আত্মা হতও হন না; বস্তুতঃ ইহা যে একেবারে সত্য বাক্য নহে তাহা নহে, কারণ উহা বুঝিবার দোষে অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। তুমি যে বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ বলিতেছ তাহাতে তোমার বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থই বোধ করিতে পার নাই। তুমি যদি প্রথমে বেদান্ত এই শব্দের অর্থ বোধ করিয়া তাহার পর বাকি সমস্ত পাঠ করিতে তাহা হইলে আর তোমার বর্ত্তমান এই অবস্থা ঘটিত না। তুমি কেবল বেদান্তের কতকগুলি শব্দ পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছ মাত্র। তাহাতে আর তোমার আত্মা সম্বন্ধে কি জ্ঞান হইতে পারে বরং তাহার ফলে তোমার এই অমঙ্গলকর ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। বেদান্ত পাঠের দ্বারায় কাহারও বেদান্তের অবস্থা অনুভব হইতে পারে না ইহা সত্য জানিবে, বেদান্ত পাঠের দ্বারা বা শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ দ্বারা যাহাদের বেদান্তের অবস্থা লাভের জন্য ব্যাকুলতা বা আগ্রহ হয় না, কিম্বা গীতা পাঠের দ্বারায় যাহাদের আত্মোন্নতি লাভের ইচ্ছা প্রবল না হইয়া থাকে, তাহাদের নিশ্চয় বেদান্ত বা শ্রীমদ্ভগবদগীতা কিছুই পাঠ হয় না জানিবে। তাহারা উক্ত শাস্ত্রাদি যাহাদের নিকট হইতে পাঠ করিয়াছে তাঁহাদের নিকট তাহারা বিড়ম্বিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে মাত্র, আর কিছুই লাভ হয় না, যেমন তোমার ঘটিয়াছে। বেদান্ত ইহাতে দুটি মাত্র শব্দ রহিয়াছে; প্রথম শব্দটি বেদ—দ্বিতীয়টি অন্ত; উভয়ে মিলিয়া বেদান্ত। বেদ-বিদ ধাতু জানা; অন্ত শব্দে শেষ, অর্থাৎ বেদান্ত শব্দের অর্থ—জানার শেষ অবস্থা, এই জানার শেষ অবস্থা লাভ হওয়া বেদান্ত পাঠ দ্বারা সম্ভব তুমি বিবেচনা কর?

এইখানে মন গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, কদাচ তাহা হইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। তাহার পর বুদ্ধি আবার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথা বলিতেছ, তাহাতে কি তোমার সম্যক গীতার ভাব জানা হইয়াছে? তাহাতে তোমার গীতার ভাব জানা হয় নাই। গীতার প্রকৃত ভাব জানা হইলে তুমি এই ঘৃণিত আত্মহত্যারূপ

নরহত্যায় কদাচ লিপ্ত হইতে না। তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, গীতার অর্থ যোগী ব্যতীত অপরের জ্ঞাতব্য নহে, যিনি যোগী তিনিই গীতা জানেন, আর যিনি গীতার প্রকৃত ভাবার্থ জানেন তাঁহাকে যোগী বলিয়া জানিও। একটা ভাষা কথায় বলিয়া থাকে, যোগী তাহি জানিয়ে যো গীতাহি জানিয়ে। যোগী তাহি না জানিয়ে, যো গীতাহি না জানিয়ে।

অর্থাৎ যিনি গীতাকে জানেন তিনিই যোগী আর যিনি গীতা জানেন না তিনি যোগী নন। গীতা জানা কি গীতার পুথিখানা জানা বা গীতার শব্দগুলো জানা, তাহা হইলে গীতা জানা হইল? তাহা নিশ্চয়ই নহে জানিবে। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা অর্জ্জুন; যাহারা গীতার প্রকৃত ভাব অবগত নহে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা কহিয়া থাকে গীতা আবার কি? শ্রীকৃষ্ণ খুব ফিকিরে লোক ছিলেন, নিজের শত্রুকুলকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে কুরু পাণ্ডবদের ভা'য়ে ভা'য়ে বিপাদ বাধাইয়া নিজের শত্রুগণকে কৌশল করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি দ্বাপরে অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎপরে পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বারায় পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বারায় পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়া শেষে যদুকুল সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করেন; এবং ইঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে ভগবান ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য পাপিগণের বিনাশ জন্য এবং সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে যে উপায়ে পাপিগণের বিনাশ সাধন করেন তাহাই গীতাতে লিখিত আছে। তুমিও এইরূপ ভাবে গীতা পাঠ করিয়া থাকিবে; তাহা না হইলে আর তোমার এমত মতি হইবে কেন? উপরিউক্ত উভয় বাক্যই ভ্রান্ত জানিবে, তবে প্রথমোক্ত বাক্যগুলি নাস্তিকতায় পূর্ণ, তৎপরের বাক্যগুলি নাস্তিকতার সহিত কিঞ্চিৎ মোলায়েম ভাবে বর্ণিত থাকায় আস্তিকভাবাপন্ন আমার ন্যায় অন্ধ লোকেরা তাহা ভগবৎ বাক্য ও ভগবৎ কার্য্যে বলিয়া মনে ভাল না লাগিলেও মানিয়া লইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতার এরূপ ভাব নহে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কিরূপে জীব নিজ ইন্দ্রিয়গণকে ও রিপুগণকে সংযত করিয়া আত্মানন্দ লাভ করিতে পারিবে, তাহারই উপায় সকল বিশদরূপে বর্ণিত আছে, তাহা মানুষ কাটাকাটি করিয়া লড়াই করার বিষয় নহে; তাহা নিজ ইন্দ্রিয়গণের সহিত নিজের বিরোধ হওয়ায়, নিজের সহিত নিজ ইন্দ্রিয়গণের যুদ্ধ। ইহাতে বাহিরের যুদ্ধ বর্ণন করা হয় নাই। তুমি নিজে যখন যোগী হইবে, তখন গীতার ভাব বুঝিতে পারিবে, তুমি ব্যাকরণের সাহায্যে গীতা পড়িয়া যত গণ্ডগোলে পড়িয়াছ। আর শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যে যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে যদি তাহা মানুষ কাটাকাটি করিয়া লড়াই করার বিষয় হয়, তাহা হইলে আর উহা ধর্ম্ম পুস্তক কিরূপে হইতে পারে? কারণ যিনি সর্ব শক্তিমান তাঁহার পক্ষে সাধারণ নরের রক্তপাত করিয়া যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে ভগবৎশক্তিতে কলঙ্ক আরোপ করা ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না। গীতায় যে যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ আছে, তাহা যদি সাধারণ যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে

ভগবান যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলেন কেন? যোগী যে সকলের শ্রেষ্ঠ তাহাও বলিয়াছেন। সাধারণতঃ যাঁহারা যুদ্ধের নায়ক তাঁহারা কি যুদ্ধস্থলে যাইয়া কাহাকেও যোগী হইতে উপদেশ দেন? এবং কি উপায়ে যোগী হওয়া যায় তাহার উপায় সকল কি কেহ যুদ্ধস্থলে উপদেশ দিয়া থাকেন? ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে গীতোক্ত যুদ্ধ নরহত্যা করিয়া যুদ্ধ নহে। উহাতে সাধনা সমর বর্ণন আছে। কিরূপ কৌশল জীব নিজ ইন্দ্রিয়গণকে ও রিপুগণকে সংযত করিয়া আত্মানন্দ লাভ করিতে পারিবে এবং তিন গুণের কি কি কার্য্য এবং তাহাদের সংযম করিবার উপায় সকল বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যাহারা অল্পবুদ্ধি মানব তাহারাই গীতা বুঝিতে না পারিয়া অর্থ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া নিজের এবং অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। এবং সর্বশক্তিমান ভগবৎশক্তিকেও কলঙ্কিত করিয়া থাকে। যাহা হউক আমার তোমার প্রতি শেষ বক্তব্য এই যে, তুমি এইরূপ বাহ্যিক শুষ্কজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া এই আত্মহত্যারূপ ঘৃণিত কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হইও না। তুমি যাহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া আত্মা অবিনাশী শুনিয়াছ তাহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, মৃত্যুর নামে তাহারা ভয়ে জড়সড় হয় কেন? যখন জীব জানিতে পারে এইবার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন শাস্ত্রে পণ্ডিতই হউন আর মূর্খই হউন সকলকেই মৃত্যু ভয়ে কাতর হইতে হয়। তবে এই কাতর ভাবেরও ইতর-বিশেষ আছে, কাহারও বা অন্তরে অন্তরে কাতর ভাব থাকে, কাহারও বা বাহ্যিক কাতর ভাব দেখিয়া পাওয়া যায়। যাহাদের অন্তরে অন্তরে ভয় থাকে তাহাদের বাহিরের ভাব দেখিয়া ধরা যায় না। লোকের নিকট তাহারা বাহ্যিক সাহস ভাব দেখাইয়া থাকে মাত্র। সংসার মায়া কাটান জীবের পক্ষে সহজ সাধ্য নয় ইহার প্রমাণ তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পার। জীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে জীব যখন দেখে এইবার আমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইতেছে, আর কোনও আশাই নাই তখন জীবের চক্ষু হইতে বারি পতন হইয়া তাহার পরেই মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহা মৃত্যুভয়জনিতই হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউক মৃত্যুভয় জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। (প্রবৃত্তি দেবীও উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্বগত মনে বলিতেছেন, "আমি জীবদেহে বর্ত্তমান থাকিতে এবং আমার সহচরী আশা থাকিতে মৃত্যুভয় অবশ্যম্ভাবী ইহা ধ্রুব সত্য") অতএব তোমার এই ঘৃণিত সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা কর। ইহা বলিয়া আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি অন্তর্হিত হইলেন। আমার বর্তমান বুদ্ধির এই সকল সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বর্ত্তমান আসুরিকভাবাপন্ন মন কথঞ্চিৎ এ সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিলেও; শাস্ত্র পাঠজনিত পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ অহঙ্কারের ভরে আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির উপদেশগুলি মৌখিক মানিয়া লইতে সহজে প্রস্তুত হইতেছে না। তাহা না হইলেও আমার মনে পূর্বভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে, কিন্তু ধারণার অভাব হেতু আমার বর্ত্তমান মন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি অন্তর্হিত হইলে পর, আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি আমার মনের সম্মুখেই রহিয়াছেন। এই

অবকাশে আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি মনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া বলিতেছেন, "আত্মা সম্বন্ধে যখন তোমার কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তখন তুমি নিজে অনুভব না করিয়া আবার একটা দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার কর কেন? তাহার পর না হয় আত্মার অস্তিত্ব লোকের কথায় মানিয়া লইলাম। তাহা হইলেও সেই আত্মাকে যখন কেহ জানিতে পারে না, এবং তৎসম্বন্ধে যখন বাদানুবাদ রহিয়াছে, তখন আমাদের পক্ষে ইহার অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়ই তুল্য, অতএব উহা তোমার বা আমার দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি না।" প্রবৃত্তি আত্মার সম্বন্ধে কথা শেষ করিয়া মনকে নিজ আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়ে অপর ভাবের অবতারণা করিয়া মনের প্রলোভন স্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক কথা উত্থাপন করিয়া মনকে যেন প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন, "এই দেহধারী জীব মাত্রই ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ, জীব যে সৎ অসৎ কর্ম করিয়া থাকে; ঈশ্বর তাহার বিচার করিয়া সৎকার্য্যের উপযুক্ত স্বর্গভোগাদি পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি দেহ নষ্ট না করিয়া সৎ কর্ম, যথা—ব্রত, নিয়ম, পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি করিয়া চল ইহাতে তোমার অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হইবে। তুমি শুষ্ক জ্ঞানের বিচারে বিরত হও, কারণ ইহাতে তোমার অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে। আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বীরাচারী হইয়া পূজাদির অনুষ্ঠান কর তাহাতে তোমার অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব তুমি উক্ত শুষ্ক আত্মবিচার পরিত্যাগ করিয়া পূজা যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও আর কাল বিলম্ব করিও না" এই কথা বলিয়া প্রবৃত্তি নিরস্ত হইলে পর মন তদুত্তরে বলিতেছেন, "দেখ প্রবৃত্তি, জীবমাত্রই যে ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ যে সম্বন্ধে আমার কোনও সত্য জ্ঞান না থাকিলেও আমার তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। আস্থাও বিশেষ আছে তাহাও বলিতে পারি না। তাহার পর তুমি যে বলিতেছ ঈশ্বর জীবের সদসৎ কর্ম সমুদায়ের বিচার করিয়া সৎকর্মের পারিতোষিক স্বরূপ জীবকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগাদি বা কিছুদিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করিতে দেন, এবং পাপকর্মের দণ্ড স্বরূপ জীবের অনন্ত নরক বা কিছুকালের জন্য নরক ভোগাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এসব কথা আমাকে বলিও না। কারণ তাহাতে আমার ঈশ্বরের প্রতি আরও দারুণ সন্দেহ ও অভক্তিই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। মনে কর ঈশ্বর যদি জীবের সদসৎ কর্মানুযায়ী স্বর্গ নরকাদি ব্যবস্থা করেন মনে করা যায় তাহা হইলে এ কথায় সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কলঙ্ক আরোপ করা হয় মাত্র। বিবেচনা করিয়া দেখ ঈশ্বর যখন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ তখন তিনি কি জানিতেন না যে জীব পাপ ইচ্ছা করিবেই। যদি জানিতেন না বলি তাহা হইলে তাঁহার সর্বজ্ঞতায় দোষ পড়ে। আর যদি বলি যে তিনি জানিয়াই পাপ পূণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইলে মনে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে আমার ন্যায় বানররূপী জীবকে নাচাইয়া তাঁহার লাভ কি? আমি বানররূপী বা অজ্ঞান জীব, আমার কোন জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমনস্থলে আমার সম্মুখে প্রলোভনের বিষয় থাকিলে তাহা

পরিত্যাগ করা সকল সময়ে আমার পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে ইহা কি তিনি জানিতেন না। এমন অবস্থায় প্রলোভনের বিষয় গ্রহণ করিলে বা ভোগ করিলে আমাকে ঈশ্বরের বিচারে পাপী হইতে হইবে এবং পাপ কর্ম করার দরুণ আমাকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে ইহাই কি ন্যায় বিচার? মনে কর যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনও শিশু-বালকের সম্মুখে জলন্ত অঙ্গার রাখেন এবং দেখিবামাত্র বালক অজ্ঞানতাবশতঃ যদি তাহা গ্রহণ করে তবে তাহাকে অগ্নি জনিত জ্বালা অনুভব করিয়া কষ্ট পাইতে হইবে নিশ্চিত। বালকের এই অগ্নিজনিত জ্বালার কারণ কে? এবং ইহার জন্য দায়ীই বা কে হইবে? এরূপ স্থলে ন্যায় কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে, যিনি বালকের সম্মুখে অগ্নি রাখিয়াছিলেন তিনিই বালকের কষ্টের ও জ্বালার কারণ হইবেন। এবং অগ্নি রাখার দরুণ তাঁহারই দণ্ড হওয়া উচিত, কারণ সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জানিত যে বালকের সম্মুখে অগ্নি রাখিলেই বালকের অগ্নি বলিয়া জ্ঞান না থাকায়, বালক নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিবে। সুতরাং অগ্নি রাখার দরুণ যখন বালকের কষ্ট হইল, তখন যিনি অগ্নি রাখিয়াছেন তাঁহারই দণ্ড হওয়া উচিত। ঈশ্বর পাপের বিচার করিয়া তাহার যথাযথ সুখভোগ বা নরকভোগরূপ পুরস্কার বা দণ্ডের বিধান করিয়া থাকেন ইহা বলা নিতান্ত অনুচিত। ইহাতে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরে কলঙ্ক আরোপ করা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। অতএব এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আমার বিবেচনায় নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। তারপর প্রবৃত্তি তুমি যে বলিতেছ সৎকর্মের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে তাহাতেই বা বিশেষ লাভ কি? আমার বিবেচনায় স্বর্গভোগ বা নরকভোগ উভয়ই তুল্য। কারণ ভোগ থাকিতে শান্তি কোথায়? শান্তির অভাবে সুখ কোথায়? "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্"। ভোগের অবসানই শান্তি সে শান্তি স্বর্গাদিতে নাই। স্বর্গ কথাটা আমার নিকট মাকাল ফলের ন্যায় বোধ হয়। মাকাল ফল বাহিরে যেমন দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু ভিতরে যেন সুন্দরের ঠিক বিপরীত, স্বর্গও তদ্রূপ বাহিরে শুনিতে বড় মধুর, এবং তাহা লাভ করিবার জন্য জীব একেবারে মুগ্ধ হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে করে আকাশের উপরি ভাগেই হয়ত স্বর্গ অবস্থিত এবং কোন গতিকে এইটুকু লাফাইয়া বা উড়িয়া যাইতে পারিলেই স্বর্গলাভ হইবে। দুঃখের বিষয় ভ্রান্ত জীবের জানা নাই যে, তাহা হইবার নহে। আকাশে যতই উপরে আমি উঠি না কেন, আকাশ যে কেবল শূন্যময় তাহা জানিয়াও আমার ৎকি জানা না থাকায় মাকাল ফলরূপ স্বর্গ লাভের জন্য সময় সময় জীবের মন ধাবিত হয়। স্বর্গ লাভের ইচ্ছাও যে প্রবৃত্তি তোমারই প্রলোভন তাহা জীব বুঝিয়াও বুঝে না। তাহার পর প্রবৃত্তি তোমার কথিত স্বর্গরাজ্যের কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি তোমার স্বর্গরাজ্যের রাজা যিনি ইন্দ্র তিনিও নিজের স্বর্গরাজ্য রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে মহা শশব্যস্ত হইয়া দারুণ অশান্তিতে পড়িয়া থাকেন। এবং কখন স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, কখন শচিকে হারাইতে হয় এই ভাবনাতেই অস্থির। সুতরাং

এ হেন ইন্দ্রেরও যে শান্তি আছে তাহা বলিয়াও বোধ হয় না। তাহার পর স্বর্গে বিদ্যাধরীগণের বাস। তাহাদের নয়ন কটাক্ষ বাণেও অনেকেই অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া শুনিয়াছি। সুতরাং এমতস্থলে স্বর্গ, বিদ্যাধরী প্রিয় জীবের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, শান্তি প্রার্থীর প্রার্থনীয় হইতে পারে না। তাহার পর স্বর্গ হইতে পতনের ভয় সর্বদাই আছে। এমন স্থলে আমার পক্ষে স্বর্গ বাঞ্ছনীয় নহে জানিবে। আমার বিবেচনায় স্বর্গ বা নরক উভয়ই জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখে অতএব ইহারা উভয়েই আমার পরিত্যজ্য। আমার বিবেচনায় বোধ হয় যে নিজকৃত পাপ পুণ্যের বিচার অন্তকালে জীব নিজেই করিয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। তাহার পর প্রবৃত্তি তুমি যে বলিতেছিলে বীরাচারী হইয়া পূজাদি কর, উহা আমার নিকট একেবারেই ঘৃণিত। কারণ ভাঁটির মদ্য ও মাংসাদি খাইয়া যদি ভগবৎ সাধন হয় ও জগবৎ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে তোমার কথিত নরকে কে যাইবে? দেবীরা কি রাক্ষসী, যে রুধির প্রিয় হইবেন। তাহা কখনই নহে। বীর কাহাকে বলে তাহা হয়ত তোমার জানা নাই তাই তুমি আমাকে বীরাচারী মতে পূজাদি করিতে বলিতেছ। "বীরোজিতেন্দ্রিয়ো ধীরঃ" অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় বীর ব্যক্তিই ধীরপদবাচ্য। সুতরাং তোমার কথিত বাহ্যিক বীরাচার মতে পূজাদি অমার একেবারেই পরিত্যক্ত জানিবে, বরং সাত্ত্বিকভাবের পূজাদি আমার অকরণীয় নহে। সুতরাং প্রবৃত্তি তোমার এই সকল কথার উপর যে আমার আস্থা আছে তাহা বলিতে পারি না। তবে তোমার অনুরোধে অমাকে সবই করিতে হয় এবং বর্ত্তমানেও করিতে হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি এখন যাহা যাহা বলিতেছ সে সমস্ত আমি করিতে অক্ষম।" আমার বর্ত্তমান মন এই বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে প্রবৃত্তি অমনি তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ মন, আমি স্ত্রীরূপা, তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। সর্বদা তোমার এবং আমার মঙ্গল যাহাতে হয়, আমি তাহাই করিয়া আসিতেছি। তোমার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলে তুমি সব সময়েই ত' আনন্দলাভ করিয়া আসিতেছ। তবে এক্ষণে আমার কথামত কার্য্য করিতে তুমি কেন অসম্মত হইতেছ তাহার ত' কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমার অবমাননা করিয়া তোমার যে কি বিশেষ লাভ হইবে তাহাত তুমি জান না, অথচ বৃথা আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ। ইহাতে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল হইবে, ইহা তুমি বুঝিতেছ না।" এইকথা বলিয়া প্রবৃত্তি আমার মনের উপর যেন একটু কটাক্ষ পাত করিয়া ম্লান বদনে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং স্ত্রীস্বভাব বশতঃ যেন অভিমান ভরে নিজ নখের দ্বারায় আমার হৃদয়ে-ক্ষেত্রের ভূমি ধীরে ধীরে খনন করিতে লাগিলেন। আমার মন নিজ প্রবৃত্তির বর্ত্তমান দশা দেখিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারে? বিশেষতঃ বর্ত্তমান মন যে স্ত্রীগত প্রাণ এবং প্রবৃত্তিও স্ত্রীরূপা। সুতরাং আমার মন প্রবৃত্তির বর্ত্তমান দশা অবলোকন করিয়া চতুর্দিক যেন শূন্যময় দেখিতে লাগিল। মন প্রবৃত্তি শূন্য থাকিতেই পারে না; প্রবৃত্তির

অভাবে মনের যে কি অবস্থা হইবে, বর্ত্তমানে মন তাহা জানে না, সুতরাং আমার বর্ত্তমান প্রবৃত্তির উক্তরূপ দশা অবলোকন করিয়া মনের সমূহ বিষাদ উপস্থিত হইল। এই বিষাদের মূলও প্রবৃত্তি। “প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিব কি উহার অনুকূলে কার্য্য করিব” এই ভাবিয়াই মন বিষাদগ্রস্থ। “প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিব কি উহার অনুকূলে কার্য্য করিব এই ভাবনার মূলেও যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে আমার বর্ত্তমান মন তাহা বর্ত্তমান বুদ্ধির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। কারণ বর্ত্তমান বুদ্ধি যাহা আমার আছে তাহাও প্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া প্রবৃত্তির অনুকূল মত কার্য্য মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকে। কারণ আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি যাহা আছে তাহা যুক্ত বুদ্ধি না হওয়ায় নামে বুদ্ধি মাত্র, কার্য্যে নহে। সুতরাং আমার বর্ত্তমান মনের পক্ষে প্রবৃত্তির এ কুহক জাল ভেদ করিয়া প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। সুতরাং আমার বর্ত্তমান মনের যে বিষাদ জন্মিয়াছিল তাহা শিথিল হইয়া ক্রমশঃ প্রবৃত্তির অনুকূলে ধাবিত হইল। মন আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। মনের স্থির থাকাও অসম্ভব; কারণ বর্ত্তমান মনের স্বাভাবিক অবস্থাই চঞ্চল। মনের এই চঞ্চল স্বভাব ও বর্ত্তমান প্রবৃত্তির সহবাসেই হইয়াছে। মন যখন দেখিল যে আমার প্রবৃত্তি যাহা বলিতেছিল আমার বর্ত্তমান বুদ্ধিও তাহার বিপরীত কিছুই বলিতেছে না, তখন প্রবৃত্তির কথাটা অমান্য করা অন্যায় হইবে। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির উপর আমার মনের আস্থা বেশী থাকায় এই অন্যায় বোধ আসিতেছে কারণ আমার মনের বিশ্বাস যে আমার বুদ্ধি যাহা আছে তাহাও কম নহে বরং আমার অতিবুদ্ধিই আছে। যাহা হউক আমার বর্ত্তমান মনের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি আদির কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমি এক প্রকার হতবুদ্ধি ও হতাশ হইয়াছি। বর্ত্তমান মন, বর্ত্তমান বুদ্ধি ও বর্ত্তমান প্রবৃত্তি ইহারা যে স্থানে বর্ত্তমান থাকে তথায় যে কোনও বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা হইয়া সত্য প্রকাশ হইতে পারে তাহা আমার ধারণা হয় না। তাহার পর যেখানে বর্ত্তমান মন বর্ত্তমান প্রকৃতির একান্ত অনুগত এমন কি প্রবৃত্তির দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তথায় আর কোন প্রকার সুমীমাংসার আশা আদৌ থাকে না। যাহা হউক আমার ওসব কথায় আর তত দরকার নাই। আমার জানা, আবশ্যক “জগৎ ও আমি”। তাহা আমার যত শীঘ্র জানা হইয়া যায় ততই ভাল। এবং তাহা জানিবার জন্যই আমার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া যাইতেছে, আর মনে হইতেছে, অত কথার দরকার কি? জগৎটা কি আমিটা কে বলিলেই ত’ পাপ চুকিয়া যায় কিন্তু জগৎটা জানিতে হইলে জগতের ব্যাপারটাও জানা চাই কারণ তাহা না হইলে জানার সম্পূর্ণতা হইল না এবং আমি কে জানিতে হইলে আমার আমির কার্য্য প্রণালীও জানা চাই। তাহা ন হইলে আমার ‘আমিকে’ জানাও সম্পূর্ণতা লাভ হইবে না। সুতরাং আমার ব্যস্ত হইলে চলিবে না ধীর ভাবে চারিদিক দেখিয়া কোথায় কি আছে বা নাই তাহা দেখিয়া শুনিতে বলিতে হইবে, ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? জগৎ ও আমার আমির ব্যাপারটা কম নয়, সুতরাং আমার বলাটাও কম হইতে পারে না। বিশদভাবে না বলিলেও আমার ‘আমি’

বুঝিতে সক্ষম হইবে না। যাহা হউক আমি পূর্বেই বলিয়াছি কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি যে এই জগৎটা মরুভূমির মরীচিকাবৎ মায়া ইহা শুনিয়াও যে জগৎকে মরুভূমিবৎ আমার বোধ হইতেছে তাহা নহে। কারণ আমি জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, লোকের কথায় তাহার অপলাপ করিতে পারি না। সত্য আমাকে বলিতে হইবে এবং সত্য প্রকাশ করাও আমার অভিপ্রায়। সত্য বলিতে গেলে জগৎ দেখিতেছি ইহাই আমার বলা উচিত। কারণ আমার সম্মুখেই জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, আমিও সেই জগতের বক্ষে দণ্ডায়মান সুতরাং সত্যের রক্ষণ জন্য জগৎকে উপস্থিত মরুভূমি বা মায়া বলিতে পারি না। তদ্রূপ জগদীশ্বর সম্বন্ধে অস্তি বা নাস্তি আমার কোন কথাই বলা উচিত নয়। কারণ তাঁহার সম্বন্ধেও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপস্থিত নাই। লোকের মুখে তাঁহাকে নানা সাজে নানারকমে শুনিয়াছি তাহাতে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হয় নাই। জগৎ ও জগৎপতি উভয়ই অনন্ত তাঁর সৃষ্ট পদার্থও অনন্ত। সেই অনন্তের নির্ণয় হইলে অন্তের লোপ হইয়া যায়। সুতরাং অনন্তের নির্ণয় হইতে পারে বা পারে না, এই দুয়ের মধ্যে কিছুই বলা উচিত নহে, বলিলেও যে বলা সম্পূর্ণ হইল তাহা বোধ হয় না। কিছু বলিলে তাঁর অব্যক্ত ভাবে দোষ পড়ে, নির্ণয় হইলেও অসীম অবস্থায় এবং অনন্তে দোষ পড়ে, অথচ কিছু না বলিলেও চলে না। বলা বাহুল্য উক্ত বিষয়ে আমার যতটা সম্ভবপর হয়, সেই পর্যন্ত্যেই প্রকাশ হইবে। তাহার বেশী আমি আশা করিতে পারি না। সেই মহাশক্তিকে প্রকাশ করা আমার বা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাঁহাকে প্রকাশ করা এ কথাটাও এক প্রকার অসম্ভব। কারণ তাঁহার অপ্রকাশ কোথায়? যাহা অপ্রকাশ থাকে তাহাই প্রকাশ করিতে হয়। তিনি যে কোন স্থানে অপ্রকাশ আছেন তাহা ত' আমার জানা নাই। তবে তিনি প্রকাশ থাকিলেও আমার নিকট তিনি অপ্রকাশ। তিনি আমার নিকট অপ্রকাশ থাকিবার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল আমার তাঁহাতে লক্ষ্য নাই। আমার লক্ষ্য তাঁহাতে না থাকাতেই তিনি প্রকাশ থাকিয়াও আমার নিকট অপ্রকাশ। তাঁহাকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও অবশ্য কাহারই নাই, কেন না তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ কারণ তিনি স্বপ্রকাশ।

যাহা হউক পূর্বে বলা হইয়াছে জগৎপতি ও জগৎ উভয়ই অনন্ত। এক্ষণে অনন্তের যে বিচার হইতে পারে ইহা বলাও এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাবে এই জগৎ বা জগৎপতিকে যদি আমার মধ্যে আনিয়া দেখি তাহা হইলে একদিন নিশ্চয়ই আমার নিকট জগৎ বা জগৎপতির নির্ণয় বা রহস্য প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। কারণ আমার আমিও অনন্ত, এ আমি অবশ্য আমার অস্থিমাংসবিশিষ্ট শরীর বা আমি এই শব্দও নহে। আমার আমিকে অস্থিমাংসবিশিষ্ট শরীরের সহিত আমি শব্দের উৎপত্তি স্থান বুঝিতে হইবে। এই আমি অনন্ত এবং এই আমির কার্য্যও অনন্ত। ইহার সমস্ত বিষয় অনন্ত তাহার পর আমার এইরূপ আমি হইতে জগৎ প্রকাশমান হইতেছে

এবং কালক্রমে বর্ত্তমান জগৎ ও আমা হইতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; আমা হইতে যাহা ভিন্ন পদার্থ তাহার সমস্তই অবস্তু অর্থাৎ কিছুই নহে। যেখানে আমি নাই, সেখানে জগৎ থাকিয়াও আমার কাছে জগৎ নাই। এই অস্থিমাংসবিশিষ্ট শরীররূপ জগৎ ও বর্হিজগৎ যাহা উপস্থিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আমার আমির একটি অবস্থা হইতে নয়নগোচর হইতেছে, অপর আর একটি অবস্থা এমত রহিয়াছে যে, তাহার দ্বারায় আমি আমার আমি বোধের সহিত ও জগতের সহিত আমার অস্তিত্ত্বের লোপ হইয়া, সমস্তই বিলীন হইয়া যায়। উহার অলোচনা আমার পরে করাই কর্ত্তব্য, কারণ উপস্থিত বর্ত্তমানেরই আলোচনা করা উচিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে জগৎ আমা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে এবং আমা হইতে যাহা ভিন্ন পদার্থ তাহা অবস্তু। উপস্থিত জগৎ আমা হইতে ভিন্ন নহে কিসে তাহাই দেখা যাউক। উপরে দুইটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। যে অবস্থার দ্বারা আমার শরীররূপ জগৎ ও বর্হিজগৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এইটি আমার প্রকৃতির অবস্থা। আমার প্রকৃতি আমা হইতে ভিন্ন নহে (যেমন জল ও জলের তরঙ্গ ভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ) পূর্বোক্ত আমার প্রকৃতির অবস্থা হইতেই সমস্ত জগৎও জগতের জীবসমূহ উদ্ভাসিত হইতেছে। যেখানে পূর্বোক্ত আমার আমির প্রকৃতি নাই, যেখানে জগৎও নাই, আমার বর্ত্তমান শরীরও নাই, সুতরাং তথায় বস্তু বা অবস্তু কিছুই নাই। যতক্ষণ প্রকৃতির অবস্থা আছে, ততক্ষণ বর্হিজগত অবস্তু হইয়াও বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যেখানে বর্ত্তমান আমি অর্থাৎ দেহাভিমানযুক্ত আমি নাই, যেখানে দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রেই অবস্তু। যেখানে আমি নাই সেখানে দৃশ্যমান পদার্থ থাকিলেও দ্রষ্টার অভাবে থাকিয়াও কিছুই নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত আমার আমি ব্যতীত সবই অবস্তু বলিয়া ধার্য্য হইল; এখানে আমি কিন্তু জগৎকে দেখিতেছি, কথায় জগৎ ধার্য্য হউক বা না হউক তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না, কারণ কথায় ত' চিঁড়ে ভিজে না। চিঁড়ে ভিজাইতে হইলে যেমন জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে তদ্রূপ আমারও আর শুধু কথায় শান্তি হইতেছে না। কথা লাখ্ লাখ্ শুনিয়াছি, এ না হয় আর একটা নতূন কথা শুনিলাম। কথায় আর কি হইবে? দরকার আমার জলের। জলের কথা বা জলের নানাপ্রকার নাম শুনিয়া আমার কিছুই লাভ নাই। জলের কথা বা জলের নাম আমি অনেক শুনিয়াছি। তাহাতে আর আমার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে পূর্বোক্ত একটি কথায় আমার বর্ত্তমান মনের সন্দেহ জন্মিতেছে, সন্দেহ জন্মিবার কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে। জীব নিজকৃত সদসৎ কর্মের বিচার জীবের অন্তকালে নিজেই করিয়া লয় ও ও তাহার ফলাফলের দায়ী হইয়া সদসৎ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ইহা আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির দুর্জ্ঞেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অন্তকালের অবস্থা কি প্রকার তাহা আমার জানা নাই ও যাঁহার অন্তকালে উপস্থিত হইয়া থাকে তিনিও তখন কিছু বলিতে পারেন না, সুতরাং তাহার মীমাংসা হওয়া বড়ই দুরূহ, তবে একেবারে

যে মীমাংসা হয় না তাহা বলিতে পারি না কারণ যখন অন্তকাল হইয়া থাকে, তকন তাহার মীমাংসাই বা হইবে না কেন? বরং হওয়াই সম্ভব, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে জীবের দেহান্ত হইলে দ্বাদশ দণ্ডকাল পরে সেই জীবের দেহের সৎকার করা কর্ত্তব্য, এবং লোকেও তাহাই করিয়া থাকে ইহা করিবার কারণ অনেকের ধরণা যম চিত্রগুপ্তের দ্বারা জীবের কর্ম শেষ হইয়াছে কিনা তাহা জানিয়া যদি কর্ম শেষ না হইয়া থাকে (অর্থাৎ আয়ু যদি থাকে) তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেন, সে বাঁচিয়া যায়, আর যদি কর্ম শেষ হইয়া থাকে (অর্থাৎ আয়ু না থাকে) তাহা হইলে পূর্বোক্ত দ্বাদশ দণ্ড কালের মধ্যে তাহার বিচার করিয়া ঐ জীবকে যমালয়ে লইয়া গিয়া স্বর্গ নরক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এই প্রবাদের মূলে কিঞ্চিৎ গূঢ় রহস্য অতি গুপ্তভাবে নিহিত আছে বলিয়া আমার মনে হয়, কেননা যমালয়ের চিত্র যেরূপ ভাবে পূরাণে বর্ণিত আছে, তাহা অতি ভয়নক এবং তথায় পাপীদিগকে নানাপ্রকার কঠোর যন্ত্রণা সহ নরক ভোগ করিতে হয় এরূপ শুনিয়াছি, জগৎপিতা জগদীশ্বরের ইহা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহাতে কলঙ্ক পড়িতে পারে কারণ তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের উক্তরূপ দুর্গতি সম্ভাবনা। পুরাণাদিতে ঐরূপ যে সকল ভাব লিখিত আছে তাহা নিশ্চয়ই পশুভাবাপন্ন জীবদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য শাসন বাক্য স্বরূপ, অথবা ঐ বাক্য সকল অতিরঞ্জিতও হইতে পারে, ইহা ব্যতীত অপর কিছুই নহে, স্বর্গ বা নরক উভয়েই ভোগের স্থান, বর্ত্তমান জগৎ ব্যতীত উহার অপর স্থান নাই, এই জগতেই স্বর্গ ও নরক বিদ্যমান রহিয়াছে, অপর স্থানে স্বর্গ নরক আছে বলা তাহা কেবল কল্পনা মাত্র, যাহা হউক এক্ষণে অন্তকালের বিষয়টাই বিবেচেনা করিয়া দেখা যাউক, এবং অন্তকালের সময় যে যম ও চিত্রগুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারাই বা কে, আমার অগ্রে তাহাই জানা দরকার, কারণ আমারও অন্তকাল আছে, এবং একদিন উহা নিশ্চয়ই আসিবে, অগ্রে জানা থাকিলে সাবধানও হইতে পারিব, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় নিজের মোহবশতঃ এবং স্বার্থবশতঃ নিজকৃত কর্মের ন্যায়তঃ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিয়াও নাই, কারণ আমি বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়ের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেখানে আমার স্বার্থ থাকে সেখানে আমি একবারে জ্ঞানহীন অন্ধ স্বরূপ। আমার যে স্বার্থ কোন বিষয়ে নাই তাহা বলিতে পারি না, বর্ত্তমানে যে আমার নকল বিষয়েই স্বার্থ রহিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই, স্বার্থ ত্যাগ কালের বর্ত্তমান অবস্থায় জীবের হইতেই পারে না, সুতরাং স্বার্থে জড়িত থাকিলে ন্যায়সঙ্গত বিচারও আশা করিতে পারা যায় না। আমি দোষ করিলেও আমি আমাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহি না; বরং নিজেকে আমি নির্দ্দোষী সৎভাবাপন্ন ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিতেই সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি সুতরাং এমত স্থলে আমার কালের বর্ত্তমান অবস্থায় আমার দ্বারায় আমার ন্যায়তঃ বিচার কিরূপে সম্ভবে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান কালের অন্ত অবস্থায় আর ঐ বিচার অসম্ভব হইবার নহে, কারণ আমার বর্ত্তমান

অবস্থায় কাল অজ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকাতে আমার মন হিতাহিত বিচার করিতে অক্ষম, কিন্তু আমার কালের অন্ত অবস্থায় আমার ইন্দ্রিয়গণাদি সমস্তই সংযত হইয়া যায়, এই সংযত অবস্থার নাম যম। কালের অন্ত অবস্থায় আর আমার বর্ত্তমান কালের মনেরও মন উপাধি থাকে না; মন উপাধির নাশ হইয়া আত্মা উপাধি হইয়া থাকে, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় যে কাল থাকেন তাঁহারই নাম চিত্রগুপ্ত, বর্ত্তমান কালের চিত্রগুপ্ত নাম হইবার কারণ এই যে, জীব বর্ত্তমানে যে সকল সদসৎ কার্য্য করিয়া থাকে তাহা মন ও বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণের অজ্ঞাতসারে যমালয়ে (সংযমালয়ে) গুপ্তভাবে চিত্রবৎ অঙ্কিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে চিত্রগুপ্ত বলা যায়, চিত্রগুপ্তও যমের নামান্তর মাত্র। ইনি আমার বর্ত্তমান কালের মধ্যে মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের অজ্ঞাতসারেই রহিয়াছেন, মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ জানে না যে, বর্ত্তমান কালের মধ্যেও কালের যমভাব অর্থাৎ সংযমভাবে বিদ্যমান আছে। বিশদভাবে উক্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে বর্ত্তমান মনের দ্বারা মন্দ কার্য্যসমূহ করা হইত না নিশ্চয়। অন্তকাল উপস্থিত সময়ে মনের সম্মুখে (অন্তকালের মন বর্ত্তমান কালের মন নহে, ইহা আমার জানা থাকা আবশ্যক) বর্ত্তমান কালের কৃতকর্ম্মের চিত্রসমূহ প্রকাশিত হয় এবং উক্ত অন্তকালের মন তখন কৃতকর্ম্মের চিত্রসমূহ দেখিয়া ন্যায়তঃ বিচার করিয়া লয়। এ অবস্থায় আর অন্যায় বিচার হইতে পারে না কারণ আমার বর্ত্তমান মন আর এই অন্তকালে থাকে না, এই মন তখন আত্মতুল্য অর্থাৎ স্থির মন, সুতরাং তখন অন্যায় বিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় কৃতকর্ম্মের ন্যায়সঙ্গত বিচার হইয়া সদসৎ কর্ম্মানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হইয়া জীব জলৌকাবৎ সদসৎ যোনি গমন করতঃ ইহা জগতেই সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এইরূপ পুনঃ পুনঃ নানা যোনি ভ্রমণ হয়। কর্ম্মক্ষয় ও কর্ম্মত্যাগ করিলে হয় না। কর্ম কি তাহাই আমার প্রকৃত প্রস্তাবে জানা নাই। যাহা হউক সে আলোচনায় এখন আমার দরকার নাই। পরে আলোচনা করা যাইবে, এক্ষণে আমার আমি ও জগৎ ইহারই আলোচনা যাহা হইতেছে তাহাই হউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমার আমি ব্যতীত সবই অবস্তু যুক্তি দ্বারা সমস্ত অবস্তু হইলেও আমার সম্মুখে জগৎ যেমন ভাবে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও তদ্রূপ ভাবে রহিয়াছে, এবং কথায় যাইবেও না, তবে যতটা সূক্ষ্ম বাহির হয় তাহাই দেখা মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমার আমির দুইটি অবস্থা রহিয়াছে (বর্ত্তমান আমার দেহ আমি নহে, বর্ত্তমান অস্থিমাংসবিশিষ্ট শরীরের ও আমি শব্দের উৎপত্তি স্থানকে আমার আমি বুঝিতে হইবে)। এবং ঐ দুইটি অবস্থার মধ্যে যে অবস্থাটি হইতে বর্ত্তমান শরীররূপ জগৎ ও বহির্জগৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে এই অবস্থাটিই আমার প্রকৃতির অবস্থা। বর্ত্তমান প্রকৃতিই মহামায়া। এই মহামায়া প্রভাবেই বর্ত্তমান জগৎ অবস্তু হইয়াও ইন্দ্রজালবৎ বস্তু বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ইন্দ্রজাল শব্দের অর্থ যাহা ইন্দ্রিয়ের জাল, অর্থাৎ যাহা আচ্ছাদন করে বা ভ্রান্তিতে পাতিত করে, তাহাকে ইন্দ্রজাল কহিয়া

থাকে। এই ইন্দ্রজালই আমার জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া ভ্রান্তিতে পাতিত করিতেছে, সূর্য্যকে মেঘে আচ্ছাদন করিলে সূর্য্যের যেমন অপ্রকাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার জ্ঞান অজ্ঞান রূপ ইন্দ্রজাল দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে আমার এই জগৎ যাহা দর্শন হইতেছে, তাহা ভ্রম দর্শন হইতেছে। এই সূর্য্য আচ্ছাদনের দৃষ্টান্তের দ্বারা যে আমার ভ্রম দূর হইল তাহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না, বা ইহার দ্বারা যে আমার ভ্রম দূর হইতে পারে তাহাও নহে। বাস্তবিক ইহার দ্বারা যে আমার মীমাংসা করা হইল তাহা বলিতে পারি না। তবে কোন একটা বিষয়ের চিত্র প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন পূর্বে তাহার একটা ভূমি (জমি) তৈয়ারী করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে ইহাও আমার তদ্রূপ, আমি যে ইন্দ্রজাল দেখি নাই তাহা নহে, তবে তাহাই যে ইন্দ্রজাল তাহা জানি না। বালিকারা যেমন অল্প বয়সে নানারকম খেলাঘর তৈয়ার করিয়া নানারকম খেলা খেলিয়া থাকে অথচ উহা যেমন কোন কাজেরই নহে, আমিও যাহা ইন্দ্রজাল দেখিয়াছি তাহাও তদ্রূপ খেলাঘরের খেলার মত। আমি যে ইন্দ্রজাল দেখিয়াছি তাহাকে লোকে সাধারণতঃ ‘ইন্দির জাল” কহে, এবং উহা রাসোৎসবের সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাসোৎসবটিকে লোকে রাসযাত্রা কহিয়া থাকে। এই উৎসবটিকে আমি সাধারণতঃ একটি পর্ব বা আমাদের কার্য্য বলিয়া থাকি। বালিকাদের খেলাঘরের খেলা যেমন কোন কাজের না হইলেও তাহাদের ঐরূপ প্রকৃত খেলা পরে খেলিতে হইবে তাহার আভাস কতকটা পাইয়া থাকে, রাসক্রীড়া রূপ রাসযাত্রাটি খেলা হইলেও ইহাতে কিঞ্চিৎ পূর্বাভাস যে নাই তাহা নহে। তবে আমি উহাকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, তাহাতে আমার ঠিক দেখা হয় না এবং উহার রহস্য ভেদ না হইয়া উহা তামাসায় পরিণত হইয়া থাকে; বর্ত্তমান সময়ে উহা তামাসাতেই পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে যে কি জানিবার বা শিক্ষার বিষয় আছে তাহা আমি দেখিও না, এবং আমাকে উহার রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত বিষয়টা কি তাহার উপদেশও কেহ দেয় না। রাসোৎসবের মধ্যে যে অনেক শিক্ষার বা জানিবার বিষয় রহিয়াছে তাহা আমার জানা নাই বরং রাসযাত্রায় যাহা দেখিয়াছি, তাহাকেই চরম দেখা বলিয়া মনে করি। রাসযাত্রায় যাহা দেখিয়াছি তাহা কেবল গোলে হরিবোল মাত্র। কেবল বহুলোকের গণ্ডগোল আর নাচ তামাসা ইত্যাদি হৈ হৈ ব্যাপার। আর রাঁস-মণ্ডপের উপর সং সাজাইবার মতন রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি এবং তাহার চারিদিকে সোলার ফুল, ফল, পাতা ইত্যাদির দ্বারা সাজান। ইহার দ্বারা আজকাল এই বিংশ শতাব্দীর দিন আমি আমাকে আর এখন সোলার ফুল দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারি না এবং সোলার ফুল দিয়া রাধাকৃষ্ণকে সাজাইয়া দেখাইলেও আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধার বৃদ্ধি পাইবে না বরং যাহা আছে তাহাও যাইতে বসিবে, যেমন যাইতে বসিয়াছে। রাসোৎসবের রহস্য ভেদ করিয়া আমাকে যখন কেহ দেখাইলেন না, তখন উহা আমার নিজেরই দেখা উচিত যে উহার মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে। বস্তুতঃ রাসোৎসবটি ব্যর্থ বিষয় নহে, উহার মধ্যে বিশেষ

শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে, রাসযাত্রার রহস্য বিষয় বুঝিবার পূর্বে আমার একটা কথা জানিয়া রাখা উচিত। যদি একজন চিত্রকর ও একজন কবি কোনও বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করে, তবে যিনি কবি, তিনি সুললিত বাক্য বিন্যাস করিয়া লেখনী সাহায্যে বর্ণনীয়-বিষয়কে বিশেষ বর্ণনা করেন, আর যিনি চিত্রকর তিনি চিত্র-লেখনী সাহায্যে নানাবর্ণে বা নানা আকারে মনোমুগ্ধকর চিত্রপট প্রস্তুত করিয়া সেই বিষয়েরই বর্ণনা করিয়া থাকেন। লেখকের ও চিত্রকরের উদ্দেশ্য একই। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতিতে যে বিষয় বর্ণিত আছে, রাস দোল, শ্রীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম প্রভৃতি ব্যাপারের দ্বারা সেই বিষয়ই যেন বাহিরে কথঞ্চিৎ চিত্রিত রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি রাসোৎসবটিকে না হয় পরে দেখিব, প্রথমে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবকেই দেখিয়া লই, জগন্নাথ দেবকে দেখিতে যাওয়াই কষ্টকর। কষ্টকর হইবার কারণ, জগন্নাথ দেবের যাহা শ্রীমন্দির আছে, তাহা দর্শন করা বড়ই দুরূহ। মাতা পুত্রে উভয়ে একত্রে মন্দির দর্শন করিলে উভয়কেই নতশির হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলে যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা বলিয়া থাকেন "এখানে বৈষ্ণবী চক্র বর্ত্তমান, এখানে কোন প্রকার অন্নাদি প্রভৃতির বিচার নাই"। আবার যাঁহারা তান্ত্রিক, তাঁহারা বলিয়া থাকেন "ইহা ভৈরবীচক্র জগন্নাথ ভৈরব বর্ত্তমান, সুতরাং এখানে কোন রকম পান ভোজন প্রভৃতির কোন জাতি বিচার নাই।" এই ভৈরবী চক্রে বা বৈষ্ণবী চক্রে যে কোন জাতিই হউক না কেন আগমন মাত্রই দ্বিজোত্তম হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের উপরিস্থিত কর্দয্য চিত্রাদি সম্বন্ধে যাহা তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাহাও ভয়ানক, উহা লিখিয়া আমার হস্ত কলুষিত করিবার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, বৈষ্ণবী চক্রে বা ভৈরবী চক্রে কোন প্রকার বিচার করা নিষিদ্ধ। জগন্নাথ দেবও আমার ন্যায় জীবের বিচার আচার দেখিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় যেন নিজের উদর মধ্যে নিজের হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করতঃ কাষ্ঠপুত্তলিকা হইয়া বসিয়া আছেন। বস্তুতঃ কাষ্ঠপুত্তলিকা জগন্নাথ দেব নহেন ইহাতেও বেদাভাসের চিত্র বিচিত্র রহিয়াছে। জগন্নাথ দেবকে অনেকে দারুব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বেদই ব্রহ্ম, ঐ বেদ চারি প্রকার ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। ইহার মধ্যে যজুর্ব্বেদ প্রথম। এই যজুর্ব্বেদ দুই শাখায় বিভক্ত, শুক্লযজু ও কৃষ্ণযজু। এই যজুর্ব্বেদ যুক্তবেদ বিশেষ। এক্ষণে দারুব্রহ্ম কোথায় রহিয়াছেন, তাহাই দেখা যাউক। শ্রীশব্দের অর্থ কি? শ্রীশব্দে তিনটি বর্ণ রহিয়াছে শ, র, ঈ। শ অর্থে শিব অর্থাৎ প্রাণ, (যে রুদ্রাস্তে খলুপ্রাণাঃ) যিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন, র অর্থে বহ্নি-বীজ, যাহা জীবের চক্ষে প্রকাশ, ঈ অর্থে শক্তি সুতরাং প্রাণবায়ুকে শক্তি দ্বারায় চক্ষে

স্থির করিলে যে অবস্থা হয়, তাহারই নাম শ্রী! কিংবা সর্বলোকে যাহাকে সেবা করে, তাহাকেও শ্রী বলা যাইতেপারে। এক্ষণে সর্বলোক কাহার সেবা করে, তাহাই দেখা যাউক। যদি বলা যায়, সর্বলোক দারু মূর্ত্তি জগন্নাথ দেবকেই সেবা করিয়া থাকে, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে। আপত্তি যে একবোরেই হইতে পারে না, তাহা নহে। কারণ দারু মূর্ত্তি জগন্নাথ দেবকে এক হিন্দু ব্যতীত বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ কেহই ত' সেবা করেন না। সুতরাং এমতস্থলে সর্বলোক হইল কোথায়? ইহাতে এক হিন্দু ভিন্ন আর সকলকারই আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যদি বলি সম্পত্তির সেবা সকলেই করিয়া থাকে সুতরাং সম্পত্তি শ্রীপদবাচ্য তাহাতে আর কাহারও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কারণ সম্পত্তি চাহে না কে তাহাও দেখিতে পাই না। হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন, মুসলমানই হউন বা খ্রীষ্টানই হউন সম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা সকলেরই আছে, এবং সম্পত্তির সেবা সকলেই করিয়া থাকেন। এখানে সম্পত্তি কাহাকে বলে তাহাই দেখি। সাধারণতঃ ধন রত্ন টাকা কড়ি ইত্যাদিকেই আমার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান আছে, কারণ ধন রত্নাদি দ্বারা আমার অভাব মোচন হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা অভাব মোচন হয় তাহাই সম্পত্তি পদবাচ্য। এক্ষণে ধন রত্নাদি দ্বারা প্রকৃত অভাব মোচন হয় কিনা তাহাই আমার বিবেচ্য। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝতেপারা যায় যে ধন রত্নাদি দ্বারা আমার অভাব মোচন হয় না, কারণ ধনরত্ন টাকা কড়ি প্রাপ্তির ইচ্ছার যে নাশ হয় তাহা বলিয়া ত' বোধ হয় না। কেননা আমি দেখিয়াছি যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধন রত্নাদি থাকিলেও অর্থলালসার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, বরং যাহার যত অধিক ধন রত্নাদি থাকে তাহাকে ততই অর্থ পিশাচ বলিয়া বোধ হয়। এমতস্থলে টাকা কড়ি ধন রত্নকে কেমন করিয়া সম্পত্তি বলিতে পারি। যাহা প্রাপ্তি হইলে আর অপর কিছুই প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না তাহাকেই প্রকৃত সম্পত্তি বলা যাইতে পারে।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা ৬ অঃ ২২ শ্লোক)

অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে অপর কিছু লাভকে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না। এবং যে অবস্থায় থাকিলে মহাদুঃখ অভিভূত করিতে পারে না। এই অবস্থাই সম্পত্তি, উহাই যোগ সম্পত্তি, উহাকে যৌগৈশ্বর্য্যরূপ সম্পত্তি বলা যায়। পূর্বে চক্ষুতে যে বায়ু স্থির করার কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ চক্ষুতে বায়ু স্থির হইলেই বা করিতে পারিলেই যে অবস্থা হয় তাহাই প্রকৃত সম্পত্তি। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের আর প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না, এবং অভাব বা অশান্তি থাকিতে পারে না। এই অবস্থাকেই শ্রী কহিয়া থাকে। এক্ষণে ক্ষেত্রটা কি এবং কাহাকেই বা ক্ষেত্র বলে তাহাই দেখা যাউক। ক্ষেত্র বলিতে আমি সাধারণতঃ শস্য ক্ষেত্রই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ যে জমিতে চাষ আবাদ

প্রভৃতি হইয়া থাকে ক্ষেত্র শব্দে তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। এখানে কিন্তু ক্ষেত্র শব্দে তাহা বুঝিলে চলিবে না। এখানে আমার দেহকেই ক্ষেত্র শব্দে বুঝিতে হইবে।

রামপ্রসাদও এই অর্থেই গাহিয়াছেন "মন তুমি কৃষি কার্য্য জান না, এমন মানব জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোণা"। বস্তুতঃ মানব দেহে সমস্তই বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই দেহেই যে ক্ষেত্র তাহা শ্রীমদ্ভাগবদগীতাতেও উল্লেখ আছে। 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে"। বর্ত্তমান মানব দেহই ক্ষেত্র পদবাচ্য। তবে সকল মানব দেহই শ্রীক্ষেত্র পদবাচ্য নহে ইহা নিশ্চয়। কারণ পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রীঅবস্থা প্রাপ্ত মানব দেহ অতি বিরল। মানব শরীরকে নারায়ণের মন্দির বুঝিতে হইবে। ইহারই চিত্র যজুর্ব্বেদীয় আভাস সহ বর্ত্তমান উড়িষ্যা দেশের শ্রীক্ষেত্রে (উপদেশ দান করিবার জন্য) চিত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে উহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার লোকাভাব। যজুর্ব্বেদোক্ত কৃষ্ণ যজুই জগন্নাথ বা শ্রীকৃষ্ণ, এবং শুক্ল যজুই বলরাম। মধ্যে সুভদ্রা যিনি অতিশয় মঙ্গলযুক্তা অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিই। "যা দেবী বায়বী শক্তিং" ইতি রুদ্র যামল। এই শক্তির চৈতন্য হইলে জীবের সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়। ইনি জীব দেহে শুক্লকৃষ্ণের মধ্যমার্গে অবস্থিত থাকেন। চিত্রতেও তাহাই দেখান হইয়াছে অর্থাৎ সুভদ্রাকে কৃষ্ণ বলরামের মধ্যভাগে রাখা হইয়াছে। হস্ত পদাদি কাহারও দেওয়া হয় নাই তাহার কারণ উহাতে সংযম ভাবেরই লক্ষণ দেখান হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রীমন্দির সেইখানেই অর্থাৎ সেই দেহরূপ মন্দিরেই সর্বদা জগন্নাথ দেব ও বলরামই দেদীপ্যমান থাকেন। শ্রীমন্দির ব্যতীত অপর সাধারণ দেহরূপ মন্দিরে তাঁহার প্রকাশ থাকিয়াও অপ্রকাশ। প্রকাশ থাকিয়াও অপ্রকাশ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীবের লক্ষ্য না থাকার দরুণ অপ্রকাশ। যাহা হউক উহা না হয় একপ্রকার মানিয়া লইলাম, কিন্তু মন্দিরের বর্হিভাগে ঐরূপ কুৎসিত ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায় কি তাহা ত' আমার জানা হইল না। অবশ্য আমার কথার দ্বারা যে জানা হইবে তাহা হইতে পারে না। প্রকৃতরূপে জানিতে হইলে কার্য্যের দরকার, কথায় প্রাপ্তির ইচ্ছা হয় মাত্র অপর কিছুই হয় না। যাহা হউক এখন চিত্র সকল যে কি অভিপ্রায়ে মন্দিরের বর্হিভাগে চিত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাই জানিতে চেষ্টা করা যাউক। বস্তুতঃ মন্দিরের উপরিভাগে কুৎসিত চিত্র সমুদায় যাহা অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা একেবারে অগ্রাহ্য নহে। অর্থাৎ দেহ মন্দিরের ভিতরস্থিত ভাব সকল মন্দিরের ভিতরেই চিত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে বাহিরের ভাব বাহিরে চিত্রিত না থাকিবে কেন? দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই বহির্ম্মুখ এবং তাহাদের কার্য্যও সমস্ত বহির্ম্মুখী। মন্দিরের বাহিরে যে সমস্ত কুৎসিত চিত্র দেখান আছে, তৎ সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ের ও রিপুগণের কার্য্যের পরিচায়ক। সুতরাং উহা বাহিরে থাকাই উচিত। দেহের ও বহির্ভাগেই উহারা থাকে, সুতরাং মন্দিরেরই বা বাহিরে না থাকিবে কেন? বরং থাকারই দরকার। যেখানকার যে জিনিষ সেইখানেই তাহা থাকা উচিত। আর ইহা হইতে যে শিক্ষণীয় বিষয় নাই

তাহাও নহে। দোষ ভাগ ব্যক্ত হইলে বা প্রকাশ থাকিলে তাহা হইতে জীব সাবধান থাকিতে পারে। পাপ কার্য্য যত গোপন থাকিবে ততই অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং পাপ কার্য্যও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। যদি উক্ত চিত্র দেখিয়া আমার আমোদ না হইয়া ঘৃণা বা লজ্জা হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে উহা একেবারে মন্দ নয়, কারণ যাহা একেবারে ঘৃণা বা লজ্জার বিষয়, তাহা আমার পরিত্যজ্য হওয়াই উচিত। ইহার দ্বারা ব্যাভিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ সকল বিষয়ের ব্যাভিচারই পাপ। রিপুগণের অপব্যবহারই ব্যাভিচার। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের বর্হিভাগে যে সকল কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করা আছে তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণের অপব্যবহারই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তাহা পাপ। দেহ মন্দির অভ্যন্তরস্থিত জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে হইলে দেহের বর্হিভাগস্থ ইন্দ্রিয় বিষয়ে লক্ষ্য থাকিলে বা তৎ বিষয়ে আসক্ত হইলে দেহ মন্দিরের ভিতরস্থিত জগন্নাথ দেবের দর্শন লাভ হয় না। এই সকল ইন্দ্রিয় বিষয় পরিত্যাগও হইবার নহে এবং পরিত্যজ্যও নহে। তবে সকল বিষয়েরই সদ্ব্যবহার হওয়া বা করা উচিত। সকল বিষয়ের ন্যায্য ব্যবহারে শুভফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মূর্ত্তিত্রয়ে হস্ত পদাদি না দিয়া হস্তপদের সংযত ভাবই দেখান হইয়াছে, নচেৎ তাঁহার যে হস্তপদাদি নাই তাহা বলিতে পারি না কারণ "অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রম্" (গীতা ১১ অঃ ১৬ শ্লোক)। অর্থাৎ তাঁহার অনেক বাহু, উদর, মুখ ও চক্ষু। সুতরাং তাঁহার যে হস্ত নাই তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি? বরং হস্ত আছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আরও বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডই সমগ্র হস্তপদাদি যে তাঁহারই হস্তপদাদি। আমি হাত পা ওয়ালা আর আমার জগন্নাথ ঠুঁটো; ইহা কখনই হইতে পারে না। বস্তুতঃ দেখিতে যাইলে আমিই ঠুঁটো; আমার হস্তপদাদি থাকিয়াও নাই, কারণ হস্তের অপর একটি নাম বহু। বাহু অর্থে যদ্দ্বারা বহন করা যায়। এক্ষণে বহন করে কে তাহাই দেখি। আমার বর্ত্তমান অস্থিমাংসের যে হস্ত তাহাই কি বহন করিতে সক্ষম? তাহা ত' হইতে পারে না, কারণ একটা শবদেহেও হস্তপদাদি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে হস্তত কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং বস্তু গ্রহণের মূলীভূত কারণ বর্ত্তমান অস্থিমাংসের গঠিত হস্ত হইতে পারে না। ইহা বস্তু গ্রহণের গৌণ কারণ হওয়াই সম্ভব। যখন জীবের জীবনীশক্তি ব্যতীত কেহই কোন কার্য্যক্ষম নহে, তখন বর্ত্তমান হস্তপাদদিকে বস্তু গ্রহণের মুখ্যকারণ না বলিয়া ইহাদিগকে বস্তু গ্রহণ করণের গৌণ কারণ রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলাই উচিত। আমার বর্ত্তমান অস্থিমাংসের পদদ্বয় ও তদ্রূপ আমার চলিবার পক্ষে গৌণ কারণ। প্রকৃত পদদ্বয় ইহা নহে "পদং হংস মুদাহৃতম্"। হংসই প্রকৃত পদশব্দ বাচ্য। হংসরূপ পদ না থাকিলে; পাও চল না, হাতও নড়ে না, এই হংসরূপ পদদ্বয়ই প্রকৃত হস্তপদবাচ্য। জগন্নাথের ঠুঁটো হস্তপদের উপলক্ষ্য করিয়া হংসরূপ হস্তপদের সংযম অবস্থা যাহা, তাহাই জগন্নাথ দেবের মূর্তিতে দেখান আছে। ঘটে বা পটে হংসের সংযম ভাব দেখান যায় না, একারণ ঠুঁটো হস্তপদকে উপলক্ষ্য

করিয়া বহিরঙ্গ হস্তপদের সংযমচ্ছলে হংসের সংযম অবস্থাই দেখান হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

বর্ত্তমান জীবদেহের আভ্যন্তরিক বিষয় ও বহির্বিষয়কে লইয়া যজুর্বেদের সহিত ঐক্য করিয়া শ্রীক্ষেত্রের মন্দির এবং মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দেবমূর্ত্তিত্রয় প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দেবতাত্রয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও বলরাম এবং সুভদ্রা। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবই জীবের জীবন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ইনি বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে অষ্টম অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। বলরাম দেবের যে হস্ত ছিল না তাহা নহে। তাঁহার ধ্যান পাঠের দ্বারা জানা যায় যে তাঁহার চতুর্ভূজ ছিল। বলরাম দেবের অপর নাম যাহা আছে তাহার মধ্যে একটি নাম বলভদ্র। বলভদ্র শব্দের অর্থ বলশক্তি, ভদ্র শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠশক্তি সম্পন্ন যিনি তিনিই বলভদ্র। স্থিরত্বই প্রধান শক্তি বা বল। যেখানে স্থিরত্বের অভাব সেখানে শক্তিও তাদৃশ থাকে না। অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণের স্থির ভাবই বল স্বরূপ, আর বলরাম শব্দের অর্থ—বল-শক্তি, রাম-রম ক্রীড়া করা অর্থাৎ যিনি রমার সহিত রমণ করেন তিনিই রামশব্দ বাচ্য। রমা-চঞ্চলা প্রাণশক্তি ইনিই আদ্যাপ্রকৃতি এই চঞ্চলা প্রাণশক্তির মধ্যে যে স্থিরত্বের ক্রীড়ারূপ অবস্থা তাহাই বলরাম পদবাচ্য। ইনিই শুক্ল যজুঃ। তাহার পর বলরাম দেবের অপর একটি নাম লাঙ্গলী অর্থাৎ যাঁর লাঙ্গল আছে। তিনি লাঙ্গলধারী ছিলেন। লাঙ্গল ধরিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি যে অস্ত্রের অভাব বশতঃ লাঙ্গল ধরিতেন তাহা নহে। উহাতে জীবের আত্মোন্নতি করিবার একমাত্র উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ক্ষেত্র কর্ষণ দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ হইয়া থাকে এবং তিনি যে একজন শরীররূপ ক্ষেত্রকর্ষণকারী ও গুরুরূপী কৃষক অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ তাহাই বুঝাইতেছেন। প্রাণের স্থিরাবস্থারূপ পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ (গীতা ১৩ অঃ ২ শ্লোক অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ, 'প্রাণস্য প্রাণঃ' ইতি শ্রুতিঃ। আর শ্রীকৃষ্ণকেই জগন্নাথ বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণই যে জগন্নাথ দেব তাহাতে আর আমার সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জীবের জীবন স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। জীবের জীবনই প্রাণ। প্রাণ ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব কোথায়? জগতের জীবের প্রাণ দ্বারায় যখন জীবের পোষণ হইতেছে এবং তাহা দ্বারাই যখন জীবের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তখন তিনিই সমগ্র জীবের নাথ, সুতরাং তাঁহাকে জগন্নাথ না বলিব কেন এবং তাঁহার পূজাই বা না করিব কেন? বরং করা ত' উচিত। তবে পূজা আমার বিধি পূর্বক জানা নাই, এবং পূজা কাহাকে বলে তাহাও জানি না। পূজা অর্থে সম্বর্দ্ধন করা, সম্বর্দ্ধন—সম্যক বৃদ্ধি করা। এখানে সম্যক রূপে বৃদ্ধি কাহাকে করিতে হইবে তাহাও আমার জানা উচিত। উপরোক্ত জগন্নাথও বলরামের সম্যকরূপে বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ স্থিরত্বের ও চঞ্চল প্রাণের সম্যক বৃদ্ধি করণ রূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া বাস্তবিক অন্তর্ভাবের পূজা করিতে হইবে। বাহ্য পূজায় উহা হইবার নহে। উপরোক্ত সম্বর্দ্ধন রূপ পূজা করিতে করিতে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপা বায়ুরূপিণী সুভদ্রা আপনিই প্রকাশ হইয়া থাকেন। ইনি

কল্যাণদাত্রী বলিয়া ইঁহার নাম সুভদ্রা। ইহার পর আমার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। কারণ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যেন আমার সম্যক তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ আকর্ষণ করা, টানিয়া আনা বা টানিয়া লওয়ার নাম আকর্ণে। আর কৃষ্ ধাতু অর্থে কর্ষণ করা রূপ কৃষিকর্ম অর্থাৎ জীবদেহে অজপা রূপ ক্রিয়া স্বভাবতঃ যাহা চলিতেছে তাহাই কৃষিকর্ম। সেই কৃষিকর্মের নিবৃত্তি রূপ অবস্থাই কৃষ্ণ শব্দবাচ্য।

কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চেনিবৃত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাভিধীয়তে॥

এই অবস্থাই জীবকে টানিয়া লইয়া সংসার হইতে মুক্তি দিয়া থাকে। জীবের ইহাতে লক্ষ্য না থাকায় সংসারাসক্তি যাইতেছে না। সম্বর্দ্ধন রূপ পূজা ব্যতিরেকে জীব উহাতে লক্ষ্য করিতে সক্ষম নহে। যাহা হউক এক্ষণে যেন আমার কতকটা তৃপ্তি বোধ হইতেছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ ও অপর দেবদেবীর মূর্ত্তি যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহাতে রূপের পার্থক্য থাকায় যেন আমার সন্দেহ বৃদ্ধি পায়।

পূর্বে এ সম্বন্ধে সন্দেহ বৃদ্ধির কোনও কারণ ছিল না। কারণ এ দেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাতায়াতের তত সুবিধা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে যাতায়াতের সে অসুবিধা না থাকায় লোকে অনায়াসে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাতায়াত করিতে পারে এবং ঘটনাক্রমে যাতায়াতের সুবিধা করিতে না পারিলেও অন্যান্য লোক অতি সহজেই অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এইরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া কোন কোনও বিষয়ে আমার সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমন আমার বাঙ্গালা দেশের কৃষ্ণ বা মহাদেবের চিত্র এক রকম, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের চিত্র অন্য রকম। এমন ক্ষেত্রে কোন্ চিত্র ঠিক এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইবারই কথা। তবে আমার বোম্বাইয়ের চিত্রের প্রতি আজকাল আস্থা বেশী হইয়াছে। বেশী হইবার কারণ, আমার বিশ্বাস বোম্বাইয়ের জিনিস খুব ভাল, এবং তথাকার সবই ঠিক সুতরাং আমার দেশের শ্রীকৃষ্ণ বা মহাদেবের মূর্ত্তি ঠিক নয়। যাহা হউক এই মূর্ত্তির পার্থক্য থাকায় আমার বোধহয় যে এই সকল মূর্ত্তি তাঁহাদের (দেব দেবীর) যথার্থ গঠন নিজে দেখিয়া ঠিক তদনুযায়ী কখনই চিত্রিত করা হয় নাই। দেব দেবীর মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়া সেই দেব দেবীর প্রকৃত গঠনানুযায়ী চিত্র প্রস্তুত করিলে এই মূর্তি বৈষম্য কখনই ঘটিত না বলিয়া আবার বোধ হয়। যেমন আমার ফটোগ্রাফ্ বা চিত্র যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের দ্বারা চিত্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল চিত্রে কখনই পার্থক্যভাব থাকিতে পারে না। এ কারণে আমার মনে হয় যে, দেবদেবীদের যে সকল চিত্র আমি দেখিতে পাই তাহা সমস্তই চিত্রকরগণ নিজ দেশের লোকের আকার প্রকার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তদুপরি লোকের চিত্র আকর্ষণ করিবার জন্য ঐ সমস্ত চিত্রগুলিকে অলকা তিলকা দিয়া সাজাইয়া থাকে মাত্র। ইহাতেই

প্রতীয়মান হইতেছে যে, লোকে আপন আপন ইচ্ছামত মূর্ত্তি গঠন করিয়া থাকে, বস্তুতঃ আমি যে সব শ্রীকৃষ্ণ বা শিবের ছবি বা মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি তাহা নিশ্চয়ই প্রকৃত মূর্ত্তি নহে, উহা আপন আপন কল্পনাপ্রসূত ছবি বা মূর্ত্তিমাত্র। যাহা হউক এক্ষণে আমার প্রাণ কৃষ্ণই যে প্রকৃত কৃষ্ণপদবাচ্য অপর সব চিত্র মাত্র তাহাতে আর আমার সন্দেহ মাত্র নাই। এক্ষণে আমার মনে আর একটু সন্দেহ আসিতেছে যে দেবতাদিগের যে সকল মূর্ত্তি আমি দেখিতেছি, তাহা যদি জীবের আপন আপন ভাবের কল্পনাপ্রসূতই হয় তাহা হইলে সেই মূর্ত্তি সকল আমার পূজ্য কি প্রকারে হইতে পারেন এবং প্রতিমার আবশ্যকতাই বা কি? এবং কাহার কাহার মুখে শুনিয়াছি যে মূর্ত্তি পূজার অপেক্ষা নিরাকারের উপাসনায় থাকাই ভাল। তাঁহারা বলেন তিনি যখন বাক্য ও রূপের অতীত তখন আবার তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপে হইতে পারে। এইসব নানাপ্রকার সাকার নিরাকার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ থাকায় প্রথম হইতেই মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে আমার দারুণ সন্দেহ ছিল। তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ বা জগন্নাথ সম্বন্ধে সন্দেহ যাহা ছিল তাহা আরও দৃঢ়তর হইল। বস্তুতঃ আমার সন্দেহ করিবার কোনও কারণই নাই, তবে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ আমার সন্দেহ যাইবার নহে। যেমন এই জগৎ আমি ইন্দ্রজাল মরীচিকাবৎ বা স্বপ্নবৎ এই কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান জগৎ আমার প্রত্যক্ষ দেখা থাকা হেতু আমি যেমন জগৎকে স্বপ্নবৎ বা ইন্দ্রজাল ও মরীচিকাবৎ হঠাৎ কাহারও কথায় স্বীকার করিতে পারি না, তদ্রূপ ভগবানের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান (জানা) না থাকায় সন্দেহ হইবারই কথা, তাহা নিতান্ত দূষণীয় নহে। বস্তুতঃ মূর্ত্তির যে আবশ্যকতা একেবারেই নাই তাহা বলিতে পারি না। কারণ স্বল্পবুদ্ধিযুক্ত মানবরূপী জীব বিনা অবলম্বনে উপাসনা বা পূজা করিতে পারে না। বিনা অবলম্বনে স্থির থাকা জীবের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। তাহা হইতেই পারে না। এ কারণ স্বল্পবুদ্ধিযুক্ত মানবরূপী জীবের পক্ষে মূর্ত্তি পূজাই শ্রেয়ঃ। এ স্থলে আমি যখন আমাকে স্বল্পবুদ্ধিযুক্ত মনে করি না তখন আমি কেন মূর্ত্তি পূজার অধিকারী হইতে যাইব; আমি মূর্ত্তি পূজার অধিকারী নহি, তাহার কারণ পাশ্চাত্য বিদ্যা বা বেদান্তাদি পাঠের দ্বারা আমার যখন স্বল্পবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে তখন্ আমি নিশ্চয়ই সেই নিরাকার ব্রহ্মের বা আমার উপাসনা করার যোগ্য পাত্র ইহাও কি আমি বলিতে পারি না। বস্তুতঃ আমি ইহা বলিলে আমাকে বাধা দেয় কে? আর বাধা দিলেই বা আমি শুনিব কেন, আমি জোর করিয়া করিব, ইহাতে আমার বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই। এমত অবস্থায় যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই স্বেচ্ছাচারী ভাবে করিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ ঈশ্বর তত্ত্ব, আত্ম তত্ত্ব, বা ব্রহ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে মানব মাত্রেই স্বল্প বুদ্ধি জীব বলিয়া পরিগণিত। আমার ব্যাকরণের বা বেদবেদান্তের জ্ঞান বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারায় তথায় পৌঁছিবার উপায় নাই, কারণ উহা দ্বারা কেবল কতকগুলি

শব্দ মুখস্থ করিয়াছি মাত্র, তদ্ব্যতীত আর কিছু আমার লাভ হয় নাই। বরং উহা পাঠের দ্বারা আমি আত্ম তত্ত্ববিৎ না হইয়া আমার সন্দেহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, অধিকন্তু নাস্তিকতার ভাব আসাতে অশান্তির স্রোতে ভাসিতে হইতেছে।

সপুরাণান্‌পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারোদোহতি শুযোচ হি॥
বেদভ্যাসাৎ পুরাতাপত্রয় মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাস বিস্মার ভঙ্গ গর্ব্বৈশ্চ শোকিতা ইতি। পঞ্চদশী॥

অর্থাৎ নারদ পুরাণের সহিত পঞ্চবেদ ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্ববিৎ হইতে না পারায় শোকাকুল হইয়াছিলেন। বেদাধ্যয়নের পর পাঠ বিস্মরণ অবমাননা ও গর্ব হেতু তাঁহার মনের আরও অশান্তি হইয়াছিল। নারদেরই যখন শাস্ত্র পাঠের দ্বারায় ঐরূপ হইয়াছিল তখন আমার ন্যায় জীবের পক্ষে যে কি না হইতে পারে তাহা বলিতে পারি না। সকলই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা হয়। নারদকেই যখন স্বল্পবুদ্ধি মানবের ন্যায় শোকাকুল হইতে হইয়াছিল তখন আমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি মানবের সকলই সম্ভব। এ কারণ বেদাদি পাঠ করিলেই যে আমি জ্ঞানী হইলাম ইহা মনে করা আমার বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধনালব্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলেই ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানব। আমি যখন স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নই হইলাম তখন আমি নিশ্চয়ই মূর্ত্তি পূজার অধিকারী। ইহাতে আমার মনে হইতে পারে যে মূর্তি ব্যতীত কি আমার উপাসনা বা পূজা হইতে পারে না? আমি নিরাকারেই তাঁহার উপাসনা বা পূজা করিব। নিরাকার অবস্থার উপাসনা বা ধ্যান পূজা হইতে পারে না, কারণ নিরাকার বলিতে গেলেই প্রথমতঃ এক শূন্যকেই বলিতে হয়। সাধারণ জীবের সমস্তই চঞ্চলভাবে পরিপূর্ণ। তাহার পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যান করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ নিরাকার বলিতে গেলে এক শূন্যকে বুঝায় শূন্য ব্যতীত সবই সাকার, শূন্যের ধ্যান করিতে গেলেই আমার সম্মুখে সমস্ত বিষয় আসিয়া পড়ে। আমার চতুর্দ্দিকেই শূন্য রহিয়াছে আমি শূন্যের মধ্যে থাকিয়াও শূন্যে লক্ষ্য বা ধ্যান করিতে পারি না। আমি আমার সম্মুখস্থ শূন্য পদার্থ যখন দেখিতে যাই, তখন আমার লক্ষ্য শূন্যে না পড়িয়া বাড়ী, ঘর, গাছ, পালা ইত্যাদিতে পতিত হয়। যখন অপর বস্তু দেখিতে পাইতেছি, তখন নিশ্চয়ই আমার শূন্য দর্শন হইতেছে না। যেমন আমি একটি স্থানে বসিয়া আছি এবং আমার সম্মুখেই অপর একটি লোকও বসিয়া আছেন, আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে যে স্থান বর্ত্তমান থাকে, তাহাই শূন্যস্থল; দুঃখের বিষয় আমার লক্ষ্য শূন্যস্থলে না পড়িয়া আমার সম্মুখস্থ লোকটির উপরি পতিত হইয়া থাকে। যদি আমার শূন্যেতে লক্ষ্য থাকিত তাহা হইলে আমার সম্মুখস্থ লোকটিকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম না। যখন আমার সম্মুখস্থ লোকের রূপ বা অপর বিষয় দর্শন হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই শূন্য দর্শন হইতেছে না বলিতে হইবে। যদি আমার মস্তকের

ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শূন্য দর্শন করিতে যাই তাহাতেও আমার শূন্য দর্শন না হইয়া আকাশস্থ মেঘ, চন্দ্র, সূর্য্য বা নক্ষত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, নক্ষত্র ইহারা নিশ্চয়ই শূন্য নহে, তাহা হইলে আর আমার শূন্য দর্শন কোথা হইতে হইল। আমার শূন্য দর্শন হইতেছে ইহা বলাটাও আমার একপ্রকার বাতুলতা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এরূপ অবস্থায় শূন্য স্বরূপ নিরাকারের ধ্যান করা বা করিতে যাওয়া কি বিড়ম্বনার বিষয় নহে? জীব ভাবের অবস্থায় নিরাকার বাদ অবলম্বন করা বিধেয় নহে, কারণ জীবভাবে নিরাকার অবলম্বন করা এক প্রকার নাস্তিকতার সোপান মাত্র। জীব প্রথম হইতে নিরাকার পথ অবলম্বন করিলে কালে জীবকে নিশ্চয়ই যে ব্যাভিচারগ্রস্ত হইতে হইবে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, যদিও কোন গতিকে ব্যাভিচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই তবে অর্ন্তদাহে যে আমরণ পুড়িতে হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ব্যাভিচারের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে গেলে, আমাকে আজীবন ইন্দ্রিয়গণের ও রিপুগণের প্রবাহের বিরুদ্ধে চলিতে হইবে। একে ইন্দ্রিয়গণের ও রিপুগণের খরতর স্রোত তাহার উপর আমার অন্তরস্থ যে বায়ু চলিতেছে তাহাও আমার অনুকূল নহে, বরাং উহা-ইন্দ্রিয়গণের ও রিপুগণের স্বপক্ষেই বহিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমার দেহরূপ জীর্ণ তরণী কতক্ষণ চলিতে পারে? তাহা যে নিশ্চয়ই অকালে ভগ্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। নিরাকারের সাধনে ভক্তি বা প্রেম হইতে পারে না, কারণ ভক্তি শব্দের অর্থ, ভজ, সেবকরা বা পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ; এক্ষণে নিরাকারের সেবা কিরূপে হইতে পারে তাহাত বুঝি না। সেবা করিতে গেলেই আকার আসিয়া পড়ে, আকার না থাকিলে সেবা হইতে পারে না, যিনি আকার ও অবয়ব হীন তাঁহাকেই নিরাকার বলা যাইতে পারে এবং তাঁহার সেবা হইতে পারে না। এস্থলে যদি এরূপ বলি তিনি আমার ন্যায় হস্তপদাদি বিশিষ্ট নহেন, তিনি সেই তেজঃস্বরূপ, তেজঃস্বরূপের সেবা করিব বা তেজের উপর অনুরাগ রাখিব, ইহাতে আর দোষ কি? বস্তুতঃ ইহাতে যে দোষ নাই তাহা নহে, কারণ তেজঃস্বরূপ বলাতেও রূপ আসিতেছে। প্রথমতঃ এই কথায় তাঁহার রূপাতীত অবস্থায় দোষ পড়িতেছে, কারণ আমি তাঁহাকে রূপাতীত বলিয়া শুনিয়াছি, রূপ থাকিলে রূপাতীত কেমন করিয়া বলি। তেজঃস্বরূপ বা জ্যোতিঃস্বরূপ বলিলে আর রূপাতীত বা নিরাকার বলা যাইতে পারে না। এবং বলাও উচিত নয়, এমতস্থলে তাঁহাকে নিরাকার না বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ বা তেজঃস্বরূপ বলাই উচিত, তিনি নিরাকার বলা সঙ্গত হয় না। তাহার পর কথা হইতেছে যদি তিনি সত্যই তেজঃস্বরূপ বা জ্যোতিঃস্বরূপ হন, তাহা হইলেও আমার সেই জ্যোতির বা তেজের উপর অনুরাগ আসিতে পারে না কারণ সেই তেজ বা জ্যোতিঃ আমার দর্শনাভাব হেতু ধ্যান করিব কার? দর্শনাভাব জনিত, অনুরাগ বা সেবা বা ধ্যান কিছুই হইল না বরং ভ্রষ্টাচারে পরিণত হইল। পতি ব্যতীত যেমন পতি-

প্রেম হইতে পারে না তদ্রূপ জ্যোতিঃ বা তেজ আমার নিজ প্রত্যক্ষ দর্শনাভাব থাকায় ইহাতেও অনুরাগ বা প্রেম হইতে পারে না বরং তাহাতে চিরজীবন কুমারীর ন্যায় থাকিয়া নানা জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। আজীবন কুমারী অবস্থায় থাকা যে জ্বালা হয় তাহা চিরকুমারী ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে। অপরাপর বিষয় সমস্ত কল্পনার চক্ষে দেখিলে তাহাতে তত যায় আসে না, কিন্তু পতি অভাবে পতি কল্পনা করা বোধহয় ঠিক নহে। আমি এ পর্য্যন্ত আমার পতি কে তাহা জানিতে না পারায় পতি পরিবর্তন যে কতবার হইল তাহা ব্যক্ত করিতেও আমার লজ্জা বোধহয়। আমার পতিকে কখন সাকার বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতে যাই, আবার কখন বা নিরাকার বোধে ব্যস্তভাবে ধরিতে গিয়া শেষে পড়িয়া যাই। শূন্যকে যেমন লাফাইয়া উচ্চদিকে ধরিতে গেলে আমার পতন নিশ্চয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ নিরাকার বোধে ভগবানকে ধরিতে গেলেও আমার পতন অবশ্যম্ভাবী। সাকারেও যে আমার তৃপ্তি হইতেছে তাহাই বা কেমন করিয়া বলিতে পারি। কারণ মৃৎশিলা ধাতু বা দারু দ্বারায় গঠিত প্রতি মূর্ত্তিতে কি আমার পতি-প্রেমের বা পতি-সহবাসের সুখরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারা সম্ভবপর? তাহা বোধহয় কখনও নহে, তাহার উপর আমার যে পতিরূপ গঠিত হইয়া আমার সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে তাহাও আমার পতিকে না দেখিয়া একটা কল্পনার চক্ষে মূর্ত্তিগঠন করিয়া তাহাকেই আমার পতি বলিয়া সম্বোধন করিতে বলা হইতেছে। ইহা আমার মন আর কতকাল মানিয়া লইয়া চলিতে পারে। এরূপ ভাবে সাকার উপাসনাও দোষশূন্য না হইলেও নিরাকারের উপাসনা অপেক্ষা যে ইহা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিরাকার অপেক্ষা সাকারকে শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ, জীব অবলম্বন ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না। এবং অবলম্বন যতই চিত্ত-মুগ্ধকর হইবে ততই জীবের মন তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। যেমত বালক বালিকাগণ চিত্রপুত্তলিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পুত্রকন্যা ভাবে কোলে করিয়া আদর ও স্নেহ যত্ন করিয়া থাকে ইহাতে যে তাহাদের কিছুলাভ হয় না। এমত নহে, অন্ততঃ স্নেহর ও যত্নের শিক্ষার অভ্যাস তাহাতে নিশ্চয়ই হইয়া থাকে এবং বালক বালিকারাও নানারূপ মূর্ত্তি দর্শনে সেই সকল মূর্ত্তির নিকটস্থ হইয়া ঈশ্বর বোধে প্রণামাদি করায় প্রথম হইতে নিজেকে ঈশ্বর সমীপে নত হইবার অভ্যাস করিয়া থাকে। নিরাকারে তাহা হইবার নহে। বালক নিরাকার কি বুঝিবে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধমুক্ত জীব ব্যতীত সকলেই যে বালকবৎ তাহাও আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, বালকগণ হইতে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরে একরকম নাস্তিকতার ভাবই দাঁড়াইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ইহা বোধগম্য হওয়া আমার ন্যায় স্বল্পমতি বিশিষ্ট জীবের পক্ষে যে কত কঠিন হইতে কঠিনতর তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন, তবে দুঃখের বিষয় আমি আমাকে বুদ্ধিহীন বলিয়া কিছুতেই স্বীকার

করি না। সেই কারণে আমার যত গণ্ডগোল, অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমি যে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিহীন তাহাতে আর আমার সন্দেহ নাই।

জীব মাত্রেই চঞ্চল এবং অযুক্ত, ব্যক্তির আহার নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি বিষয়িনী বুদ্ধি ব্যতীত, আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বর তত্ত্ব বিষয়িনী বুদ্ধি নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য না চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

অর্থাৎ অযুক্ত ব্যক্তির আত্ম-বিষয়িনী বুদ্ধি নাই, অযুক্ত ব্যক্তির আত্ম-বিষয়কজ্ঞানও হয় না। আত্ম ধ্যানবিহীন ব্যক্তির শান্তিও নাই, শান্তিহীনের সুখ কোথায়? সুখের অভাবেই দুঃখ, দুঃখ শব্দের অর্থ খং—ব্রম্ভ বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে, আত্মার বৃহত্ত্ব হেতু আত্মাকেই ব্রহ্ম কহা যায়, সেই আত্মব্রহ্ম হইতে দূরে থাকাই দুঃখ। এখানে যদি বলা যায় আত্মব্রহ্ম হইতে দূরে থাকা অসম্ভব, কারণ তিনি যখন সর্বত্রই সমানভাবে রহিয়াছেন তখন আমি তাঁহা হইতে দূরে কিরূপে থাকিতে পারি, দূরে থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না, বরং নিকটে থাকাই সম্ভব। বস্তুতঃ তিনি আমার দূরে নাই ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও আমার আত্মব্রহ্মকে না জানা হেতু আমার পক্ষে দূর, আত্মাকে না জানায় জীবের যত অশান্তি, অশান্তি অপেক্ষা আর বেশী দুঃখ কি আছে বা হইতে পারে?

যাহা হউক ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এই শুষ্ক এবং বাহ্যিক জ্ঞানের ফলে এখন আর গুরুজনকে কেহ মানিতে চায় না এবং ইহার ফলে আমার সদাচারেরও অভাব আসিতেছে। সদাচার বা নীতিধর্ম ঈশ্বর প্রেম ব্যতীত হইতেই পারে না। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষভাবে হেতু প্রেম বা ভালবাসা হয় কি প্রকারে তাহাও আমার বোধ নাই; সুতরাং আমার ঈশ্বর প্রেম এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। এমতস্থলে আমার সদাচারী বা চরিত্রবান হওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, আমি যাহা নীতিশিক্ষা করিয়াছি তাহা এক প্রকার ধর্মহীন নীতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্মহীন বলিবার অভিপ্রায় এই যে আমি যে ধর্ম পাইয়াছি তাহার অবলম্বন না পাওয়ায়, আমার ধর্ম, অধর্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ঈশ্বর সাকার নহেন ইত্যাদি পরের কথায়, আমার না সাকারে আস্থা আছে, না নিরাকারে আছে, আমার উভয় কূলই নষ্টপ্রায় হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এমত অবস্থায় আর নীতি, সদাচার ও চরিত্র রক্ষা হয় কাহার বলে। এই কারণে আমার কার্য্যাকার্য্যের এক প্রকার কিছুই ঠিক নাই, আমি প্রকাশ্য লোকলজ্জা ভয়ে অনেক সময় অনেক কার্য্য করিতে না পারিলেও গোপনে কোন কার্য্যই করিতে কুণ্ঠিত হই না, কুণ্ঠিত হই না তাহার কারণ আমার প্রবল রিপুগণ আমাকে অবলম্বন শূন্য অবস্থায় পাইয়া তাহারা অনায়াসে আমাকে তাহাদের (রিপুগণের) অভিপ্রেত সদসৎ সমস্ত কার্য্যই আমার দ্বারা করাইয়া লয়। এমত অবস্থায় প্রত্যক্ষ সাকার বাদ জীবের প্রথম অবস্থায় জীব মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত, কারণ শূন্য স্বরূপ নিরাকার বাদের অবলম্বন না পাওয়ায় নিরাকার

বাদ আমাকে রিপুগণের প্রবল প্রবাহ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আরও বিশেষ যাহারা নিরাকার বাদী, তাহারা মুখে সাকার বাদীকে ঘৃণা করিয়া পৌত্তলিক ইত্যাদি শ্লেষ বাক্য সকল বলিয়া কেবল আপনা আপনি একটা বিরোধ বাধাইয়া ধর্ম জগতে একটা দলাদলির ভিত্তি স্থাপন করিয়া পরস্পরের একটা মনোমালিন্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র। নচেৎ অপর কিছুই তাহাদের লাভ হয় না, ইহা কেবল আমার অজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বস্তুতঃ তিনি নিরাকারও নহেন সাকারও নহেন, আবার তিনি সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন, অর্থাৎ আমার আমির বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি নিরাকার কদাচ নহেন ইহা ধ্রুব সত্য। এবং আমার আমির রহিত অবস্থায় তিনি নিরাকার, সেখানে তিনি নাই সেখানে আমিও নাই, যেখানে তিনি আছেন সেখানে আমিও আছি, অর্থাৎ আমার আমিই তিনি, এ আমি, অস্থিমাংসবিশিষ্ট শরীর নহে বা আমি শব্দ আমি নহে, অস্থিমাংস বিশিষ্ট শরীরের ও আমি শব্দের উৎপত্তি স্থানই আমি শব্দ বাচ্য। এই আমি যখন ঘটস্থ হইয়া কার্য্য করি তখন সাকার, স্বভাবের দ্বারায় ঘট ভাঙ্গিলেই নিরাকার, সেই সর্বশক্তিমান নারায়ণ তিনি প্রতি ঘটে বিরাজমান, সাকারবাদীরা সেই নিরাকারের পূজা করিয়া থাকে, তবে যাহারা প্রকৃত পূজা করিতে অক্ষম বা পূজা কর্ম জানে না তাহাদের জন্যই মৃৎশিলা ধাতু ইত্যাদির অবলম্বন মাত্র সম্মুখে রাখিয়া প্রকৃত আত্মানারায়ণের পূজার অভ্যাস করান হইয়া থাকে, কারণ প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধি মানবের জন্যই ব্যবস্থা আছে, ইহা নিরাকার বাদ অপেক্ষা যে শতাংশে শ্রেয়ঃ তাহার সন্দেহ নাই। এই বাহ্য পূজার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহা সিদ্ধ মুক্ত ব্যতীত সাধারণের অকরণীয় নহে বরং করণীয়, তবে এই বাহ্যকে মুখ্যকর্ম মনে করা চাহি না।

পূজা পদ্ধতিতে যে সব ধ্যান মন্ত্র লিখিত আছে তৎসমুদায়ই প্রায় বায়ু ক্রিয়া অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি ন্যাস ইত্যাদি যাহা যাহা লিখিত আছে তাহা দুচার ঘণ্টায় বা দুই চারি বৎসরে কাহারও শেষ করা সাধ্যয়ত্ত নহে, ভূতশুদ্ধির কার্য্যটি শেষ করিতে পারিলেই সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই ভূতশুদ্ধির কার্যটি প্রাণায়াম যোগাভ্যাসী সাধক যদি প্রত্যহ গুরুবাক্যমত বিধিপূর্বক ছয় ঘণ্টাকাল ধরিয়া সাধনা করেন, একদিনও বাদ না যায় তাহা হইলে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরে তাঁহার ভূতশুদ্ধি কার্য্য সমাপন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব, নচেৎ নহে।

দুঃখের বিষয় উপস্থিত কালে একবার পুঁথিখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া পুষ্প পত্রগুলি সম্মুখস্থ দেব বা দেবীর উপর ফেলিয়া দিতে পারিলেই ছুটি, ইহা আর সাকার বাদের দোষ নহে, আমি যদি না জানিয়া কোন কার্য্য জানি বলি তাহা আমারি দোষ।

সম্মুখস্থ দেব দেবীর মূর্ত্তিগুলি জীবকে আস্তিকতা ভাবে রাখিবার উপায় মাত্র নচেৎ অপর কিছুই নহে, দেখিতে পাওয়া যায় ধ্যান মন্ত্র শেষ সময়ের পুষ্পটি নিজের মস্তকে

দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতেই বুঝিতে হইবে যাহা কিছু মূর্ত্তি সব নিজ মস্তকের ভিতরে রহিয়াছে। যেমন নারায়ণের পূজা করিতে গেলে আমরা নারায়ণ শিলাকেই পূজা করিয়া থাকি ইহাকে সাকার বিদ্বেষী যাঁহারা তাঁহারা হয়ত বলিবেন পাথর পূজা করিয়া কি হইবে, বস্তুতঃ পাথর পূজা কেহই করেন না, আর যদি পাথর পূজাই হয় তাহাতেই বা দোষ কি? তিনি কি পাথরে নাই? তিনি যখন সর্বত্রই সমান ভাবে বিরাজমান তখন তিনি নাই কোথায়, তবে পূজা বিধি পূর্বক হইলে, তিনি সাধকের হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া, তিনি যে প্রস্তরেও আছেন তাহা সাধক অনুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ নারায়ণ শিলা অল্পবুদ্ধি জীবের অবলম্বন মাত্র, ইহাই একটি প্রকৃত রূপের প্রতিমা, প্রতিমা শব্দের অর্থ—সাদৃশ, নারায়ণের রূপের সাদৃশই, শিলামূর্ত্তি, নারায়ণের ধ্যান যাহা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার কতকটা অনুরূপ থাকায় অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জীবের অবলম্বন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নারায়ণের ধ্যান যথা—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ ইত্যাদি নারায়ণের ধ্যানের অর্থ করিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারায়ণ শিলার সহিত মিল নাই, ইহাতে আমার মনে স্বতঃই সন্দেহ হইতে পারে যে, নারায়ণের ধ্যানের সহিত যখন শিলা-মূর্ত্তির মিল নাই; তখন তাহাকে নারায়ণ বলিতে পারি না। বস্তুতঃ আমার এ সন্দেহ হওয়াটা অন্যায় নহে। প্রকৃতভাব জানা না থাকিলে সন্দেহ আসাই সম্ভব। প্রকৃত ভাব আমাকে কেহই বুঝাইয়া দেন নাই, আমার সন্দেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আমার হঠাৎ সন্দেহ করা চাহি না কারণ আমার যখন কোন বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই এবং কোথাও প্রত্যক্ষ বিষয়ও পাই নাই, তখন আমার যাহা আছে, তাহা কেন সন্দেহ করিয়া নষ্ট করি।

যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্মকে ঘৃণা করিয়া একেশ্বর বাদকে মান্য করেন তাঁহারাও যে পৌত্তলিক, তাহা তাঁহারা জানিয়াও জানে না, একেশ্বর বাদীদিগেরও ঈশ্বরের হস্তপদাদির সহিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এই কল্পনা করিয়া তাঁহাকে এক কল্পনার ক্ষেত্র স্বর্গধাম রচনা করিয়া তথায় তাঁহার রাজ্য আছে এবং সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর সেই ঈশ্বর এই কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে পুষ্প ইত্যাদি দিয়া প্রার্থনাা করিয়া থাকেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধেও কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে বলিয়া আমার বোধহয় না।

এমত অবস্থায় আর আমার দেবমূর্ত্তির কি অপরাধ হইল। এবং আমরা যে ভাবে দেবমূর্ত্তির ধ্যান পূজা যে সব মন্ত্রের দ্বারা করিয়া থাকি, তাহাতে প্রতিমাই যে ঈশ্বর, তাহাও বলা হয় না, কার্য্যের দ্বারায় প্রতিমাতে ঐশ্বরিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই পূজা করিয়া থাকি, সুতরাং উপরোক্ত একেশ্বর বাদ অপেক্ষায় আমার সাকার বাদ ঘৃণার কথা নহে। সুতরাং আমার পূজাদিতে ঘৃণা বা সন্দেহ না করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। তবে আমার ধর্মে যাহা আছে তাহার প্রকৃত মর্ম অবগত হইবার চেষ্টা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে নারায়ণের ধ্যানের অর্থটাই দেখি, তাহাতে কি আছে আর

নারায়ণ শিলার সহিত প্রকৃত রূপের সাদৃশ্যই বা কি তাহা আমার আগে জানা আবশ্যক হইয়া পড়িল দেখিতেছি।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধবর্ত্তী নারায়ণঃ ইত্যাদি—অর্থাৎ সবিতৃ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, (সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী) অবস্থাই নারায়ণ, তাহাকে সদা—নিয়ত ধ্যান কর, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই নারায়ণ, তাঁহাকে জান, ইত্যাদি।

এক্ষণে সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা কি তাহাও আমার জানা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই জ্যোতিঃতে পূর্ণ দেখিয়াছি, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যভাগেও জ্যোতিঃই দেখিতে পাইয়া থাকি, জ্যোতিঃ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া যে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অপর কিছুই নাই তাহা বলিতে পারি না এবং বলাও উচিত নহে। সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী অবস্থা গাঢ় নীলবর্ণের (দেখিতে কৃষ্ণ বর্ণের ন্যায় দেখা যায় বস্তুতঃ কৃষ্ণবর্ণ নহে) গোলক এবং গোলক-মধ্যে গহ্বর, ইহাই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, ইহা দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখাও যাইতে পারে, সূর্য্যকে নীলবর্ণের নক্ষত্রও বলা যাইতে পারে। স্বল্পবুদ্ধি মানবের জন্য অনুকরণে যতটা সম্ভব হয় ততটা অনুকরণ করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা করিবার উদ্দেশ্য যাঁহারা বহিরঙ্গ সাধনে রহিয়াছেন তাঁহাদের অবলম্বন জন্য ইহা মনঃস্থিরের উপায় মাত্র। নারায়ণ শিলাও গোলকার এবং শিলার মধ্যে গহ্বর আছে, শিলাতে কেবল নারায়ণ শিলার চতুর্দ্দিকের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণ শিলার চতুর্দ্দিকে যজ্ঞোপবীতের ছলে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের বা রৌপ্যের বা তাম্রের পাতের বলয়া-কৃতি নারায়ণের যজ্ঞোপবীত বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা যজ্ঞোপবীত নহে, ইহা জ্যোতিঃর অনুরূপ মাত্র। যিনি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত, তাঁহার যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার স্থান কোথায়? (যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।)

নারায়ণ শিলাই স্বল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট বহিরঙ্গ সাধকের একমাত্র অবলম্বন, ইহাতে মনঃস্থিরের ও কতকটা সাহায্য হইয়া থাকে, তবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অনুষ্ঠান করা উচিত, তবে যদি কেবল সাধারণ শিলা বোধ থাকে, তাহা হইলে কিছুই হইবার আশা নাই, এ কারণ নারায়ণ শিলাকে পাথর বোধ না করিয়া, নারায়ণের সৌসাদৃশ্য বোধে তাঁহার সেবা করা উচিত, কারণ ইহা প্রথম অভ্যাসের প্রথম সোপান মাত্র। যেমত বাল্যকালে বালিকারা মৃত্তিকার বা কাষ্ঠের নির্ম্মিত পুত্তলিকা লইয়া নিজ সন্তান বোধে খেলা করিয়া থাকে, তাহার পর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পতি-গৃহে যাইয়া পুত্রকন্যা হইলে তাহারা যেমত আর সাধারণ পুতুল-খেলা না খেলিয়া পতি পুত্র লইয়া আনন্দলাভ করে, তদ্রূপ সাধক যতকাল না অন্তরঙ্গ সাধন কার্য্য পান, ততদিন তাঁহাকে বহিঃরঙ্গ সাধনেই থাকিয়া বহিঃরঙ্গ সাধনের সহিত অন্তরঙ্গ সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে ও করাও উচিত। তাহার পর অন্তরঙ্গ সাধনপ্রাপ্ত হইলে তখন তিনি আপন শরীরে নারায়ণ—রূপ দর্শন করিয়া

তৃপ্তিলাভ করিবেন, এবং নারায়ণের ধ্যান যাহা লিখিত আছে তাহা যে ভুল নহে তাহাও হৃদয়মঙ্গল করিতে পারিবেন। এক্ষণে অন্তরঙ্গ সাধনের নারায়ণই বা কিরূপ তাহাই আমার এখন জানিবার বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে শরীররূপ জগৎ ও বর্হিজ্জগৎ তুল্য, শরীররূপ জগতের যেমন প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারায় অস্তিত্ব রহিয়াছে বহির্জ্জগতেরও তদ্রূপ প্রাণের ক্রিয়া (শ্বাস প্রশ্বাস) দ্বারায় অস্তিত্ব রহিয়াছে, এবং কালে শরীরও যেমন প্রাণের ক্ষয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে বহির্জ্জগৎও তদ্রূপ প্রাণের ক্রিয়া রহিত হইলে কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

জীব-দেহের প্রাণের ক্রিয়াই শ্বাস-প্রশ্বাস, শরীররূপ জগতের উৎপত্তি, স্থায়িত্ব এবং ধ্বংস প্রাণের ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা হইতেছে। বহির্জ্জগতের প্রাণের ক্রিয়া রূপ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা উৎপত্তি, স্থায়িত্ব এবং ধ্বংস হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের প্রাণের ক্রিয়ারূপ শ্বাস-প্রশ্বাসই জোয়ার ও ভাটা। এই জোয়ার ভাটারূপ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা বহির্জ্জগৎও একদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

বহির্জ্জগৎও নারায়ণের একটি বিরাট দেহ মাত্র; মানব শরীরও ক্ষুদ্র একটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। মানব দেহে সবই প্রত্যক্ষভাবে অণুস্বরূপে বর্ত্তমান। মানব মাত্রেই নিজ নিজ দেহতত্ত্বকেও দেহস্থিত আত্মা নারায়ণকে যতক্ষণ বা যতকাল না জানিবে ততকাল তাহার কিছুই জানা হয় নাই বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। মানব দেহই আত্মানারায়ণের মন্দির স্বরূপ। দেহ মন্দিরস্থিত আত্মানারায়ণকে অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা যাঁহারা ভাগ্যবান সাধক তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকনে, এবং যিনি উপদেষ্টা গুরু তিনি প্রথমে আত্মানারায়ণের রূপ দেহ মধ্যস্থিত গোলকধামে দেখাইয়া দেন বলিয়া গুরু সকলের প্রণম্য। গোলক ধাম মানব দেহেই বর্ত্তমান অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে স্থানে জ্যোতিঃর বা সবিতৃ-মণ্ডলের মধ্যে গাঢ় নীলবর্ণের গোলক (মণ্ডলাকার পদার্থ) প্রকাশমান, সেই স্থানকেই গোলকধাম বলা যায়। গুরু উহা দর্শন করাইয়া দেন বলিয়াই তিনি সকলের প্রণম্য। "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ"! গুরুর এই প্রণাম মন্ত্রেই বুঝা যাইতেছে যে গুরুর কার্য্য "মুখে বলিয়া দেওয়া নহে" তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই দিয়া থাকেন। তাহার পর সাধক সাধন দ্বারা তাহাতেই নিজের মনের লয় সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই প্রথম সোপান এবং গুরু যাহা দেখাইয়া দেন তাহাই অন্তরঙ্গ সাধনের অন্তরস্থিত আত্মানারায়ণের রূপ। উক্ত আত্মানারায়ণের রাস, দোল ইত্যাদি উৎসব যাহা আমরা বাহিরে দেখিয়া থাকি তাহার বিষয় ক্রমে ক্রমে বিবেচনা করা যাইবে। এখানে রাসযাত্রা কি তাহাই দেখা যাউক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাসলীলা

রাসযাত্রাটি ভগবৎ লীলার একটি মায়িক ক্রীড়া বিশেষ। ইহা নিত্যলীলা; সর্বদাই হইতেছে ও হইবে (অদ্যাপিও সেই রাস করে গোপীরায়, কদাপি কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।) বস্তুতঃ রাস-লীলাটি নিত্য বিষয়ের মধ্যে। যদি নিত্যই হইল তবে উহাকে আবার মায়িক নিত্য লীলা বলি কেন? মায়িক শব্দের অর্থ ঐন্দ্রজালিক বা ভ্রান্তিজনক, নিত্য শব্দের অর্থ যাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান। এস্থলে উভয় শব্দের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না দেখিতেছি। কারণ মায়িক বলাতে নিত্যতায় দোষ পড়ে, মায়িক হইলে নিত্যতা কোথায়? মায়িক ইন্দ্রজাল মরীচিকা বা ভ্রম দর্শন মাত্র, তাহার আবার নিত্যতা কোথায়? বস্তুতঃ ইহার যে সামঞ্জস্য নাই তাহা নহে, সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে। একটু ধীরভাবে প্রণিধান করিলে আপনিই সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে, কোনও কথারই দোষ থাকিবে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে যাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান তাহাকেই নিত্য কহা যায়। বস্তুতঃ ভগবানের মায়িক রাসলীলা সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছে ও থাকিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমান অবস্থা নিত্য; যেখানে কাল নাই সেখানে "আমি" "আমারও" নাই। কাল অনন্ত। এই কাল ঘটস্থ হইয়া ভাবের দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বকালে অনন্তরূপে বিদ্যমান থাকে ও রহিয়াছে। সুতরাং কালের বর্ত্তমান অবস্থাও যে নিত্য তাহা কালের বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিয়া বলা চলে না কারণ কাল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণতঃ কাল শব্দের অর্থে আমরা কালের বিভাগরূপ অবস্থাকেই সময় বা কাল বলিয়া বুঝিয়া থাকি। আমরা বাহিরের চন্দ্র সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া উহাদের উদয় হইতে অস্তকাল পর্যন্ত গতি বিভাগ করিয়া সময় বা কালের সংখ্যা করিয়া থাকি এবং তাহাকেই কাল বা সময় কহিয়া থাকি। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা কালের প্রকৃত নির্ণয় হয় না, তাহাতে বাহ্যিক মোটামুটি জ্ঞান হয় মাত্র। উহার দ্বারা কালের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। কারণ অনুভব না হইলে, প্রকৃত জ্ঞান কোথায়? অনুভব ও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই নচেৎ বৃথা।

এক্ষণে প্রকৃত কাল কি তাহাই দেখা যাউক। কাল সর্বসংহারক রুদ্রকে কহা যায়, রুদ্র কে তাহাও আমার জানা নাই। রুদ্র বলিলেই যেন একটা ভীষণ রকমের জিনিষ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ রুদ্র ভীষণ নহেন; তিনিই জীবের জীবন স্বরূপ প্রাণ। প্রাণের অবস্থাই রুদ্ররূপ কাল। "যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণা যে প্রাণাস্তে তদাত্মকা। প্রাণাঃ প্রাণবতাং জ্ঞেয়াঃ সর্বভূতেষ্ব বস্থিতাঃ"॥ অর্থাৎ যিনি রুদ্র তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ, আবার যিনি প্রাণ তিনিই আত্মা। ঘটস্থ প্রাণের ক্রিয়ার বিচ্ছেদ অবস্থাই একমাত্র কাল শব্দ বাচ্য।

এই কালের শরণাপন্ন হইয়া পূজা রূপ সম্বর্দ্ধন করা সকলেরই একমাত্র কর্তব্য; কারণ—

জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামা শ্রয়োমতঃ।
পরাপরত্ব ধীহেতু ক্ষণাদি স্যাদু পাধিতঃ॥
অনাদি নিধনঃ কালোরুদ্র সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কালান্যাং সর্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কালের সর্ব ঘটে স্থিতিবিধায় কালের নিত্যতা অসম্ভব নহে। তবে কালের অবস্থা মায়াতীত অবস্থা নহে, সগুণ অবস্থা কালাতীত অবস্থাই এক মাত্র মায়াতীত অবস্থা, সুতরাং কালেতে নিত্যতার অবস্থাও মায়িক অবস্থা দুইই বর্তমান।

পূর্ব বলা হইয়াছে যে ভগবানের মায়িক রাসলীলা সর্বকালে বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। কালাতীত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে তাহা বলা হয় নাই। কালাতীত অবস্থায় কোনও লীলা নাই, থাকিতেও পারে না। কারণ যেখানে আমি থাকিয়াও আমি নাই সেখানে লীলা কোথায়? যিনি কালাতীত তাঁহার নিকট লীলা থাকিয়াও লীলা নাই। কালের বর্তমান অবস্থাতেই রাস ক্রীড়া রূপ লীলা রহিয়াছে। বাহিরে যে রাসলীলার উৎসব দেখা যায়—তাহা প্রকৃত রাসলীলার ছবি মাত্র অপর কিছুই নহে।—রাস মণ্ডপে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি এবং মণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নানাবিধ সোলার ফুল গাছ এবং প্রাঙ্গণের উপরিভাগে একটি জাল খাটাইয়া (এই জালকে ইন্দ্র জাল কহে) তাহাতে সোলার নানারকম জীব জন্তু ফুল ফল ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হয়। এই রূপেই বাহ্যিকে রাসের উৎসব হইয়া থাকে, এ রাসকে নিত্যলীলা বলা যায় না। কারণ দুই চারি দিন পরে ইহার অস্তিত্ব থাকে না, এমন স্থলে বাহিরের রাসের অবস্থাকে নিত্য রাস বলিতে পারি না। ইহা নারায়ণের অপ্রাকৃত লীলার চিত্র মাত্র। ইহার দ্বারা যাহারা রঙ্গপ্রিয় জীব, রঙ্গ তামাসা আমোদ ব্যতীত থাকিতে পারে না,—তাহাদিগকে ধর্ম বিষয়ে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম সম্বন্ধ রাখিয়া বাহ্যিক পূজাদির সহিত বাহ্যিক রাসের উৎসব দ্বারা অজ্ঞানী জীবসমূহকে ধর্ম মার্গে আকর্যণ করিবার একটি প্রধান কৌশল প্রণীত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য কারণ দ্বারা বা দর্শনাদির দ্বারা জীবের ভগবৎ প্রাপ্তির রুচি বর্দ্ধিত হইলে তখন তাহাকে দীক্ষাদির দ্বারা অন্তরঙ্গ সাধনে প্রবর্তিত করা হইত। গৌরাঙ্গদেবও এই অভিপ্রায়ে নাম সঙ্কীর্ত্তণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাম সঙ্কীর্তন দ্বারা জীবের রুচি বর্দ্ধিত হইলে তাহার পর তাহাকে মন্ত্র দীক্ষাদি দিবার ব্যবস্থা আছে এক্ষণে কালে দীক্ষাদি উঠিয়া গিয়া কেবল মাত্র হরি সংকীর্তন রূপ নামেই মোক্ষ লাভ হইবে, এইরূপ আমার ন্যায় মূঢ় জীবের নিকট প্রতিপন্ন হইতেছে। তদ্রূপ অপ্রাকৃত রাসের জ্ঞান উঠিয়া গিয়া আমার মনে বাহ্যিক রাসক্রীড়া দর্শন দ্বারা আমার মোক্ষ বা কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে এইরূপ ভুল ধারণা, জন্মিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা আমার অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক্ষণে অপ্রাকৃত রাসের বিষয়টা কি তাহা দেখিয়া লই পরে অপর বিষয় দেখা যাইবে। পুরুষ ও প্রকৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যে ক্রীড়া তাহাই রাসপদবাচ্য। সেই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই

কহা, যায় এবং প্রকৃতি রাধাকেই বলা হইয়া থাকে। বাহ্যিক ভাবে আমরা শুনিয়াছি যে রাধাকৃষ্ণের রাস লীলা শ্রীবৃন্দাবনেই হইয়াছিল এবং এখনও কার্ত্তিক পূর্ণিমায় অনেক স্থলে হইয়া থাকে। আমার প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণ ইঁহারা কে এবং বৃন্দারন ধামই বা কোথায় এবং রাসলীলা কি তাহাই প্রকৃত পক্ষে জানা আবশ্যক। পূর্বে উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণই প্রধান পুরুষ শব্দ বাচ্য। শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষ প্রধান বলিবার কারণ পুর দেহ, শী শয়ন করা অর্থাৎ দেহ রূপ পূরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন বা দেহ রূপ পুরে যিনি বাস করেন তিনিই পুরুষ শব্দ বাচ্য। এবং পুরুষ শব্দে আত্মা বা বিষ্ণুকে বলা যাইতে পারে। এবং যিনি জগতের আদি কারণ ঈশ্বর তিনিও পুরুষ শব্দবাচ্য। এক্ষণে দেহ মধ্যে কোন্ প্রধানপুরুষ শয়ন করিয়া আছেন অর্থাৎ কোন্ প্রধান বাস করিতছেন এবং আত্মা বা বিষ্ণু বা ঈশ্বরই বা কে তাহাই দেখা যাউক। আত্মা বা বিষ্ণু বা ঈশ্বর এই শব্দ সকল, আত্মা বা বিষ্ণু বা ঈশ্বর নহেন। যদি এই শব্দ সকল তাঁহারা হন তবে জল এই শব্দ জল হওয়া উচিত। বস্তুতঃ জল এই শব্দ জল নহে, কারণ জল জল এই শব্দ মাত্র উচ্চারণে কাহারও পিপাসা মিটে না। যদি জল এই শব্দ জলই হইত তাহা হইলে জল এই শব্দ উচ্চারণ করিলে জীবের পিপাসা দূর হইত। যখন তাহা হয় না তখন জল এই শব্দ মাত্র জল হইতে পারে না। তদ্রূপ আত্মা বা বিষ্ণু বা ঈশ্বর এই শব্দ সকলকে আত্মা বা বিষ্ণু বা ঈশ্বর বলিতে পারি না। এই সকল শব্দকে একটি প্রধান শক্তির বাচক বা উপাধি মাত্রই বলিতে পারি এবং তাহা বলাই উচিত। এক্ষণে দেহর মধ্যে সেই প্রধান শক্তি কাহাকে বলিতে পারি তাহাও আমার জানা উচিত। দেহের মধ্যে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিয়াছে, ইহারাই ত' প্রধান বলিয়া আমার মনে হয়। ইহাদের উপর মন রহিয়াছে। সুতরাং মনকে প্রধান বলিলেও আমার মতে যেন অন্যায় হয় না। কারণ কার্য্য করণ কালে ইহাদের দ্বারাই আমি কার্য্য করিয়া থাকি। এমন স্থলে ইহারা প্রধান নহে কিসে? ইহারা সকলেই ত' স্ব স্ব প্রধান বলিয়া আমার বিবেচনা হয় এবং তাহাই জানি। ইহা ব্যতীত যে অপর কেহ প্রধান আছে তাহা আমার জানা নাই, শুনা আছে। তাহার পর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হস্ত পদাদি এবং পাকস্থলী যন্ত্র প্রভৃতিকেও প্রধান বলিতে পারি। কারণ দেহস্থ যন্ত্র সমূহ দ্বারা দেহের কার্য্যসমূহ চলিতেছে। ইহাদিগকেই বা প্রধান না বলি কেন? বস্তুতঃ আমার বর্তমান জ্ঞানে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রধানতম শক্তি আমার দেহে বর্তমান আছে বলিয়া আমার জানা নাই। শুনিয়া জানা থাকিলেও তাহাতে লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য না থাকায় তাহার প্রাধান্য ও ক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া তাহা অগ্রাহ্যের মধ্যে পরিণত হইয়া থাকে ও আছে। আমার জানা না থাকিলেও আমার আর কিছু জানিবার বিষয় নাই ইহা বলা আমার এক প্রকার বাতুলতা মাত্র। নচেৎ বাস্তবিক আমার জানিবার অনেক বিষয় আছে তাহা জানিয়াও নিজে অহঙ্কার বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে সময়ে সময়ে লজ্জা বোধ হওয়ায় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। বস্তুতঃ আমার জানা কিছুই হয় নাই। জানিবার প্রকৃত বিষয়ই আমার জানা হয় নাই।

এক্ষণে দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ইহারা প্রধান নহে কিসে তাহারই আলোচনা করিয়া দেখি। প্রথমতঃ আমার ইন্দ্রিয়গণের অভাবে শরীর থাকিতে পারে কিনা তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ইন্দ্রিয়গণের অভাবে যে শরীর থাকিতে পারে না তাহা আমার বলা উচিত নহে। দর্শন শক্তির অভাবে অন্ধের যে শরীর নষ্ট হয় তাহাত বলিতে পারি না, বরং অনেক অন্ধকে চক্ষুর অভাবে অপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্য করিয়া শরীর রক্ষা করিতে দেখিয়াছি সুতরাং একটি ইন্দ্রিয় যাইলে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা শরীর রক্ষা হইতে পারে। এরূপ স্থলেও ইন্দ্রিয়েরই প্রাধান্য রহিয়াছে ইহা বলাই আমার উচিত। তবে আমি একবার দেখি যে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতাকে দেহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে আমার দেহ থাকে কিনা। যদি এরূপ অবস্থায় আমার আমি না থাকে তাহা হইলে বুঝিব যে বাস্তবিক ইন্দ্রিয়গণই প্রধান। এবং ইন্দ্রিয়গণ না থাকিলে যদি আমার দেহের অস্তিত্ব লোপ হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণকে প্রধান না বলিব কেন বরং সে স্থলে আমার ইন্দ্রিয়গণকে প্রধান বলাই উচিত।

হায় আমি কি ভ্রমেই পড়িয়াছি। এখন আমি ইন্দ্রিয়গণের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। ইন্দ্রিয়গণের প্রাধান্য কোথায়? প্রাণের অস্তিত্বেই দেহের ও ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব একথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাণ যদি একবার মাত্র ক্ষণিক শিথিলকা ধারণ করেন তাহা হইলে আমার চক্ষু থাকিতেও আমার চক্ষে ঘোলা ও সরিষা ফুল দেখিতে হয় এবং শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ও মন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্তই পড়িয়া যায়, কাহারও কোনও ক্ষমতা থাকে না, তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। এরূপ অবস্থায় আর আমার ইন্দ্রিয়গণের বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রাধান্য কোথায়। আমি ভ্রান্ত জীব, তাই মোহবশতঃ সর্বদা প্রাণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের ও বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সেবায় কালাতিপাত করিতেছি, এবং প্রাণের সেবা ছাড়িয়া অপরাপর বিষয় সমূহকে পূজ্য মনে করিয়া তাহাদের সেবায় যত্ন করিতেছি। একমাত্র প্রাণের সেবা দ্বারা যে সমস্ত (গুণাদি) দেবগণের আমি তুষ্টিসাধন করিতে পারিব তাহা আমার জানা নাই। এই জানা না থাকায় এবং আমার প্রাণের প্রতি আস্থা ও লক্ষ্য না থাকায় আমার যত জ্বালা ও অশান্তি। বস্তুতঃ যুক্তি দ্বারা দেখিতে গেলেও প্রাণের প্রাধান্যই সংসারে দেখিতে পাই, সমস্ত সংসারই প্রাণময় প্রাণই আত্মা, যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ যে প্রাণাস্তে তদাত্মকা ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি রুদ্র, তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ আর যিনি প্রাণ তিনিই আত্মা। এই প্রাণই ঈশ্বর, প্রাণই ভগবান বিষ্ণু। প্রাণকে বিষ্ণু বলিবার কারণ এই যে বিষ্ ব্যাপা, যিনি বিশ্বব্যাপিয়া আছেন তিনিই বিষ্ণুপদ বাচ্য। প্রাণই অন্তরে ও বাহিরে এই চরাচর সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া আছেন এ কারণ প্রাণই বিষ্ণুপদবাচ্য যথা—

প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

এক্ষণে আমার পূর্বোক্ত প্রধান পুরুষ যে প্রাণরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আর আমার কোনও

সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ শ্রীকৃষ্ণকেই জীবের জীবন স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। জীবের জীবনই প্রাণ এবং ইনিই দেহরূপ পুরে শয়ন করিয়া বা বাস করিয়া আছেন বলিয়া ইনি পুরুষ শব্দবাচ্য।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার আর পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রাণ কর্মের নিবৃত্তি অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণপদবাচ্য। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষ এবং প্রকৃতি রাসক্রীড়ার প্রধান দেবতা এবং এই পুরুষ ও প্রকৃতি কৃষ্ণ ও রাধা।

এক্ষণে পূর্বোক্ত পুরুষ প্রধান, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শব্দবাচ্য যখন আমার স্থির হইল, তখন প্রকৃতি বা রাধা কে তাহা জানিলে রাসের অনেকটা জানা হইবে। এক্ষণে প্রকৃতি কে তাহাই জানা যাউক। প্রকৃতি—প্র প্রথম—কৃ করা অর্থাৎ প্রথমে করা প্রধানা বা আদ্যা। এই প্রকৃতি দুই প্রকার নিকৃষ্টা ও পরা। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ গীতা ৭ম অঃ ৪ শ্লোক অর্থাৎ ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি ইহারা নিকৃষ্টা; ইহারাই দেহস্থিত প্রাণকৃষ্ণের অষ্ট সখি তন্ত্রোক্তমতে ইহারাই অষ্ট নায়িকা। ইহা ব্যতীত অপর একটি পরা প্রকৃতি আছে। যথা—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।

জীব ভূতাং, মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা ৭ম অঃ ৫ শ্লোক অর্থাৎ গীতার ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে অষ্ট প্রকৃতি যাহা উল্লেখ আছে তাহা নিকৃষ্ট বিধায় ভগবান্ পরে বলিতেছেন, "হে মহাবাহো! ইহা কিন্তু অপরা বা নিকৃষ্টা, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীব স্বরূপ (চেতনময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি আমার পরা প্রকৃতি এবং যাহা এই জগৎকে ধারণ করিতেছে।" অষ্ট প্রকৃতি যাহা তাহা জড় তাহা অনেকটা বুঝিয়াছি, তাহার পর পরা প্রকৃতি কি তাহাই আমার জানা আবশ্যক। ইহাকে না জানিলে আমার জানিবার সবই বাকি থাকিয়া যাইবে সুতরাং অগ্রে তাহা আমার জানা আবশ্যক। পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবদ্বাক্য যাহা রহিয়াছে তাহাতে দেখিতেছি যে পরা প্রকৃতি জীব স্বরূপ চেতনাময়ী। জীব স্বরূপ কে তাহা না জানিলে আমার জানা হইবে না। কথায় যে জানা হয় বা পুস্তকাদি পাঠে যে জানা হয় তাহা প্রকৃত জানা নহে। কথায় বা পুস্তকাদি পাঠে জানিবার বিষয়টা অবগত হইতে পারিলে তাহার পর সেই বিষয়ে তন্ময় ভাবে সাধন দ্বারা প্রবেশ করিতে পারিলে অনেকটা জানা হইতে পারে, নচেৎ নহে।

প্রথমতঃ জীব কাহাকে বলে তাহাই দেখা যাউক। ইহা জীবতত্ত্ব (Zoology) পড়িয়া এ জীবভাব অবগত হওয়া যায় না। তাহাতে সাধারণতঃ কোন প্রাণীর কি রকম গঠন, কিরূপ আকৃতি, কাহার কি নাম ইত্যাদি মাত্র জানা হইতে পারে। উহার দ্বারা প্রকৃত

জীবভাব, কোন্ পদার্থ জীব শব্দবাচ্য এবং কোন্ বস্তুর অভাবে জীবের জীবত্ব লোপ পায় তাহার বিষয় অবগত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ প্রাণী মাত্রেরই নাম জীব। যাহার প্রাণ আছে তাহাকে প্রাণী কহা যায়, যাহার প্রাণ নাই তাহা শব তুল্য। সুতরাং প্রাণী মাত্রেই জীব শব্দ বাচ্য। প্রাণের অবস্থা জীব অবগত নহে। তবে প্রাণের বাহ্য ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস আছে এই মাত্র কতকটা কেহ কেহ জানে। প্রাণের ক্রিয়া কি তাহা জানিবার আবশ্যক আছে বলিয়াও আমার বোধ নাই। হায় হায় যদি আমার পকেটে একটা কিম্বা দুইটা টাকা থাকে, তাহা হইলে পাছে গাঁট কাটা বা পকেট মারায় আমার গাঁট বা পকেট হইতে আমার অজানিত ভাবে কেহ তুলিয়া লয় এই ভয়ে পথে চলিবার সময় আমার সর্বদাই উক্ত পকেটস্থিত টাকাতে লক্ষ্য থাকে। উক্ত টাকাতে আমার এত যত্ন হইবার কারণ আমার জানা আছে যে উক্ত টাকা বা অর্থ দ্বারা আমি সুখী হইতে পারিব। এই কারণে আমি অর্থাদি টাকা কড়িতে এত যত্ন বা লক্ষ্য করিয়া থাকি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে আমার দেহরূপ পকেটে যে রত্ন রহিয়াছে ও সর্বদা চুরি যাইতেছে তাহার প্রতি ক্ষণার্দ্ধকালও লক্ষ্য করি না বা রাখি না। ইহার অভাবে ধন রত্ন টাকা কড়ি সত্ত্বেও যে আমার সকল সুখ শান্তি আমোদ আহ্লাদ সবই ফুরাইয়া যাইবে এবং কোটি কোটি রত্ন দিলেও সে ধনকে আর পাওয়া যাইবে না তাহাতে আমার লক্ষ্য নাই। সে রত্ন যাহাতে খরচ হইয়া না যায় তাহা দেখি না। উহা যথা খরচ হইয়া যাইতেছে, জমার নামও নাই। যাহার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব তাহার প্রতি ক্ষণার্দ্ধ কালও লক্ষ্য না করায় আমার ন্যায় পাষণ্ড বা মূঢ় কে আছে তাহা বলিতে পারি না।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে জীব প্রাণের অবস্থা অবগত নহে। বাহ্য প্রাণে শ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র আছে বলিয়াই জানে এবং তাহার বিষয়েও সম্যক্ অবগত নহে। এই বাহ্য প্রাণের ক্রিয়াই অর্থাৎ চঞ্চলা প্রাণ শক্তিই মূলা বা পরা প্রকৃতি, ইনিই জীব স্বরূপ এবং প্রধানা বা আদ্যা প্রকৃতি। ইহার দ্বারাই সৃষ্টির কার্য্যসমূহ কৃত হইতেছে বলিয়া ইনি প্রকৃতি, এবং ইনিই রাধা। কারণ রা শব্দে বিশ্ব বুঝায় এবং ধা শব্দে ধারণ করা সুতরাং যিনি বিশ্ব বা জগৎকে ধারণ করেন তিনি রাধা শব্দবাচ্য, অপরে নহে। প্রাণ শক্তির অভাবে জগতের সহিত কাহারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ইহা ধ্রুব সত্য। এই প্রাণ শক্তি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং হংসীরূপা চঞ্চলা প্রাণ শক্তিই একমাত্র রাধা শব্দবাচ্য। রাধা শব্দ মাত্র রাধা নহে, উহা হংসীরূপা প্রাণ শক্তির উপাধি মাত্র। এবম্বিধ রাধাকে সম্বর্দ্ধনারূপ সাধন পূজা দ্বারা জীব নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারে; কারণ হংসীরূপা চঞ্চলা প্রাণ শক্তি রাধাও নির্ব্বাণ দাত্রী।

রাধেত্যেচঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারে দান বাচকঃ।
স্বয়ং নির্ব্বাণ দাত্রীযা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥

রাধা রাধা করিয়া চীৎকার মাত্র-দ্বারা নির্বাণ পদ লাভ হয় না বা পিপাসা ও কাহারও যায়না যেমন জল জল শব্দ মুখে উচ্চারণ করিলে কাহারও পিপাসার শান্তি হয় না।

এক্ষণে উপরোক্ত রাধা নির্বাণ দিতে পারেন কিনা তাহাও আমার জানা আবশ্যক এবং নির্বাণ পদ কাহাকে বলে তাহাও আমার জানা উচিত। কারণ আমার শুনা আছে যে মরিয়া যাওয়ার নামই নির্বাণ মুক্তি কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মৃত্যু কাহার হইবে বা কয়জনের মৃত্যু হইয়া থাকে? সাধারণতঃ দুই দশ হাজার মনুষ্যের মধ্যে দুই একজনের মৃত্যু হইয়া থাকে; এবং মৃত্যুও মনুষ্যের মধ্যে হইয়া থাকে জীবের মধ্যে এরূপ মৃত্যু হয় না, জীবের পক্ষে দেহান্তর প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। এই দেহান্তর প্রাপ্তিকেই জীব-সমূহ মৃত্যু কহিয়া থাকে; বস্তুতঃ ইহা মৃত্যু নহে। কারণ মৃত্যু কাহার হইবে? আত্মা যখন অবিনাশী তখন তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। নির্বাণ অবস্থাই মুক্তিরূপ মৃত্যু, ইহা সাধকের দেহান্তেও হইতে পারে এবং দেহ সত্ত্বেও হইতে পারে। নির্বাণ শব্দের অর্থ কি? নির্ণাস্তি বাণো যস্য, বাণ শরকে কহে।

প্রণ বো ধনুঃ শরো-হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য-মুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।। (উপনিষদ)

এক্ষণে আত্মাকেই শর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে দেখিতেছি এবং পূর্বে যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা আত্মাই একমাত্র প্রাণ শব্দবাচ্য তাহাও বুঝিয়াছি। এক্ষণে বাহ্য প্রাণের চঞ্চল ভাব রহিত অবস্থাই যে নির্বাণ অবস্থা তাহাতে আর আমর সন্দেহ নাই এবং সন্দেহ হইতেই পারে না। সুতরাং রাধাকে যে নির্বাণ দাত্রী বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত নহে, কারণ নির্বাণ অবস্থা পাইতে ইচ্ছা করেন এমন সাধক চঞ্চলা প্রাণ শক্তি রূপা রাধার সেবা রূপ সম্বর্দ্ধন দ্বারা অনায়াসে নির্বাণ অবস্থা যে প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাও অসম্ভব নহে বরং উহা সম্ভব বলাই উচিৎ।

এক্ষণে পুরুষ প্রধান শ্রীকৃষ্ণ কে ও রাধা কে তাহা আমার জানা হইল। এক্ষণে আমার প্রাণ কৃষ্ণের রাস ক্রীড়া যে কি তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। রাস ক্রীড়া আর কিছুই নহে এই ক্রীড়া প্রতি ঘটে ঘটে নিত্য হইতেছে, এই শরীরকেই বৃন্দাবন কহা যায়। বৃন্দাবন চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপী, এই দেহও অর্থাৎ প্রত্যেক দেহ আপনাপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চৌরাশী আঙ্গুলি ইহাই চৌরাশী ক্রোশ, এবং প্রাণাদি পঞ্চকোষ ইহাই দেহরূপ বৃন্দাবন এই দেহরূপ বৃন্দাবনের রাস নিত্যক্রীড়া; এই রাসের রাসেশ্বরী স্বয়ং চঞ্চলা প্রাণ শক্তিরূপা আদ্যা প্রকৃতি এবং রাসেশ্বর পুরুষ প্রধান স্থির প্রাণ রূপ আত্ম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি অষ্ট সখি সহ (অষ্ট সখি যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার) শৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবে যে লীলা রূপ ক্রীড়া করিতেছেন তাহাই রাস শব্দবাচ্য। রাসের প্রাঙ্গণ দেহের সম্মুখে ইন্দ্রজাল রূপ মায়িক জগতের যাবতীয় পদার্থ এবং রাস মন্ডপ দেহ রূপ বৃন্দাবন মধ্যে আজ্ঞাচক্রই ব্রজধাম, ইহাই সত্য লোক বা গোলক ধাম। কণ্ঠের ঊর্দ্ধ ও ভ্রুরমধ্য পর্যন্ত সত্য লোক। বাহিরে লৌকিক ভাবে যে বৃন্দাবনের চিত্র দেখা যায় তাহাতে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হয়। এই কারণে কোনও কোনও বৈদান্তিক

পণ্ডিতেরা বৃন্দাবনের চিত্র সম্বন্ধে অনেক দোষ ধরিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকেন, বৃন্দাবন হইতে মথুরা তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান, বড় জোর তিন চারি ঘণ্টার পথ। এবং ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের ও গোপ বালকগণের যেরূপ প্রেম বা ভালবাসা বর্ণিত আছে তাহাতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীরা সময়ে সময়ে মৃত প্রায় হইতেন। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সপ্তাহের মধ্যে একবার কেহ কি গুপ্ত ভাবেও যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসিতে পারিতেন না? তাহা যখন কেহ যান নাই তখন গোপীদিগের বা গোপবালকগণের প্রেম বা বন্ধুভাব কোথায়? আমার যদি কোনও পরমবন্ধু দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমি বোধহয় প্রত্যহ না পারি অন্ততঃ সপ্তাহে যে দুই দিন যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাতে যদি বলি যে গোপীরা স্ত্রী-জাতি; স্ত্রী-জাতি মাত্রেই অভিমানিনী; গোপীরা অভিমান ভরেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান নাই তাহাতে আর দোষ কি? দোষ যে একেবারেই নাই তাহা নহে। কারণ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবেই দেখিয়া থাকিতেন। সাধ্যা পতিব্রতার নিজ পতির নিকট অভিমান থাকা সম্ভবপর নহে। তাঁহার ত' আর এখনকার মত স্ত্রীলোক ছিলেন না যে সর্বদাই অভিমান ভরে ও অহঙ্কারে পূর্ণ থাকিতেন। আরও বিশেষ মীনের জলের প্রতি যেরূপ প্রেম, পতিব্রতার পতির প্রতি সেই রূপই প্রেম। মীন যেমন জজ ছাড়া হইলেই জলের অভাবে প্রাণত্যাগ করে পতিব্রতাও সেইরূপ পতিছাড়া হইলেই পতির অভাবে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। কই শ্রীকৃষ্ণকে দূরে রাখিয়া কোনও গোপীই ত' দেহত্যাগ করে নাই। তখন গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বাহুল্যতা কোথায়? আজকালও ঐরূপ প্রেম বা ভালবাসার ছড়াছড়ি সাধারণ নারীগণের ভিতরেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এমন স্থলে গোপীদিগের প্রেম আমার অনুকরণীয় হইবার যোগ্য নহে। যশোদারই বা পুত্র স্নেহ কিরূপ? গোপীরা না হয় অভিমান ভরে বসিয়া রহলি, কিন্তু যশোদা-মার প্রাণ-তিনিও কি একবার তাঁহার প্রাণ গোপালকে স্নেহভরে দেখিতে আসিলেন না! তাঁহার মাতৃ স্নেহই বা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি না দেবকী হইলে বোধহয় থাকিতে পারিতেন না। কারণ দেবকীর গর্ভজাত সন্তান, তিনি নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং যশোদার পুত্রস্নেহ যেরূপ হওয়া উচিত তাহা ছিল না ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। বন্ধু বান্ধব না হয় সন্ধান না লইতে পারে, কিন্তু পিতামতা নিজ সন্তান কে না দেখিয়া কখনও থাকিতে পারেন না। পুত্র স্নেহ বশতঃ পিতামাতা যদি নিজ প্রাণ দিয়াও পুত্রকে পান তাহাতেও কুণ্ঠিত হন না ইহাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নন্দ যশোদা মান অভিমানভরে মধ্যে মধ্যে ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন জন্য যাইতেন না। যাঁহাদের এত নিজ মান মর্য্যাদা ও অহঙ্কার বোধ থাকে, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ যে কোনও কালে হইতে পারে সে বিষয়ে আমার দারুণ সন্দেহ। আমার বিশ্বাস নিজ মান মর্য্যাদা যাহারা অত্যধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহাদের নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন বা প্রাপ্তি হইতে

পারে না। এমন অবস্থায় গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, আমি বিশ্বাস করি কিরূপে?

এই সকল কারণে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে লোকে যেমন কৃষ্ণ যাত্রার পালা সাজাইয়া এবং অভিনয় করিয়া সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও পণ্ডিত কর্তৃক গ্রন্থ রচিত হইয়া সাধারণের নিকট বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। দয়ানন্দ, সরস্বতী রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে কংস শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রুরকে প্রেরণ করেন। অক্রুর মথুরা হইতে সূর্য্যোদয় কালে বায়ুর ন্যায় গতি বিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে বৃন্দাবন ধামে উপনীত হন। বৃন্দাবন হইতে মথুরা তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বায়ুর ন্যায় গতিবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া তিন ক্রোশ পথ যাইতে অক্রুরের সূর্য্যের উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত সময় লাগিল। এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে অক্রুর হয়ত কংসালয় মথুরা হইতে বাহির হইয়া ভাগবতের গ্রন্থকর্তার বাটীতে স্নানাহার করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন এবং পরে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্বে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তখন তাড়াতাড়ি পুনরায় যাত্রা করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় বৃন্দাবনে পৌঁছান। বস্তুতঃ বাহ্যিকভাবে বৃন্দাবনের লীলা যাহা বর্ণিত আছে, তাহা দেখিয়া বা পাঠ করিয়া যাঁহারা দোষদর্শী তাঁহারা সমস্তই দোষমুক্ত বলিতে পারেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

পূর্বে বলা হইয়াছে লৌকিক বৃন্দাবন-লীলা ইহাও একটি প্রকৃত বিষয়ের চিত্র মাত্র। মানবকৃত চিত্র কখনও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহার কোনও না কোনও দোষ থাকিবেই। ইহা কেবল মূঢ় জীবকে ধর্ম বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার এবং অজ্ঞানী জীবকে মন্দকার্য্য হইতে বিরত করিবার কৌশল মাত্র। এই সকল লীলার চিত্রাদি দেখিতে দেখিতে যখন চিত্ত ভগবৎ লীলার প্রকৃত ভাব অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ প্রকৃতভাব জানিবার জন্য চেষ্টাও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ভাগ্য প্রসন্ন হইলে প্রকৃত তত্ত্ব কেহ কেহ সাধন দ্বারা জানিতে পারে। এইরূপ অভিপ্রায়েই বাহ্যিক ভাব সকল বর্ণিত আছে। নচেৎ উক্ত বাহ্যিক বৃন্দাবনাদি দর্শন দ্বারা যে কাহারও শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি বা দর্শন হইতে পারে তাহা কখনই নহে। ভগবৎ লীলার মধ্যে যাহা মাথুরভাব (মথুরা লীলা) তাহাও বাহ্যিকভাবে দেখিতে গেলে দোষ পূর্ণ; ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কারণ মাতুল কংসকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য নিজে আয়ত্ত করা ইহা ভগবানের পক্ষে ঠিক কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যিনি ভগবান পূর্ণব্রহ্ম তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া, তাঁহাকে ধর্মজ্ঞান দান করিয়া তাঁহাকে সুবুদ্ধি প্রদান অনায়াসেই করিতে পারিতেন। নররক্তে তাঁহার হস্ত কলুষিত করিবার প্রয়োজন কি ছিল? ইহার উত্তরে আমি বলিতে পারি যে ইহাদিগকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই ভগবান কংসকে নিধন করিয়াছিলেন। কারণ বিষ্ণুর জয় ও বিজয় নামক দুইজন দ্বারপাল ছিল। তাহারা দ্বার ছাড়িয়া না দেওয়ায় ঋষির নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হয় যে তাহারা রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত

হইবে। তৎপরে বিষ্ণুর নিকট উভয়ে গমন করিয়া মিনতি করায় নারায়ণ তাঁহাদিগকে বলেন "যাও তোমরা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ কর, আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিব। যদি তোমরা শত্রুভাবে আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে তিন জন্মে মুক্ত করিব, আর যদি মিত্রভাবে আমার সহিত ব্যবহার কর, তবে সপ্তজন্মে তোমাদিগকে মুক্ত করিব।" তাহার পর সেই জয় ও বিজয় হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং কংস ও শিশুপালরূপে শত্রুভাবে জন্মগ্রহণ করে ও তৃতীয় জন্মে উদ্ধার হয়। রাবণেরই অপর জন্ম কংস বস্তুতঃ ইহা সত্য হইলে যিনি সর্বশক্তিমান্ ভগবান তাঁহার পক্ষে একথা বলাও ঠিক নহে; কারণ ভগবদ্ভক্তের এত লাঞ্ছনা হওয়া ঠিক নহে। যদি জয় বিজয়ের উপর ঋষির কোপ হইয়াছিল বলা হয় তাহা হইলে ঋষির কোপ হওয়াও অসম্ভব। যাঁহাকে ঋষিপদবাচ্য বলা যায় তিনি কি আমার ন্যায় মানব যে তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া অভিশাপ দিবেন? এমন ব্যক্তিকে ঋষিপদবাচ্য বলিতে পারি না। আর যিনি স্থূল শরীরে শূন্যমার্গে গমন করিয়া গোলকধাম পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম, তিনি ত' সাধারণ মানব নহেন ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। আমরাও যদি কোনও বড় বা ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই এবং যদি তাঁহার দ্বারপালের নিকট শ্রবণ করি যে এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, এবং আমিও তাঁহাকে আপনার আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিতে পারিব না কারণ তিনি এখন কোনও বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং এই কারণে দ্বারপাল যদি আমায় অপেক্ষা করিতে বলে এবং সময় হইলেই আমার আগমন বার্তা নিজ প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিবে বলিয়া আমায় জানায়, আমার কি সেই কথায় দ্বারপালকে অভিশাপ দেওয়া বা কটুকাটব্য বলা উচিত? তাহাতে কি নিজের ভদ্রতার হানি হয় না? জয় বিজয়ও সম্ভবতঃ এই ভাবেই বলিয়াছিল। ইহাতে ঋষিচরিত্রকে কলঙ্কিত করা হইয়াছে মাত্র। তাহার পর না হয় ধরিয়া লইলাম যে ঋষির কোপই হইয়াছিল। কিন্তু ঋষির কোপ কতক্ষণ থাকিতে পারে? ঋষি যদি আমার ন্যায় কোপ পরায়ণ হয়েন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। তাহা না হইলে ঋষি নিজের দোষ বুঝিয়া নিজেই বলিতেন, "বাপু! আমি না বুঝিয়া হঠাৎ একটা অভিশাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছি, আমি এখন বুঝিতেছি তোমাদের কোনও দোষ নাই, তোমরা তোমাদের প্রভুর আজ্ঞানুযায়ীই কার্য্য করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ; এক্ষণে আমি বলিতেছি আমার বাক্য কখনও লঙ্ঘন হইবে না, অতএব আমি পুনরায় তোমাদিগকে বর দিতেছি যে তোমরা রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইয়া সামান্য দুই দশ দিনের পর পুনরায় যথাস্থানে নিজকার্য্যে আগমন করিবে।" তাহা হইলেও ঋষির ভদ্রতা বজায় থাকিত। ইহা কি ঋষি করিতে পারিতেন না, না নারায়ণই ইহা করিতে পারিতেন না? আমার বিশ্বাস তাঁহারা নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। তবে ঘটনা ত' এরূপ হয় নাই, সুতরাং করিতে পারবেন কোথা হইতে? বস্তুতঃ এসব কাটানে কথা মাত্র, ইহা প্রকৃত কথা নহে। ইহার ভিতর নিশ্চয়ই রহস্য রহিয়াছে, সেই রহস্য না জানিতে পারিলে প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া যায় না। মাথুর ভাব (মথুরালীলা) কি এক্ষণে তাহাই দেখিয়া লই।

এক্ষণে মথুরা কাহাকে বলে এবং "মথুরা" এই নামই বা হইল কেন তাহাও আমার জানা উচিত। মধু নামক অসুরের যে স্থানে বধকার্য্য সম্পন্ন হয় সেই স্থানকেই মথুরা কহিয়া থাকে। মধু শব্দে (মন্-বোধ করা) যাহা দ্বারা মায়াতে মোহিত হয়; এই মোহরূপ অসুরই মধু নামক দৈত্য। জীব দেহে এই মোহরূপ অসুর সর্বদা বিরাজ করিতেছে। জীবদেহে ইহার স্থান কণ্ঠ হইতে নাভির অধঃ গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ কণ্ঠের অধঃ নাভি পর্য্যন্ত রজোগুণের স্থান এবং নাভির অধঃ গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত তমোগুণের স্থান এই রজস্তমোগুণের স্থানেই আসুরিক ভাব বর্তমান থাকে, ইহাই মথুর নামে অভিহিত, ইহাই প্রকৃত মথুরাপুরী। বর্তমানে ইহা কংসালয় হইয়া আছে। কংস—(কম্-বাঞ্ছা করা, ইচ্ছা করা) ইহা আসুরিক-ভাবের ইচ্ছা, ইহা সতত আত্মবিরোধী ভাবে আত্মজ্ঞান নাশের জন্য সতত চেষ্টিত। সুতরাং সতত রজস্তমোগুণের নানা বিষয়াভিলাষরূপ অবস্থাই কংসাসুর নামক দৈত্য। এই কংস আত্মজ্ঞানের বিনাশ সাধন জন্য অক্রুরকে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণকে আনয়ন জন্য প্রেরণ করেন। জীবভাবে সকাম কর্মকেই প্রশস্ত মনে করিয়া আসুরিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানারকম স্বর্গাদি ফল কামনার সহিত কর্ম করণে ইচ্ছুক থাকে। সকাম ধর্ম বজায় থাকিতে ইচ্ছার নাশ হয় না। ইচ্ছার নাশ যাহাতে না হয়, তাহাও আসুরিক ভাবের একান্ত ইচ্ছা থাকায় নিষ্কাম-কর্ম যাহাতে উচ্ছেদ হয় এই কারণে সর্বদাই আত্ম-কর্মের ও আত্ম-জ্ঞানের নাশ জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা আসুরিক ভাবের স্বাভাবিক ধর্ম।

কর্ষণ ক্রিয়ার নিবৃত্তি অবস্থাই "কৃষ্ণ" পদবাচ্য ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রাণের কর্ষণ ক্রিয়ারূপ সাধনের উচ্ছেদ মানসে, কর্ষণ ক্রিয়ার নিবৃত্তি অবস্থারূপ কৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ যাহাতে সাধকের হৃদয়ে কর্ষণ ক্রিয়ার নিবৃত্তি অবস্থা প্রকাশ না পায় অপ্রকাশই থাকে এই অভিপ্রায়ে আসুরিক ভাবের ইচ্ছারূপ কংস অক্রুরকে মিত্র বোধে প্রেরণ করেন। অক্রুর ব্যতীত অপরের কৃষ্ণ সমীপে যাওয়াও সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ ক্রূর ভাবরূপ খলতা সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থাকিতে প্রাণের স্থির অবস্থারূপ আত্মা নারায়ণের সমীপস্থ হওয়া যায় না ইহা নিশ্চয়। সুতরাং ক্রূরভাব শূন্য অবস্থার প্রয়োজন। সেই ক্রূরভাব শূন্য অবস্থাই অক্রুর ভাব। জীবভাবের ইচ্ছারূপ কংসাসুর বাহ্যিক অক্রুর ভাবের সহায়তা দ্বারা প্রাণকৃষ্ণের স্থির ভাবকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দেহস্থিত বৃন্দাবন ধামে স্থির প্রাণরূপ কৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ জীব দেহে দৈবভাব ও আসুরিক ভাব উভয় ভাবই বর্তমান থাকে। এই উভয় ভাবের পরস্পর বিরোধ দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে। কখন আসুরিক ভাব দৈবভাবকে পরাস্ত করিয়া আসুরিক ভাব প্রধান হইতেছে, আবার কখনও বা দৈবভাব আসুরিক ভাবকে নষ্ট করিয়া দৈব ভাব প্রধান হইতেছে। এইরূপ পরস্পর যুদ্ধ দেহ মধ্যে সর্বদাই হইয়া থাকে। জীবের লক্ষ্য তাহাতে না থাকায় জীব তাহা বুঝিতে পারে না। আসুরিক বলের সৈন্য আসুরিক সম্পদ যথা দম্ভ, দর্প অভিমান অতি পূজ্যত্বভিমান, কাম (কামনা) ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অহঙ্কার

(দেহাভিমান) মাৎসর্য্য, ইচ্ছা, হিংসা, দ্বেষ, তৃষ্ণা, দুরাশা প্রভৃতি; ইহারাই আসুরিক সম্পদ এবং ইহাদের দ্বারা জীব আসুরিক ভাবে অবদ্ধ হইয়া দেবভাবকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। দৈব ভাবের বল দৈবীসম্পদ; দৈবীসম্পদগুলি দৈবভাবের সৈন্য স্বরূপ। দৈবী সম্পদ কি কি তাহাও আমার জানা আবশ্যক। প্রথ অভয় অর্থাৎ ভয়শূন্যতা বা চিত্ত প্রসন্নতা; ২য় আত্মজ্ঞানের উপায়েনিষ্ঠা; অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে নিষ্ঠা; ৩য় দান অর্থাৎ সাত্ত্বিক দান; ৪র্থ ইন্দ্রিয় সংযম; ৫ম যজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, কারণ প্রাণ যজ্ঞ ব্যতীত অপর যজ্ঞ সকল বাহ্যিক যজ্ঞ (ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌতত্তুভূয়তে। ব্রহ্মাগৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম তদুচ্যতে)। ৬ষ্ঠ আত্মধ্যান, তপস্যা বা তপলোকে থাকা; ৭ম সরলতা; ৮ম অহিংসা; ৯ম সত্য; ১০ম অক্রোধ; ১১শ ত্যাগ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম; ১২শ শান্তি অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিরূপ অবস্থা; ১৩শ খলতাশূন্যতা অর্থাৎ অক্রূরভাব; ১৪শ সর্বভূতে দয়া; ১৫শ লোভশূন্যতা; ১৬শ অহঙ্কার রাহিত্য; ১৭শ কুকর্ম প্রবৃত্তিতে লজ্জা; ১৮শ চাপল্যশূন্যতা; ১৯শ তেজ; ২০শ ক্ষমা; ২১শ ধৈর্য্য; ২২শ বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ; ২৩শ আপনাকে অতিপূজ্য বলিয়া যে অভিমান তাহার অভাব এইগুলিই দৈবী সম্পদ এবং ইহারা আসুরিক ভাবকে পরাজয় করিতে সক্ষম। অক্রূরও দৈবী সম্পদের মধ্যে। ইচ্ছারূপ কংসাসুর স্থিরত্ব শক্তির নাশজন্য নিজ আলয়েস্থিত অক্রুরভাবকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে অক্রুর সূর্য্যোদয় কালে মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া পবনবেগে রথ চালনা করিয়া সূর্য্যাস্তের পর বৃন্দাবন ধাম যথায় শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি তথায় উপস্থিত হন। বাহ্যিকভাবে মথুরা বৃন্দাবন হইতে তিন ক্রোশ মাত্র। এই ক্রোশ শব্দ কোষ শব্দের অপভ্রংশরূপে লিখিবার দোষে "কোষ" শব্দ "ক্রোশ" শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা ক্রোশ নহে "কোষ" মাত্র। আত্মা পঞ্চময় কোষে আবৃত থাকায় জীবভাবাপন্ন। এই পঞ্চ কোষাতীত ভাবই পরমাত্ম-ভাব। জীবই শিব। অক্রূরভাবাপন্ন জীবরূপ সাধকের নিজ শরীরই রথপদবাচ্য (আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং অথ উচ্যতে)। বর্তমান শরীরও বায়ুবেশে চালিত হইয়া থাকে। ১৭২৮ সংখ্যা উত্তম প্রাণায়ামে সাধকের ধ্যানাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ধ্যানাবস্থা প্রাপ্তেচ্ছু সাধক সূর্য্যোদয় কালে আপন শরীরস্থ হৃদয়াসনে মনকে বসাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে ১৭২৮ বার উত্তম প্রাণায়ামের সংখ্যা শেষ হইতে সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। অর্থাৎ একটি প্রাণায়ামে ২৫ সেকেন্ড সময় লাগিলেও ১২ ঘণ্টার কমে ১৭২৮ উত্তম প্রাণায়াম হয় না।

১৭২৮ প্রাণায়ামের সংখ্যা পূর্ণ কালে শরীরস্থ আজ্ঞাচক্রে ভূর মধ্যে সাধকের কুটস্থ দর্শনলাভ হইয়া থাকে। এবং তখন সাধক তাহাতেই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাই জীবরূপ অক্রূরভাবের সাধক দ্বারায় দেহরূপ বৃন্দাবনের মধ্যে আজ্ঞাচক্রেই আত্মরূপ কুটস্থ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের ধামে আগমন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কূটস্থ সমীপে আপন মনোভাব জ্ঞাপন করাই অক্রুর সংবাদ। বাহ্যিকে ইহার রূপক ভাব প্রকাশ আছে। অপ্রাকৃত ভাবকে বাহ্যিকে প্রকাশ করিতে যাইলে কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই থাকিবে। বাহ্যদৃষ্টি সম্পন্ন মানব

মাত্রেই কোনও বিষয় বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে যাইলে উহাতে দোষ আছে বলিয়া দৃষ্ট হইবেই। শ্রীকৃষ্ণকেও বাহ্যিক ভাবে আনয়ন করিয়া নন্দের নন্দন ইত্যাদি কর্ম্মজ জ্ঞানশূন্য পণ্ডিতগণ শ্লেষবাক্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননা। ইঁহারা যে কেহই দূরদর্শী নহেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সাধন দ্বারা দূরদর্শী হইলে আর শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে সামর্থ্য থাকিত না। নারায়ণের লীলারহস্য প্রণিধান করা সাধন সাপেক্ষ। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কাহারও নন্দন নহেন তাহা ঠিক। কারণ "নন্দন কাহারও নহেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।" যিনি স্বয়ং নায়ক তিনিই পরম কারণ। ইহা বুঝিবে কয়জন। তিনি সকল ঘটে ঘটে প্রাণরূপে থাকিয়া অনিচ্ছার ইচ্ছায় লীলাময়ের লীলা অহরহঃ খেলিতেছেন। এই লীলারহস্য সাধন ব্যতীত শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা জ্ঞাতব্য নহে। শাস্ত্রাদি গ্রন্থকারগণ ভিতরকার ভাব যাহা সাধন ব্যতীত প্রণিধান করিবার উপায় নাই তাহারই কতক অংশ বহির্ভাবে অজ্ঞ জীবকে সাধন পথে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে জীবের মঙ্গলের জন্য যতটুকু সম্ভব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ এইভাবেই গাহিয়া গিয়াছেন "চাতারে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে।" অক্রুরও কোনও মানব নহেন ইহা সত্য। অক্রূর দৈবীসম্পদের মধ্যে একটি উচ্চাবস্থারূপ সম্পদ বিশেষ। এই অক্রুর ভাবরূপ সম্পদ যে সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বা শ্রীকৃষ্ণ সমীপে যাইবার অধিকার আছে। এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই বাহ্যভাবে গ্রন্থকার লীলার বর্ণনচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার যেরূপ ভাব তিনি তদনুরূপ বুঝিবেন তাহাতে গ্রন্থকারের দোষ কি?

অক্রুর ভাব মনে উদয় হইলে স্থির শক্তির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহার পরই প্রাণ কৃষ্ণ মথুরাধামে গমন করিয়া অর্থাৎ নিজ দেহ স্থিত সত্ত্বগুণের স্থান হইতে, কংসালয় মথুরাধামে অর্থাৎ রজস্তমগুণের মধ্যে প্রকাশ হইয়া প্রাণক্রিয়ার বর্হিমুখী গতি ফিরাইয়া অর্ন্তমুখ গতি বিস্তার দ্বারা স্থির শক্তি বলে ইচ্ছারূপ কংসবধ পূর্বক দেবকীর বন্ধনমোচন করিয়া কুব্জা মালিনীর সহিত মিলিত হইলেন। মথুরামথ-মন্থন বা বিলোড়ন, উর— অবতীর্ণ হওয়া, অর্থাৎ মন্থন কার্য্য জন্য যেখানে তিনি অবতীর্ণ হন তাহাই মথুরা ধাম অর্থাৎ জীব হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আসুরিক ভাবের মন্থন করিয়া কুব্জা মালিনীর সহিত তাঁহার মিলন হয় এবং কুব্জার কুব্জভাব তিনি দূর করেন। মালিনী শব্দের অর্থ আদ্যা প্রকৃতি ভগবতী। প্রকৃতি শব্দের অর্থ বেদমাতা। সাবিত্রী, রাধিকা, দুর্গা, ষষ্ঠী, মনসা, গঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় দেবীগণ একই প্রকৃতির নানা উপাধিমাত্র, বিষয় একই। ইহাতে একটা সন্দেহ আমার মনে আসিতেছে। আমার জানা আছে দুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতি হরের রমণী বা শক্তি, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি কিরূপে হইতে পারেন? কিন্তু আমার স্মরণ রাখা উচিত যে হর ও হরি পৃথক নহেন; দুই নামই একই পুরুষের নানা আখ্যা বা নানা উপাধি মাত্র। যেমন শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, ইহাও তদ্রূপ। নাম উপাধিমাত্র। একটি বিষয়ের নানা উপাধি হওয়া অসম্ভব নহে। বরং সম্ভব। এক এক অবস্থার জন্য কেবল নামান্তর মাত্র, নচেৎ বিষয় পৃথক নহে। আদ্যাশক্তিরূপা প্রাণশক্তির বক্রভাবই কুব্জভাব, যাহা জীব দেহে বর্ত্তমানে রহিয়াছে। পদরূপ হংসের বিস্তার রূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থিরত্বের অনুভব বা প্রকাশ

হইলে এই কুব্জভাব বা চঞ্চল প্রাণের বক্রগতি বা বর্হির্মুখী গতি তিরোহিত হয় এবং তখনই আসুরিক বলের বা আসুরিক সম্পদের ধ্বংসসাধন স্থিরপ্রাণরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সংসাধিতে হইয়া থাকে। এবং রজস্তমগুণের নিবৃত্তি অবস্থায় সত্ত্বগুণের দৈবীবল প্রধান হইয়া থাকে। এবং সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হেতু আত্মজ্ঞান প্রকাশে ইচ্ছারূপ কংস নিধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইলেই ভবকারাগারে মাতাস্বরূপা প্রকৃতি অষ্টপাশে বন্ধন অবস্থা হইতে মুক্তা হইয়া মূলা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। মাতা হবৈঃ প্রাণঃ ইতি শ্রুতি। প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি; এই তিন দেবতাই তিন গুণ সত্ত্ব; রজঃ ও তমঃ। দিব্ শব্দে আকাশ, ক শব্দে মস্তক, ঈ শব্দে শক্তি, শূন্য স্বরূপ প্রাণকে মস্তকে স্থির করিলে যে অবস্থা হয় তাহাই দেবকী শব্দবাচ্য। এই অবস্থাই স্বপ্রকৃতির মুক্তাবস্থা বা স্বাভাবিক অবস্থা। নির্ম্মল জ্যোতিঃ স্বরূপা কুণ্ডলীনি বায়বী শক্তিরূপা; মুলাধারে নিদ্রারূপ মোহভাবে তিনি আবদ্ধা হইয়া আছেন। এই শক্তিকে সহস্রার রূপ মস্তকে স্থিতি করিলেই ইঁহার দেবভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহাই দেবকীর কারামুক্ত ভাব এবং ইহাই প্রকৃত মাথুর ভাব। এই মাথুরভাবের রহস্য সংক্ষেপে বলা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহাতে যে আমার মাথুর ভাব প্রণিধান হইল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ কথায় প্রণিধান হইবার নহে। তবে একটা নূতন কথা শুনিলাম এই মাত্র বলিতে পারি। আমার জড় বস্তুর ভাব অন্তরে থাকিতে এবং জড় বস্তুতে ক্রিয়াবোধ ও আসক্তি থাকিতে আমার জড়ভাবই ভাল লাগিয়া থাকে; সূক্ষ্মভাব ভাল লাগা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। জড় বাহ্যিক ভাব ব্যতীত যে সূক্ষ্ম ভাব আছে বা থাকিতে পারে তাহা আমার শুনাও ছিল না জানা ত' অনেক দূরের কথা। যাহা হউক ইহাতে আমার আর একটা নূতন রকমের কথা শুনা হইল এবং কথাটা যে অগ্রাহ্য তাহাও বলিতে পারি না। তবে যাহাতে আমার উপরোক্ত ভাব সকল প্রণিধান হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করা আমার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ এ পর্য্যন্ত আমি কেবল জড় বিষয় লইয়া কালাতিপাত করিতেছি; এক্ষণে আমি কি করি তাহাই অমার বিবেচ্য বিষয়। রাসলীলা বা মাথুরভাবের কথা শুনিয়া যে আমার সন্দেহের অবসান হইল তাহা নহে। কারণ আমি নানা বিষয়ে শুনিয়া ও নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া একটা কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া আছি। আমার জ্বালার অবসান হওয়া দূরের কথা বরং জ্বালা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। আমার এ জ্বালাার মূল "জগৎ ও আমি।" আমি কে তাহাও আমার এখনও প্রকৃত জানা হয় নাই। কতকটা আভাস মাত্র পাইয়াছি তাহাতে আমার জানা হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। পূর্বোক্ত কথায় জগৎ যে মায়িক বা ইন্দ্রজাল বা মরীচিকা বিশেষ তাহাও বলিতে

পারি না। কারণ আমি মরীচিকা দেখিতেছি না ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার বিশ্বাস আমি স্বাভাবিক দেখিতেছি এবং তাহা আমার ভ্রম নয়। আমার ভ্রম যতক্ষণ না যাইবে ততক্ষণ আমি জগৎকে মরীচিকা বলিতে পারি না। মরুভূমিতেই মরীচিকা দর্শন হয়। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আমার বর্ত্তমান ধারণা যে ভ্রম তাহা বুঝিতে হইলে আমার প্রথমে জানা উচিত আমি কোন্ অবস্থায় আছি এবং সেই অবস্থায় থাকার জন্য আমার এ ভ্রম আসিতেছে কিনা। সেই অবস্থাকে না জানিয়া কেমন করিয়া বলি যে জগৎ মরীচিকাবৎ আমার ভ্রম দর্শন হইতেছে। একারণ অগ্রে আমার সেই অবস্থা জানাই উচিত। যে অবস্থায় পতিত হওয়ার জন্য আমার এই ভ্রম উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই এক্ষণে আমার আলোচ্য বিষয়। আমার ইহা আলোচ্য বিষয় হইলেও আমার পক্ষে তাহা বিষম সমস্যা বোধ হইতেছে। কারণ আমার অবস্থা জানিতে গেলে, অগ্রে আমি বা আমার কি বা কে, এবং আমি কোথা হইতে আসিলাম তাহা জানা উচিত। তাহার পর আমার কোন্ অবস্থা মরুভূমি বা মায়ার অবস্থা তাহাই বা জানিব কি প্রকারে? ইহা জানাও আমার এক প্রকার অসম্ভব। বস্তুতঃ অসম্ভব বলিয়া চুপ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকাও আমার উচিত নয়। অসম্ভব কথাটা আমার মনে রাখাই উচিত নয়। প্রথম হইতেই অসম্ভব বোধ হইলে বা থাকিলে, কোন কার্য্যই আমি করিতে সক্ষম হইব না। একারণ অসম্ভব কথাটা আমার মন হইতে মুছিয়া ফেলা উচিত। আমার মনে রাখা উচিত যে আমার দ্বারা সকলই সম্ভব এবং এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি চলিতে পারিলে, তখন আমার নিকট সকলই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইবে। কারণ যদি কেহ আমায় কোনও কার্য্য করিতে বলে এবং সে কর্ম্ম আমার জানা না থাকার জন্য আমার দ্বারা উহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বোধে যদি উহা আমি না করি, তাহা হইলে সকল কার্য্যই আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু যদি আমার জানা না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মনের বলের সহিত উহা আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সেই কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব। কারণ লোকমুখে যতটুকু সম্ভব ততটুকু অবগত হইয়া সেই কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই কর্ম্মই আমাকে কর্ম্মের জ্ঞান প্রদান করিবে অর্থাৎ কর্ম্ম করণের দ্বারা কর্ম্মেই বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও কর্ম্ম কেন না আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে? তখন অসম্ভব কোথায়? বস্তুতঃ অসম্ভব কিছুই নাই সবই সম্ভবপর কিছু না কিছু কৃতকার্য্য ত' হইতে পারিব। এমতস্থলে আমার "আমিকে" জানিতে যাওয়াটা অসম্ভব নহে, বরং সম্ভবপর।

আমি ত' সবই সম্ভবপর বলিলাম; এক্ষণে আমার "আমির" ধরি কি? আমার বা আমি বলিলেই আমার হস্তপদাদি বিশিষ্ট শরীরের উপরই নজর পড়ে। যখন আমার আমিকে না জানিলে আমার অবস্থা বোধ হইবার নহে, তখন আমার আমিকে জানিতেই হইবে। এবং এক্ষণে বিশেষরূপে বুঝিতেছি যে আমার আমিকে না জানিলে আমার যে

জ্বালা জন্মিয়াছে তাহাও যাইবার নহে। এমন অবস্থায় "হয় আমার আমিকে জানা হউক, নচেৎ শরীর পতন হউক, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই।" এরূপ দৃঢ়তা না হইলেও আমার আমিকে প্রকৃতরূপে জানা হইবে না। তখন আমার ঐরূপ দৃঢ়তা সহকারে জানিবার জন্য অগ্রসর হওয়া নিতান্ত কর্তব্য; তাহা না হইলে আমার নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়াটা কি বিড়ম্বনার বিষয় নহে। আমার আমিকে জানার পর জগৎ সত্য কি মিথ্যা তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব। এখন আমার জগৎ থাকুক, অগ্রে জগৎকে জানিতে গেলে আমার কিছুই জানা হইবে না। সুতরাং আমার আমিকে বিশদরূপে আমার শরীরের সহিত অগ্রে জানিয়া লওয়া যাউক তাহার পর অপর কথা।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমার "আমি কে" দেখিতে গেলেই আমার শরীরের উপর নজর পড়ে। আমার শরীরটি ঠিক যেন একটি সেতার যন্ত্রের ন্যায়। সাধারণতঃ আমি যে সেতার যন্ত্র দেখিয়াছি, তাহার গঠনের সহিত অবশ্য ইহা ভিন্ন দেখা যায়, বাহিরের সেতার একটি ফাঁপা অর্দ্ধাকৃতি কাষ্ঠ দণ্ডের নিম্নদেশে একটি অর্দ্ধকৃতি অলাবু নিবদ্ধ থাকে; কাষ্ঠদণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে কয়েকটি কান সন্নিবেশিত থাকে (পূর্ব তিনটি কাণ থাকিত, এক্ষণে লয় সুরের সাহায্য জন্য বাদকের ইচ্ছামত ঐ কাণের সংখ্যা বেশী করা হইয়া থাকে) অলাবুর বক্ষদেশে অস্থিনির্মিত বা কাষ্ঠনির্মিত একখানি আসন (সোওয়ারী) থাকে। কাষ্ঠদণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে যে সকল কাণ থাকে তাহাতে তার লাগাইয়া উক্ত আসনের (সোওয়ারী) উপর দিয়া ঐ তার অলাবুর নিম্নদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অবশ্য নিম্নে ঐ সকল তার বন্ধন করিবার জন্য একটি খুঁটি থাকে। এবং কাষ্ঠদণ্ডের বক্ষঃস্থলে একুশ খানি লোহার বা পিতলের ঘাট বা পরদা থাকে। ইহাই সাধারণ সেতার। তাহার পর কাণ টিপিয়া সুর বাঁধিয়া আপন আপন ইচ্ছামত অনুরাগের রাগ রাগিণী লোকে বাজাইয়া থাকে। সেতার শব্দ পারসিক ভাষা, উহা বাঙ্গালা বা সংস্কৃত নহে। বাদসাহের আমলে ত্রিতন্ত্রীর নামকে সেতার করা হয়। ত্রিতন্ত্রী সংস্কৃত নাম; ত্রিতন্ত্রী নাম বদলাইয়া বাদসাদিগের আমালে তাঁহাদের ভাষানুযায়ী সেতার নাম রাখা হয়। "সে" শব্দের অর্থ— তিন অর্থাৎ সেতার অর্থে তিন তার এবং বাদসাহগণের আমল হইতেই ত্রিতন্ত্রী সেতার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। আমার এ শরীর সেতারের মত বটে কিন্তু ইহা উল্‌টা রকমের দেখিতেছি। আমার এ উল্‌টা সেতারের বোলও উল্‌টা, ইহা বাজানও উলুটা, ইহার সবই উল্‌টা। বাহিরের সেতার আঙ্গুলে মেজরাফ পরিয়া তারে ঠোকর দিয়া বাজাইতে হয়, আমার এ দেহরূপ সেতারে মেজরাফ আবশ্যক হয় না। আমার এ উল্‌টা সেতারের অলাবু ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত, ইহা সাধারণ অলাবু (লাউ) নহে। মস্তকই অলাবু স্থলে রহিয়াছে। এই মস্তক হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত একটি দণ্ডও রহিয়াছে, সে দণ্ডটি মেরুদণ্ড বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার সহিত তিনটি বায়ুরূপী তারও সংলগ্ন রহিয়াছে, সে তার তিনটি তিন রঙ্গের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা ঈড়া, পিঙ্গলা ও

সুষুম্না বা বায়ু পিত্ত কফ। সাধারণ সেতারে যেমন তিনটি গ্রাম থাকে, আমার দেহরূপ সেতারেও সেইরূপ তিনটি গ্রাম আছে এবং তিন গ্রামে একুশখানি পরদারূপ গ্রন্থিও আছে। তারা মুদারা, উদারা এই তিন গ্রাম, আমার শরীরের মধ্যেও উহা রহিয়াছে যথা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। কণ্ঠের উর্দ্ধে স্বর্গ, কণ্ঠের অধঃ নাভি পর্য্যন্ত মর্ত্য, নাভির অধঃ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত পাতাল এবং সপ্তসুরও রহিয়াছে। সপ্তস্থান হইতে সপ্তসুর বাহির হইয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামেই সপ্তসুর রহিয়াছে। তিন সাতে একুশখানি ঘাটও রহিয়াছে। সহস্রার, আজ্ঞা, বিশুদ্ধ, অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান এবং মূলাধার ইহাই সপ্তসুরের প্রকৃত স্থান এবং এই সকল স্থান হইতে স্বর বাহির হইয়া বাহিরের সুর, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তসুর উত্থিত হয় এবং ইহারাই বাহিরের সপ্তসুর। শরীরেরও তিন গ্রামের তিন স্থানে এইরূপ চক্ররূপী ঘাট সকল রহিয়াছে। অবশ্য ইহা জীবের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকে এবং জীবের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ ইহারা সকলেই বায়ুরূপী অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা গঠিত, যাঁহারা মূলাধার-গ্রন্থী-হৃদয়গ্রন্থী ও জিহ্বাগ্রন্থী ভেদ করিয়াছেন তাঁহারা এ রহস্য বুঝিতে সক্ষম, অপরে নহে। স্বর প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া বিশেষ। এই স্বর উর্দ্ধে যাইলে উদাত্ত; নিম্নে যাইলে অনুদাত্ত এবং মধ্যে থাকিলে স্বরিৎ কহা যায়। উক্ত স্বর কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি হইতে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতভাবে ধ্বনিত হইয়া থাকে। যাহার উচ্চারণকাল এক নিমেষ মাত্র উহাকে হ্রস্ব বলে, দীর্ঘ উচ্চারণে তাহার দ্বিগুণ কাল এবং প্লুত উচ্চারণে তাহার ত্রিগুণ কাল লাগিয়া থাকে। আমার দেহরূপ সেতারের বোলরূপ কথা সকল যাহা বাহির হইয়া থাকে অর্থাৎ উচ্চারণ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই স্বর বা সুর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বর সকল উরঃ কণ্ঠ, শির জিহ্বামূল দন্ত, নাসিকা, তালু এবং ওষ্ঠ এবং সকল স্থান হইতে স্বর বা সুর বর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। আমার শরীররূপ সেতারের সুর এক রকমই বাঁধা আছে সুতরাং ইহাতে আর কাণ টিপিয়া সুর বাঁধিতে হয় না। তবে জোয়ারি (ঘাট) পরিষ্কার না থাকায় ঠিক বোল বা ধ্বনি বাহির হয় না। জোয়ারি রূপ ঘাট সকল পরিষ্কার না থাকায় আবোল তাবোলরূপ বোল বা ধ্বনি বাহির হইয়া থাকে সে বোল সকল কাহারও ভাল লাগে না। যেমন বেসুরে বেতালা বাদ্য কাহারও ভাল লাগে না; ইহাও তদ্রূপ। আমার এ শরীররূপ সেতারের জোয়ারিরূপ ঘাট পরিষ্কার করা প্রথমেই আবশ্যক। কারণ জোয়ারিরূপ ঘাট পরিষ্কার না থাকিলে প্রকৃত বোল বাহির হইবে না। জোয়ারিরূপ ঘাট পরিষ্কার করিয়া তাহার পর স্বরের জ্ঞানলাভ করিয়া সুর ঠিক করিলে প্রকৃত ধ্বনি বাহির হইবে। ধ্বনি ঠিক হইলে তাহার পর তাল ও লয় ঠিক করিতে হইবে। তাল অপর কিছুই নহে, ধ্বনি কালকে আশ্রয় করিয়া চলিয়া থাকে। কালের প্রকৃত জ্ঞান না থাকিলে তালও ঠিক হয় না। কাল ও ধ্বনি উভয়ের লয় স্থানই বাহিরের বাদ্যের লয় এবং ইহাকে সাধারণে সোম কহিয়া থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমার দেহরূপ সেতারে ধাতু নির্ম্মিত তার সংলগ্ন নাই। ইহাতে পবন অর্থাৎ বায়ুরূপী তার সংলগ্ন আছে; সুতরাং বায়ুরূপী তারে আঘাত করিতে যাইলে অঙ্গুলি দ্বারা হইতে পারে না কারণ বায়ু অঙ্গুলির দ্বারা ধরা যায় না। বায়ুরূপী তারে আঘাত করিতে হইলে বায়ু দ্বারাই আঘাত করিতে হইবে। তবে প্রকৃত ধ্বনি বাহির হইবে যে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হয়, এমন কি দেবতাগণ ও ঋষিগণও মোহিত হইয়া থাকেন। আপনাতে আপনি তন্ময় হইয়া যান। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমার এই দেহরূপ সেতারের সবই উল্টা। ইহাকে বাজাইতে হইলে, উল্টা পবনের টোকর দ্বারা মধ্যম তারে আঘাত করিতে হয় তবেই ইহার প্রকৃত ধ্বনি বাহির হয়। সেই ধ্বনিই নারদাদি ঋষিগণের বাঞ্ছনীয়। ঋষি প্রবর নারদ এই দেহরূপ ত্রিতন্ত্রীই বাজাইতেন এবং ধ্বনির সাহায্যে জীবসমুহকে জ্ঞান উপদেশ দিয়া ব্রহ্ম বিদ্যা শিখাইতেন। নারদ শব্দের অর্থও তাই অর্থাৎ যিনি মনুষ্যসমূহকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করেন। তিনই নারদ শব্দবাচ্য, অপরে নহে। নারদ কি একটা অলাবু ও কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা নির্মিত ত্রিতন্ত্রী বা সেতার ঘাড়ে করিয়া বেড়াইতেন? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তাহা হইতেই পারে না। একথা বলিলে ঋষিকে কলঙ্কিত করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কাষ্ঠ নির্মিত সাধারণ ত্রিতন্ত্রী বাজাইয়া বেড়াইতেন না ইহা নিশ্চয়। নারদ শরীররূপ সেতার বাজাইয়া প্রণব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে সেই জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা মনুষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ধ্বনি শ্রবণকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ ওঁকার ধ্বনি শ্রবণৈঃ বিশেষণ প্রতিপন্না নিশ্চিতা) তে তব বুদ্ধিঃ সমাধৌ (সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্) নিশ্চলা (বিষয়ান্তরৈঃ অনকৃষ্টা) অতএব অচলা (অভ্যাস পটুত্বেন তত্রৈব স্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞানম্ অবাপ্স্যসি)।

অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি যখন অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাস পটুতা দ্বারা স্থির থাকিবে, তখন তুমি যোগ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত হইবে। নারদ শরীররূপ যন্ত্রের মধ্যে যে ত্রিতন্ত্রী রহিয়াছে, অভ্যাসবলে সাধন দ্বারা তিনি তাহা বাজাইয়া প্রণব ধ্বনি শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিও এই ওঁকারধ্বনি এবং শরীরই বংশী। বাঁশের বাঁশী তিনি বাজাইতেন না। যে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া জগতের জীবসমূহ মোহিত হয় তাহা বাঁশের বাঁশী বা কাষ্ঠের বাঁশী হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই বংশীধ্বনি এই প্রণবধ্বনি এবং জীব দেহই শ্রীকৃষ্ণের বংশী। যাহা হউক বর্তমানে আমার শরীরের কার্য্য যে ভাবে হইতেছে, ইহার সব বিষয়ের উল্টা না করিতে পারিলে প্রকৃত ধ্বনিরূপ বোল

বাহির হইবে না । আমার শরীর মধ্যস্থ বায়ুরূপী তার বর্তমানে যে ভাবে চলিতেছে তাহার উল্টা করা চাহি, নচেৎ আমার প্রকৃত ধ্বনিরূপ বোল ও তাহা হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ হইবে না। এই উল্টা ভাবকেই লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কবির গাহিয়াছেন "উল্টা নাম্ জগৎ জগ্ জানা, বাল্মিকি হুয়া ব্রহ্ম সমানা।" বাল্মিকিও উল্টা করিয়া লইয়া নাম জপ্ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাম নামের উল্টা জপ করিয়া যে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল তাহা নহে। কারণ "রাম" শব্দ উপাধি মাত্র, উহা রাম নহে। রমার সহিত যিনি সদা রমণ করিতেছেন, তিনিই একমাত্র প্রকৃত রাম শব্দবাচ্য। অর্থাৎ যিনি আদ্যা প্রকৃতির সহিত রমণ করিতেছেন, তিনিই রাম অর্থাৎ পুরুষ প্রধান স্থির প্রাণরূপ আত্মা রাম। ইহার উল্টা করিলেই ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরই লাভ হইতে পারে। সোজায় হইবার নহে বা পাইবার নহে। আমার সোজা রামকে উল্টা করিয়া চালাইতে পারিলেই প্রকৃত বোল বাহির হইতে পারে এবং ধ্বনিরূপ বোল প্রতিপন্ন হইলে তখন বোধগম্য হইবে নচেৎ নহে। আমার এই বোলের বা ধ্বনির কোনও অলঙ্কার নাই। আমিও কোনও অলঙ্কার দ্বারা আমার দেহরূপ সেতারের বোলকে বাজাইতে চাহি না। অর্থাৎ আমার দেহরূপ সেতারের বোল সাধারণের প্রিয় হইবে এই অভিপ্রায়ে উহাকে কোনও প্রকার অলঙ্কার দ্বারা সাজাইতে চাহি না। কারণ অলঙ্কার দ্বারা প্রকৃত সুন্দর বিষয়ের সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়। এবং অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়ায় প্রকৃত সুন্দর বিষয়ে ততটা লক্ষ্য পড়ে না।

আমার এই দেহরূপ সেতারের বোলের কোনও বাহ্য অলঙ্কারও নাই; অলঙ্কার না থাকিও আমি অপরের নিকট হইতে ধার করা অলঙ্কার লইয়া আমার ঐ বোলকে সাজাইয়া বাহির করিতে ইচ্ছুক নহি। সুতরাং যাঁহারা বাহ্য অলঙ্কার প্রিয়, তাঁহাদের নিকট যে আমার শরীররূপ সেতারের বোল প্রিয় হইবে সে আশা আমার নাই। অপরের নিকট আমার এই দেহরূপ সেতারের বেল প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই; কোনও একটি বিষয় সকলেরই প্রিয় হইতে পারে না। যাহা আমার প্রবৃত্তির বিরোধী তাহা যেমন প্রকৃত ভাল হইলেও আমার ভাল লাগে না বরং উহাকে মন্দ বলিয়াই বিবেচনা করি, আমার দেহরূপ সেতারের বোলও তদ্রূপ অনেকের নিকট অপ্রিয় হইতে পারে। প্রবৃত্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত, অপর বিষয় আমার নিকট কখনও ভাল লাগিতে পারে না। সুতরাং দেহরূপ সেতারের বোল যে সকলেরই প্রিয় হইবে বা হইতে পারে যে কথা আমি বলিতে পারি না, বরং উহা না হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার এত বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই, তবে আমার শরীরের সহিত আমার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তাহাই আমার জানা আবশ্যক, এবং তাহার পর আমার সমস্ত অবস্থার ভাব যাহাতে প্রকাশ পায় তাহাই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার বর্ত্তমান শরীরের সহিত আমার উৎপত্তি ও আমার গর্ভবাস

আমার বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারা আমার আমি শব্দের ও আমার শরীরের সহিত আমার শরীরস্থ যাবতীয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইত্যাদি সমস্তই উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য আমার বর্ত্তমান কর্ম্মশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ আমার বর্তমান কর্ম্মরহিত অবস্থায়, আমিও নাই, আমার শরীরাদিও নাই এবং থাকিতেও পারে না। এক্ষণে কোন্ কর্মের অভাবে আমার শরীরাদি থাকিতে পারে না, তাহা আমার জানা উচিত। যাহা করা যায় তাহাই কর্মপদবাচ্য। আমি যে কর্মের কথা এখানে বলিতেছি, তাহা আমার হস্তপদাদি বা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কৃত যে কর্ম তাহা নিশ্চয়ই নহে। কারণ হস্ত পদাদি বা ইন্দ্রিয়গণের কৃত কর্ম মুখ্য-কর্মপদবাচ্য নহে, উহা গৌণ—কর্মপদবাচ্য। কারণ আমার বর্ত্তমান কর্মের অভাবে আমার হস্তপদাদি ও ইন্দ্রিয়গণের কৃত সমস্ত কর্মই রহিত হইয়া যায়, সুতরাং ইহা গৌণকর্ম মাত্র। হস্তপদাদি বা ইন্দ্রিয়গণের কৃতকর্ম ব্যতীত, আমার বিনা চেষ্টায় ও বিনা যত্নে, আমার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং আমি কর্ম করিব না বলিলেও যে কর্ম স্বতঃই আমি করিয়া যাইতেছি আমি সে কর্মের কথাই বলিতেছি এবং সেই কর্মই একমাত্র আমার বর্ত্তমান কর্মপদবাচ্য। ইহাই অজপারূপ বর্ত্তমান প্রাণকর্ম; ইহার অভাবে হস্তপদাদি মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই পঙ্গু। এবং সেই জন্যই ইহাদের দ্বারা কৃতকর্ম গৌণকর্ম পদবাচ্য। অজপারূপ প্রাণকর্ম যাহা আপনা আপনি চলিতেছে, এই অজপারূপ বর্ত্তমান প্রাণকর্মের উৎপত্তি স্থির প্রাণরূপ অব্যক্ত অক্ষর ভাব হইতে। "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবঃ।" ইতি গীতা। স্থিরপ্রাণের অবস্থা মুখে সম্পূর্ণ রূপ ব্যক্ত করা যায় না এই কারণে উহাকে অব্যক্ত বলা হইয়া থাকে অজপারূপ প্রাণকর্মের তিনটি অবস্থা আছ; প্রথমটিকে আদি অবস্থা, দ্বিতীয়টিকে মধ্যঅবস্থা এবং এই মধ্যাবস্থাই অজপাভাব এবং তৃতীয়টিকে অন্ত অবস্থা কহা যায়। এই তিনটি অবস্থায় মধ্যে আদি ও অন্ত অবস্থা অব্যক্তভাব, নিজ বোধরূপ অর্থাৎ নিজের অনুভবনীয়, মুখে ব্যক্ত করা যায় না, সেইজন্য ইহাদিগকে অব্যক্ত বলা হয়। যেমন কোনও বোবাকে কোন দ্রব্য খাইতে দিলে, ঐ বোবা সেই খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ নিজে বুঝিলেও উহা মুখে ব্যক্ত করিতে পারে না কিন্তু আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, তদ্রূপ অজপারূপ প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার অতীতাবস্থারূপ আদি ও অন্ত অবস্থা জীবের পক্ষে অব্যক্ত। আদি ও অন্ত অবস্থা উভয়ই তুল্যাবস্থা; উভয় অবস্থাই স্থির ও শূন্য স্বরূপ। শূন্য স্বরূপ বলাতেও প্রকৃত বলা হইল না; কারণ শূন্য স্বরূপ বলাতে শূন্যের মত বা শূন্যের তুল্য বুঝাইল। কিন্তু শূন্যই যে আমার বোধগম্য বিষয় নহে। সুতরাং শূন্যের মত বা তুল্য বলায়, বলা আর না বলা উভয়ই সমান।

তবে কিছু বলা চাহি, তাই বলা হয় স্থির বা শূন্য স্বরূপ। এই জন্যই উপরে বলা হইয়াছে যে ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ যোগ্য নহে এবং স্থির প্রাণের অবস্থা নিজ বোধরূপ অব্যক্ত অবস্থা। বর্ত্তমান অজপারূপ প্রাণের প্রাণই স্থির প্রাণরূপ অব্যক্ত অক্ষর ভাব। "অব্যক্তাৎ জায়তে প্রাণঃ।" ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র অর্থাৎ অব্যক্তরূপ স্থির প্রাণ হইতে অজপারূপ প্রাণকর্ম প্রকাশ হইলেন। ইহা স্থির প্রাণের আদি ও অন্তভাবের মধ্য অবস্থা, এই মধ্যাবস্থাই ক্ষর ভাব ও ব্যক্তভাব এবং ইহাই মূলা প্রকৃতি। প্র—প্রকৃষ্টরূপে, কৃ—করা, অর্থাৎ যাঁহা কর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টিক্রিয়া অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই অজপারূপা প্রকৃতি অনাদি। স্থিরপ্রাণরূপ প্রধান পুরুষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। স্থির প্রাণকে প্রধান পুরুষ বলিবার কারণ এই যে ইনি দেহরূপ পুরে শয়ন (শি—শয়নকরা) করিয়া রহিয়াছেন সুতরাং পুরুষ, এবং প্রধান বলিবার কারণ এই যে তাঁহার উপর আর কেহই প্রধান নাই। সুতরাং স্থির প্রাণরূপ আত্মা প্রধান পুরুষ পদবাচ্য। ইনি সাধারণ স্ত্রী বা পুরুষ আকার বিশিষ্ট দেহ নহেন; ইনি দেহী, দেহ নহেন। জগৎ প্রকাশের মূল কারণ রূপা প্রকৃতি স্থির প্রাণরূপ আত্মার চিৎঅংশের অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ আত্মার চিৎজ্ঞানরূপ সংজ্ঞার ছায়ার সহযোগে, এই অনিত্য নাট্যকার মনের কল্পিত জগতের সহিত যাবতীয় স্থাবর জঙগম ও প্রাণি সমূহের উৎপত্তি বা প্রকাশ সাধন করিয়া থাকেন। এই অজপারূপ প্রাণকর্ম উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট লিঙ্গ শব্দ লিন্ম্ গমন করা। অজপারূপ প্রাণও বমাবর্ত্তন ও দক্ষিণাবর্ত্তন গতি দ্বারা, বাম ও দক্ষিণ নাসিকার দ্বার দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন, এই কারণে ইহাকে উভয় লিঙ্গ বলা হইয়া থাকে এবং বামাবর্ত্তন ও দক্ষিণাবর্ত্তন গতির আলোড়ন বিলোড়ন (মন্থন) ক্রিয়াদ্বারা, স্ত্রী ও পুং চিহ্ন বিশিষ্ট জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই কারণেও অজপারূপ বহিঃপ্রাণ শক্তিকে উভয় লিঙ্গ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অজপারূপ বহিঃপ্রাণে একাধারে পুরুষ প্রকৃতি উভয় ভাবই বর্তমান, সুতরাং অজপারূপ বহিঃপ্রাণ উভয় লিঙ্গ বাচ্য।

এই অজপারূপ বহিঃপ্রাণকে ভগবান পদবাচ্য বলা যাইতে পারে। প্রমাণ যথা—

"ভগ আর বান্ দুই পুরুষ প্রকৃতি।
এ কথা শুনিয়া কার হইবে প্রতীতি"॥

ভগ শব্দর অর্থ—পরাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি এবং এই পরাপ্রকৃতি যাঁহার আছে তিনিই ভগবান পদবাচ্য। পূর্বে বলা হইয়াছে যে দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করিয়া থাকেন তিনি পুরুষ পদবাচ্য। স্থির প্রাণরূপ আত্মাই দেহরূপ পুরে শয়ন করিয়া আছেন, সুতরাং তিনিই পুরুষ পদবাচ্য এবং এই স্থির প্রাণরূপ আত্মার ক্রিয়াশক্তিই প্রকৃতি পদবাচ্য। অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ আত্মা পুরুষ এবং প্রাণের ক্রিয়াশক্তিরূপা পরা প্রকৃতি উভয়ে অনাদি কাল হইতে দেহরূপ পুরে জড়িত ভাবে থাকায় স্থির প্রাণরূপ আত্মাপুরুষকেই ভগবান বলা হইয়া থাকে। ইহা উন্নত অবস্থা ইহা সাধকের প্রতীতি হওয়া অসম্ভব নহে, বরং সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়, তবে সাধারণ জীবের প্রতীতি হওয়া অসম্ভব।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে অজপারূপ প্রাণকর্মের তিনটি অবস্থা আছে এবং তাহা আদি, অন্ত ও মধ্য অবস্থা; ইহার মধ্যে আদি ও অন্ত অবস্থা অবিনাশী বা অক্ষর ভাব অর্থাৎ ইহার বিনাশ বা ক্ষয় নাই। অজপারূপ প্রাণকর্ম যাহা বর্তমানে চলিতেছে তাহাই মধ্য অবস্থা, এই মধ্যবস্থাই ক্ষরভাব এবং ব্যক্তভাব এবং ইহার আদি ও অন্ত অবস্থা বর্তমানে জীবের নিকট অব্যক্তভাব। অজপারূপ বর্তমান মধ্যাবস্থা যাহা চলিতেছে ইহাই মহামায়ারূপিণী। এই অজপারূপা মহামায়া কর্তৃক, আমি আমার বোধের সহিত মরীচিকাবৎ আমার শরীররূপ জগৎ এবং বহির্জ্জগৎ আমার মনের সম্মুখে প্রতিভাসিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমার বর্তমান মন আমার আদি বা অন্ত অবস্থায় ছিল না। আমার বর্তমান অজপারূপ মধ্য অবস্থাতেই আমার বর্তমান শরীরের সহিত আমার বর্তমান মনের উৎপত্তি হইয়াছে। আমার মধ্যাবস্থারূপা অজপাই যোগমায়া রূপা প্রকৃতি। এই যোগমায়ারূপা প্রকৃতির প্রভাবে জীবসমূহ আমি আমার বোধের সহিত ভ্রান্তভাবে পশুবৎ চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যবস্থার অতীতাবস্থারূপ অবিনাশী স্থির প্রাণে চৈতন্যরূপ সংজ্ঞা বর্তমান আছেন। কিন্তু বর্তমান থাকিলে কি হইবে, বর্তমানে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যবস্থারূপা যোগমায়ার প্রভাবে উহা জীবের অলক্ষ্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আমার অজপারূপ মধ্যাবস্থার বর্তমানে তাহা লক্ষীভূত হইবার নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে অজপারূপ বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থাই স্থির প্রাণের অবস্থা। এই স্থির প্রাণের উৎপত্তিও নাই নাশও নাই। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাশও আছে এবং যাহার নাশ আছে তাহার উৎপত্তিও আছে। স্থির প্রাণরূপ আত্মার উৎপত্তিও নাই সুতরাং নাশও সম্ভবপর নহে। অথবা নাশ করেই বা কে? কারণ স্থির প্রাণরূপ আত্মার ভাব অক্ষর ও অবিনাশী। তবে যে আমি উৎপত্তি ও নাশভাব দেখিয়া থাকি তাহার প্রধান কারণ আমার সংজ্ঞার অভাব। আমার অজপারূপ মধ্যাবস্থার প্রবাহধারা অবিচ্ছেদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় অজপারূপ মধ্যাবস্থা কর্তৃক ধারাবাহিক রূপে অজপার তনু বিস্তার রূপ ক্রিয়া দ্বারা সন্তান (সম্-তন্ বিস্তার করা) সন্ততির উৎপত্তি ও নাশ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা অজপার মধ্যাবস্থা রূপিণী যোগমায়ার ফল স্বরূপ। এই মধ্যাবস্থাই ক্ষরভাব বা নাশশীল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই অজপার ক্ষরভাব হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার নাশও অবশ্যম্ভাবী। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাশও আছে। তবে এ নাশভাবও অবস্থান্তর মাত্র। যেমন ঘটের নাশে ঘটকাশের নাশ সম্ভবপর নহে, বা জলবুদ্‌বুদের নাশে জলের নাশ হয় না ইহাও তদ্রূপ। অজপারূপ প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ অব্যক্ত ভাবের অনিচ্ছার ইচ্ছায় আপনাতে আপনি রমণ হওয়ায় যেমন অরণ্য মধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভাবে আপনাতে আপনি রমণ হওয়ায় (ইহাই আত্মারামের রমার সহিত রমণরূপ আত্মক্রীড়া ইহা নিজ-বোধরূপ অবস্থা) তেজ বৃদ্ধির সহিত বৃহৎ কূটস্থের প্রকাশ হইল। এই বৃহৎ কূটস্থ মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রই মহৎ ব্রহ্মরূপ যোনিস্থান অর্থাৎ ইহাই ব্রহ্মযোনি এবং ইহাকে মাতৃকাও কহা যায়।

ইহা জীবের জীবনীশক্তির প্রধান আধারস্থান। এইস্থানে কিঞ্চিৎমাত্র আঘাত লাগিলেই জীবের জীবনের অবসান হয় এবং ইহাই যোগীগণের একমাত্র অবলম্বন স্থান। ইহা ভ্রূর পশ্চাতে আজ্ঞাচক্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্না গহ্বরের কেন্দ্রস্থল এবং ইহা ঈড়া ও পিঙ্গলার অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসাপুটদ্বয় স্থির বায়ুরও আধার স্থল। এইস্থানে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে জীব আদি ও অন্ত অবস্থার জ্ঞানলাভ করিয়া ত্রিকালজ্ঞ হয়। ইহাকে ডাক্তারী মতে মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা (Medula oblongata) কহিয়া থাকে। জীবের দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান এই স্থান হইতে হইয়া থাকে। সাধন দ্বারা এই মাতৃকার দৈবী শক্তি উদ্ধার করিতে হয়, বর্তমানে ইহা আসুরিক শক্তিতে পরিণত রহিয়াছে। যাহা হউক স্থির প্রাণ রূপ আত্মা এই ব্রহ্মযোনিতে গর্ভ সঞ্চার করিয়া থাকেন।

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।

(গীতা ১৪শ অধ্যায় ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা এই গর্ভমধ্যে অণু স্বরূপে বিন্দুরূপে (বিন্দু অবয়বীভূত হওয়া) অবয়বীভূত হইলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্থির প্রাণরূপ আত্মার সংজ্ঞা বর্ত্তমান আছে। এই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে আদিত্যও বলা যায়। এই স্থির প্রাণ রূপ আদিত্যের সপ্তাশ্বযুক্ত অর্থাৎ সপ্ত প্রকার জ্যোতিঃ বিশিষ্ট রথে অর্থাৎ শরীরে (আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথ উচ্যতে) অজপারূপা পরা-প্রকৃতির সহিত অনিচ্ছার ইচ্ছায় রমণ হওয়ায় অর্থাৎ স্থিরত্বের সহিত অজপারূপা চঞ্চলা- প্রকৃতির আলোড়ন বিলোড়নরূপ মন্থন ক্রিয়ার ঘর্ষণে, স্থিরপ্রাণ হইতে দ্বিধাভাবে স্থিরমনরূপ মনু হইলেন (মনু-মন বোধ করা) এবং মনবী (শতরূপা) হইলেন। বলা বাহুল্য স্থির প্রাণরূপ আত্মা অবয়বীভূত হইবার সময় স্থির প্রাণরূপ আত্মার তেজোরূপ গতি সহ্য করিতে না পারায় সংজ্ঞা আপন ছায়াকে রাখিয়া তোজোরূপ গতির বৃদ্ধি সময়ে অন্তর্হিতা হইলেন। (স্থির প্রাণরূপ আত্মার এই তেজোরূপকেই আদিত্য বলে), সংজ্ঞা রহিল না, সংজ্ঞার ছায়া মাত্র রহিল। সংজ্ঞাহীন অবস্থাই অজ্ঞানভাব এবং এই অজ্ঞানই সংজ্ঞার ছায়া অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতিভাব এবং ইহাই এক্ষণে বর্ত্তমান রহিল এবং ইহাই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার প্রকৃতিস্থ ভাব। বলা বাহুল্য যে স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাচৈতন্য স্বরূপ, সত্ত্বাদি গুণ রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত এবং সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, দ্বেষ প্রভৃতিতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা রহিত। অজপারূপা মূলা বা আদ্যা প্রকৃতি অচেতনা, ত্রিগুণযুক্তা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণ ইহাতে (অজপারূপা প্রকৃতিতে) আছে; এবং ইহা বীজধর্ম্মিণী অর্থাৎ মহদাদি চতুবিংশত্রি তত্ত্ব সমূহের বীজস্বরূপা, এবং প্রসব-ধর্ম্মিণী অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার সহিত আলোড়ন বিলোড়ন রূপ মন্থন ক্রিয়া দ্বারা বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়া চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এবং অহঙ্কারাদি ক্রমে স্থাবর জঙ্গম ও জগতের জীবসমূহের প্রসবিত্রী এবং সুখ দুঃখ ভোগে উদাসীনা

নহেন, সুতরাং সুখ দুঃখ ভোগরতা। গুটিপোকা যেমন আপনার লালে আপনি আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা উপরোক্ত প্রকারে প্রকৃতিস্থ হইয়া সংজ্ঞাহারা হইয়া সংজ্ঞার ছায়াকেই সংজ্ঞা বোধে অজ্ঞানে উপগত হইয়া আত্মবিস্মৃতিভাব প্রাপ্ত হয়েন এই স্থিরপ্রাণ অজপারূপা প্রকৃতির ভিতর অবস্থিতি করিয়াই সমস্ত তত্ত্বের সহিত অণু স্বরূপে বিন্দুরূপে অবয়বীভূত হইয়া প্রকাশ হইলেন। এই বিন্দু চন্দ্রকলা রসে পুষ্ট হইয়া শরীরাকৃতি ওঁকার রূপ দেহ হইল। এই ওঁকার রূপ সূক্ষ্ম দেহ কূটস্থ গহ্বর মধ্যে ব্রহ্মযোনিতে স্থিতিলাভ করিল। কূটস্থ গহ্বর মধ্যে ত্রিকোণাকার যন্ত্র যাহা দেখা যায় তাহাই ব্রহ্মযোনি (বিন্দুচক্র) পদবাচ্য। এই ত্রিকোণাকার যন্ত্র মধ্যে (যাহার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল) যে পুত্তলিকাবৎ চিত্রটি অঙ্কিত আছে তাহাই ওঁকার রূপ সূক্ষ্ম মানব শরীর।

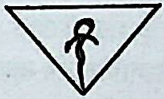

ইহাই ব্রহ্ম যোনি মধ্যে ওঁকার রূপ সূক্ষ্ম শরীরের চিত্র।

ইহাকে ওঁকাররূপ শরীর কহা যায়। ইহা সাধন দ্বারা নিজ বোধরূপ হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং ইহা কল্পনার বিষয় নহে।

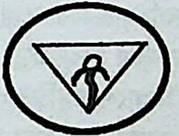

বিন্দু চক্র ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির স্থান এবং নাদমণ্ডল

উপরোক্ত ওঁকার রূপ শরীর মধ্যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব অণু স্বরূপে বর্তমান আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত এবং তৎপঞ্চতন্মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তাহার পর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও তিনগুণ বিন্দুরূপে ওঁকার রূপ শরীরে সূক্ষ্ম ভাবে বর্তমান আছে। এই বিন্দুই শরীর রূপে প্রকাশ পায় সুতরাং বিন্দুই বীজ স্বরূপ। ত্রিকোণাকার যন্ত্রই ব্রহ্মযোনি বলিয়া উপরে উক্ত হইয়াছে, এই ব্রহ্মযোনি গর্ভাধানে স্থানাগর্ভ পঞ্চ মহাভূতের বিকার ভাব অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ (জল) ও পিত (মৃত্তিকা) এই পঞ্চ মহাভূতের বিকার ভাবকেই গর্ভ কহা যায়। প্রথম উৎপত্তি স্থানই ব্রহ্মযোনি যাহাকে পূর্বে ত্রিকোণাকার যন্ত্র বলা হইয়াছে এবং উহাকেও ক্ষেত্ররূপ যোনিস্থান বলা যাইতে পারে। "ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী, বীজভূতো স্মৃতঃ পুমান্। ক্ষেত্রবীজ সমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব দেহিনাম্"।

স্থির প্রাণরূপ আত্মাই বীজ স্বরূপ পিতা, ইহা হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট হওয়ায় ইনি সংজ্ঞা ভ্রমে সংজ্ঞার ছায়াতে উপগত হইয়া প্রথমে মনু ও মনবির উৎপত্তি সাধন করিলেন এবং তাহার পর জড়ভবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইতে হইতে এক্ষণে প্রায় অনন্তে পরিণত হইয়াছে। এরূপ স্থলে আমি আমাকে আদি পুরুষও বলিতে পারি।

কারণ পিতাই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্র পিতার রূপান্তর মাত্র (আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ) পিতাই পুত্ররূপে স্ত্রী জঠরে রূপান্তর ভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এই কারণে রমনীকেও জননী কহা যায়। "রমনী জননী, জননী রমণী।" প্রকৃতি কর্তৃক গুণাদির ব্যতিক্রমে এই রূপান্তর ভাব হইয়া থাকে, অজ্ঞ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ একই সূত্রে সমস্তই গ্রথিত রহিয়াছে। যেমন পুষ্প মাল্যের মধ্যে যে সূত্র থাকে উহা একই বস্তু, মাল্যের পুষ্প বিভিন্ন প্রকার হইলেও যেমন সূত্রের মধ্যে বিভিন্নতা নাই, তেমনই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা সর্বঘটে মাল্যের সূত্রের ন্যায় সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন। "সূত্রে মণিগণা ইব।" ইতি গীতা। পিতার স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা বীজ বা শুক্ররূপে স্ত্রীজঠরে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তানে পরিণত হয়। শুক্র প্রাণের ঘনীভূত অবস্থা বিশেষ; "শুক্র ধাতু ভবেৎ প্রাণঃ। পঞ্চীক রস যোগে শূন্য স্বরূপ প্রাণে চারিটি মহাভূতের অংশ মিলিত হইয়া এবং ষড় রস যুক্ত হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহা ওজঃ ধাতুরূপে ব্যান বায়ুর সহিত বায়ুরূপে মিলিতভাবে থাকে, তাহার পর তেজ এবং বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া শুক্রাধার নীত হইয়া অবস্থিতি করে। তাহার পর স্থূলভাবে রমণ ক্রিয়ার দ্বারা শুক্রাধার হইতে শুক্র ক্ষরণ হইয়া যোনিদ্বার দিয়া যথা সময়ে অর্থাৎ নারীর ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ দিন মধ্যে জরায়ু মুখে প্রবিষ্ট হয়। প্রকৃতির অভূতপূর্ব ক্রিয়া কৌশল যোনিমধ্যে বিদ্যমান। যোনিস্থানটির নিম্নাংশ সঙ্কুচিত এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত। ইহার ভিতরটি একটি নলাকার গহ্বর বিশেষ; ইহা জরায়ুর যে স্থান হইতে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া হইতে থাকে সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যোনির সম্মুখ দেশে মূত্র নিঃসরণ পথ এবং পশ্চ্যাদ্দেশে মল নিঃসরণ পথ। যোনিমুখে তিনটি নাড়ী জরায়ু মধ্যে অবস্থিত আছে। যোনিদ্বারের উপরিস্থিত সূক্ষ্মাগ্র একটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড যাহা আছে, তাহাকে ভগঙ্কুর কহে; ইহা শিশ্নের ন্যায় উত্থানশীল ও পতনশীল। কামোদ্বেগ বশতঃ বায়ু কর্ত্তৃক ইহাতে রক্ত চালিত হইয়া, ইহা অল্পেতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইহাও অজপারূপা প্রকৃতির ক্রিয়া কৌশল। তাহার পর জরায়ু। জরায়ুকেই গর্ভাশয় কহা যায়; ইহা পদ্ম পুষ্পের ন্যায়। সাধারণ নারীগণ ইহাকে পো নাড়ী বা পদ্ম কহিয়া থাকে। মৃণালের সহিত পদ্ম পুষ্প যেমন দেখায়, ইহাও প্রায় তদ্রূপ; তবে পদ্মের মৃণাল অপেক্ষা জরায়ুর সহিত সংলগ্ন মাংসদণ্ড কিছু মোটা তবে খুব মোটা নহে ফাঁপা এবং পশ্চাদ্দেশ ও সম্মুখদেশ কিছু চেপ্টা জরায়ুর উর্দ্ধ দেশে দুই পার্শ্বে দুইটি অণ্ড আছে; ইহাকেই জরায়ু কোষ কহা যায়। জরায়ু কোষস্থিত দুইটি অণ্ড দেখিতে প্রায় ডিম্বের ন্যায়। জরায়ু বা পো নাড়ীর দৈর্ঘ্যে

প্রায় তিন বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ, কুমারীগণের বা যাহাদের সন্তান হয় নাই, তাহাদের জরায়ুর দৈর্ঘ্য ইহার অর্দ্ধেক।

উপরে বলা হইয়াছে যে জরায়ুকে গর্ভাশয়ও কহা যায়। শুক্র সংযোগে ইহার মধ্যে অর্থাৎ জরায়ু মধ্যে ভ্রূণ উৎপন্ন হয় এবং পুষ্টিলাভ করে, এবং প্রসব কালে ইহা হইতেই ভ্রূণ বহিঃ নিঃসারিত হইয়া থাকে। স্থূলরমণ ক্রিয়া দ্বারা শুক্রাধার হইতে শুক্র ক্ষরণ হইয়া জীবাণুরূপে ঐ শুক্র জরায়ু মুখে প্রবিষ্ট হয়। তাহার পর জরায়ু নীড় মুখ হইতে আপন বায়ুর কম্পন ও আকর্ষিণী শক্তি দ্বারা জীবাণু কুক্ষিস্থানে অর্থাৎ জরায়ুর বা গর্ভাশয়ের বস্তি গহ্বরে নীত হয় এবং তথায় স্থিত হইলেই গর্ভাধান হইল। এই বস্তি গহ্বর সূক্ষ্ম চর্ম্মের থলি বিশেষ এবং এই থলি ক্রমশঃ ভ্রূণের বৃদ্ধির সহিত জলে পূর্ণ হয়। গর্ভাধানের পর গর্ভস্থ সুতিকাধামে (অর্থাৎ গর্ভাশয়ে) গর্ভস্থিত বীজরূপে স্থিরপ্রাণ প্রথমে বিন্দুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আর্ত্তব শোণিত দ্বারা ক্রমণঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। গর্ভাশয়স্থিত বিন্দুরূপ জীবাণু বা বীজাণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কিরূপে জন্মায় তাহাও আমার জানা উচিত। গর্ভাশয়স্থিত বিন্দুরূপ জীবনাণুর মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদয়ই অণু স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে, স্ত্রীআর্ত্তব শোণিতের দ্বারা উহা পুষ্টিলাভ করে মাত্র। আমার ইহাও জানা থাকা আবশ্যক যে স্ত্রী শুক্রের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি নাই, এবং তদ্দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হইতেও পারে না এবং হইবার আবশ্যকও থাকে না, কারণ জীবাণু বা বীজাণুতে সমস্তই সূক্ষ্ম রূপে বর্ত্তমান থাকে। যেমন একটি বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে একটি বটবৃক্ষ অণু স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে তদ্রূপ। বটবীজ বা অপর কোনও বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে, উহা যেমন মৃত্তিকার রস মাত্র গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করতঃ অণুস্বরূপ হইতে কালে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া থাকে এবং ঐ বৃক্ষের কাণ্ড (গুঁড়ি) বা শাখা পল্লবাদি কোনও অংশই যেমন মৃত্তিকার রস হইতে জন্মায় না, কিন্তু পুষ্টিলাভ করে মাত্র তদ্রূপ মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি মাতা স্বরূপা প্রকৃতির রস হইতে অর্থাৎ আর্ত্তব শোণিত হইতে জন্মায় না, তবে প্রকৃতি স্বরূপা মাতা হইতে বিন্দুরূপ বীজাণু পুষ্টি লাভ করতঃ নরাকারে প্রকাশ হইয়া থাকে মাত্র। প্রকৃতি কর্ত্তৃক পুষ্টি লাভ করে বলিয়া অর্থাৎ জীবসমূহ চঞ্চলাপ্রাণ শক্তি রূপা প্রকৃতি পুষ্টি লাভ করে বলিয়া, কারণ চঞ্চলা প্রাণ শক্তি দ্বারাই আর্তব শোণিত বীজাণুর মধ্যে নীত হইয়া উহার পুষ্টিসাধন করে এবং এই কারণে প্রকৃতির অপর নাম স্ত্রীরূপা জগদ্ধাত্রী। যাঁহার দ্বারা জগতের লালন পালন কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে তাঁহাকেই জগদ্ধাত্রী কহা যায়। প্রাণ শক্তির অভাবে দেহের পুষ্টি অসম্ভব এবং প্রাণ শক্তির দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধিত হয় বলিয়া এই প্রাণ শক্তিকেও জগদ্ধাত্রী বলা যায়। তবে ক্ষেত্র স্বামী যদি অনুর্বরা বা কঙ্করাকীর্ণ ভুমিতে বীজ রোপণ করেন তাহা হইলে যেমন উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় না তদ্রূপ মানবের পক্ষেও অনুর্বরা ক্ষেত্রে অর্থাৎ অনম্রা, মুখরা, চঞ্চলা, চপলা, নির্দয়া নির্লজ্জা, কুটিলা, ইন্দ্রিয় পরায়ণা, অবিদ্যাগতা বা অবিদ্যা স্বরূপা, পতি দ্রোহিণী, অধার্মিকা, রুগ্না বা হিংসাপরায়ণা

স্ত্রী রূপক্ষেত্রে ও সৎগুণ সম্পন্ন সন্তান প্রত্যাশা করা সম্ভবপর নহে। ক্ষেত্র উপরোক্ত দোষ যুক্ত হইলে সন্তানও তদনুরূপ হইয়া থাকে যেমন বর্তমানে হইতেছে। আমার ক্ষেত্র যদিও সর্ব গুণ সম্পন্ন হয়, কিন্তু বীজ যদি অপক্ক বা দোষ যুক্ত হয় বা বীজ রোপণ কর্তা যদি উপরোক্ত প্রকার দোষযুক্ত হন বা বীজ যদি দুর্বল বা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট বা তিথি নক্ষত্রাদি দোষ সংযুক্ত হয় তাহা হইলেও উৎকৃষ্ট ফল লাভ আশা করা যায় না। এ কারণ ক্ষেত্র ও বীজের সর্বতোভাবে সংশোধন হওয়া আবশ্যক। কারণ বীজ মধ্যে পিতার সমস্ত গুণ বা দোষই বর্তমান থাকে। আসুরিকভাবে বর্তমান অবস্থায় যদি বীজ গ্রহণ বা ক্ষরণ হয়, তাহা হইলে আসুরিক সম্পদ যুক্ত সন্তানই হইয়া থাকে, কিন্তু দৈবীভাবযুক্ত অবস্থায় উহা ঘটিলে দৈবী সম্পদ যুক্ত সন্তানই হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট ফল লাভের আশায় দ্বার পরিগ্রহ করা হয় না, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্যই দ্বার পরিগ্রহ করা হইয়া থাকে, সুতরাং ফলও তাদৃশই হইয়া থাকে; সুফল লাভ হয় না বরং পরিণামে ফল রূপ সন্তান হইতে অসহ্য জ্বালাই প্রাপ্ত হইতে পায়। এ কারণ প্রথমে নিজেকে দৈবীভাবাপন্ন করিয়া পরে ক্ষেত্ররূপা স্বপ্রকৃতিকেও করিয়া লইয়া তাহার পর ফল লাভের চেষ্টা করাই সকলেরই কর্তব্য। তাহা না হইলে নরপশুই উৎপন্ন হইবে, তাহাতে না পিতার লাভ আছে, না জগতে কোনও উপকার আছে। ইহাতে কেবল নর পশুর সংখ্যাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে নচেৎ অপর কাহারও কেনাও লাভ নাই। সন্তানের সঙ্গ দোষ না ঘটে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক, কারণ সঙ্গ দোষে নানা প্রকার দোষযুক্ত হওয়া সম্ভব, সঙ্গ দোষে সৎ পুত্রও অসতে পরিণত হইয়া থাকে।

যাহা হউক এক্ষণে আমার মনে আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। প্রশ্নটি এই যে বীজ যদি একই প্রকারের হইল, তখন একই প্রকার বীজ হইতে, স্ত্রীচিহ্ন বিশিষ্ট এবং পুং চিহ্ন বিশিষ্ট উভয় প্রকার সন্তান কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে? স্ত্রীগণের গোঁফদাড়িই বা কেন হয় না, এবং পুরুষের স্তনচিহ্ন থাকিয়াও স্ত্রীলোকের ন্যায় ঐ স্তন বর্দ্ধিত হয় না কেন? এবং পুরুষের গোঁফদাড়িই বা বৃদ্ধি পায় কেন? এই প্রশ্ন আমার মনে উদয় হওয়ায়, আমার স্থির মন হইতেই উহার উত্তর আসিতেছে। অজপারূপ প্রাণকর্ম যে উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট একথা পূর্বে বিষদভাবে বলা হইয়াছে। অজপারূপ প্রাণ কর্মের বামাবর্তন ও দক্ষিণাবর্তন গতি যখন যে ভাবে থাকে, জরায়ুও সেইভাবে বীজ গ্রহণ করিয়া থাকে। যোনিমুখে জরায়ুমধ্যে তিনটি নাড়ী আছে একথাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এই নাড়ী তিনটির মধ্যে একটির নাম সমীরণা, দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্রামসি এবং তৃতীয়টির নাম গৌরী। যে অবস্থায় বাম বা দক্ষিণ নাসার মধ্যে কোনটিতেই অজপার গতি না থাকিয়া কেবল সুষুম্নাতেই গতি থাকে ঐ অবস্থায় রোপিত বীজ সমীরণা নাড়ীমুখে গতি প্রাপ্ত হইয়া উহাতেই স্থিতিলাভ করে এবং তাহাতে কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয় এবং যে অবস্থায় দক্ষিণ নাসায় অজপার গতি থাকে সেই অবস্থায় যদি বীজ রোপিত হয় তবে ঐ বীজের গতি গৌরী নাম্নী নাড়ীমুখে হইয়া ঐ নাড়ীতে অবস্থিত হওয়ায় পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়।

বামাবর্তন গতি সময়ে বীজ রোপিত হওয়ায় এবং চান্দ্রমসী নাড়ী ও যোনিমুখে জরায়ুর বামভাগে অবস্থিত থাকায় এবং উহাতেই বীজের অবস্থিতি হইয়া কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয় বলিয়া সাধারণতঃ নারীগণকে বামা কহা যায়। এক্ষণে স্ত্রীগণের গুম্ফ প্রভৃতি কেন উঠে না এবং স্তনই বা কেন বর্ধিত হয় এবং পুরুষের তদ্বিপরীত ভাবই বা কেন তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে জরায়ুর ঊর্দ্ধ দেশে বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে দুইটি অণ্ড আছে, ইহাদিগকে জরায়ু কোষ বলা হয়। ইহা কুমারী অবস্থায় অল্প বয়সে অতি ছোট আকারের থাকে বলিয়া নারীগণের স্তন অল্প বয়সে প্রায় পুরুষের মতই থাকে এবং জরায়ু কোষস্থিত অণ্ডদ্বয় যেমন বৃদ্ধি পায় স্তনের গঠনও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গর্ভধারণের পূর্বে ইহার আকার সম্যক বৃদ্ধি পাইয়া গর্ভাবস্থায় উহা আরও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে নারীর এই অণ্ড নিতান্ত ছোট থাকে বা একেবারেই থাকে না তাহাকে ষণ্ডী (এক প্রকার ক্লীব বিশেষ) কহা যায়। জরায়ু কোষস্থিত অণ্ডের বৃদ্ধিতে স্তনেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত স্তনদুগ্ধও জন্মিয়া থাকে। নারীগণের জরায়ু কোষের অণ্ডের কার্য্য অন্তরেই হইয়া থাকে এবং ঐ অণ্ডের কার্য্যশক্তি বক্ষঃস্থলস্থিত স্তন যুগলে ব্যয়িত হওয়ায় স্ত্রীলোকের গোঁফ দাড়ি প্রকাশ পায় না। পুরুষের অণ্ড বর্হিমুখে অবস্থিত থাকায় পুরুষের স্তন বৃদ্ধি না পাইয়া ঐ অণ্ডের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের গোঁফদাড়ি বৃদ্ধি এবং অপর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে স্থির প্রাণরূপ আত্মা বা অজপারূপ বর্তমান প্রাণকর্ম রূপা প্রকৃতি শক্তি ইঁহারা উভয়ে উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভাবে পুংচিহ্ন বা স্ত্রীচিহ্ন বিশিষ্ট নহেন। তবে ইঁহারা যখন যেরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট দেহে অবস্থিতি করেন, তখন ইঁহারা তাহাই, অর্থাৎ নারীদেহে অবস্থিতি করিলে স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুরুষদেহে অবস্থিতি করিলে পুংলিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হন। বস্তুতঃ ইঁহারা না নারী না পুরুষ। ইঁহারা দেহী কিন্তু দেহ নহেন। ষণ্ডী বা স্বভাবতঃ ক্লীবের স্তন বা গোঁফ দাড়ী প্রায়ই হয় না ইহা দেখা যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্থির প্রাণ রূপ আত্মা বিন্দু রূপে (বিন্দু—অবয়বীভূত হওয়া) গর্ভাশয় গত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। এই গর্ভাশয় রূপ গর্ভোদ সূতিকাধামে স্থির প্রাণ—রূপ—আত্মা নারায়ণ গর্ভসমুদ্রে নিদ্রাচ্ছলে, গর্ভাবস্থায় বা সহজাবস্থায় ধ্যানে মগ্ন থাকেন। গর্ভাবস্থা বা সহজাবস্থায় এ দুইই একই অবস্থা এবং ইহা নিজ বোধ রূপ অবস্থা এবং ইহা সাধন দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়। গর্ভাবস্থা বা সহজাবস্থা পূর্বোক্ত অজপারূপ প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থা। এই সহজাবস্থা জীবের পক্ষে পুনঃ প্রাপ্তি অতীব দুর্লভ। ইহা একমাত্র সহজ কর্ম দ্বারাই হইয়া থাকে, অপর কিছুতেই লাভ হয় না। অজপারূপ প্রাণকর্মকেই সহজ কর্ম বলা যায়। কারণ জন্মের সহিত যাহা হইয়া থাকে। (সহজ = সহ + জন + ড) তাহাকেই সহজ কর্ম বলা যাইতে পারে। সুতরাং অজপারূপ প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে তাহাই একমাত্র সহজ কর্ম। এই সহজ কর্মের সম্বর্দ্ধনা দ্বারা সহজ কর্মের অতীতাবস্থা রূপ সহজাবস্থা লাভ সম্ভবপর, নচেৎ উহা অপ্রাপ্য। গর্ভাবস্থায় শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি

যে ভাবে অবস্থিত থাকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ঐ ভাবে অবস্থিতিকেই অনেকে গর্ভাবস্থা বা সহজবস্থা কহিয়া থাকেন। তাঁহারা যে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত তাহা আমার জানা থাকা উচিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কোনও প্রকার বিশেষভাবে অবস্থিতি দ্বারা অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ধ্যান দ্বারা সহজাবস্থা বা গর্ভাবস্থার জ্ঞান কাহারও হয় না ইহা অতীব নিশ্চিত বলিয়া জানা উচিত। "সহজ সাধন, সহজ ভজন, সহজ বীনা আর নাই। ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ ঐক্যতা করিয়া মনে।"একথা বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত আছে। জন্মের সহিত যাহা জন্মিয়াছে তাহাই সহজ এবং তাহার যে কর্ম তাহাই সহজ কর্ম। এই সহজ কর্মকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ থুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

অর্থাৎ হে কৌন্তেয় সদোষ হইলেও সহজ কর্মত্যাগ করিও না। দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা ইত্যাদিও কথিত আছে। অর্থাৎ সহজাবস্থা নিজবোধরূপ, ইহা সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত মিলিবার নহে। পূর্বোক্তরূপ গর্ভাবস্থা বা সহজাবস্থায় ধ্যানে মগ্ন হইয়া অর্থাৎ আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া স্থির প্রাণরূপ আত্মা নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। আদ্যা প্রকৃতি শ্রী রূপা লক্ষ্মী পদ সেবায় নিযুক্তা। স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা নারায়ণ যে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সে অনন্ত সর্প নহে। এই অনন্তকে সাধারণ জ্ঞান বিশিষ্ট লোকে সর্প কহিয়া থাকে, বাস্তবিক উহা সর্প নহে। নারায়ণ শব্দের অর্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহা প্রকৃত সর্প নহে, উহা জল। নারা শব্দে জলকে বুঝায় এবং অয়ণ শব্দের অর্থ স্থান অর্থাৎ পূর্বে যাঁহার জলই থাকিবার স্থান ছিল তিনিই নারায়ণ। এই জলই অনন্ত, কারণ ইহার কূল পাওয়া যায় না। সুতরাং জলও অনন্ত শব্দ বাচ্য। গর্ভ সমুদ্রের জলরূপ অনন্তের মধ্যে প্রথমে শয়ন করিয়া পূর্বোক্ত গর্ভাবস্থায় বা সহজাবস্থায় ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আদ্যা প্রকৃতিরূপা লক্ষ্মী পদ সেবায় নিযুক্তা। জ্যোতিঃই প্রকৃতি; নারায়ণের অঙ্গরূপ তনুও প্রকৃতি এই জন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রে "অনু রাধা" বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্যোতিঃ রূপা প্রকৃতি বা জ্যোতিঃরূপা তেজশক্তি কর্ত্তৃক হংসরূপ পদের (পদং হংসমুদাহৃতম্) সেবায় নিযুক্তা, অর্থাৎ হংসের স্থিরত্বের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা গর্ভ সমুদ্রস্থিত নারায়ণের অকালে ধ্যান ভঙ্গ না হয় এই কারণে হংসের স্থিরত্ব সাধনে লক্ষ্মী সদাই ব্যাপৃতা। হংসের স্থিরত্বের হানি হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণ পতিত হইতে পারে এবং হংসের এই স্থিরত্বভাব থাকা হেতু গর্ভস্থ ভ্রূণ জলের মধ্যে থাকিলেও নাসিকা বা কর্ণ পথে জল ভ্রূণের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। হংসের চঞ্চলভাব হইলেই জল প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রুণের দেহ নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। হংসের স্থির অবস্থায় জিহ্বা দ্বারা মুখ নানাপুটদ্বয় ও কর্ণ পথরুদ্ধ থাকে। হংসের চঞ্চল অবস্থা হইলেই জিহ্বা উহার যথাস্থান হইতে স্খলিত হইয়া ভ্রূণকে অকালে পাতিত করিতে পারে এই

কারণে জ্যোতিরূপা প্রাণশক্তি স্বয়ং আদ্যাপ্রকৃতি লক্ষ্মী হসংরূপ পদের স্থিরত্ব রক্ষণে বিশেষ কর্ত্তব্য বোধে একান্ত যত্নশীলা। এই নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মা বর্তমান। ভ্রূণের নাভি হইতে সমৃণাল পদ্মপুষ্পাকৃতি একটি নাড়ী, ইহাকে সাধারণতঃ লোকে ফুল বলিয়া থাকে এবং ইহা প্রসবের সময় পতিত হয়। এই পদ্মের উপর রজঃগুণ ব্রহ্মা বর্তমান থাকেন। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত রজোগুণের স্থান। নাভিপদ্ম হইতেই ইঁহার উৎপত্তি এবং ইনি হংস বাহন। গর্ভাবস্থায় ইঁহার কোনও কার্য্য থাকে না; কারণ গর্ভাবস্থা গুণাতীত অবস্থা, সুতরাং কোনও গুণই তখন অন্তরে থাকিতে পারে না। কুকুর জলে ডুবিলে কুকুরের গায়ের মক্ষিকাগুলি যেমন জলের উপরি ভাগে ভাসিতে থাকে বা উড়িতে থাকে, তদ্রূপ হংসের কার্য্যের অভাবে হংসের অস্তিত্ব থাকিয়াও নাই, সুতরাং রজোগুণ ব্রহ্মা নাভিপদ্মের সহিত জলের উপরে থাকেন, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। গর্ভাবস্থা হইতে পতিত হইবার পর ইঁহার কার্য্য আরম্ভ হয়। রামপ্রসাদ গাহিয়া গিয়াছেন "গর্ভে যখন, যোগী তখন, ভূমে প'ড়ে খে'লাম মাটী" এই স্থির প্রাণরূপ আত্মা নারায়ণ কুক্ষিগত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রকৃতির আর্তব শোণিতে সর্বাঙ্গীন ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী গর্ভাবাসানন্তর সূতিবাত নামক বায়ু কর্তৃক যথাকালে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পূর্বোক্ত গর্ভাবস্থা বা সহজাবস্থা যাহা আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থা তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আত্ম বিস্মৃতি ভাবে আমার গর্ভাবাস হইতে আমার মধ্যাবস্থারূপ মরুভূমিতে পতিত হইয়া আমি হইলাম। বলা বাহুল্য ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আমার অজপারূপ প্রকৃতির কার্য্য হইতে লাগিল। আমার বর্তমান চঞ্চলা প্রাণ শক্তিরূপা প্রকৃতি হইতে তিন গুণ প্রকাশ হইয়া, তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যসকল অজপারূপ মধ্যাবস্থার কার্য্যের আরম্ভের সহিত, ধীরে ধীরে আরম্ভ হইতে লাগিল। এখন আর আমার পূর্বধ্যান নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার আভাস মাত্রে আসিয়া থাকে। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, তাহারও কোনও জ্ঞান নাই, কারণ আমার সংজ্ঞার অভাব। আমি যে আমার কর্মের মধ্যাবস্থারূপ মরুভূমিতে আসিয়াছি তাহার ও আমার জ্ঞান নাই কারণ এক্ষণে আমার পূর্বোক্ত সংজ্ঞার অভাব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার মধ্যাবস্থার বর্ণন

এক্ষণে আমি আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থার সংজ্ঞা নাই। আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থার সংজ্ঞা না থাকাই সম্ভব। কারণ আমার কর্মের আদি ও অন্ত অবস্থার বিষয় যদি আমার স্মরণ থাকিত, তাহা হইলেই আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থার কথা স্মরণ করা সম্ভব

হইত। তাহা যখন নাই, তখন আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থার সংজ্ঞা থাকা অসম্ভব। আমার বর্তমান অজপারূপ প্রাণকর্মের বর্তমান অবস্থাই আমার কর্মের মধ্যাবস্থা। আমি আমার মধ্যাবস্থায় পড়িয়া সংজ্ঞাহীন হওয়ায় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার যে সংজ্ঞা নাই, তাহাও আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনী শক্তিকে প্রণিধান করিতে পারিতেছি না। আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার গুণে আমার সংজ্ঞার ছায়াকে আমি সংজ্ঞা বলিয়া বোধ করিতেছি। সংজ্ঞার ছায়া যে প্রকৃত সংজ্ঞা নহে তাহাও আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার বোধ করিবার উপায় নাই। আমার এই বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থা আমার দোলায়মান অবস্থা, আমার সহিত আমার সমস্তই দুলিতেছে। আমার এই দোলায়মান অবস্থায় আমার এই স্থিরস্বরূপ সংজ্ঞা থাকিতেই পারে না। কারণ চঞ্চলাবস্থায় স্থিরপ্রজ্ঞারূপ সংজ্ঞা থাকাই অসম্ভব। সুতরাং আমার সংজ্ঞার ছায়াকেই আমি সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিতেছি। বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থায় পড়িয়া আমার এখন "আমি" "আমার" বোধ হইতেছে এবং এই "আমি" "আমার" বোধ আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় ছিল না। সুতরাং আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থাই মরুভূমি, কারণ ইহা কর্তৃকই মরীচিকাবৎ সমস্তই দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি স্বপ্নবৎ অনুভূতি হইতেছে। ইহাই মায়া। কারণ যাহা নাই তাহারই অস্তিত্ব বোধ করার নামই মায়া। আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থা ও মায়া অর্থাৎ এই মধ্যাবস্থাও আমার নাই, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার আদি অবস্থা ও অন্ত অবস্থা উভয়ই স্থির বা শূন্য অবস্থা; সুতরাং যাহার আদি ও অন্ত স্থির বা শূন্য, তাহার মধ্যবস্থাও স্থির বা শূন্য। সুতরাং মধ্যাবস্থায় যে চঞ্চল ভাব দেখা যায় তাহার অস্তিত্ব কোথায়? চঞ্চল ভাব থাকিতেই পারে না। তবে যে আমার কর্মরূপ মধ্যাবস্থা আমি দেখিতেছি, তাহা কেবল আমার স্থির প্রাণে সংজ্ঞার অভাব। বর্তমানে আমার স্থির প্রাণে লক্ষ্য না থাকায়, এবং স্থির প্রাণের সংজ্ঞা অন্তর্হিত হওয়ায় এবং আদি ও অন্ত অবস্থার জ্ঞান না থাকায়, আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার চঞ্চল ভাব অনুভূতি হইতেছে এবং এই চঞ্চল ভাবের ফলে সমস্তই ভ্রমদর্শন হইতেছে। এক সংজ্ঞার অভাবে অজ্ঞানরূপ ছায়াতে সম্পূর্ণভাবে আবৃত হওয়ায় আমি সবই বিপর্য্যয় দেখিতেছি। এই মধ্যাবস্থার মোহিনী শক্তিতে দেবতা ও নর নারী সকলেই মুগ্ধ। ইহাই আত্মা নারায়ণের মোহিনীরূপ যোগমায়ার অবস্থা এবং ইহাই যোগমায়া। আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার প্রভাবে আমি আত্মবিস্মৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থাই আমাকে আত্মা বিস্মৃত করাইয়া আমাকে কত সাজে সাজাইতেছে ও কতরূপ দেখাইতেছে।

এই মধ্যাবস্থার প্রভাবেই কোথাও বা আমি আমাকে চতুষ্পদ পশুরূপে নানাভাবে দেখিতেছি, আবার কোথাও বা আমি রাজবেশে আমাত্যবর্গ লইয়া রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিতেছি, আবার অপরদিকে প্রজা হইয়া কর যোড়ে রাজাজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তৎপালনে প্রাণপণে যত্নশীল হইতেছি। কোথাও বা কাঙ্গাল বেশে

ভিক্ষাগ্রহণ করিতেছি, কোথাও বা দাতা হইয়া দান করিতেছি। কোথাও বা মাতৃরূপে শিশুকে স্তন দুগ্ধ পান করাইতেছি, আবার অপরদিকে শিশু হইয়া স্তন দুগ্ধ পান করিতেছি। কোথাও বা স্বামী সাজিয়া বর্তমান, আবার তৎপার্শ্বেই স্ত্রী সাজিয়া দণ্ডায়মান; কোথাও নর কোথাও নারীভাবে আমি আমাকে দেখিতেছি। কে যে পুরুষ আর কে যে স্ত্রী এবং কে যে দর্শন করিতেছে তাহারও কোন নির্ণয় নাই। বর্তমান জগৎ যাহা আমার সম্মুখে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাও আমার এই বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার মায়ারূপ ফলস্বরূপ বা মায়িক ইন্দ্রজালের ফল স্বরূপ। এ জাল আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থা বর্তমান থাকিতে ভেদ করিবার উপায় নাই। কারণ আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থা বর্তমান থাকিতে আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থা লক্ষ্য হইবার নহে। যখন আমার বর্তমান কর্মের উপরই লক্ষ্য রাখিতে পারি না, তখন বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থায় লক্ষ্য হওয়া অনেক দূরের কথা এবং তাহা সম্ভবপরও নহে। আমি এক্ষণে গবাদি পশুর ন্যায় কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে মত্ত হইয়া বেড়াইতেছি; আমার লক্ষ্য এখন কেবল বহির্বিষয়ে, আমি এখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা এবং তদনুকূল কার্য্যে ব্যস্ত, সুতরাং আমার অজপারূপ প্রাণ কর্ম যে চলিতেছে, এবং তাহার বলেই যে আমি সমস্ত কার্য্য করিতে সক্ষম এ ধারণা আমার থাকিয়াও নাই। কারণ আমার প্রকৃত সংজ্ঞার অভাব থাকায় আমি অজ্ঞানবশতঃ ভ্রান্তভাবে পশুবৎ আচার সমস্তই করিয়া চলিতেছি এবং পশুবৎ ভ্রান্তভাবে সমস্তই দেখিতেছি। আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থা হইতে সত্ত্ব রজঃ, তমঃ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জন্মিয়াছে। এই গুণত্রয় কর্তৃক রঙ্গিন চশমা আমার চক্ষে লাগিয়া থাকে। যখন যে রঙ্গের চশমা থাকে তখন আমি সেই রঙ্গই দেখিয়া থাকি এবং সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকি। আমার চক্ষে যে গুণত্রয়ের চশমা লাগান আছে তাহাও আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার মায়ায় প্রতিধান করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সর্বত্রই আমি রঙ্গ তামাসা দেখিতেছি, ও রঙ্গ তামাসা করিতেছি। ইহা যে আমি কেন করিতেছি তাহা বুঝি না; কারণ যে কোনও বিষয় হউক না কেন, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিতে হইলে প্রথমে উহা বুদ্ধির দ্বারা বিচার হইয়া পরে মনের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। আমার বর্তমান বুদ্ধি যাহা আছে, তাহাও আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থায় জাত। আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থায়, আমার এই বর্তমান বুদ্ধি ছিল না। যে অবস্থায় আমার বর্তমান বুদ্ধি ছিল না, সে অবস্থার বিষয় আমার বর্তমান বুদ্ধি কেমন করিয়া বিচার করিতে সক্ষম হইতে পারে? সুতরাং বর্তমান বুদ্ধি গুণের অতীতাবস্থার বিষয় বিচার করিতে আদৌ সক্ষম হইতে পারে না। এ কারণ আমার বর্তমান বুদ্ধি আমার বর্তমান গুণেরই পোষকতা করিয়া থাকে এবং এই তিন গুণের উপাসনা ও নানাপ্রকার প্রশংসাবাদ করিয়া যাহাতে আমি তিন গুণেরই সেবা করি এবং তিন গুণে আসক্ত হই, এই অভিপ্রায় আমার বর্তমান বুদ্ধি আমাকে আমার গুণের দ্বারা আবদ্ধ করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহাও আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফলে হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার তাহা

জানিবার উপায় নাই, কারণ আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থায় আমার বর্তমান কর্ম্মের অতীতাবস্থার সংজ্ঞার অভাব।

সুতরাং কেই বা দেখে আর কেই বা বুঝে? এক সংজ্ঞার অভাবে সকলই অভাব। এ অভাব বোধও আমার যাইবার নহে, কারণ আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থা রহিয়াছে। আমার এই বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার প্রখরতা যতই বাড়িতে, ততই লাল রঙ্গের (রজোগুণের) চশমার রঙ্গ অধিকতর ঘনীভূত হইবে; সুতরাং এই রজোগুণের বৃদ্ধিতে তদুৎপন্ন কামনা, অনুরাগ প্রভৃতি বাড়িয়া যাইতেছে। লঙ্কা দগ্ধ করিবার পূর্বে হনুমানের লাঙ্গুল বস্ত্রাবৃত করিবার সময় যেমন কথিত আছে যে যতই বস্ত্র লাঙ্গুল আবৃত করিবার অভিপ্রায় প্রযুক্ত হইয়াছিল, লাঙ্গুলে সম্পূর্ণরূপে আবৃত না হইয়া উহার দুই অঙ্গুলি অনাবৃত থাকিয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ আমার রজোভাবের বৃদ্ধিতে কামনা প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়া আমার আশা আর মিটে না এবং অভাবও পূরণ হয় না হনুমানের লাঙ্গুলের ন্যায় আমার এ অভাবও মিটিবার নহে। এক আমার বর্তমান কর্ম্মের অতীতাবস্থার সংজ্ঞার অভাবে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। এখন আমি অজ্ঞানে মুগ্ধ, অজ্ঞানতা বশতঃ সমস্তই ছায়াবৎ দেখিতেছি। আমার কার্য্য, আমার ধর্ম, আমার জ্ঞান, আমার দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম এবং এমন কি আমার বুদ্ধিও সংজ্ঞার ছায়া মাত্রে আবৃত হওয়ায় সমস্তই অজ্ঞান ভাব। আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থায় জাত গুণত্রয়ের অভিলষিত কর্মই এখন আমি করিয়া থাকি এবং তদ্বারা আমি বিশেষরূপে ঘানি গাছের "চোখ ঢাকা বলদের মত" কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ইহা আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার ফের বা জাল হইলেও, সংজ্ঞার অভাবে তাহা আমার বোধ হইতেছে না; কারণ সংজ্ঞার অভাবে জ্ঞানের ছায়ামাত্র দ্বারা উহা আমার বোধগম্য হইবার নহে। আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থায় জ্ঞানের ছায়ারূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমি এখন সত্যবোধে সমস্তই দেখিতেছি এবং করিয়া চলিয়াছি, ইহাই আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার কর্ম ফের। আমার বর্তমান কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার বর্ণন এইখানে গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপতঃ শেষ করিয়া, আমার দ্বিতীয় দশা শৈশবভাবের বিষয় প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমার দ্বিতীয় দশা বা শৈশবভাব

এখন আমি আমার গর্ভবাস অবস্থা হইতে গর্ভবাসান্তর ভূমে পতিত "গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে প'ড়ে খে'লাম মাটি"। বলা বাহুল্য আমার এ অবস্থায় আর গর্ভাবস্থার ধ্যান বা সহজাবস্থার ধ্যান নাই। আমার প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার কার্য্য আরম্ভ হওয়ায়

আমি এখন আমার মধ্যাবস্থার ভাবেই পড়িয়াছি। তবে মধ্যে মধ্যে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ সহজাবস্থার ভাবের ঘোর বা নেশা এখন সম্যক্ যায় নাই মধ্যে মধ্যে উহা অর্থাৎ পূর্বাভাসের ভাব আসিতেছে ও যাইতেছে। আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার কর্মই আমাকে আমার গর্ভবাস অবস্থা হইতে গর্ভচ্যুত করিয়াছে। আমার আর পূর্ব সংজ্ঞা সম্যক্ না থাকায় পূর্বভাব যেন বিস্মৃত প্রায় হইয়া গিয়াছি। আমি কোথায় আসিলাম এবং কোথা হইতে আসিয়া যে ভূমে পড়িয়া আছি তাহা কিছুই জানি না। আমি যে কে তাহাও আমার জানা নাই। কেনই বা আসিলাম, কেই বা আমায় আনিল এবং কেই বা আমার এ গতি করিল, তাহাও আমার জ্ঞান নাই। আমি পূর্বে কোন্ ভাবে কোন্ অবস্থায় ছিলাম, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ভাল অবস্থায় আসিয়াছি কি মন্দাবস্থায় পড়িলাম, তাহা আমার এ অবস্থায় বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কারণ পূর্বভাব বা পূর্ব অবস্থা আমার আর এখন নাই।

আমি এখন যথায় পতিত আছি সেই স্থানে আমার দেহের তুলনায় অনেক বড় বড় বা দীর্ঘাকার লোক সকল কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা বসিয়া আছে; তাহাদের দেহের সহিত তুলনায় আমার দেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি যে গৃহে রহিয়াছি ঐ গৃহটি জনতায় পূর্ণ এবং সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে ও কোলাহল করিতেছে, তবে আমার এ অবস্থায় জনতা বা আনন্দ বা কোলাহলের কোনও জ্ঞান না থাকিলেও, কি যেন কতটা অস্পষ্ট শব্দ মধ্যে মধ্যে আমার বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য যে আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই আমার পিতা কর্তৃক বর্হিভাবে আমার জাতকর্ম সম্পন্ন হইল। (ইহা এক্ষণে একটি লৌকিক কর্মে পরিণত হইয়াছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ মাত্রে পিতা ধান্যচূর্ণ এবং যব-চূর্ণ নিয় সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করেন স্বর্ণ দিয়া সন্তানকে দেখেন, ইহাই লৌকিক জাতকর্ম। বর্তমান কালে এখন জন্ম মাত্রেই আর জাতকর্ম সম্পন্ন হয় না।) ইহার অব্যবহিত পূর্বেই আমার নাড়ীছেদন কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তাহাতে যে আমার বিশেষ কোনও যন্ত্রণা বোধ হইয়াছিল তাহা নহে। যন্ত্রণা যে কি এবং সুখ দুঃখই বা কি তাহা এখন আমার বিশেষভাবে বোধ নাই। তবে আমার ঘড়্ ঘড়ি ভাঙ্গার সময়ে (মুখের মধ্যে আঙ্গুলি দিয়া মুখমধ্যস্থ লালার সহিত কণ্ঠগহ্বর হইতে জিহ্বাকে নামাইয়া আনার সময়ে) ও নাড়ী কাটার সময় আমি কাঁদিয়াছিলাম; আমার এ কান্না কিসের জন্য তাহা কেই বা বুঝে আর কেই বা শুনে। কারণ তখন বাটীস্থ সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে আমার কান্নার প্রকৃত কারণও কেহই অবগত নহেন। আমার বর্তমান অবস্থায় আমার কান্নার কারণ যখন আমি সম্যক অবগত নহি, তখন অপরে উহা কি বুঝিবে। তবে আমার কান্নার কারণ যে একেবারেই নাই তাহা বোধ হয় না। কারণ ব্যতীত কার্য্য প্রায় হয় না। আমার কান্নার কারণ আমার বর্তমান অবস্থায় সম্যক্ প্রণিধান না হইলেও কিঞ্চিৎভাবে এই কান্নার কারণের আভাস আমার মনে এখন হইতেছে। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই “ঙা” “ঙা” করিয়া আমার সাধ্যমত

জোরে কাঁদিতেছি। যে সময়ে সকলেই বলিতে লাগিল, "বাবা, ছেলের গলার জোর দেখ"; আবার কেহ বা বলিল, "আহা মায়াকান্না গো, পেটে থেকে প'ড়ে সকলেই একবার ওরকম কাঁদে।" বস্তুতঃ ইহা মায়ারই কান্না, এবং এ কান্না আমার অভাব জনিত। যদিও আমার এখন ভাব বা অভাবের বিশেষ বোধ নাই, তথাপি এই সময় হইতেই আমার অভাবের বোধ সূত্রপাত হওয়ায়, সেই প্রথম অভাব বোধ জনিতই আমার এ কান্না। আমার এ প্রথম অভাব বোধ কোনও পার্থিব পদার্থের অভাব নহে। আমি গর্ভবাস সময়ে যে গর্ভাবস্থার বা সহজাবস্থার ধ্যানে ছিলাম সেই ধ্যানের অভাবই আমার প্রথম অভাব বোধ। গর্ভবাস সময়ে যে ধ্যানের অবস্থায় অমি মগ্ন ছিলাম, গর্ভবাস হইতে পতিত হইয়া সেই অনির্বচনীয় ধ্যানাবস্থার অভাব হেতু সেই অনির্বচনীয় সুখের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় আমার প্রথম অভাবজনিত দুঃখ বা কষ্ট অনুভব হইল এবং সে কারণ আমার এ কান্না অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ শব্দের অর্থ দুঃ—দূরে, খং—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকা। আবার বৃতত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে অর্থাৎ বৃতত্ত্ব হেতু ব্রহ্ম কহা যায় এবং কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এ কথাও গীতায় উক্ত হইয়াছে। সহজাবস্থারূপ অতি মহান স্থির প্রাণই ব্রহ্ম অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থাই অতি মহান্ বা অতিবৃহৎ ব্রহ্ম, সেই অতি মহান, অবস্থা রূপ ব্রহ্ম হইতেই বর্তমান প্রাণকর্মের উৎপত্তি ; সুতরাং অতি মহান্ নৈষ্কর্ম্যরূপ সহজাবস্থা যাহা গর্ভবাস সময়ে ছিল তাহা হইতে ভূমে পতিত হইয়া আমার বর্তমান প্রাণকর্ম আরম্ভ হওয়ায় আমার পূর্বাবস্থা না থাকার কারণ আমি ব্রহ্ম হইতে দূরে পতিত হইলাম, সুতরাং দুঃখ বোধ হইল। সুতরাং গর্ভাবস্থা বা সহজাবস্থার ধ্যানের অভাবই আমার প্রথম কান্নার কারণ। এ কান্নার কারণ অপরের প্রণিধান করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ আমার ন্যায় সকলেই আপন আপন মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া আছে। আমি যেমন আমার বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া মায়ারূপ মরীচিকা দেখিতেছি অপরেও তদ্রূপ; সুতরাং অপরে আমার এ কান্নার কারণ কিরূপে বুঝিবে?

এখন আমার পূর্বভাব তিরোহিত হইলেও পূর্বভাবের আভাস এখনও মধ্যে মধ্যে আমার স্মরণ হইতেছে। কিন্তু আমার সম্মুখে যাহারা উপস্থিত, তাহারা বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার জালে সম্পূর্ণরূপে জড়িত হইয়া পূর্বভাব একেবারে বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে কেবল মায়ার হাসি হাসিতেছে। বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যে কাহারও বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার ধ্যান নাই; সে ধ্যান ইহাদের অন্তরে থাকিলে ইহারা কখনই বাহ্যিক সুখে বা কষ্টে সুখ বা কষ্ট বোধ করিত না। ইহাদিগকে প্রথম দেখিয়া আমার বোধ হইল ইহারা যেন ছায়ার পুত্তলিকাবৎ বর্তমান রহিয়াছে এবং আমাকে দেখিয়া নিজেদের দল পুষ্টি হইল ভাবিয়াই যেন আমাকে রহস্য করিয়া হাসিতেছে। কারাগারের পুরাতন বন্দীগণ যেমন নতুন কাহাকেও কারাগারে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলে আনন্দ বোধ

করে, কিন্তু যে নূতন প্রবেশ করে সে যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়ে ভয়ে কারাগারে প্রবেশ করিয়া থাকে, আমার পক্ষেও ঠিক সেইরূপ দৃশ্য উপস্থিত; আমি ভব-কারাগারে নবাগত বন্দী কাঁদিতে কাঁদিতে ভবকারাগারে প্রবিষ্ট হইলাম আর ভবকারাগারের যত পুরাতন বন্দীগণ আমাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল।

আমার বর্তমান প্রাণ কর্মরূপ মধ্যাবস্থার মায়িক ফলস্বরূপ এই জগৎ ভবকারাগার। ভাব শব্দের অর্থ উৎপত্তিবোধক এবং কারাগার শব্দের অর্থ আবদ্ধালয়। যেখানে জীবভাব উৎপন্ন হইয়া আবদ্ধ থাকে উহাই ভবকারাগার। আপন আপন বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া জীব মাত্রেই আবদ্ধ। আবদ্ধ হইবার স্থান এই দেহরূপ মায়িক জগৎ ও বহির্জ্জগৎ, বহির্জ্জগৎও মধ্যাবস্থারূপ মায়ার ফলস্বরূপ। মধ্যবস্থা উৎপত্তি হইবার পূর্বে ইহা ছিল না এবং মধ্যাবস্থার অবসানে উহা থাকিবেও না। মধ্যাবস্থার উৎপত্তি বা আরম্ভ সময় হইতেই ইহার উৎপত্তি, সুতরাং মধ্যাবস্থার ফল স্বরূপ দেহাদি সমস্তই কারাগার স্বরূপ এবং মধ্যাবস্থার উৎপত্তি কাল হইতেই এই কারাগার হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ভবকারাগার বলা হইয়া থাকে। সাধারণ কারাগারের পুরাতন কয়েদীরা যেমন কারাগারে থাকিতে ভালবাসে এবং পুনঃ পুনঃ গর্হিত কর্ম করিয়া কারাগারে প্রবেশ লাভ করে, এই ভবকারাগারের পুরাতন কয়েদীরাও নিজ নিজ বর্তমান কর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ভবকারাগারকে সুখের আলয় মনে করিয় স্বর্গাদি প্রাপ্তি ইচ্ছায় পুনঃ পুনঃ সকাম কর্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ সকাম কর্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ এই ভবকারাগারে প্রবেশ লাভ করে এবং মধ্যাবস্থার মোহিনী শক্তিতে কারামুক্ত হইবার প্রবৃত্তিও তাহাদের থাকে না। আমার বর্তমান প্রাণককর্মরূপ মধ্যাবস্থার গতিরূপ ফের নিবারণ না হইলে কারামুক্ত হওয়া যায় না তাহা আমিও আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া জানি না এবং আমার মত অবস্থাতেই থাকায় তাহারাও তাহা জানে না। তবে আমার পূর্বাবস্থার আভাস অর্থাৎ আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থার আভাস এখনও কিঞ্চিৎ ভাবে আমাতে আসিয়া থাকে, আমার সম্মুখে যাহারা উপস্থিত তাহাদের তাহাও আর আসে না। উপস্থিত আমার মনে যখনই পূর্বভাস আসিতেছে তখনই আমি হাসিতেছি, আমার হাসি দেখিয়া অপরে বলিতেছে "ওমা ওমা দেখ খোকা যেমন দেয়ালা করিতেছে।" দেয়ালা যে কেন কার তাহা তাহারাও জানে না, আমিও তাহা জানি না। আর আমি জানিলেই বা কি হইবে, আমার এ অবস্থায় ত' কোনও ভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ আমার ভাষাও কেহ বুঝে না এবং আমিও ইহাদের ভাষা কিছুমাত্র অবগত নহি। আমার ভাষা এখন দুইটি শব্দ মাত্র—একটি "ঙ" এবং অপরটি "আ"। এই দুইটি শব্দের যে কি ভাব, তাহা আমিই এখন আমার বর্তমান অবস্থায় সম্যক্ অবগত নহি, তবে তাহার আভাস মাত্র আমার এখনও জ্ঞান আছে একবারে সে ভাব এখনও তিরোহিত হয় নাই।

"ঙ" বর্ণটি ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ ত্রিগুণ বিশিষ্ট এবং পঞ্চম দেবময় (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই

পঞ্চদেবতা) এবং পঞ্চ প্রাণময় (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ইহারাই পঞ্চ-প্রাণ)। ইহার উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল এবং ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলা যায়। "ঙ" প্রকৃত অর্থ কথা কহিবার আগ্রহ বা স্পৃহা। আমার সন্মুখে যাহারা ছায়ার ন্যায় উপস্থিত রহিয়াছে তাহাদের সহিত কথা কহিবার স্পৃহাই আমা কর্তৃক উচ্চারিত "ঙ" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। আমার গর্ভবাস সময়ে আমি যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থা হইতে পতিত হইয়া আমার স্থির-প্রাণের গতি হওয়ায় আমার যে চলায়মান অবস্থা হইল এই চলায়মান অবস্থার সময়েই আমার বর্তমান মন হইয়াছে। এই মন অনঙ্গ বা বায়ুরূপী বিধায় শরীরস্থ উত্তাপ হেতু চঞ্চল প্রাণের দ্বারা ধাক্কা পাইয়া নাভিতে উপস্থিত হয় এবং নাভিতে সমান বায়ু থাকেন (সমান বায়ু প্রাণের স্থান ভেদ উপাধি মাত্র) তাহাতে তেজের বা উত্তাপের ধাক্কা লাগায় সমান বায়ুর সহিত মনের উর্দ্ধদিকে গতি হইল। নাভিদেশ হইতে তেজ বা উত্তাপ দ্বারা প্রেরিত সমান বায়ু সহ মন মন্দ গতিতে হৃদয়ে উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে উক্ত বায়ুর বা মনের কথা কহিবার কোনও ইচ্ছা থাকে না বা ইচ্ছা হয় না। প্রভাতে যখন প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন যেমন সঙ্কেত দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলে, কথা কহিবার ইচ্ছা থাকে না ইহাও তদ্রূপ ভাব। তাহার পর হৃদয় হইতে পূর্বোক্ত সমান বায়ু ও মনের জোর হইয়া তিন গুণের তিন ধারার (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুযুম্না ইহাই তিন গুণের তিন ধারা) সহিত মিলিত হইয়া কথা কহিবার আগ্রহ বা স্পৃহা হয়। তাহার পর ঐ সমান বায়ু ও মন, মস্তকে যেখানে ব্রহ্মরন্ধ্র সেই স্থান হইতে পুনরায় বিদ্যুৎ গতিতে বায়ু কর্ত্তৃক ধাক্কা পাইয়া মস্তক হইতে সেই বায়ু ও মন কণ্ঠে আসিয়া জিহ্বার সাহায্যে বক্ত্রের দ্বারা বাক্যরূপ শব্দরূপে সাঙ্কেতিক ভাবে "ঙ" শব্দ প্রকাশ হইল। এই অবস্থায় সম্যক্ উপলব্ধি সাধন সাপেক্ষ। "আ" বর্ণটিও পূর্বোক্ত "ঙ"র ন্যায় ত্রিগুণাত্মক এবং পঞ্চ প্রাণময়।

আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খ জ্যোতির্ময়ং প্রিয়ে।
ব্রহ্মা বিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে।
পঞ্চ প্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।।

"আ" বর্ণটি স্মৃতি বাক্য এবং ক্রোধ বা বিরক্তি ব্যঞ্জক ভাবেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমার পূর্বাবস্থা যাহা ত্রিগুণাতীত এবং স্থির প্রাণময় ছিল এবং যে অবস্থা হইতে আমি এক্ষণে বিচ্যুত হইলেও যাহার আভাস এখনও কিঞ্চিৎ রূপে আমার মনে রহিয়াছে এবং যে আভাস ভাব মনে উদয় হইলে আমি সুখ বোধ করিয়া হাসিয়া থাকি, আমাকে নাড়াচাড়া করার জন্য আমার সেই নিরঞ্জন ভাবের আভাস দূরীভূত হইলেই বিরক্তিজনক ভাবে আমার পূর্বাবস্থার স্মৃতিবোধক বাক্য একমাত্র "আ" শব্দ দ্বারাই স্বভাবতঃ প্রকাশ হইতে পারে এবং প্রকৃত পক্ষে হয়ও তাহাই। অতএব আমার দ্বারা উচ্চারিত "ঙা" শব্দটি আমার সাধারণ রোদনধ্বনি নহে, উহা আমার বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার অর্থাৎ আমার

গর্ভাবস্থার বা সহজাবস্থার সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিচায়কও বটে এবং ইহাই এক্ষণে আমার একমাত্র অপ্রাকৃতিক স্বভাবজ ভাষা। এখনও পর্য্যন্ত আমার বর্তমান কর্মের অতীতাবস্থার ঘোর বর্তমান থাকায়, অপরের কর্ত্তৃক আমার সেই অনির্বচনীয় ঘোরের ভাব ভাঙ্গাইবার চেষ্টা হওয়াতে আমি প্রকৃতি বশেই "ঙা" শব্দ করিয়া থাকি। আমার কৃত এই "ঙা" শব্দ সাধারণ ভাষায় অনূদিত হইলে এইরূপ অর্থ প্রকাশ পায়,—"আমি বেশ অনির্বচনীয় ঘোরের অবস্থায় আছি, আমাকে এই অবস্থায় থাকিতে দাও; আমাকে নাড়াচাড়া করিয়া আমার এ সুখের অবস্থার বিচ্যুতি ঘটাইও না।" গাঢ় নিদ্রার পর প্রভাতকালে যখন এক প্রকার অবস্থা হয়, যে অবস্থায় মানব নিদ্রিতও নহে, অথচ জাগ্রতও নহে অথচ এক প্রকার ঘোরের অবস্থা এবং সেই ঘোরের অবস্থা কাটাইবার চেষ্টা অপরে কেহ করিলে উহা যেমন ভাল লাগে না এবং বিরক্তিজনক ভাবে লোকে যেমন উঁ (ঙ) আঁ করিয়া সেই ঘোরের অবস্থাতেই থাকিবার প্রায়স পায়, আমা কর্ত্তৃক উচ্চারিত "ঙা" শব্দ ঠিক তদ্রূপভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রকার ঘোরের অবস্থায় তৎপূর্ববর্তী গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তির আভাস বর্তমান থাকে এবং মনে হয় যে সুষুপ্তির অবস্থায় বেশ ছিলাম", সুতরাং এই ঘোরের অবস্থা কাটাইবার কেহ চেষ্টা করিলে উহা বিরক্তিজনক বলিয়াই বোধ হয় এবং উঁ (ঙ) আঁ শব্দ করিয়া যেন সংক্ষেপে 'আমার এই অবস্থাতেই থাকিতে দাও" লোকে বলিয়া থাকে, আমার দ্বারা উচ্চারিত "ঙা" শব্দও ঠিক এইরূপ ভাবে উচ্চারিত। তবে দুঃখের বিষয় একথা বুঝেই বা কে, আর শুনেই বা কে, বা কাকেই বল বলি। অপরে আমার এই সাঙ্কেতিক বুলি দুইটি বুঝে না এবং আমারও আর ইহা ব্যতীত পুঁজি নাই। আমার এই সদ্যপ্রসূত অবস্থায় উপরোক্ত সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যতীত অপরের ভাষা বলিবার আমার ক্ষমতা নাই এবং অপরেরও আমার সঙ্কেত বুঝিবার শক্তি নাই। অপরের ভাষা প্রাকৃত, আমার ভাষা যাহা বর্তমানে দুইটি শব্দ মাত্র দ্বারা গঠিত উহা অপ্রাকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং অপরের প্রাকৃত ভাষার ন্যায় নিকৃষ্টা নহে। আমার ভাষা দুইটি শব্দ মাত্র হইলেও উহা অপ্রাকৃত ভাষা। কারণ আমার ন্যায় সদ্যপ্রসূত বালক মাত্রেরই এই ভাষা; জাতি, বর্ণ, দেশ বা কাল ভেদে এই ভাষার পরিবর্তন নাই সুতরাং আমার ভাষা অপ্রাকৃত বা স্বাভাবিক। আমি যাহাদের নিকট এখন আসিয়া পড়িয়াছ তাহাদের ভাষা প্রাকৃত বা নিকৃষ্টা। নিকৃষ্টা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের ভাষার ঠিক নাই। এক জাতি বা এক বর্ণ হইলেও দেশ বা কাল ভেদে ইহাদের আচার, ব্যাবহার, ভাষা ইহাদের আপন আপন নিকৃষ্ট বা অস্বাভাবিক ভাবের বশবর্তী হওয়ায় ঐ সমস্ত আচার, ব্যবহার ও ভাষা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। আমি যে গর্ভাবস্থার ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, তাহা অপ্রাকৃত অবস্থা, সেখানকার ভাষাও অপ্রাকৃত। উক্ত গর্ভাবস্থার ধ্যানে কথা কহিবার ইচ্ছাই থাকে না। এই অবস্থায় আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া থাকায় ইহা এক অনির্বচনীয় অবস্থা। সঙ্কেত ব্যতীত এই অবস্থা প্রকাশ করিবার উপায় নাই

এবং প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও থাকে না, তবে ঘটনাচক্রে পড়িয়া সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। আমার এই সাঙ্কেতিক শব্দ বোঝেই বা কে আর শোনেই বা কে। যাহারা শুনিতেছে তাহারা সকলেই প্রাকৃত বা সাধারণ লোক, সুতরাং আমার অপ্রাকৃত ভাষা বুঝিবার শক্তি তাহাদের নাই, এই কারণে আমার কৃত শব্দ সংসার অরণ্যে রোদনে পরিণত। আমি এখনও ইহাদের প্রাকৃত ভাষা শিখি নাই যে আমার ভাব ইহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিব। ইহারা আমাকে প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ শিশু মনে করিতেছে। ইহারা জানে না যে আমি কে বা কোথা হইতে আসিলাম। ইহা জানাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ তাহারা নিজেকেই নিজে জানে না, সুতরাং আমাকে জানিবে কি প্রকারে? সুতরাং সাধারণতঃ শিশুকে সাধারণ লোকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে; আমাকেও ইহারা তদ্রূপ ভাবে দেখিতেছে। "ঙা" "ঙা" শব্দ কয়েকবার করিয়া, তাহার পর আমিও যোগমায়ারূপিণী আমার বর্তমান প্রাণকর্ম রূপ মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া স্তব্ধপ্রায় হইয়া প্রাকৃত বা সাধারণ শিশুর ন্যায় হইয়াছি। বস্তুতঃ আমি প্রাকৃত শিশু নহি, তবে ইহারা আমাকে প্রাকৃত শিশু মনে করিতেছে।

ইতুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তুষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
প্রিত্রোঃ সংপশ্যাতা সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।।

যাহা হউক তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ প্রাকৃত (সাধারণ) লোকে সবই বলিতে পারেন। বিশেষতঃ ইহারা সকলেই নিজকর্মের মধ্যাবস্থার ভাবে ভাসমান হইয়া সাধারণ বা প্রাকৃত লোকে পরিণত; সুতরাং ইহারা যে আপন আপন ভাবের মতই কথা কহিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কারণ যিনি যে ভাবের বশীভূত তিনি সেই ভাবেরই মত কথা কহিয়া থাকেন।

উপরোক্ত "ঙ" এবং "আ" শব্দ দুইটি অনুনাসিকভাবে আমার দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই অনুনাসিকভাবে উচ্চারণ হওয়াও আমার পূর্বাবস্থার সঙ্কেত বিশেষ অনুনাসিক ভাবে উচ্চারণ বর্ণের মস্তকে চন্দ্রবিন্দু দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের প্রতম কলার উপরিভাগে বিন্দু সন্নিবেশিত হইলে তাহাকে চন্দ্রবিন্দু কহা যায় এবং কখনও কখনও লিখিবার সময়ে চন্দ্রকলা না লিখিয়া কেবল বিন্দু দ্বারাই চন্দ্রবিন্দুর সঙ্কেত প্রকাশ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে বিন্দুর স্থান ভ্রূ-মধ্যস্থল, চন্দ্রকলার রসে উক্ত বিন্দু অবয়বীভূত হইয়া আমার বর্তমান দেহের উৎপত্তি। বিন্দুই আত্মরূপ, ইহা জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাকৃতি। ইহার অতীতাবস্থা নিরঞ্জন অর্থাৎ যাঁহার মন নাই অর্থাৎ যিনি অবিদ্যা-রহিত পরব্রহ্ম। আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থাই নিরঞ্জন। চন্দ্রকলা ও বিন্দু যাহা ভ্রূমধ্যে অবস্থিত উহা যোগীগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। দেবাদিদেব মহাদেবও এই চন্দ্রকলা ও বিন্দু নিজভালে অনিমেষ লোচনে তন্ময় ভাবে অবলোকন করিতেছেন এবং এই চন্দ্রকলা ও বিন্দু নেত্রচ্ছলে মহাদেবের ভালে অঙ্কিত থাকে। "ঙা" শব্দ আমার দ্বারা অনুনাসিক ভাবে উচ্চারিত হওয়ায় উহা যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত তাহাই প্রকাশ পাইতেছে সুতরাং এই

অনুনাসিক ভাবে উচ্চারণও আমার পূর্বাবস্থার সঙ্কেত চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে সাধারণ লোকে ইহাকে আমার কান্না বা রোদন করা কহিতেছে। বস্তুতঃ ইহা আমার সাধারণ কান্না বা রোদন নহে। প্রকৃত পক্ষে আমার এখন রোদন কি, তাহা বোধ নাই, আমার নিকট এখন হাসি কান্না দুইই তুল্য। তবে আমার এ ভাবও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইতেছে। কারণ আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার চঞ্চল ভাবের স্রোতের বেগ যেমন যেমন ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আমার বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার জ্ঞানও তেমনই তেমনই ভাবে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

আমি এখন দিগম্বর বেশে সদ্যপ্রসূত অবস্থায় ভূমে পতিত। আমার প্রসূতি আমাকে প্রসব করিয়া ভূমে শায়িতা অবস্থায় কাতর ভাবে আছেন। তিনি কাতরা থাকিলেও "খোকা হইয়াছে, খোকা হইয়াছে" এই শব্দ শ্রবণ মাত্র আনন্দে বিভোর হইয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া আনন্দের সহিত সহাস্যমুখে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আহা, যোগমায়া রূপিনী আমার বর্তমান প্রাণ কর্মরূপ মধ্যাবস্থার কি মোহিনীশক্তি। আমার মাতৃরূপা প্রসূতি দেবীও প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া আত্ম বিস্মৃতি ভাবে "আমি, আমার" জ্ঞানে মুগ্ধা হইয়া প্রাকৃত (সাধারণ) নারীর ভাবে "আমার খোকা" এই ভাবে আসক্ত হইয়া খোকার মায়ায় মুগ্ধ। দুঃখের বিষয় খোকার হাড়মাসেই তিনি আসক্তা; খোকা যে কে এবং তিনিই যে কে তাহা তাঁহার বর্তমান কর্মের মধ্যাবস্থার ফেরের কারণ তিনি প্রণিধান করিতে সম্পূর্ণ অশক্তা, কারণ তাঁহার বুদ্ধিও তাঁহার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থা হইতেই জাত; সুতরাং তাঁহার সেই বুদ্ধি বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থার বিষয় প্রণিধান করিতে অসমর্থা। সুতরাং আমার প্রসূতিও নিজ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ মরুভূমির ফল স্বরূপ মায়িক জগৎকে সত্য বোধে "আমি আমার" বিষয়ে আসক্তা হইয়া ভ্রমে পতিতা। হায়! বর্তমান প্রাণকর্মরূপা যোগমায়া রূপিণী মহামায়ার কি অপূর্ব মোহিনীশক্তি। এই শক্তি বলে নর নারী সকলেই মোহিত। আমার জননী রূপা প্রসূতিও এই মোহিনী-শক্তি বলে দারুণ প্রসব বেদনা আগ্রহ্য করিয়া সহাস্যমুখে খোকারূপী আমার দিকে স্নেহভরে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আমাকে প্রসব করিবার পূর্বে যন্ত্রণায় কাতর হওয়ায় তাঁহার বদনের ভাব যেরূপ মলিন হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার বদনের সে মলিনতা ভাব আর নাই। আমার জননীর বদনে এক্ষণে কষ্টের কালিমা চিহ্নের লেশ মাত্রও নাই, বরং সেই বদন এক্ষণে স্নিগ্ধকর কোমল জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। এবং হৃদয়ও যেন আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হওয়ায় ঐ আনন্দের উচ্ছ্বাস শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সকলকে জ্ঞাপন করিতেছে। এক্ষণে আমার জননীকে যেন সাক্ষাৎ আদ্যা-প্রকৃতিরূপা জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীরূপা বোধ হইতেছে, ইনি যেন সাক্ষাৎ জগদম্বা, আমার নিকট থাকিয়া অমাকে অভয় দান করিতেছেন। ইনিই আমার প্রাণশক্তিরূপা আদ্যা-প্রকৃতি জগজ্জননী, আমি যে কি বলিয়া আমার জননীর স্তব করিব তাহা জানি না। বাহ্যিক

স্তব দ্বারা যে তাঁহাকে সন্তোষ করিব, সে আশাও আমার নাই। আমার এই জননী ব্যতীত অপর যে কে পূজ্য আছেন তাহাও আমি জানি না। আমার এই জননীরূপা দেবীর সেবায় নিযুক্ত থাকা একান্ত কর্তব্য। যে সেবা একমাত্র পূজারূপ সম্বর্দ্ধন তদ্ব্যতীত জননীর কৃপা লাভ অসম্ভব। আমার জননীর কৃপা লাভ করিতে পারিলে তবেই সর্বশক্তিমতী জগন্মাতা আদ্যা-প্রকৃতির কৃপা লাভ হইতে পারে। সুতরাং আমার জননীর নিকট অপ্রাপ্য কিছুই নাই একথা বলিতে পারি। তিনি জ্ঞানদাত্রী এবং মুক্তিদাত্রী এবং ধনাদি দাত্রীও বটেন একথাও নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি। তবে একথা আমার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অজ্ঞানী পুত্র জননীর নিকট হইতে বিষের নাড়ু বা অগ্নি প্রার্থনা করিলে জননী তাহা যেমন পুত্রকে দেন না, কিন্তু পুত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যখন ঐ সকল পদার্থের গুণাগুণ সম্যক্ অবগত হয় তখন ঐ সকল বিষয়ের দ্বারা পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কা না থাকিলে, জননী যেমন ঐ সকল বিষয় পুত্রকে দিয়া থাকেন, তদ্রূপ পুত্র জ্ঞান লাভ করিলে তবেই জননী ধনাদিও দিয়া থাকেন এবং তখনই জননীর ধনাদি দাত্রী নামের সার্থকতা হয়।

যাহা হউক এই সময়ে কে যেন আমাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া স্নান করাইয়া আমার গাত্র মুছাইয়া দিয়া আমার জননীর কোলে আমাকে শায়িত করাইয়া দিল। আমার জননীও আমাকে কোলে লইয়া তাহার পর আমাকে দুই হস্ত দ্বারা পাথারিকোলা করিয়া ধরিয়া স্নেহভরে অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। আমি যখন প্রথমে তাঁর কোলে ছিলাম তখন তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, কারণ এখনও আমার পার্শ্বদৃষ্টি হয় নাই, অর্থাৎ পার্শ্বের দিকে আমার দৃষ্টি এখন স্বতঃই যায় না এবং সেই কারণে আমার পার্শ্বে কি আছে না আছে তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। গর্ভবাস কালে নয়ন মুদ্রিতাবস্থায় উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি (লক্ষ্য) স্থির ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমার মধ্যাবস্থার গুণে আমার পূর্বোক্ত উর্দ্ধদৃষ্টি ঘুচিয়া গিয়া চক্ষু গোলক আমার চক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ায় আমার চক্ষের সম্মুখের বিষয় মাত্রই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জননীও যেমন আমাকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছেন, আমিও তাঁহাকে তেমনই অনিমেষ লোচনে দেখিতেছি। আমার জননীর কিন্তু একেবারে অনিমেষ লোচন নাই, কারণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার চক্ষের পাতা পড়িতেছে, আমার কিন্তু পূর্ব অভ্যাসবশতঃ এখনও চক্ষের পাতা পড়িতেছে না; কারণ আমার এই অনিমেষ লোচনের অবস্থার ঘোর এখনও সম্যক্ কাটে নাই, গর্ভবস্থার অভ্যাস বশতঃ ঐ ঘোরের ভাব এখনও সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই। জননী পুত্রভাবে আমার অস্থিমাংসের উপরই স্নেহভরে আসক্তির সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, সুতরাং এমত অবস্থায় তাঁহার অনিমেষ লোচন থাকা সম্ভবপর নহে। পুত্র শব্দের অর্থ আমার বোধ নাই, আমার জননীও যে তাহা আছে তাহাও বলিতে পারি না। কারণ আমার জননীও নিজ বর্ত্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার স্রোতে ভাসমান হইয়া বাঞ্ছারূপ কংসের কুৎসিত নরকরূপ ভব কারাগারে আবদ্ধা। আমি যদি আমার জনক জননীকে এই কুৎসিত

নরকরূপ ভব-কারাগার হইতে ত্রাণ করিতে পারি, তাহা হইলেই পুত্র পদবাচ্য হইতে পারিব, নচেৎ নহে। পুত্র শব্দের অর্থও তাহাই। পুৎ—নরক বিশেষ; দুঃখ ভোগের স্থানের নামই নরক; ত্রৈ অর্থ—ত্রাণ করা। সুতরাং দুঃখ ভোগের স্থান হইতে যে মাতা পিতাকে ত্রাণ করে সেই পুত্র পদবাচ্য, অপরে নহে। পুত্রমুখ অবলোকন করিলেই যে ভব-কারাগাররূপ কুৎসিত নরক হইতে ত্রাণ হয় তাহা নহে। পুত্রমুখ অবলোকন করিবামাত্রই যদি ত্রাণ হইত, তাহা হইলে সমস্ত জনক জননীগণের শান্তি দেখা যাইত। কিন্তু তাহা ত' দেখা যায় না। যিনি ভবকারাগার হইতে মুক্ত তাঁহার শান্তি স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে। যখন সেই শান্তিরই অভাব দেখিতে পাই, তখন পুত্রমুখ অবলোকন মাত্রই যে ভব কারাগাররূপ নরক হইতে ত্রাণ হয় তাহা বলিতে পারি না এবং এরূপ ভাবের কথা বলা যে ভ্রম তাহাতে সন্দেহ নাই। জননী আমাকে যে ভাবেই দেখুন না কেন এ কথা কিন্তু নিশ্চয় যে আমার জননী তাঁহার নিজ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া আপনাকে আপনি তুলিয়া আসক্তির সহিত "আমার খোকা" এই ভাবেই আমায় দেখিতেছেন এবং এক একবার অপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দুই একটা কথা অপরের সহিতও কহিতেছেন। আমার কিন্তু তাহা প্রণিধান করিবার উপায় নাই, কারণ ইঁহাদের ভাষা আমার এখন জানা নাই। ইঁহাদের কর্থাবার্ত্তায় কতকগুলি শব্দ অস্ফুট ভাবে আমার কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে মাত্র; তাহা ব্যতীত অপর কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক এ সময়ে আমিও বাঞ্ছারূপ কংসের ভবকারাগারের জনৈক নূতন বন্দী। আমার এই সদ্যপ্রসূত অবস্থায় আমি যে আমার জনক জননীর কারাদুঃখ মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করি, সে অবস্থা আমার আর নাই। এক্ষণে আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোত ক্রমশঃই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোত বর্তমান থাকিতে যে আমি আমার সহিত আমার জনক জননীকে এবং আমার আত্মীয়গণকে ভবকারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পারিব, সে আশা যেন আমার অন্তরে থাকিয়াও অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থার ভাব এখনও আমার মধ্যে কিছু কিছু বর্তমান থাকায় এই ভবকারাগারের সমস্ত জীবগণকেই আমার এখন আত্মীয় বোধ হইতেছে। কারণ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থায় জ্ঞানে সমস্তই আত্মময়, যেহেতু সে অবস্থায় "আমি, আমার" বোধ বা শত্রু মিত্র বোধ থাকে না। কারণ এক আত্মাই প্রাণরূপে প্রতি ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। "যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ যে প্রাণাস্তে তদাত্মকা"। অর্থাৎ যিনি রুদ্র তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ, আর যিনি প্রাণ তিনিই আত্মা। সুতরাং সমস্ত জীবগণকে আত্মীয় বোধ হওয়া আমার পক্ষে এখনও বিচিত্র নহে; কারণ এখনও আমার পূর্বাবস্থার আত্মভাব কিছু কিছু বর্তমান আছে এবং এই কারণে ভব কারাগার হইতে সকলকে উদ্ধার করার আশা স্বতঃ থাকাই সম্ভব, না থাকাই অসম্ভব। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আমার সে আশা অন্তরে থাকিয়াও যেন অন্তর্হিত

হইবার উপক্রম হইতেছে, ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকায়, বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থার আভাস ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে, সুতরাং ঐ আভাস যতই ক্ষীণতর হইতেছে, ততই আমিও প্রাকৃত বা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় "আমি, আমার" বোধরূপ শৃঙ্খলে দৃঢ়তর রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং এই হেতু আমার পূর্ব সংস্কার আভাসও ক্রমশঃ ক্ষীণতর হওয়ায় জীব মাত্রকেই আত্মীয় বোধও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার আশাও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। সাধারণ লোক যেমন "চোখ ঢাকা বলদের মত" ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেরূপ লক্ষ্মণ দেখা যাইতেছে তাহাতে আমারও সেই অবস্থা পাইতে আর বড় বেশী দেরী নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং পূর্বোক্ত আশা আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনীমায়ায় সবই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রাকৃত বা সাধারণ লোকদের যেমন ঘটিয়াছে আমারও শীঘ্রই তাহাই ঘটিয়া সাধারণ লোকের মধ্যেই গণ্য হইব, ইহারই সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক এক্ষণে আমার মনে একটা সন্দেহ আসিতেছে, অর্থাৎ ভবকারাগার কাহাকে বলে এবং কোথায় উহা অবস্থিত তাহা যেন কতকটা আমার জানা উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। বাস্তবিক ভব-কারাগার অপর কোথাও যে আছে তাহা নহে। আমিই ভবকারাগারে আবদ্ধ। আমার বর্তমান দেহই কারাগার রূপে বর্তমান। ভূ ধাতুর অর্থ— হওয়া বা উৎপত্তি; অর্থাৎ দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রকাশ হইয়াছি। এই "আমি", আমি শব্দও নহে বা দেহও নহে; বর্তমান দেহের এবং আমি শব্দের উৎপত্তি স্থানই প্রকৃত "আমি"। গুটিপোকা যেমন আপনার লালায় গুটি তৈয়ার করিয়া সেই গুযিতে আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মা-নারায়ণ প্রাণরূপে দেহরূপ কারাগারে বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া "আমি, আমার" বোধের সহিত অষ্টপাশে আবদ্ধ। আমার এই দেহরূপ কারাগারও যেমন মায়িক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তদ্রূপ জগৎও আত্মা-নারায়ণের একটি মায়িক বিরাট দেহ; উভয়ই তুল্য এবং উভয়ই কারাগার বা ভব-কারাগার।

যাহা হউক এক্ষণে আমি মাতৃক্রোড়েই অবস্থিত। তিনিও আমাকে স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমিও তাঁহাকে দেখিতেছি; বলা বাহুল্য আমার বর্তমান অবস্থায় কে আমার জনক, আর কেই বা আমার জননী এবং আমিই বা কে তাহার কোন জ্ঞানই আমার নাই। সম্মুখে যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় রহিয়াছে তাহা সমস্তই ছায়ার ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে। যখন যাহা দেখিতেছি, তাহাতেই আকৃষ্ট হইতেছি; অথচ কে দেখিতেছে এবং কি দেখিতেছি তাহা বোধ নাই অথচ যেন দেখিতেছি। আমি যাঁহার ক্রোড়ে অবস্থিত, তিনি আমাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থিত মাংসপিণ্ডবৎ স্তনদ্বয়ের মধ্যে এটি হস্তে ধারণ করিয়া উহার চুচুক আমার মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দুগ্ধ বাহির করিবার অভিপ্রায়ে উহা আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলেন এবং তদ্বারা আমার মুখবিবরে দুগ্ধরূপ

তরল পদার্থ অল্প অল্প প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতেই যে এই স্তনদুগ্ধ আমি সম্যক্‌রূপে পাইতেছি তাহা নহে। কারণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মাতৃস্তনে প্রথম দুগ্ধক্ষরণ হয় না। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ ও মায়া যতই বাড়িতে থাকে, স্তনের দুগ্ধও ততই বাড়িতে থাকে। সেই কারণে আমাকে প্রথম প্রথম ন্যাক্‌ড়ার সলিতা দ্বারা অপর দুগ্ধও খাওয়ান হইতে থাকে কিছু দিনের মধ্যেই আর অপর দুগ্ধ খাওয়ানর আবশ্যকতা রহিল না। মাতৃস্তনে দুগ্ধও প্রচুর জন্মিল এবং আমিও চুক চুক করিয়া স্তনপান করিতে শিখিলাম। স্তনপান করিতে এখন আমার বেশ ভাল লাগে এবং তাহাতে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া বেশ তৃপ্তি বোধ হইয়া থাকে। তৃপ্তি যে কি তাহা আমি জানি না তবে মোটামুটি পেট ভরিলেই আনন্দ হইয়া থাকে। বর্তমানে আমার যে ক্ষুধা হইতেছে, তাহা আমার গর্ভাবস্থায় ছিল না। তাহা না থাকিবার প্রধান কারণ এই যে গর্ভাবস্থায় আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার কার্য্য রহিত থাকায় ক্ষুধার কারণও ছিল না; বিশেষতঃ উক্ত গর্ভাবস্থায় নৈসর্গিক নিয়মানুযায়ী আমার নাভিস্থিত নাড়ীর সহিত জননীর হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকায় জননীর ভক্ষিত অন্নরস, ঐ নীড় সাহায্যে আমার শরীরে নীত হইয়া আমার শরীরের পুষ্টি সাধন করিত। সুতরাং তখন আর আমার অপর দ্রব্যের আবশ্যক হইত না।

এক্ষণে আমার গর্ভাবস্থার ধ্যান অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থার ধ্যান আর মোটেই নাই। বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থা মাত্র বর্তমান। ইহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হওয়া দূরের কথা, ক্ষুধার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন যেমন বেশী সংখ্যায় ক্ষয় হইতে থাকে, ক্ষুধাও সেই সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস যে পরিমাণে যার যত স্থির থাকে, তাহার সেই পরিমাণে ক্ষুধার আধিক্যও কম থাকে। দুঃখের বিষয় আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোত আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধির দিকেই ধাবিত হইতেছে। সুতরাং ক্ষুধার পর ক্ষুধা বৃদ্ধিই হইতেছে। এ ক্ষুধা বাড়িতেই চলিয়াছে, সুতরাং এ ক্ষুধা বর্তমান থাকিতে তৃপ্তি হওয়া বা থাকা অসম্ভব। আমি যাঁহার ক্রোড়ে রহিয়াছি বা আমাকে যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষুধা আমার ক্ষুধা হইতে কিছু স্বতন্ত্র রকমের। জঠর জ্বালা বোধ হইলেই আমার তাহাকে ক্ষুধা বলিয়া মনে হয় এবং সেই সময় ইহারা যাহা কিছু দেয় তাহাতে পেটটা ভরিলেই হাত পা ছুঁড়িয়া আনন্দ করি। কিন্তু আমার অপেক্ষা যাঁহারা আকারে অনেক বড়, পেট ভরিলেই তাঁহাদের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। কারণ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রাণকর্ম্মরূপ বর্তমান অবস্থার স্রোত আমার অপেক্ষায় অনেক বেশী হওয়ায় অর্থাৎ ঐ স্রোতের ঊর্দ্ধাধঃ গতি তাঁহাদের অনেক বেশী থাকায়, তাঁহাদের ক্ষুধা লালসায় পরিণত। এই লালসা হনুমানের আঙ্গুলের ন্যায় কিছুতেই আবৃত হইবার নহে। যতই তৈল কাপড় দাও, দুই অঙ্গুলী অনাবৃত থাকিবেই, অর্থাৎ তাঁহাদের এ লালসা

কিছুতেই মিটিবার নহে, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদের তৃপ্তিও নাই। তাঁহাদের তৃপ্তি শব্দের অর্থ বোধও নাই এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ "বুভুক্ষিতানাং দীনানাং নাতৃপ্তিরুপলভ্যতে।" আমার পেটটা ভরিলেই আমি হাত পা ছুঁড়িয়া আনন্দ করি সত্য এবং আমার ক্ষুধা যদিও অপরের ন্যায় এখনও লালসায় পরিণত হয় নাই, তথাপি আমারও এখন কোনও বিষয়েই স্থায়ী তৃপ্তি নাই। কারণ এক্ষণে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার লীলা চলিয়াছে; এই প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থা থাকিতে, আমার যে কোনও বিষয়ে তৃপ্তি হইতে পারে, তাহাও আমি আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় অবগত হইতে সক্ষম নহি।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমার দেহ বা আমি শব্দ আমি নহি, আমার দেহের এবং আমি শব্দের উৎপত্তি স্থানই আমি শব্দ বাচ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমার এই "আমি" একক মাত্র হইলেও, আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার কার্য্যতৎপরাতয়, অনন্তে পরিণত হইয়া নিজেই নিজেকে নানাভাবে নানাসাজে নানারূপে দেখিতেছি। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থাই আমার "আমি" কে বহুরূপীর ন্যায় সাজাইয়া নানাগুণে নানারূপে ও ননাআকারে সাজাইয়া রাখিয়াছে। মূলে "আমি" একটি মাত্র হইলেও, আমার বর্তমান বাহ্যিক আকারের সহিত সর্ব বিষয়ে সৌসাদৃশ্যযুক্ত অপর আর একটি কুত্রাপিও দেখিতে পাই না। আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মায়িক লীলাচক্রে পড়িয়া কিছুই প্রণিধান করিতে পারিতেছি না, প্রণিধান করিবার উপায় থাকিয়াও নাই। কারণ কোনও জটিল বিষয় সম্যক্ প্রণিধান করিতে হইলে, সম্যক্ স্থিরত্বের আবশ্যক। সে স্থিরত্বের আমার এখন অভাব। বিশেষতঃ আমার বর্তমান বুদ্ধিদ্বারা ঐ সব জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে আমাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হতাশ হইতে হইবে। কারণ, আমার বর্তমান বুদ্ধি যাহা আছে তাহাতে আমার বুদ্ধি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার বর্তমান বুদ্ধি যাহা আছে তাহা আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থা হইতে জাত। সুতরাং বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা আমার বর্তমান বুদ্ধির অগোচর। আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় যে সংজ্ঞা ছিল, উহা আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থায় অন্তর্হিত হওয়ায় সংজ্ঞার ছায়ামাত্রই রহিয়াছে। সেই সংজ্ঞার ছায়াকেই আমি আমার জ্ঞান বা বুদ্ধি বলিয়া মনে করিয়া থাকি মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে আমার বর্তমান বুদ্ধি যাহা রহিয়াছে, অপার্থিব বিষয় মাত্রই তাহার অগোচর। সুতরাং প্রকৃত তৃপ্তি আমার বর্তমান বুদ্ধির অগোচর। কারণ লালসারূপ ক্ষুধার স্থায়ী নিবৃত্তি অবস্থাই প্রকৃত তৃপ্তি। অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থাই প্রকৃত তৃপ্তির অবস্থা উক্ত অবস্থায় ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়ই থাকে না। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকিতে প্রকৃত তৃপ্তি পাইবার আশা দূরাশা মাত্র।

যাহা হউক আমি যাঁহার ক্রোড়ে রহিয়াছি তিনি যে আমার জননী, তাহা আমার বর্তমান অবস্থায় বোধ নাই। তবে সেবার মোহিনী শক্তির গুণে এবং প্রায় সর্বদা তাঁহার

ক্রোড়ে থাকিতে থাকিতে এমন একটা অভ্যাস আসিয়াছে যে তাঁহার কোলছাড়া হইলেই যেন কেমন একটা কি হইয়া যায় এবং তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে ওঁ আঁ ওঁ আঁ করিয়া শব্দও করিয়া থাকি আবার আমাকে কোলে তুলিয়া লইলে আমার সে ভাব আর থাকে না। আমি এবং আমার প্রসূতি যে ঘরে রহিয়াছি, সে ঘরটিকে সূতিকাঘর (আঁতুরঘর) সাধারণে বলিয়া থাকে। এই সূতিকাঘর সাধরণের নিকট অপবিত্র বলিয়া গণ্য হওয়ায়, যাঁহারা এই সূতিকাঘরে প্রবেশ করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করিয়া সূতিকাঘর হইতে বাহির হইয়া বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করেন এবং তাহার পর গঙ্গাজল মস্তকে দিয়া আপনাদিগকে কতকটা পবিত্র মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে বিষম ভ্রমের বশবর্তী হইয়াই লোকে এইরূপ করিয়া থাকে। ইহা নিতান্ত ভ্রম। সূতিকাগৃহ কখনও অপবিত্র হইতে পারে না। তবে আজকাল যেরূপ ভাবে সূতিকাগৃহ নির্মাণ করা হয় তাহা বাস্তবিকই অপবিত্র। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি কাহারও ব্যবহার্য্য নহে এবং যে ঘরটি বাড়ীর মধ্যে সকল ঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট, লোকে আজকাল সেই ঘরটিকেই আঁতুড়ঘর করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রসূতি এবং নবপ্রসূত বালকও একপ্রকার চিররুগ্ন হইয়া থাকে। যাহাদিগের মন অপবিত্র, তাহাদিগের নিকট সমস্তই অপবিত্র। বর্তমান মনই একমাত্র অপবিত্র। সেই মনের শুদ্ধতা না হইলে গঙ্গাজল স্পর্শই কর আর গঙ্গাস্নানই কর কিছুতেই পবিত্র হইতে পারা যায় না। গঙ্গাস্নান বা অপর নদ নদী বা তড়াগাদিতে স্নান করিলে গাত্রের মল মাত্র ধৌত হইয়া থাকে, তাহাতে মনের মল ধৌত হয় না। মনের মল ধৌত না হইলেও প্রকৃত পবিত্র ভাব আসিতে পারে না। সুতরাং যাহাদের মনে পবিত্র ভাবের অভাব, তাহারাই সূতিকাগৃহকে অপবিত্র কহিয়া থাকে। সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে, পবিত্র ও পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়াই সূতিকাগৃহে প্রবেশ করা উচিত। কারণ অপরিস্কৃত বা মলিন বস্ত্রে নানাপ্রকার বিযাক্ত পদার্থ থাকা নিতান্ত সম্ভব, উহার সংস্পর্শে নবপ্রসূত বালকের এবং প্রসূতির নানাপ্রকার ব্যাধি হওয়া সম্ভব। এ কারণ অপরেই যে কেবল পবিত্র এবং পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিবেন তাহাই নহে, প্রসূতিও যাহাতে ধৌত ও পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং যাহাতে দিনের মধ্যে অন্তত দুইবার বস্ত্র পরিবর্তন করেন তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। অপরে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিতে যাইলে অগ্রে সামান্য অগ্নি স্পর্শ করিয়া পরে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিবার রীতি পূর্বে ছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অগ্নি সদা শুদ্ধ, এবং অগ্নি দ্বারা অপর বিযাক্ত দ্রব্যও নষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় সামান্য মাত্র অগ্নি হস্ত বা পদদ্বারা স্পর্শ করিলে যে তাতে সমস্ত গাত্রের বা গাত্র বস্ত্রের বিযাক্ত দ্রব্য নষ্ট হয় না, তাহা কেহই বিবেচনা করে না। উক্তি প্রথা দ্বারা একথা নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায় যে শুদ্ধভাবে এবং পরিস্কৃত ভাবেই সূতিকা গৃহে প্রবেশ করা উচিত। এক্ষণে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমার নাড়ী কাটার স্থানে প্রদীপ শিখার তাপ এবং আমার গাত্রের স্থানে স্থানে অগ্নির তাপ প্রত্যহ দিয়া থাকে। কেন তাহা দেয় তাহা আমি জানি না, তবে ইহা আমার বেশ ভাল লাগে এবং তাহাতে যেন আমার আরাম বোধ হয়। যদিও আমার বর্তমান অবস্থায় আরাম বা সুখ যে কি তাহার বোধ নাই, তথাপি আমাকে উপরোক্ত ভাবে তাপ দিবার সময় আমি বেশ স্থির ভাবেই থাকি এবং সেই কারণেই উহাতে আরাম বোধ হইয়া থাকে বলিতেছি। অদ্য আমার ষষ্ঠ দিবস সূতিকাগৃহে বাস হইল; সেইজন্য অদ্য একটি লৌকিক উৎসব হইতেছে যাহাকে সাধারণতঃ ষষ্ঠীপূজা বা সেটারা পূজা বলা হইয়া থাকে। আমি যে দেশে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, এখানকার সাধারণ লোকে ষষ্ঠ দিবসে জাত বালকের মঙ্গলার্থ ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিয়া পরে ব্রাহ্মণগণকে যথাসাধ্য মিষ্টান্ন ও অর্থ দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পদরজঃ জাত-বালকের মস্তকে দিয়া থাকে, এবং প্রাকৃত লোকের (সাধারণের) ধারণা যে এইদিন রাত্রে বিধাতা পুরুষ জাত-বালকের কপালে আয়ু এবং অপর সদসৎ কর্ম যাহা জাত বালকের ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা লিখিয়া দিয়া যান। বস্তুতঃ আমার ভূমিষ্ঠ হইবার পর, আর আমার কপালে লিখিবার কিছু বাকি থাকে না। প্রাকৃত লোকে (সাধারণে) যাহা বলিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের বিধাতার জ্ঞান না থাকাই প্রকাশ পায় এবং বিধাতার জ্ঞান না থাকাতেই যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাকে। বিধাতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকাতেই, ঐরূপ উক্তি হইয়া থাকে। আর ও বিশেষ আপন আপন বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থায় আত্মবিস্মৃতি ভাবে উক্ত অবস্থার মোহিনী মায়ার সকলেই মুগ্ধ। এমন অবস্থায় কে বা বিধাতা, কেই বা লিখে, কার কপালেই বা লিখে এবং লিখিয়া দিয়াই বা যান কোথায়, এ সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। তবে যিনি যাহা বলেন, তাঁহার কথা মানিয়া লইয়া তাহাকেই জানা মনে করিয়া একটা না একটা আকাশ কুসুমের ন্যায় শব্দ বলিয়া “আমি জানি” মনে করিয়া লোকে মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে মাত্র। বস্তুতঃ বিধাতা বলিয়া কোন অস্থিমাংস বিশিষ্ট দেহধারী পুরুষ অথবা কোনও অপার্থিব দেহধারী পুরুষ আসিয়া আমার কপালে লিখিয়া দিয়া যান না। বিধাতা শব্দের অর্থ যিনি লোক সমূহকে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে কে লোক সমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তাহাই দেকা যাউক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রাণই ভগবান ঈশ্বর, প্রাণই বিষ্ণু প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা এবং লোক সমূহ প্রাণ কর্ত্তৃকই ধৃত হইয় রহিয়াছে এবং এই প্রাণই ধাতা, ইঁহা কর্ত্তৃকই সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। অবশ্য এই প্রাণ বর্তমানে যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে তাহা নহে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণের ছায়া মাত্র। বর্তমান শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণকেও যিনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ স্থির প্রাণ তিনি বর্তমানে জীবের অলক্ষ্য এবং ইঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া দেববাক্যে “প্রাণস্য প্রাণঃ” বলিয়া কথিত হইয়াছে, তিনিই একমাত্র ধাতা স্বরূপ এবং ইনিই জীবের একমাত্র উপাস্য দেবতা ও নিয়ন্তা। জীব ইঁহারই

পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া (সম্বর্দ্ধনা সম্যকরূপবৃদ্ধি) নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া শান্তিলাভে সক্ষম হইতে পারে নচেৎ নহে।

যাহা হউক অদ্যরাত্রে আমার সেটেরা পূজা হইয়া গেল; কি হইল আর না হইল তাহা আমি জানি না, তবে মোটের উপর অদ্য সমস্ত রাত্রি আমায় কোলে করিয়া রাখা হইল; আমার পক্ষে এইটুকুই লাভ। কারণ কোলের ভিতর বেশ গরম ও নরম জায়গায় থাকা যায় এবং তাহা আমার ভাল লাগে। আমার শরীর এখন অত্যন্ত কোমল থাকায় কাঁথার উপর কোনও স্থানে থাকিলে আমার যেন কেমন এক রকম বোধ হয় তাহা আমার ভাল লাগে না, এই কারণে কোলে থাকিতে বেশ ভাল লাগে এবং কোল ছাড়া করিলেই আমি ওঁআঁ ওঁআ শব্দ করি। এই প্রকার শব্দ করিবা মাত্র "খোকা কাঁদিতেছে" বলিয়া যে কেহ হউক আমাকে কোলে তুলিয়া লয়, এবং কোলে আমায় শোয়াইয়া কখন কখন আমার মুখে মাই দিয়া পা নাড়িয়া আমায় নাচাইতে থাকে এবং কত কি শব্দ সুর করিয়া মধুরভাবে (আয় রে আয় খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল ইত্যাদি) বলিতে থাকে। আমিও তাহা বেশ স্থির ভাবে শুনিতে থাকি, তাহা শুনিতে শুনিতে যেন আমার শরীর শীতল হইয়া কেমন এক রকম হইয়া যায় এবং মেট্রা নাড়ীতে মনঃসংযোগ হইয়া নিদ্রা আসিয়া আমাকে জড়ের মত করিয়া দেয়। এক্ষণে এরূপ নিদ্রা প্রায়ই আমার হইয়া থাকে। তবে এই নিদ্রা আমার স্বপ্নরহিত নিদ্রা নহে। আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার প্রখর স্রোত বর্তমান থাকিতে এ নিদ্রা যে আমার কখনও যাইবে, তাহা বোধ হয় না। আমার এ নিদ্রা তমোগুণের ফল স্বরূপ; আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই তিন গুণই আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। তমগুণের প্রধান কার্য্য নিদ্রা। সেই নিদ্রা আমাকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করিয়া আমার পূর্বাভাস বিস্মরণ করাইয়া দিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। আমার এ স্বপ্নরহিত নিদ্রা নহে, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যদিও আমার এ নিদ্রাতে বড় বড় খোকাদের মত স্বপ্ননাই, তাহা হইলেও ইহা স্বপ্নরহিত নিদ্রা নহে। আমার নিদ্রার অবসান অবস্থায় আমি ছায়ার মত যাহা যাহা দেখিয়া থাকি আমার নিদ্রাকালীন স্বপ্নেও তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি, কখনও স্বপ্ন দেখি আমায় লইয়া টানাটানি করিতেছে এবং কখনও স্বপ্ন দেখি যেন আমি মাই খাইতেছি। আবার কখনও কখনও বা এই নিদ্রাকালে আমার গর্ভাবস্থারূপ বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার ভাব স্মরণ পথে উদয় হয়। যখনই এই ভাব স্মরণ পথে উদয় হয়, তখনই আমার মুখের ঠোঁট দুইটি যেন হাসি হাসি ভাবের দেখা যায়। এখনও কে যেন আমায় আমার সেই পূর্বাভাস স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে, অপর কেহই আমাকে আমার পূর্বাভাস স্মরণ করাইয়া দেয় না, আমার স্বভাবই উহা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে। কখনও কখনও আমার নিদ্রাবস্থার ঘোরের সময় আমার কপালের মধ্যদেশ হইতে সময় সময় একটা জ্যোতিমণ্ডলের মধ্যে গাঢ় নীল বর্ণের গোলক এবং ঐ নীলবর্ণর গোলকের মধ্যে একটি শুভ্রবর্ণের তারকা

(নক্ষত্র) দেখিতে পাই। উহা দেখিবামাত্র আমার আনন্দভাব উদয় হইয়া আমার মুখের ঠোঁট দুখানির বেশ হাসি হাসি ভাব হইয়া থাকে। আমার এই হাসি হাসি ভাব হইবার কারণ এই যে ইহাই আমার একমাত্র অবলম্বন এবং সম্বল এবং ইহাকেই আমার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ আছে। যাহার যাহা সম্বল এবং অবলম্বন তাহা দেখিতে না পাইলেই দুঃখ এবং তাহা দেখিতে পাইলেই আনন্দ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং উপরোক্ত রূপ দর্শনে অন্তরে আনন্দভাব উদয় হইলে, ঐ আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার হাসি হাসি মুখ হইয়া থাকে এবং তাহার পর উহা দেখিতে দেখিতে কি যেন কি হইয়া গিয়া আমি যাহা দেখিতেছিলাম তাহাও থাকে না এবং যে দেখিতে ছিল সেও যেন না থাকার মত হইয়া যায়। ইহা আমার বড় আনন্দ জনক অবস্থা, কিন্তু যখন এ অবস্থা আসে তখন আনন্দ বলিয়া আমার বোধ থাকে না, কারণ তখন আনন্দ বোধ করিবার লোকাভাব। এই অবস্থাই অমার গর্ভাবস্থার ধ্যানের অবস্থা, এবং ইহাই জীবের কৈবল্য অবস্থা বা সহজাবস্থা।

আমি এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে আমার উপরোক্ত ভাবের অস্তিত্ব আর বেশীদিন থাকিবে না বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে। কারণ আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার গতি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের আমার প্রাণকর্মের উপর লক্ষ্য না থাকায় তাঁহারা বুঝিতে পারে না। তাঁহারা বুঝিবেন কি? তাঁহারাও যে নিজ নিজ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া আছেন এবং বুঝিয়াও বুঝেন না। আমার প্রাণকর্মের গতির উপর তাঁহাদের লক্ষ্যও নাই। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার টান দেখিলে এখন বোধ হয় যেন নাভিশ্বাসের মত ভাব চলিয়াছে, অর্থাৎ এখন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস টানা ফেলার সময় আমার কণ্ঠ বা হৃদয় হইতে নাভির অধোদেশ পর্য্যন্ত (হাপর তাওয়ানয় মত ভাবে) দুলিতে থাকে এবং বহির্ভাবে মিনিটে ১৫ বার হইতে ২৫/৩০ বার পর্য্যন্ত টানা ফেলা করিয়া থাকি। ইহা যেন কেন করি তাহা আমিও জানি না অথবা যাহাদের নিকট আমি আসিয়াছি তাহারাও জানে না। কারণ কাহারা সকলেই প্রাকৃত (সাধারণ) লোক। সকলেই আপন আপন বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মায়ায় মোহিত হইয়া "আমি আমার" বোধের সহিত ভবঘুরের ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ ভাবে ছুটাছুটি করায় তাহাদের মূলধনে টান পড়িয়া নিজ নিজ প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার টানা ফেলার স্রোতও বাড়িয়া যাইতেছে। মূলধন যে কি তাহাও প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বুঝিয়াও ধারণা করিতে পারিতেছে না। ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতা আমর এখন নাই, নিজের হাত পা ছুঁড়িয়াই ছুটাছুটির কার্য্য কতকটা সমাধা করিয়া থাকি। আমার হাত পা বেশী নাড়াচাড়া করায় আমার ওজন ও বল যেন ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইতেছে। আমার ওজন ও বল বাড়িতেছে তাহা আমি জানি না এবং বুঝিতেও পারি না।

যাহা হউক আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ পরাধীন অবস্থায় পড়িয়াছি। পরাধীন অবস্থা যে কি তাহা আমিও জানি না, যাহাদের নিকট আসিয়াছি তাহারাও জানে না। তবে আমার অপেক্ষায় তাহারা নিজের নিজের বাহ্যিক কার্য্য সকল নিজেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমি পারি না; কারণ আমার হস্তপদাদি থাকিতেও এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এখন মুখ থাকিতেও বোবা। আমি যাহা ইসারা ইঙ্গিতে বলি, ইহারা তাহা বুঝে না, কারণ ইহারা আমার ভাষা বুঝে না এবং আমিও ইহাদের ভাষা অবগত নহি। আমার ভাষা ত' দুইটি শব্দ মাত্র, তাহার ভাব ইহারা বুঝে না একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আমার এখন সকল বিষয়েই অসুবিধা, আমি এখন সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। যিনি আমায় তাঁহার স্তনদুগ্ধ পান করান, তিনি আমার জননী হইলেও, আমার তাহা জ্ঞান নাই। আমার এ জ্ঞান না থাকিলেও আমি এখন তাঁহার যত্ন ও সেবার গুণে তাঁহার কোলে থাকিলে যেন আমার কোনও রকম ভয় বা আশঙ্কা বোধ থাকে না। আমার যে এখন ভয় নাই তাহা নহে, তবে ভয় যে কি জিনিস তাহা আমার বোধ নাই, এবং বর্তমানে যাহাদিগকে আমি দেখিতেছি আমার আকারের সহিত তাহাদের আকারের তুলনা আমার মনে উদয় হইলেই আমায় কেমন একটা আশঙ্কভাব উপস্থিত হয়। তাহাদের বড় বড় হাত, বড় বড় পা, দেহও খুব বড় বড় এবং মুখের মধ্যে বড় বড় দাঁত; আবার তাহারা যখন আমাকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া আদর করিতে করিতে হাসিয়া আমাকে দুই হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া আমার মুখচম্বন করিবার জন্য আমার মুখের নিকট উহাদের মুখ আনিয়া থাকে, তখন আমার মনে হয় এইবার বোধ হয় ইহাদের মুখের ভিতর ইহারা আমাকে পুরিয়া ফেলিবে। ইহাতে আমার ত্রাস হয় এবং তখন আমি আমার কচি হস্তদ্বারা যথাসাধ্য বাধা দিবার চেষ্টাও সময়ে সময়ে করিয়া থাকি। ক্রমশঃ ইহাদিগকে দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হওয়ায় ইহাদিগকে দেখিয়া আর তত ভয় হয় না।

এখন আমাকে মধ্যে মধ্যে কাঠের পিঁড়িতে করিয়া বাহিরে আনিয়া উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রের তাপে এক রকম ভাজা ভাজা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এক্ষণে আর আমি সূতিকাগারে নাই। এক্ষণে সূতিকা-গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি। এক্ষণে আমার আর সূতিকাশৌচ বা জননীশৌচ নাই। আমার যে অশৌচ হইয়াছিল তাহা আমি জানি না এবং আমার যে প্রকৃত অশৌচ গিয়াছে তাহাও আমি জানি না। আমার যে অশৌচাবস্থা আসিয়াছে তাহাও আমার বোধ নই। দেহের শুদ্ধিতে বা অশুদ্ধিতে আমার অশৌচ হইতে পারে না। কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমি দেহ নহি এবং আমি দেহ হইতেও পারে না। এমন অবস্থায় আমার আবার অশৌচ কিসের? তবে আমি প্রাকৃত (সাধারণ) লোকের সঙ্গে পড়ায় আমার যে অশৌচ অবস্থা আসিয়াছে, যে অশৌচ আমার শীঘ্র যাইবার নহে। কারণ প্রাকৃত লোকে সর্বদাই নিজেকে অশুচি মনে করিয়া গঙ্গাজল বা মৃত্তিকা দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। জল বা মৃত্তিকা দ্বারা নিজের যে শুদ্ধি হয়

না তাহা তাঁহাদের জানা নাই। জল বা মৃত্তিকা দ্বারা দেহের কতক মল শুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু দেহের শুদ্ধিতে আমার শুদ্ধি ত' হইতে পারে না, কারণ আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং তদ্দ্বারা আমার অশৌচান্ত কি করিয়া হইবে। বর্তমানে আমি আমাকে না জানাই আমার প্রকৃত অশৌচ। আমার এ অশৌচ যতদিন “আমি কে” একথা না জানিব ততদিন আমার অশৌচরূপ অশুদ্ধি যাইবার নহে। আমার এ অশৌচ নখ চুল কাটিলেই যে যাইবে তাহা নহে। হস্তের বা পদের নখ কর্ত্তন দ্বারা, নখের ভিতর যে সমস্ত ময়লা থাকে তাহা দূরীভূত হয় এবং ইহা মধ্যে মধ্যে কাটাও উচিত। এবং দেহের মলও পরিষ্কার করিয়া দেহও সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত, কিন্তু তাহাতে আমার প্রকৃত অশৌচান্ত হইবে ন। আমার “আমির” মধ্যে কোনও মলিন দ্রব্য প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা আমার ঠিক জানা নাই, তবে আমার “আমির” সম্বন্ধে আমার এখন ধারণা আছে যে আমার “আমির”র মধ্যে কোনও মলিন ভাব প্রবেশ করিতে পারে না। মেঘ যখন সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তখন ইতর লোকে সূর্য্যের অপ্রকাশ ভাব দেখিয়া মনে করিতে পারে যে আজ আর সূর্য্য উঠে নাই। কিন্তু এরূপ ভাব মনে করা যেমন অসত্য, আমার “আমি”র মধ্যে মলিন ভাব প্রবেশ করিয়াছে বলাও তদ্রূপ। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ মেঘ দ্বারা, আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থারূপ সূর্য্য ঢাক পড়ায় আমার “আমিকে” মলিন মনে করিয়া সর্বদাই অশুচিভাব হইয়া রহিয়াছি মনে করিয়া থাকি মাত্র। বস্তুতঃ আমার কোনও অশৌচ নাই, আমি সদাই শুদ্ধ। তবে যাহার দেহেতে আমি বোধ রহিয়াছে, যে সদাই অশুচি কিন্তু যিনি আপনাতে আপনি সদাই রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অশৌচ নাই।

যাহা হউক আমার এক্ষণে শৌচ বা অশৌচ ভাব না থাকিলেও যাহাদের হাতে পড়িয়াছি, তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহার ছায়া ক্রমশঃ যেন আমার মধ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে। এবং তজ্জনিত অশুদ্ধভাবও যেন ক্রমশঃ আমার মধ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে। তজ্জনিত অশুদ্ধভাবও যেন ক্রমশঃ আমার মধ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে এবং সে চেষ্টা ক্রমশঃ ফলবতীও যে হইতেছে না তাহাও নহে। আমার ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ভাবই ধীরে ধীরে আমার অলক্ষিত ভাবে আমার মধ্যে বাড়িয়া যাইতেছে। আমার বলও পূর্ব্বোপেক্ষায় যেন এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি এক্ষণে আমার গ্রীবা (ঘাড়) সোজা করিয়া রাখিতে পারি, তাহাতে আমার কোনও কষ্ট হয় না এবং উপুড় হইয়া বুকে ভরা দিয়া এবং হাতে জোর দিয়া অল্প অল্প বুকে হাঁটিতে পারি। এই সময়ে আমার সম্বন্ধে অনেকে বলিয়া থাকেন যে “খোকার কোনও কষ্ট নাই, খোকার বেশ সুখের অবস্থা, “খোকার কোনও জ্বালাই নাই।” কিন্তু আমার জ্বালা আছে কিনা, তাহা কেই বা বুঝে আর কেই বা দেখে? আমার জ্বালা আমিই বুঝি, তবে আমিও যে সম্যক্ বুঝি তাহা নহে। বস্তুতঃ আমার এক্ষণে কোনও বিষয়েই সুখ নাই।

একে ত' আমি বাহ্যিক দেহের ভাবে সকল বিষয়েই অসমর্থ। এই অসমর্থ অবস্থায় কাহারও যে কোনও বিষয়ে সুখ হইতে পারে তাহা ত' সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত পক্ষে আমার এই অসমর্থতার কারণ আমার কোন বিষয়েই সুখ নাই। এক্ষণে আমার না খাবার সুখ আছে, না শয়নের সুখ আছে, আমি এখন সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। যাহারা নির্বোধ, তাহারাই আমার বর্তমান অবস্থাকে সুখকর মনে করিয়া বলিয়া থাকে "খোকার এখন বড় সুখের অবস্থা।" আমার হয়ত পেট-ব্যথা করিতেছে, কিন্তু ইহাদের ভাষা আমি এখনও জানি না এবং ইহারাও আমার ভাষা জানে না, সুতরাং আমার পেটব্যাথার কথা ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই। আমার যে "ঙ" "আঁ" বা "ও" "আঁ" শব্দ দুইটি প্রথমে ছিল, এক্ষণে কষ্টের জন্য তাহার রূপান্তর যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বা কে বুঝে? অর্থাৎ উপরোক্ত শব্দ দুইটি আমার আর পূর্বের মত উচ্চারণ হয় না। এখন আমার স্বরের জোর হওয়ায়, এবং যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন সেই ভাবের অনুযায়ী শব্দ হইয়া চক্ষে জল ভর হুইয়া আমার এখন কান্না হইয়া থাকে এবং চক্ষের জলও পড়িয়া থাকে; চক্ষে জল পড়া আমার কিন্তু প্রথমে ছিল না। আমার যখন পেটব্যথা করিতেছে, তখন কষ্ট জন্য আমি কাতর ভাবে ঘন ঘন কাঁদিতেছি, অপরে কান্না শুনিয়া মনে করিতেছে "খোকা কাঁদিতেছে, সম্ভবতঃ খোকার ক্ষুধা পাইয়াছে" এবং এইরূপ মনে করিয়া আমার পেটব্যথার সময় আমাকে কতকটা দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিল। আমিও খাইব না, তাহারাও ছাড়িবার পাত্র নহে, জোর করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিল। এইরূপ জোর করিয়া দুগ্ধ খাওয়ানতে কতকটা মুখবিবরে গেল এবং কতকটা নাসিকার মধ্যে গেল। একে পেটব্যথার জন্য কষ্ট পাইতেছি তাহার উপর এই জোর করিয়া দুগ্ধ খাওয়ানতে কষ্ট। এইরূপ ব্যাপারে আমার জ্বালা হয় কি সুখ হয় তাহা কেই বুঝে? সাধারণ লোক ইহাকেই আমার সুখ মনে করিয়া থাকে। এইরূপ কত জ্বালা যে ভোগ করিতে হয় তাহা আমার বলিবার উপায় নাই। যাহারা আমার এই অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলে, প্রকৃত সুখ না তাহাদের আছে, না আমার আছে, উভয়েই যে প্রাণকর্মের বর্তমান অবস্থারূপ মধ্যাবস্থার স্রোতে ভাসমান, সতুরাং সকলকেই প্রকৃত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে।

দুঃখের অবসানই সুখ; দুঃখের অবসান, যে কাহারও হইয়াছে তাহা ত' দেখিতেছি না। আমার ত' কথাই নাই কারণ আমার দুঃখ-রবি এই ত' সবেমাত্র উদয়োন্মুখ। আমার দুঃখের এই ত' প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এমন কি দুঃখ যে কি পদার্থ তাহা আমার এখনও সম্যক্ বোধ হয় নাই। দুঃখ শব্দের প্রকৃত অর্থ করিলেই আমার যে দুঃখ আরম্ভ হইয়াছে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিব এবং সুখ কাহাকে বলে তাহারও কতকটা আভাস পাইতে পারিব। এক্ষণে দুঃখ শব্দের প্রকৃত অর্থটা কি তাহাই দেখিয়া লই। দুঃ অর্থ দূরে এবং খ অর্থ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকার নামই দুঃখ। এই

খ অর্থে যে ব্রহ্ম তাঁহাকে "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে" (বহত্ত্বহেতুই ব্রহ্ম) কহা যায়। এই ব্রহ্মেরই অপর একনাম ব্রহ্মনাভ অর্থাৎ এই ব্রহ্মেরই নাভিদেশ হইতে রজোগুণ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। দেহমধ্যে এই নাভি দুই স্থানে আছে। উদরের মধ্যদেশে যে গণ্ডাকার নিম্নাংশ বা গর্ত আছে তাহা এক নাভি, এই স্থান হইতে অপান বায়ুর মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং গর্ভাবস্থায় রজোগুণ যে ইহার উপর ভাসিতে থাকে এ কথা পূর্বেই উক্তি হইয়াছে। ঊর্দ্ধদেশে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অপর আর একটি নাভি। এখানে প্রাণ স্বয়ং থাকিয়া মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া জীবের স্থিতিসাধন করিয়া থাকেন। অপান প্রভৃতি স্থান ভেদে এক প্রাণেরই নানা নাম এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই যে দুই নাভিস্থান উক্ত হইল এই উভয়স্থানের মধ্যে পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ বর্তমান আছে। ইহাতে অর্থাৎ এই নাভিস্থানেও তাহার ঊর্দ্ধে যে পবিত্র রত্নখানি আছে, অর্থাৎ এই ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ যাঁহারা নাভিস্থান, তিনি সদাই সর্বতোভাবে পবিত্র, কারণ ঐ রত্নখনি বা তিনিই স্থিরপ্রাণ এবং বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার এবং গুণাদি ইন্দ্রিয়গণের অতীতাবস্থা, ইহা সর্বতোভাবে পবিত্র অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া নিম্নস্থ নাভিতে আসিয়া গুণাদির অধীন হওয়াতেই আমি সেই ব্রহ্ম হইতে দূরে পড়িলাম সুতরাং উক্ত সর্বতোভাবে পবিত্র অবস্থা হইতে অর্থাৎ আমার বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা হইতে চ্যুত হওয়াই প্রকৃত "দুঃখ" শব্দবাচ্য। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থা গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই আরম্ভ হইয়াছে এবং গর্ভ হইতে অতি সম্প্রতিই ভূমিষ্ঠ হইয়াছি এই কারণে এখনও আমার বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার স্রোত তেমন প্রখর রূপে বৃদ্ধি পায় নাই, এই জন্যই আমার দুঃখ-রবি সবেমাত্র উদয়োন্মুখ বলা হইয়াছে। অপরে কিন্তু আমার অপেক্ষায় অনেক পূর্বে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় এবং তাহাদের মধ্যাবস্থার স্রোত প্রখর রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের দুঃখ সম্যকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, সুতরাং বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা পুনঃ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্তই দুঃখ এবং তৎ পুনঃ প্রাপ্তিই প্রকৃত দুঃখের অবসান বা সুখ।

আমি কিন্তু এখন যাহাদের নিকট আসিয়াছি তাহারা উপরোক্ত প্রকারে "দুঃখ" শব্দের অর্থ বুঝে না। কারণ তাহারা নিজ নিজ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার স্রোতে পড়িয়া নিজের ফাঁদে নিজে আবদ্ধ হইয়া প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফের বুঝিতে না পারিয়া মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় জড়িত হইয়া নিজেদের মতন ভাবে দুঃখ শব্দের অর্থ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে যে বস্তুতে বা বিষয়ে তাহাদের প্রগাঢ় আসক্তি থাকে, সেই বস্তু বা বিষয়ের অভাব হইলেই তাহাকে দুঃখ কহিয়া থাকে। এই অভাববোধ থাকিতে যে তাহাদের কখনও দুঃখ যাইবে তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা মুখে সুখের কথা কহিয়া থাকে। বাহ্যিক সাধারণ অর্থে দেখিতে গেলেও যাহার সর্বদা অভাব তাহার সুখ কোথায়? বিশেযতঃ যখন ইহাদের মধ্যে লালসা বর্তমান রহিয়াছে; তখন যে ইহাদের

প্রকৃত সুখ আছে তাহা বলা যায় না। কারণ যাহার অন্তরে সর্বদা লালসা বিরাজ করিতেছে, তাহার ঐ লালসার পরিতৃপ্তি না হওয়ায়, তাহার অন্তরে সর্বদাই অশান্তি বিরাজ করিতেছে, সুতরাং অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়?" "রশান্তস্য কুতঃ সুখম্"। তবে কি তাহাদের মোটেই সুখ নাই? বাস্তবিক সুখ যে তাহাদের আছে তাহা বলিতে পারি না; তবে তাহাদের যে সুখ আছে, অর্থাৎ যাহাকে তাহারা সুখ বলিয়া মনে করে, তাহা প্রকৃত সুখ নহে, ইহা নিশ্চিত। তাহারা আশু সুখকর বিষয়ে মত্ত হইয়া পরিণামে তাহার জন্য জ্বালা বোধ করিয়া থাকে। যে সুখের পরিণামে জ্বালা অবশ্যম্ভাবী, সে সুখ সুখপদবাচ্য হইতে পারে না। সকলেই আপন আপন প্রাণ কর্মের বর্তমান অবস্থার ফেরের জন্য কোনও বিষয়েরই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারায় পরিণামে জ্বালা বিশিষ্ট আশু সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করে। তাহারা ইহা জানে না যে আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার জালে পড়ার জন্য এইরূপ হইতেছে। ইহা প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার আশ্চর্য্য মোহিনী মায়া। এ মায়া ভেদ করা জীবের পক্ষে এক রকম অসাধ্য। সকলেই এই বর্তমান অবস্থার ফেরে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া "আমি আমার" বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া দুঃখকে সুখ মনে করিয়া জ্বালার উপর জ্বালা পাইয়া ও ঐ জ্বালা সহ্য করিয়া চড়ুকে হাসি হাসিয়া ভবকারাগারের চিরস্থায়ী বন্দীরূপে কাল কাটাইয়া থাকে। চড়ুকে সন্ন্যাসীরা যেমন পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠদেশ ফুঁড়িয়া ঐ পৃষ্ঠদেশকে অসাড় করিয়া তুলিয়া অবশেষে "বেঁধে মারে না সয়ভাল" অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহারাও পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে উক্তরূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

আমিও যে ভব কারাগারের একজন কয়েদী, তাহা আপন প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার মায়ার ফেরের জন্য বুঝি না এবং উহা বুঝিবার উপায়ও নাই। জেলখানার বন্দীদিগকে সাধারণতঃ চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং তন্মধ্যে জেলের জমাদার, দারোগা ও অন্যান্য কর্মচারীবর্গ ঐ সকল কয়েদীদিগকে নানারকম কার্য্যে খাটাইয়া থাকেন। আমার এ দেহরূপ ভবকারাগারেও আসুরিক ভাবের অনেক জেলদারোগা ও জেলকর্মচারী বায়ুরূপে নানা সাজে সাজিয়া আমাকে নানা কার্য্যে খাটাইতেছে। বাহ্যিক সবই বায়ুর খেলা। এই বায়ু সকল আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অনুচরবর্গ। এই অনুচরবর্গের মধ্যে ভোগিকান্ত নামক বায়ুই প্রধান এবং ইনিই বর্তমানে রাজা সাজিয়া আছেন। ইনিই কংসাসুর (কম্ বাঞ্ছাকরা বা ইচ্ছাকরা বা অভিলাষ করা বা ভোগবিলাস করা)। অপরাপর অনেক প্রকার বায়ুর সাহায্যে ইনি এই ভোগবিলাসের কার্য্য করাইয়া লয়েন। মনোমুগ্ধকর দর্শন লালসা, সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ লালসা, স্পর্শ সুখানুভব লালসা, মনোমুগ্ধকর সুগন্ধদ্রব্যঘ্রাণ সুখ লালসা এবং উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট দ্রব্যের রসনাতৃপ্তিকর রসাস্বাদন সুখলালসা ইহারা সকলেই উপরোক্ত রাজার অনুচরবর্গ এবং আমার দেহরূপ কারাগারে জমাদার দারোগা প্রভৃতি সাজিয়া ইন্দ্রিয়রূপে থাকিয়া ইহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাকে নানাভাবে খাটাইয়া থাকে। ইহার উপর আমার

বর্তমান প্রাণকর্ম হইতে জাত বর্তমান মন ভোগিকান্ত নামক বায়ুর দ্বারা রঞ্জিত হইয়া এবং গুণের বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকৃত সমস্ত সদসৎ কার্য্যকে অন্ধবৎ নিজের কৃতকার্য্য বোধে সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার বিরাম সময় আমার বর্তমান মনের অস্তিত্ব থাকে না। কেবল মাত্র আমার প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থায় আমার বর্তমান মন জাত হইয়া গুণত্রয়ের এবং ইন্দ্রিয়গণের প্ররোচনায় (উত্তেজনায়) নানাপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও গুণত্রয়ের রুচি বা অরুচি অনুযায়ী বর্তমান মনের রুচি বা অরুচি বোধ হইয়া থাকে। বর্তমান মন বায়ুরূপী, বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার সহিত মিশিয়া আছে। মনকে দেখিতে গেলে, ইন্দ্রিয়দ্বারাদির ন্যায় আকার বিশিষ্ট রূপে মনকে দেখা যায় না।

বস্তুতঃ মনের কোনও আকারই নাই। মন বায়ুরূপী এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তবে যখন আমি যাহা কিছু দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শন করি, তখন আমার মনও ঠিক সেইরূপই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়েরই ভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ মন অরূপ; যেমন আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার কোনও বাহ্যিক রূপ নাই কেবল বায়ুবৎ অনুভত হইয়া থাকে, বর্তমানে আমার মনও ঠিক সেই প্রকার। এতদ্ব্যতীত মনের অপর কোনও রূপ নাই। আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থা অসাধারণ শক্তিশালিনী; ইহার অসাধ্য কিছুই নাই; সুতরাং আমার মনও আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অনুরূপ বলিয়া, অসাধারণ শক্তিশালী। তবে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থা হইতে জাত গুণাদি দেবতাত্রয় এবং ইন্দ্রিয়গণ এবং ভোগিকান্ত নামক বায়ু ইহাদের সকলের কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া আমার বর্তমান মন কখনও বা নিজেকে সবল এবং কখনও বা দুর্বল বোধ করিয়া থাকে। ভোগিকান্ত নামক বায়ুর অভিপ্রায় অনুসারে বর্তমানে আমার সমস্ত কার্য্যই সমাধা হইয়া থাকে। বর্তমান বুদ্ধিও যাহা আমার আছে তাহাও সর্বতোভাবে উপরোক্ত ভোগিকান্ত নামক বায়ুর অনুগামী এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই কখনও করে না। বর্তমান বুদ্ধির যাহা গ্রাহ্য, আমার মনও তাহাই গ্রাহ্য করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বর্তমান মন অন্ধ, অর্থাৎ তাহার সংজ্ঞা নাই, সংজ্ঞার ছায়াকেই সংজ্ঞা মনে করিয়া থাকে এবং সংজ্ঞার ছায়াই বর্তমান বুদ্ধি। সুতরাং বর্তমান বুদ্ধির দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি যাহা কিছু হইয়া থাকে তৎ সমুদায়ই বুদ্ধি কর্তৃক মনের অনুভব হইয়া থাকে এবং তৎসমুদায় যেন মনেরই কৃতকার্য্য বলিয়া বর্তমানে প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা মনের কৃতকার্য্য নহে। যেমন যখন আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি তখন স্বতঃই আমার মনে হয় যে এই বৃক্ষটি মনই দেখিতেছে। চক্ষু দর্শনের দ্বারস্বরূপ মাত্র। চক্ষুতে মনঃসংযোগ না হইলে কোনও বস্তুই দর্শন হয় না ইহা সত্য; কিন্তু মন যখন স্বয়ং অন্ধ, তখন মন দেখিবে কি প্রকারে? বস্তুতঃ মন কিছুই দেখে না। কোনও বিষয় মনের গ্রাহ্য করাইতে হইলে, সেই বিষয়টি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া যাওয়া সম্ভব, ভোগিকান্ত

নামক বায়ু সেই বিষয়টি সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বিদ্যুদ্বেগ অপেক্ষাও শতগুণ অধিক বেগে দেহের মধ্যে ষষ্ঠস্থান অর্থাৎ ভ্রূমধ্য দেশের পশ্চাতে যেখানে ব্রহ্মযোনির স্থান, তথায় নীত হইলেই উহা মনের গোচর করা হয়। মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, তাঁহার সম্মুখে যাহা কিছু নীত হয়, মন তদ্রূপই প্রাপ্ত হয়। কোনও বিষয় মনের গোচর হইবামাত্রই বর্তমান বুদ্ধি দ্বারা বিষয়টি কি তাহার মীমাংসা হইয়া মনের উহা প্রণিধান হয় এবং মনও তখন বর্তমান বুদ্ধির সিদ্ধান্তমত মানিয়া লয় এবং মন মানিয়া লইলেই আমি বোধ করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য এ সমস্ত ব্যাপার বর্তমান কর্মের মধ্যাবস্থার আধিক্য কালে বোধগম্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ প্রথমতঃ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার সংজ্ঞার অভাব, দ্বিতীয়তঃ উক্ত মধ্যাবস্থার এখন প্রখর চাঞ্চল্যভাব, সুতরাং উপরোক্ত ব্যাপার প্রণিধান এক প্রকার অসম্ভব। যেমন ঘড়ির দোলক বা পেণ্ডুলাম (Pendulum) যখন দুলিতে থাকে, তখন ঐ পেণ্ডুলমের দোলায়মান বা চলায়মান অবস্থার উভয়দিকে যে স্থিরাবস্থা বর্তমান থাকে, সেই স্থির ভাব যেমন আমার লক্ষ্যের বর্হিভূত ব্যাপার, উপরোক্ত বিষয়গুলিও তদ্রূপ।

যাহা হউক আমার বর্তমান অবস্থায় যে কি সুখ তাহা আমি ত' দেখিতে পাইতেছি না, তবে লোকে বলে যে খোকার খুব সুখের অবস্থা। সুখ যে কি তাহা আমিই জানিতেছি, তবে জানিলে কি হইবে মুখ ফুটিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ ইহাদের ভাষা না জানা থাকায় আমি মুখ থাকিতেও বোবা। যাহা হউক এক্ষণে বুকে হাঁটিতে হাঁটিতে পূর্বাপেক্ষা আমার শক্তি যেন কিছু বাড়িয়াছে এবং ওজনও কিছু বাড়িয়াছে। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে আমাকে দোল্‌নায় শয়ন করাইয়া দেয় এবং দোল্‌নায় শুইয়া যখন দোল্‌না দুলিতে থাকে তখন দেখি যেন সবই দুলিতেছে। বস্তুতঃ সমস্তই যে দুলিতেছে তাহা নহে, আমি দুলিতেছি বলিয়া আমার নয়ন পথস্থিত সমস্থ বিষয়ই দূলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা যে আমার ভ্রম তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ আমার দোল্‌নার দোল যখন থামিয়া যায়, তখন অমি দেখিতে পাই যে আর কিছুই দুলিতেছে না, তখন ঘর, বাড়ী, চন্দ্র, সূর্য্য সবই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার আশ্রয় স্বরূপ দোল্‌নার দোল না থামিলে আমার দোলয়মান অবস্থার নিবৃত্তি অসম্ভব এবং আমার দোলায়মান অবস্থায় আমার লক্ষ্যের কোনও বিষয় যে স্থির হইতে পারে বা কোনও একটি বিষয়ে আমি যে স্থির দৃষ্টি রাখিতে পারি তাহাও অসম্ভব, কারণ আমার দোলায়মান অবস্থায় লক্ষ্য বস্তুও দুলিতেছে সুতরাং লক্ষ্যবস্তুর একস্থানে লক্ষ্য স্থির থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক আমার এক্ষণে উভয় সঙ্কট উপস্থিত। প্রথমতঃ আমার দড়ির দোল্‌নার দোল এ দোল্‌না দোলাইয়া দিলে তবে দোলে এবং দ্বিতীয়তঃ আমার একমাত্র আধার যাহা না থাকিলে "আমি" থাকিব না, সেই আধাররূপ আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থায় যে দোল স্বতঃই হইতেছে, কারণ সে যে না দোলালেও আপনি দোলে," এই উভয় দোল সামলান আমার এখন দায়

হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের দড়ির দোল্‌নার দোল সর্বদা থাকে না, মধ্যে মধ্যেই এ দোল খাইতে হয় এবং ইহা কখনও বা থামাইয়া দিলে থামে, আবার কখনও কখনও বা আপনা আপনিও থামিয়া যায়। দোল্‌না থামিয়া গেলেই আমার তন্দ্রাভাব কাটিয়া যাওয়ায় কাঁদিতে থাকি। কারণ দোল্‌নায় দুলিতে দুলিতে অভ্যাসগুণে উহা যেন ভাল লাগে বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং দোল থামিলেই কাঁদিয়া থাকি এবং পুনরায় কেহ আসিয়া দোল্‌না দুলাইয়া দিলেই আমি হাসিতে থাকি; সতুরাং দোলায়মান অবস্থাটা এখন যেন আমার ভাল লাগে বলিয়া বোধ হয়। আমার বাহিরের দোল্‌নার দোলের জন্য যেমন সমস্ত বিষয়ই দোদুল্যমান হওয়ায় স্থিরত্বের অভাব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আমার শরীরস্থ বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার দোলায়মান ভাব হেতু আমার সকল ভাবই বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ অভ্যাসের গুণে বিপরীত ভাবই আমার চক্ষে সোজা বলিয়া মনে হয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় দোল ছিল না, এক্ষণে স্বভাবের বিপরীত ভাবে পড়িয়া আমি দুলিতেছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে সবই দুলিতেছে। এবং আমার সমস্ত ভাবও বিপরীত হইয়া গিয়াছে, স্বভাবের (আত্মভাবের) ভাব আমার আর এখন নাই।

আমি এক্ষণে স্বভাবের বিপরীত অনাত্মভাবেতেই আসক্ত হইতেছি এবং অনাত্মভাবকেই দোলার ঘোরের জন্য স্বভাব বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থাই আমার স্বভাব। দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমার প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্বভাবের ভাব লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অন্তরস্থ দোলার বেগে, বাহিরের দোলায় যখন আমি শুইয়া দোল খাইতে খাইতে আমার চারিদিকের সব বিষয়ই যেমন বিপরীতভাবে দেখিয়া থাকি, তদ্রূপ আমার অন্তরস্থ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ দোলাযন্ত্রের গুণে আমার সমস্তই বিপরীত বোধ হইতেছে। বাহিরের দড়ির দোলনার দোল বাহিরের সাধারণ লোকের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। আমার অন্তরস্থ প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার দোল অর্থাৎ দোলক্রিয়া প্রকৃতি কর্তৃক গুণের দড়িতে আবদ্ধ হইয়া চালিত হইতেছে। ইহা বর্তমানে ভোগিকান্ত নামক বায়ুর স্পর্দ্ধা সহকারে দুলিতেছে। ভোগিকান্ত নামক বায়ুই সাক্ষাৎ কাম, স্পর্দ্ধা তাহার অনুচর অসুর বিশেষ। বর্তমান শরীরে ভোগিকান্ত নামক বায়ুর থাকিবার স্থান কণ্ঠ ও হৃদয়। ইহার রং বিদ্যুতাভা। ইহা বর্তমানে ঈড়ানাড়ীস্থিত শ্বাস-প্রশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া তদ্রূপে দেহমধ্যে রহিয়াছে। এই ভোগিকান্তও অসুরবিশেষ, সুতরাং প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার দোল বর্তমানে আসুরিক দোলে পরিণত হইয়া আসুরিক ভাবে কার্য্য হইতেছে। এই দোল যখন দৈবীভাবে চালিত হইবে, তখন দেবদোলে পরিণত হইয়া গোবিন্দের দোল পদবাচ্য হইবে। প্রাণকৃষ্ণের পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা দ্বারা (সম্বর্দ্ধনা—সম্যক্‌বৃদ্ধি; কৃষ্ণ শব্দের তাৎপর্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণের সম্বর্দ্ধন ক্রিয়া দ্বারা যখন ভোগিকান্ত নামক বায়ুকে সাম্যভাব করিয়া মেট্রাসুরকে বধ করা যাইবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের দোল হইবে।

এক্ষণে মেট্রাসুর কি বা কে তাহা দেখা যাউক। মেট্রা শব্দের অর্থ মেষ এবং মেষ শব্দ মিষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। মিষ্ ধাতুর অর্থ স্পর্দ্ধা করা। সুতরাং মেট্রা শব্দের অর্থ স্পর্দ্ধা। বাহিরের দোল যাত্রা পর্ব উপলক্ষে যে চিত্র যায়, তাহাতে দোলের পূর্বে বহ্ন্যুৎসব যাহা হইয়া থাকে তাহাতে পিটুলির (চালের গুঁড়ার) একটি মেষ গড়িয়া খড়ের ঘরের মধ্যে রাখিয়া অগ্নিদ্বারা উহা পোড়ান হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ মেষাসুরকে যে ভাবে বধ করিয়াছিলেন তাহার বর্হির্দৃশ্য দেখান। বস্তুতঃ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা পুরাণে বর্ণিত আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে কলঙ্কিত করাই হইয়াছে। ভিতরের বিষয় বাহিরের চিত্রে দেখাইতে হইলে, কিছু না কিছু দোষস্পর্শ করিয়াই থাকে। তাহাতে রচয়িতার দোষ না লওয়াই কর্তব্য, কারণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। লোককে কোনও প্রকারে ধর্মপথে আনয়ন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং উদ্দেশ্য মন্দ না থাকায় উহা তত দোষাবহ নহে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে গোপিনীরা কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাপ্রকার আহারীয় দ্রব্য আনিতেছিল, এমন সময়ে মেট্রাসুর গোপিনীদের সম্মুখস্থ হইয়া বলে "আমি বড় ক্ষুধার্থ, আমাকে সমস্ত আহারীয়দ্রব্য প্রদান কর।" গোপিনীরা তাহাতে অস্বীকার হওয়ায় মেট্রাসুরের সহিত বচসা হইতে থাকে; এমন সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া বলেন "তোমরা ঐ ঘরের মধ্যে আহারীয়দ্রব্য রাখিয়া দিয়া উহাকে আহার করিতে বল" ইত্যাদি। তৎপরে গোপিনীরা সম্মুখস্থিত একটি খড়ের ঘরে আহারীয় দ্রব্যভার রাখিয়া তাহাকে আহার করিতে বলায়, মেট্রাসুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য পাইয়া তন্ময়ভাবে আহার করিতে থাকে, এমন সময়ে পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেই ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া সেইঘরে অগ্নি প্রদান করিয়া অসুরকে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলেন এবং তাহার পর অসুরবধ হেতু আনন্দ জন্য দোল উৎসব করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। কারণ ইহা আততায়ীর কার্য্য। বস্তুতঃ এরূপভাবে বাহ্যিক দোললীলা ভগবান কর্তৃক আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই, ইহা অতি নিশ্চয়। বাহ্যিকভাবে দোললীলা বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবানকে আততায়ী করা হইতেছে, এরূপ আততায়ী দোষ পুরাণের মধ্যে বহুস্থানে ভগবানে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বর্ণিত আছে।

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্র পাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥

অর্থাৎ যে গৃহে অগ্নি প্রদান করে, যে বিষ প্রয়োগ করে, বা প্রাণ বা ধন হরণ করে, অথবা অপরের ভূমি বা পত্নি হরণ করে এই ছয় প্রকার ব্যক্তিই আততায়ী পদবাচ্য ইহাদিগকে বধ করিলে কোনই পাপ নাই। পুরাণের মূল শ্লোক অবিবেচক টিকাকার বা

কথকগণের হাতে পড়িয়া অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের প্রত্যেক শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ নাই। এরূপ অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিবারই কথা, কারণ ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহারা নিজ নিজ প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় থাকিয়া অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের ভাবের উপর অপরে যাঁহারা টিকাটিপ্পনী করিতে যান, তাঁহারা আপন আপন প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থায় থাকিয়া ঐ টীকাটীপ্পনী করিয়াছেন, সুতরাং বিপরীত ভাবের অর্থ হওয়াই সম্ভব এবং কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে কোথায় কিরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক না হওয়ায় তাহার বিপরীত ভাবই হইয়া থাকে। এই সমস্ত টীকাকারগণ আপন আপন প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থায় থাকার জন্য ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেও একজন সাধারণ কামীপুরুষের মত করিয়া তুলিয়াছেন, ফলে ঠিক যেন "শিব গড়িতে বাঁদর" হইয়াছে। প্রাণকর্মের অবস্থার গুণে সমস্তই বহির্ম্মুখী অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া, সব বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যেমন মেষ শব্দের অর্থ ভেড়াও হয় আবার মেষ শব্দের অর্থ স্পর্দ্ধাও হয়। আপন আপন প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া টীকাকারগণ শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ কামীপুরুষে পরিণত করিয়াছেন এবং মেট্রাসুর তাঁহাদের হাতে পড়িয়া আজকাল ভেড়ায় পরিণত হয়, হায় প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার কি বিচিত্র মায়া! ইহারই ফেরে সবই স্বভাবের বিপরীত হইয়া থাকে। দোষ কাহারও নাই, দোষ নিজ নিজ প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার। প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরের জন্য যে ভাবের কদর্থ করা হইয়াছে তাহা স্ত্রীগণকে বেশ বুঝাইয়া দিতে পারা যায় এবং যে সব পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাঁহারও তাহা মানিয়া লইতে পারেন, অপরে নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই দোল যখন দৈবীভাবে চালিত হইয়া দৈবীদোলে পরিণত হইবে, তখনই ইহা শ্রীগোবিন্দের দোল পদবাচ্য হইবে। গোবিন্দের দোল পদবাচ্য হইবে বলায় মনে হইতে পারে তবে কি দোল শ্রীকৃষ্ণের নহে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দ কি পৃথক পৃথক ব্যক্তি। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দ নাম পৃথক হইলেও বিষয় পৃথক নহে। শ্রীকৃষ্ণ শব্দের অর্থ এবং শ্রীকৃষ্ণ কে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে তাহার সম্যক্ পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ কর্ষণ ক্রিয়ার নিবৃত্তি অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ পদবাচ্য, অর্থাৎ ইনি স্থির প্রাণ এবং ইনিই প্রাণের প্রাণ পদবাচ্য। ইনিই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং প্রধান পুরুষ। ইনি প্রতি ঘটে ঘটে বিরাজমান থাকিয়াও জীবের অলক্ষ্য বিষয়। যেমন সূর্য্যকে মেঘে আচ্ছাদন করিলে সূর্য্যকে আর দেখা যায় না, অথবা যেমন গ্যাসের আলোকস্তম্ভে গ্যাস বর্তমান থাকিলেও উহা জ্বালিয়া না দিলে আলোক প্রকাশ পায় না তদ্রূপ ইনি প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ঊর্দ্ধাধোগতির উভয় সন্ধিস্থলে থাকিয়াও বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মেঘদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় জীবভাবের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। ঘড়ির পেণ্ডুলমের গতি সময়ে পেন্ডুলামের দুলনস্থানের উভয় প্রান্তে পেন্ডুলমের

স্থিতিরূপ স্থির থাকে; তাহাতে যেমন কাহারও লক্ষ্য পড়ে না ইহাও ঠিক তদ্রূপ। ইহা কেবল যোগিগণের জ্ঞানগম্য, সাধারণের জ্ঞানগম্য নহে। "মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে রমণ"। এই শরীরই ক্ষেত্রপদবাচ্য এবং এই শরীর মধ্যস্থ স্থির প্রাণই ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য এবং ইনিই শ্রীকৃষ্ণ পদবাচ্য। ইঁহার এক একটি অবস্থার কার্য্যভেদে এক একটি নাম হইয়াছে। গোবিন্দ শব্দের অর্থ-গো শব্দে বিশ্ব সমূহাদি—বিদ্ ধাতু অর্থে জানা অর্থাৎ যিনি বিশ্ব সমূহাদি জানেন তিনিই গোবিন্দ। এই শারীরূপ ক্ষেত্রই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এই শরীরকেই ক্ষেত্র কহা যায়। "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে"। গীতা—১৩শ অঃ ২য় শ্লোক।

যিনি এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে তত্ত্বের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জানেন ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। গীতা—১৩শ অঃ ২য় শ্লোক যথা—"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।" গীতার ঐ অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকে বলিয়াছেন "আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।" এবং উক্ত অধ্যায়ের ৩৫শে শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে "জীবের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান সম্যক্ প্রত্যক্ষ হইলে, ঐ জীব পরম পদ প্রাপ্ত হন। উপরে বলা হইয়াছে যে বিশ্বকে যিনি জানেন, তিনিই গোবিন্দ পদবাচ্য এবং "গোবিন্দ" এই শব্দটি কোন একটি বিষয়ের বা অবস্থার উপাধি মাত্র। এক্ষণে কে বিশ্বকে জানেন তাহার নিরাকরণ হওয়া আবশ্যক। বিশ্ব শব্দ বিশ্-ধাতু (প্রবেশ করা) হইতে উৎপন্ন। শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণই শরীরীরূপে রহিয়াছেন এবং বিশ্ব সমূহাদির জ্ঞান প্রাণেরই থাকা সম্ভব। কারণ একমাত্র প্রাণই সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করিয়া সমস্ত অবগত আছেন সুতরাং একমাত্র স্থির প্রাণই শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ পদবাচ্য। বিষয় এক কার্য্যভেদে নামান্তর মাত্র।

"গাশ্চ বিশ্ব সমূহশ্চ বিন্দতে যোহবলীলয়া।
জ্ঞান-সিন্ধু সমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্তিত॥"

অর্থাৎ বিশ্ব সমূহাদি যিনি অবলীলাক্রমে লাভ করিয়া (বিশ্ব সমূহাদি যিনি অবলীলাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াও ব্যাপ্ত হইয়া) জ্ঞানসিন্ধু সমূহ লাভ করেন অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপী এবং (সেই হেতু) সর্বজ্ঞ, তিনিই গোবিন্দ নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

যাহা হউক পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমার ওজন ও বল একটু বাড়িয়াছে এই বল ও ওজন এক্ষণে আরও একটু বেশী বাড়িয়াছে এবং সেইজন্য এক্ষণে আমার পূর্ব গর্ভাবস্থার ধ্যানের আভাস ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন ইহার প্রকাশ থাকে না তখন আমার এইমাত্র বোধ হয় যে আমার যেন কি একটা বিষয় হারাইয়া গিয়াছে, কি হারাইয়া গিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারি না। যাহার দ্বারা আমি বুঝিতে পারিব সে সংজ্ঞাই আমার নাই। আমি সংজ্ঞোহারা হইয়াছি, কিন্তু আমি যে সংজ্ঞাহারা হইয়াছি তাহাও আমি জানি না। আমার সংজ্ঞাহারা হইয়া আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে

পড়িয়া বায়ুর বিকারে আমি নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছি তাহাও আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার গুণে প্রণিধান করিবার উপায় নাই। বরং আমি যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্ন বলিয়া আমার বোধ না হইয়া তাহা সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তবে যে আমি ইহাকে স্বপ্ন বলিতেছি, তাহার কারণ আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায়, বর্তমানে যাহা দেখিতেছি তাহার অস্তিত্ব আমার নিকট ছিল না সুতরাং বর্তমানে যাহা দেখিতেছি, তাহাকে স্বপ্নবৎ না বলিয়া আর কি বলিব। আমার ওজন ও বল বৃদ্ধির সহিত এক্ষণে আমার অনেক রকম খেলাও বাড়িয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় কি খেলি, কে খেলে, কেই বা খেলায় আর কেনই বা খেলি তাহার কিছুই অবগত নহি। এবং উহা যে জানিবার বিষয় বা জানিতে হইবে তাহাও আমি জানি না, কারণ আমি খোকা। এক্ষণে আমার পা হইয়াছে অর্থাৎ পায়ে বেশ জোর হইয়াছে এবং হাতেও বেশ জোর হইয়াছে। এক্ষণে হাতে ও পায়ে জোর দিয়া আপনা আপনি বেশ বসিতে পারি, আবার গোপাল বেশে "হামা" দিয়া বেড়াইতেও পারি, অথচ কেন বেড়াই বা কে বেড়ায় তাহার কোনও বোধই নাই। যাহা দেখি তাহাই নূতন বলিয়া বোধ হয়। এবং আমার যাহা হারাইয়া গিয়াছে ইহা হয়ত তাহাই এইবোধে উহা পাইবার জন্য ব্যগ্র হই। এখনও আমি মুখ থাকিতেও বোবা; অপরের ভাষা এখনও আমার জানা না থাকায় সম্যক্ বুঝাইয়া বলিতেও পারি না। সুতরাং যে কোনও জিনিষ দেখি তাহাই হামা দিয়া গিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু তাহা লইয়াও সুস্থির হইতে পারি না, কারণ যখন একটা কিছু লইলাম, তাহার পরক্ষণেই অপর আর একটা জিনিষ দেখিয়া আবার তাহার দিকে ধাবিত হই। যখন যেটা পাইয়া থাকি বা লইয়া থাকি সেইটা লইয়া একেবারে মুখের ভিতর দিয়া খাইবার চেষ্টা করি, কখনও বা উহা বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে থাকি, কি যে দেখি, বা কেই বা দেখে তাহা জানি না, অথচ দেখিবার জন্য বা পাইবার জন্য ব্যগ্র। আমার যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাই বোধ হয় ইহা হইবে এই মনে করিয়া যেন সমস্ত দ্রব্য যাহা দেখি তাহা লইবার জন্য হামা দিয়া দৌড়াদৌড়ি করি, অথচ যাহা আমার হারাইয়াছে তাহা পাই না। যে দ্রব্যই পাই বা লইয়া থাকি তাহা অল্পক্ষণ নিজের কাছে রাখিয়া তাহার পর আবার ফেলিয়া দিই। ফেলিয়া দিবার কারণ, আমার যাহা হারাইয়াছে, ইহা তাহা নহে ভাবিয়া ফেলিয়া দিই, আবার হয়ত ক্ষণিক পরে সেই দ্রব্যটি পাইবার জন্য ব্যগ্র; কোনও বিষয়ের ঠিক নাই। আবার যখন আমি কোনও দ্রব্য লইতেছি, এমন সময়ে কেহ যদি উহা সরাইয়া লয়, বা আমাকে না দেয়, তাহা হইলেই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাকি, মনে হয় যখন এইটা আমাকে দিতেছে না, তখন বোধ হয় আমার যাহা হারাইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ ঐটাই তাহা।

যাহা হউক আমার আর একটা বল এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি । সে বলটি রোদন করা। আমার এই নূতন রোদন বলের নিকট সকলেই পরাস্ত এবং আমার অপর

বল এই রোদন বলের সহিত তুলনায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "বালানাং" রোদনং বলং।" এইরূপ করিতে করিতে আমি এক্ষণে আরও কিছু বাড়িয়াছি এবং আমার ওজনও আরও কিছু বাড়িয়াছে। আমার ওজন বৃদ্ধির সহিত আমার অভিলাষও যেন বাড়িয়া যাইতেছে। এ অভিলাষ আমার কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল তাহার কিছুই আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে বোধগম্য হইবার উপায় নাই। আমি ত খোকা, আমার ত' বোধগম্য না হওয়াই সম্ভব, এমন কি আমার মত খোকার বাবা যাঁহারা; তাঁহাদেরও বোধগম্য হয় কিনা সন্দেহ। কারণ আমার মত খোকার বাবা যাঁহারা; তাঁহারাও আপন আপন প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোতে ভাসমান হইয়া অভিলষিত বিষয়ে অনুরাগ ভরে মাতিয়া থাকায় "অভিলষিত বিষয়টি কি" বা "কেন অভিলাষ হয়" বা "কেন অভিলাষ করি" তাহার দিকে আদৌ দৃষ্টি করেন না; তাঁহাদের দৃষ্টি অভিলষিত বিষয়ে ধাবিত; সুতরাং "অভিলষিত বিষয়টি কি" তাহা দেখিবার বা জানিবার অবকাশ নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমার শরীরস্থ ভোগিকান্ত নামক বায়ুই সাক্ষাৎ কাম। ইনি আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন এবং ইঁহার কতকগুলি অনুচর বায়ুরূপে শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, ইঁহার অপর একটি নাম প্রবাহ নামক বায়ু, ভোগিকান্তের এই প্রবাহে পড়িয়া অর্থাৎ কামের (কামনার) প্রবাহে পড়িয়া জীবনের যত প্রকার ক্লেশকর বিষয় আছে জীব তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, জীব অতিকষ্টে সাধন দ্বারা ইহা জয় করিতে পারেন নচেৎ নহে। অভিলাষ ও কামরূপী ভোগিকান্ত নামক বায়ুর এক প্রধান অমাত্য। "অভিলাষ" শব্দের অর্থ, আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগের সহিত লোভ; ইহাই অভিলাষ শব্দের প্রকৃত অর্থ। অভি-লস্—ইচ্ছা করা হইতে অভিলাষ শব্দ উৎপন্ন অর্থাৎ কোনও বিষয় বা বস্তু সম্মুখস্থ হইবামাত্র তাহা নয়ন গোচর হইলেই বায়ু কর্তৃক তাহার চিত্র বিদ্যুৎবেগে মনের গোচর হইয়া বুদ্ধি দ্বারা বিষয়টি ধারণা হইয়া ভোগিকান্তের ইচ্ছানুসারে, অনুরাগের সহিত সেই বিষয় বা পদার্থ পাইবার যে কামনা বা ইচ্ছা হয় তাহাই "অভিলাষ" পদবাচ্য। আমার শরীরের বৃদ্ধির সহিত আমার এই অভিলাষ এখন বাড়িতেছে। যাহা দেখিতেছি তাহাই প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করি। অভিলষিত বিষয় না পাইলে বা কেহ কাড়িয়া লইলে কাঁদিয়া থাকি এবং উহা পাইবার জন্য বায়নাও করিয়া থাকি। রোদন করাটা আমার পক্ষে এখন মহাবল; সেই রোদন করার জন্য যে দ্রব্য আমি পাইতেছিলাম না, তাহা পুনরায় পাইয়াও থাকি; আবার কোনও কোনও সময়ে একটার বদলে আর একটা দিয়া আমাকে ভুলাইয়াও দিয়া থাকে। আমিও একটার বদলে অপর কিছু পাইলেই বোকার মত সময়ে সময়ে তাহাতেই তুষ্ট হইয়া হামা দিতে দিতে ছুটাছুটি করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় আমার এই গোপাল ভাবে হামা দেওয়ার অবস্থায় অভিলাষের বিষয় অনেক হওয়ায় বায়নাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন আমি আমার মত খোকা অনেক দেখিতে পাই, তাহাদিগকে দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে এবং তাহাদিগকে

দেখিলে আমার যেন তাহাদিগের সহিত মিশিতে ভাল লাগে। সময়ে সময়ে তাহারাও আমার কাছে আসিয়া আমার গায়ে হাত দিয়া আমার সহিত কথা কহিবার শক্তি না থাকিলেও যেন কিছু বলিবার চেষ্টা করে বলিয়া বোধ হয়। আমিও ঠিক সেইমত করিয়া থাকি। আবার কখনও কখনও কোনও খোকা আমাকে খোকাভাবের চড়টা চাপড়টা বা সামান্য আঁচড়াইয়া কামড়াইয়াও দেয়, আমিও যে তাহা না করি, তাহা নহে, বরং করিয়াই থাকি। এই সময়ে আমার হামাটানা গোপালভাব দেখিয়া আদর করিয়া অনেকেই কোলে লইয়া থাকে; তবে বড় একটা সকলকার কোলে ইচ্ছা করিয়া যাই না, কারণ সকলকার কোলে যাইতে ভয় করে; তথাচ সময়ে সময়ে তাহারা আমাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে আমার মুখচুম্বন করে। কেহ মুখচুম্বন করিতে আসিলে, আমি প্রায় বাধা দিয়া থাকি। বাধা দিবার কারণ আমার যেন তাহাতে ভয় করে। যে ভয় অপর কিছুই নহে, আমার মনে হয় আমাকে বুঝি তাহারা খাইবার চেষ্টা করিতেছে। বস্তুতঃ আমার অস্থিমাংস যে তাহারা খাইবে তাহা নহে, তবুও কিন্তু আমার তাহাতে কেমন ভয় করে। আমার অস্থিমাংস না খাইলেও তাহারা যে আমার ইহকাল পরকাল খাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার পরকাল কি তাহা এখন সম্যক্ জানি না এবং ইহকালও যে কি তাহাও যে সম্যক্ জানি তাহা নহে। তবে আমার ইহকালের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। আমি এখন কাদার ডেলা বা ক্ষীরের ডেলার মত যেমন ছাঁচে পড়িব, সেইরূপই আমার আচার ব্যাবহার হইবে। আমার বায়না যে এখন সমস্তই পূরণ করা হয় এবং আমি আমার বায়না পূরণ হইলেই বেশ সুখবোধ করিয়া থাকি, এই বায়না পূরণ করাই আমার ভবিষ্যতের এক রকম মাথা খাওয়া হইতেছে। কারণ ভবিষ্যতে আমার বায়নার স্রোত প্রখরতররূপে বহিয়া বৃহদাকারের তরঙ্গ উত্থিত করিয়া ঐ বায়নার স্রোত ও তরঙ্গে আমার দারুণ অনিষ্ট করিবে; আমাকে ত' কষ্ট দিবেই এবং সে আঘাত যে কেবল আমাকে একা ভোগ করিতে হইবে তাহা নহে, সে ধাক্কায় আমার আত্মীয়গণকেও অসহ্য যন্ত্রণা যে দিবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বর্তমানে আমার আত্মীয়পর বোধ কিছু কিছু হইয়াছে। তবে আমার এই আত্মীয়পর বোধের জ্ঞান প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত তাহা আমার জানা নাই। অমার তাহা না জানা থাকাই সম্ভব, কারণ যাহা দ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান প্রকৃতরূপে হইবে, সে সংজ্ঞাই আমার নাই। আমার সংজ্ঞা অন্তর্হিত হওয়ায় এবং আমার বর্তমান জ্ঞান, সংজ্ঞার ছায়া হইতে উৎপন্ন হওয়ায় আমার জ্ঞান বা জানা সব ছায়ারই মত অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান নাই জ্ঞানের ছায়ামাত্র আছে। সুতরাং তাহার দ্বারা আমার প্রকৃত জানা কি প্রকারে হইবে? এ কারণ আমার জানা বা জানিবার উপায় থাকিয়াও বর্তমানে আমার নাই। কারণ এক্ষণে আমি আমার প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার স্রোতে ভাসিতেছি, সুতরাং আমি এখন যাহাকে জানা বলিতেছি, তাহা বাস্তবিক আমার জানা নহে, জানার ছায়াকে সত্যরূপ জ্ঞানে মানিয়া

লইতেছি। আমি যে ইহা জ্ঞানের ছাড়য়া দেখিতেছি তাহাও আমি জানি না, কারণ আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার গুণে তাহা আমার বোধ করিবার শক্তি নাই। এমন অবস্থায় আমার প্রকৃত আত্মীয়পর বোধ হওয়া অসম্ভব। আত্মীয় শব্দের অপ্রাকৃত অর্থ আত্ম সম্পর্কীয়, অর্থাৎ আমার নিজের সম্পর্কীয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমি শব্দ বা আমার দেহ আমি নহি; "আমি" অর্থে "আমি" শব্দের ও আমার দেহের উৎপত্তি স্থানই বুঝিতে হইবে, আমার উৎপত্তি স্থান স্থিরপ্রাণ এবং স্থির প্রাণই আত্মা-নারায়ণ, ইহা বিশদরূপে পূর্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই স্থির প্রাণরূপ আত্মাই আমার একমাত্র আত্মীয় পদবাচ্য এবং স্থির প্রাণরূপে আত্মাকে যাহারা ঢাকিয়া রাখিয়া আত্মাতে বা আপনাতে লক্ষ্য করিতে দেয় না, তাহারাই প্রকৃত পর পদবাচ্য। অথচ ইহারাই আমার সম্মুখে আত্মীয়বৎ প্রতিভাসিত হইতেছে। আমার সংজ্ঞার অভাবে আমিও ইহাদিগকে আত্মীয় বোধ করিয়া ইহাদের কার্য্য সমূহকেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য মনে করিয়া থাকি এবং সে কারণে ইহাদের অনুগত হইয়া ইহাদেরই তৃপ্তি সাধন জন্য সদাই শশব্যস্ত ভাবে ইহাদের সেবা করিয়া থাকি। সংজ্ঞার অভাবে আমি পরিণামদর্শী নহি, সুতরাং আশু সুখের প্রত্যাশায় ইহারাই আমার পরমাত্মীয় বলিয়া আমার সংজ্ঞার ছায়ারূপ জ্ঞানে দ্বারা বিবেচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহারা আত্মীয় নহে, ইহারা আমা হইতে ভিন্ন, এবং আমা হইতে বা আত্মা হইতে যাহারা ভিন্ন তাহারাই পর। ইহারা আমার শরীরে বাস করিয়া আমারই অনিষ্ঠ সাধনে সর্বদা চেষ্টা করিতেছে, এবং ইহারা ইন্দ্রিয় পদবাচ্য। ইন্দ্রিয়গণ আমা হইতে বা আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা আমার পরম শত্রু সর্বদাই ভয়াবহ। ইহাদের দ্বারা সমস্ত অমঙ্গলকর কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে ও হইতেছে। বর্তমানে আমার সংজ্ঞার অভাবে ইহাদের কার্য্য সমুদায় আসুরিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহারা নানাপ্রকার প্রলোভন রূপ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং যখন যেরূপ প্রলোভনের আবশ্যক আমাকে আবদ্ধ করিবার জন্য তন্মুহূর্তে তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট ধর্ম-প্রলোভন যে নাই তাহাও নহে। ইহারা সকল শরীরেই থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং এক শরীর হইতে অপর শরীরেও অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা আসুরিক ও পাশবিক প্রলোভনে ভগ্নমনোরথ হইলে, পরিশেষে আসুরিক ভাবের ও পাশরিক ভাবের ধর্মানুষ্ঠানরূপ প্রলোভনে আবদ্ধ করিয়া থাকি। ধর্ম প্রলোভন ভয়ানক প্রলোভন, ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই সুকঠিন।

কারণ রাজসিক ও তামসিক ভাবের ধর্মে, ধর্মভাবে সমস্তই অধর্মের কার্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অথচ যিনি সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার জানা আছে "আমি ধর্মানুষ্ঠান করিতেছি" এবং এরূপ ভাবেও জীব আত্মা হইতে দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আবার কখন কখন আসুরিক ভাব সাত্ত্বিক ভাবের ছল করিয়া, বাহ্যিক সাত্ত্বিক সাজে

সাজিয়া বাহ্যিক জ্ঞানরূপ প্রলোভন দ্বারা ও সুখসঙ্গের প্রলোভন দ্বারা আবদ্ধ করিয়া যাহারা পরমাত্মীয় যথা মাতা, পিতা ও সদ্‌গুরু এবং সহধর্মিণী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করাইয়া পরিণামে জীবকে ব্যাভিচারগ্রস্থ করাইয়া থাকে। পিতা, মাতাও ধর্মপত্নীকে যে পরমাত্মীয় বলা হইয়াছে তাহার কারণ "পিতা হবৈ প্রাণঃ" "মাতা হবৈ প্রাণঃ" অর্থাৎ মাতা পিতা প্রাণ স্বরূপ বিশেষতঃ সৎ-পিতা ও সন্মাতা কখনও আত্ম ধর্মের বিরোধী হন না; এবং ধর্মপত্নী নিকটে থাকিলে পতিকে ধর্মচ্যুত হইতে হয় না এবং ব্যাভিচার গ্রস্থও হইতে হয় না।

আসুরিক ভাবের উদ্দেশ্যই হইতেছে আমাকে নিজের দলে আনিয়া আসুরিক ভাবাপন্ন করিয়া আমাকে ব্যাভিচারগ্রস্থ করা অর্থাৎ যাহাতে এবং যে কোনও প্রকারে আমি ব্যাভিচারগ্রস্থ হই, তাহাই ইন্দ্রিয়গণের ও আসুরিক ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য, এ কারণ ইন্দ্রিয়গণ ও আসুরিক ভাব সর্বদা ভয়াবহ। ইহারা ভয়াবহ হইলেও বর্তমানে আমার প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে সংজ্ঞাহীন হওয়ায় সংজ্ঞার ছায়ার স্থানে অনাত্মীয়কে আত্মীয় বোধ করিয়া তাহাদেরই অনুগত হইয়া সমস্তই বিপরীত ভাবে দেখিতেছি। তবে আমার এখন খোকাভাবে যে আমাকে আদর করে, যত্ন করে, আমার সেবা করে তাহাকে এখন আমার আত্মীয় বা আপনার লোক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সেবার অপূর্ব মোহিনী শক্তি, সে সেবায় সকলেই মুগ্ধ; আমি খোকা; আমি যে মুগ্ধ হইব না, তাহা হইতে পারে না, নচেৎ আমার এক্ষণে কে মাতা, কে পিতা তাহার কোনও জ্ঞানই নাই। তবে যিনি আমাকে প্রসব করিয়াছেন তিনিই আমার বাস্তবিক মাতা এবং আমার নিকট তিনি আমার মা জগদম্বা স্বরূপিণী জগন্মাতা। দুঃখের বিষয় আমি খোকা, মা যে কি পদার্থ, তাহা আমার বোধ নাই এবং বর্তমান খোকাভাব যদি আমার থাকিয়া যায় তাহা হইলেও মা যে কি পদার্থ তাহা জানিতেও পারিব না এবং তাহা না জানিতে পারায় তাঁহার প্রতি আমার কি কর্তব্য তাহাও খোকাভাবে এবং বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে, আমার বোধ হইবে না। আমার মাতাকে আমার জীবনীশক্তি রূপা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মনে করিয়া তাঁহার সেবা করা আমার নিতান্ত কর্তব্য।

জনকো জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ।
গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ সোহন্নদাতা পিতা মুনে॥
বিনান্নান্নশ্বরো দেহো ন নিত্যঃ পিতুরুদ্ভবঃ।
তয়োঃ শতগুণে মাতা পূজ্যা মান্যা চ বন্দিতা।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী॥

জনক শব্দের অর্থ যাহা কর্তৃক উৎপন্ন হয় বা যে উৎপন্ন করে, বা যিনি জননের কারণ। জন্যানাং জনকো কালঃ, জগতামাশ্রয়ো মতঃ। কালই হইতেছেন প্রথম জনক। কারণ উৎপন্নের কারণ কেবল দেহ নহেন; দেহ কারণ হইলে শবদেহ হইতেও পুত্র উৎপন্ন

হইতে পারিত, তাহা যখন হয় না, তখন, উৎপন্ন হইবার কারণ দেহ নহে ইহা সত্য। উৎপন্নের কারণ একমাত্র কাল; সেই কাল দেহরূপ ঘটে ঘটে প্রাণরূপে প্রকাশ। এই কালরূপ প্রাণ উৎপন্নের প্রথম কারণ, সুতরাং ইনি জীবের প্রথম জনক। দ্বিতীয় জনক যিনি পালন করেন, তিনি পিতা। গোধূমাদি অন্নদ্বারাই যে কেবল জীবের পোষণ হয়, তাহা নহে। প্রাণ না থাকিলে বা প্রাণের তেজের হ্রাস হইলে অন্ন খায়ই বা কে আর হজমই বা করে কে? সুতরাং গোধূমাদি একমাত্র অন্নশব্দ বাচ্য নহে। প্রাণই একমাত্র পিতাস্বরূপ। প্রাণের দ্বারাই জীবের পোষণ হইয়া থাকে। প্রাণঃ হবৈ পিতা। প্রাণের গতি বিচ্ছেদ অবস্থার নাম কাল। কাল ও প্রাণ পৃথক বিষয় নহে, তবে অবস্থান্তরে নামান্তর এবং অবস্থান্তরে কার্য্য বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। মাতা, পিতা অপেক্ষা অধিকতরা পূজ্যা এবং মান্যা। পিতা অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠা হইবার কারণ "মাতা হবৈ প্রাণঃ" মাতাও প্রাণ স্বরূপ, তবে অবস্থা ভেদে কার্য্য ভেদ। চঞ্চলা প্রাণশক্তিই মাতাস্বরূপা; ইনিই জীবকে গর্ভাবস্থায় ধারণ করিয়া রাখেন। ইনি ধারণ করিয়া না রাখিলে গর্ভস্থ ভ্রূণ গর্ভে থাকিতে পারে না এবং গর্ভাবস্থায় প্রাণ-শক্তিদ্বারাই গর্ভস্থ ভ্রূণ সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া থাকে এবং এই মাতৃস্বরূপা প্রাণশক্তিরূপা দেবীর কৃপা ব্যতীত জীবের উদ্ধার নাই, সুতরাং মাতা, পিতা বা জনক অপেক্ষা অধিকতর পূজনীয়া।

আমার প্রাণশক্তি-রূপা মাতৃদেবী বা আমার স্থিরপ্রাণরূপ পিতা বা আমার প্রাণের গতিবিচ্ছেদের বিভাগ অবস্থারূপ কাল ইহারা যখন ঘটস্থ অবস্থায় থাকেন, তখন সাকার পদবাচ্য, আর ঘট ভাঙ্গিলেই নিরাকার পদবাচ্য। আমার প্রাণশক্তিরূপা জননী আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; ইনিই আমার নিকট সর্ববায়ুরূপিণী, দেবগণের অগ্রে ইঁহার পূজা করা কর্তব্য। ইঁহাকে সন্তোষ করিতে পারিলে সর্ববায়ুরূপী দেবগণ আমার উপর কুপিত থাকিলেও আমার অনুকূলে থাকিতে বাধ্য; কিন্তু যদি আমার প্রাণশক্তিরূপা জননী আমার উপর কখনও কুপিতা হন, তাহা হইলে কাহারও নিকট আশ্রয় পাইবার স্থান আমার নাই। আমার প্রাণশক্তিরূপা সাকারা জননী, যিনি আমাকে গর্ভ হইতে প্রসব করিয়াছেন এবং আমার এই অক্ষম অবস্থায় যাঁহার কৃপায় ও যত্নে আমি সদা রক্ষিত হইতেছি এবং যাহার স্তনপান করিয়া আমি পরিপুষ্ট হইতেছি, আমার সেই জননীর পদযুগলে চিরাবনত হইয়া থাকা নিতান্ত কর্তব্য। যিনি আমার মল মূত্রে কিছুমাত্র ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া; উহা চন্দনের ন্যায় অকাতরে স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া আসিতেছেন, ভক্তিভরে তাঁহার চরণে কোটী কোটী বার প্রণাম করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যিনি দারুণ শীতের সময় আমার মুত্রদ্বারা সিক্ত শয্যা বা সিক্তবস্ত্রা হইলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শয্যার সিক্ত ভাগে নিজে শয়ন করিয়া এবং পরিধেয় বসনের সিক্ত অংশ নিজ গাত্রে দিয়া শয্যার শুষ্কভাবে আমাকে শয়ন করাইয়া এবং পরিধেয় বসনের শুষ্কাংশ আমার গাত্রে আবরণ দিয়া আমাকে শীত হইতে রক্ষা করিয়া আপনাকে সুখীবোধ

করিয়া থাকেন, সেই জননী দেবীর চরণে পুনরায় আমার কোটী কোটী ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। যিনি আমার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ জন্য নিজে না খাইয়া আমাকে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন আমার সেই জননীর চরণ যুগলে আমি পুনরায় প্রণাম করিতেছি। যাঁহার অসীম কৃপাশক্তিবলে আমি শক্তিশালী হইতেছি, সেই প্রাণশক্তিরূপা সাকারা দেবীর অন্তর্বাহ্যরূপের চতুর্দিকে আমি নতভাবে প্রণাম করিতেছি। জননীর নিকট পুত্রের আব্দার চিরকালই রক্ষিত হইয়া থাকে, এ কারণ আমার সাকারা প্রাণশক্তিরূপা জননীর নিকট আমি এই মাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন আজীবন আমার জননীর সম্মুখে চরিত্রবান কৃতদাসের ন্যায় ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালনে কখনও পরান্মুখ না হই; ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। ইহাতেও ত' আমার মনের তৃপ্তি হইল না। কারণ ইহা ত' মাতার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। আমার সাকারা প্রাণশক্তিরূপা জননী দেবীকে কিরূপে ভক্তি করিয়া প্রণাম করিতে হইবে তাহা ত' আমি জানি না, তবে আমার বোধ হয় আমার মন ও প্রাণ অর্পণ করিয়া তগ্দতভাবে তাঁহার চরণ যুগলে নতভাবে থাকাই প্রণাম। কিন্তু এরূপ প্রণামও ত' যথেষ্ট নহে, কারণ সন্তানের পক্ষে মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। প্রাণশক্তিরূপা মাতাকে যদি ভব কারাগাররূপ কংসকারাগার হইতে সন্তান মুক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে ততক্ষণ সন্তানের পক্ষে মাতার কিছুই করা হইল না মনে করা উচিত। জননীকে ভব-কারাগার রূপ কংস কারাগার হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তখন আমার মাতার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা যেন সম্পন্ন হইল মনে হইতে পারে, নচেৎ নহে। আমার খোকাভাবে তাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। কারণ আমার খোকাভাব যত বাড়িবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার স্রোত বাড়িয়া আমাকে সেই স্রোতে কোথায় লইয়া ফেলিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তবে এখন আমার পূর্বাভাস অর্থাৎ আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থার সংজ্ঞা মধ্যে মধ্যে আসায় আমার বর্তমান অবস্থার কার্য্য সমূহ বর্ণন করিতে পারিতেছি, নচেৎ হইত না। যিনি নিজ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থার জ্ঞান বর্তমানে সাধন দ্বারা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার নিজের সমস্ত অবস্থাই প্রকাশ করিতে সক্ষম। নিজের প্রকৃত ভাব প্রকাশ হইলে সধারণতঃ সমস্তই প্রকাশ হইল। কারণ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার সদসৎ কার্য্য সমূহ সর্বত্রই প্রায় সমান; সুতরাং যিনি আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার লীলা বর্ণন করা অসম্ভব নহে, বরং সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়।

যাহা হউক আমার এই খোকাভাবের সহিত এখনও অনেক অপ্রাকৃত ভাবের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তবে প্রাকৃত লোকের সঙ্গ আমার যত বাড়িবে এবং প্রাকৃত (সাধারণ) লোকের আচার, ব্যবহার, ভাষা, কার্য্য আমাকে যে পরিমাণে আশ্রয় করিবে, আমিও সেই পরিমাণে প্রাকৃত লোকের ন্যায় হইয়া যাইব এবং পরিশেষে একেবারে একজন

প্রাকৃত লোকে পরিণত হইব। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত লোকে প্রভেদ একমাত্র অবস্থা লইয়া। যাঁহারা অপ্রাকৃত লোক তাঁহারা বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় থাকিয়া অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া যাহাতে জীবের মঙ্গল হয় অর্থাৎ জীব যাহাতে আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা নিজে কার্য্য করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, অথচ সাধারণভাবে থাকিয়াই উক্তরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন; ইহাই অপ্রাকৃত লোকের লক্ষণ। আর যাহারা প্রাকৃত লোক তাহারা নিজ প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোতে পড়িয়া আপনাকে আপনি না জানিয়া দেহেতে আমি আমার বোধ করিয়া ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থই একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং স্বভাবের (আত্মভাবের) বিপরীত গুণাদি ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, পশুবৎ ভাবে কার্য্য করিয়া কালের ভক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হইয়া বার বার দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া অশান্তিরূপ জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে, ইহাই প্রাকৃত লোকের লক্ষণ।

এক্ষণে আমি যাঁহার দ্বারা লালিত ও পালিত হইতেছি, তাঁহার সেবার গুণে মোহিত হইয়া, তিন যাহা বলেন তাহা শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ অস্পষ্টভাবে সেই সকল শব্দ আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি মা, বা, কা, দা দি শব্দগুলি অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারি এবং যিনি আমাকে স্তনদুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতেছেন তিনিই যে আমার মা, তাহাও ইঁহাদের কথামত আমি বুঝিয়াছি। ক্রমশঃ মা হইতে মামা, বা হইতে বাবা, কা হইতে কাকা, দা হইতে দাদা, দি হইতে দিদি ইত্যাদি শব্দ সকল আধ আধ ভাবে উচ্চারণ করিতেও শিখিলাম। আমি এই সকল বোল বলিলেও; ইহা কিন্তু আমার শরীররূপ সেতারের স্বাভাবিক বোল নহে। কারণ শরীররূপ সেতারের স্বাভাবিক বোল যাহা দশ প্রকারের ধ্বনি আছে, তাহা বিনা আঘাতে বাজিয়া উঠে এবং সে ধ্বনি আমার ইহা নহে। কারণ আমার শরীররূপ সেতার বর্তমানে সাধারণ লোকের ভাবে পতিত হওয়ায় অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার দ্বারা চালিত হওয়ায় সাধারণ অপর সমস্ত শরীররূপ সেতার যে ভাবে চলিতেছে, আমার শরীররূপ সেতারও প্রায় তদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। সকল শরীরই সাধারণতঃ বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার সুরে ও তিন গুণের তারে বাঁধা আছে, সুতরাং একই সুরে সব সেতার বাঁধা থাকায়, অপরের শরীররূপ সেতার হইতে উত্থিত শব্দ আমার শরীররূপ সেতারে আঘাত করায়, আমার ভিতরে ঐ সকল শব্দের চিত্র গঠিত হইয়া তাহার পর কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে আপনা আপনি উপরোক্ত শব্দগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছে। এইরূপে অনেক বোল আমার এখন অভ্যাস হইয়া বাহিরে কথা বা বোলরূপে প্রকাশ হইতেছে।" আমা অপেক্ষা যাঁহারা বড় বড় খোকা, তাঁহারা এক্ষণে আমাকে বলিয়া থাকেন "খোকার মুখে এখন খুব বোল ফুটিয়াছে, যেন খই ফুটিতেছে। এই সকল শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইবামাত্র বা তাহাদের মুখ হইতে অপর কোন কথা বা শব্দ যখন আমি প্রথম শ্রবণ

করি, তখন তাহারা কি বলিতেছে তাহা বুঝিবার জন্যই যেন ফেল্ ফেল্ করিয়া তাহাদের দিকে তাহাদের দিকে তাকাইয়া; সেই সকল কথা বা শব্দ একটু ধীরভাবে প্রথমতঃ শ্রবণ করি; শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সকল শব্দ ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘাত প্রতিঘাতে মনের গোচর হইয়া শব্দ-চিত্র অঙ্কিত হইয়া প্রথমতঃ মনে মনে উচ্চারণ হইয়া তাহার পর কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে প্রথমে আধ আধ ভাবে এবং পরে পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে অনেকটা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ হইয়া থাকে। কথা বা শব্দ সকল আমাকে যে অভ্যাস বা মুখস্থ করিতে হয়, তাহা নহে; শব্দ সকল শুনিতে শুনিতে শব্দের ঘাত প্রতিঘাতে আমার ভিতরে আপনা আপনি শব্দ চিত্র অঙ্কিত হইয়া কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে মনের ইচ্ছানুযায়ী শব্দ বা কথা সকল বাহির হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ব্যাকরণ অভ্যাস করার মত আমাকে উহা মুখস্থ করিতে হয় না।

বলা বাহুল্য, আমার খোকাভাবের ওজন যেমন যেমন বাড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয় সম্বন্ধেই আমার প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থায় জাত ছায়ারূপ অজ্ঞানতাও বাড়িয়া যাইতেছে; অথচ আমার এই ছায়ারূপ অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া বোধ নাই, ইহাকে আমার সত্যজ্ঞান বলিয়াই ক্রমশঃ বোধ হইতেছে। কারণ আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার স্রোত বাড়িয়া যাওয়ায় আমি আমার মধ্যাবস্থারূপ যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়া অসত্য-বিষয় সমূহকেই সত্য ও নিত্য বলিয়া প্রায়ই বোধ করিতেছি। বস্তুতঃ সত্য যে কি এবং নিত্য যে কি তাহা আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার প্রবল ভাবের জন্য নিরাকরণ হওয়া দুরূহ, তবে আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার সাম্যভাবে উহা নিরাকরণ করা দুরূহ নহে, বরং সহজ সাধ্য। প্রাণকর্ম্মের সাম্যভাবই স্থিরপ্রাণ এবং স্থিরপ্রাণই সত্য স্বরূপ। সত্য শব্দ সৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন; সৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, পরমাত্মা অর্থাৎ স্থিরপ্রাণ; "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে" বৃহত্ত্ব হেতু স্থির প্রাণই ব্রহ্ম পদবাচ্য, ইনিই সত্য স্বরূপ এবং ইনিই সত্যনারায়ণ পদবাচ্য এবং উক্ত প্রাণই একমাত্র নিত্য পদার্থ। প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থায় পড়িয়া যাহা কিছু দেখিতেছি তৎসমুদয়ই অসত্য এবং অনিত্য। প্রাণেতে সত্যতা ও নিত্যতা উভয়ই বিদ্যবান। প্রাণেতে সত্যতা ও নিত্যতা বিদ্যমান থাকিলেও প্রাণের বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থায় যোগমায়া কর্তৃক মায়া দ্বারা ঐ প্রাণ আবৃত থাকায় গুণ ও ইন্দ্রিয়গণকেই উক্ত মায়া কর্ত্তৃক সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং আমারও সত্যবৎ প্রতীতি হইতেছে। বস্তুতঃ গুণ এবং ইন্দ্রিয়গণ এবং ইহাদের কার্য্য সমুদায় সমস্তই অনিত্য এবং অসত্য। প্রাণের সত্যতা এবং নিত্যতা উভয়ই যাহা রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা অসাধ্য নহে, তবে আমার প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থায় খোকাভাবে উহা অগ্রাহ্যের বিষয় হইয়া আছে; কারণ এই মধ্যাবস্থায় যোগমায়া কর্তৃক আমার বর্তমান বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমাকে গুণাদি দেবগণের সেবায় আসক্ত রাখিয়াছে এবং ভোগিকান্ত নামক বায়ুর সাহায্যে উক্ত যোগমায়া আমাকে সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া, অসত্য ও অনিত্য বিষয়ে

আসক্ত করিয়া নিজ প্রাণ হইতে মনকে দূরে লইয়া ফেলিয়াছে, এবং অন্ধকারময় অসত্য ও অনিত্য স্বর্গাদি লাভের প্রলোভনে আমাকে আবদ্ধ করিয়া গুণাদি দেবগণের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেছে এবং ভব-কারাগার হইতে আমার উদ্ধারের পথও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

উপরে প্রাণকেই সত্যস্বরূপ কহা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের মধ্যাবস্থাকে অসত্যও কহা যাইতে পারে। কারণ যাহা সত্য তাহাও তিনি এবং যাহা অসত্য তাহাও তিনি। যাহা সৎ নহে তাহাই অসৎ; অর্থাৎ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ যে কর্ম চলিতেছে, তাহাই অসত্য; ইহা অসত্য হইবার কারণ, ইহার আদি অন্ত শূন্য, এবং যাহার আদি ও অন্ত শূন্য, তাহার মধ্যাবস্থা থাকিতে পারে না সুতরাং অসত্য। তবে যে আমার প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থা অনুভব হইতেছে, তাহা কেবল যোগমায়ার মায়ার দ্বারাই বোধ হইয়া থাকে। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার অনুভব করার নামই মায়া। প্রাণকর্মের আদি ও অন্ত অবস্থা শূন্যস্বরূপ সৎভাব, আর প্রাণকর্মের বর্তমান অবস্থাই মধ্যাবস্থা অসৎ পদবাচ্য। এই প্রাণকর্মের সমস্ত অবস্থার অতীতাবস্থারূপ প্রাণের প্রাণ সৎ ও অসতের অতীতাবস্থা, অর্থাৎ মহাপ্রাণ বা পরমাত্মা যিনি সত্য ও অসত্যের অতীত অথবা যিনি ভাল ও মন্দের অতীত। এই সত্যস্বরূপ মহাপ্রাণের ধ্যানে মগ্ন থাকা সকলেরই একমাত্র কর্তব্য, ইহাই সত্যের উপাসনা। এই সত্যের ধ্যানকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে "সত্যং পরং ধীমহি।" বলা বাহুল্য এক্ষণে আমার উপরোক্ত ধ্যান প্রায়ই আর নাই, কারণ আমার ওজন বৃদ্ধির সহিত আমার খোকা ভাবও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ আমার ওজন বৃদ্ধির সহিত আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার গতিও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তৎসহ আমার চঞ্চলতা ও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহার সহিত আমার মনের চঞ্চলতাও বাড়িয়া যাইতেছে। আমার ধ্যান এক্ষণে প্রায় সম্মুখস্থ বিষয়ের, অর্থাৎ যে বিষয়টি নজরে পড়ে ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাহা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকি।

যাহা হউক সাধারণ বড় বড় খোকাদের সঙ্গে প্রায় সর্বদা থাকায়, বড় বড় খোকারা যাহাকে ভাল বা মন্দ বলিয়া থাকে, তাহাদের কথামত ক্রমশঃ আমিও "এটা ভাল, ওটা মন্দ" বলিতে শিখিয়াছি; নচেৎ আমার এ খোকাভাবে আর ভাল মন্দ কি আছে? যাহা দেখি বা শুনি তাহাই অনুকরণ করিতে যাই, আবার কখন বা আমার ইচ্ছামত যা তা একটা করিয়া বসি, ভালমন্দ কিছুই দেখি না। কখন একটা মনোমত দ্রব্য পাইলে আনন্দ করিয়া থাকি এবং তাহা না পাইলে ট্যাঁ বা প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া থাকি। এক্ষণে আর আমার "ঙা" শব্দ করিয়া অথবা "উ" "আঁ" শব্দ করিয়া কান্না নাই। স্বরের পরিবর্তন হওয়ায় আমার কান্নারও পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সুখ বা দুঃখ আমার এখন বোধ নাই; বড় বড় খোকারা যাহাতে সুখ বা দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন, আমিও প্রায় এখন সেই সমস্ত বিষয়েই সুখ বা দুঃখ বোধ করিয়া থাকি। তবে বড় বড় খোকাদের

ওজন বেশী থাকায় এবং সুখ দুঃখের বিষয়ও বেশী থাকায়, তাঁহারা আমার অপেক্ষা বেশী সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আমার মত চুযিকাটি বা ঝুমঝুমি পাইলে আর সন্তুষ্ট হন না; প্রভেদ মাত্র এই। আমার সুখকর বিষয়ের মধ্যে চুষি বা ঝুমঝুমি বা কোনও একটা খেলনা এবং তাহা পাইলেই সুখবোধ করিয়া থাকি এবং তাহা না পাইলে বা কেহ কাড়িয়া লইলে দুঃখবোধে ট্যা পা প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া থাকি। আমি কাঁদিলেই বড় বড় খোকারা বা বড় বড় খুকীরা আমার কাছে আসিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিয়া থাকেন "আহা মরি মরি গা, তাইত গা, কে খোকার খেলনা লয়েছে গা, তাই খোকার দুঃখু হয়েছে ও তাই কাঁদ্ছে।" আমিও তাহাদের এইরূপ আদরের কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, কোনও জিনিষ না পাইলে এবং তাহার সহিত কান্না আসিলেই তাহাকে দুঃখ বলিয়া থাকে এবং দুঃখ শব্দের এই প্রকার অর্থ বোধ হওয়ায় এইরূপ করিয়াই দুঃখ করিতে হয় বলিয়া মানিয়া লইলাম। এইরূপ কান্নার সময়ে যেমন উহারা আমার হস্তে একটি লালরঙ্গের চুযিকাটি বা অপর একটা কিছু খেলনা দিল, আমি অমনি তাহা পাইয়া যেন সন্তুষ্ট হইয়া দন্ত বাহির করিয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে লাগিলাম, আমার হাসি দেখিয়া উহারা বলিয়া উঠিল "এইবার আমাদের খোকার খুব আনন্দ হইয়াছে।" আমিও বুঝিয়া লইলাম যে দাঁত বাহির করিয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিলেই তাহাকে সুখ বা আনন্দ কহিয়া থাকে। সুখ বা আনন্দের অর্থ আমার এইরূপই বোধ হইয়াছে; এবং ইহা ব্যতীত সুখ বা আনন্দের অপর কোনও রকম অর্থবোধ আমার নাই।

উপস্থিত আমার ওজন বৃদ্ধির সহিত আমার বায়না বা অভিলাষ যাহা বাড়িয়াছে, তাহার সহিত এক্ষণে আর এক উপসর্গ দেখা দিয়াছে, সে উপসর্গটি কি? আমার অভিলায ও বায়না করা রোগ ত' পূর্ব হইতেই আছে তাহার সহিত এক্ষণে অভিমানরূপ উপসর্গ যোগ দিয়াছে। আমার বায়না করার সহিত অভিমান মিলিয়া আমার উপদ্রবের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমি কিন্তু জানি যে আমি কোনও উপদ্রব করি না, বা আমার কোনও উপদ্রব আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। এই উপদ্রবের অবস্থায় আমার আর এখন গোপালবেশের অর্থাৎ হামাটানার অবস্থা নাই। এখন আমার "পা" হইয়াছে। পা যে আমার ছিল না তাহা নহে, তবে পায়ে জোর না থাকায় ইতিপূর্বে আমার পা থাকা না থাকা দুইই সমান ছিল। এক্ষণে "আমার পা হইয়াছে" বলায় বুঝিতে হইবে যে আমার পায়ে জোর হইয়া আমি এখন চলিতে পারি। তবে বড় বড় খোকাদের মত চলিতে পারি না। দুঃখের বিষয় মধ্যে মধ্যে পতনও হইয়া থাকে। আমি পড়িয়া যাইলেই প্রথমে একবার চারিদিকে দেখি কে কোথায় আছে। দেখিবার উদ্দেশ্য আমি যে পড়িয়া গিয়াছি তাহা কেহ দেখিয়াছে কিনা; যদি কেহ না দেখিয়া থাকে তাহা হইলে অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়াই আবার দৌড়াইতে থাকি। দৌড় দিবার উদ্দেশ্য পাছে আমার পতন অবস্থা কেহ অনুমান করিয়া লয়। আর যদি কেহ দেখে বা কাহারও সম্মুখে পড়িয়া

যাই আর সে যদি বলে "আহা খোকা পড়িয়া গিয়াছে, ধর ধর" তাহা হইলেই অমনি "ট্যা" বা "প্যা" করিয়া কাঁদিয়া উঠি। পড়িয়া যাওয়ার কারণ আমাকে যে আঘাত লাগিয়াছে সেই জন্য যে আমি কাঁদিয়া থাকি তাহা নহে। উহা আমার অভিমানের কান্না। আমার মধ্যে এখন অভিমান বোধ জন্মিয়াছে এবং সেই অভিমান ভরেই এখন কাঁদিয়া ফেলি। আমার এ অভিমান আমার অহংবোধ হইতে জন্মিয়াছে। আমার এই অভিমান আমার মোহরূপ অসুরের সহচর, ইহা গর্ব। মোহ শব্দের অর্থ দেহাদিতে "আমি আমার বোধ"; ইহাকেই মোহ কহিয়া থাকে ঃ—

মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

"আমি আমার" বোধ ও অভিমান আমাতে যাহা এখন আসিয়াছে তাহাও প্রাকৃতিক লোকের সহবাসেই আসিয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃতিক (সাধারণ) লোকরে সহবাসেই আমার এই মোহ এবং অভিমানের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। আদর ও যত্ন বেশী পাওয়াতেই আমার অভিমানটাও কিছু বেশী হইয়াছে। এই অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে আমার রাগও যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাড়িয়া চলিয়াছে। এ রাগ আমার অনুরাগ নহে, কারণ অনুরাগ অভিলাষের সহিতই জন্মিয়াছে। এ রাগ অর্থে আমার ক্রোধকে বুঝিতে হইবে। সাধারণে ক্রোধকে রাগ বলিয়া থাকে, যেমন খোকা বড় রাগ করিয়াছে বা রাগিয়াছে। আমার এই ক্রোধও সঙ্গদ্বারা বিশেষরূপে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

যদিও ইহার বীজ আমার মধ্যে রহিয়াছে, তথাপি সৎসঙ্গের দ্বারা উহা বিশেষরূপে ধৌত বা মার্জিত হইতেও পারে; কিন্তু তাহা না হইয়া প্রাকৃত (সাধারণ) লোকের সঙ্গদ্বারা কাম অর্থাৎ কামনার ন্যায় ক্রোধাধি আসুরিক ভাব সকল বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও রঞ্জিত হইয়া থাকে, আমারও তাহাই হইতেছে, তবে আমি খোকা, আমি অত জানিও না বা বুঝিও না! রাগ বা ক্রোধই বা কি, আর মোহই বা কি, আর কামই বা কি? আর অভিমানই বা কি তাহা আমি কিছুই জানি না। সাধারণে যাহা করে তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমি তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকি। সাধারণে যাহাকে রাগ বলে আমিও তাহাকে রাগ বলিয়া থাকি। কিন্তু এই রোগের উৎপত্তি কোথা হইতে হইতেছে তাহা আমার জানা উচিত।

প্রথমতঃ আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার বহির্মুখী গতি যাহা হইতেছে, তাহার মধ্যে ঈড়ানাড়ীস্থিত ভোগিকান্ত নামক বায়ুরূপী আসুর ভাব দ্বারা বহির্ব্বিষয়ে লক্ষ্য পতিত হইবামাত্র বুদ্ধির সাহায্যে প্রবৃত্তি উহা মনের গোচর করাইয়া বহির্ব্বিষয়ের সঙ্গে কামনা মনের মধ্যে জন্মাইয়া দিয়া ঐ কামনা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া থাকে। তাহার পর সঙ্গের দ্বারা বিষয় সম্বন্ধে কামনা মনের মধ্যে প্রবৃত্তি কর্তৃক উথিত হইয়া কাম (কামনা) ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। এই কামভাব প্রবল হইলে উহা কামের প্রধান অনুচর কামজ্বরে

পরিণত হয়। এবং এই অবস্থায় কামনা সিদ্ধির বাধা ঘটিলে, ঐ বাধাজনিত ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্বে যে কামজ্বরের কথা উক্ত হইল ঐ কামজ্বর প্রকাশ পাইবার সময় দেহও ঈষৎ উষ্ণ হয় এবং বায়ুর দ্বারা নাড়ীর গতিও ঈষৎ চঞ্চলভাব ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই কামজ্বর। তাহার পর যখন ক্রোধ প্রকাশ পায়, তখন আমার শরীরও নাড়ী কামজ্বরের অবস্থার মত থাকে, অধিকন্তু কর্ণদ্বয়ও উষ্ণ হয় এবং ঈষৎ বিকার অবস্থার ভাব প্রাপ্ত করায়। তখন আমার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইয়া অজ্ঞান রূপ মোহ "আমি আমার" বিষয়ে আমাকে সম্যকরূপে আসক্ত করাইয়া আমার পূর্বস্মৃতি লোপ করাইয়া দেয় এবং তখন আমার বর্তমান ছায়ারূপিনী বুদ্ধি যাহা আছে তাহাও নষ্ট করিয়া দিয়া আমার দৈব ভাবের বলকে একেবারে নষ্ট করিয়া আসুরিক ভাবের অভিনয় করাইয়া থাকে। আমি এখন কাদার বা ক্ষীরের ডেলার মত। প্রাকৃত লোকের সঙ্গরূপ ছাঁচে পড়িয়া আমার চরিত্র ও কার্য্য প্রণালী সমস্তই প্রাকৃত লোকের মত গঠিত হইয়াছে। আমি যাঁহাদের নিকট লালিত পালিত হইতেছি তাঁহরা সকলেই আসুরিক সম্পদে ধনী, তাঁহাদের দৈব সম্পদের অভাব থাকায় আমিও আসুরিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছি ও হইতেছি। ইঁহারা যদি দৈবী সম্পদে ধনী হইতেন, তাহা হইলে আমিও দৈবী সম্পদের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ও অধিকারী হইতে পারিতাম, এবং তাহার দ্বারা আমার আসুরিক ভাবকে অন্ততঃ নিরস্ত রাখিতে যত্নবান হইতেও পারিতাম। কিন্তু দৈব সম্পদ আমার কিছু মাত্র নাই, তাহা আমার না থাকাই সম্ভব, কারণ আমা অপেক্ষা বড় বড় খোকাদেরই যখন তাহা নাই তখন উহা আমার থাকা সম্ভবপর নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে এখন আমার উপদ্রবটা কিছু বেশী হইয়াছে। আমার এই উপদ্রব নিবারণের জন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে প্রায় জুজুর ভয় দেখান হইয়া থাকে। জুজু যে কি তাহা আমি জানি না; তবে আমি কোনও দিকে যাইতে চেষ্টা করিলে বা কোনও দ্রব্য লইতে গেলে আমাকে ইঁহারা বলিয়া থাকেন, "বাবা খোকা, ওদিকে যেও না, ওখানে জুজু আছে, জুজু ধ'রে নিয়ে যাবে বা জুজু কামড়িয়ে দিবে।" "জুজু কামড়াবে" বা "ধরে নিয়ে যাবে" শুনিবামাত্র আমার মন দুর্বল হইয়া আমার বুকের ভিতর ধড় ফড় করিযা বুকের ভিতর কেমন একটা কি হইয়া আমাকে যেন ভয়ে জড়সড় করিয়া দেয়। "জুজু" নাম শুনিলেই আমি পলাইয়া আসি আর সেদিকে যাই না। রাত্রিতে শুইবার সময় একটু ঘুমাইতে বিলম্ব হইলে বা ঘুম না আসিলে যেমন জুজুর নাম লইয়া আমাকে বলা হয় "খোকা ঘুমাও, না ঘুমালে জুজু আসবে, ঐ জুজু আসছে," অমনি আমি "জুজু আসছে" শুনিবামাত্র চক্ষু বুজিয়া মার কোলের ভিতর ঢুকিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকি। কোনও রকম ভয় পাইলেই তাড়াতাড়ি অগ্রে মার কাছেই আসিয়া থাকি, মার কাছে আসিলেই যেন আমার সব ভয় দূর হইয়া যায়। আমার মাও তারপর আমার ভয় দেখিয়া বলিয়া থাকেন "দূর হ জুজু, খোকা ঘুমাইয়াছে।" আমাকে বলেন " খোকা

ঘুমাও, আমি জুজুকে তাড়াইয়া দিয়াছি, না ঘুমাইলে আবার জুজু আস্‌বে।" এই রকম কথা বলিতে বলিতে আমার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে "খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এলো দেশে" ইত্যাদি বাক্যও সুরের সহিত গান করার মত ভাবে বলিতে থাকেন, আমিও তাহা শুনিতে শুনিতে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়ি। আমি ঘুমাইয়া পড়িলে, মা আমার গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া আপন কার্য্যে চলিয়া যান। যাহা হউক জুজুর ভয়টা আমার খুবই আছে। আমার জুজুর ভয় থাকাকই সম্ভব, কারণ বড় বড় খোকাদেরই যখন জুজুর ভয় এখনও যায় নাই, তখন ইতিমধ্যেই আমার জুজুর ভয় না যাওয়াই সম্ভব। বড় বড় খুকীরা যাহারা আমাকে জুজুর ভয় বেশী দেখায় তাহাদেরও জুজুর ভয় বড় বড় খোকাদের অপেক্ষা কম নহে বরং তাহাদের ঐ ভয় শতগুণে বেশী। বস্তুতঃ জুজু কিছুই নহে, ইহা একটি কাল্পনিক ভূত বিশেষ মনের ভূল সংস্কার। অল্প বয়সে এই জুজুর ভয় পরিণামে ভূতের ভয়ে পরিণত হইয়া থাকে। জুজুর ভয় দেখানতে অনিষ্ঠ আছে; সে অনিষ্ট এই যে তাহাতে মনের সাহস প্রায়ই নষ্ঠ হইয়া যায়।

যাহা হউক আমি এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ঠ "নাদুষ নুদুষ" খোকায় পরিণত হইয়াছি। আমার ওজনও এখন ৮।১০ সের হইবে। এক্ষণে আমি যে খোকা তাহাও আমি বুঝিয়াছি। কারণ কেহ খোকা বলিয়া ডাকিলেই আমি তাহার নিকট যাই; আমাকে যে বেশী আদর করে, আমিও তাহাকে ভালবাসি, তবে ভালবাসা যে কি পদার্থ তাহা আমি জানি না। আমার ভালবাসায় স্বার্থ রহিয়াছে। আমাকে যে ভালবাসে অর্থাৎ আমি যাহার নিকট হইতে আমার অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হই বা যাহা কর্তৃক আমার সদসৎ ইচ্ছার পূরণ হইয়া থাকে, তাহাকেই আমি ভালবাসিয়া থাকি। এইরূপ ভাব ব্যাতীত ভালবাসার অপর অর্থবোধ আমার নাই। আমাাকেও যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারাও স্বার্থের সহিত আমাকে ভালবাসেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহাদের স্বার্থ প্রথমতঃ খোকাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ঠি, দেখিতে ভাল, কোলে করিয়া বেশ আরাম বোধ হয় এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে বেশ উপকার প্রাপ্ত হইবে। নিঃস্বার্থভাবে যে আমাকে কেহ ভালবাসে তাহা আমার বোধ হয় না, সকলেরই ভালবাসায় স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। স্বার্থের সহিত আসুরিক ভাবের ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া পরস্পর আবদ্ধ হওয়ায় এই ভালবাসা পরিণামে একদিন জ্বালায় পরিণত হইয়া থাকে। স্বার্থ থাকিলেই স্বার্থের হানিতে ভালবাসা নষ্ঠ হইয়া গিয়া মনোবেদনারূপ জ্বালা উপস্থিত হইয়া কষ্ঠ হইয়া থাকে। আমি খোকা আমি প্রকৃত ভালবাসা কি পদার্থ তাহা জানি না; বড় বড় খোকাদের ভালবাসা সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান আছে, আমার মনেও স্বার্থের সহিত ভালবাসার ছাপ তদ্রূপ ভাবে অঙ্কিত হইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃত ভালবাসার বোধ আমার থাকিলেও সে ভালবাসা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার আসিতেছে না। তবে যতটা সম্ভব ততটুকু প্রকাশ করিব। ভালবাসা শব্দের মধ্যে দুইটি কথা রহিয়াছে, প্রথমটি "ভাল" দ্বিতীয়টি "বাসা"। দুইটি শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া

"ভালবাসা" শব্দটি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ "ভাল" শব্দটি ভদ্র শব্দ হইতে উৎপন্ন; ভদ্র শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকানন এবং বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কানন বলিয়া ভদ্র শব্দের অর্থে দেহরূপ বৃন্দাবনই বুঝায়। এই ভদ্র শব্দ হইতে উৎপন্ন যে "ভাল" শব্দ উহা "ভা" ধাতু (দীপ্তি পাওয়া) হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ললাটস্থ তেজ যাহা দীপ্তি পাইতেছে তাহাই "ভাল" শব্দার্থ। দ্বিতীয় "বাসা" শব্দটি বস্ ধাতু (বাসকরা) হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ আবাস স্থান। সুতরাং ললাট দেশে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে তাহাকে দেখিবার জন্য বা পাইবার জন্য বা সেই স্থানে যাইবার জন্য অথবা সেই স্থানে থাকিবার জন্য অহৈতুকীভাবে ব্যাকুলতার সহিত অন্তরে যে ভাবের উদয় হয় সেই অবস্থার নামই ভালবাসা। বাহিরেও দেখা যায় যে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে দেখিবার জন্য বা পাইবার জন্য তাহার যে ব্যাকুল ভাব হয় লোকে তাহাকেই ভালবাসা কহিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ আসুরিক ভাবের দৃষ্টি প্রায় অধোগামীই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কণ্ঠের অধোদেশ হইতে নিম্নস্থানেই সাধারণতঃ লক্ষ্য পতিত হইয়া থাকে; দেহের ঊর্দ্ধভাগে কপালদেশ প্রায় কেহ দেখে না, এবং কপাল দেশকেও কেহ ভালবাসে না। কপালদেশে নজর বা লক্ষ্য না পড়ায় আসক্তির সহিত স্বার্থ মিলিয়া সাধারণ ভালবাসায় পরিণত হইয়া থাকে। যেখানে আসক্তি সেইখানেই স্বার্থ জড়িত হইয়া যায়, স্বার্থ থাকিলেই ভালবাসা পরিণামে জ্বালায় পরিণত হইয়া থাকে। ভালবাসার প্রকৃত অর্থ ভালো থাকা অর্থাৎ ভ্রূর মধ্যস্থলরূপ কপালে বাস করা বা থাকার নামই ভালবাসা। বর্তমানে গুণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত আমার প্রণয় হওয়ায় (প্রণয়—প্রা-ণী-পাওয়া) অর্থাৎ গুণ ও ইন্দ্রিয়গণকে পাইয়া তাহাদের দ্বারা আশু সুখ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের প্রতি প্রীতি বা সন্তুষ্ট হইয়া আমার মন ভ্রূর মধ্যে ভালরূপ কপালদেশে না থাকিয়া কণ্ঠের অধোদেশে সর্বদাই অবস্থিতি করায় আসুরিক ভাবে আসক্ত হইয়া বর্তমান প্রণয়রূপ ভালবাসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহা নিঃস্বার্থ ভালবাসা নহে। ভালবাসা একটা অবস্থা বিশেষ অর্থাৎ ভ্রূর মধ্যে মন তন্ময়ভাবে থাকিলে যে অবস্থা হয় তাহার নামই নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে আমাকে বেশী আদর করে ও বেশী যত্ন করে এবং আমি যাহা চাই তাহাই যে আমাকে দেয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমার সকল ইচ্ছা পূরণ হয়, তাহাকেই আমি ভাল বাসিয়া থাকি। আবার যাহার নিকট হইতে আমি আমার অভিলষিত দ্রব্যাদি না পাই, বা যে আমাকে আদর করে না, আমিও তাহাকে ভালবাসিনা এবং তাহার কাছে বড় একটা যাই না। যাহাকে আমি ভালবাসি এবং যাহার নিকট বা যাহার কোলে যাইতে আমি সর্বদাই চাই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন "খোকা অমুকের বড় "ন্যাওটো।" "ন্যাওটো" কথাটা একটা গ্রাম্য অপভ্রংশ শব্দ মাত্র। ইহা চলিত কথা মাত্র। যাহার কাছে সর্বদা থাকিতে ইচ্ছা হয় তাহারই সম্বন্ধে "ন্যাওটো" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "ন্যাওটো" শব্দ দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত করা হয় তাহার মূলে

ভালবাসা থাকায় এ শব্দটিকে "ভালবাসা" শব্দের অপ্রভ্রংশও বলা যাইতে পারে। আমি যাঁর মত ন্যাওটো, তাঁহার নিকট হইতে আমার অভিলষিত দ্রব্যাদি সেই পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকি ইহা বুঝিতে হইবে, কখনও বা প্রকাশ্যে পাইয়া থাকি আবার কখনও বা গোপনে কেহ না জানিতে পারে এমন ভাবেও পাইয়া থাকি। এরূপ ব্যক্তি "ন্যাওটো" কে না হয়? আমি ত' খোকা, আমার ত' হওয়াই সম্ভব। আমি যাঁর বেশী ন্যাওটো তিনিই বেশী করিয়া আমার মাথাটা খাইতেছেন ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপে অনাবশ্যক আদর ও যত্ন পাইয়া এক রকম আদুরে খোকা হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমার "আমি" জ্ঞানটা বেশ টন্‌টনে হইয়াছে; অবশ্য আমার এই "আমি" জ্ঞান আসুরিক ভাবের অর্থাৎ দেহে আত্মবোধ জন্মিয়াছে। আমার প্রকৃত "আমি"র জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ আমি এখন আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার খেলায় মাতিয়াছি। এক্ষণে আমি খোকা, "খোকার মা" বলিলে আমি বুঝিয়া থাকি। যে আমার "মা"কেই উল্লেখ করা হইতেছে। আমার মাকে দেখাইয়া যদি কেহ বলে 'ও খোকার মা নহে, ও আমার মা, তাহাই হইলেই প্রতুল; আমি অমনি তখনই অভিমান ভরে ভূমে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। কিংবা 'মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া যে আমার মাকে আমার মা নহে বলিতেছিল তাহাকে মার কাছে আসিতে দিই না, সে আসিলেও তাহাকে সাধ্যমত আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিতেও ত্রুটি করি না। এইরূপ এক্ষণে খোকারূপী আমার অনেক বিষয় আছে, যথা খোকার ঝি, খোকার চাকর খোকার পোষাক, খোকার গাড়ী ইত্যাদি। আমি জানি, এ সব আমার, ইহা অপরের নহে। 'আমি' 'আমার' জ্ঞান এই সময় হইতেই আমার অন্তরে অন্তরে বদ্ধ হইতে চলিল। দুঃখের বিষয় আমিই বা কে আমারই বা কি, তাহা কিছুই বুঝি না, এবং ইহা যে বুঝিবার বা জানিবার বিষয়ে তাহাও জানি না। ইহা যে কেবল আমিই জানি না তাহা নহে, আমার অপেক্ষা ওজনে বড় বড় খোকারাও বোঝেন না। আমি যেমন আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া ঘোরপাক খাইতেছি, আমার অপেক্ষা ওজনে বড় খোকারাও আপন আপন প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার ফেরে যোগমায়া কর্তৃক আমরা কেহই বুঝিতে পারিতেছি না যে আমরা ঘোরপাক বা হাবুডবু খাইতেছি। মধ্যাবস্থারূপ যোগমায়ার মোহিনী শক্তিতে সকলই মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত ভাবে যোগমায়ার মণিহারীর দোকানের বাহ্যিক পরিপাট্যে দিশাহারা হইয়া রত্নের বদলে কাচের খেলনা কিনিতেছি। যেমন কোনও ক্রেতা সাধারণ কোনও মণিহারীর দোকানে যাইলে, দোকানের বাহ্যিক সাজের চটকে পড়িয়া দোকানের বাহার দেখিতে দেখিতে সব ভুলিয়া গিয়া ক্রেতার আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় না করিয়া শেষে যাহা তাহা একটা কিনিয়া বসে, তদ্রূপ মধ্যাবস্থারূপ যোগামায়ার সমগ্র সংসাররূপ মণিহারীর দোকানে আমি খোকারূপ ক্রেতা আসিয়া দোকানের বাহ্যিক চটকে ভুলিয়া গিয়া আমার আত্মরত্নরূপ আপনাকে

আপনি হারাইয়া কেবল খেলার পুতুলই কিনিতেছি এবং তাহা লইয়াই আমোদ করিতেছি। এ খেলা যে চিরস্থায়ী নহে তাহা জানিয়াও আপনাকে আপনি ভুলিয়া রহিয়াছি, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে বা কি হইতে পারে? আমা অপেক্ষা অনেক বড় যে সব খোকা যাহাদের ওজন আমা অপেক্ষা অনেক বেশী এমন কি যাহাদের সঙ্গে তুলনায় আমি কিছুই নহি বলিতে পারা যায়, তাহারাই যখন আপনাকে আপনি ভুলিয়া রহিয়াছে, তখন আমি খোকা আমি ভুলিয়া থাকিব না কেন? সুতরাং আমার এই খোকাভাবের লীলা বুঝিতে আমি অক্ষম।

যাহা হউক আমি এখন বেশ স্পষ্ট করিয়া বাবা, মা, দাদা, জেঠা, দিদি ইত্যাদি কথাগুলি বলিতে পারি। তবে এই সব কথা কেন বলি তাহার কোনও উদ্দেশ্য নাই, অপরে যেমন সব কথা কহিয়া থাকে আমিও তাহাদের অনুকরণে তাহাদের সহিত খোকাভাবের সুরের সঙ্গে আদুরে আদুরে ভাবে কথা কহিয়া থাকি। আমার কথায় সকলেই যেন বেশ খুশী হন এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন "খোকার কথাগুলি কেমন মিষ্ট দেখিয়াছ।" এরূপ কথা শুনিলে আমার মা অমনি বলিয়া উঠেন "আহা আমার খোকার কথা যেন মধু মাখা, ওদের খোকাটা যখন কথা কয় তখন তাহার কথাগুলো যেন টেঁস্ টেঁস্ করে, রস কস কিছুই থাকে না, আমার বাছার কথা যেন মধুমাখান।" আমার মার কাছে আমার সমস্তই ভাল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমার মার কাছে যদি কেহ বলেন, "খোকাকে একটু রোগা রোগা দেখিতেছি কেন গা? খোকাকে বুঝি পেট ভরিয়া ভাতটাত খাইতে দাও না।" বস্তুতঃ আমি যে রোগা হইয়াছি তাহা নহে, ইা একটা কথার কথা মাত্র। বড় বড় খুকীদের মধ্যে পরস্পরের সহিত দেখাশুনা ইলে ছেলেপিলের কথা একটা জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে মাত্র। এরূপ কথা হইলে আমার মা বলিয়া থাকেন, "আর বাছা, ওকি ভাত খায়, এক মুটো ভাত, তাও খেতে চায় না এবং খেতেও পারে না, দেখ্‌ছেন না ওর আকার, খাবার জন্য মারামারি ক'রে খাওয়াতে হয়।" বাস্তবিকই আমি ভাত কম খাই বটে, কম খাবার কারণ আমার পেটত' আর গরুর গাড়ী নহে, যে বিশ মণ বোঝাই করিব! কেবল ভাত হইলে যা হউক দুটো খেতে পারি; কিন্তু রাত্রিদিনে মার দুগ্ধে এবং গাভীর দুগ্ধে প্রায় দুইসের দুগ্ধ খাইয়া থাকি, তারপর এটা সেটা কচুরী, মিঠাই ও ফলটা আস্‌টাও আছে; মুখ চলা প্রায় বন্ধ নাই। সেটা মা ভয়ে কাহাকেও প্রায় বলেন না, পাছে এত সব খাবার কথা শুনিয়া লোকে তাঁর খোকার খাবার বিষয় খোঁড়ে বা তাহাতে কেহ নজর দেয়, এই কারণে ও আমার খাওয়ার কথাটাও মা প্রায় কম করিয়াই বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু খাওয়ার ত্রুটি নাই, বরং বেশীই আছে। যাহা হউক আমার কথা কহা শুনিয়া সকলেই যেন সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয়। যাহার প্রতি যাহার আসক্তি বেশী থাকে, তাহার নিকট তাহার সবই ভাল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, নচেৎ আমার কথা যে মধুমাখান তাহা

নহে। সাধারণতঃ আমার ত' খোকাদের কথা প্রায় একরকম; তবে যার সেখানে "আমি আমার" বলিয়া বোধ আছে, তার ব্যথারূপ মোহ সেইখানে বর্তমান। "আমার" বোধ থাকিলেই তাহা মন্দ হইলেও ভাল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই "আমার" বোধই মোহের স্বরূপ বা মোহের রূপ, বিষয়াদি মোহের রূপ বা স্বরূপ নহে, বিষয়সমূহ মোহকর মাত্র। যেমন আমার পুত্রের বা পত্নীর দেহাদি নষ্ট হইলে, উহাদের অভাব জনিত আমার যে পরিমাণে কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে, অপরের পুত্র বা পত্নী নষ্ট হইলে আমি কি সেই পরিমাণে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি? অর্থাৎ নিজের পুত্র বা পত্নী বিয়োগে আমি যেরূপ কষ্ট অনুভব করি, অপরের পুত্র দ্বারা যাহা আমার নহে তাহাদের বিয়োগে আমি কি সেই পরিমাণে কষ্ট পাই? তাহাত' কাহারও হয় না। সুতরাং "আমি আমার" বলিয়া বোধ থাকাই প্রকৃত মোহপদবাচ্য বিষয়াদি মোহের রূপ বা স্বরূপ নহে; বিষয়াদি মোহ হইতেও পারে না। মোহ অবিদ্যাসম্ভূত, অবিদ্যার বৃত্তিমাত্র, অর্থাৎ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া যে অবস্থায় ভ্রমে দেহাদিতে আত্মবোধ হইয়া থাকে, সেই অবস্থাই মোহের স্বরূপ বা রূপ। আমার প্রতি আমার মাতারও সেইরূপ মোহ থাকায় অর্থাৎ আমার খোকা বলিয়া বোধ থাকায় তিনিও মোহের বশীভূত হইয়া আমাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখিয়া থাকেন। আমার সমস্তই তাঁহার চক্ষে ভাল বোধ হইয়া থাকে; ইহা বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম। কারণ বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থায় ঈড়ানাড়ীস্থিত বহির্ম্মুখী গতিরূপ বায়ুই ভোগিকান্ত নামধারী মহাসুরের প্রধান অমাত্য মোহ নামক অসুর। এই ভোগিকান্তের অবস্থা সাক্ষাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানরূপ মহাসুরের অনেক বৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে মোহ নামক অসুরও তাহার একটি প্রধান বৃত্তি। ভোগিকান্ত বা অজ্ঞানের অবস্থা জীবদেহে মোহরূপে প্রথমেই প্রকাশ বলিয়া মোহরূপ অসুরকে ভোগিকান্তের স্বরূপ বলা যাইতে পারে। অবিদ্যাগত করিয়া জীবদেহে আমি আমার বোধ করানই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বৃত্তি যে মোহ তাহার কার্য্য। ইহা বিষয়াদিতে আসক্ত করায় বলিয়া বিষয়ের উপর যে আসক্তি তাহাকেও মোহ বলা যাইতে পারে। বিষয়ে আসক্তিই বন্ধের কারণ, বিষয় বন্ধের কারণ নহে। বিষয়ে অনাসক্ত ভাব থাকিলে, বিষয় বন্ধের কারণ হইতে পার না। আমার খোকাকে "ও আমার খোকা নহে, ও ভগবানের খোকা" একথা কেবলমাত্র মৌখিকভাবে না বলিয়া যদি আমি অন্তরের সহিত ঐ ভাব মনে দৃঢ় ধারণা করিয়া ঐ কথা বলিতে পারি, তাহা হইলে আমার খোকা মরিলেও কোন কষ্ট হইতে পারে না। কারণ অপরের খোকা মরিলে যেমন আমার বিশেষ কোনও কষ্ট হয় না, তদ্রূপ ভগবানের খোকা মরিলে তাহাতে আর আমার কষ্ট কিসের? যাঁহর খোকা তাঁহারই কষ্ট হউক, তাহাতে আমার কষ্ট হইবে কেন? মুখে কিন্তু সকলেই ভদ্রতার খাতিরে বা লোকাচার মতে বলিয়া থাকেন যে "আমার খোকা নহে বা আমার কিছুই নহে, সবই ভগবানের।" ইহা কেবল কথার কথা মাত্র। আমি অবিদ্যাগত হইয়া মুখে বলিয়া থাকি

যে সর্বস্ব ভগবান বা গুরুকে দিয়াছি, বস্তুতঃ অন্তরে যোল আনাই ফাঁকি। কারণ যদি সমস্তই তাঁহার হইল, তবে বিষয় বিশেষের অভাবে আমি “বাপরে মারে” করিয়া কাঁদিয়া আকুল হই কেন? যখন বিষয় বিশেষের অভাব জনিত আমার শোক বা জ্বালা উপস্থিত হইতেছে, তখন ভগবানের খোকা বা ভগবানের সমস্ত ইহা যাহা বলি তাহা আমার মিথ্যা কথা বলা নহে কি? আমি অবিদ্যাগত হইয়া মোহান্ধ হইয়া ভগবানের সহিত ছলনা করিতেও ত্রুটি করি না। আমি যে ভগবানের সহিত ছলনা করি তাহা আমার বোধ নাই, কারণ আমি আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া ভগবান যে কি তাহা জানি না। সাধারণে যেমন মুখে ভগবান ভগবান করে আমিও সেই রকম করিয়া থাকি মাত্র। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার বহির্মুখীগতি থাকিতে ভগবান যে কে তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই।

যাহা হউক আমি এক্ষণে খোকাভাবে আলালের ঘরের দুলালের মত কখনও দিগম্বর বেশে কখনও কাপড় বা পোষাক পরিয়া রজস্তমগুণের বশীভূত হইয়া দম্ভ, দর্প অহঙ্কারের সহিত ধরণী কাঁপাইয়া চলিয়া থাকি; আমার কখনও বা মৃদুগতিতে থমকে থমকে হংসগতির ন্যায় আধ আধ ভাবে হাসিতে হাসিতে বাটীর পরিজনবর্গকে মোহিত করিয়া আদুরে আদুরে সুরে কত কথা কহিয়া থাকি। এ সমস্তই আমার খোকাভাবের বাল্যলীলা। আমার ওজন বড় বড় খোকাদের অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং ওজনের তারতম্যে গুণেরও তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক বিধায় বড় বড় খোকাদের মত রজস্তমগুণের আধিক্য ভাব আমাতে এখন আসে নাই। লোভের বিষয় আমার যত, বড় বড় খোকাদের তদপেক্ষা শতগুণে বেশী। লোভ কি এবং লোভ করাটা যে দূষণীয় তাহা আমিও যেমন জানি না, বড় বড় খোকারা ও তাহা জানিয়াও জানেন না, পার্থক্য এইটুকু মাত্র। লোভ কি তাহা অর্থবোধ আমার আদৌ এখনও হয় নাই। বড় বড় খোকাদের লোভের সাধারণ অর্থবোধ থাকিলেও তাঁহারা কিন্তু লোভ সম্বরণে একপ্রকার প্রায় অসমর্থ। সুতরাং আমি খোকা আমার পক্ষে লোভ সম্বরণ করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি লোভ যে সম্বরণ করিতে হয় তাহাই আমার জানা নাই। কোনও দ্রব্য বা বিষয় দেখিলেই তাহা পাইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বা লিপ্সা তাহাই লোভপদবাচ্য। তবে আমার অরুচিকর দ্রব্য দেখিলে, হয়ত তাহাতে আমার লোভ না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমি লোভশূন্য হইয়াছি ইহা মনে করা আমার ঠিক নহে। কারণ কাম (কামনা) ও রতি (ইচ্ছা) আমার হৃদয়ে বর্তমান থাকিতে লোভ যাইবার নহে। বাহ্যজগতে যোগমায়ার সংসাররূপ মণিহারির দোকান আমার চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত থাকায় বিষয়ের পর বিষয় আমার চক্ষুর সাহায্যে মনের গোচর হইয়া মনোমধ্যে লোভবৃত্তি উদ্ভাসিত হইয়া লোভের কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমি অনেক সময় মনে করিয়া থাকি আমার লোভ নাই কিন্তু তাহা আমার ভ্রম মাত্র। কারণ অনেক সময়ে আমার মনে বিষয়াকাঙ্ক্ষার

উদ্রেক করিয়া মনে মনে লোভের বিষয় সকল চিন্তা করাইয়া লোভ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। বিষয়াকাঙ্ক্ষাজনিত মনে মনে লোভের বিষয় চিন্তাকে আমি অনেক সময় দোষ বলিয়া ধরি না। আমার বর্তমান মনও উহাকে মন্দ বলিয়া মনে করে না। কেবল বাক্যের দ্বারা লোভ যাইবার নহে। ইহা ঈড়ানাড়ীস্থিত ভোগিকান্ত নামক মহাসুরের একজন প্রধান অনুচর এবং জীবদেহের বায়ুরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত মহাসুরের অভিপ্রেত কার্য্যসম্পন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ কামনা জনিত বিষয়র লোভ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই লোভ আমাকে ছাড়িবার পাত্র নহে, বাহ্যিক কেন উপায়ে ইহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় না। আমি সাধারণ গৃহস্থই হই আর বেশধারী সাধু সন্ন্যাসীই হই, আমি বাহ্যিক কোনও উপায়েই লোভ সম্বরণ করিতে পারিব না, লোভ আপন গতি অনুযায়ী কার্য্য করিবেই করিবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বেশধারী সন্ন্যাসীর অন্ততঃ অপরের মস্তকের জটা দেখিয়া নিজের মস্তকে আটা লাগাইয়া অপরের জটার ন্যায় নিজের জটা করিবার লোভ হইয়া থাকে; অপর বিষয়ের কথা আর কি বলিব, তাহা এক জটার দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিয়া লওয়া উচিত। মোটকথা, আকাঙ্ক্ষা থাকিতে লোভ যাইবার নহে।

"পরবিত্তাদিকং দৃষ্টা নেতুং যোহৃদিজায়তে।
অভিলাষো দ্বিজ শ্রেষ্ঠ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।"

এই লোভের আবার দুইটি যুবতী ভার্য্যা যাহা রহিয়াছে তাহারা আবার লোভ অপেক্ষাও ভয়ানক, তাহারা লোভ অপেক্ষাও বেশী শিকারী এবং তাহারা আমার মনের মধ্যে আমার অজ্ঞাতভাবে আশ্রয় লইয়া আমার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া মনকে মোহিত করিয়া সুন্দররূপে নিজ প্রভুর কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। তবে আমি খোকা, এত বুঝিতে পারি না। এই যুবতী ভার্য্যাদ্বয়ের মধ্যে একটি তৃষ্ণা ও দ্বিতীয়টি লালসা (আশা)। রূপে গুণে ইহারা লোভেরই সদৃশ। তবে আমার ওজন এখন কম থাকায় আমার বিষয় তৃষ্ণাও কম। কারণ আমার এখন বিষয়ের মধ্যে দুটো খেলনা বা দুচার রকম কাপড়ের পোষাক, ইহা ব্যতীত আমার এখন তৃষ্ণা বা লালসার বিষয় অপর কিছুই প্রায় নাই। এখনও উহাদের বিষয় আমার পক্ষে অনন্তে পরিণত হয় নাই এখনও একটা সীমার মধ্যেই আছে। সুতরাং বড় বড় খোকাদের সহিত তুলনায় আমার বিষয়তৃষ্ণা বা বিষয়লালসা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আমার বিষয়তৃষ্ণা বা বিষয়লালসা যে নাই তাহা নহে। যার যতটুকু তৃষ্ণা বা লালসা তার ততটুকুই জ্বালা। তবে বেশী ওজনের বড় বড় খোকাদের সহিত তুলনায় আমার উহা কমই বলিতে হইবে।

আমি এখন বাটীতে যাহা দেখি তাহা লইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকি। ইহা আমার তত দোষাবহ নহে। কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে, যে আমার যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে, অথচ কি যে হারাইয়াছে, তাহা আর আমার মনে নাই। আমার সে হারানো রত্ন প্রাপ্তির তৃষ্ণা হইয়াছে, এবং সেই হারানো রত্ন পাইবার আশাও থাকায় যাহা দেখি তাহাই আমার

সেই হারানো রত্ন মনে করিয়া উহা পাইববার জন্য ব্যস্ত ভাবে উদ্যত হইয়া থাকি, অথচ যাহা পাই তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া উহা ফেলিয়া দিয়া থাকি। এই কারেণ খেলনা প্রভৃতি পাইয়াও নিজেই অনেক সময়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকি। কাপড় পোষাকও যাহা পাইয়া থাকি, তাহাও দুই চারি দিন ব্যবহার করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি বা আর তাহা ব্যবহার করিতে না চাহিয়া আবার অন্য রকম পাইবার জন্য বায়নাও করিয়া থাকি। বড় বড় খোকাদের এরূপ নহে; বড় বড় বা বহুমূল্যবান বিষয়ের তৃষ্ণা অহরহঃ তাঁহাদের মনে জাগিয়া আছে। ধন রত্ন প্রত্যাশা, যশঃ-প্রত্যাশা ইত্যাদি প্রায় অনন্ত বিষয়ের পিপাসা অর্থাৎ তৎতৎ বিষয়-প্রাপ্তির লালসারূপ আশা সদাই জাগরূপ রহিয়াছে। তাঁহারা ঘুমাইলেও নিস্তার নাই, নিদ্রাবস্থায় তাহার মধ্যে কিছু কিছু স্বপ্ন দেখি সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও নিদ্রাকালে মধ্যে মধ্যে আমার বোধহয় যেন আমি আমার পূর্বরূপ চতুর্দিকে জ্যোর্তিমণ্ডলের মধ্যে গাঢ় নীলবর্ণের একটি গোলক এবং সেই গাঢ় নীলবর্ণের গোলকের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাই। ইহা দেখিলেই আমি যেন কি হইয়া যাই, তাহা আর আমি বলিতে পারি না, কারণ যে বলিবে, সে তখন থাকে না। তারপর কখন যে তাহা অদৃশ্য হইয়া যায় তাহাও বুঝিতে পারি না। তারপর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া যখন উঠিয়া ঘরের জিনিষপত্র ও মা, বাবা প্রভৃতিকে দেখি, তখন সব ভুলিয়া যাই। আর কিছুই মনে থাকে না। বাহিরের কোনও জিনিষও সেরকম দেখিতে পাই না, তাহা দেখিলেও স্মরণ হইতে পারিত। বিশেষতঃ আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার বর্হিমুখীগতি বৃদ্ধি হওয়ায় বাহ্যিক বিষয়েই আমার মনকে লইয়া গিয়া সব ভুলাইয়া দিয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় যখন আমার উপরোক্ত রূপ দর্শন হইয়া থাকে, তখন আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার উল্টাগতি হওয়ায় আমার কি যেন এক রকম হইয়া যায় এবং আমার ঐরূপ দর্শন হইয়া থাকে বলিয়াই এখন আমার এই খোকাভাবে বহির্বিষয়ে বড় বড় খোকাদের মত তত ভালবাসা বা আসক্তি জন্মায় নাই। সুতরাং ভবিষ্যতের তৃষ্ণা বা লালসা আমার নাই, বড় বড় খোকাদের তাহা যথেষ্টই আছে। তৃষ্ণা বা লালসা কাহাকে বলে তাহাই আমার এখন বোধ হয় নাই। সেই কারণে অতীত বিষয়ে বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে তৃষ্ণা বা লালসা আমার মনে উদয় হয় না। বড় বড় খোকাদের অন্তরে অতীতের ও ভবিষ্যতের তৃষ্ণা বা লালসা প্রবলরূপে বর্তমান থাকায়, সেই ভাবনাতেই তাঁহাদরে শরীর ও মন জীর্ণ হইয়া যায়। আমার এখন কেবল বর্তমানেরই ভাবনা এবং বর্তমানেরও স্থায়ীভাবে কোনও ভাবনা নাই। কারণ বর্হিবিষয়ে আমার এখনও তত বেশী লক্ষ্য পড়ে নাই। তবে যখন সেটা সম্মুখে পড়ে তখন সেইটা দেখিয়া ক্ষণিক নাড়াচাড়া করিয়া ফেলিয়া দিই বা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অল্পক্ষণের জন্য হাস্যের সহিত উহা লইয়া আনন্দ করি। এখনও আমার আসক্তি বা ভালবাসা কোন বিষয়েই স্থায়ী হয় নাই, এই কারণে কোনও বিষয়েই যত্ন বা আস্থা আমার নাই। আসক্তি থাকিলেই যত্ন ও আস্থা হইত, আসক্তি

নাই বলিয়া যত্নও নাই আস্থাও নাই। সুতরাং আমার তৃষ্ণা বা লালসা যাহা আছে তাহা সাময়িক, উহাদের স্থায়ীভাব এখনও আমাতে আসে নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে তৃষ্ণা যে কি এবং লালসা যে কি তাহার অর্থবোধ এখনও আমার হয় নাই; উহা যে একেবারে হয় নাই বা উহা একেবার জানি না তাহা নহে; তবে খোকাভাবে তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম; অন্তরে উহাদের আভাস সময়ে সময়ে উদয় হইয়া থাকে। তৃষ্ণা ও লালসা বা আশা ইহারা লোভ হইতে জাত। "লোভজনয়তে তৃষ্ণাং, তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি।" তৃষ্ণা সাধারণতঃ পিপাসাকে কহিয়া থাকে যেমন আমার জলের পিপাসা। কই পিপাসাই তৃষ্ণা পদবাচ্য। তাহার পর জল পাইবার জন্য যে ব্যাকুলতা তাহাই লালসা বা আশা পদবাচ্য। লোভ হইতে তৃষ্ণা ও লালসার উৎপত্তি এবং লোভের অসাধ্য কিছুই নাই। সুতরাং লোভই আমার পরম শত্রু। আমি যদি ইহার বশবর্তী হই, তাহা হইলে আমার দ্বারাও সমস্ত অকার্য্য সাধিত হইতে পারে। লোক লজ্জাভয়ে কার্য্যতঃ কোনও অকার্য্যের অনুষ্ঠান না হইলেও মনে মনে সমস্ত অকার্য্যের ভোগ লালসা চরিতার্থ করাইয়া থাকে। এই লোভ দৈবীসম্পদের ঘোর বিরোধী এবং রজোগুণের সমর্থনকারী। এই লোভ রজগুণ ব্রহ্মাকে নিজ কন্যাতে উপগত করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। এমন অবস্থায় সাধারণ সম্বন্ধে আর কি কথা আছে সাধারণের পক্ষে সবই সম্ভব। লোভাদি তিন গুণেই বর্তমান থাকিয়া বায়ুরূপীগুণের দড়িতে আমাকে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রজস্তমোগুণের খোকাদের আবদ্ধ করিতে বেশী সময় লাগে না, অল্প আয়াসেই সে কার্য্য সফল হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের প্রথম অবস্থাতেও তত বেগ পাইতে হয় না; কারণ সত্ত্বগুণের প্রথম সোপানে সুখ ভোগের লালসা ও বাহ্যিক শুষ্ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা বাহ্যিক আত্ম অনাত্ম বিচারে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব হয় এবং সেই কারণ ঐ শুষ্ক শাস্ত্রীয় জ্ঞানের লালসা জীবকে আবদ্ধ করে। এই শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান জনিত আনন্দের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইলেই উহা পঞ্চম রিপু মদে পরিণত হয় এবং ঐ মদের বশীভূত হওয়ায় জীব আনন্দিত হইয়া সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। এই আনন্দ জনিত সম্মোহের বশীভূত হইয়া "আমি সাত্ত্বিক পুরুষ," "আমি জ্ঞানী," আমি সাধু" ইত্যাদিরূপ অহং জ্ঞানে উন্মত্ত হওয়ায় পুনরায় জীবকে রজস্তমোগুণের ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় এবং তখন জীব গোপনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা কার্য্যাদিতে রত হইয়া পড়ে। কুকার্য্য কতকাল গোপনে থাকে; একদিন না একদিন নিশ্চয় প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তখন আমি দৈহিক ও মানসিক নানারকম অশান্তি পাইয়া থাকি।

আমি খোকা, আমি আমার দুর্গতির কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার বর্হির্ম্মুখী গতিতে পড়িয়াই যে আমার এত লাঞ্ছনা হইতেছে বা হইয়াছে তাহা আমার বর্তমান জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছি না; আমার সংজ্ঞার অভাবে চারি দিকেই অভাব থাকিয়া যাইতেছে। আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার বর্হির্ম্মুখী

গতি থাকিতে যে আমার সংজ্ঞালাভ হইবে বা হইতে পারে যে সম্ভাবনাও নাই। আমি বড় বড় খোকাদের এই সকল অবস্থা দেখিয়া সময় সময় তাঁহাদের দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকি, আবার কখনও মুচকে মুচকে ফোগ্‌লা দাঁতে হাসিয়া থাকি। বলা বাহুল্য আমার এখনও সব দন্ত বাহির হয় নাই, কতকগুলি মাত্র বাহির হইয়াছে। তাঁহাদের দেখিয়া হাসিবার কারণ অপর কিছুই নহে আমার অবস্থা ও তাহাদের অবস্থা এই দুইয়ের পার্থক্য দেখিয়াই আমি হাসিয়া থাকি বা অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকি। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য সাধারণের সমস্ত বুলি বা ভাষা এখনও আমার আয়ত্ত হয় নাই সুতরাং সে ভাষা এখনও বলিতে পারি না; বলিতে পারিলেও কতক বলিতাম। বিশেষতঃ আমি খোকা আমার কথা বিশ্বাসই বা করিবে কে? আমি বলিতে গেলে হয়ত আমার কথার উত্তরে বলিবেন "খোকাটা বড় ডেঁপো, ভারি ফাজিল, উনি আবার আমাদের শিক্ষা দিতেছেন।" আমি খোকা বলিয়া তাঁহাদের ধারণা "ও খোকা, ও কি জানে, ও যা তা বলিয়া থাকে, ওর ওসব কথা শুনিতে চাহিনা।" দুঃখের বিষয় তাঁহারা জানেন না যে অস্থিমাংসের ওজন বেশী হইলেই যে বড় হয় বা মস্তকের কেশ পরিপক্ক হইলেই যে বড় হয় তাহা নহে; যিনি জ্ঞান বৃদ্ধ তাঁহাকেই বাস্তবিক বড় বলা উচিত। সাধারণ কথাতেও চলিত আছে "বয়সেতে জ্যেষ্ঠ নয়, জ্যেষ্ঠ হয় জ্ঞানে।" আমি বাস্তবিকই খোকা, তবে আমি যে খোকা তাহা আমি জানি এবং আমাকে কেহ খোকা বলিয়া ডাকিলে আমার মনে সন্তোষই হইয়া থাকে। কিন্তু অপর বড় বড় খোকাদিগকে যদি কেহ "খোকা" বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে তাঁহারা অপমান বোধ করিয়া দুঃখিত হন, বা রাগ করেন। বড় বড় খোকাদের সহিত আমার এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

তবে আমার যে এখন একেবারে মান অপমান বোধ হয় না তাহা নহে। আমার শরীরের ওজন অনুযায়ী আমার মান অপমান বোধও আছে। তবে বড় বড় খোকাদের যেমন উহা স্থায়ীভাবে মনে অঙ্কিত হইয়া যায়, আমার বর্তমান খোকা ভাবে তাহা হয় না। আমাকে কেহ অপমান করিয়া তাড়না করিলেও আমার উহা অধিকক্ষণ মনে থাকে না, এবং কেহ মর্য্যাদা সহকারে আমার সম্মান করিলেও, উহা বেশীক্ষণ মনে থাকে না। আবার সময় সময় মান ও অপমান উভয়ই অগ্রাহ্যবোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ মনে হয় "মান বা অপমান কিই বা এমন বিষয়, ইহাতে লাভালাভ ত' কিছুই দেখি না ইহা খাবার জিনিষ নহে যে খাইয়া পেট ভরিবে।" আমি খোকা আমার পেট ভরিলেই আনন্দ, দুটো খোসামুদে মিষ্ট কথায় বা দুটো রূঢ় বাক্যে আমার কি হইতে পারে, সুতরাং তাহা আপনা আপনি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সাধারণতঃ আমার সমবয়স্ক অপর খোকাদের অপেক্ষা আমার শরীরের ও মনের বল এখন অনেক অধিক। ইহা অধিক হইবার কারণ আমি প্রায় আমার মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়াই এতবড় হইয়াছি। আমার সমবয়স্ক অপর খোকারা মাতৃস্তনদুগ্ধ খুবই কমই

পাইয়া থাকে। তহাদিগকে প্রায় গাভীর দুগ্ধ বা গাধার দুগ্ধ বা ছাগলের দুগ্ধ খাইয়াই থাকিতে হয়, সুতরাং তাহাদের শরীরিক বলও কম এবং মনের বলও কম। যে যে পশুর দুগ্ধ তাহারা খাইয়া থাকে, সেই সেই পশুর ভাব ও বৃত্তি সকল আংশিক ভাবে তাহাদের মনে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং এই কারণে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বল সম্যক্ পরিপুষ্ট হইতে পারে না। আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমি ইতিপূর্বে আমার মাতার স্তনদুগ্ধই বরাবর পান করিতে পাইয়াছি এবং আমার জননীও আমাকে এ নাগাদ অপর দুগ্ধ পান করাইতে কিছুতেই স্বীকৃতা হননি, তিনি বলেন, "আমার ছেলে এ অবস্থায় আমারই দুগ্ধ পান করিবে, আমার দুগ্ধ ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাতেই আমার পুত্রের উপকার হইবে, অপর দুগ্ধ পান করিলে এ অবস্থায় তাহা আমার পুত্রের উপযোগী না হইয়া বরং তাহাতে অনিষ্ঠ হইবারই সম্ভাবনা।' তিনি আরও বলেন যে, "যিনি আমার স্তনে দুগ্ধ দিয়াছেন, তাঁহার ইহাই অভিপ্রেত যে আমারই স্তন দুগ্ধ পান করিয়া শিশু সর্ব বিষয়ে পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং সেই অভিপ্রায়ে তিনি আমার স্তনে দুগ্ধ দিয়াছেন।" তবে আমার জননী বিশেষ নিয়মে থাকেন, যাহাতে তাঁহার স্তন দুগ্ধ কোনও প্রকারে দোষযুক্ত না হয়। তিনি এইরূপ নিয়মে থাকেন বলিয়া তাঁহার শরীরও কখন অসুস্থ হয় নাই এবং অপর খোকাদের মত আমার বাল্‌সা বা অপর কোনও রোগ প্রায় এ পর্য্যন্ত হয় নাই; দুই একবার যাহা সামান্য বাল্‌সার মত হইয়াছিল, তাহা অল্পে আপনা আপনি সারিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমার জননী ইতিপূর্বে সপ্তাহে দুইবার করিয়া নিজের স্তন দুগ্ধের সহিত আলুই গুলিয়া খাইতে দিতেন। এই সকল কারণে অপর খোকাদের সহিত তুলনায় আমার অসুখের মাত্রাও কম এবং বলাধানও বেশ আছে। তবে এক্ষণে ওজনে আমি কিছু বড় হওয়ায় আমার মা এক্ষণে আমাকে কিছু কিছু গাভীদুগ্ধ খাইতে দেন, নিতান্ত শৈশব অবস্থায় অপর দুগ্ধ আদৌ খাইতে দিতেন না। আমি খোকা, এ সকল কারণ তত বুঝি না, আমার মা যাহা বলেন ও করেন তাহা দেখিয়া যাই ও শুনিয়া যাই মাত্র, ইহাতে আমি মার নিকট হইতে অনেক সাধারণ বিষয় বা কার্য্য শিখিয়া থাকি।

এখন আমি প্রায় সর্বদাই মার নিকটে থাকি; কখন কখনও ঝি বা চাকরের নিকটেও থাকি কিন্তু তাহা অত্যন্ত কম। ঝি চাকরের নিকট মা প্রায়ই যাইতে দেন না; তাহার কারণ মা বলেন, "ঝি চাকরের কাছে থাকিলে আমার ছেলে তাহাদেরই গুণ প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের সহবাসে অনেক মন্দ বিষয় শিক্ষা পাইবে।" তাঁহার ধারণা যাহারা ঝি চাকরের নিকট সর্বদা থাকে, তাহারা অল্প বয়সে ঝি চাকরের কার্য্যাবলি যাহা দেখিয়া থাকে, তাহা তাহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং তাহা পরিণামে ধৌত হওয়া সঙ্কট হইয়া পড়ে। এই কারণ ঝি চাকরের নিকট প্রায় মা আমাকে দেন না; যখন ঝি চাকরের নিকট আমাকে দেন, তখন তিনি উহাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। আমি আমার বাবার নিকট বড় একটা যাই না, কারণ আমার বাবাকে আমি বড় ভয় করি;

বাবাকে ভয় করিবার কারণ এই যে আমার মা আমার যত বায়না সহ্য করেন, বাবা তত সহ্য করেন না। একটু কিছু করিলে বা তাঁহার কোনও একটা দ্রব্যে হাত দিলে প্রায় ধমকাইয়া থাকেন, এই কারণে আমি বড় একটা আমার বাবার কাছে যাই না। তবে আমার বাবা যে আমাকে ভালবাসেন না, বা আমি যে আমার বাবাকে ভালবাসি না তাহা নহে। বস্তুতঃ বাবা আমাকে যে অন্তরের সহিত ভালবাসেন তাহা সময়ে সময়ে বেশ বুঝিতে পারি; আমিও বাবাকে খুব ভালবাসি। এমন কি যদি কোনও কার্য্যবশতঃ বাবা দুই চারিদিন বাড়ীতে না থাকেন, তাহা হইলে আমার মন কেমন একরকম হইয়া যায়, আমার ভাবও কেমন একরকম হইয়া যায়, এবং শরীরও কেমন কেমন হইয়া থাকে। এই সময়ে লোকে আমায় দেখিলে বলিয়া থাকে, "আহা খোকা বাবার জন্য হেদিয়েছে গো," এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলে "খোকা ঐ বাবা আস্‌ছেন" বা "এখনই বাবা আস্‌বেন।" তাহারা যেদিকে মুখ ফিরাইয়া ঐ কথা বলে, আমিও অমনি তখনই সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে থাকি। যদি বাবাকে দেখিতে পাই, অমনি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে যাই, বাবাও আমাকে কোলে করিয়া আদর করিয়া থাকেন। আর যদি বাবাকে না দেখিতে পাই, তাহা হইলে ফেল্ ফেল্ করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকি এবং আদুরে আদুরে কথায় বলিতে থাকি, "বাবা কই, বাবা কোটায় গেছে", আর অমনি চক্ষে জলভর হইয়া কাঁদো কাঁদো ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মা আমাকে আদর করিয়া অন্যমনস্ক করিয়া দেন ও ভুলাইয়া দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আমার মা ও বাবা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। এরূপ স্নেহ আমাকে আর কেহ করে না এবং অপরে যে কেহ এরূপ স্নেহ করিবে বা করিতে পারে; তাহাও আমার জানা নাই। আমি যখন মার কোলে থাকি, তখন স্বর্গসুখ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আমার বোধ হইয়া থাকে। কারণ "স্বর্গেঽপি দুঃখ সম্ভোগঃ পরস্ত্রী দর্শননাদিষু," অর্থাৎ স্বর্গেও পরস্ত্রী দর্শনাদি জন্য দুঃখ ভোগ আছে; কিন্তু আমার মার কোলে শয়ন করিয়া যখন আমি স্তন পান করি তখন আমার সকল সুখ দুঃখের অবসান হইয়া কেমন একরকম আমি হইয়া যাই এবং পরে ঘুমাইয়া পড়ি এবং তখন আমার কোনও দুঃখ বোধই থাকে না। যদি কেহ আমাকে মা ছাড়া করিয়া স্বর্গেও লইয়া যাইতে চাহে, আমি তাহাতেও প্রস্তুত নহি। আমার মার কোলে থাকা অবস্থা স্বর্গবাস বা স্বর্গ-সখ অপেক্ষাও গরীয়সী বলিয়া মনে হইয়ো থাকে। আমার মনে হয় আমার পিতা যেন সর্ব দেবগণের আধার স্বরূপ; সুতরাং অপর দেবগণকে অগ্রে সন্তুষ্ট করার আমার প্রয়োজনাভাব। বিশেষতঃ পিতা হইতেছেন মাতার গুরু, মা আবার আমার গুরু; সুতরাং পিতা আমার পরমগুরু। আমার মাতাই আমার পিতাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া বলিয়াছেন ইনিই তোমার বাবা নচেৎ পিতা সম্বন্ধে সন্তানের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আমার পিতার দেহকে আমি প্রাণরূপ আত্মানারায়ণের সাকার দেহ মনে করিয়া থাকি এবং আমার মাতার দেহকে আমি সাকারা প্রাণশক্তিরূপা আদ্যাপ্রকৃতি ভগবতী বলিয়া মনে করিয়া থাকি। তবে

আমার এ ভাব বড় বড় খোকাদের সঙ্গে পড়িয়া আর কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না।

বড় বড় খোকারা প্রায়ই নিজ নিজ মাতা পিতার উপর সন্তুষ্ট নহেন। কারণ তাঁহারা নিজ নিজ প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোতে ভাসমান হইয়া আসুরিক ভাবে উন্মত্ত এবং হিতাহিত জ্ঞানের অভাব হেতু পাষণ্ডের ন্যায়ই নিজরেই অধোগতি করিয়া পরিণামে নিজেই নিজের অপ্রিয় হইয়া এবং নিজেই নিজের অধোগতি করিয়া, অকালে কালের ভক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়া থাকে। আমাকে যে তাহা হইতে হইবে না, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোতের গতি নাসারন্ধ্রের বহির্ভাগে প্রায় মধ্যে মধ্যে দ্বাদশাঙ্গুলির কম থাকায়, আমার দৈবী সম্পদের বল এখনও হ্রাস হয় নাই এবং আমার আসুরিক সম্পদ এখনও তত অধিক প্রকাশ পায় নাই। আমার মনে হয়, যদি আমার বর্তমান খোকাভাব স্থায়ী থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমাকে অকালে কালের ভক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হইতে হইবে না। বলা বাহুল্য আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমি আত্মানারায়ণের জগৎরূপ বিরাট দেহের যে অংশে এবং যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তথায় দৈবাসুর সম্পদ মিশ্রভাবেই রহিয়াছে, অপরাপর স্থান কেবল মেত্র আসুরিক সম্পদেই আচ্ছন্ন। যেখানে দৈবাসুর সম্পদ মিশ্রভাবে বর্তমান, তথায়ও কার্য্যতঃ আসুরিক ভাবেরই প্রায় অভিনয় হইয়া থাকে, দৈবীসম্পদের বিষয় কেবল কথায় পরিণত হইয়া থাকে। পরিতাপের বিষয় এই যে ইহার জন্য উপদেষ্টাগণই দায়ী। কারণ উপদেষ্টাগণের উপদেশানুযায়ী অনেকে পুরাণোক্ত দেবযোনি ও অসুরযোনি সম্বন্ধে এইরূপ ভাব জানেন যে পুরাকালে দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কখনও বা দেবগণ কখনও বা অসুরগণ জয়লাভ করিতেন। পুরাণাদিতে এইরূপ ভাবে বর্ণনা থাকায় অনেকেরই এইরূপ ভাবে জানা আছে। কিন্তু এই দেবযোনি ও অসুরযোনি বা দৈবীভাব এবং আসুরভাব যে মানবদেহে আমরণকালে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ এই দেবাসুরের যুদ্ধ যে নিত্য চলিতেছে ও চলিবে এবং সেই কথাই যে রূপকচ্ছলে শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে তাহা উপদেষ্টাগণের ভ্রান্ত উপদেশের ফলে অনেকেরই জানা নাই। উপদেষ্টাগণও আপন আপন প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার স্রোতে পড়িয়া যোগ মায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে পরলোক সম্বন্ধে কামনায় আবদ্ধ করিয়া ভ্রমে আসুরিক ভাবেরই পোষণ করিয়া থাকেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে বড় বড় খোকাদের সঙ্গে পড়িয়া, আমার এই বর্তমান সরল খোকাভাবে কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমার এই খোকাভাবরূপ তরী আমার ওজন বৃদ্ধির সহিত আশারূপ সমুদ্রের তরঙ্গে টল্‌টলায়মান হইতেছে। আমার ওজন বৃদ্ধি হওয়ায় আমার অঙ্গ-সৌষ্ঠবও বাড়িয়া গিয়াছে। আমার মুখের মধ্যে এখন প্রায় সমস্ত দন্তগুলিই বাহির হইয়াছে। অনেকে আমার দন্ত দেখিয়া বলিয়া থাকেন, "আহা,

খোকার দাঁতগুলি যেন মুক্তার মত মুখে শোভা পাইতেছে।" এই দন্ত বাহির হওয়ায় আমার একটা অস্ত্রলাভ হইয়াছে। এখন কেহ আমার মুখে অঙ্গুলি দিলে, আমি কুট্ করিয়া কামড়াইয়া দিতে ত্রুটী করি না এবং পাছে কামড়াইয়া দিই, এই ভয়ে কেহ ভরসা করিয়া আমার মুখে অঙ্গুলিও দেয় না। আমাদের বাড়ীতে বৈকালে আমার মত অনেক খোকা খুকী তাহাদের আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াইতে আসে। এই সব খোকাখুকীদের মধ্যে কাহারও ওজন আমার সহিত তুলনায় কিছুবেশী এবং কাহারও বা কিছু কম। আমি অনেক সময় তাহাদের অনুকরণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমি যে কাহারও অনুকরণ করিতেছি তাহা যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, সে পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার মা আমাকে খুকীদের সহিত আদৌ খেলা করিতে দেন না। অন্যান্য খোকারা খুকীদের সহিত প্রায়ই নানারকম খেলা করে, কিন্তু আমি কোনও খুকীর সহিত খেলা করিতে যাইলে, আমার মা রাগ করেন ও বকিয়া থাকেন এবং মা'র ভয়ে আমি কখনও খুকীদের সহিত খেলা করি না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমি অপরাপর খোকাদের অনুকরণ যাহা করি, তাহা মনে মনে করিয়া থাকি, কাহাকেও জানিতে দিই না, ইহার কারণ পাছে কেহ মনে করে যে আমি কিছুই জানি না। সব খোকারাই আমার মত করিয়া থাকে, অথচ কাহারও অনুকরণ করা বা কাহাকে অনুসরণ করার কথা মুখে কেহই স্বীকার করে না। আমার মত বা আমা অপেক্ষা বড় বড় খোকাদের প্রায়ই অন্তরে এক ভাব এবং বাহিরে অপর ভাবের অভিনয় হইয়া থাকে। আবার কোনও কোনও ছোট ছোট বা বড় বড় খোকারা জিলেবীর মত বক্রভাবে চলিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে মনে কালনেমির মত লঙ্কাভাগ করেন, বাহিরে বেশ সরলভাব দেখাইয়া থাকেন, যেন কিছুই জানেন না, একেবারে ঠাণ্ডা ও ধীরভাব। বড় বড় খোকারা এইরূপ ভাবের খোকাদের বড় সুখ্যাতি করিয়া থাকেন, আর আমার মত খোকা, যাহারা বাহিরে খুব চট্প'টে, সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে, তাহারা লোকের নিকট হইতে "ডেঁপো" "চালাক" "দুষ্ট" ইত্যাদি উপাধি লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উপরোক্ত উভয় প্রকার খোকাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত শান্ত নহে, উভয়েই তুল্য; কারণ চঞ্চলতা উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। তবে কাহারও বা বাহিরে চঞ্চলভাব দেখা যায়, আর কেহ বা ভিতরে ভিতরে চঞ্চল, হয়ত সামর্থ্য কম থাকায় বাহিরে অনেক সময় ঠাণ্ডা ভাব দেখা যায়। বাহিরে ঠাণ্ডা হইলেও তাহাদের ভিতর চঞ্চলভাবে পূর্ণ থাকে। তবে বালস্বভাব প্রযুক্ত সকলেই আনন্দের ছবি, আনন্দই যেন তাহাদের আভরণ। বড় বড় খোকাদের অপেক্ষা ইহাদের অল্পেই সন্তোষ লাভ হয়, ইহাই উহাদের আন্দের প্রধান কারণ। এই সন্তোষ ভাব থাকায় সাধারণ বস্তু মাত্রেই ইহাদের নিকট ধুলিকণাবৎ পরিত্যজ্য। প্রথমে নূতন বোধে কোনও বস্তুবিশেষ ইহাদের যত্ন বা আগ্রহ দেখা যাইলেও উহা সাময়িক, একটির বদলে অপর একটি কিছু পাইলেই পূর্ব বিষয় ভুলিয়া যায় এবং পরে যাহা পায় তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই সেন্তাষভাব

স্থায়ী হইলে লোভ দমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। সন্তোষভাব দৈবীসম্পদের মধ্যে একটি প্রধান রত্ন। ইহা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করিলে কোনও খোকারই অভাব থাকে না। আমি যে ইহা ধারণ করিতে পারিয়াছি তাহা নহে, এবং ইহা ধারণ করিবার উপায়ও আমার এক্ষণে জানা নাই। বিশেষতঃ আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার স্রোতের গতি এক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে, সুতরাং সর্বদা সন্তোষ ভাব হৃদয়ে বর্তমান থাকাও অসম্ভব, বরং সন্তোষের পরিবর্তে ক্রমশঃ অসন্তোষের ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। এই অসন্তোষের ভাব যে দূষণীয় তাহা আমি জানি না, কারণ আমি খোকা, বিশেষতঃ আদরের সহিত আমি পালিত হওয়ায় আমি একটি আদুরে খোকা; সুতরাং আমার বায়নাও বেশী, বায়না থাকিলেই এবং উহা পূরণ না হইলেই অসন্তোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং পরে অসন্তোষের সহিত অভিমান আসিয়া চক্ষে জলভর হইয়া কাঁদিতে থাকি।

পূর্ব বলা হইয়াছে যে আমার বলের মধ্যে রোদন করাটা আমার প্রধান বল আমার রোদনধ্বনি শুনিলেই অমনি কেহ না কেহ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাকে কোলে লইয়া, যে বিষয় লইয়া আমার বায়না হইয়াছে; হয় সেই বিষয়টি অথবা তৎপরিবর্তে অপর একটি কিছু আমাকে দিয়া ভুলাইয়া আমাকে শান্ত করিয়া থাকে। তখন আর আমার কান্না বা রোদন থাকে না, আবার বেশ সন্তোষভাব আসিয়া থাকে। এই কারণে এক্ষণে আমার সন্তোষ ও অসন্তোষ ভাব মিশ্রভাবেই চলিতেছে। আমার এক্ষণে বয়সও হইয়াছে। বয়স আমার কত তাহা আমি জানি না, তবে আমার মাকে অপর লোকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে মা বলিয়া থাকেন, "খোকা আমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এই চারি বৎসরে পা দিয়াছে।" ইহাতেই আমি জানি যে, আমি চারি বৎসরের খোকা, নচেৎ আমার বয়সের প্রকৃত জ্ঞান নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

দুর্গোৎসব

আমি একদিন দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের বাড়ীতে যেন সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে, বাড়ীতেও নানা বিষয়ের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, ঝি, চাকরদের এবং অপরাপর লোকজনের খুবই আনন্দ। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মা, আমাদের বাড়ীতে কি হবে?" মা উত্তরে বলিলেন, "বাবা, পূজা আগত প্রায়, মা ভগবতী আমাদের বাড়ীতে আসিবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা ভগবতী কে মা?" মা বলিলেন, "বাবা, মা ভগবতী মা দুর্গা, তিনি জগন্মাতা।" আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা

জগন্মাতা কাহাকে বলে মা?” আমার কথার উত্তরে বলিলেন, “বাবা খোকা তুমি খোকা, তুমি অত বুঝিবে না, মা দুর্গা তিনি আমাদের সকলের এবং এই জগতের মা হন। যেমন আমি তোমার মা, তদ্রূপ তিনি সকলের মা, একারণ তাঁহার পূজা করা সকলেরই কর্তব্য।” আমি আধো আধো ভাবে বলিলাম, “মা, তুমি যখন আমার মা রহিয়াছ, তখন আমি আমার মারই পূজা করিব, তোমার মাকে তুমি পূজা করিও।” আমার এই কথা শুনিয়া আমার মা বলিলেন, “না বাবা, ও কথা বলিতে নাই, মুখে ঘা হয়, মা দুর্গাকে সকলেরই পূজা করিতে হয়, তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সকলের অভাব দূর করেন এবং সকল ভয় দূর করেন। আর এই পূজার সময় তোমার নূতন পোষাক হইবে, নূতন জুতা হইবে, আর কত লোকের কত কি হইবে, সুতরাং সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে।” মার এই কথা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, “মা, আমার যে জুজুর ভয় আছে, তোমার মা দুর্গা আমার সেই জুজুর ভয়টা কি দূর করিয়া দিবেন?” মা বলিলেন, “বাবা খোকা, তুমি মা দুর্গাকে ডাকিলে, তোমার জুজুর ভয় আর থাকিবে না।” আমি দেখিলাম এ মন্দ নহে, আমার জুজুর ভয় যাবে এবং নানারকম ভাল ভাল পোষাক হইবে, সুতরাং পূজাটা খুব ভাল; বিশেষতঃ আমার মা যখন বলিতেছেন, তখন ইহাতে আর আমার সন্দেহ মাত্র রহিল না। তাহার পর আমি আমার মাকে বলিলাম “মা, আমার ত’ ভাল ভাল পোষাক হবে এবং লোকজনের সব নূতন নূতন কাপড় হবে, তোমার কি পোষাক হবে মা?” আবার মা’র সঙ্গে এই রকম কথা হইতেছে এমন সময়ে আমার বাবা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া মা আমার পূর্বোক্ত কথার উত্তরে বলিলেন, “বাবা খোকা, ছেলেদেরই নানারকম পোষাক আসাক হইয়া থাকে”, এবং বাবার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলেন, “আমারও নূতন কাপড়, নূতন গহনা হবে, তোমার বাবা আমাকে সেই সকল দিবেন।” আমি তখন আধো আধো কথায় মাকে বলিলাম, “মা, আমার যা পোষাক হবে, আমি তাহা তোমাকে দিব” মা অমনি আমায় কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, “না বাবা, তোমার পোষাক আমার ছোট হবে, বিশেষতঃ তুমি এখন খোকা, এখন তোমাকেই আমাদের দিতে হয়; আমরা যখন বুড়ো বুড়ী হব, তখন তুমি আমাদিগকে তোমার কন্যা পুত্রের মত দেখিয়া আমাদিগকে যাহা দিয়া তোমার সন্তোষ হইবে, তাহাই দিও। এখন তুমি আমাদিগের নিকট খোকা, ইহার পর আমরা বুড়া হইয়া তোমার খোকা খুকীর মত হইয়া, তোমার নিকট হইতে তোমার সেবা লইব।” এই কথা বলিয়া মা নিজ ক্রোড় হইতে আমাকে বাবার ক্রোড়ে দিলেন, বাবাও আমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, “কেমন খোকা, বাবা হ’তে পারবে ত’, যেমন তোমার মা বলিলেন?” আমি বাবার কথার উত্তরে আদুরে আদুরে কথায় বাবাকে বলিলাম, “হাঁ, বাবা, আমি তা পারবো।” বাবা আমার এই কথা শুনিয়া পুনরায় আমার মুখ চুম্বন করিয়া আমাকে মার কোলে দিলেন।

পূজা আগত প্রায় জানিয়া বাটীর সকলেই পূজার উৎসব জন্য যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে; আমিও এখন অনেকটা আনন্দে মাতিয়াছি, সকলেই পূজার সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছে; কাহারও মুখে এখন আর প্রায় অপর কথা নাই; সকলেই আনন্দে এক রকম বিভোর। কেবল আমার বাবার অন্তরে তত আনন্দ দেখিতে পাইতেছি না; বাবার অন্তরে যেন কি একটা ভাব লুক্কায়িত ভাবে রহিয়াছে। বাহিরে সামান্য আনন্দ ভাব থাকিলেও, বাবার ভিতরে যেন নিরানন্দভাব বর্তমান, এবং সেই অভ্যন্তরিক নিরানন্দভাবের ছায়া মধ্যে মধ্যে বাহির প্রকাশ পাইয়া তাঁহার প্রফুল্ল বদন যেন ভাবনার কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার ভাবনার কারণ সম্ভবতঃ দুইটি, প্রথমতঃ পূজা আসিতেছে; ইহা যেন একটি দায় উপস্থিত মানের কান্নায় পূজা রক্ষা করিতেই হইবে, পূজা রক্ষা করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থই বা আসে কোথা হইতে? কলসীর জল খরচ করিতে করিতে কলসী যে প্রায় শূন্য ভাণ্ডে পরিণত, অথচ পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনের জন্য নানা প্রকার পোযাক এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইবে, যাহারা পাইবে তাহারা পাইবার প্রত্যাশায় আনন্দ করিতেছে, কিন্তু আমার বাবার ত' পাইবার প্রত্যাশা নাই, যেখান হইতে যে রকম করিয়াই হউক তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হইবে, না করিতে পারিলে মান ইজ্জৎ নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং এ ভাবনা স্বতঃই উপস্থিত হওয়া সম্ভব এবং ইহাই ভাবনার প্রথম কারণ। ভাবনার দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমারোহ কার্য্যে অনেক লোক সমাগম হইয়া থাকে, কাহারও কোন মান মর্য্যাদার ক্রুটী হইবে, বা কোনও দ্রব্যের অকুলান হইবে ইত্যাদি নানাপ্রকার আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা বর্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত ভাবনার ছায়ারূপ কালিমা বাবার বদন কমলে প্রায়ই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। বাবার এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আমাকেও যখন খোকার বাবা হইতে হইবে তখন আমারও ত' এই রকম দুর্দশা হইবে। কোনও খোকাই খোকার বাবার ভাবনা ভাবে না, বিশেষতঃ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার স্রোতে তাহা অনুভবও করিতে পারে না, সুতরাং খোকাভাবই থাকিয়া গিয়া ক্রমশঃ বায়নার স্রোত বাড়িয়া গিয়া পরিণামে অসহ্য জ্বালা পাইয়া থাকে।

যাহা হউক তাহার পর মা আমাকে কোলে লইয়া ঠাকুর ঘরে চলিলেন; সেখানে গিয়া দেখি তিন চারি জন ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন পূজা করিতেছেন, আর দুইজন কি একটা পুঁথি পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ও কি হইতেছে?" মা আমাকে বলিলেন, "অদ্য দেবীর কল্পারম্ভ, রাত্রে বোধন ও অধিবাস হইবে, তাই মা দুর্গার পূজা করিয়া পরে চণ্ডীপাঠ হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, বোধন কাহাকে বলে এবং চণ্ডীই বা কে মা এবং তার পাঠই বা কি মা?" তদুত্তরে মা আমাকে স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা খোকা তুমি আমাকে যাহা

জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে তাহার সম্যক্ উত্তর দিতে পারিব তাহা বোধ হয় না, তবে সাধারণতঃ যাহা শুনিয়াছি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শুন; তবে উহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমি জানি না। পুরোহিত মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের উদ্দেশ্যে দেবীর অকালে নিদ্রাভঙ্গ করাইবার জন্য বোধন করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবীকে জাগাইয়া ছিলেন, তদবধি এই দুর্গোৎসব ক্রিয়া বোধনাদি করিয়া চলিয়া আসিতেছে। চণ্ডীপাঠ দুর্গোৎসবের পূজাঙ্গ বিশেষ, চণ্ডীপাঠ ব্যাতীত দুর্গাপূজা হয় না, এইরূপ শুনিয়াছি; চণ্ডীপাঠ করিলে বা করাইলে কি হয় তাহা আমি সম্যক্ অবগত নহি, উহা পুরোহিত মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানেন। তুমি এখন খোকা, ও সব বুঝিবে না; আমিই বুঝি না তা তুমি আর কি বুঝিবে, এখন চুপ কর, চুপ করিয়া শুনিয়া চল উহা শুনিলে তোমার মঙ্গল হইবে; শুনিয়াছি, চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিলে সর্ব বিষয়ের মঙ্গল হইয়া থাকে।" মা আমাকে চুপ করিতে বলায় আমি আর কোন কথা মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া চুপ করিয়া চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আমার মাকে ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডীর ফলশ্রুতি বলিতে লাগিলেন। আমার মাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "গিন্নি মা, যে স্থলে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে তথায় চৌরভয়, অগ্নিভয়, অকালমৃত্যু, মহামারি হয় না; রাজ্যলাভ ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে এবং সর্ববিধ ব্যাধি নাশ হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে এবং বংশের গৌরব বৃদ্ধির সহিত বংশ বৃদ্ধিও হইয়া থাকে।" আমার মা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মুখে এই সব কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "পুরোহিত মহাশয়, আমার অনেক পুত্রকন্যা অকালে মারা গিয়াছে; আমার শেষ ফল এই খোকা; আশীর্বাদ করুন, খোকা যেন আমার দীর্ঘজীবি হইয়া ঐ সব ফল লাভ করে।" ইহা বলিয়া মা চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিলেন, আমি মার কোলে শুইয়া চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিলাম। চণ্ডীপাঠ শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ যেন আমার নিদ্রার আবেশ আসিতে লাগিল। বর্তমানে উহা আমার প্রায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কাহারও কোলে শুইয়া সুরের সহিত কোনও রকম কথা অল্পক্ষণ শুনিলেই আমার নিদ্রাভাব আসিয়া থাকে। চণ্ডীপাঠ যাহা হইতেছে তাহাও বেশ সুরের সহিত শ্রুতি-মধুর হওয়ায় আমার নিদ্রাভাব আসিতে আর বিলম্ব হইল না। আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এক্ষণে আমার পক্ষে চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করা আর না করা উভয়ই তুল্য। কারণ আমার কর্ণ ত' শ্রবণ করে না; কর্ণ শ্রবণের দ্বারস্বরূপ, শ্রবণ করে মন; সেই মন আমার এই নিদ্রাবস্থায় শরীরস্থ মেধ্যা নাড়ীতে প্রবেশ হওয়ায় আমার বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহ রহিত হইয়া নিদ্রাভাবের আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং আমার বহিরিন্দ্রিয়গণ এক্ষণে বহির্জগতের কার্য্য হইতে বিশ্রাম লাভ করায়, আমার বাহ্য শরীরেরও বিশ্রাম হইতেছে। এবং আমি যেন ঠিক মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মাতৃক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতেছি।

আমার নিদ্রাবস্থা এবং জাগ্রতাবস্থা উভয়ই প্রায় তুল্য। জাগ্রতাবস্থায় আমার স্থূল শরীরের সহিত বহিরিন্দ্রিয়গণ সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকে। এই কারণে আমি ইহাকে আমার জাগ্রতাবস্থা কহিয়া থাকি, কিন্তু ইহা যে আমার প্রকৃত পক্ষে জাগ্রতাবস্থা, তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না; কারণ আমার নিদ্রাবস্থাতেও আমার ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত কার্য্যই করিতেছে এবং তাহা আমি অনুভবও করিয়া থাকি। আমার নিদ্রাবস্থায় পশুভাবের বা দেবভাবের কার্য্য সমূহ মনে মনে সমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়া তাহার সুখ দুঃখও অনুভব করিয়া থাকি; এই নিদ্রাকালীন সুখ দুঃখের অনুভূতি জাগ্রতাবস্থার সুখ দুঃখের অনুভূতি অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে; বরং উভয়ই তুল্য বোধ হইয়া থাকে; সুতরাং আমার নিকট নিদ্রা বা জাগরণ উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য বোধ হয় না, বরং উভয় অবস্থাই আমার পক্ষে সমান আবদ্ধকর বলিয়া বোধ হয় এবং এই কারণেই উপরে বলা হইয়াছে যে, আমার নিদ্রাবস্থা এবং জাগ্রতাবস্থা উভয়ই প্রায় তুল্যাবস্থা। আমি যাহাকে আমার জাগ্রতাবস্থা কহিয়া থাকি, তাহাকে জাগ্রতাবস্থা বলা আমার ভ্রম মাত্র এবং সে ভ্রম আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার মায়িক ফল স্বরূপ। কারণ আমার উভয় অবস্থাতেই আমার সংজ্ঞার অভাব বশতঃ সংজ্ঞার ছায়ামাত্র রহিয়াছে; প্রকৃত সংজ্ঞার অভাব হেতু এই আমার মূর্চ্ছাবস্থাকেই আমার নিদ্রাবস্থা কহিতেছি, আর মূর্চ্ছাভঙ্গের অবস্থাকে আমার জাগ্রতাবস্থা কহিতেছি। আমার যখন নিদ্রারূপ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় মনে করি, তাহাও যে প্রকৃত নিদ্রারূপ মূর্চ্ছাভঙ্গের অবস্থা নহে, তাহাও আমি আমার বর্তমান মধ্যাবস্থার গুণে প্রণিধান করিতে পারি না। বস্তুতঃ আমার মূর্চ্ছার অবস্থাতেও যেরূপ ভাবের স্বপ্ন ছিল, মূর্চ্ছাভঙ্গের পরও আমি যাহাকে আমার জাগ্রতাবস্থা কহিতেছি তাহাতেও আমার সেইরূপ ভাবের স্বপ্ন রহিয়াছে, তবে আমার সংজ্ঞার অভাব হেতু এবং আমার প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফেরের দরুণ, আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থা হইতে জাত যে মন, সেই মনও বর্তমানে সংজ্ঞাহীন হওয়ায় এবং আমার অযুক্ত বুদ্ধি কর্তৃক রঞ্জিত হওয়ায় একই অবস্থাকে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থাদ্বয় বলিয়া মন মানিয়া লইতেছে মাত্র; নচেৎ নিদ্রা বা বর্তমান জাগরণ অবস্থা উভয়ই সমান মোহকর স্বপ্নস্বরূপ অবস্থা, কারণ উভয় অবস্থাতেই সংজ্ঞার অভাব। আমার যে সংজ্ঞার অভাব তাহাও আমি আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ যোগমায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া প্রণিধান করিতে পারিতেছি না। এ কারণ আমার নিদ্রাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থার পার্থক্যভাব অনুভূতি হইতেছে; এই অবস্থাদ্বয়ের অভেদ ভাব পরিলক্ষিত না হইবার প্রধান কারণ আমার আপনার প্রতি লক্ষ্য না থাকা।

প্রথমতঃ নিদ্রাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থা কাহার হইয়া থাকে বা কাহা কর্তৃক অবস্থা দ্বয়ের উৎপত্তি হইতেছে, ইহা দেখিলেই উপরোক্ত কথার মীমাংসা হইতে পারে। দুঃখের বিষয় দেখেই বা কে আর মীমাংসা করেই বা কে। মীমাংসা ত' কথায় হয় না, প্রত্যক্ষ বা জলন্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত মীমাংসা হইতেই পারে না। মীমাংসা ত' কথায় হয় না, প্রত্যক্ষ

বা দৃষ্টান্ত ব্যতীত মীমাংসা হইতেই পারে না। এক্ষণে নিদ্রা কাহার হইয়া থাকে তাহাই দেখা যাউক। যদি বলা যায় যে আমারই নিদ্রা হইয়া থাকে বা আমিই খুব সুখে ঘুমাইয়া থাকি তাহা হইলে এ কথা কি আমার মিথ্যা কথা বলা হইল? এরূপ কথা বলায় আমার মিথ্যা কথা বলা হইল বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমার নিদ্রা বা আমি ঘুমাই এ কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে আমার আমিত্ব কোন্ টুকু তাহা জানা আবশ্যক। যে বিষয় বা বস্তুকে লইয়া আমার আমিত্ব, তাঁহাকে লইয়াই কথা। পূর্বে অনেকস্থলে বলা হইয়াছে যে, অস্থি মাংস বিশিষ্ট শরীর বা "আমি" শব্দ আমি পদবাচ্য নহে; "আমি" শব্দের ও শরীরের উৎপত্তি স্থানই আমি পদবাচ্য বুঝিতে হইবে। আমার আমি শাব্দের এবং আমার দেহের উৎপত্তি প্রাণ হইতে; প্রাণ না থাকিলে "আমি" শব্দের অস্তিত্বও থাকে না এবং আমার দেহের অস্তিত্বও থাকে না। সেই প্রাণও দুই প্রকার, স্থির ও চঞ্চল। চঞ্চল প্রাণই আমার বহিঃপ্রাণ। এক্ষণে দেখা যাউক, আমি যখন বলি যে "আমি ঘুমাইয়াছিলাম," তখন কি আমার বহিরিন্দ্রিয়গণের ন্যায় আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপে চঞ্চলপ্রাণ যাহা শ্বাসরূপে চলিতেছে তাহারও কি নিদ্রারূপ বিশ্রাম হইয়াছিল? তাহা ত' হয় নাই, তাহা ত' দেখা যায় না। বরং যদি বলা যায় যে আমার চঞ্চলপ্রাণের কর্ম্মেরও বিশ্রাম হইয়াছিল তাহা হইলে উহা ভুল কথা বলা হইবে; কারণ আমার প্রাণকর্ম্মের বিশ্রাম হইলে উহার সহিত আমারও চিরবিশ্রাম হইয়া যাইত, আর আমাকে উঠিয়া বেড়াইতে হইত না, আমার আমিত্বের অবসানের সহিত সব লেঠাই চুকিয়া যাইত। প্রাণকর্ম্মের বিশ্রাম হইলেই আমারও অবসান যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমি যাহাকে আমার নিদ্রাবস্থা বলিতেছি, সেই অবস্থায় আমার প্রাণের নিদ্রাবস্থা হয় নাই ইহা ধ্রুব সত্য। আমার প্রাণই যখন আমি পদবাচ্য এবং আমার জাগ্রত অবস্থাতে বা আমার নিদ্রাবস্থাতে আমার প্রাণশক্তির ক্রিয়ার বিরাম যখন দেখা যায় না, বরং সেই ক্রিয়া সমভাবেই চলিয়া থাকে দেখা যায় তখন 'আমার' নিদ্রা কোথায়? বরং তখন আমার নিদ্রা বা জাগ্রত ভাব উভয়ই তুল্যাবস্থা। প্রকৃত পক্ষে আমার নিদ্রাও নাই জাগ্রতাবস্থাও নাই। আমার জাগ্রতাবস্থা নাই বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এক সংজ্ঞার অভাবে আমার নিদ্রা বা জাগ্রতবস্থা উভয়ই তুল্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এমত অবস্থায় আমার আবার জাগ্রতাবস্থা কোথায়? উভয় অবস্থাতেই আমি আমার প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থারূপ যোগমায়া কর্তৃক স্বপ্নবৎ সংসার মায়াতে আচ্ছন্ন। এই সংসারমায়াও আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার ফল-স্বরূপ।

নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থা সম্বন্ধে অপর একটা প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে, এস্থলে আমার তাহা প্রকাশ করা উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতেছি। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রাণের নিদ্রা বা জাগরণ কিছুই নাই, আমার নিদ্রাবস্থাতে প্রাণ জাগিয়া থাকিয়া প্রাণের কার্য্য সমান ভাবেই চলিয়া থাকে। প্রাণ যখন জাগিয়া রহিয়াছে, তখন

প্রাণের জাগ্রতাবস্থায় চোরে চুরি করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে, অথচ প্রাণের তাহা বোধগম্য হইতেছে না; এমন অবস্থায় স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, প্রাণও নিদ্রাভিভূত অবস্থায় আছে এবং একথা বলাও যে অসঙ্গত তাহা আমার বোধ হইতেছে না, বরং সঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতেছে। যদিও আমার বর্তমান মনের এরূপ প্রশ্ন করায় বাতুলতারই পরিচয় দেওয়া হইতেছে; কিন্তু তাহা হইলেও আমার উক্ত প্রশ্ন খণ্ডন করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই, বরং উক্ত প্রশ্ন অগ্রাহ্য করাই অসঙ্গত। সুতরাং উপরোক্ত প্রশ্নের আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি। আমার বর্তমান মনের জানা উচিত যে, প্রাণই যখন আত্মাস্বরূপ "যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ, যে প্রাণাস্তে তদাত্মকা", অর্থাৎ যিনি রুদ্র তিনি নিশ্চয়ই প্রাণপদবাচ্য এবং যিনি প্রাণ তিনিই আত্মাপদবাচ্য! প্রাণ যখন নিশ্চয়ই আত্মপদ বাচ্য হইলেন, তখন তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নাই এবং শত্রু বা মিত্রও নাই, এমন অবস্থায় চোরই বা কে? এবং চোর ধরেই বা কে? যে চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাতেও প্রাণ রহিয়াছে, প্রাণ বস্তুতঃ চোর নহে; ইন্দ্রিয়গণই এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমূহই চোর পদবাচ্য। চোরেই চোর ধরিতে বিষদরূপে সক্ষম। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমার বহিরিন্দ্রিয়ের ও তদ্বৃত্তি সমুদায়ের বিশ্রাম অবস্থাকেই নিদ্রা কহা যায়। সুতরাং যাহারা চোর ধরিবে তাহারা বিশ্রামরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকায়, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে চুরি হইতেছে তাহা ধরে কে? যাহারা চোর ধরিবে তাহারা বিশ্রামরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকায় চুরি হইয়া থাকে; প্রাণ সাক্ষীস্বরূপ বর্তমান আছেন মাত্র তাঁহার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই, কারণ তিনি সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই "সর্বং প্রাণময়ং জগৎ"। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা যোগমায়া রূপিণী দেবীর চঞ্চল ভাবরূপ দর্প ও তেজ দ্বারা সংজ্ঞা অপহৃত হওয়ায় সংজ্ঞার ছায়ামাত্র থাকায়, স্থির প্রাণরূপা আত্মা আত্মবিস্মৃতিভাবে প্রতি ঘটে ঘটে কর্তা হইয়াও অকর্তার ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন; সুতরাং স্থির প্রাণরূপ আত্মা নারায়ণের আমরা যাহাকে বর্তমান নিদ্রা বা জাগ্রতাবস্থা কহিয়া থাকি, তাহা নাই; জীবের বর্তমান নিদ্রাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থা উভয় অবস্থাই, আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা যোগমায়ারূপিণী দেবীর মায়িক স্বপ্নরূপ ফল। স্বপ্নরহিত অবস্থাই সুযুপ্তি, ইহা ক্বচিৎ কাহারও ঘটিয়া থাকে। সুযুপ্তির অবস্থা প্রায় মৃত্যুর ন্যায় অচেতন অবস্থা। উক্ত অবস্থা হইতে অনেক কষ্টে জাগান যায় বলিয়াই উহাকে মৃত্যু বলা হয় না। পুরীতৎ নাড়ীতে মনের সংযোগ হওয়াতেই এই সুষুপ্তি অবস্থা ঘটিয়া থাকে; এই অবস্থায় অচেতনে স্বপ্নরহিত নিদ্রা হয় বলিয়াই ইহাকে সুযুপ্তি বলা হইয়া থাকে ঃ—

"যত্র সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামং কাময়তে,
ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ততঃ সুষুপ্তম্"।

এই সুষুপ্তি অবস্থার সহিত কেহ কেহ সমাধির তুলনা করিয়া থাকেন, কারণ সুষুপ্তির অবস্থা আর মৃত্যুর অবস্থা উভয়ই প্রায় তুল্যাবস্থা; প্রায় বলিবার অভিপ্রায়, সুষুপ্তি অবস্থা না ভাঙ্গিলেই মৃত্যু, অর্থাৎ সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া থাকে, মৃত্যু হইলে আর উত্থান হয় না, প্রভেদ এইমাত্র। সমাধির অবস্থা স্বতন্ত্র, তাহা নিজ বোধরূপ, উহা না নিদ্রার অবস্থা, না জাগরণের অবস্থা, না সুষুপ্তির অবস্থা, অথচ উহা স্বপ্নরহিত চৈতন্যের অবস্থা; যেমন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরের অবস্থায় নিদ্রাও নাই অথচ সম্পূর্ণ জাগ্রতবস্থাও আইসে নাই এবং মনের মধ্যে কোনও পার্থিব বিষয়াদির চিন্তাও নাই; এই অবস্থার সহিত সমাধি অবস্থার কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে মাত্র। সমাধি অবস্থা অতুলনীয় অবস্থা; সুতরাং কতকটা তুলনা ব্যতীত ঠিক তুলনা উহার নাই এবং বাক্যের দ্বারা ঐ অবস্থা সম্যক্ প্রকাশ করাও অসম্ভব। প্রকৃত চৈতন্য সমাধির অবস্থা নিজ বোধরূপ, যেমন বোবার সন্দেশ খাওয়া। বোবাকে সন্দেশ খাইতে দিলে, সে উহা খাইবার পর কেহ যদি উহাকে জিজ্ঞাসা করে "সন্দেশ কিরূপ" বা "সন্দেশের আস্বাদন কি রকম তোমার বোধ হইল," তাহা হইলে ঐ বোবা যেমন ভালমন্দ কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, অথচ আকার ইঙ্গিতে ভাল মন্দের কতকটা ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ চৈতন্য সমাধির অবস্থা নিজ বোধ হইলেও উক্ত অবস্থার বিষয় আকার ইঙ্গিতে ও কার্য্যের দ্বারা অনেকটা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন ক্রোধান্ধ ব্যক্তির মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার ক্রোধ হইয়াছে অথবা যাহারা অন্তরে সর্বদা নির্মল আনন্দভাব থাকে তাহার বদনমণ্ডলে যেমন অন্তরস্থ আনন্দভাবের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহাদের চৈতন্যসমাধির অবস্থা লাভ হইয়াছে তাঁহাদের আকার প্রকার এবং কার্য্যাবলীতেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা লোক শিক্ষার্থে এবং লোক সংগ্রহার্থে সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন, তবে নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য প্রায় করেন না; কার্য্যের অনুরোধে এবং লোকের ইচ্ছায় সমস্তই করিয়া থাকেন; তাঁহাদের কোনও ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই; কারণ তাঁহারা ইচ্ছা রহিত অবস্থায় স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখী; নিজের দুঃখও নাই, সুখও নাই; যেমন একদিকে তাঁহাদের হৃদয় কুসুম অপেক্ষাও কোমল, তেমনি অপর দিকে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। তাঁহাদের হৃদয় দর্পণের ন্যায়, যে, যে ভাব লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাঁহারাও, তাহার নিকট ঠিক তদ্রূপভাবে প্রকট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ আমি যদি দর্পণের সম্মুখে দন্ত বাহির করিয়া দণ্ডায়মান হই, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বও যেমন অবিকল তদনুরূপই লক্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের সম্মুখে কেহ উপস্থিত হইলে ঠিক তদ্রূপ ভাবই হইয়া থাকে। উক্ত অবস্থা আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয় হইলেও, আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃতিভাবে

সংজ্ঞার ছায়াকে সংজ্ঞা বোধে স্বপ্নে আসক্ত হইয়া আশু সুখে ধাবিত হইতেছি। আমার প্রকৃত সংজ্ঞা না থাকায় পরিণাম দৃষ্টি এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মাতৃক্রোড়ে চরন্ডীপাঠ শুনিতে শুনিতে আমার নিদ্রাভাব আসায় আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না, অথচ আমি যে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়াছি তাহাও নহে। চণ্ডীপাঠ যাহা হইতেছিল তাহাও ঠিক শুনিতে পাইতেছি না, তবে যেন অনেক দূরে কি যেন কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হইতেছে তাহা চণ্ডীপাঠের শব্দ কি অপর শব্দ তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; ফল কথা আমি এক্ষণে নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ এই অবস্থাটি আমার পক্ষে বড় স্নিগ্ধকর এবং সুখকর বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহা ছাড়িতেও ইচ্ছা হইতেছে না। আমার চক্ষু যেন অর্দ্ধমুদ্রিত ভাবেই রহিয়াছে, তাহাতে ঘরের মধ্যে না আলোক না অন্ধকার কি যেন কি এক রকম কেবল প্রকাশের ন্যায় বোধ হইতেছে, অথচ বোধও যে আমার ঠিক হইতেছে তাহাও বলিতে পারি না এবং ইহা আমার নিরানন্দের কি আনন্দের অবস্থা তাহাও বলিতে পারিতেছি না, কারণ যে বলিবে সেই নাই, অর্থাৎ বলিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়ই নাই। এই অবস্থাটি আমার শৈশবকাল হইতেই প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। এই অবস্থাটি ভাঙিয়া গেলেই আমার কষ্ট হয়, সুতরাং ইহা যে নিরানন্দের অবস্থা তাহা বলিতে পারি না। কারণ নিরানন্দের অবস্থা বা কষ্টকর অবস্থা হইলে তাহার অভাব জনিত কষ্ট হইত না। উক্ত অবস্থা প্রাপ্তির লালসা স্থায়ী রূপেই রহিয়াছে, অথচ মুখে প্রকাশ করিতে পারি না যে আমার কোন্ অবস্থার অবস্থান্তর হইয়াছে; কিন্তু সর্বদাই আমার মনে হয় যেন আমার কি হারাইয়াছে, অথচ কি যে হারাইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। এবারে অনেক দিনের পর আমার সেই অবস্থা আসিয়াছে, ইহাই আমার গর্ভাবস্থার অবস্থা বা যোগনিদ্রার অবস্থা; এই অবস্থায় আমার যে কোনও রকম চিন্তা আছে তাহা বলিতে পারি না। ইহা কি যেন কি এক অপূর্ব অনির্বচনীয় তৃপ্তিকর অবস্থা। যাহা হউক এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ক্ষণিক পরে আমার যেন চিন্তা আসিতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমার বোধ হইল যেন উক্ত অবস্থা হইতে একটু নিম্নস্তরে আসিয়াছি। যাহা হউক এই চিন্তা আমার যাহা আসিতেছে তাহা কোনও পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে নহে। আমি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে চণ্ডীপাঠ শুনিতেছিলাম, সেই চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীর বিষয় সম্বন্ধেই চিন্তার উদয় হইয়া আমার মনে মনে আপনা আপনি চণ্ডীরহস্য প্রকাশ হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

চণ্ডীরহস্য

দুর্গোৎসব সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে যে কথা চলিত আছে, (আমি আমার মাতৃদেবীর মুখে যাহা শুনিয়াছি), বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণ গ্রন্থে অবিকল তদনুরূপ লিখিত না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাহা লিখিত আছে। চণ্ডী গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন। দুঃখের বিষয়, টীকাকারগণের দ্বারা বহিরর্থে ইহার যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে মহাদেবীর মাহাত্ম্যের হানি ব্যতীত গৌরববৃদ্ধি হয় নাই, বরং বিদ্বৎ সমাজে গৌরবের হানিই হইয়াছে। যাহা হউক আমি চণ্ডীপাঠ যাহা শুনিতেছিলাম পাঠক মহাশয় সুর করিয়া পাঠ করার দরুণ উহা শ্রুতিমধুর হইলেও আমার সম্যক্ ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কারণ চণ্ডীপাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি প্রথমে মা'র নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি এবং তৎপরে পুরোহিত মহাশয়ের নিকট যাহা যাহা ফলশ্রুতি প্রভৃতি শুনিয়াছি তাহা সত্য হইলেও, বর্তমানে যেভাবে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে তাহাতে যে পূর্বোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, তাহা আমার আদৌ বিশ্বাস না হইয়া বরং তাহাতে দারুণ সন্দেহ আসিতেছে। কারণ যেভাবে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে বা হইতেছে, তাহা আদী ঠিক নহে। কেবলমাত্র পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিয়া গেলেই যে চণ্ডীপাঠ করা হইল তাহা মনে করাও ভুল, এবং এইরূপ পাঠের দ্বারা চণ্ডীমাহাত্ম্যে যে সকল ফলশ্রুতি লিখিত আছে, তাহা লাভ করিবার আশা করাও অন্যায়। কারণ যে যে স্থানে বহুপূর্ব হইতে উক্তরূপ ভাবে চণ্ডীপাঠ হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরেই অর্থনাশ, কাহার কাহারও বংশনাশ পর্য্যন্ত হইয়াছে, এমন কি অনেকের বাস্তুভিটার চিহ্নমাত্রও নাই, সুতরাং ফলশ্রুতির ফললাভ যে আমার হইবে এবং ঐ লব্ধ ফল যে স্থায়ীভাবে থাকিবে পূর্বাপর দেখিয়া আমার সে বিশ্বাস নষ্ট প্রায় হইয়াছে।

চণ্ডীপাঠের উদ্দেশ্য কি, এবং চণ্ডীই বা কোন্ দেবী ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আমার যদি সম্যক্ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার লীলার বিষয় পাঠ করিয়া আমার যে কি লাভ হইতে পারে তাহা ত' আমি বুঝিতে অক্ষম, এমন অবস্থায় আমার চণ্ডীপাঠ করা আর না করা বা চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করা আর না করা উভয়ই তুল্য নয় কি? চণ্ডীগ্রন্থখানিকে যদি আমি উপন্যাসের মত পাঠ করি বা শ্রবণ করি, তাহাতে আর আমার বিশেষ কি লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে বা থাকিতে পারে? না হয় গল্প শ্রবণ করার মত একটু শ্রবণ সুখকর হইল, তাহাতে আর আমার বিশেষ কি লাভ হইল? আর যদি

মনে করা যায় যে, চণ্ডী-মাহাত্ম্যে ভগবতীর লীলা বর্ণন আছে, এবং ভগবতী স্বয়ং দেবগণের অনুরোধে দেবগণের উদ্ধার জন্য, অসুরকুলকে বিনাশ করিয়া দেবগণের আসুরিক ভয় নষ্ট করিয়া, দেবগণকে অসুরগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, একারণ তাহা শ্রবণ করিলে বা পাঠ করিলে পূণ্য আছে, অতএব উহা ভক্তিপূর্বক পাঠ করা বা শ্রবণ করা সকলেরই কর্তব্য, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যেভাবে চণ্ডী গ্রন্থখানি সাধারণতঃ বহির্ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে এবং এই ব্যাখ্যায় দেবীকে সাধারণ নারীভাবে সাজাইয়া যেরূপভাবে কদর্থ করা হইয়া থাকে, তাহাতে চণ্ডীপাঠ শুনিয়া ভক্তি হওয়া দূরের কথা বরং অভক্তিই হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ ব্যাখ্যা বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদের বিষয় হইয়া রহিয়াছে; তবে আমার ন্যায় খোকার নিকট এবং আমার মাতার ন্যায় নারীগণের নিকট ঐ ব্যাখ্যা আদরণীয় হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রথমতঃ যিনি ভগবৎ চিৎশক্তি, যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মঙ্গলময় হইতে পারে, তিনি কিনা নর রক্তে বা অসুর রক্তে নিজ হস্ত কলুষিত করিবেন, ইহাই কি সম্ভবপর কথা? এমন কথা যে কদাচ সম্ভবপর নহে ইহা ধ্রুবসত্য। যাঁহার ইচ্ছামাত্রে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, তিনি কিনা সামান্য নারীর বেশে সিংহের উপর আরূঢ় হইয়া (আজকাল সার্কাস ওয়ালারাও এইরকম খেলা দেখাইয়া থাকে) দণ্ডায়মানা; ইহাতে দেবীর অবমাননা করা ব্যতীত গৌরব বৃদ্ধি করা হয় না; যদি বলা যায় যে, দেবগণের কাতর বাক্যে এবং প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া দেবী তাঁহাদের উদ্ধার জন্য সমরাঙ্গণে অসুরকুলকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে উহা নিতান্ত অসঙ্গত বাক্য হইয়া পড়ে, চিৎশক্তির দ্বারা এরূপ কার্য্য কখনও সম্ভবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যাঁহার ইচ্ছামাত্রে অসম্ভব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাঁহার আবার সাধারণ মানবের ন্যায় যুদ্ধ করার প্রয়োজন কি? তাহার পর সেই দেবী রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া শুম্ভের দূতকে কহিতেছেন,

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ "যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, যে আমার দর্পচূর্ণ করিবে, যে আমার তুল্য বলশালী, সেই আমার ভর্ত্তা বা স্বামী হইবে।"

দেবীর মুখে এ আবার কি কথা! দেবীর মুখ হইতে এরূপ প্রলোভন বাক্য নিঃসৃত হওয়া কি সম্ভবপর? এরূপ প্রলোভন বাক্যে দেব, নর বা অসুর সকলেরই মুগ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে; কারণ সৌন্দর্য্যশালিনী স্ত্রী লাভের জন্য নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করা ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে, বরং সম্ভবপর বলিয়া অনুমতি হয়। উপরোক্তভাব ব্যতীত অসুরগণকে দমিত করিবার (চিৎশক্তির) কি অপর কোনও উপায় জানা ছিল না বা অপর কোনও ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি এই ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন? বস্তুতঃ চিৎশক্তি সম্বন্ধে ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। অবশ্যই ইহার মধ্যে গূঢ় রহস্য আছে যাহা সাধারণে অবগত নহেন। সেই রহস্য অবগত

হইলেই চণ্ডী সম্বন্ধে সকল সন্দেহ আমার অন্তর হইতে দূর হইয়া যাইবে।

প্রকৃত পক্ষে দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবদগীতা পৃথক্ বিষয় নহে, উভয় শাস্ত্রেরই তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য একই প্রকার, কোনই প্রভেদ নাই, গূঢ়ভাব অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কিন্তু পার্থক্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা এবং চণ্ডীগ্রন্থখানির মর্মবোধ না করিয়া কেবলমাত্র আবৃত্তির দ্বারা বিশেষ কিছু লাভ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। রামায়ণ, মহাভারত এবং চণ্ডীতে যে সকল যুদ্ধ বর্ণনা আছে, সাধারণ মানবে যেরূপ রক্তপাত করিয়া পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে, উহা সেরূপ যুদ্ধ নহে। সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে দেবাসুরে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, ইহা প্রতি ঘটে ঘটে সর্বদাই চলিতেছেন। এই সংগ্রামের ক্ষেত্র নর বপু, অর্থাৎ আপন আপন শরীররূপ ক্ষেত্রই দেবাসুর সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র রূপে স্থিরীকৃত রহিয়াছে; ইহা ভাবের যুদ্ধ, অর্থাৎ দেবভাবের সহিত আসুরিক ভাবের যুদ্ধ বা দৈবী সম্পদের সহিত আসুরিক সম্পদের যুদ্ধ। (দেবী সম্পদ ও আসুরিক সম্পদ ইতিপূর্বে বিস্তারিত রূপে বলা হওয়ায়, এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)। পুরুষ ও প্রকৃতি এই যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বর পদবাচ্য, যখন যেরূপ ঘটে থাকেন, তখন সেইরূপ ঘটনানুযায়ী উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। এই পুরুষ বা প্রকৃতিকে আসুরিকভাবেরা নিজেদের দলপুষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে কখনও বা বলপূর্বক কখনও বা ছলনাপূর্বক নিজেদের আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে, এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আসুরিক ভাবের স্রোত জগতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া থাকে, যেমন বর্তমানে চলিয়াছে; কাল বশে সময় সময় এই রকমই চলিয়া থাকে। তবে আসুরিক সম্পদ দৈবী সম্পদকে একেবারে নষ্ট করিতে কোনও কালেই সক্ষম হয় না হইবেও না; দৈবী সম্পদ কখনও বা প্রবলভাবে প্রকাশ থাকে, আবার কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ইহাই নিয়ম। জীবদেহ যতদিন জগতে প্রকাশ থাকিবে, ততদিন উভয়ভাবই বর্তমান থাকিবে এবং ততদিন দেবাসুর সংগ্রামও প্রতি ঘটে ঘটে বর্তমান থাকিবে।

চণ্ডীতে উক্ত দেবাসুর সংগ্রাম শতবর্ষকাল চলিয়াছিল, অর্থাৎ জীবের পরমায়ু শতবর্ষ, "শতায়ুর্মানবঃ" ইতি উপনিষদ্; সুতরাং এই শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া থাকে। এই জীব সকলের মধ্যে কখন কখনও কোন কোনও ঘটস্থ জীব আসুরিক ভাবকে একেবারে পরাস্ত করিয়া পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিতি করতঃ অপরাপর জীবের হিতসাধনে রত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ অপর ঘটস্থজীব যাহাতে আসুরিক ভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, এমন সুন্দর উপায়রূপ কৌশল উপদেশ করিয়া সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকেন, ইহাই জীবের প্রকৃত হিতসাধন। নচেৎ দুই মুষ্টি খাইতে দিলে বা পীড়িতের সেবা করিলেই যে লোকের প্রকৃত হিতসাধন করা হইল, ইহা মনে করাও নিতান্ত ভুল; তবে ইহাও যে করা চাহি না তাহা নহে, সামর্থ্য অনুযায়ী এরূপ করা সাধারণের পক্ষে ভাল ব্যতীত মন্দ নহে। ইহাতে সাময়িক উপকার করা হয় মাত্র, ইহা প্রকৃত হিতসাধন নহে। যে

উপায় দ্বারা জীবের সকল অভাব দূর হইয়া থাকে, সেই উপায়রূপ পরম সুকৌশল যিনি উপদেশ করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ জীবের হিতসাধন করিয়া থাকেন, অপরে করিতে পারেন না।

উপরে বলা হইয়াছে যে, কোন কোনও ঘটস্থ জীব আসুরিক-ভাবের উপর জয়লাভ করিয়া পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। উক্ত ঘটস্থ জীবের মধ্যে নর অপেক্ষা নারীজাতি অধিক শক্তিশালিনী। তাঁহারা অল্পায়াসেই সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। নারীজাতিই ভগবতীর বাহ্যিকরূপ জগদ্ধাত্রীরূপা, অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীবসমূহের ধাত্রীস্বরূপা এবং নর অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী। তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা ভোজনে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসাতে (ব্যাবসা শব্দের অর্থ উদ্যম, নিশ্চয়তা, ইচ্ছা) এবং কামে (কাম শব্দে কামনা বুঝিতে হইবে) অষ্টগুণ শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের উপরোক্ত শক্তি সকলের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, নারীগণের শিক্ষার দোষে উক্তগুণ সকল আসুরিকভাবে দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। যদি উক্ত গুণ সকল পার্থিব বিষয়ে ধাবিত না হইয়া নিজের শরীরস্থ মনের আসুরিকভাবে সমূহকে দমিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত করিয়া আত্মকর্মের দিকে চালিত হয়, তাহা হইলে নারীগণ প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্য হইতে পারেন; বর্তমানে তাঁহারা ভগবতীর বাহ্যিকরূপ মাত্র হইয়াই রহিয়াছেন। যিনি প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্য তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবতী। ভগ শব্দের অর্থ,—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়প্রকার ঐশ্বর্য্য। ভগ শব্দের অর্থে সেবাও বুঝায়। সুতরাং যিনি আত্মকর্মের সেবার দ্বারা (অর্থাৎ ক্রিয়া যোগের সেবার দ্বারা) উপরোক্ত গুণ বা ঐশ্বর্য্য সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্য হয়েন, অপরে নহেন। যিনি প্রাণাদি ধাতুসমূহের ক্রিয়া করারূপ সেবার দ্বারা বহিঃপ্রাণাদি বায়ুর স্থিরীকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্য, অপরে নহেন। উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যের অবস্থা—ষট্‌চক্র পথে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত, প্রত্যেক চক্রের কার্য্য দ্বারা ছয়-চক্রে ছয়টি অবস্থা লাভ হইয়া থাকে; ইহা ক্রিয়া যোগের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে, বিনা সাধনে কাহারও লাভ হয় না, ইহা স্থির নিশ্চয়। দেব হউন আর দেবীই হউন, নর হউন আর নারীই হউন, সকলকেই ইহা সাধন দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, নচেৎ ইহার অন্য উপায় নাই।

এক্ষণে চণ্ডীর বিষয় সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা যাউক। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়েই সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা যাইতেছে এবং চণ্ডীর রহস্য মাত্রই এস্থলে প্রকাশিত হইবে। শরীররূপ দেহধারী জীব—সুরথ পদবাচ্য। এই জীব দেহরূপ রাজ্যের রাজা বলিয়া এবং সুরথ শব্দের অর্থ "সুন্দর রথ যাহার" এবং রথ শব্দে শরীরকে বুঝায় বলিয়া (কারণ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ" এই শাস্ত্র প্রমাণানুযায়ী শরীরই রথ শব্দ বাচ্য বলিয়া) এবং অন্যান্য শরীর অপেক্ষা মানবদেহ সুন্দর এবং আবশ্যকমত সমস্ত অবয়ব পূর্ণ বলিয়া, সুন্দর দেহধারী দেহরাজ্যের রাজা যে জীব, সেই জীবই সুরথ নামক রাজা বলিয়া চণ্ডীতে

উক্ত হইয়াছে। দুর্গোৎসব ইহার দ্বারাই প্রকাশ। ইনি দেহস্থিত আসুরিক ভাবরূপ যবনরাজ কর্তৃক (আত্মকর্মের বিরোধীগণ রিপু ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতা বশতঃ কেবলমাত্র মুখে আত্মা বা ঈশ্বরবাদী হইয়া মনকে আত্মাতে থাকিতে দেয় না তাহারাই যবন পদবাচ্য, দেহস্থিত আসুরিক ভাবই যবনরাজ স্বরূপ) পরাজিত হইয়া এবং দুরাত্মা অসুরগণ কর্তৃক ইহার সাত্ত্বিক বলস্বরূপ ধনরত্নাদি অপহৃত হইলে পর, ইনি আত্মহারা হইয়া সংসার জ্বালায় অধীর হইয়া, মনোরূপ অশ্বে আরোহণ করতঃ সংসাররূপ বিষয়ারণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকেন, (অর্থাৎ মনের গতি বিষয়াদিতে ধাবিত হইতে থাকে)। এমন সময়ে একদিন সমাধি নামক এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

এই সমাধি নামক বৈশ্য, ইনি নামে সমাধি, কার্য্য ইঁহার বেশ্যবৃত্তি অর্থাৎ বণিকের ন্যায়। ইনি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন এবং মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয়ের সুখদুঃখ চিন্তা করেন, অর্থাৎ গৃহত্যাগ করিয়া তাহার পর আত্মচিন্তন না করিয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পরিত্যক্ত বিষয় সকল মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকেন, অথচ বাহ্যিক সমাধির অনুষ্ঠানও কিঞ্চিৎ আছে। বর্তমানে এরূপ সাধুবেশধারী জীব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা স্বগৃহস্থিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আশ্রমাদি স্থাপন করিয়া, সাধুর বেশে বিয়য়াদি প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা যত্ন করিয়া থাকনে এবং তজ্জন্য মাম্‌লা মোকদ্দমা করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না, অথচ বাহ্যিকে সমাধির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া পরিচয়ও দিয়া থাকেন। সমাধি নামক বৈশ্যও তদ্রূপ, নামে মাত্র সমাধি, কার্য্যতঃ নহে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধুবেশধারী মাত্র, প্রকৃত সাধু নহে। প্রকৃত সাধু তিনি, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছেন; কারণ সাধুশব্দ সাধ্‌ ধাতু (সিদ্ধ করা) হইতে উৎপন্ন। সুতরাং যিনি ইন্দ্রিয়বিজয়ী তিনিই সাধু পদবাচ্য, অপরে নহেন। ইন্দ্রিয়গণকে সিদ্ধ করিতে হইলে স্ত্রী পুত্র, পিতামাতা, গৃহাদি পরিত্যাগ করিতে হয় না। সাধুর লক্ষণ যথা—

“ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধু লক্ষণম্।।
নির্বৈরং সদায়োশান্তঃ দম্ভাহঙ্কার বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে।।”

ইহাই প্রকৃত সাধুর লক্ষণ।

জীবরূপ সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্যর অবস্থা তুল্য হওয়ায় অর্থাৎ মনোবৃত্তি উভয়েরই তুল্য হওয়ায়, উভয়েই গুরুরূপী মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন। মেধস,—যিনি বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যিনি আত্মবুদ্ধিযুক্ত অথচ ঋষি। ঋষি—ঋ=ব্রহ্ম, অথার্ৎ বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থাই ব্রহ্ম পদবাচ্য, ঋ—মূৰ্দ্ধি, ই=শক্তি অর্থাৎ বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থায় ব্রহ্মে যিনি থাকেন তিনিই প্রকৃত ঋষি পদবাচ্য, অপরে নহেন। ঋষি শব্দ দৃশ্‌ ধাতু (দর্শন করা) হইতে উৎপন্ন এবং ঋষি

শব্দের অর্থ—যিনি পরমাত্মদর্শী, সুতরাং যাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা (আধ্যাত্মবিদ্যা) সত্য, তপঃ ও শ্রুতি এই সকল বিষয়ের সম্যক্ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। এইরূপ ঋষির নিকট উভয়ে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উপস্থিত হইয়া, জীবরূপী রাজা সুরথ প্রণতভাবে ঋষিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবন্! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি; আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহার সদুত্তর দানে আমাকে কৃতার্থ করুন। আমার প্রশ্ন এই যে, চিত্ত বশীভূত করিতে না পারায়, মনের যে দুঃখ হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি এবং কেনই বা তাহা হয়? আমি জানা সত্ত্বেও অজ্ঞের ন্যায় দেহাদি বিষয় সমূহে আমার মমত্ব বোধ হয় ইহারই বা কারণ কি? এই বৈশ্য, ইনি নামে সমাধি, অর্থাভাব বশতঃ পরিজনবর্গের ও স্বজন বর্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াও তথাপি সেই পরিজনবর্গের উপর সাতিশয় স্নেহহীল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপী আত্মীয়গণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াও সেই ইন্দ্রিয়গণের উপর সাতিশয় স্নেহশীল রহিয়াছেন। এই কারণে এই বৈশ্য ও আমি অত্যন্ত দুঃখিত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি, আমরা বিষয়ের দোষ অনুভব করিয়াছি, তথাপি আমাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়বিষয়ে এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয়ে মমত্ব বোধে আকৃষ্ট হইতেছে। হে ভগবন্! আমি এবং এই বৈশ্য আমরা উভয়ে জ্ঞানবান্, তথাপি আমাদের ইন্দ্রিয়গণের প্রতি মোহ জন্মে কেন? এই মূঢ়তা, অবিবেকী ব্যক্তিরই হওয়া সম্ভব” ঋষি কহিলেন, “বৎস, সমুদয় প্রাণীরই ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান বর্তমান আছে, এই কারণে তাহারা যদি জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তোমরাও জ্ঞানী পদবাচ্য।

হে মহাভাগ! জ্ঞানবান্ এবং বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া তোমাদের যে অভিমান রহিয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কারণ আহার নিদ্রা, ভয় মৈথুনাদি বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান—ইতর প্রাণী, পশুপক্ষী প্রভৃতিতেও রহিয়াছে, সুতরাং ইহা মোক্ষপ্রদ জ্ঞান নহে জানিবে। ইতর প্রাণী হইতে সাধারণ মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণীরই আপন আপন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান যাহা বর্তমান রহিয়াছেন তাহাতে যদি তাহারা জ্ঞানী বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইলে তোমরাও জ্ঞানী পদবাচ্য। বস্তুতঃ তোমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা পরমাত্ম সম্বন্ধে নহে। পরমাত্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব হেতু তোমাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও বিবেক বুদ্ধি নাই এবং পরমাত্মজ্ঞানও নাই, সাধারণ জ্ঞান বর্তমান সত্ত্বেও তোমাদের জ্ঞানচক্ষুর অভাব। পরমাত্মজ্ঞান কর্মসাপেক্ষ, তাহা তোমাদের নাই। জ্ঞান তিন প্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; ইহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এই সাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব হেতু দিবারাত্রি সম্বন্ধে বিপরীত দর্শন হইয়া থাকে।

দিবা এবং রাত্রি, ইহার কার্য্য নিয়ত জীব শরীরে হইয়া থাকে। দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, ইহা জীব শরীরে পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা দক্ষিণ নাসা দিয়া শ্বাসবহন করিয়া থাকে। প্রাণীগণের দক্ষিণ নাসা দিয়া শ্বাস বহন কালে, রাজসিক ভাবের উদয় হওয়াতে তাহারা দিবসান্ধ, কারণ রাজসিক জ্ঞান সত্ত্বেও অত্মপ্রকশরূপ দীপ্তি পাওয়া অসম্ভব; (দিবস অর্থে দীপ্তি পাওয়া বুঝিতে হইবে)। সুতরাং এরূপ প্রাণীরা দিবসেও অন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানান্ধ।

আবার কোন কোনও প্রাণী ঐরূপ রাত্রিকালেও অন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানান্ধ; কারণ রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। মানব শরীরে ঈড়া নাড়ীকে চন্দ্র নাড়ী কহা যায়, ইহা তমোগুণ, ইহার কার্য্য অজ্ঞান। কোন কোনও প্রাণীগণের বাম নাসিকায় বায়ু সমাগম কালে রাত্র্যাগম হওয়ায়, তাহারা তখনও জ্ঞানান্ধ হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। কোন কোনও প্রাণী পূর্বোক্ত দিবা এবং রাত্রি উভয় সময়েই অন্ধ, অর্থাৎ উভয় সময়েই জ্ঞানান্ধ। উভয় সময়েই অন্ধ হইবার কারণ, পিঙ্গলা নাড়ী হইতে বায়ু যখন ঈড়া নাড়ীতে গমন করে, অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী হইতে শ্বাসের গতি পরিত্যাগ হইয়াছে অথচ ঈড়াতে গতি আরম্ভ হয় নাই, এই সময়েই শ্বাসের গতি স্থিরাবস্থারূপ সযুন্না নাড়ীতে থাকে, এই অবস্থার স্থিতি ক্ষণকাল মাত্র ইহাকে মাহেন্দ্রক্ষণও কহা যায়, ইহা দিবা এবং রাত্র্যাগমে অর্থাৎ চন্দ্র এবং সূর্য্যের গতি পরিবর্তন সময়ে ঘটিয়া থাকে, উক্ত স্থিরভাবে লক্ষ্য যহাদের থাকে না, সাধারণ চক্ষু থাকিতেও তাহারা উভয়কালেই জ্ঞানিগণের নিকট অন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ক্বচিৎ কোন কোনও প্রাণী—দিবা এবং রাত্রি সময়ে অর্থাৎ চন্দ্র নাড়ীতে এবং সূর্য্য নাড়ীতে শ্বাসের গতির সময়ে তুল্যদর্শন শক্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন; ইহা হইবার কারণ, সুযুম্না মার্গে স্থিরভাবের উপর যাঁহাদের সর্বদা লক্ষ্য থাকে, তাঁহারা দিবা রাত্রি উভয় কালেই তুল্যদৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন এবং ইহারাই জ্ঞানী পদবাচ্য হয়েন, অপরে নহেন। বহির্ভাবেও কোন কোনও প্রাণী দিবাভাগে দেখিতে পায় না, আবার কোন কোনও প্রাণী রাত্রিতে দেখিতে পায় না, আবার কোন কোনও প্রাণী দিবারাত্রি উভয় সময়েই দেখিতে পায় না, আবার কোন কোনও প্রাণী উভয় সময়েই তুল্য দর্শন শক্তি বিশিষ্ট। সকলের সকল শক্তি সমান নহ। মানবগণ জ্ঞানী, ইহা সত্য হইলেও কেবল যে তাহারাই জ্ঞানী, এরূপ বলা ঠিক নহে। কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সাধারণ জন্তু মাত্রেই সাধারণ জ্ঞান বিশিষ্ট জানিবে। সাধারন পশু পক্ষীগণের জ্ঞানও যদ্রূপ, তোমাদের ন্যায় মনুষ্যগণের জ্ঞানও তদ্রূপ। সাধারণতঃ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান তোমাদেরও যদ্রূপ, পশুপক্ষীগণের তদ্রূপ। তবে তোমরা পড়া পাখী হওয়ায়, তোমাদের কিছু মূল্য সাধারণের নিকট বাড়িয়াছে মাত্র, নচেৎ আত্মদর্শীর নিকট উভয়েই তুল্য জ্ঞান বিশিষ্ট। প্রকৃত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের যেরূপ জ্ঞানে অভাব, পশুপক্ষীগণের মধ্যেও তদ্রূপ অভাব, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যেই প্রকৃত প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানের অভাব, সুতরাং উভয়ই তুল্য। দেহের আকার পৃথক পৃথক হইলেও প্রকৃত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উভয়ই তুল্য পদবাচ্য।

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই জীবগণ মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া মোহ বশতঃ আপন আপন পুত্রকন্যাগণের সেবা যাহা করিয়া থাকে তাহা স্বার্থ বশতঃই করিয়া থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় ইহারা আমার সেবা করিবে, এই প্রত্যাশায় পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহশীল হইয়া থাকে ইহা কি দেখিয়াও দেখিতে পাওনা। মনুষ্যগণ তথাপি মহামায়ার মায়া প্রভাবে বাসনারূপ আবর্তে ঘূর্ণায়মান ও মোহরূপ গর্তে নিপতিত হইয়া। সংসার স্থিতির কারণভূত হইয়া থাকে। জগতের পালন-কর্তা এবং সংহার-কর্তা নারায়ণের যোগনিদ্রা স্বরূপ (প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থারূপ) প্রাণশক্তিরূপা দেবী যে মহামায়া, তিনিই এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন,

অতএব এই মোহ বিষয়ে আশ্চর্য্য বোধ করিও না। উক্ত প্রাণশক্তিরূপা দেবী, সর্বেন্দ্রিয় প্রকাশিকা ভগবতী। সেই মহামায়া, জ্ঞানীগণের চিত্তকে স্বীয় শক্তি বলে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। তিনি নিজ মায়ায় এই স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরদায়িনী মহামায়া (চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবী) প্রসন্না হইলে অর্থাৎ তাঁহাকে সাধন দ্বারায় তাঁহার স্বচ্ছ ও নির্মল প্রসন্নতাভাব হইলেই তিনি মানবগণের মুক্তির কারণভূতা হইয়া থাকেন। তিনি মহামায়া (প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপা চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবী) তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণা বিদ্যা অর্থাৎ তাঁহা কর্তৃকই জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তিনি মুক্তির কারণ স্বরূপা এবং সনাতনী, নিত্যা, সদা সর্বত্রে বিদ্যমানা, আবার উক্তা মহামায়া সংসার বন্ধের কারণ এবং ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী।

ঋষির এই সকল সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুন্দর শরীর বিশিষ্ট জীবরূপ সুরথ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তিনি কে? কেমন করিয়া তিনি উৎপন্না হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যই বা কি? এবং সেই মহামায়া দেবী কিরূপ স্বভাববিশিষ্টা, কিরূপ আকৃতি বিশিষ্টা এবং কাহা হইতে উৎপন্না, তৎ-সমুদয় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।" জীবরূপ সুন্দর শরীর বিশিষ্ট সুরথের প্রশ্ন শেষ হইলে, ঐ ঋষি সমগ্র দেবী মাহাত্ম্য ও দেবাসুর সংগ্রাম বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন। দেবীই বা কে এবং অসুরই বা কে; দেবতারাই বা কে এবং কি কারণেই বা সংগ্রামে, এখানে সেই সকল বিষয় সংক্ষেপতঃ মাত্র প্রকাশ করা হইবে। সমগ্র মূল দেবী মাহাত্ম্য এখানে প্রকাশ করা হইবে না, উহা প্রত্যেক শ্লোকের তাৎপর্য্যসহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সময় মত প্রকাশিত হইতে পারে। সুরথের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি কহিলেন, যাঁহাকে মাহয়ামা কহা হইয়াছে, তিনি জীবদেহস্থিতা প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপা চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবী, আবার তিনিই মহামায়া পদবাচ্যা; ইনি নিত্যা, সদা সর্বত্রে বিরাজমানা; ইঁহারই পূজার দ্বারা জীব মোক্ষলাভ করিতে পারে। এই বর্তমান চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা যোগামায়া ভগবতী কর্তৃক প্রাণী মাত্রেই আত্মবিস্মৃতি ভাবে সংসার মায়ায় আবদ্ধ রহিয়াছে।

সংসার বন্ধের কারণও এই বর্তমান প্রাণশক্তিরূপা দেবী মহামায়া। এই প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দেবী ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী, কারণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই দেবত্রয় তিনগুণ; "ত্রয়োদেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ।" মহামায়ারূপা চঞ্চলা প্রাণশক্তি হইতেই এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি এবং প্রাণশক্তির অস্তিত্বে গুণত্রয়েরও অস্তিত্ব, সুতরাং তিনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী। এই প্রাণ শক্তিরূপা মহামায়ার আকৃতি জ্যোতিঃরূপা এবং যখন যে ঘটে থাকেন, তখন তদ্রূপা; তিনি নরও নহেন, নারীও নহেন। ঘটের চিহ্নভেদে নর বা নারী উপাধি ধারণ করেন। এই মহামায়ারূপিণী চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবী, সর্ব প্রাণীতে জীবাত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার স্বভাব সম্বন্ধে আর কি বলিব, তবে কিছু বলা চাহি, তাই বলিতেছি, অভাব রহিত ভাবই তাঁহার স্বভাব; তাঁহার স্বভাব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত সে কারণ বলিতেছি যে, স্বভাবের ভাবই তাঁর স্বভাব। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আর কি বলিব তবে এই মাত্র বলি যে, তাঁর কার্য্যও নাই, অকার্য্যও নাই, তবে তাঁর একমাত্র কার্য্য

বর্তমানে যাহা দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ প্রাণকর্মের উর্দ্ধাধোগতি যাহা হইতেছে তাহাই কার্য্য। এই কার্য্যবলে জগতের যাবতীয় প্রাণীসমূহ কার্য্যক্ষম হইয়াছে, উপরোক্ত কার্য্য রহিত হইলে, আর কেহই কোনও কার্য্য করিতে পারে না, তখন সকলেই শবে পরিণত হয়। এমন মহাশক্তি অতি নিকটে থাকিতেও জীবের তাহাতে লক্ষ্য হইতেছে না। মহামায়ার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া জীব সেই মহাশক্তিকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বোধ করিতে পারিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। ইঁহার উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। দেহের নাশে ইঁহার নাশ নাই, যেমন জলবিম্বের নাশে জলের নাশ হয় না।

দেহরূপ ঘটের উৎপত্তিও আছে, নাশও আছে। কিন্তু ঘটের নাশে ঘটস্থিত আকাশের যেমন নাশ হয় না, তদ্রূপ দেহের নাশে দেহস্থিতা প্রাণশক্তির নাশ সম্ভবপর নহে; কারণ প্রাণও শূন্যস্বরূপ, "শূন্য ধাতুঃ ভবেৎ প্রাণঃ"। (দেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে)। এই মহামায়ারূপিণী প্রাণশক্তিরূপা দেবীই পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদিকারণরূপা এবং বিশ্বজননী। শরীররূপ দুর্গের সঙ্কটাবস্থা হইতে ইনি ত্রান করেন বলিয়া ইঁহাকে "দুর্গা" বলা হইয়া থাকে অথবা ইঁহাকে দুঃখে জানা যায় বলিয়াও "দুর্গা" বলা হইয়া থাকে—[সুন্দর শরীর বিশিষ্ট জীবরূপ সুরথ কর্তৃক (গুরূপদেশে) ধরাধামে ইঁহার পূজা প্রচলিত হইয়াছে]।

—পূজা শব্দের অর্থ সম্বর্দ্ধন করণ, অর্থাৎ প্রাণশক্তির বর্তমান অবস্থা যাহা চলিতেছে তাহাকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধন বা বিস্তার করা অর্থাৎ মেরুমধ্যে সুষুম্নার পথে যাতায়াতরূপ ক্রিয়া করা, ইহা গুরূপদেশ গম্য। বলা বাহুল্য উক্তরূপ পূজা আরম্ভ হইলে, বায়ুরূপী দেব সমূহ এবং দৈবী সম্পদ্ সমূহ সমস্তই ক্রিয়াশক্তির অনুকূলে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই অবস্থায় আসুরিক ভাব এবং আসুরিক বৃত্তি সমূহ এবং আসুরিক সম্পদ্ সকল ক্রিয়াশক্তির বিঘ্নমানসে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত হইবার প্রধান কারণ, প্রাণশক্তিরূপা দেবীর প্রকৃত পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা সম্পূর্ণ হইলে, অসুরকূল একেবারে মর্দ্দিত হইবে, এই আশঙ্কায় যাহাতে প্রাণশক্তিরূপা দেবীর পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা না হয়, তৎকার্য্যে আসুরিক ভাব সমূহ আপন আপন ভাবের সংরক্ষণার্থে চেষ্টা আরম্ভ করিল।

এই আসুরিক ভাবের প্রধান নেতা মধুকৈটভ। মধু অর্থে মদভাব। মদ অর্থে যাহার দ্বারা মত্ততা জন্মায় অর্থাৎ অহঙ্কারাদি। কৈটভ-দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ মদভাব যাহার দ্বারা প্রকাশ পায় তিনিই কৈটভ। ইহারা উভয়ে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ বিশিষ্ট; ইহারা উভয়ে রজোগুণ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তৎপরে মধুকৈটভ ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়। তিনি নিজ জঘনে উহাদিগকে বধ করেন। জঘন অর্থাৎ জঘন স্থান; জঘন স্থানই প্রয়াগ "গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যাং জঘনং স্মৃতম্। প্রয়াগং জঘনস্থান মুপস্থমৃষয়োবিদুঃ"। প্রয়াগ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে যেখানে সজন ক্রিয়া বা যাগযজ্ঞ হইয়া থাকে তাহাই প্রয়াগ; প্রাণযজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞপদবাচ্য। "না হোমম্ হোম ইত্যাহু সমাধৌ তত্তু ভূয়তে। ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম তদুচ্যতো॥" ঈড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বামনাসাস্থিত বায়ু ঈড়া ও দক্ষিণ-

নাসাস্থিত বায়ু পিঙ্গলা; ইহারাই গঙ্গা ও যমুনা; মধ্যে সুযুম্না প্রয়াগরূপ যজ্ঞস্থান। এই প্রয়াগরূপ যজ্ঞস্থানের সমীপে চক্ররূপী ভগবান কুটস্থ প্রকাশ। মধুনামক (মত্ততাভাব) মহাসুর এবং পাপরূপ কৈটভ ইহাদের শিরঃ (শ্রি—সেবা করা বা মান্য করা) চক্ররূপী কূটস্থ সমীপে নীত হইলে, অর্থাৎ চক্ররূপী কূটস্থ সমীপে শির অবনত হইলে, পাপ ও অহঙ্কারভাব ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

তৎপরে মহিষাসুর নামক মহাসুর সসৈন্যে আত্মক্রিয়ারূপ যজ্ঞের বাধা প্রদান মানসে আগমন করিয়া, বাধারূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহিষাসুর অর্থাৎ মনের একগুঁয়ে স্বভাব যাহা স্থিরত্বের হানিকর এবং ক্ষুধারূপ লালসাযুক্ত যে ভাব তাহাই আসুরিক ভাবের প্রধান সম্পদ মহিষাসুর। বহির্ব্বিষয়ে লালসা যাওয়ায়, ইহা স্থিরত্বের প্রতি লক্ষ্য ভ্রষ্ট করাইয়া দিয়া থাকে। মহিষাসুরের একজন সাহায্যকারী চিক্ষুর নামক মহাসুর; চি—অব্যক্ত ভাব এবং চি শব্দে বর্দ্ধিত করাও বুঝায় এবং ক্ষুর অর্থে ছেদন করা। সুতরাং যে মহাসুর অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ অলক্ষিতভাবে সাধকের মনে মনে বিষয় লালসার চিন্তা বর্দ্ধিত করিয়া, সাধক হৃদয়ে স্থিরত্বের প্রতি লক্ষ্য ছেদন করে, সেই চিক্ষুর নামক মহাসুর। দ্বিতীয় সাহার্য্যকারী উদগ্র নামক মহাসুর, উদগ্র অর্থাৎ তীব্রতার সহিত উদ্ধতভাব; ইহা তীব্রবেগে উদ্ধতস্বভাব করাইয়া বিষয় লালসার তীক্ষ্ম গতি করাইয়া থাকে। তাহার পর অসিলোমা নামক মহাসুর, ইহা জীবের জ্ঞানকে ছেদন করিয়া মুক্তিপথ রোধ করে। অসিলোমা নামক মহাসুর, অসিরূপ ঈড়া নাড়ীর বায়ুর গতি যাহাতে সঙ্গমস্থল সুষম্না পথে না যায়, এই অভিপ্রায়ে আত্মনির্ভরতা ছেদন করিয়া সংশয় আনাইয়া দেয়।

অসি ও বরুণা—ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়, ইহাই অসিবরুণা, মধ্যে সুষম্না এই সুযুম্নাই প্রকাশরূপী কাশী। এই অসি নদীরূপ নাড়ীর সঙ্গম স্থল সুযুম্না; সুযুম্নার যে স্থলে অসিরূপী নাড়ীস্থিত বায়ুর মিলনরূপ সঙ্গম হইতেছে, তাহাকেই জ্ঞানরূপা গঙ্গা কহা যায়। এই সুযুম্নাস্থিত জ্ঞানগঙ্গাতে মনের অবগাহনরূপ স্নান হইলে, মনো-মালিন্য দূর হইয়া জীবনের মুক্তি হয়, নচেৎ অন্য কিছুতে উহা হয় না। পৃথিবীস্থ নদীসমূহে স্নান করিলে শরীরের ময়লা দূর হয় মাত্র,—তাহাতে মনোমালিন্য দূর হয় না—(তবে এই সবেরও নিগুঢ় তত্ত্ব ভিতরে রহিয়াছে, তাই এই সকলও অগ্রাহ্য বস্তু নহে)।

অসিলোমা =লোম—(লোমন্-লু-ছেদন করা) অর্থাৎ জ্ঞানমার্গকে ছেদন করিয়া যিনি মনের সংশয় জন্মান, তিনিই অসিলোমা।

তাহার পর পরিবারিত নামক অসুররূপী আসুরিক সম্পদ। পারিবারিত অর্থে—পরি—বারিত অর্থাৎ পরি—প্রকৃষ্টরূপে, বারিত—নিবারিত বা আচ্ছাদিত বা আবৃত অর্থাৎ আত্মানারায়ণকে যে তমোরূপ মেঘের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে। যেমন সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিয়া রাখে, তদ্রূপ, আত্মজ্ঞানকে অজ্ঞান দ্বারা ঢাকিয়া রাখাই পরি বারিত অসুরের কার্য্য। তৎপরে বিড়ালাক্ষ আসুরিক ভাবের অসুরও উপস্থিত হইলেন; ইহার কার্য্য—লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সদাই দুষ্টভাবে পরহিংসা করা; এই কারণে ইহার নাম বিড়ালাক্ষ।

অপর আরও অনেক মহিষাসুরের সাহায্যকারী আসুরিক সম্পদের সৈন্যগণ যথা, অসত্য, সাধনে—নৈরাশভাব, আলস্য, বৃথা সময় নষ্ট করা ইত্যাদি সমস্তই সমরে দেবীর ক্রিয়ারূপ যজ্ঞে হত হইয়াছিল। পরিশেষে ক্ষুধারূপ লালসাযুক্ত একগুঁয়ে স্বভাব যাহা মহিষাসুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং যাহা স্থিরত্বের নাশক তাহাও নিহত হইল অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপা দেবীর ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধিতে সাধক হৃদয়ে আত্মশক্তির তেজবৃদ্ধি হওয়ায়, কুটস্থের মধ্যে জ্যোতিঃরূপা দেবীকে দর্শনমাত্রে স্থিরত্বের হানিকর মনের একগুয়ে ভাব মর্দ্দিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দূরিত হইয়া গেল। ইহাই মহিষাসুর বধের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

তৎপরে বায়ুরূপী দেবগণ সকলে মিলিয়া প্রাণশক্তিরূপা মহামায়ারূপিণী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে দূর্গাকে দশভূজা বলা হইয়া থাকে। জীবের আপন আপন শরীরস্থ দশ প্রাণই দশভূজা স্বরূপ। এই দশ প্রাণের যে ক্রিয়া জীবরূপী সাধককে করিতে হয়, তাহাই বাহ্যিকভাবে শাস্ত্রাদিরূপে দেবীর হস্তে দেখান হয়। বাস্তবিক পক্ষে দেবীর হস্তস্থিত অস্ত্রাদি বাহ্যিক অস্ত্র নহে; ঐ সকল অস্ত্রাদি দশ প্রাণের ক্রিয়ার বাহ্যিক চিহ্ন স্বরূপ বলিয়াই বুঝিতে হইবে; এরহস্য গুরূপদেশে জ্ঞাত হওয়া যায়। দশ প্রাণ যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ইহাই পঞ্চপ্রাণ বলিয়া উক্ত হয়; তারপর আর পাঁচটি যথা নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই সমুদয়ে দশটি; এই দশটিকেই দশপ্রাণ কহা যায়। এই দশপ্রাণ আপন আপন কার্য্যে পরিচালিত হইয়া, মানবদেহে আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে। এই দশপ্রাণ বায়ুর মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান, এই পঞ্চবায়ুই প্রধান। এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ুর মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান অপর বায়ু হইতে প্রধান, কারণ শরীরের প্রধান কার্য্য এই দুইটি বায়ুর দ্বারাই সাধিত হইতেছে। প্রাণ আবার সর্ববায়ু হইতে শ্রেষ্ঠতম। এই প্রাণবায়ুই স্থানভেদে নামান্তর হইয়া কার্য্য করিতেছেন। প্রাণের অভাবে স্থাবর জঙ্গমস্থ জগতের সহিত, জগতের যাবতীয় জীব সমূহ সকলেরই কার্য্য রহিত হইয়া সকলেই শবে পরিণত হইয়া থাকে। প্রাণ হৃদয়ে, আপন গুহ্যদেশে, সমনা নাভিমণ্ডলে, উদান কণ্ঠদেশে এবং ব্যান সর্বশরীরে ব্যাপক ভাবে আছেন এবং সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

নাগের কার্য্য উদগার, কুর্মবায়ুর কার্য্য উন্মীলন, প্রসারণ ও সঙ্কোচন, কৃকরের কার্য্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেবদত্তের কার্য্য জৃম্ভণ (হাইতোলা) এবং ধনঞ্জয়ের কার্য্যহিক্কা। ইহা ব্যতীত আরও উনচল্লিশ বায়ু আছে, তাহারাও আপন আপন কার্য্য করিতেছে। একপ্রাণ সর্বরকমে উনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত হইয়া আছেন এবং এই উনপঞ্চাশ প্রকার বায়ু রস ও রক্তবহা নাড়ী সকলে কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ উক্ত উনপঞ্চাশ বায়ু কর্তৃক রস ও রক্ত শিরাসমূহে চালিত হইতেছে, বায়ুর অভাবে সকল কার্য্যই রহিত হইয়া যায়।

এই প্রাণশক্তিরূপা ভগবতী দুর্গার রূপ জ্যোতিঃস্বরূপা, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ও তিনি নিশ্চিতই জ্যোতিঃরূপা, তবে পীতবর্ণ জ্যোতিঃরূপা নহেন; ঐ জ্যোতিঃ অতসী পুষ্পের বর্ণের ন্যায় অর্থাৎ তিসি ফুলের রং এর ন্যায় অল্প নীলাভাবর্ণ বিশিষ্টা।

একটি দীপশিখার মধ্যভাগের রং পীতবর্ণ দেখা যায় বটে, কিন্তু দীপশিখার নিম্নভাগে দৃষ্টি করিলে নীলাভাবর্ণ দেখা যায়, তদ্রূপ আদ্যাপ্রাণশক্তিরূপা ভগবতী দুর্গার প্রকৃত রূপ—নীলকান্তমণির ন্যায়। তাহার পর বাহ্যিক মৃণ্ময় প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের মধ্যে যাহা প্রচলিত আছে, সেই দুর্গা মূর্তির বামদিকে সরস্বতী এবং দক্ষিণে লক্ষ্মী, তদ্ব্যতীত কার্তিক ও গণেশের মূর্তি থাকে।

সরস্বতী, ইনি বিদ্যারূপিণী বাক্‌দেবী। অবিদ্যারূপ আসুরিক ভাব নাশ করিতে আত্মবিদ্যার প্রয়োজন। আত্মবিদ্যা ব্যাতীত অবিদ্যা নাশ হয় না। এই আত্মবিদ্যাও আদ্যাপ্রকৃতিরূপা প্রাণশক্তি হইতে উৎপন্না। আত্মাই যখন নিশ্চিত প্রাণশব্দবাচ্য, তখন আত্মবিদ্যাও প্রাণশক্তি হইতে উৎপন্না, ইহাও নিশ্চয়। বিশেষতঃ প্রাণশক্তির অভাবে কোনও বিদ্যারই অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং আত্মবিদ্যারূপিণী বাগ্‌দেবী সরস্বতী—আদ্যা প্রাণশক্তি হইতেই উৎপন্না ইহা স্থির ও নিশ্চয়। প্রাণশক্তিরূপা মহাদেবীর দক্ষিণে শ্রীরূপা লক্ষ্মী, ইনি সাত্ত্বিকশক্তি বিশিষ্টা এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালীনী এবং শ্রীরূপা। ("শ্রী" শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে)। আসুরিকভাব বিনাশের জন্য ইনি সাত্ত্বিকী দৈবসম্পদ্ দাত্রী। কার্তিক—দৈবসম্পদ রূপ সৈন্যের সেনানায়ক বা সংযতেন্দ্রিয়ভাব; সাধারণে যেভাবে আইবুড়ো কার্তিক বলিয়া থাকে এবং যেভাবে কার্তিককে কুমার কহা যায়, কার্তিক সে ভাবের কুমার নহেন; কারণ কার্তিক অবিবাহিত নহেন; কার্তিকের দুই পত্নীর শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্তিকের রূপের নিকট সাক্ষাৎ কন্দর্পও কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন, এই কারণেই কার্তিককে কুমার বলিয়া থাকে। গণেশ—গণ + ঈশ। সমবর্দ্ধন পূজা ব্যতীত গণেশের অপর পূজা নিষ্ফল। গণ অর্থে সংখ্যা বুঝায়। কালের গতি বিচ্ছেদ অবস্থাই সংখ্যা, অর্থাৎ স্থিত্বভাবই গণেশ পদবাচ্য। এই সমস্ত ভিতরের ভাবের সহিত জড়িত করিয়া বহির্ভাবে রূপকচ্ছলে শাস্ত্রাদিতে এই সকল ব্যাপার বর্ণিত আছে, উদ্দেশ্য—যাহাতে সাধারণ অজ্ঞলোকে ধর্মপথে আসক্ত হয়। প্রতিমা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

মহিষাসুর বধের পর শুম্ভ নিশুম্ভ কর্তৃক ক্রিয়ারূপ প্রাণযজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায়, বায়ুরূপী দেবগণ যেরূপভাবে প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন এবং যে প্রকারে ঐ দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণকে দমিত করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই রহস্যই সংক্ষেপতঃ লিখিত হইবে। দেবগণ নিম্নলিখিতরূপেই দেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন। যথা—"যে দেবী সর্বপ্রাণীতে বা সর্বজীবে বিষ্ণু-মায়ারূপে অভিহিতা হন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।" অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ বর্তমান চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা মহামায়ারূপিণী দেবীই—বিষ্ণুমায়া বা যেগামায়া আখ্যাধারিণী, তিনিই সর্বজীবে অবস্থিতা রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। "সেই প্রাণশক্তি রূপিণী দেবী, যিনি চেতনারূপে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।" অর্থাৎ সেই প্রাণশক্তিরূপা দেবীই—দেহধারী জীব মাত্রেরই চেতনারূপে রহিয়াছেন;

জীবের প্রাণ না থাকলেই অচেতন, সুতরাং প্রাণশক্তিই একমাত্র চেতনারূপিণী এবং এই কারণেই একমাত্র প্রাণশক্তিরূপিণী দেবীকেই চেতনারূপিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিরূপা দেবীই বুদ্ধিরূপে সর্বজীবে রহিয়াছেন, প্রাণশক্তির অভাবে বুদ্ধিও অভাব হইয়া থাকে সুতরাং "প্রাণশক্তিরূপা দেবীই বুদ্ধিরূপে সর্বপ্রাণীতে রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে নমস্কার।

এইরূপে জীবশরীরে নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায় (সংস্কার ছায়া), শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি (ক্ষমা), জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি (শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ), স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে একমাত্র প্রাণশকিতরূপা দেবীই রহিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার প্রত্যেক অবস্থাকেই নমস্কার। অখিল-ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবদেহের ইন্দ্রিয়াধারগণের ও দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্রী বিশ্বব্যাপিকা প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে নমস্কার। এই যে "নমস্কার" শব্দ উপরে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহা চণ্ডীতে উক্ত আছে, ঐ "নমস্কার" শব্দের অর্থ,—ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে আপনি নমস্কার। এই ওঁকার ক্রিয়া গুরূপদেশগম্য। প্রাণশক্তিরূপাদেবী সাধন বলে প্রত্যক্ষ হইলে, সাধক এই ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা দেবীকে অর্থাৎ আপনাকে আপনি প্রণাম করিয়া থাকেন, এই প্রণাম করিয়া সাধকের যেন আশ মিটে না, তাই পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া থাকেন; সেই জন্যই চণ্ডীতে এতবার "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" উক্ত হইয়াছে; শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও ঠিক এই ভাবেই সাধক স্বরূপ অর্জ্জুন ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া কহিতেছেন "নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চভূয়োঽপি নমো নমস্তে।। নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তুতে সর্বত এবসর্ব।" ইত্যাদি।

চণ্ডীতে উক্ত দেবগণের কৃত দেবীর স্তবের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণশক্তিরূপা দেবীই—গুণাদি দেবগণের এবং ইন্দ্রিয়াধার সকলের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রাণশক্তির অস্তিত্ব ব্যতীত গুণাদিদেবগণ বা ইন্দ্রিয়াধারগণ কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। প্রাণশক্তিরূপা দেবীই একমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও প্রাণশক্তির অভাবে মুহূর্তকালও স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং শরীরস্থ প্রাণশক্তিরূপা দেবীই—জীবসমূহের একমাত্র প্রণম্যা ও আরাধ্যা দেবী। উক্ত দেবীরই মহামায়া বশে জীব অন্ধ হইয়া ঐ দেবীকে অমূল্যরত্ন বোধ না করিয়া আত্মহারা হইয়া, জ্বালা প্রাপ্ত হইতেছে। অন্ধ ব্যক্তি যষ্টিহারা হইলে, তাহার যেমন পদে পদে পতন অবশ্যাম্ভাবী, ভ্রমান্ধ জীব প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে অবলম্বন না করিলে, ঐ জীবের ও পদে পদে পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভ্রমান্ধ জীব যদি প্রাণশাক্তিরূপা দেবী মহামায়া ভগবতীকে অন্ধ ব্যক্তির যষ্টির ন্যায় দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যে সে চক্ষুষ্মান্ হইয়া সংসার মোহ হইতে নিশ্চয় অব্যাহতি পাইবে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাণ শক্তিরূপা মহামায়ারূপিণী মহাদেবীই—জীবের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের একমাত্র তরণী স্বরূপা। বিষয়াসক্তিরূপ আসুরিক ভাবের প্রধান নায়কদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ, এই

প্রাণশক্তিরূপা মহাদেবী কর্তৃক হৃতবল হইয়াছিল শুম্ভ— বামানাসাস্থিত ঈড়ারূপ বহির্ব্বায়ু, যাহার বর্হিগতি বিস্তার হইলে ভোগিকান্ত নামক বায়ুর সাহায্য হইয়া জীবের নাশ শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বায়ুর গতি যত বিস্তার হইবে, জীবের নাশ শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বায়ুর গতি যত বিস্তার হইবে, জীবের মৃত্যু ততই নিকট হইয়া থাকে। শুম্ভ—শুন্ভ ধাতু অর্থাৎ দীপ্তি পাওয়া হইতে উৎপন্ন। সুতরাং যে আসুরিকভাব প্রকাশ হইয়া বিষয়াদিতে ধাবিত করাইয়া, অলক্ষিত ভাবে জীবের আয়ুঃক্ষয় করাইতেছে এবং বিষয়াসক্ত ভাবও বৃদ্ধি করাইতেছে, উহাই শুম্ভ পদবাচ্য। নিশুম্ভ—দক্ষিণ নাসাস্থিত পিঙ্গলারূপ বহির্বায়ু নাসার বহির্ভাগে যাহার গতি হইতেছে, ইহারও কার্য্য জীবের নাশ করা। ইহারা উভয়ে ভ্রাতৃস্বরূপ। বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বায়ু বহির্ম্মুখীভাবে যতই বিস্তৃত হইবে, আসুরিকভাবে ততই দীপ্তি পাইয়া, জীবের জীবভাবকে সম্পূর্ণ আসুরিকভাবে পরিণ করিয়া বিষয়াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করতঃ জীবকে সকাম কর্মে আসক্ত বা আবদ্ধ রাখিয়া, জীবের নাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বর্তমানে এই শুম্ভ নিশুম্ভই জীবদেহের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। চণ্ডমুণ্ড, এই শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয়। চণ্ড—উগ্র স্বভাব এবং মুণ্ড—তমোগুণ রাহুর ন্যায় স্বভাব। ইহারা উভয়েই সর্বদা সাধক হৃদয়ের আত্মভাব গ্রাস করিয়া, আত্মক্রিয়াকরণে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এই বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বহির্ম্মুখী গতি বিশিষ্ট বায়ু অর্থাৎ মহাসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ, ইহাদের অধিকৃত প্রাঙ্গণ স্থিতা প্রাঙ্গণ—শরীররূপ গৃহভূমির মধ্যস্থিত অঙ্গণ অর্থাৎ জীবদেহাভ্যন্তর—কুটস্থস্বরূপা গায়ত্রীদেবী ভগবতী যিনি রহিয়াছেন, সেই দেবী কৌশিকীকে উপরোক্ত চণ্ড ও মুণ্ড, যাহারা সদাই দুর্বুদ্ধিযুক্ত উহারা প্রথমে দর্শন করিয়াছিল এবং আসুরিক ভাবের নেতাস্বরূপ মহাসুর শুম্ভকে সংবাদ দিয়াছিল "মহারাজ! কোন এক অনির্বচনীয়া মনোহরা জ্যোতিঃরূপা স্ত্রীরত্ন, হিমালয় আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। হিমালয় অর্থে নিজ শরীরস্থ মেরুর উপরিভাগ অর্থাৎ মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হইয়াছে সেই স্থান অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র। ইহাই প্রকৃত হিমালয় পদবাচ্য। কারণ হিম—হন্ ধাতু অর্থে বধ করা) এই স্থানে আসুরিক ভাবের ও ইন্দ্রিয়গণের কুপ্রবৃত্তিরূপ ভাবে নাশ হইয়া যায়। আবার হিমালয়, হিম ও আলয় শব্দের সংযোগে উৎপন্ন। আলয় শব্দের অর্থ স্থান অর্থাৎ উপরোক্ত স্থান, যথায় আসুরিক ভাব সমূহ নাশ হইয়া যয়, সেই স্থানেই কুটস্থরূপা গায়ত্রী দেবী বিরাজমানা। এই স্থানেই কূটস্থ স্বরূপা ভগবতী গায়ত্রী কৌশিকী দেবীকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগী এবং সাধকের একমাত্র আরাধ্যা দেবতা। তাঁহার রূপ মুখে সম্যক্ ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই, উপরোক্ত চণ্ডমুণ্ডে মুখ হইতে দেবীর রূপ অনির্বচনীয় এই কথা বলান হইয়াছে। ঐরূপ দর্শন করিলে, বর্তমান মনের অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া তাঁহাকে "মনোহরা" বলা হইয়াছে। উপরোক্ত চণ্ডমুণ্ড নিজ প্রভু শুম্ভের নিকট যাহা বলিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই যে 'হে মহারাজ! তোমার যাহা কিছু ধনরত্ন আছে তাহা ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর, তোমার আসুরিক সম্পদ সমস্তই রহিয়াছে, এমন কি বর্তমান শরীর রূপ হংসযুক্তরথ যাহা রজোগুণ ব্রহ্মার আয়ত্তাধীনে

জীবের প্রাণ না থাকলেই অচেতন, সুতরাং প্রাণশক্তিই একমাত্র চেতনারূপিণী এবং এই কারণেই একমাত্র প্রাণশক্তিরূপিণী দেবীকেই চেতনারূপিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিরূপা দেবীই বুদ্ধিরূপে সর্বজীবে রহিয়াছেন, প্রাণশক্তির অভাবে বুদ্ধিও অভাব হইয়া থাকে সুতরাং "প্রাণশক্তিরূপা দেবীই বুদ্ধিরূপে সর্বপ্রাণীতে রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে নমস্কার।

এইরূপে জীবশরীরে নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায় (সংস্কার ছায়া), শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি (ক্ষমা), জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি (শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ), স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে একমাত্র প্রাণশকিতরূপা দেবীই রহিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার প্রত্যেক অবস্থাকেই নমস্কার। অখিল-ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবদেহের ইন্দ্রিয়াধারগণের ও দেবগণের অধিষ্ঠত্রী অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্রী বিশ্বব্যাপিকা প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে নমস্কার। এই যে "নমস্কার" শব্দ উপরে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহা চণ্ডীতে উক্ত আছে, ঐ "নমস্কার" শব্দের অর্থ,—ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে আপনি নমস্কার। এই ওঁকার ক্রিয়া গুরূপদেশগম্য। প্রাণশক্তিরূপাদেবী সাধন বলে প্রত্যক্ষ হইলে, সাধক এই ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা দেবীকে অর্থাৎ আপনাকে আপনি প্রণাম করিয়া থাকেন, এই প্রণাম করিয়া সাধকের যেন আশ মিটে না, তাই পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া থাকেন; সেই জন্যই চণ্ডীতে এতবার "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" উক্ত হইয়াছে; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ঠিক এই ভাবেই সাধক স্বরূপ অর্জ্জুন ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া কহিতেছেন "নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তুতে সর্বত এবসর্ব।" ইত্যাদি।

চণ্ডীতে উক্ত দেবগণের কৃত দেবীর স্তবের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণশক্তিরূপা দেবীই—গুণাদি দেবগণের এবং ইন্দ্রিয়াধার সকলের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রাণশক্তির অস্তিত্ব ব্যতীত গুণাদিদেবগণ বা-ইন্দ্রিয়াধারগণ কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। প্রাণশক্তিরূপা দেবীই একমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও প্রাণশক্তির অভাবে মূহূর্তকালও স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং শরীরস্থ প্রাণশক্তিরূপা দেবীই—জীবসমূহের একমাত্র প্রণম্যা ও আরাধ্যা দেবী। উক্ত দেবীরই মহামায়া বশে জীব অন্ধ হইয়া ঐ দেবীকে অমূল্যরত্ন বোধ না করিয়া আত্মহারা হইয়া, জ্বালা প্রাপ্ত হইতেছে। অন্ধ ব্যক্তি যষ্টিহারা হইলে, তাহার যেমন পদে পদে পতন অবশ্যাম্ভাবী, ভ্রমান্ধ জীব প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে অবলম্বন না করিলে, ঐ জীবের ও পদে পদে পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভ্রমান্ধ জীব যদি প্রাণশাক্তিরূপা দেবী মহামায়া ভগবতীকে অন্ধ ব্যক্তির যষ্টির ন্যায় দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যে সে চক্ষুষ্মান্ হইয়া সংসার মোহ হইতে নিশ্চয় অব্যাহতি পাইবে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাণ শক্তিরূপা মহামায়ারূপিণী মহাদেবীই—জীবের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের একমাত্র তরণী স্বরূপা। বিষয়াসক্তিরূপ আসুরিক ভাবের প্রধান নায়কদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ, এই

প্রাণশক্তিরূপা মহাদেবী কর্তৃক হৃতবল হইয়াছিল শুম্ভ— বামানাসাস্থিত ঈড়ারূপ বহির্ব্বায়ু, যাহার বর্হিগতি বিস্তার হইলে ভোগিকান্ত নামক বায়ুর সাহায্য হইয়া জীবের নাশ শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বায়ুর গতি যত বিস্তার হইবে, জীবের নাশ শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বায়ুর গতি যত বিস্তার হইবে, জীবের মৃত্যু ততই নিকট হইয়া থাকে। শুম্ভ—শুন্‌ভ ধাতু অর্থাৎ দীপ্তি পাওয়া হইতে উৎপন্ন। সুতরাং যে আসুরিকভাব প্রকাশ হইয়া বিষয়াদিতে ধাবিত করাইয়া, অলক্ষিত ভাবে জীবের আয়ুঃক্ষয় করাইতেছে এবং বিষয়াসক্ত ভাবও বৃদ্ধি করাইতেছে, উহাই শুম্ভ পদবাচ্য। নিশুম্ভ—দক্ষিণ নাসাস্থিত পিঙ্গলারূপ বহির্বায়ু নাসার বহির্ভাগে যাহার গতি হইতেছে, ইহারও কার্য্য জীবের নাশ করা। ইহারা উভয়ে ভ্রাতৃস্বরূপ। বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বায়ু বহির্ম্মুখীভাবে যতই বিস্তৃত হইবে, আসুরিকভাবে ততই দীপ্তি পাইয়া, জীবের জীবভাবকে সম্পূর্ণ আসুরিকভাবে পরিণ করিয়া বিষয়াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করতঃ জীবকে সকাম কর্মে আসক্ত বা আবদ্ধ রাখিয়া, জীবের নাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বর্তমানে এই শুম্ভ নিশুম্ভই জীবদেহের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। চণ্ডমুণ্ড, এই শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয়। চণ্ড—উগ্র স্বভাব এবং মুণ্ড—তমোগুণ রাহুর ন্যায় স্বভাব। ইহারা উভয়েই সর্বদা সাধক হৃদয়ের আত্মভাব গ্রাস করিয়া, আত্মক্রিয়াকরণে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এই বাম ও দক্ষিণ নাসাস্থিত বহির্ম্মুখী গতি বিশিষ্ট বায়ু অর্থাৎ মহাসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ, ইহাদের অধিকৃত প্রাঙ্গণ স্থিতা প্রাঙ্গণ—শরীররূপ গৃহভূমির মধ্যস্থিত অঙ্গণ অর্থাৎ জীবদেহাভ্যন্তর—কুটস্থস্বরূপা গায়ত্রীদেবী ভগবতী যিনি রহিয়াছেন, সেই দেবী কৌশিকীকে উপরোক্ত চণ্ড ও মুণ্ড, যাহারা সদাই দুর্বুদ্ধিযুক্ত উহারা প্রথমে দর্শন করিয়াছিল এবং আসুরিক ভাবের নেতাস্বরূপ মহাসুর শুম্ভকে সংবাদ দিয়াছিল "মহারাজ! কোন এক অনির্বচনীয়া মনোহরা জ্যোতিঃরূপা স্ত্রীরত্ন, হিমালয় আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। হিমালয় অর্থে নিজ শরীরস্থ মেরুর উপরিভাগ অর্থাৎ মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হইয়াছে সেই স্থান অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র। ইহাই প্রকৃত হিমালয় পদবাচ্য। কারণ হিম—হন্‌ ধাতু অর্থে বধ করা) এই স্থানে আসুরিক ভাবের ও ইন্দ্রিয়গণের কুপ্রবৃত্তিরূপ ভাবে নাশ হইয়া যায়। আবার হিমালয়, হিম ও আলয় শব্দের সংযোগে উৎপন্ন। আলয় শব্দের অর্থ স্থান অর্থাৎ উপরোক্ত স্থান, যথায় আসুরিক ভাব সমূহ নাশ হইয়া যয়, সেই স্থানেই কুটস্থরূপা গায়ত্রী দেবী বিরাজমানা। এই স্থানেই কূটস্থ স্বরূপা ভগবতী গায়ত্রী কৌশিকী দেবীকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগী এবং সাধকের একমাত্র আরাধ্যা দেবতা। তাঁহার রূপ মুখে সম্যক্ ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই, উপরোক্ত চণ্ডমুণ্ডে মুখ হইতে দেবীর রূপ অনির্বচনীয় এই কথা বলান হইয়াছে। ঐরূপ দর্শন করিলে, বর্তমান মনের অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া তাঁহাকে "মনোহরা" বলা হইয়াছে। উপরোক্ত চণ্ডমুণ্ড নিজ প্রভু শুম্ভের নিকট যাহা বলিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই যে 'হে মহারাজ! তোমার যাহা কিছু ধনরত্ন আছে তাহা ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর, তোমার আসুরিক সম্পদ সমস্তই রহিয়াছে, এমন কি বর্তমান শরীর রূপ হংসযুক্তরথ যাহা রজোগুণ ব্রহ্মার আয়ত্তাধীনে

ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার অধীনে আনীত হইয়া রহিয়াছে; তুমি ইন্দ্রিয়গণের সকল রত্নই নিজ আয়ত্তে আনিয়াছ। সাধারণ মনুষ্যাদি লোক সমূহের যে ধনরত্নাদি আছে তাহাও তোমার আয়ত্তাধীনে রহিয়াছে। কিন্তু কূটস্থ স্বরূপা মহাদেবী গায়ত্রী মহারত্নরূপা, যাহা যোগীদিগের হৃদয়ে প্রকাশ রহিয়াছে, হে মহারাজ! উহা তোমার নিকট অপ্রকাশ রহিয়াছে। হে দৈত্যরাজ! আপনি দেহস্থিত সমুদয় রত্নই আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন; এই শুভ লক্ষণ যুক্তা, স্ত্রীরত্নস্বরূপা দেবী গায়ত্রী কৌশিকীকে আপনি কেন গ্রহণ করিতেছেন না”। আসুরিক ভাবের এই সকল বাক্য মনে মনে আন্দোলিত হইলে, অর্থাৎ ঈড়া নাড়ীস্থিত বহির্বায়ু যাহা প্রকাশ পাইতেছে সেই শুম্ভ—উগ্রস্বভাবযুক্ত দুর্মতি চণ্ড ও রাহুর ন্যায় তমোভাবযুক্ত মুণ্ড এই উভয় অবস্থা কর্তৃক উক্ত দেবীর কথা শ্রুত হইয়া, সুগ্রীব নামক দূতকে তথ্য জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। অর্থাৎ যিনি কুবুদ্ধি ভাবাপন্ন অথচ আসুরিক ভাবের সমর্থন করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন তিনিই সুগ্রীব নামক দূত; এই কুবুদ্ধি মনের মধ্যে প্রশে করিয়া বর্তমান মনের দ্বারা উক্ত দেবীকে আসুরিক ভাবে আনিবার চেষ্টা করিল।

জীবদেহে বর্তমান মনের মধ্যেই আসুরিক ভাবসমূহ বায়ুরূপে কার্য্য করিতেছে। ভোগিকান্ত নামক বায়ুই উভয় নাসার মধ্যে চালিত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভভাবে বর্তমান, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও বর্তমান বুদ্ধি আসুরিকভাবে রঞ্জিত হইয়া, আসক্তির সহিত জীবের ভোগেচ্ছা বলবৎ করাইয়া আসুরিকভাবেরই পোষণ করাইতেছে এবং বর্তমানে চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবীর প্রতি মনের লক্ষ্য যাহাতে না পড়ে এবং সেই দেবীকে সাধারণ আসুরিক ভাবের বশবর্ত্তী করাই আসুরিক ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে অর্থাৎ এই দূত প্রেরণের দ্বারা তাহারই উদ্যোগ পর্ব আরম্ভ হইতেছে। সুগ্রীব নামক কুবুদ্ধিযুক্ত দূত দেবীকে আসুরিক ভাবের সমস্ত ক্ষমতা (বল) ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপন করিয়া আসুরিক ভাবের বশীভূতা হইতে কহিলেন। সাধারণ মানব স্ত্রীরূপ দেখিলেই তৎপ্রাপ্তির জন্য মোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত সাধক যিনি, তিনি তাহাতে মোহিত হন না, বরং সমস্ত নারীরূপকে ভগবতীর অংশ বোধে, মান্য ও পূজা করিয়া থকেন। সাধন অবস্থায় সাধক আপন শরীর মধ্যে কূটস্থে ভগবতীর বিভূতি বিশেষ নারী মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। আসুরিক ভাবাপন্ন সাধক নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ চরিতার্থ করিবার মানসে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং তদর্থে লালসা বৃদ্ধি পাইয়া পরে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধও তাহাই। আসুরিক ভাবের শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত দূতমুখে সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী দূতকে কহিলেন, “তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বর্তমানে সত্য, অর্থাৎ বর্তমানে সকলেই আসুরিক সম্পদে ধনী এবং শুম্ভ যে তাহার অধিপতি, তাহাও আমি জানি, কিন্তু আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আমি কদাচ ভঙ্গ করিতে পারিব না। সে প্রতিজ্ঞা আমার এই যে, আমাকে যুদ্ধে যে পরাজয় করিবে এবং আমার দর্পচূর্ণ করিবে এবং যে আমার তুল্য বলশালী, সেই আমার স্বামী হইবে। অর্থাৎ

প্রাণশক্তিরূপা দেবীর ঊর্দ্ধাধোভাবরূপ চঞ্চল গতিই দর্পস্বরূপ ভাব; এবং ইহার বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া দিয়া অন্তমুর্খীভাব সংস্থাপন করা, ইহাই যুদ্ধ। এইরূপ যুদ্ধে যিনি আমাকে জয় করিবেন তিনি আমার স্বামী হইবেন। দেবীর প্রকৃত পূজা ব্যতীত ইহা (এই জয়লাভ) হইবার নহে (পূজা শব্দের অর্থ সম্বর্দ্ধন এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে)—অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপা দেবীর বর্তমান অবস্থা যাহা চঞ্চল প্রাণরূপে চলিতেছে সৎগুরুর উপদেশ মত প্রাণের এই বর্হির্মুখী চঞ্চল গতিকে অন্তমুর্খী করিয়া* ইহার সম্যক্‌রূপ স্থিতি বৃদ্ধি করার নামই (অর্থাৎ এই চঞ্চল গতিকে অন্তমুর্খী করিয়া ইহাকে স্থির করার নামই) সম্যকরূপে স্থিতি বৃদ্ধি করা রূপ সম্বর্দ্ধনা পূজা বা প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ারূপ প্রাণকর্ম। এই যে, প্রাণের আরাম বা স্থিতি বৃদ্ধি করা রূপ বিস্তার ক্রিয়া, ইহা দ্বারাই চঞ্চল ভাব দূর হইয়া সাম্যভাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ জীবদেহে প্রাণশক্তিরূপা দেবীর চঞ্চল ভাবে বহির্গতি বৃদ্ধি থাকায়, আসুরিকবল বৃদ্ধি পাইয়া আত্মবলকে হীন ভাবাপন্ন করিয়া রাখে। প্রাণশক্তির চঞ্চল ভাবরূপ মধ্য অবস্থার স্রোতে স্থির স্বরূপ আত্মবল, তমোরূপ মেঘেতে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রাণশক্তিরূপা দেবীর সম্বর্দ্ধনরূপ ক্রিয়া দ্বারা জীবের আত্মবল স্বরূপ স্থিরত্বভাব লক্ষীভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে জীব আপন দেহে এই স্থির প্রাণের প্রকাশ করাইয়া তাহাতে তন্ময় হইয়া যায়, তখন সেই জীবের জীবভাব রহিত হইয়া শিবভাব বা শিবত্ব প্রাপ্তি হয়, তখন জীবই শিব হইয়া যায় এবং তখনই সেই জীব প্রাণশক্তিরূপা দেবীর স্বামী পদবাচ্য হইয়া থাকে। স্থির প্রাণ বা স্থিরত্বভাবই প্রকৃত বলস্বরূপ এবং একমাত্র বল, যদ্বারা প্রাণের চঞ্চল ভাব দমিত হয়; এই স্থিরত্বভাব বা স্থির প্রাণ, চঞ্চলা প্রাণশক্তি অপেক্ষা বলবান্। এই স্থিরত্বই আত্মবল। যিনি এই আত্মবল স্বরূপ স্থিরত্বকে লাভ করিয়া থাকেন, তিনি আর তখন আমার ন্যায় জীবপদবাচ্য নহেন, তখন তিনি প্রকৃত উত্তম পুরুষ পদবাচ্য, সুতরাং তখন তিনি প্রকৃতই প্রকৃতির স্বামী হয়েন, অপরে কখন তাহা হইতে পারে না অর্থাৎ জীবভাব থাকিতে উহা হইবার নহে।

তৎপরে উক্ত দূতরূপী কুবুদ্ধি কর্তৃক দেবীর বাক্য সমুদয় ঈড়াও পিঙ্গলাস্থিত অসুরদ্বয়ের নিকট ব্যক্ত হইলে, সাধক হৃদয়ে আত্মক্রিয়ার বিঘ্ন-মানসে সাধনরূপ সমর আরম্ভ হইল এবং ঐ সমরে অসুরপক্ষ হইতে প্রথমে ধুম্রলোচন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তমোরূপ ধূমে যাহার দৃষ্টি আবৃত সেই ধূম্রলোচন, অর্থাৎ তমোদৃষ্টিভাবাপন্ন ভাব যথা, ক্রিয়া করার আলস্য, মোহ নিদ্রাতে অভিভূত করান, তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন করাইয়া সমস্ত কর্ম তামসিক ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা, ইত্যাদি ভাব যাহা হইতে উৎপন্ন হয় সেই ধূম্রলোচন। উপরোক্ত ধূম্রলোচন অসুরপক্ষ হইতে সাধন সমরে অবতীর্ণ হইয়া, সাধককে সাত্ত্বিক কর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিবার মানসে আপন বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। তৎপরে

---

* এখানে প্রাণের গতিকে অন্তর্ম্মুখী করার মর্মে প্রাণবায়ুকে রোধ করা নয়। ইহা—(সদগুরুর উপদেশ সাপেক্ষ) বায়ুকে স্থির করার কার্য্য।

প্রাণশক্তিরূপা দেবীর ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্তে সাত্ত্বিক বলস্বরূপ বিক্রমরূপ সিংহ কর্তৃক ধূম্রলোচনের সৈন্যসকল নিহত হইল অর্থাৎ ধূম্রলোচন ভাবরূপ তমোগুণের কার্য্য (যে সমস্ত তমোভাব তাহা) বিনষ্ট হইল এবং প্রাণশক্তিরূপা দেবী হইতে যে প্রণবরূপ ওঁকারধ্বনি উত্থিত হয়, সেই প্রাণধ্বনিরূপ হুঙ্কারশব্দ হইবামাত্র মনের তমোভাব ভস্মীভূত হইয়া গেল, ইহাই ধূম্রলোচন বধ। দশ প্রকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে প্রণবরূপ ওঁকারধ্বনিই প্রধান। প্রণবধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল স্তব্ধ প্রায় হইয়া বিলীন হইয়া যায় এবং মন আত্মস্থ হইয়া থাকে।

ধূম্রলোচন বধ হইলে উগ্রতারূপ দুর্মতি চণ্ড এবং রাহুর ন্যায় তমোপূর্ণ মুণ্ড সাধন সমরে বাধ দিবার জন্য যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। চণ্ড ও মুণ্ড শরীরস্থ প্রাণশক্তি দেবীর ক্রিয়াশক্তিকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইলে, শরীরস্থ প্রাণশক্তির ভ্রূকুটী ভঙ্গীরূপ ক্রিয়া হইতে, নিজ ললাটে বৃহৎকূটস্থের মূর্তি করালবদনা মহাকালীর রূপ দর্শন হইল। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ১১শ অধ্যায়েও এই ভাবের কথাই উক্ত হইয়াছে যথা, "দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টে কালানল সন্নিভানি" ইত্যাদি। উপরোক্ত মহাকালীর রূপদর্শন জনিত জ্ঞানখড়্গে চণ্ডমুণ্ড উভয়েই সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কাল অনন্ত, সেই কাল ঘটস্থভাবে অবস্থিত হইলে ঐ কালে ঈ অর্থাৎ শক্তি সংযুক্ত হওয়ায় কালী হইয়া থাকেন। চণ্ডমুণ্ড স্তব্ধভাবপ্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হওয়ায় দেবীর চণ্ডিকা নাম হইল। ইহাই উগ্রচণ্ডা মূর্তি। এই উগ্রচণ্ডা মূর্তির কথাও শ্রীমদ্ভাগবদীতার ১১শ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যথা,—

"দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি, ব্যাপ্তংত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।" ইত্যাদি।

উক্ত মহাকালীরূপা কূটস্থের সর্ব্বব্যাপীরূপ, প্রাণশক্তিরই তেজো প্রকাশরূপ অবস্থা। যখন সাধকের যোগ অবস্থা হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা সাধক যখন প্রাপ্ত হন, তখনই উক্তরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকাশ অবস্থাকে উৎপন্না মনে করা চাহি না, কারণ ইতি নিত্যা, সর্বদা সর্বত্রে বিদ্যমানা, ঐ অবস্থার উৎপত্তি ও নাই, নাশ ও নাই। চণ্ডমুণ্ড বধ নামক অধ্যায়ের ইহাই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। উগ্রভাব চণ্ড ও রাহুসদৃশ তমোগুণরূপী মুণ্ড বিনষ্ট হইলে, মহাসুর শুম্ভ কর্তৃক সাধন সমরে রক্তবীজ প্রেরিত হইল এবং ঐ রক্তবীজ সাধন সমরে সাধকের আত্মক্রিয়াকরণ ইচ্ছাকে নাশ করিতে উদ্যত হইল। রক্ত অর্থাৎ অনুরক্ত সুতরাং রক্তবীজ অর্থাৎ অনুরক্তির বীজ বা ইচ্ছারূপ অবস্থা; অর্থাৎ সাধকের বিষয়াশক্তিরূপ ইচ্ছা বা মনে মনে বাক্য কথনরূপ বিষয় চিন্তা যাহা সাধকের হৃদয়ে উদয় হইয়া মূল স্থিরত্বের লক্ষ্য রাখা রূপ অবস্থা হইতে চ্যুত করাইয়া দেয় তাহাই রক্তবীজ পদবাচ্য। ইহার একবিন্দু ইচ্ছা হইতে শত শত রক্তবীজরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিছুতেই ইহার নাশ না হওয়ায় কালী ইহাকে নিজ জিহ্বার উপরে রাখিয়া রক্তবীজের বধকার্য্য সামাধা করেন বলিয়া চণ্ডীতে উল্লেখ

আছে। কালীমূর্তিতে জিহ্বা বাহির করিয়া উহা দন্তের দ্বারা যে কামড়ান অবস্থা দেখান হয়, উহার প্রকৃত ভাব জিহ্বার সংযম অবস্থা বুঝিতে হইবে। ক্ষণিক জিহ্বাকে নিজে কামড়াইয়া ধরিলেও ক্ষণিকের জন্যও ইচ্ছার আংশিক নাশভাব অনুভূত হইতে পারে, করিয়া দেখিলেই সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত জিহ্বার সংযম—কণ্ঠকূপ মধ্যে বিশুদ্ধচক্রে আটকাইয়া থাকারূপ অবস্থা, ইহা গুরুপদেশগম্য। অর্থাৎ জিহ্বাকে তালুকুহরে স্থিতি করিয়া, বিশুদ্ধচক্রে বিনা অবরোধে বায়ু রোধ হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই জিহ্বার সংযম অবস্থা; এই অবস্থাতেই রক্তবীজ বধ হইয়া থাকে এবং এই অবস্থাতেই উপরোক্ত রক্তবীজ বা ইচ্ছা, দেহস্থ দেবী কর্তৃক নিহত হয়। ইহাই দেবী মাহাত্ম্যে রক্তবীজ বধের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

রক্তবীজ বধ হইলে আসুরিকভাবের প্রধান প্রধান ভাব সমস্তই প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, পিঙ্গলা বা দক্ষিণ নাসাস্থিত বহির্বায়ু যাহা ক্রমাগত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, সেই পিঙ্গলাস্থিত মহাসুর নিশুম্ভ, সাধন অবস্থায় শরীরস্থ প্রাণের গতি যাহাতে স্বতঃস্থির না হয় সেই উদ্দেশ্য যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল, অর্থাৎ সাধকের মনে নানাপ্রকার বিঘ্নপ্রদানে উদ্যত হইল অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্মরূপ যোগ বিঘ্নস্বরূপ অস্ত্রাদি দ্বারা যোগকর্ম হইতে নিবৃত্তি মানসে, অবশিষ্ট আসুরিক প্রবৃত্তি সকল, সৈন্যরূপে প্রকাশ হইয়া সাধন সমরে প্রবৃত্ত হইল। প্রাণকর্মরূপ নিষ্কাম কর্ম দ্বারা প্রাণশক্তিরূপা দেবীর নিকট সমস্ত পরাস্ত হইলে, অবশেষে পিঙ্গলাস্থিত বহির্বায়ুর গতি বিচ্ছেদ হইয়া পিঙ্গলাস্থিত মহাসুর নিশুম্ভা সাধন সমরে প্রাণশক্তিরূপা দেবীর অন্তর্ম্মুখী গতিতে হীনবল হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নিশুম্ভকে ভূতলে অর্থাৎ মূলাধারে পতিত দেখিয়া, ঈড়াস্থিত মহাসুর শুম্ভ যুদ্ধার্থে আসুরিক সম্পদের অবশিষ্ট সৈন্য যাহা ছিল, তাহা লইয়া সাধন সমরে উপস্থিত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে পর আসুরিক বল হীন হইতে লাগিল, এমন সময়ে পিঙ্গলাস্থিত মহাসুর নিশুম্ভ পুনঃ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শরীরস্থ প্রাণরূপা ক্রিয়াশক্তির আত্মশূল অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়ারূপ শূলের দ্বারা হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইলে, নিশুম্ভরূপ মহাসুর শূলবিদ্ধ হইল অর্থাৎ পিঙ্গলাস্থ বহির্বায়ু বোধ হইল। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সমস্ত অসুরগণ সকলেই অনঙ্গ অর্থাৎ বায়ুরূপী, বর্তমানে ইহারা জীবদেহ ব্যাপিয়া উহা অধিকার করিয়া আছে। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলে পর অর্থাৎ উপরোক্ত নিশুম্ভ উপরোক্ত শূলে বিদারিত হইলে পর, তাহার ভিতর হইতে অর্থাৎ উক্ত নিশুম্ভের হৃদয় নিজ শরীরেরই মধ্য হইতে অপর পাপপুরুষ একটি বাহির হইল। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলে সাধক ইহা বুঝিতে পারেন। প্রাণশক্তির ক্রিয়া দ্বারা সেই পাপ-পুরুষরূপ মহাসুরও বিনাশ প্রাপ্ত হইল, ইহাই নিশুম্ভ বধ।

অনন্ত প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত হইতে দেখিয়া (আসুরিক ভাবাপন্ন জীবসকল উভয় নাসাস্থিত বহির্বায়ুকেই প্রাণবায়ু বলিয়া মনে করায় প্রাণতুল্য বলা হইল) অর্থাৎ পিঙ্গলায় নাসাস্থিত বহির্বায়ু যাহা প্রকাশ পাইতেছিল তাহা প্রাণশক্তির ক্রিয়া দ্বারা

নাসাভ্যন্তরচারী হইয়া স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইল দেখিয়া (পিঙ্গলাস্থিত বহির্বায়ুর স্বতঃ নিরোধ অবস্থা হওয়ায় ঐ প্রাণের ক্রিয়াশক্তিদ্বারা উক্ত মহাসুর নিশুম্ভ নিহত হওয়াতে এবং পিঙ্গলারূপ রজোভাবের সৈন্য যথা—ইচ্ছা, দ্বেষ, অহঙ্কারাদিরূপ সৈন্য সকলও বিনষ্ট হওয়াতে) ঈড়াস্থিত বহির্বায়ুরূপী মহাসুর শুম্ভ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে বলগর্বমত্তে দুর্গে! তুমি শরীররূপ দুর্গে অবস্থিতি করিয়া, শরীরস্থ অপরাপর বায়ুরূপী দেবও দেবীগণের বলরূপ সাহায্য পাইয়া সাধন সমররূপ যুদ্ধ করিতেছ, তুমি একাকিনী নহ; অতএব তোমার অহঙ্কার করা উচিত নহে।" তাৎপর্য্য—বহিরঙ্গ সাধনে আসুরিক ভাবকে দমন করিবার শক্তি, আসুরিক ভাবাপন্ন জীবের পক্ষে দুরাশা মাত্র। ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত বাহ্যিক যাগযজ্ঞাদিতে আসক্ত করিয়া রখিতে পারিলে আসুরিকভাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং আসুরিকভাব সমুদয়ের চেষ্টাও তাহাই। মাকাল ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ফল প্রত্যাশায় বশীভূত করিয়া এবং মোক্ষমার্গ হইতে একেবারে বঞ্চিত রাখিয়া, আসুরিকভাব সমুদয় জীবকে মায়ারূপ সংসারচক্রে নিষ্পেষণ করতঃ তাহার জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া, মুগ্ধভাবে তাহাকে ক্রমাগত জন্মমৃত্যুরূপ যাতায়াত করাইয়া সংসার জ্বালা ভোগ করাইয়া থাকে। জীবের যাহাতে অন্তর্লক্ষ্য না হয়, আসুরিকভাব ও আসুরিক সম্পাদাদির তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য; ইহা বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থাপিণী মহামায়ার বহির্ম্মুখী ক্রিয়াশক্তির ফলস্পরূপ। যে জীব বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ প্রাণশক্তির বহির্ম্মুখী অবস্থাকে গুরূপদেশে বিধিপূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখী করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কেবল তাঁহারই সহিত আসুরিকভাব ও আসুরিক সম্পদ্ এবং গুণাদি ইন্দ্রিয়গণের সাধন-সমর হইয়া থাকে এবং যিনি এই সাধন সমরে অসুরকুলকে মর্দ্দন করিতে সক্ষম হন, তিনিই শিবপদবাচ্য হয়েন, নচেৎ সকলেই জীব পদবাচ্য। তবে চেষ্টা ও যত্ন বিশেষভাবে বর্তমান থাকিলে, জীব একদিন না একদিন সাধন সমরে জয়ী হইয়া মোক্ষভাগী হইয়া শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন, ইহা নিশ্চয়। ঈড়াস্থিত বহির্বায়ুরূপ মহাসুর শুম্ভ, প্রাণশক্তিরূপা দেবী দুর্গাকে উক্তরূপ বাক্য কহিলে পর, দেবী কহিলেন অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপা দেবীর কূটস্থরূপ মূর্তি হইতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি প্রকাশ হইয়া মনের অনুভবে আসিল এবং এই অর্থেই "দেবী কহিলেন" উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ভাবেই দেবী কহিলেন "এই বহির্জগতে এবং শরীররূপ জগতে একমাত্র আমিই আছি' দ্বিতীয় আর কেহই নাই (আর কেহ থাকিবে কোথা হইতে? কারণ "সর্বং প্রাণময়ং জগৎ"); তুমি যাহা যাহা দেখিতেছ, এ সমস্তই আমার বিভূতি; যে আমাকে জানে না অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানে না, সে মূঢ় আমার বিভূতিও অবগত নহে। রে দুষ্ট! এই দেখ, এই বায়বী রূপিণী দেবীগণ সকলেই আমারই অংশ এবং আমারই বিভূতি, ইহারা শরীররূপ জগতে কার্য্য করিয়া আমাতেই প্রবেশ করিতেছে, অর্থাৎ চঞ্চলভাব যাইয়া প্রাণের স্থিরভাবে সবই মিশিয়া বিলীন হইতেছে, আমি একাকী মাত্র রহিয়াছি

অর্থাৎ নদী সকল যেমন মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া মহাসমুদ্রের বারিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ শরীরস্থ সমস্ত বায়বী শক্তি, স্থিরা প্রাণশক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া গেল।

তৎপরে ঈড়াস্থিত মহাসুর শুম্ভ, অজ্ঞানরূপ খড়্গ এবং তমোরূপ চর্ম (ঢাল) লইয়া দেবীকে আক্রমণ করিল,অর্থাৎ ঈড়ানাড়ীস্থিত মহাসুরের অজ্ঞানভাব এবং তমোভাব অর্থাৎ নিদ্রাচ্ছন্নভাব সাধক হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়া মনকে আক্রমণ করিল। প্রাণশক্তিরূপা দেবী, প্রণবরূপ ধনুনিক্ষিপ্ত শাণিত বাণসকল দ্বারা অজ্ঞানরূপ খড়্গ ও নিদ্রাচ্ছান্নভাব বা তমোরূপ চর্ম ছিন্নভিন্ন করিলেন। অর্থাৎ সাধকের অজ্ঞানভাব আসায় নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে, ওঁকাররূপ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা, অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি হইতে নিঃসৃত ওঁকারধ্বনির সদৃশ স্থিরপ্রাণের ক্রিয়া দ্বারা আসুরিকভাবের ঐ অবস্থার অর্থাৎ অজ্ঞানভাব নিদ্রাচ্ছন্নভাব অবস্থার নাশ হইয়া গেল। তৎপরে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাহু—বহ্ ধাতু, বহন করা অর্থাৎ যাহার দ্বারা বহন কার্য্য হইয়া থাকে তাহাকেই বাহু কহিয়া থাকে বহ নামক বায়ু কর্তৃক সমস্ত বিষয় মনের গোচর হইয়া থাকে অর্থাৎ বহ্ নামক বায়ুই সমস্ত বিষয় বহন করিয়া মনের গোচর করিয়া থাকে। এই বহ্ নামক বায়ুর ক্রিয়া ও বহির্বায়ুর ক্রিয়া নিরোধ করাই বাহুযুদ্ধ; অর্থাৎ নাসিকার বহির্বায়ু ভিতরে যাহাতে প্রবেশ না করে, কেবলমাত্র নাসাভ্যন্তরচারীমাত্র অবস্থা করিবার জন্য উভয় বায়ুর প্রক্রিয়া বিশেষই বাহুযুদ্ধ। এইরূপ বায়ু ক্রিয়াকরারূপ যুদ্ধ অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি কার্য্য বহুকালব্যাপী হইল। প্রাণশক্তিরূপা দেবী কর্তৃক অর্থাৎ প্রাণশক্তির ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ঈড়াস্থিত বহির্বায়ুরূপী শুম্ভ উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়া পৃথ্বীতলে অর্থাৎ মূলাধারে নিক্ষিপ্ত হইল। মূলাধারে উক্ত বায়ুকে ক্ষেপণ করিয়া মূলাবন্ধরূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা সঙ্কোচ করিয়া রাখিলে পর, উক্ত ঈড়াস্থিত মহাসুর শুম্ভরূপী বায়ু পুনরায় মূলাধার হইতে মহাবেগে ধাবিত হইয়া, মূলা প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল অর্থাৎ স্থিরত্বের অনুভব বন্ধ করিতে উদ্যত হইল। তৎপরে প্রাণশক্তির ওঁকার ক্রিয়ারূপ শূলদ্বারা (শূলযোগ ক্রিয়া বিশেষ) পুনরায় ভূতলে (মূলাধারে) পাতিত ও মর্দ্দিত হইয়া একেবারে তেজোহীন অবস্থায় পতিত হইল। এইরূপে আসুরিকভাবে নায়ক দুরাত্মা মহাসুর শুম্ভ নিহত হইলে, দেহ উপদ্রব রহিত হইয়া প্রসন্ন হইল ও সুন্দর সুস্থভাব প্রাপ্ত হইল এবং হৃদয়াকাশও নির্ম্মল হইল। আসুরিকভাবের ও আসুরিক সম্পদের অস্তিত্বকালে অর্থাৎ দেহের বর্তমান অবস্থায় যে সকল জ্বালা, উৎপাত বর্তমান রহিয়াছে এবং আসুরিকভাব দ্বারা মন ভ্রান্তভাবে চালিত হইয়া, সদ্সৎ কর্মে সুখ দুঃখ, পাপ, পুণ্য বোধ করিয়া ফলভাগী হইতেছে, ঈড়া ও পিঙ্গ লাস্থিত বায়ুর বশীকরণরূপ অবস্থা হওয়ায়, মনের সেই সকল ভাব দুর হইয়া গেল। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিজ করতলগত হইয়া মন চিরশান্তিলাভ করিল এবং মন আত্মস্থ হওয়ায় শমতা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামলাভ করিল। অর্থাৎ এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কর্ম ইন্দ্রিয়গণ করিতেছে, মন আত্মস্থ হইয়া আত্মাতে রমণ করিতেছে, এ অবস্থা যাহা ইহা অব্যক্ত অনির্বচনীয় অবস্থা। ইহা চণ্ডী পুঁথিপাঠে বা শ্রবণে লাভ হয় না; যদি কোনও ভাগ্যবান্

জীব বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ মহামায়া চণ্ডিকার বর্তমান অবস্থার উল্টা অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী গতি গুরূপদেশে করিতে সক্ষম হন, তিনিই প্রকৃত চণ্ডীর রহস্য অবগত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, নচেৎ নহে।

প্রাণক্রিয়ার উল্টা বা অন্তর্ম্মুখীগতি করিয়া অর্থাৎ অজপাজপের উল্টা জপদ্বারা বাল্মীকি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। এইরূপ উল্টা গতি করিয়া লওয়াই উল্টা নাম জপ করা। এই কারণেই কথিত আছে যে, "উল্টা নাম জপৎ জগ জানা, বাল্মীকি হুয়া ব্রহ্মসমানা।" যে জীব উহা উল্টা ভাবে অর্থাৎ গুরূপদেশে প্রাণশক্তিরূপা দেবীর উল্টা নামের ক্রিয়ারূপজপ করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি উপরোক্ত সমস্ত অবস্থাই লাভ করিবেন এবং যিনি এই প্রাণশক্তির কার্য্যরূপ ধর্মের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবেন তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। এই ক্রিয়ারূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম সুখের সহিত সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাই সহজ কর্ম, জন্মের সহিত ইহা পাওয়া যায় এই জন্যই ইহা সহজ। যাহা করা যায় তাহাই কর্ম পদবাচ্য। জীব, জন্মের সহিত এই প্রাণকর্ম পাইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সহজ কর্ম। প্রজাপতি সৃষ্টির প্রথমে প্রাণযজ্ঞ (প্রাণের ক্রিয়ারূপ যজ্ঞ) সহ প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক।

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাসৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।"
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।"

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা ৩য় অধ্যায় ১০ম ১১শ শ্লোক। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি প্রাণযজ্ঞসহ প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর; ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে। এখানে "দেবগণ" অর্থে প্রাণ। দিব্ শব্দের অর্থ আকাশ বা শূন্য; শূন্যধাতু ভবেৎ প্রাণঃ" ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ৩৪ শ্লোক। প্রাণায়ামাদি কার্য্যদ্বারা প্রাণের সংবর্দ্ধনা করিলে অর্থাৎ প্রাণের সম্যক্‌রূপ বিস্তার করিলে, প্রাণও আমাদিগকে পরম মঙ্গলপথে অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকেন! (আর্য্য মিশন হইতে প্রকাশিত গীতার ১৮ অঃ ৪৭/৪৮ শ্লোক এবং তাহার ফুটনোট দেখ)। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বা চণ্ডী এই সকল গ্রন্থে যে সকল যুদ্ধ বিবরণ বাহ্যিকভাবে লিখিত আছে, তাহা নিশ্চয়ই সাধারণ বাহ্যিক সমর বা যুদ্ধ নহে, ইহাতে ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ও আসুরিকভাবের সহিত সাধকের সাধনরূপ সমর বাহ্যিক রূপকভাবে বর্ণিত আছে। তবে বিনা সদ্‌গুরুর উপদেশে পাঠ করিলে, পাঠকগণের আপন আপন রুচি অনুযায়ী শাস্ত্রার্থ

সকল সাধারণ বাহ্যিক ভাবেই পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। সাধারণ জীবমাত্রেরই রুচি পৃথক্ পৃথক্। “ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।” সুতরাং সাধারণ পশুভাবাপন্ন জীব আপন আপন ভাবের বশীভূত হইয়া, অর্থাৎ যাহার যেমন মনের ভাব, তিনি সেইরূপ আপন মনের ভাবের বশবর্তী হইয়া সাধারণ পশুভাবের ভাবেই অর্থ করিয়া থাকেন মাত্র এবং তাহার ফলে আসুরিকভাবেই বৃদ্ধি পাইয়া আত্মোন্নতির পথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, নিজে মনের অশান্তিতে কালাতিপাত করিয়া থাকেন এবং অপরের মনেও সন্দেহ ও অশান্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা উপরোক্ত কুফল ব্যতীত অপর কিছুই কাহারও লাভ হয় না। অপরিণামদর্শী লোকের দ্বারা শাস্ত্রার্থ সকল প্রচারিত হওয়ায় তাহাতে কুফলই ফলিতেছে। অর্থাৎ শাস্ত্রাদির বহির্ভাবের অর্থ পাঠ করিয়া লোকে কর্মশূন্য হইয়া, মৌখিক জ্ঞানের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে, অথচ ভিতরে ভিতরে নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। কর্মব্যতীত যে আমার জ্ঞানলাভ হইবে না, চণ্ডী, গীতা বা অপরশাস্ত্র পাঠ দ্বারা আমার তাহা জানা হয় নাই। তাহার পর কোন্ কর্মধারা যে আমার আত্মজ্ঞান লাভ হইবে, তাহা দেখাইবার ও বুঝাইবার লোকাভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সাধারণতঃ আপন আপন রুচি অনুযায়ী সকলে কর্ম সম্বন্ধে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী কর্ম করিয়াও থাকেন। আসুরিকভাবের রুচি আমার যখন বর্তমান রহিয়াছে, তখন আমার কৃত কর্মও আসুরিকভাবেরই হইয়া থাকে। আমার অভীষ্ট দেবতা আমার মধ্যে থাকিলেও আমাকে দেখাইবার প্রায় লোকাভাব; কারণ যাঁহারা দেখাইবেন, তাঁহারাও আসুরিকভাবে পরিপূর্ণ থাকায়, আসুরিকভাব সংরক্ষণার্থ আমার অন্তরস্থ অভীষ্টদেব বা দেবীর দিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিতে দেন না, বরং তাচ্ছল্যই করিয়া থাকেন; সুতরাং এমন অবস্থায় চণ্ডীপাঠ বা অপর শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণে আমার যে কিছু হইবে বা হইতে পারে সে আশা করাও আমার বিড়ম্বনা মাত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাহ্য পূজার উৎসব

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমি আমার মা'র কোলে শায়িত অবস্থায় থাকা কালীন আমার গর্ভাবস্থার আভাস আসায়, আমি সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে চণ্ডী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যেভাব সংক্ষেপতঃ আমার প্রকাশ হইতেছিল, তাহার পরেই বোধনগৃহে চণ্ডীপাঠ সমাপন হইয়া যাইলে, মা আমাকে নিজ ক্রোড় হইতে উঠাইবার সময় আমাকে নাড়াচাড়া করায়, আমার “না নিদ্রা না জাগরণ” অথচ এক অনির্বচনীয় অবস্থা যাহা ছিল, তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, যেন আমার উক্ত অবস্থার উপর বেগে যবনিকা পতন হইল।

আমার উক্ত অবস্থা অন্তর্হিত হওয়ায় আমার যেন অত্যন্ত ভাল জিনিষ একটা কিছু হারাইয়া গেল এইরূপ বোধ হওয়াতে আমি অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। মা আমার কান্না দেখিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার এ কান্না আর থামিতেছে না। "কেন কাঁদছ বাবা", "তোমার কি চাই বাবা" ইত্যাদি নানারকম কথা বলিয়া মা আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং অপরে নানাপ্রকার খেল্না আনিয়া আমাকে ভুলাইয়া, আমার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সকলেই বলিতেছেন, "কেন কাঁদ্‌ছ বাবা" "বাবা খোকা, তোমার কি চাই বল আমরা সব দিতেছি" এবং কেহ কেহ বা আমার কান্না থামাইবার জন্য আমার মা'র ক্রোড় হইতে আমাকে নিজ ক্রোড়ে লইল, কিন্তু কেহই কিছুতেই আমার কান্না থামাইতে পারিতেছে না। "কেন কাঁদ্‌ছ বাবা" "তোমার কি চাই বাবা," ইত্যাদি কথা সকলেই বলিতেছে, কিন্তু আমি যে কেন কাঁদ্‌ছি তাহা কেই বা বুঝে এবং তাহা আমিই বা কি বুঝি তাহাও জানি না। নানারকম খেলনার জিনিষ আমাকে দিতে আসায়, আমার তাহা পছন্দ হইতেছে না এবং আমি তাহাতে ভুলিতেছি না। কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহাও আমার মনে না থাকায় আর বলিতে পারিতেছি না, অথচ আমার যে বিশেষ একটা কিছু হারাইয়াছে তাহাও ঠিক। যে সকল খেলনা আমাকে দিতেছে, তাহাতে আমার তৃপ্তি আসিতেছে না, সুতরাং আমার কান্না আর নিবারণ হইতেছে না। পরিশেষে মা আমাকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইবার জন্য আমার মুখে নিজ স্তন প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অনেক কান্নার কারণে আমার গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং মুখে স্তন পাইয়া আমি কোঁত কোঁত করিয়া স্তনদুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম এবং ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া আস্তে আস্তে কাঁদিতেও লাগিলাম। তবে এখন কান্নার আর জোর নাই এবং শব্দও নাই কেবল ফোঁস ফোঁসানিমাত্র আছে। যাহা হউক স্তনপান করিতে করিতে পরিশেষে আমার ফোঁস ফোঁসানি রূপ যে কান্না ছিল তাহাও নিবারণ হইয়া গেল। এখন আমি মধ্যে মধ্যে আমার মার মুখের দিকে তাকাইয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে আধ আধ ভাবে হাসিতেছি। আমার হাসি দেখিয়া জননীও আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মিষ্ট মিষ্ট কথা কহার সহিত হাসিতেছেন। জননীর হাস্যবদন দেখিয়া এবং স্তনদুগ্ধপান করায় পেটভরার দরুণ, আমার পূর্বভাব আর এখন নাই, কান্নাও নাই। এখন আমি সাধারণ ভাবের সাধারণ খোকায় পরিণত। পূর্বে যে আমি কেন কাঁদিতেছিলাম, তাহা এখন আমার বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় সব ভুলিয়া গিয়াছি; আমার যে কিছু হারাইয়া গিয়াছে তাহাও আর আমার এখন বোধ নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমি এখন হাঁটিতে পারি এবং মধ্যম রকমের দৌড়াদৌড়িও করিতে পারি। সুতরাং স্তনপান করার পরই আমি আমার জননীর ক্রোড় হইতে নামিয়া খোকাভাবে অপর খোকার সহিত মিলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের পূজাবাড়ী; এখন আমাদের বাড়ীতে ছোট বড় অনেক খোকা আসিয়াছে, বাড়ীতে খুব ধুম ধাম

চলিতেছে। ধুমধামের বিষয় আমার কিছুই জানা নাই, তবে বাড়ীতে খুব ঢাকঢোল বাজিতেছে, আমার পক্ষে ইহাই ধুমধাম। অপর খোকাও যেমন আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে, আমিও তাহাদের দেখাদেখি নাচিয়া বেড়াইতেছি। প্রকৃত আনন্দ যে কি, তাহা আমি জানি না; অধিকাংশই ছোট বড় খোকাদের নকল করিয়া চলি, এবং কখন কখনও নিজের খেয়াল মতও অনেক কার্য্য করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমার এখন কার্য্যেরও বোধ নাই, অকার্য্যেরও বোধ নাই; তবে আমি আমার জননী বা পিতার নিকট লালিত পালিত হওয়ায়, ইহাঁরা যাহাকে ভাল কার্য্য বলেন, আমিও তাহাকে ভাল কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং তাঁহারা যাহাকে অকার্য্য বলিয়া থাকেন, আমিও তাহাকে অকার্য্য বলিয়া থাকি। তবে মুখে অকার্য্য বলিলেও তাহা করনে যে আমি নিবৃত্ত থাকি তাহা নহে, বরং তাহা প্রায়ই করিয়া থাকি এবং তাহার জন্য তাড়নাও খাইয়া থাকি। এই তাড়না খাওয়াটাও একপ্রকার অভ্যাস হইয়া আসিতেছে। এই অকার্য্যকরণের প্রভৃতিও বড় ও ছোট খোকাদের আচরণ দেখিয়াই আমার অভ্যাস হইয়া আসিতেছে। কারণ মুখে সকলেই বলিয়া থাকে "এটা অকার্য্য", কিন্তু কার্য্যকালে লোভের বশীভূত হইয়া সকলেই সেই কার্য্য করিয়া থাকে; কেনই বা করি অথবা কেই বা অকার্য্য করায়, তাহার কোন খবরই আমার জানা নাই। আমার ত' জানা না থাকিবারই কথা, কারণ আমি খোকা; যাঁহারা খোকার বাবা, তাঁহারাও জানেন কিনা সন্দেহ; কারণ জানিলে করিবেন কেন? সুতরাং না জানাই সম্ভব।

আজ আমাদের বাড়ীতে খুব ধুমধাম, অনেক ছোট বড় খোকা-খুকী আসিয়াছে, ঢাকঢোলের বাদ্যাদির ধুমধাম ত' আছেই, তাহার উপর এখন আহারের ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। কারণ আহারের কাল উপস্থিত হওয়ায়, আহারাদি করিতে এখন প্রায় সকলেই ব্যস্ত। অনেকে অপর কার্য্যে অপারগ হইলেও, আহার কার্য্যে প্রায় কেহই অপারগ নহেন। ছোট বড় সকল খোকাই আহার করিবার স্থানে বসিয়া, আহারীয় দ্রব্য পাইয়া আনন্দে হৈ হৈ শব্দে আহার করিতে লাগিল। আমার পিতা নিজে উপস্থিত থাকিয়া, যাহার যাহা দরকার তাহা দেওয়াইতে ছিলেন। আমি নিতান্ত ছোট খোকা, যাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমার ওজন খুব কম থাকায়, এবং আমার পিতা খাইতে না বসায়, আমিও না খাইয়া, দাঁড়াইয়া বড় বড় খোকাদের খাবার তামাসা দেখিতে লাগিলাম। সকলেই খোকা, সুতরাং পরিমিত আহার কাহারও নাই, যেটা খাইতে একটু ভাল লাগিতেছে সেইটাই আকণ্ঠ ভরিয়া খাইতেছে, শেষে প্রাণে বাঁচিব কি মরিব তাহার জ্ঞান নাই। খোকাভাবে সে জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে; সুতরাং ছোট ছোট খোকারাই বা কি অথবা খোকার বাবার মত খোকারাই বা কি, সকলেই রসনার তৃপ্তিকেই একমাত্র তৃপ্তি বোধে, উদর থাকুক বা ফাটিয়া যাউক তাহাতে লক্ষ্য না রাখিয়া, রসনার তৃপ্তিসাধনে সকলেই ব্যস্ত। রসনার তৃপ্তি যে কতকাল স্থায়ী হইবে, তাহা খোকাভাবে বোধগম্য হওয়াও অসম্ভব। আমি খোকা, আমার রসনার তৃপ্তিই আমি যথেষ্ট মনে করিয়া থাকি; বস্তুতঃ

রসনার তৃপ্তিতে যে আমার প্রকৃত তৃপ্তি হয় না, তাহা আমার জানা নাই। ভোজনের পর আবার যখন ভোজনের ইচ্ছা আসিতেছে, তখন আমার তৃপ্তি কোথায়? রসনা হইতে গলাধঃকরণ হসতে না হইতেই যখন ভোজন ইচ্ছা আসিতেছে, তখন রসনার তৃপ্তিকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা উচিত। দুঃখের বিষয় আমি খোকা, লোভের বশীভূত হওয়ায় রসনার তৃপ্তি আর আমার হইতেছে না। যতই রকম খাইতেছি, রসনা তৃপ্তির লালসা ততই বাড়িয়া যাইতেছে। বুড়ো খোকা হইয়া গেলাম, তত্রাচ এটা খাইব, সেটা খাইব, এ বায়না আর ঘুচিল না। শেষে পরকালটা বাকী আছে, সেটাও এক রকম খাওয়ার সামিলে পড়িয়াছে, তত্রাচ রসনা তৃপ্তির লালসা আর মিটিল না। প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থা হইতেই এই লালসা উৎপন্ন হওয়ায় প্রাণকর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার মোহিনীমায়ার ফেরে পড়িয়া এ রহস্য বুঝিবারও উপায় নাই, সুতরাং রসনাতৃপ্তির লালসার নিবৃত্তি নাই। তৃপ্তি শব্দের অর্থবোধ থাকিয়াও নাই। কারণ আমার অর্থবোধ যাহা আছে, তাহা সাধারণ মোটামুটি অর্থ অর্থাৎ পেট ভরিলেই তৃপ্তি হয় ইহাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ সাধারণ অর্থবোধ আমার ভ্রম। কারণ আহারের দ্বারা পেট ভরিলেও, পুনরায় অপর রকম মনোহর খাদ্যদ্রব্য দেখিলে খাইবার ইচ্ছা হয়। তবে হয়ত পেটটা ভরিয়া থাকার কারণ বেশী খাইতে পারি না বা লোভের বশীভূত হইয়া খাইয়া শেষে বমন করিয়া ফেলি, বা অন্য প্রকারে কষ্ট পাই; এমন অবস্থায় আর আমার তৃপ্তি কোথায়? বস্তুতঃ পূর্ণকাম না হইলে কাহারও প্রকৃত তৃপ্তি হয় না। আমার কামনাও পূর্ণ হইতেছে না, তৃপ্তিও কিছুতে হইতেছে না। কামনা দ্বারা কখনও কামনাপূর্ণ হয় না, কামনা থাকিতে তৃপ্তিও নাই। অকামভাব থাকিলে বা অকামভাব আসিলে আমার তৃপ্তি আসিতে পারে। কিন্তু বর্তমান কর্ম্মের মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া "অকাম" শব্দমাত্র আমার শুনা হইয়াছে; অকামভাব যে হইতে পারে, তাহা আমার শুনা থাকিলেও এ পর্য্যন্ত ধারণা হয় নাই; বরং বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থার মোহিনীমায়ায় পড়িয়া, অকামভাব হইতে পারে না বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে। প্রকৃত তৃপ্তির বোধ আমার নাই, তবে যে আহারাদি বা কোনও কাম্যবস্তু প্রাপ্তে ক্ষণিক তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকি, তাহা তৃপ্তির ছায়ামাত্র, প্রকৃত তৃপ্তি কোনও বিষয়েই আমার আদৌ নাই।

যাহা হউক বড় বড় ও ছোট ছোট খোকাদের আহারাদি দাঁড়াইয়া দেখিতেছি; ক্রমশঃ তাঁহারা সব উঠিয়া পড়িলেন; আমিও আস্তে আস্তে হেলিতে দুলিতে বাড়ীতে মা'র কাছে যাইলাম; বাড়ীতে মা'র কাছে যাইবামাত্র মা আমাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন; উপরে একটা ঘরের মধ্যে মা আমাকে লইয়া গিয়া বসিলেন, সেখানে দেখি আমার পিতার আহারের স্থান হইয়াছে। ক্ষণিক পরেই আমার পিতা আহার করিতে আসিলেন। পিতা আহার করিতে বসিলে পর, মা একখানি পাখা হস্তে লইয়া পিতার আহারীয় দ্রব্যে কোনও মক্ষিকাদি বসিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে ব্যজন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য পিতার পার্শ্বেই একখানি ছোট আসনে আমার জন্য স্বতন্ত্র আহারের স্থান হইয়াছিল।

আমি সেই আসনে বসিয়া অল্প সল্প কতক খাইলাম, কতক থালার নীচে ফেলিলাম, কতক বা ছড়াইয়া পড়িল। আমার পিতাও নিজ আহারীয় দ্রব্য হইতে দুই একটি দ্রব্য যাহা তাহার খাইতে ভাল লাগিল, তাহা আমাকেও দিতে লাগিলেন, আমিও তাহা বেশ আনন্দের সহিত পিতার সঙ্গে বসিয়া খাইতে লাগিলাম। আমার জননী বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছেন এবং পিতার সহিত কথাও কহিতেছেন এবং আমাকে "বাবা" সম্বোধন করিয়া, "বাবা খোকা এটা খাও, ওটা খাও" প্রভৃতি দুই একটা কথা বলিতেছেন। পিতার আহার হইয়া গেলে, তিনি আঁচাইতে গেলেন, আমিও তাহার পর উঠিয়া পড়িলাম এবং মা আমাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া আঁচাইয়া দিলেন। পিতা বাহিরে চলিয়া গেলেন; তাহার পর আমি মা'র সহিত নীচে আসিয়া বাড়ীর ভিতর ছোট বড় খুকীরা সব খাইতে বসিয়াছেন দেখিলাম; মা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। বাড়ীতে সকলেই আমাকে খোকা বলায়,আমার ধারণা আমি খোকা এবং আমার মত চিহ্ন বিশিষ্ট যাহারা, তাহারাও সব খোকা পদবাচ্য। বাড়ীতে ছোট ছোট মেয়েরা যাহারা আছে, সকলেই তাহাদিগকে খুকী বলিয়া ডাকায়, আমি ছোট আর বড়ই হউক তাহাদের সকলকেই খুকী বলিয়াই জানি এবং এই কারণেই খুকী বলিয়া তাহাদিগকে উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ বড়ই কি আর ছোটই কি সকলেরই খুকীর মত ভাব; সুতরাং আমার কাছে আমার জননী ব্যতীত সবই খুকী। তবে সকলেই মাতৃরূপা, তাহাতে আর সন্দেহমাত্রও নাই। আমি খোকা সুতরাং আমার জননীও পিতা ব্যতীত অপর সকলেই আমার নিকট খোকা বা খুকী উপাধি বিশিষ্ট এবং আমি তাহাই মনে করিয়া থাকি। আমার জননীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। আহার বিষয়ে খোকাদের অপেক্ষায় খুকীরা কম নহে, বরং দ্বিগুণ। এখানে আমার ন্যায় ছোট ছোট খোকাও বড় বড় খুকীদের সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে, তবে এখানে বড় বড় খোকারা কেহই নাই, খুকীরাই সব খাইতেছেন। রসনা তৃপ্তির লালসা বা ইচ্ছা খোকাদের অপেক্ষা খুকীদের অনেক বেশী, তবে সে লালসা মৎস্য ভোজনের দিকেই বেশীরভাগ চালিত হইয়া থাকে, খুকীদের এক একজনের পাতের নীচে মাছের কাঁটা প্রায় পোয়াটাক্ করিয়া জমা হয়। খাইতে খাইতে পরস্পরে কত কি হাসি তামাসা করিতেছে, আমি খোকা সে সব বুঝি না, কেবল দেখিয়াই যাইতেছি। খুকীদের বাক্যের স্রোত যেমন চলিতেছে, আহারের স্রোতও সেই রকম চলিতেছে। ক্রমশঃ আহারাদি শেষ হইলে সব খুকীরা আঁচাইতে উঠিয়া গেল, আমিও আমার জননীর সহিত চলিতে লাগিলাম। একটু ধীরভাবে চলিতে দেখিয়া, মা আমাকে কোলে করিয়া, উপরে যে ঘরে পিতা ও আমি খাইয়াছিলাম, সেই ঘরে চলিলেন ও তথায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া, আমাকে কোলে লইয়াই পিতার ভোজনপাত্রে আহার করিতে বসিলেন। আমি তখন মা'র কোল হইতে নামিয়া তাঁহার নিকটেই বসিয়া রহিলাম। মা আহার করিতে করিতে আমাকে যৎ সামান্য যাহা কিছু দিতে লাগিলেন, আমিও তাহা খাইতে লাগিলাম। আহারাদি শেষ হইলে ঘরের বাহিরে

আসিয়া, মা নিজে আঁচাইলেন এবং আমার হাতমুখ ধোয়াইয়া দিলেন। তৎপরে জননী বসিয়া পান খাইতেছেন, এমন সময়ে বড় বড় খুকীরদল তথায় আসিয়া, জননীর চুল বাঁধিয়া দিতে লাগিল এবং তাহারাও পরস্পরে মাথার চুল বাঁধিতে লাগিল। সকলের মাথার চুল বাঁধা হইয়াছে দেখিয়া, মা বলিলেন, "আর বেশী বেলা নাই, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, এই বেলা সকলে গা হাত ধুইয়া শীঘ্র শীঘ্র আইস; আজ ষষ্ঠী, আজ নূতন কাপড় পরা মঙ্গলজনক, বিশেষতঃ আজ বৎসরের মধ্যে প্রধান দিন, আজ মলিন বা পুরাতন বস্ত্র পরিতে নাই।" ইহা বলায়, সকলেই উঠিয়া গাত্র ধৌতাদি করিতে গেলেন এবং সকলে গাত্র ধৌতাদি কার্য্য শেষ করিয়া আসিলে পর, জননী সকলকে নববস্ত্র বাহির করিয়া পরিধান করিতে দিলেন। কয়েকজন নাপিতানী উপস্থিত ছিল, মা তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, সকলকে ভাল করিয়া আলতা পরাইয়া দাও। তাহার পর বাটীস্থ দাসীগণকে ডাকাইয়া, সকলকে (যাহার যেমন প্রাপ্য তদনুরূপ) কাপড় দিয়া বলিয়া দিলেন, "পুরাতন কাপড় ছাড়িয়া সকলই আজ নূতন কাপড় পরিধান কর। আজ কেহ যেন আমার বাড়ীতে পুরাতন কাপড় না পরিয়া থাকে।" কাপড় পাইয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল।

তাহার পর যেখানে খুকীরা সকলে আল্‌তা পরিতেছে, মা আমাকে লইয়া সেইখানে আল্‌তা পরান দেখিতে চলিলেন। তথায় গিয়া দেখি যে, একটি আনন্দের স্রোত চলিতেছে। সকলেই হাস্যবদনে আল্‌তা পরিতেছে ও কত কি আমোদের কথা কহিতেছে এবং পরস্পরে কত কি ঠাট্টা তামাসাও করিতেছে। আমি ছোট খোকা, আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের কথাবার্তার কোন বাধা হইল না; আমিও সে সব বুঝি না। বড় বড় ও ছোট ছোট খুকীদের আলতা পরা দেখিয়া, আমারও আল্‌তা পরার ইচ্ছা বলবৎ হওয়ায়, আমি জননীকে বলিলাম, "মা আমিও আল্‌টা পব্বো"। জননী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা খোকা! তুমি বেটা ছেলে, আলতা পরিলে তোমাকে ভাল দেখাবে না, আমি উপরে যাইয়া তোমাকে ভাল ভাল পোষাক (যাহা তোমার জন্য আসিয়াছে) পরাইয়া দিব। আমি তখন আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় একজন নাপিতানী আসিয়া, মাকে কহিল "খোকা আজিকার দিনে আল্‌তা পরিতে চাহিতেছে, মা! হুকুম দিন, আমি আল্‌তা পরাইয়া দিই।" মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে পায়ে আলতা পরাইয়া দাও।" সে তখন আমার পায়ে আল্‌তা পরাইয়া দিতে লাগিল। আমিও সকলের মত পা বাড়াইয়া দিয়া আল্‌তা পরিতে লাগিলাম। আমার পায়ে বেশ করিয়া আলতা পরান হইলে, পা দুখানি বেশ টুকটুকে লালরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠায়, আমার খুব আনন্দ বোধ হইতে লাগিল এবং পায়ের দিকেই ঘন ঘন নজর যাইতে লাগিল। পাছে ধূলি লাগিয়া পায়ের রঙ্গ কালো হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ডিঙ্গি মারিয়া অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি উচু করিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহার পর মা আমাকে উপরে লইয়া গিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে আমার পিতা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে পোষাক পরান হইতেছে দেখিয়া, পিতা চিবুক ধরিয়া

আমাকে আদর করিলেন। আমার পোযাক পরা শেষ হইলে, মা পিতাকে কহিলেন, “আপনি একবার খোকাকে বাহিরে লইয়া গিয়া, পূজার দালানে প্রতিমাকে প্রণাম করাইয়া, খোকাকে সব দেখান, আমি এখন পূজার ঘরে যাইব, কারণ বোধন ও অধিবাসের উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক হইল কিনা তাহা দেখিব, বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল; সুতরাং খোকাকে আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান।” তাহার পর মা আমাকে বলিলেন, “বাবা খোকা, তুমি বাবুর সঙ্গে বাহিরে গিয়া পূজার দালানে ঠাকুর সাজান হইয়াছে দেখগে।” আমি বলিলাম, “মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।” মা বলিলেন, “না, এখন তুমি বাহিরে গিয়া ঠাকুর দেখিয়া আইস, তাহার পর বোধনের কার্য্য আরম্ভ হইলে, আমার কাছে বসিয়া বোধনের পূজা দেখিও।” সুতরাং আমি মা’র কথার উপর আর কোনও কথা না বলিয়া পিতার সহিত ঠাকুর দেখিতে বাহিরে চলিলাম।

পিতার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখি যে, অনেক ছোটবড় খোকা খুকী নানা রকমের পরিচ্ছদ পরিয়া, আমাদের বাড়ীতে প্রতিমা দেখিতে আসিয়াছে। সকলেই আপন আপন পরিচ্ছদের প্রশংসা করিতেছে ও হাস্যবদনে প্রতিমা দেখিতেছে এবং আপন আপন ভাব অনুযায়ী নানা রকম কথাবার্তা কহিতেছে। পূজার দালানে একটা বড় চৌকিতে যেখানে দুর্গা প্রতিমাকে রাখা হইয়াছে, বাবা আমাকে তথায় লইয়া গেলেন। আমি প্রতিমা দেখিতে লাগিলাম। প্রতিমা দেখিতে সুন্দর বোধ হওয়ায়, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবা, মাঝখানে ঐ দশ হাত শুদ্ধ ও কে বাবা?” বাবা বলিলেন, “উনিই মা দুর্গা দশভূজা” এবং তৎপরে সমস্ত পুত্তলিগুলির পরিচয় দিতে লাগিলেন। বাবার মুখে “মা দুর্গা” এই নাম শুনিয়া আমি “মা দুর্গা, মা দুর্গা” বলিয়া অনেক ডাকিতে লাগিলাম। অনেকবার ডাকিয়া কোনও উত্তর না পাওয়ায় বাবাকে কহিলাম, “বাবা, মা দুর্গাকে এত ডাকিলাম, কই মা দুর্গা ত’ কোনও সাড়া দিলেন না এবং কোন কথাও কহিলেন না।” বাবা বলিলেন, “এখন ওরূপভাবে ডাকিলে, সাড়া পাওয়া যাইবে না, পূজা করিয়া উঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিলে, উনি সন্তুষ্ট হইয়া কথার উত্তর দিয়া থাকেন, এখনও উঁহার পূজা হয় নাই, সুতরাং এখন উনি কোনও উত্তর দিবেন না।” বাবা যাহা বলিলেন আমি তাহাই শুনিয়া মানিয়া লইলাম। বিশেষতঃ আমি খোকা, মানিয়া লওয়া ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নাই, সুতরাং বাবার কথা শুনিয়া মানিয়া লইলাম তাহার পর বাবা আর একজন বড় খোকার কাছে আমাকে দিয়া নিজের কার্য্যে চলিয়া গেলেন। যাঁহার কাছে আমাকে দিয়া গেলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সব দেখিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, “খোকা চল উঠানে যাই, ওখানে চণ্ডীর গান হইতেছে, শুনিগে চল।” এই বলিয়াই আমাকে সঙ্গে করিয়া উঠানে আসিল। এখানে সব বড় বড় খোকারা বসিয়া তামাক খাইতেছে ও গান শুনিতেছে। একজন লোক লালপেড়ে কাপড় পরিয়া লাল রঙ্গের চাদর কোমরে বাঁধিয়া একটা কাল চামর হাতে করিয়া, নাচিতে নাচিতে কত রকম ভাবে গান করিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও আট দশজন লোক লাল কাপড় পরিয়া, মধ্যে মধ্যে গান করিতেছে ইহাদের হস্তে চামর নাই। আমি সেইখানে যাইলে, যে লোকটার হাতে চামর ছিল সে

আমার নিকট আসিয়া আমার মাথার উপর চামরটা দিল। আমাকে আশীর্বাদ করিবার উদ্দেশ্যেই চামরটা আমার মাথার উপর ধরিল। আমি খোকা, তাহা জানিনা, মাথার উপর দিবামাত্র আমি ভয় পাইয়া, উহা হাত দিয়া সরাইয়া দিলাম। সকলে বলিয়া উঠিল, "খোকা ভয় নাই, ও ভাল।" ভাল যে কি, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার লম্ফ-ঝম্প দেখিয়া ও গান শুনিয়া বড় বড় সব খোকারা আনন্দে হাস্য করিতেছে। আমি ছোট খোকা, তাহাদের অপেক্ষা ওজনে অনেক কম, আমার চক্ষে সং নাচা দেখিতে ভালই লাগে, গান টান বুঝি না। যখন মূল গায়েন খুব লাফাইয়া লাফাইয়া সং-এর মত নাচিতে থাকে, তখন স্বতঃই হাসি পায়। কেন হাসি বা কে হাসায়, তাহার কোন খবরই রাখি না। এ খবর যে আমিই রাখি না তাহা নহে, আমা অপেক্ষা বড় বড় খোকারাও রাখেন না। তবে আমি ছোট খোকা, আমার ওজন কম, বলও কম; বড় বড় খোকাদের আমা অপেক্ষা ওজনও অনেক বেশী বলও বেশী। এই কারণে তাঁহারা ছোট খোকা বলিয়া, সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের সহিত আমার তারতম্য কেবল ওজনের ও বলের, নতুবা খোকাভাব কাহার বেশী, কাহার কম সে কথা বলা শক্ত বরং আমার ওজন কম থাকায়, ইন্দ্রিয় জনিত অনেক ভাব আমার এখনও প্রকাশ পায় নাই। বড় বড় খোকাদের আমা অপেক্ষায় ওজন বেশী থাকায়, যাঁহার যেমন ওজন বেশী খোকাভাবের ইন্দ্রিয় বিষয়ের ভাব তাঁর তেমন বেশী; তবে তাঁহাদের আপন খোকাভাবের উপর লক্ষ্য না থাকায়, নিজেদের গায়ের জোর বেশী বলিয়া আমাকেই সকলে খোকা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সকলেই খোকা, তবে আমি এক্ষণে ওজনে কম এবং দুর্ব্বল, এই কারণে আমিই লোকসমাজে খোকা বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। যাঁহাদের খোকার বাবার বয়স হইয়াছে তাঁহারা আপন আপন প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থারূপ মহামায়ার মোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া, নিজেদের খোকাভাব লক্ষ্য না করিয়া, আমাকেই যে খোকা বলিয়া সম্বোধন করেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

যাহা হউক সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া, যাঁহার কোলে বসিয়া আমি চণ্ডীর গান শুনিতেছিলাম, তাঁহাকে "আমি মায়ের কাছে যাইব" বলিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম এবং নিজেও ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বলা বাহুল্য, সন্ধ্যা হইলে আমি মা'র নিকট ব্যতীত অপর কাহারও নিকট থাকিতে চাহি না, কারণ বাল স্বভাব প্রযুক্ত আমার জুজুর ভয় এখনও যায় নাই। আমি ব্যস্ত হইলে এবং মা'র নিকট যাইব বলিয়া বায়না করিলে, আমাদের বাড়ীর একজন লোক বাড়ীর মধ্যে যেখানে বোধনের কার্য্য আরম্ভ জন্য উদ্যোগ হইতেছিল, তথায় মা'র নিকট আমাকে দিয়া আসিল। মা'কে দেখিয়াই আমি দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে যাইলাম। মা আমাকে কোলে লইয়া সকল কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, আমিও মা'র কোলে বসিয়া সমস্ত কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটি স্ত্রীলোক আমার মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধনের কার্য্য কখন হবে?" মা বলিলেন, "এখনি বোধনের কার্য্য আরম্ভ হইবে, পরে অধিবাস হইবে, আজ মা, আমার সাবকাশ

মোটেই নাই। প্রাতঃকাল হইতে ষষ্ঠ্যাদি কল্পের সমস্ত কার্য্য হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে বোধনের কার্য্য হইয়া গেলে কতকটা সাবকাশ পাইব, সবই এক একবার না দেখিলে চলে না, কি করি সবই দেখিতে হয়, তার উপর এই খোকা আছে, এও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না।" এমন সময় প্রাতঃকালে যে তিনজন ব্রাহ্মণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া, আমাকে কোলে লইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা নিকটস্থ হইলে, মা আমাকে কোল হইতে নামাইয়া পুরোহিতগণকে প্রণাম করিলেন এবং আমার মাথাটা ভূমে নোয়াইয়া ধরিয়া, আমাকে বলিলেন "প্রণাম কর।" আমি প্রণাম করিয়াই মাকে জড়াইয়া ধরিলাম, মা'ও আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় আমার পিতা আসিয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধনের আয়োজন ত' সব ঠিক হইয়াছে?" মা বলিলেন, হাঁ, সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয়েরাও এইমাত্র আসিলেন, এইবার কার্য্য আরম্ভ হইবে।" পুরোহিত মহাশয়েরাও আমার পিতাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমরা এইবার কার্য্য আরম্ভ করিব। গিন্নিমা উদ্যোগ আয়োজন সবই ঠিক রাখিয়াছেন, গিন্নিমার সবই জানা আছে, কোনও বিষয়েরই ত্রুটি নাই, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই, উনি সাক্ষাৎ ভগবতী।" এইরূপ বাক্য দ্বারা তাঁহারা আমার মা'র অনেক প্রশংসা করিলেন, উদ্দেশ্য, আদায়টা যাহাতে কিছু বেশী হয়। স্বার্থ থাকিলে যাহা হয়, এখানেও ঠিক তদ্রূপভাবে তাঁহারা আমার মা'কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মা সমস্ত বুঝেন, তিনি চাটুকার বাক্যে নিজে উল্লসিত না হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আমি কি জানি, আমি স্ত্রীলোক, আপনারা যেমন যেমন করিতে বলেন, আমি তাহা নিজে বা লোক দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকি মাত্র; দুইখানা নৈবেদ্য করিতে জানিলে যে, সব জানা হইল, তাহা আমি মনে করি না।"

তাহার পর পুরোহিত মহাশয়েরা হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমার পিতাকে কহিলেন, "যদি আপনার কোনও কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে এই স্থানে বসিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন।" ইহাঁদের মনোগত ভাব, আমার পিতা তথা হইতে চলিয়া গেলেই ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে তৎপর কার্যটি শেষ হইতে পারে, কিন্তু আমার পিতা উপস্থিত থাকিলে কার্য্য শেষ হইতে একটু বিলম্ব হওয়া সম্ভব। কার্য্য শেষ অর্থাৎ পুঁথিখানা প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষপৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আবৃত্তি করা মাত্র, নচেৎ বেদবিহিত ক্রিয়া কিছুই হয় না। পিতা পুরোহিত মহাশয়দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমার কার্য্য অবশ্য বিস্তর আছে, আপনারা আমাকে থাকিতে বলিলে আমি থাকিতে প্রস্তুত, তবে আপনারা যেমন অনুমতি করিবেন আমি তাহাতেই সম্মত আছি, বিশেষ আপনারা আমার পুরোহিত, আমার মঙ্গল যাহা তাহাই আপনারা করিবেন, আপনাদের উপর আমার সমস্ত ভার পূর্বাপর হইতেই রহিয়াছে, এক্ষণে আর আমি নূতন কি কহিব।" এই কথার পর তিনজনের মধ্যে যিনি আমাদের

কুলপুরোহিত, তিনি বলিলেন, "না না, আপনি যান, আমি যখন এখানে রহিয়াছি, তখন আপনার কিছুই দেখিবার আবশ্যক নাই; আমি সমস্ত দেখিয়া যথা ধর্ম ও যথা শাস্ত্র সমস্ত কার্য্য করিব, আপনি নিশ্চিন্তমনে অপর কার্য্য সমূহের পর্য্যবেক্ষণ করুন গে। আমি এখানে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য সুচারুরূপে করাইয়া লইতেছি; আপনি বাহিরে যান।" বাবা পুরোহিত মহাশয়ের কথার উপর নির্ভর করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, মা আমাকে কোলে করিয়া তথায় বসিয়া পূজার কার্য্য সব দেখিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য মা'র কোলে ক্ষণিক থাকিতে থাকিতে বাল স্বভাবপ্রযুক্ত আমার তন্দ্রাভাব আসায় এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল, যে অবস্থায় আমার নিদ্রাও সম্যক্ আইসে নাই অথবা আমি ঠিক জাগ্রতও নহি, এবং এইরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আমার হৃদয়মধ্যে অজ্ঞাতসারে বর্তমান কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ হইতে লাগিল, যাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই সব বলিতেছি।

আমার বোধ হইল আমি যেন দেখিতেছি যে, পুরোহিত মহাশয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোনও অভাব নাই অভাব কেবল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগের। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত যে পূজা হইবার নহে, তাহা পুরোহিত মহাশয়ের জানা নাই; কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে আসর মাতাইতে লাগিলেন। চারিটি তীরকাটি পুঁতিয়া তন্মধ্যে একটি বিল্ববৃক্ষ রাখিয়া. ঐ তীর চারিটি সুতার দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাহার পর সংকল্প করিয়া, বাহ্যিক ভূতাদির পূজা সমাপনান্তে পাদ্যাদির দ্বারা বিল্ববৃক্ষের যথাসম্ভব বাহ্যিক পূজাদি এবং স্তব পাঠাদি করিয়া, একঘণ্টা হইতে দুইঘণ্টার মধ্যে বাহ্যিক বোধন কার্য্য সমাপন হইয়া গেল। পুরোহিত মহাশয় পূজা আরম্ভ করিয়া, সংকল্পের পর ভূতাদির পূজা করিলেন। আমি জুজুবোধে যে ভূতকে ভয় করিয়া থাকি, পুরোহিত মহাশয় ভূত অর্থে সেই জুজুভূতকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলি প্রদান করিলেন। পঞ্চভূত ব্যতীত ষষ্ঠ ভূত যে আর কেহ নাই, আমার ন্যায় পুরোহিত মহাশয়েরও তাহা জানা নাই। বাহ্যিক ভাবে তাহা জানাও অসম্ভব। বাহ্যিক ভাবের পূজাদি সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, এখানে তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে মাত্র; ইহা আমার ন্যায় খোকার পক্ষে মন্দ নহে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃত পূজা

বোধন শব্দের অর্থ জাগান অর্থাৎ দেবীকে জাগ্রত করা; বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্য অবস্থাই দেবীর যোগ নিদ্রাবস্থা; এই যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম সম্বর্দ্ধন রূপ পূজাই বোধন ক্রিয়া; ইহা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত, ইহা দুই চারিদিনে হয় না। জীবরূপী

রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য যাহাদের বাহ্যিক অনুকরণে এই দুর্গোৎসব রূপ পূজা চলিয়া আসিতেছে, সেই সুরথও এই দেবীর পূজা ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হইয়া আত্মচৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চভূতের বশীভূত করণ বা পঞ্চভূত হইতে বিঘ্ন না হয়, এই মানসে পঞ্চভূতের শুদ্ধিকরণ জন্য ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত আসন শুদ্ধি প্রথমতঃ আবশ্যক। একাসনে যতক্ষণ ইচ্ছা বসিতে সক্ষম হইবার অভ্যাস অর্থাৎ যাহাতে সুখে ও স্থিরভাবে বেশী সময় পর্য্যন্ত বসিতে পারা যায়, তাহার অভ্যাসের জন্য স্থিরভাবে বসার নামই আসনশুদ্ধি। তাহার পর ভূতশুদ্ধি, ইহাও ক্রিয়াযোগ দ্বারা পঞ্চভূতের ষট্‌চক্রভেদের দ্বারা গুরূপদেশে ভূত শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া; ইহা নিত্য বিধিপূর্ব্বক চারি প্রহর কাল করিয়া অভ্যাস করিলে, ভাগ্যবান্ সাধকের তিনবৎসরে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। জীবরূপ রাজা সুরথও তাহাই করিয়াছিলেন। আমি আহার করিলে যেমন অপরের পেট ভরে না বা অপরে আহার করিলে যেমন আমার পেট ভরে না, তদ্রূপ আমার হইয়া আমার কর্তব্য পূজা অপরে করিলে আমার শান্তিলাভ হইতে পারে না। আত্মোন্নতি লাভের জন্য ইহাই জীবমাত্রেই একমাত্র কর্তব্য কর্ম। বাহ্যিক দুর্গোৎসব যাহা চলিতেছে তাহা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন আমার ন্যায় খোকার পক্ষে অকরণীয় নহে এইমাত্র। স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের অকরণীয় নহে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্বল্পবুদ্ধি মানবগণকে বাহ্যিক কার্য্যদ্বারা শ্রদ্ধা ও ভক্তির বৃদ্ধি করণ অভিপ্রায়ে; বাহ্যিক পূজার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে; তবে উপযুক্ত আচার্য্য অভাবে ইহা যে বাহ্যিক পূজা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। উপযুক্ত আচার্য্য ব্যতীত ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবারও নহে। যাহা হউক ক্রমশঃ বোধনকার্য্যের অবসান হইল। যাঁহার বোধনরূপ জাগ্রতাবস্থা করিতে হইবে, তাহার কিছুই হইল না, কেবল বেলগাছ লইয়া টানাটানি অর্থাৎ বিল্বমুলেই ফুলচন্দন ছড়ান হইল এবং বোধনক্রিয়ার মন্ত্রগুলি পূজাপদ্ধতিতে যেমন লিখিত আছে তাহা আবৃত্তি করিয়াই পূজা শেষ হইল। ইহাতে দেবীর বোধনরূপ জাগ্রতবস্থা হইতেই পারে না। দেবী যে কে তাহাই জানা নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা বোধনকার্য্য করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারাও আপন আপন প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ মহামায়ার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আসুরিক ভাবের বশবর্তী হইয়া, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিয়া, আসুরিক ভাবেরই সমর্থন করিতেছেন। আসুরিকভাব সমূহকে জয় করাই দুর্গোৎসব ক্রিয়ার উদ্দেশ্য; এক্ষণে তাহার বিপরীত কার্য্যই হইয়া চলিতেছে; এ কারণ কি যজমানের কি পুরোহিতের কাহারও শান্তি নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

রামচন্দ্র রাক্ষসবধের জন্য দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। তবে সে রাক্ষস কাহারা তাহা আমার জানা নাই, তবে একেবারে যে জানা নাই তাহা মনে করি না। কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমি শুনা কথাকে অনেক সময় জানা কথা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। রাবণ কথাটাও আমার শুনা কথা, তবে তাহাকে জানা কথা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমি রাবণকে জানি না। আমার শুনা আছে রাবণ নামে এক রাক্ষস ছিল, তাহার দশটা মাথা কুড়িটা হাত, রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করিয়া সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়। দুঃখের বিষয়, রাবণ নিধন প্রাপ্ত হইলেও তাহার পর অদ্যাবধি কেহত একটাও রাক্ষস দেখিতে পাইল না; এমন কি একটা আধটাও কোথাও দেখা যায় না এবং তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই। শুনিয়াছি, লঙ্কা রাক্ষসে পূর্ণ ছিল, সেই দেশ এখনও রহিয়াছে অথচ তথায় একটাও রাক্ষস নাই; রাবণের বংশের সব মরিলে ও আর আর রাক্ষস বংশের সবই যে রামচন্দ্র মারিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাত সম্ভবপর নহে। মূলে কিছু সত্য থাকিলে, রাক্ষসের চিহ্নও যে অন্ততঃ কিছু না কিছু থাকিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। যেমন অসুরগণেরও কোনও চিহ্ন নাই, তদ্রূপ রাক্ষসগণেরও চিহ্ন নাই; আছে কেবল গল্পচ্ছলে কথামাত্র। বস্তুতঃ রাক্ষস বা অসুরগণ উভয় ভাবই তুল্য; ইহারা সব বায়ুরূপী। আসুরিক ভাবরূপে জীবশরীরে বর্তমান থাকিয়া জীবদেহে আপন আপন আসুরিক ভাব বা রাক্ষসভাবে কার্য্য করিয়া থাকে এবং বর্তমান দেহের অধিপতি হইয়া, সুখেচ্ছায় কার্য্য করিয়া, আত্মভাবকে নষ্ট করিতে সদাই যত্নশীল থাকে এবং ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য দেহরূপ লঙ্কাতে অবস্থিত করিয়া থাকে।

লঙ্কা শব্দের উৎপত্তি, লক্—সুখ পাওয়া হইতে, পুরী—দেহ। এই দেহরূপ পুরীতেই মহামোহরূপ দশস্কন্ধ রাবণ বাস করিতেছে। দশস্কন্ধ—দশ ইন্দ্রিয়ই মহামোহের দশটি মস্তক স্বরূপ অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় মস্তকরূপে মহামোহের সহিত যোগ হওয়ায়, মহামোহরূপ রাবণের দশ মস্তক বলিয়া, কথিত হইয়া থাকে। উক্ত মহামোহরূপ রাবণ ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিরূপ পুত্রগণ সহ এবং আত্মম্ভরিতা ও খলতারূপ মন্দভাবে, যাঁহারা উদর স্ফীত হইয়াছে এমন মন্দোদরী নামক জায়ার সহিত বর্তমান জীবদেহে বসবাস করিতেছে। বর্তমান জীবদেহ রাক্ষসপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ জীবের প্রবৃত্তি ও রাক্ষসভাবের প্রবৃত্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে জীবভাবই রাক্ষস ভাব; অপর রাক্ষস আকাশ কুসুম বা কবির কল্পনামাত্র। স্থিরপ্রাণরূপ আত্মারাম আত্মবিস্মৃতিভাবে জীবদেহেই রহিয়াছেন। রাম শব্দের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে,

এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। সংক্ষেপতঃ যিনি রমার সহিত রমণ করেন। তিনিই রামশব্দবাচ্য। অর্থাৎ চঞ্চলা প্রাণশক্তিই রমারূপা প্রকৃতি, আর স্থিরপ্রাণরূপ ঈশ্বরই পুরুষ বা আত্মারাম। ইনিই আত্মবিস্মৃতিভাবে সকল জীবদেহে সমানভাবে রহিয়াছেন। জীবরূপী সুন্দর শরীরবিশিষ্ট সুরথও যেমন প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দশভূজা দুর্গার পূজার দ্বারা প্রাণশক্তিরূপা দেবী কর্তৃক অসুরকুলের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও তদ্রূপভাবে সাধন সমর দ্বারা নিজ দেহস্থিত রাক্ষসভাব সমূহকে দমিত করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গুরুরূপী জনকের নিকট হইতে ধনুর্ভঙ্গের দ্বারা বিদ্যারূপিণী (জ্ঞানরূপিণী) সীতা নাম্নী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। ধনুর্ভঙ্গ ইহা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত; ওঁকাররূপ শরীর ধনুঃস্বরূপ (প্রণবো ধনুঃ ইত্যাদি উপনিষদ্)। এই শরীররূপ ধনুকের ত্রিভঙ্গ অবস্থা করা; অর্থাৎ মূলাধার, অনাহত (হৃদয়) এবং বিশুদ্ধ (কণ্ঠ) অর্থাৎ জিহ্বামূল এই তিনস্থান ক্রিয়াযোগের দ্বারা ভেদ হইলে ত্রিভঙ্গভাব হইয়া থাকে, ইহা নিজবোধরূপ, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিভঙ্গ মুরারি কহা যায় (গুরুপদেশগম্য)। "তিনো বন্ধ লাগায়কে, শুন অনাহত টঙ্কো, নানক শূন্য সমাধিমে নাহি ভোর নাহি সন্ধ্যা।" রামচন্দ্র এইরূপ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া গুরুরূপী জনকের নিকট বিদ্যারূপিণী (জ্ঞানরূপিণী) সীতা লাভ করিয়াছিলেন। গুরুরূপী জনকও এই বিদ্যাক্ষেত্র কর্ষণ দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। ময়দানে বা শস্যক্ষেত্রে লাঙ্গল দিতে দিতে বিদ্যানাম্নী কন্যা যে তাঁহার লাভ হয় নাই ইহা নিশ্চয়। সাধারণতঃ লোকে কহিয়া থাকে যে, রাজর্ষি জনক যেন শস্যক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতেই সীতানাম্নী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে, উহা কবি রূপকভাবই বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের বর্তমান শরীরই ক্ষেত্রপদবাচ্য;

'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যে বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।"
গীতা ১৩শ অঃ ২য় শ্লোক।

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে কৌন্তেয়! (জ্ঞানের প্ররোহভূমি বলিয়া) বর্তমান জীবশরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন ক্ষেত্রবিদ্গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।" আবার ১৩শ অঃ ৩য় শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন,

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম।।"

অর্থাৎ হে ভারত! সমুদয় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির হেতু বলিয়া জানিবে, ইহাই আমার অভিমত"। অর্থাৎ জীবের বর্তমান শরীরস্থ স্থিরপ্রাণরূপ মহাপুরুষই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য বর্তমান জীবশরীররূপ ক্ষেত্র প্রাণের দ্বারা কর্ষণ করিলে (ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত গুরুপদেশগম্য) জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই কৃষিকার্য্য সাধন অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা রাজর্ষি জনক সীতানাম্নী কন্যা লাভ করেন অর্থাৎ রাজর্ষি জনক এইরূপ

শরীর-কর্ষণরূপ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া দ্বারা বিদ্যারূপা সীতা নাম্নী কন্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই কৃষিকার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া সাধকবর রামপ্রসাদ সেন নিজ সঙ্গীতে রচনা করিয়াছেন, "মন তুমি কৃষি কার্য্য জান না" ইত্যাদি। বস্তুতঃ রাজর্ষি জনক সাধারণ ভূমিকর্ষণের দ্বারা কন্যা লাভ করেন নাই, ইহা অতি নিশ্চয়; রামচন্দ্র গুরুরূপী জনকের নিকট হইতে আত্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রকর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ওঁকাররূপ শরীরকে ধনুচ্ছলে তিনস্থলে ভঙ্গ করায় অর্থাৎ উপরোক্ত তিনস্থান ভেদ করায়, ক্ষেত্রশুদ্ধির পর আত্মবিদ্যা সীতা লাভ করেন।

"অথমে কৃষত ক্ষেত্রং লাঙ্গালাদুখিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্নী সীতেতি বিশ্রুতা।।"

তাহার পর কালবশে নিজ শরীরস্থ মহামোহরূপ রাক্ষসভাবাপন্ন রাবণ কর্তৃক রামচন্দ্রের আত্মবিদ্যারূপিণী সীতা অপহৃতা হইলে, রামচন্দ্র আত্মহারা হইয়া নিজ শরীররূপ বনে আত্মবিদ্যার অনুসন্ধান করিতে করিতে স্ব-শরীরস্থ মেরুশিখরে অর্থাৎ মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হইয়াছে (ইহাকেই ঋষ্যমুক পর্বত বলিয়া বর্ণনা আছে), তথায় প্রধান দশ প্রাণের মধ্যে প্রথমে রুদ্ররূপী পবন তনয়, যিনি প্রাণরূপী, তৎসহ (অর্থাৎ পবন নামক বায়ুর সহিত) সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর অপর প্রধান প্রধান প্রাণরূপী বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্ররূপী বর্তমান মন, তাঁহারই পুত্র কুপিত বায়ুরূপী বালী। শরীরে এই কুপিত বায়ু কর্তৃক অন্যান্য বায়ুর বিকার হইয়া থাকে। এই কুপিত বায়ুরূপী বালির ভয়ে প্রধান দশপ্রাণ, ঋষ্যমুক পর্বতরূপ শরীরস্থ মেরুর উপরিস্থিত স্থানে প্রছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল।

দশ প্রাণের উদ্ধার জন্য অর্থাৎ দশ প্রাণের ক্রিয়া যথাযথভাবে যাহাতে হইতে পারে, সেই কারণে শরীরস্থ কুপিত বায়ু যাহা প্রবল ভাবে চলিতেছে, যাহার দরুণ বর্তমান মন পর্য্যন্ত কুপথগামী হইয়া রহিয়াছে, সেই কুপিত বায়ুর সাম্যাবস্থাকরণ অভিপ্রায়ে কৌশলে (প্রাণায়াম যোগরূপ পরম কৌশল দ্বারা) প্রাণায়ামরূপ শরচালনা যোগে-ও-দ্বারা রামচন্দ্র প্রথমে কুপিত বায়ুরূপী বালীকে বিনাশ করিলেন। লৌকিক প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র বালী বধের সময় চিহ্নস্বরূপ সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে মালা ধারণ করাইয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্বসন বায়ুরূপী সুগ্রীবকে (শ্বসন বায়ুকে) সদাশিবের স্থূল কণ্ঠদেশে অজপার স্থিরভাব রূপ চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার (সাধকের) কণ্ঠদেশে অজপার স্থিরভাব রূপ চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার (সাধকের) কণ্ঠদেশে অজপার মালা (মালা—দীপ্তি পাওয়া) প্রদত্ত হইয়াছিল। এই কুপিত বায়ুরূপী বালীকে বিনাশ করিতে হইলে, অগ্রে সপ্ততাল ভেদ করা চাহি। যিনি সপ্ততাল ভেদ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার দ্বারা এই কুপিত বায়ু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না। তাল শব্দের অর্থ দুর্গের সিংহাসন এবং কালক্রিয়ার পরিমাণরূপ সময় বুঝায়। অর্থাৎ অজপারূপ কালকে যিনি ভূঃ (মূলাধার), ভূবঃ (স্বাধিষ্ঠান), স্বঃ (মণিপুর), মহঃ (অনাহত), জনঃ (বিশুদ্ধ চক্রঃ) তপঃ (আজ্ঞাচক্র),

এবং সত্যং (সহস্রার) এই সপ্তচক্র ভেদ করিয়া, সপ্তমস্থান সত্যলোকে যথায় অজপারূপ গায়ত্রী দুর্গার স্থিতিস্থানরূপ সিংহাসন অবস্থিত, তথায় ঐ অজপারূপ কালের স্থিতি করিতে সক্ষম হন, তিনিই কুপিত বায়ুরূপী বালীকে বিনাশ করিতে সক্ষম, অপরে নহেন। তৎপরে কুপিত বায়ুর বিনাশ সাধন হইলে, তৎস্থানে সুচারুরূপে স্থির বায়ুর আধিপত্য হইয়া ঐ স্থির বায়ু মনের লক্ষীভূত হয়। দশপ্রাণের মধ্যে শ্বসন বায়ুরূপী সুগ্রীব শিবস্বরূপ। সুগ্রীব—সুন্দর গ্রীবা যাহার। গ্রীবা শব্দের অর্থ—কন্ধর,—ক—শব্দে বায়ু, ধর বা ধৃ—ধারণ করা; প্রাণবায়ু যাহা বাহিরে যাইতেছে তাহাকে সুন্দররূপে টানিয়া আনা ইহার কার্য্য অর্থাৎ শ্বসন বায়ুই সুগ্রীব পদবাচ্য। রামচন্দ্র এই দশপ্রাণ এবং শরীরস্থ অপরাপর অসংখ্য বায়ুর সাহায্যে সীতার উদ্ধার সাধন করেন; অর্থাৎ শরীরের মধ্যে ঊন্‌পঞ্চাশ বায়ু প্রধান, এই ঊন্‌পঞ্চাশের মধ্যে আবার দশপ্রাণ প্রধান; দশপ্রাণের মধ্যে প্রাণবায়ুই সর্বপ্রধান। তাহার পর আবার বর্তমান শরীরে অসংখ্য ধমনী রহিয়াছে। প্রত্যেক ধমনীতেই বায়ু নানাভাবে নানারূপে কার্য্য করিতেছে। ইহারা সকলেই রাক্ষসভাব তিরোহিত করিবার উদ্দেশ্যে আত্মপক্ষের সৈন্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। বায়ুরূপী সৈন্যের সাহায্যে সমস্ত রাক্ষসভাব নষ্ট করিলেও মহামোহরূপ রাবণকে কিছুতেই নষ্ট করিতে বা হত করিতে না পারায়, পরিশেষে রামচন্দ্র প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দেবী দুর্গার অর্থাৎ প্রাণক্রিয়ারূপিণী দেবীর সম্বর্দ্ধন রূপ পূজা করিয়া, তবে মহামোহরূপ রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত অন্তর্ম্মুখী প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণশক্তিরূপা দেবী প্রসন্ন হইলে (প্রাণশক্তির চঞ্চলভাব রহিত হইলে), সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া সাধক সফলকাম হয়েন। রামচন্দ্রও সেইরূপ দেবীকে প্রসন্ন করিয়া, তৎপরে মহামোহরূপ রাবণ অর্থাৎ রাক্ষসভাবকে পরাজয় করিয়া রাক্ষসভাব কর্তৃক অপহৃত আত্মবিদ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণের সংক্ষিপ্ত ভাব। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপেই রামায়ণের ভাব এখানে বিবৃত হইল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কলাবউ

যাহা হউক মায়ের কালে শায়িত অবস্থায় আমার তন্দ্রাকালীন যে সকল ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহারই সংক্ষিপ্তভাব এখানে প্রকাশিত হইল। মায়ের কোলে শয়ন করিয়া থাকিতে থাকিতেই হঠাৎ ঢাকঢোল সব বাজিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে আমার তন্দ্রাভাব কাটিয়া যাওয়ায়, আমি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলাম; তখন মা আমাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, “বাবা খোকা, কাঁদ কেন? ভয় কি? তুমি আমার কোলেই শুইয়া আছ; ভয় কি বাবা? দেবীর বোধন কার্য্য হইয়া গেল তাই ঢাকঢোল বাজিতেছে; তোমার কোন ভয় নাই

উঠিয়া আমার সঙ্গে সব দেখ।” মা’র কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, মা নিকটেই আছেন দেখিয়া আমার সাহস যেন আরও বাড়িয়া গেল এবং তখন আমি মা’র কাছে দাঁড়াইয়া বোধন যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা দেখিতে লাগিলাম। তখন আর দেখিব কি? তখন কেবল দেখিলাম যে, পুরোহিত মহাশয়েরা পূজার কাপড় ও তাঁহাদের প্রাপ্য অন্যান্য জিনিযপত্র বাঁধিতেই ব্যস্ত। বোধন যে কি হইল, তাহা বুঝিলাম না; কারণ দেবীকে জাগ্রত করাই যদি বোধন হয়, তাহা হইলে দেবীকে যে জাগান হইয়াছে তাহার কোনও কিছুই ত’ দেখিতে পাইলাম না। লাভের মধ্যে আমি যে সুখের অবস্থায় ছিলাম, এবং কি যেন সব বলিতেছিলাম সেই অবস্থা এবং সেই সকল কথা যদিও এখন আমার সম্যক মনে নাই, তবে মনে না থাকিলেও আমি যে বেশ একটি সুখের অবস্থায় ছিলাম তাহা আমার বেশ বোধ হইতেছে, আমার সেই অবস্থা ইহারা ঢাকঢোল বাজাইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া দেবীর বোধনরূপ জাগ্রত অবস্থা করিতে না পারিলেও আমাকে জাগাইয়া যে, আমার অন্তরায় হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যেরূপভাবে দেবীর বোধন কার্য্য হইল, অধিবাসও তদ্রূপ ভাবে হইল অর্থাৎ কতকটা তৈল, হরিদ্রা, গন্ধ, মাল্য, ধান্য, দূর্বা ও ফল ইত্যাদি দ্বারা বাহ্যিক সংস্কার মাত্র করিয়া অধিবাসের কার্য্য সমাধা হইল। ইহা কিন্তু দেবীর পক্ষে সম্যক সংস্কার নহে; ইহা বাহ্যভাবে বাহ্যিক ক্রিয়া মাত্র, ইহা প্রকৃত অধিবাসরূপ সংস্কার নহে। প্রকৃত অধিবাস একটি সংস্কার ক্রিয়া বিশেষ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থারূপ চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবীই মহামায়ারূপিণী দশভূজা দুর্গা। ইঁহারাই অধিবাস করিতে হইবে। অধিবাস শব্দ অধি—বস্‌বাস করা হইতেই উৎপন্ন এবং ইহার প্রকৃত অর্থ পূর্বসংস্কার। সংস্কার শব্দ সম্—সম্যক্, কৃ—করা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং অধিবাসরূপ সংস্কারের প্রকৃত অর্থ—পূর্বকৃত কর্মের স্মরণজনক শক্তি বিশেষের মার্জনা করণ ক্রিয়া বিশেষ। অর্থাৎ পূর্ব আত্মাভাস প্রকাশ হইলে বা স্মরণ হইলে, আত্মক্রিয়া করণ অভিপ্রায়ে আগম নিগমের পথ পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য প্রাণায়াম ক্রিয়ার আরম্ভের পূর্বে ঈড়া, পিঙ্গলার বিপরীত করণরূপ ক্রিয়াযোগই প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দশভূজার প্রকৃত অধিবাস।

যাহা হউক রাত্রি বেশী হওয়ায়, নিদ্রার আবেশে আমার ঢুল আসায়, মা আমাকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন এবং আমাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য নিজেও আমার পাশে শয়ন করিয়া, আমাকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে করাইতে আমার গাত্র চাপড়াইতে লাগিলেন। বহলা বাহুল্য আমি বুড়ো খোকা হইলেও মা’র একমাত্র আদুরে খোকা থাকায়, এখন পর্য্যন্ত মাইদুধ খাইয়া থাকি, মাই খাইতে খাইতে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম, আর আমার সাড়া শব্দ রহিল না। আমি যতই ঘুমাই না কেন, বালস্বভাব প্রযুক্ত খুব ভোর রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই আমি মা’রও ঘুম ভাঙ্গাইয়া থাকি। তবে কল্য বেশী রাত্রিতে শয়ন করায় অদ্য একটু বিলম্বে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; তবে এখনও রাত্রি প্রভাত

হয় নাই, বা রাত্রিও আর নাই। আর যে রাত্রি নাই ঢাকঢোলের শব্দেই তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং মা'ও বলিলেন যে, "আর রাত্রি নাই।" বাহিরে বাজনা বাজিতেছে শুনিয়া মা'ও উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "ভোর হইয়াছে, আজ আর শয়ন করিয়া থাকিলে চিলবে না, কারণ আজ প্রথম পূজা এবং প্রভাতেই কলাবউ নাওয়ান হইবে।" মা বলিলেন "বাবা খোকা, তুমি একটু শুইয়া থাক, আমি বাহিরে যাই; আমার আজ অনেক কাজ আছে।" ইহার পর বাবা উঠিলেন এবং উঠিয়া বাহিরে গেলেন। একা থাকিতে পারিব না বলিয়া আমিও মা'র সঙ্গে উঠিয়া যাইতেছি, এমন সময় মা বলিলেন, "এখনও সামান্য অন্ধকার আছে, বাবা এখন তুমি একটু শুইয়া থাক।" আমি বলিলাম, "মা, আমি একা থাকিতে পারিব না, আমার ভয় কচ্ছে।" মা তখন ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঝি, খোকা একা রহিয়াছে, তুমি খোকার কাছে বস, আমি হাত মুখ ধুইতে যাই।" ঝি আসিলে আমি ঝির কোলে বসিয়া তাহার মুখে উপকথা শুনিতে লাগিলাম। খানিকটা গল্প শুনিবার পর, আমার মলত্যাগের বেগ আসায়, আমি বলিলাম, "ঝি আমি বাহিরে যাইব।" আমার কথা বুঝিয়া ঝি আমায় যথাস্থানে লইয়া গিয়া আমায় মলত্যাগের জন্য বসাইয়া দিলে আমি মলত্যাগ করিলাম। বলা বাহুল্য আমি মা'র উপদেশ অনুযায়ী এখন আর যেখানে সেখানে মলত্যাগ করি না। তাহার পর ঝি আমাকে জলশৌচ করাইয়া দিতেছে, এমন সময় মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। পক্ষীকূল দিবা আগত দেখিয়া আপন আপন ভাবে আনন্দ ধ্বনি করিতেছে। তাহাদের কলরবে আমার মনে কেমন একরকম স্নিগ্ধভাব উদয় হইতেছে এবং উহা যেন আমার বেশ প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় মা আমার ঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইবার খোকাকে হাত মুখ ধোওয়াইয়া দাও, তাহার পর খোকা পরিচ্ছদ পরিয়া কর্তার সঙ্গে কলাবউ নাওয়ান দেখিতে যাইবে।" ঝি আমার হাতমুখ ধোয়াইয়া দিল। বলা বাহুল্য আমার মুখের দন্তগুলি এখন উঠিয়াছে। দন্ত উঠার পর হইতে মা'র উপদেশানুযায়ী আমি আমাদের বাড়ীতে প্রস্তুত মঞ্জন দ্বারা দন্ত ধাবন করিয়া থাকি। আমার হাত মুখ প্রক্ষালন হইয়া যাইলে, মা যখন আমাকে পোষাক পরাইয়া দিতেছেন, এমন সময় আমাদের বাড়ীর একজন পরিচারক আমার জন্য গরম গরম কিছু মোহনভোগ ও দুগ্ধ আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। মা আমাকে উহা খাইতে বলায়, আমি তাহা খাইলাম। মা আমাকে যাহা খাইতে দেন, মা'র সমুখে বসিয়া আমি তাহাই খাইয়া থাকি। অপরে কেহ কোন জিনিষ খাইতে দিলে, আমি তাহা খাইনা, কারণ তাহাতে আমার মা'র নিষেধ আছে এবং মা যাহা নিষেধ করেন, এখন আমি প্রায় তাহা করি না। যাহা হউক আমার খাওয়া হইয়া গেলে এবং আমার পোষাক পরা শেষ হইলে, মা আমাকে লোকের দ্বারা বাহিরে বাবার নিকট পাঠাইয়া দিয়া নিজে আপন গৃহস্থালীর কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

আমি বাহিরে বাবার নিকট আসিলাম। আসিবামাত্র বাবা আমাকে আদর করিয়া

আপনার নিকটে একখানি চৌকীতে (চেয়ারে) আমাকে বসাইয়া রাখিলেন। আমিও তাঁহার কাছে বসিয়া তিনি অপরের সহিত যে সকল কথাবার্তা কহিতেছেন তাহা সমস্ত শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় আমাদের পুরোহিত মহাশয় আসিয়া বাবার সমুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "অদ্য বেলা এক প্রহরের মধ্যে দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, সুতরাং আর দেরী করা বিধেয় নহে, এই বেলা গঙ্গাতীরে যাত্রা করা কর্তব্য।" বাবা কহিলেন, "সমস্তই প্রস্তুত আছে, যাত্রা করিলেই হইল, বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমি ত' প্রস্তুত হইয়া আছি, খোকাও আমার সঙ্গে উপস্থিত আছে, আপনার অনুমতি হইলেই যাত্রা করি।" এই কথা বলিয়া বাবা আমাকে কহিলেন, "বাবা খোকা পুরোহিত মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম কর, তাহার পর চল, আমরা কলাবউকে স্নান করাইতে গঙ্গার তীরে যাই; আজ তুমি দেখিবে, গঙ্গায় অনেক কলাবউকে স্নান করাইতে আনিবে।" আমি বাবার মুখে কলাবউ স্নান করানর কথা শুনিয়া মনে ভাবিলাম, বাড়ীতে অনেক বউ আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে কলাবউ আখ্যাধারিণী বোধ হয় কেহ থাকিতে পারেন। ফলকথা কলাবউ কে এবং কলাবউয়ের স্নানটাই বা কি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কলাবউ কে তাহা জানিবার জন্য মনে আনন্দের সহিত কৌতূহল জন্মিল এবং তখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা কলাবউ কাদের বউ বাবা?" বাবা আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কলাবউ কাহারও বউ নহে, কলাবউকে 'নবদুর্গা' বলে এবং উহাকে 'নব পত্রিকা'ও বলে। যে দুইটী কথা বাবা বলিলেন, তাহার একটিও আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি বাবাকে বলিলাম "বাবা আমি নবদুর্গাও বুঝিলাম না নবপত্রিকাও বুঝিলাম না।" এই কথায় পুরোহিত মহাশয় বাবাকে আর কোনও কথা বলিতে না দিয়া নিজেই বলিলেন, "খোকাবাবু, কদলী (কলা), দাড়িম্ব (ডালিম), ধান্য, হরিদ্রা, কচু, মানকচু, বিল্ব অশোক ও জয়ন্তি ইহাই নবপত্রিকা। এই নয়টি গাছকে শ্বেত অপরাজিতার লতা দিয়া বাঁধিয়া স্ত্রী-আকার করা হয় এবং উক্ত গাছগুলিকেই মাতৃকাবোধে 'নবদুর্গা' বলা হয়।" পুরোহিত মহাশয় খোকার মত খোকাভাবে আমাকে যেমন বুঝাইলেন, আমিও তদ্রূপ বুঝিয়া লইলাম, এবং পুরোহিত মহাশয়ও যেমন বুঝেন, আমিও তেমনই বুঝিলাম। আমি খোকা, যে যাহা বলে, তাহাই বুঝিয়াছি বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া থাকি। যাহা হউক এই কথা শেষ হইলে, কলাবউ নাওয়াইবার জন্য আমরা সকলে উপরের বৈঠকখানা ঘর হইতে নীচে আসিলাম। তখন বাবা পুরোহিত মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি সব ঠিক্ করিয়া লউন।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সব ঠিক্ আছে, আমার কার্য্য আমি নিজে সব ঠিক করিয়া লইয়াছি, লোকজনও সব ঠিক্ আছে, এখন যাত্রা করিলেই হয়।" বাবা বলিলেন, "তবে আর দেরী করার প্রয়োজন নাই, চলুন যাওয়া যাক্।" তাহার পর পুরোহিত মহাশয় নিজে কলাবউকে লইলেন, আর একজন একখানি পুঁথি লইয়া তাঁহার সহিত চলিলেন। চাকরদের মধ্যে কেহ বা নৈবেদ্য লইল, কেহ বা ফুল লইল, কেহ বা ঘড়ি লইল, কেহ বা কাঁসর লইল এবং একজন

চাকর আলোর সহিত একটা লণ্ঠন লইল। কয়েকজন দ্বারবানও পোযাক পরিয়া আসিয়া হাজির হইল। সকলেই বাড়ীর বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, বাদ্যকরেরা আসিয়া ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি সব বাজাইতে আরম্ভ করিল, এবং সকলেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গায় যাইবার পথে চলিতে লাগিল। বাবা আমাকে একখানা গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন; সেই গাড়ীতে আরও দুই চারিজন খোকা ও খুকিকে উঠাইয়া দিয়া, আমাদিগকে সাবধানে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের সঙ্গে খুব বড় একজন খোকাকে দিলেন। তাহার পর বাবা এবং আমাদের বাড়ীর আরও পনের কুড়িজন লোক কলাবউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। আমাদের গাড়ী সকলের পশ্চাতে যাইতে লাগিল, রাস্তায় খুব ভীড়; আরও অনেক লোকে কলাবউ স্নান করাইতে যাইতেছে। ঢাকঢোলের বাদ্য যেন গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। ঢাকঢোলের বাদ্যধ্বনি শূন্য স্তর ভেদ করিয়া বায়ুর সাহায্যে কলাবউয়ের স্নানযাত্রার আনন্দবার্তা যেন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘোষণা করিতেছে। রাস্তার দুইধারেই ছোট বড় এবং মধ্যম রকমের খোকা খুকীরা সকলে নানাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাস্তা আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং সকলেই বলিতেছে "ঐ একটা কলাবউ আস্‌চে, ঐ একটা কলাবউ আস্‌চে" এবং কে কয়টা কলাবউ দেখিল, খোকারা তাহা সব গুণিতেছে। কেহ বলিতেছে, "আমি দশটা দেখিয়াছি," কেহ বলিতেছে "আমি কুড়িটা দেখিয়াছি" এবং সকলেই "আমি সর্বাপেক্ষা বেশী দেখিয়াছি" ইহাই বলিতেছি, কেহ আর কম বলিতে চাহে না। যাহা হউক আমরাও গাড়ীর ভিতর বসিয়া সব দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম এবং ক্রমশঃ গঙ্গার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাদের গাড়ী গঙ্গার ঘাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে পর আমাদিগকে গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে নামাইয়া ঘাটের উপর লইয়া গেল। আমি ঘাটে উপস্থিত হইয়া গঙ্গার দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। উহা দেখিতে অতি মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একে প্রাতঃকাল, তাহার উপর প্রাতঃকালীন সমীরণ মৃদু মন্দভাবে চালিত হইয়া, দর্শকবৃন্দকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়েই যেন শারদীয় উৎসব ব্যাপার সঙ্কেত দ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে। গঙ্গা বক্ষে তরণী সকল পতাকা উড়াইয়া পালভরে চলিয়াছে, কর্ণধার পালের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, হাল চাপিয়া ধরিয়া, তরণীকে আপন গন্তব্যস্থানের অভিমুখে চালিত করিতেছে; কোনও তরণী বা দাঁড় বাহিয়া (ক্ষেপণী সাহায্যে) চালিত হইতেছে এবং কোনও বড় বড় বহর নৌকা মাল বোঝাই করিয়া গুণ টানিয়া উজানপথে চালিত হইতেছে এবং কোনও কোনও বড় বড় বহর নৌকা স্রোতের অভিমুখে পাল তুলিয়া চলিতেছে। এইরূপ অনেক তরণী গঙ্গার শোভা বিস্তার করিয়া আপন আপন গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিয়াছে। সন্তরণপটু বড় বড় খোকারা কেহ বা হাত পা ছুঁড়িয়া কেহ বা গা ভাসান দিয়া সন্তরণ দিতেছে। ছোট ছোট খোকারা যাহারা সন্তরণ জানে না, তাহারা সিঁড়ির ধাপ ধরিয়া জলে হাত পা ছুঁড়িয়া গা ভাসাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং

গঙ্গার জলে যে সব ফল ফুল পড়িতেছে তাহা কুড়াইয়া এক জায়গায় জমা করিতেছে। পুরোহিত মহাশয়েরা আপন আপন কলাবউকে মন্ত্রপূত করিয়া গঙ্গায় স্থান করাইয়া, পূজা অর্চ্চনা করিতে বসিয়া গিয়াছেন; অপর নরনারী সকলেই গঙ্গাস্নান করিয়া আপন আপন শরীরের মল ধৌত করিয়া উঠিতেছেন, বলা বাহুল্য মনের মল কাহারও ধৌত হইতেছে না; কারণ সকলেই আপন আপন প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় পতিত, সংজ্ঞা অভাবে, জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞানে আবদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞান সত্ত্বে মনোমালিন্য দূর হওয়া অসম্ভব। আমি মা'র নিকট শুনিয়াছি, গঙ্গা দর্শনে ও স্পর্শনে জীবের মুক্তি হয়; দুঃখের বিষয় আমিও গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছি এবং চর্মপাদুকা খুলিয়া গঙ্গাজল স্পর্শও করিয়াছি, কিন্তু আমার মুক্তি ত' দূরের কথা, খোকাভাব যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে, কিছুই হ্রাস হইল না বরং বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। আমি এই সব ভাবিতেছি, এমন সময় বাবা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "খোকা, এইবার কলাবউকে স্নান করান হইল এবং পূজা অর্চ্চনাও সব হইয়া গিয়াছে, এইবার চল, আমরা বাড়ী যাই।" বাবা তখন আমার হাত ধরিয়া গাড়ীর নিকটে আসিলেন এবং আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া পুরোহিত মহাশয়দিগের সঙ্গে কলাবউ লইয়া যাইবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলে, আমি বলিলাম, "বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" বাবা বলিলেন, "না বাবা, তুমি গাড়ীতে যাও, আমি ইহাদের সঙ্গে যাই, আমাকে হাঁটিয়া যাইতে হয়।" আমি বাল স্বভাব বশতঃ একটু বায়না করায় পুরোহিত মহাশয়েরা বলিলেন, "খোকা হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না, ছেলে মানুষ, সুতরাং একজন লোক খোকাকে কোলে করিয়া যাউক।" তখন একজন লোক আমাকে কোলে করিয়া লইতে আসিলে, আমি তাহার কোলে যাইলাম না, বরং কাঁদিতে লাগিলাম। আমার কান্না দেখিয়া তাঁহারা বাবাকে বলিলেন, "তবে আপনি খোকাকে লইয়া গাড়ীতেই চলুন।" আমারও মনে মনে ইচ্ছা আছে বাবা আমাকে লইয়া গাড়ীতে আসেন, পুরোহিত মহাশয়ের কথায় বাবা আমার সঙ্গে গাড়ীতেই উঠিলেন। আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, মা আমাকে বলিয়াছিলেন, গঙ্গা দর্শনে ও স্পর্শনে মুক্তি হইয়া থাকে আমি গঙ্গাকে দর্শনও করিলাম স্পর্শও করিলাম, কিন্তু আমার মুক্তি হইল না কেন?" তিনি তখন আমার মত ভাবে আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "গঙ্গার এখন মাহাত্ম্য নাই, পূর্বে আমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, গঙ্গার মাহাত্ম্য আর বেশীদিন থাকিবে না, তিন চারি বৎসর মাত্র থাকিবে; আমার পিতা ধর্মশাস্ত্রে বেশ পণ্ডিত ছিলেন এবং বলিতেন যে, তিনিও প্রাচীন পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছেন যে, যখন শৃগাল কুক্কুর হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইয়া যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, গঙ্গার মাহাত্ম্য চলিয়া গিয়াছে; যখন গঙ্গার জলে দাম বা পানা হইবে, বা গঙ্গার জলে পোকা হইবে তখন বুঝিতে হইবে যে, গঙ্গার মাহাত্ম্য চলিয়া গিয়াছে। এখনকার পণ্ডিতগণ আবার পঞ্জিকাতে নূতন বচন বাহির করিয়া বলিয়া থাকেন যে গঙ্গার স্থিতি এখনও অনেক দিন আছে, কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে গঙ্গার স্থিতি আর নাই, গঙ্গামাহাত্ম্য

এখন গতাব্দা হইয়াছে। অমার বিশ্বাস পূর্বতন পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, কারণ পূর্বতন পণ্ডিতগণ সকলেই মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের মত পণ্ডিত এক্ষণে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিশেষতঃ গঙ্গার গতাব্দার সময় যে সমস্ত লক্ষণ হইবে বলিতেন, তাহা সমস্তই এক্ষণে ঘটিয়াছে, অর্থাৎ গঙ্গাজলে এক্ষণে পোকা জন্মিতেছে, শৃগাল কুক্কুরও হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইয়া থাকে এবং গঙ্গাতে শেওলা ও দাম হইয়াছে; এমন কি কাশীতল বাহিনী গঙ্গাতে গ্রীষ্মকালে এমন দাম দেখা যায় যে, পাছে দাম পায়ে জড়াইয়া যায় এই আশঙ্কায় গঙ্গায় সন্তরণ করিতেও ভয় হয়, সুতরাং গঙ্গা দর্শনে, স্পর্শনে যে এখন মুক্তি হইবে, সে বিশ্বাস বাবা আমারও নাই।"

বাবা এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পূর্বে যখন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্তমান ছিল, তখন যাহারা গঙ্গাতে অবগাহন করিত বা গঙ্গাকে দর্শন স্পর্শন করিত, তাহারা কি সকলেই মুক্ত হইয়া শান্তিপদ পাইয়াছে?" আমার এই কথার উত্তরে বাবা আমাকে কোলে করিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, "গঙ্গাস্নান করিয়া কে মুক্ত হইয়াছে না হইয়াছে, তাহা আমি জানিনা আমি আমার কথাই বলিতে পারি; আমি বরাবর নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে আমার স্বাস্থ্য ভাল ব্যতীত মন্দ নাই; স্রোতস্বতী নদীর জলে অবগাহন স্নান করিলে শরীর ভাল থাকে, তাহা আমার আছে, তবে আমি মুক্ত হই নাই বা আমার মনোমালিন্য দূর হয় নাই, বরং দিন দিন মনোমালিন্য যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। জ্ঞান বিনা মনোমালিন্য যে কাহারও দূর হইতে পারে তাহা আমি বিশ্বাস করি না; সেই জ্ঞানও শাস্ত্রাদি পাঠজনিত জ্ঞান নহে, শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না তাহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; জ্ঞান কর্মজনিত হওয়া চাহি, নচেৎ কিছুই লাভ হয় না।" এই কথা বলিয়া বাবা আমাকে একটি শ্লোক শুনাইলেন ঃ—

"তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং দানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু জ্ঞানমেকং কলৌযুগে।"

অথবা "দানমেকং কলৌযুগে" এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা সকলে কলিভাবাপন্ন জীব, বর্ত্তমানে কর্মকাণ্ড প্রায় লোপ হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাও বাহ্যিক কর্ম, তাহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। বাহ্যিক কর্মকাণ্ড যাহা চলিয়াছে তাহা অন্তরঙ্গ কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক চিত্র মাত্র। বাহ্যিক চিত্র দেখিয়া যদি কাহারও অন্তরঙ্গ ভাব অবগত হইবার আগ্রহ জন্মে, তাহা হইলে সে সংশয় রহিত হইয়া চেষ্টা করিলে সদ্‌গুরুর উপদেশে অন্তরঙ্গ ভাব জানিতে পারে, নচেৎ উহা জানিবার আর কোনও উপায় নাই।" তাহার পর শ্লোকটির স্থূল ভাব যাহাতে আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এমনভাবে বাবা আমাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ আমাদের শরীরেই সময় সময় বর্তমান হইয়া থাকে। আমাদের শরীরস্থ যে কাল রহিয়াছে সেই কালের অন্তর্গত উক্ত চারিযুগ। শরীরস্থ প্রাণবায়ুর প্রবেশ ও নির্গমন এই উভয় অবস্থারূপ সময়কে

কাল কহা যায়। প্রথমতঃ এই কাল ত্রিভাগে বিভক্ত; সত্ব, রজঃ, তমঃ অর্থাৎ সুষুন্না, পিঙ্গলা ও ঈড়া। বাম নাসায় যে বায়ু বহে, তাহা ঈড়া, ইহা তমোরূপ কলি; দক্ষিণ নাসায় যে বায়ু বহে তাহা পিঙ্গলা, ইহা রজোরূপ দ্বাপর ও সুষুন্নায় বায়ুর গতিই সত্বরূপ ত্রেতা; সুষন্নার উর্দ্ধে সহস্রারে স্থিতি অর্থাৎ পরমাত্মাভাবে অবস্থিতিরূপ কৃত যুগ বা সত্যযুগ। আসুরিকভাবের ক্রোধ ও হিংসার সহযোগে কলিভাবের উৎপত্তি; সুতরাং কলির ভাব হইতে সর্তক থাকা জীবের সর্বদা কর্তব্য।"

"আত্মকর্মের (প্রাণকর্মের) দ্বারা গুরুপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া (আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করাই আত্মজ্ঞান লাভ, ইহা লাভ করিয়া) জীবকে আত্মকর্মের উপদেশ দান করাই একমাত্র সাত্বিক দান, ইহাই করিতে হইবে; তাহা ইহলে কলির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে, নচেৎ নহে। নিষ্কাম দানই একমাত্র সাত্ত্বিক দান অর্থাৎ সদগুরু শিষ্যকে উপদেশ দান করিয়া যেমন শিষ্যের নিকট কোনও স্বার্থ রাখেন না, তদ্রূপ দানই একমাত্র সাত্ত্বিক দান; অপর সমস্ত দানই রাজসিক বা তামসিক দান বলিয়া জানিবে। অর্থাদি দান করিয়াও অনেক সময় পাপ ভাগী হইতে হয়; আমার কৃতদানের লভ্যবস্তু দ্বারা যদি গৃহীতা পুণ্যকর্ম করে, তবে দাতা সেই পুণ্যের অর্দ্ধেকের ভাগী হয় এবং দাতার অর্থ গ্রহণ করিয়া গৃহীতা যদি পাপকর্মের অনুষ্ঠান করে, তবে দাতাকে ঐ পাপকর্মের অর্দ্ধাংশ ভাগ লইতে হয়। একারণ অনেক সময় দান করিয়াও পাপ অর্জন হইয়া থাকে। এ কারণ বাহ্যিক দানও সতর্কভাবে করা উচিত।"

"আসিবার পূর্বে তুমি কলাবউ সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহাও তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, বেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। কলাবউ বা নবপত্রিকা কেবলমাত্র এতদ্দেশেই প্রচলিত আছে, ইহা বাহ্যিক ভাব। নবপত্রিকাকে নবদুর্গাও বলে। ইহা নবশক্তির একত্র সম্মিলন। বাহ্যিক যে সব বৃক্ষলতা একত্র করিয়া বাঁধিয়া নবপত্রিকা করা হয়, ঐগুলি সমস্ত ঔষধিবিশেষ। ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলিতে শারীরিক ব্যাধি নিবারণের কতকটা শক্তি থাকায়, উহাকেই ভ্রম ক্রমে নবশক্তি বা নব দুর্গা বোধে উহারই উপর দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বাহ্যিক ঔষধি শক্তিদ্বারা ভবব্যাধি অর্থাৎ অশান্তির সহিত জন্মমৃত্যুরূপ ভবব্যাধি দূর হয় না। বিহার ও মিথিলা ব্যতীত পশ্চিম অঞ্চলে, আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদ হইলে শুক্লা নবমী পর্যন্ত দেবীর পূজা, স্তবাদি অর্চনা হইয়া থাকে, তথায় প্রতিমার কোন মূর্তি গঠিত হয় না। নবদুর্গা, নব—নু-স্তব করা হইতে 'নব' শব্দ উৎপন্ন। প্রাণশক্তিরূপা মহামায়ারূপিণী দুর্গার "যা দেবী সর্বভূতেষু" ইত্যাদি কথিত যে স্তব সমূহ চণ্ডীতে উক্ত আছে, উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দেবীর স্তব করা এবং উক্ত প্রাণশক্তিরূপা দেবীর সম্বর্দ্ধন রূপ আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠানই একমাত্র পূজা বা অর্চনা। আমাদের বঙ্গদেশে তন্ত্রোক্ত বাহ্যিক পূজাদি যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা সমস্তই মিথিলার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের অনুকরণ মাত্র জানিবে। এক সময়ে মিথিলা শাস্ত্রাদি পাঠের ও শিক্ষার স্থান ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই তন্ত্রোক্ত

বা পুরাণোক্ত বাহ্যিক পূজার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বাহ্যিক পূজা সমস্তই রাজসিক বা তামসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা সাত্ত্বিক পূজা বা সাত্ত্বিক কর্ম নহে। নিষ্কাম ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূন্য অর্থাৎ প্রীতি বা দ্বেষবশতঃ কৃত নয়, এমন যে কর্ম, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগ দ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্ সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিক মুচ্যতে।।"

গীতা ১৮শ অঃ ২৩ শ্লোক।

বাবার এই শ্লোকটি বলা শেষ হইতে না হইতেই আমরা যে গাড়ীতে আসিতেছিলাম, সেই গাড়ী আমাদের দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, বাবা গাড়ী হইতে নামিলেন। আমি তন্ময়ভাবে গল্প শুনার মত বাবার কথাগুলি শুনিতেছিলাম, সেই জন্য যদিও এতটা রাস্তা আসিলাম, তথাপি রাস্তার কোথায় কি হইতেছিল তাহাতে আমার কোনও লক্ষ্যই ছিল না। বাবার কথার উপরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কারণ ঐ কথাগুলি শুনিতে আমার অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল, এই কারণ আমি আর কোনও দিকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। যাহা হউক বাবা গাড়ী হইতে নামিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকেও নামাইয়া দিলেন, এবং আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়াই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য, বাজনা বাদ্যের কোলাহলও যথেষ্ট। পুরোহিত মহাশয়েরা কলাবউকে লইয়া পূজার দালানে উঠিলেন। বাবাও আমার হাত ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পূজার দালানে উঠিয়া পূজার আয়োজনাদি হইয়াছে কি না দেখিতে লাগিলেন। আমি এই সময় বাবাকে বলিলাম, "বাবা আমি মা'র কাছে যাব।" বাবা তখন একজন লোকের সঙ্গে আমাকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। আমি আনন্দের সহিত মা'র নিকট আসিয়াই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, "মা, আজ কত কলাবউ সব দেখিলাম; রাস্তায় কত খোকা খুকীরা সব আনন্দভরে কলাবউ নাওয়ান দেখিবার জন্য আসিয়াছিল, আজ মা রাস্তায় খুব তামাসা দেখিলাম।" তাহার পর মা আমাকে কোলে করিয়া উপরের ঘরে আসিয়া আমার পোযাক পরিচ্ছদ খুলিয়া দিতে লাগিলেন। আমি গাড়ীতে বাবার নিকট যে সব কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার যতদূর মনে ছিল মাকে বলিতে লাগিলাম। সব কথা বলা হইলে আমার পেট্‌টা যেন হাল্‌কা হইল। আমি যেখানে যাহা শুনি তাহা আগে মা'র নিকট বলা চাহি, মা'কে না বলিলে যেন আমার তৃপ্তি হয় না। যাহা হউক আমার পোযাক পরিচ্ছদ ছাড়াইয়া দিয়া, মা আমাকে জরির পাড়ওয়ালা একখানি সাদা কাপড় ও একটি সাদা জামা পরাইয়া দিলেন। তাহার পর একটু দুগ্ধ খাইতে দিয়া নিজে একখানি গরদের শাড়ি পরিধান করিয়া আসিলেন। পূজার দালানে দেবী মূর্ত্তির সম্মুখস্থ ফোঁকরের পার্শ্বে দুইটি ফোঁকরে পর্দা ফেলা থাকায়, সেই পর্দার মধ্যে মা আমাকে কোলে করিয়া একটি আসনে বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিলেন, আমিও মা'র কোলে বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তমী পূজা

সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, শুনিলাম ঘটস্থাপনা হইতেছে। পূজক যেস্থানে পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণদিকে চারি পাঁচ হস্তের মধ্যেই মা আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, এস্থান হইতে পূজক ও তন্ত্রধারক যাহা যাহা বলিতেছেন, তৎসমুদয়ই বেশ স্পষ্টভাবে শুনা যাইতেছে। মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া যাওয়া হইতেছে মাত্র, মন্ত্রের কার্য্য কিছুই করা হইতেছে না। ঘটস্থাপনাও তদ্রূপ হইল, যাঁহার নিজের ঘটেরই ঠিক নাই, তিনি আর মৃণ্ময় ঘটকে কিরূপে স্থাপনা করিবেন। স্থাপনা অর্থে সমাধি বুঝায়; মৃণ্ময় ঘটের সমাধি কিরূপে হইবে তাহাত' বুঝিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আমি খোকা, আমার তাহা ধারণা করা অসম্ভব। সমস্ত মন্ত্রের ক্রিয়াই বাহ্যিকভাবে হইতে লাগিল। তাহার পর দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর কি হইবে? পুরোহিত মহাশয়ের নিজেরই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল ভাবকে স্থির প্রাণরূপ আত্মভাবে স্থিতি করাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে তাহার কিছুই হইল না। যাহা হউক যাহা হইল আমার ন্যায় খোকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। এখন ছোট বড় খোকারা সকলে আসিয়া ভক্তিভরে দেবী দুর্গাকে প্রণাম করিতে লাগিল। সকলকে প্রণাম করিতে দেখিয়া আমিও মা'র কোল হইতে উঠিয়া ভগবতী দেবী দুর্গার প্রতিমূর্ত্তিরূপ প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া (দণ্ডবৎ শুইয়া পড়িয়া) প্রণাম করিলাম; তাহার পর মা'র কোলে আসিয়া বসিলাম। প্রতিমাস্থিত দেব-দেবীগণের যোড়শোপচারে ক্রমশঃ পূজা করা হইল এবং নৈবেদ্য, জলপান, সরবৎ সব উৎসর্গ করা হইল। তাহার পর দীপমালা উৎসর্গ করা হইল। ছোট ছোট প্রদীপ, মালার আকারে সাজাইয়া, দীপগুলি জ্বালিয়া দিয়া দীপমালা করা হইল এবং ইহাই দেবীকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর প্রথমে খিচুড়ী ভোগ দেবীকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহার পর একবার আরতি করা হইল। আরতির সময় ঢাক ঢোল কাঁসর ঘড়ী সব বাজিয়া উঠায় আবার একবার বাদ্যাদির শব্দে বাড়ী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। দেবী প্রতিমার সম্মুখে যে আরতি করা হইতেছে তাহা বাহ্যিকভাবে প্রতিমার সম্মুখভাগে পঞ্চ প্রদীপের চালনা মাত্র করা হইতেছে, বস্তুতঃ ইহা আরতি নহে, ইহা আরতির ছায়ামাত্র। পূজা-পদ্ধতিতে ভূতশুদ্ধি (পঞ্চতত্ত্বের শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া) যাহা লিখিত আছে, তাহার কার্য্য যথাযথ করিলে আরতি আপনা আপনিই হইয়া থাকে। ষট্-চক্রের ক্রিয়ার পূজারূপ সম্বর্দ্ধন অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের ক্রিয়া দ্বারা পঞ্চতত্ত্বের শুদ্ধিরূপ অবস্থা সাধকের আসিলে বা হইলে, বর্তমান প্রাণকর্ম্মের

অতীতাবস্থারূপ আরতি বা বিরতিরূপ ইচ্ছারহিত অবস্থা অর্থাৎ শান্তি আপনিই আসিয়া থাকে। যাহা হউক আমি খোকা, আমার কথা আর কে শুনিবে? যাঁহারা পূজা করিতেছেন, তাঁহারা সব বড় খোকা, ওজনে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী এবং মা'র মুখে শুনিয়াছি এঁরা সব বড় বড় পণ্ডিত সুতরাং পাণ্ডিত্যাভিমানে সদাই মত্ত ; আমি কিছু বলিলে আমাকে খোকা বলিয়াই অগ্রাহ্য করিয়া দিবেন, সুতরাং আমার বলা আর না বলা উভয়ই তুল্য। তবে দুঃখের বিষয় ইহারা পণ্ডিত উপাধিধারীমাত্র। পণ্ডা শব্দের অর্থ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বা বেদবিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অভাব ইহাদের আছে ; সুতরাং ইঁহারা নামে পণ্ডিত হইলেও, ইঁহারা ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ইঁহাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা আত্মক্রিয়াবিহীন হওয়ায় ইঁহাদের সেই জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

"শাস্ত্রান্যধীত্যাপি ভবন্তিমূর্খাঃ
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতঞ্চৌষধমাতুরাণাম্ ন
নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্।।"

অর্থাৎ "শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও লোক মূর্খ থাকে, কিন্তু যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই বিদ্বান্; ঔষধ সুনির্দ্দিষ্ট হইলেও নামমাত্রে রোগনাশ করে না, উহা সেবন করা আবশ্যক।" আমাদের পুরোহিত মহাশয়দের উক্ত অবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমাদের বাড়ীতে পশু বলিরূপ নৃশংস ব্যাপার হয় না, শুনিলাম আমার পিতামহ ইহা উঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত আর পশুবলি হয় না। এই পশুবলি একটা কর্দয্য ব্যাপার, ইহাকে পূজার অঙ্গ বিশেষ করা হইয়াছে। শরীরস্থ পশুভাব দেবীকে বলিরূপ উপহার দিয়া, (দেবভাবে) দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা করিতে হইবে ইহাই বিধি; "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।" এখন কিন্তু সব উল্টা রাস্তায় চলিতেছে।

যাহা হউক খিচুড়ী ভোগ যাহা দেবীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলে, মা আমাকে কোলে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। তথায় আসিয়া দেখি, খিচুড়ী প্রসাদ খাইবার জন্য সব খোকারা পাতা করিয়া বসিয়া গিয়াছে। তবে এই খোকাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ছোট ছোট খোকা, দুই দশজন বড় বড় খোকাও আছে। প্রসাদের জন্য সকলেরই ভক্তির স্রোত উথলিয়া চলিয়াছে; প্রসাদ পাইবার ভক্তি সকলেরই বেশী। এই প্রসাদের ব্যবস্থা না থাকিলে খোকাদের ভক্তি কতদূর থাকিত বলা যায় না। প্রসাদী বস্তু যদি খাইতে ভাল না হয়, বা রান্নার দোষে যদি উহা বেশী লবণাক্ত বা লবণশূন্য বা তীক্ষ্ণ (ঝাল) হয়, তাহা হইলে প্রসাদ আর মুখে উঠে না। তখন পাতের প্রসাদ পাতেই পড়িয়া থাকে। সকলেই মুখে বলিতেছেন "মা ভগবতীর প্রসাদ ভক্তিপূর্বক খাওয়া চাহি মা'র প্রসাদ ভক্ষণ করিলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়।" কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রসাদে লবণ বা ঝাল বেশী হইলে চক্ষের জলে ভাসিতে হয়; অপরপক্ষে প্রসাদ খাইতে

যদি সুমধুর হয় তবে লোভের বশীভূত হইয়া বেশী খাইয়া ফেলিলে হয়ত শেষে ভেদবমি হইয়া সব দুঃখের অবসান হইয়া থাকে। যাহা হউক সকলে খিচুড়ী প্রসাদ খাইতেছে, মা একখানা কলাপাতায় করিয়া একটু খিচুড়ী প্রসাদ অনাইয়া অপর খোকাদের সঙ্গেই আমাকে বসাইয়া ঐ খিচুড়ী প্রসাদ অল্প অল্প খাওয়াইয়া দিতেছেন, আমিও নিজ হস্তে করিয়া দুই এক রকম ভাজা খাইতেছি কিন্তু পাছে হাতে খিচুড়ীর দাগ লাগে এই ভয়ে খিচুড়ীতে হাত দিতেছি না। যাহা হউক আমার কচিমুখ বা দুধেমুখ থাকায় খিচুড়ী প্রসাদ খাইতে আমার একটু ঝাল বোধ হইতে লাগিল এবং চক্ষে জলও ঈষৎ আসিল। চক্ষে জল আসায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইতে লাগিল অর্থাৎ মনে মনে যেন বোধ হইল, 'ইহা কি প্রসাদ? ইহা ত' প্রকৃত প্রসাদ নহে, ইহা প্রকৃত প্রসাদের ছায়ামাত্র, ইহা বাহ্যিক প্রসাদ, ইহাতে সকল দুঃখের নাশ হয় না।" এই সময় হঠাৎ আমার মনে হইল, যে প্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া "প্রসাদে সর্ব দুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে" এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, ইহা সে প্রসাদ নহে। আত্মপ্রসাদই প্রকৃত প্রসাদ পদবাচ্য, ইহা সাধনদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থির প্রাণই আত্মা; বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ মহামায়া দশভূজা দুর্গার প্রাণযজ্ঞরূপ সম্বর্দ্ধন ক্রিয়ার অবশিষ্ট ভাগ অবস্থাই আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থাই প্রকৃত প্রসাদ পদবাচ্য। এই প্রসাদ যিনি কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারাই সর্বদুঃখের নাশ হইয়া শান্তি প্রাপ্তি হইবে, নচেৎ নহে। ভাবিতে ভাবিতে এই সব যখন আমার মনে উদয় হইতেছিল, তখন আমার যেন কি এক রকম ভাব হওয়ায়, আমার মুখের খিচুড়ী মুখেই ছিল এবং এই সময় স্পন্দন রহিত নেত্রে মা'র মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া থাকায়, মা ভয় পাইয়া সকলকে বলিলেন, "ওগো খোকা আমার অমন কচ্চে কেন গা, মুখের গ্রাস মুখেই রহিয়াছে।" মা এই কথা বলাতে সকলেই তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল বরং কেহ কেহ বলিল, "মুখে চোখে জলের ঝাপ্টা দাও, আহা অনেক বেলা হওয়ায় ক্ষুধাতে এইরূপ হইয়াছে, বা হয়ত অধিক ঝাল লাগিয়া এইরকম হইয়াছে।" দুই একবার জলের ঝাপটাও আমার মুখে দিল এবং ইহার ক্ষণিক পরেই আমার সেই ভাব অন্তর্হিত হওয়ায় আমি হাসিতে হাসিতে মা'কে বলিলাম, "মা, আমি খিচুড়ী আর খাব না, উহা বড় ঝাল!" সকলেই বুঝিল যে, বেশী ঝাল লাগায় আমার এইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু আমার যে কি হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, আমার মনের ভাব মনেই রহিয়া গেল।

তাহার পর মা আমাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। তথায় অপরাপর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, মা আমাকে কোলে করিয়াই তাঁহাদের সহিত মেয়েলী ভাবের গল্প ও কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। পূজার আনন্দে অনেকেই হাস্যবদনে বসিয়া আছেন; কেহ কেহ বা বেড়াইতে বেড়াইতে ঘরের জিনিযপত্র দেখিতেছেন; ছোট ও মধ্যম গোছের খুকীরা ঘরের কোথায় কোন্ ছবি আছে, তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে ও ছবি সম্বন্ধে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কত হাস্যামোদ করিতেছে; আবার আমার মত ওজনের খোকা খুকী যাহারা, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলাপাতার বাঁশী

করিয়া পোঁ পোঁ করিয়া বাজাইতেছে, তাহার মধ্যে কেহ বা অপরের বাঁশী কাড়িয়া লইয়া ঝগড়া করিতেছে এবং ঝগড়া করিতে করিতে কেহ বা আপন সামর্থ্য অনুযায়ী অপরকে দুই এক ঘা চড় চাপড়ও বসাইয়া দিতেছে, চড় চাপড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেই গিন্নিরা আসিয়া তাহাদের পরস্পরের ঝগড়া থামাইয়া দিতেছেন। আমি মা'র কোলে বসিয়া এই সব তামাসা দেখিতেছি; পাছে অপর খোকা খুকি আমাকে চড় চাপড়টা বসাইয়া দেয়, এই ভয়ে মা'র কোল হইতে নামিতেছি না, মা'র কোলে বসিয়াই সব দেখিতেছি এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আপনা আপনি খোকাভাবে হাস্যও করিতেছি। এমন সময় মা একজন দাসীকে অনুমতি করিলেন, "নীচে হইতে আমার বড় ননদকে (স্বামীর ভগ্নিকে ননদ বলে) পান লইয়া আসিতে বলিয়া আইস।" দাসী অনুমতি পাইয়া নীচে চলিয়া গেল। ক্ষণিক পরেই দেখি, আমার পিসিমা একখানি রূপার থালে করিয়া পান আনিয়া সকলকে দিতে লাগিলেন। এই সময় মা একবার উঠিবার জন্য আমাকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন এবং তৎপরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; আমিও মা'র সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে লাগিলাম। মা ঘরের মধ্যে গিয়া কাঁচের আলমারী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে গোলাপ পাশ ও আতরদান বাহির করিয়া আনিয়া বড় বড় খুকিরা যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আদর করিয়া সকলের গায়ে গোলাপজল দিলেন এবং আতরদান হইতে সকলকে আতরও দিলেন। ইহার পর মা সকলকে বলিলেন, "এইবার আমি একবার পূজার দালানে মা দুর্গাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইব, আপনারা একটু বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।" তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, "ওমা, সে কি গো? এখনও তোমার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় নাই? আহা একা সব দিকে দেখিতে হইতেছে, তা দেরী তো হতেই পারে মা; তা তুমি যাও, আমরা বসিয়া আছি; আর আমাদেরই এ বাড়ী, আমাদিগকে বেশী কিছু বলিতে হবে না, যা যা দরকার হবে আমরা নিজেই সব দেখিয়া লইব; আমাদের সঙ্গে তোমার লৌকিকতা করিতে হবে না, আমরা সব আপনা-আপনির ভিতর, আমাদের অত বলিতে হবে না।" ইহার পরই মা পিসিমাকে তথায় বসাইয়া আমাকে লইয়া পূজার দালানে আসিলেন।

আমরা যখন পূজার দালানে আসিলাম, তখন দেখি যে, সাদা ভোগ সব আসিতেছে, (সাদা ভোগ অর্থাৎ অন্নভোগ বা ভাত ব্যঞ্জনাদি)। পুরোহিত মহাশয়েরা আমার মা'কে পুষ্পাঞ্জলি দিবার কথা বলিলে, মা বলিলেন, "ভোগ-আরতি হইয়া যাউক, তাহার পর আমি পুষ্পাঞ্জলি দিব।" ভোগের সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি ও ঘৃতপক্ক লুচি, কচুরী প্রভৃতি ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, দধি ও পায়স প্রভৃতি একে একে সব আসিতে লাগিল। সমস্ত দ্রব্য আসিয়া পূজার দালানে পৌছিলে পর, পুরোহিত মহাশয় যিনি পূজকরূপে ব্রতী হইয়া পূজা করিতেছিলেন, তিনি ভোগের দ্রব্যসম্ভার সমস্ত উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। ভোগদ্রব্য উৎসর্গ হইয়া যাইলে, একবার ঘন্টাধ্বনি করিলেন, এই ঘন্টাধ্বনিতেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, দেবীর ভোগ হইয়া গেল। ভোগের পর আরতির উদ্যোগ

হইয়া আরতি আরম্ভ হইল। এই সময় পূজার দালানে ধূনা গুগ্‌গুল জ্বালাইয়া উহার ধূমে পূজার দালান প্রায় অন্ধকার করিয়া ফেলা হইল এবং ঘড়ী কাঁসর বাদ্যভাণ্ড সব বাজিতে লাগিল; বাহ্যিক দৃশ্য মন্দ নহে। বাড়ীর উঠানে পূজার দালানের সমুখে লোকে লোকাকীর্ণ। আরতি শেষ হইতে প্রায় অর্দ্ধঘন্টা লাগিল। আরতি শেষ হইবামাত্র সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিল, আমার মা'ও প্রণাম করিলেন এবং আমিও মা'র সঙ্গে প্রণাম করিলাম।-গোলমাল কতকটা কমিলে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য মা অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে বাবা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা ও বাবা উভয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিলেন, আমি মাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পুষ্প, দুর্বা, বিল্বপত্র প্রভৃতি চন্দন চর্চিত করিয়া আতপ চাউলের সহিত নিজহস্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, তন্মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য ধারণ করিয়া, মন্ত্রপাঠপূর্বক উহা দেবীকে অর্পণ করার নাম পুষ্পাঞ্জলি দান। এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিনবার দেওয়া হইল। তাহার পর প্রার্থনা স্তব পাঠ। ইহাতে কেবল কামনার ছড়াছড়ি অর্থাৎ ইহা "রাজ্যং দেহি, ধনং দেহি, পুত্রান্ দেহি, সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে" ইত্যাদি কামনা পূর্ণ। কামরূপ মহাসুরকে জয় করাই পূজার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাহা জানাইবার লোকাভাব। বর্তমানে বাহ্যিক পূজার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও যেভাবে পূজা অর্চনাদি হইয়া থাকে, তাহাতে আসুরিক ভাবেরই সমর্থন হইয়া থাকে, আসুরিক ভাবকে জয় করা হয় না। যিনি আমাদের পুরোহিত, তিনিও আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া আসুরিক ভাবেরই পোষণ করিতেছেন। যাহা হউক আমার মাতাপিতার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইলে পর, পুরোহিত মহাশয় যিনি পূজকরূপে পূজা করিতেছিলেন, তিনি বাহ্য অগ্নি স্থাপন করিয়া বাহ্যিক হোমকার্য্য করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ গব্যঘৃতে বিল্বপত্র ডুবাইয়া, ঐ ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ইহা বাহ্যিক হোম মাত্র অন্তহোমে বাহ্য অগ্নির প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের জীবমাত্রেরই কুক্ষিতে (নাভিস্থানে) যে অগ্নি রহিয়াছে, তাহাই বৈশ্বানররূপ অগ্নি উহা সর্বদাই প্রজ্বলিত রহিয়াছে। পুরোহিত মহাশয় এই বৈশ্বানররূপ অগ্নির বাহ্য আবাহন ও পূজা করিয়া আহুতি দিতেছেন। অথচ এই অগ্নিস্থান পূজকের উদরের মধ্যে, তাহা না জানা থাকায়, বাহিরে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিতেছেন। বৈশ্বানররূপ অগ্নির হোমাকার্য্যে গবাদি পশুর ঘৃতের প্রয়োজন হয় না এবং বৃক্ষাদির পত্র বা সমিধের (যজ্ঞডুম্বুরের শাখাকে সমিধ বলে) প্রয়োজন হয় না। উক্ত বৈশ্বানররূপ অগ্নিই ব্রহ্মাগ্নি, ইহাকে প্রণাগ্নিও কহা যায়, যাহার তেজে শরীরের বাহিরেও শরীরের উত্তাপ বোধ হইয়া থাকে। অন্তর্হোমে চঞ্চল প্রাণই হবিঃরূপে ব্যবহৃত হয়; অর্ন্তহোম পঞ্চপ্রাণের হোমরূপ ক্রিয়া বিশেষ। বাহ্যহোমে ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে; বাহ্যহোম প্রকৃত হোম নহে।

"ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে।।"

ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

তথাচ, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।।"
গীতা ৪র্থ অধ্যায় ২৪ শ্লোক।

তবে বাহ্য হোমাদি কার্য্য আমার ন্যায় খোকার পক্ষে মন্দ নহে। কারণ ইহাতে কতকটা বাহ্যিক আড়ম্বর থাকায়, ঐ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া বাহ্যাড়ম্বর প্রিয় খোকাদের বাহ্য ভক্তি শ্রদ্ধার কতকটা উদয় হইয়া থাকে। যাহা হউক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কার্য্য হইয়া যাইলে, বাবা পুরোহিত মহাশয়কে বলিলেন,—"আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি ভোজনের কার্য্য সকল দেখিতে যাই, কারণ ভোজনের কাল উপস্থিত।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—"আপনি যান, আপনাকে এখানকার কিছুই দেখিতে হইবে না।" তাহার পর বাবা তথা হইতে বাহিরে আসিলেন, আমিও বাবার সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম; মা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

বাবা আসিয়া ব্রাহ্মণগণের ভোজনের স্থান করিতে বলিলেন। তখন আমাদের প্রতিবেশী, কুটুম্ব ও জ্ঞাতিগণের মধ্যে বড় বড় খোকারা সব কোমর বাঁধিয়া পাতা, জলের গেলাস প্রভৃতি আনিতে লাগিলেন। চাকরেরা আঙ্গিনা মার্জ্জন করিয়া জলের ছিটা দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বাড়ীর উঠান পূর্ব হইতে পরিষ্কার ছিল। তাহার পর উঠানে ও উঠানের চারিদিকে রোয়াকে পাতা হইতে লাগিল এবং পাতার উপর লেবু ও লবণ এবং পাতার পার্শ্বে জলের গেলাস দিয়া ঐ গেলাসে জল দেওয়া হইতে লাগিল। ইহার পরেই ব্রাহ্মণগণকে "ভোজনের স্থান" হইয়াছে বলায়, সকলে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যেক পাতায় একজন করিয়া বসিয়া গেলেন। আমি ও বাবা দুখানি চেয়ারে উঠানের একধারে বসিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ বসিবামাত্র বাবা আমাকে বলিয়া গেলেন, "তুমি এইখানে বসিয়া সব দেখিতে থাক।" আমি বাবার কথায় তথায় বসিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। বাবা চারিদিকে ঘুরিয়া সব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পনের কুড়িজন লোক থালায় করিয়া ভাত লইয়া সকল পাতে অল্প অল্প করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহার পর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যেক সারিতে এক একজন লোক একটা বড় বাটিতে করিয়া ভাল ঘৃত লইয়া ভাতের উপর দিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক একজন লোক এক এই রকমের ব্যঞ্জন দিয়া যাইতে লাগিল। ব্যঞ্জনও নানাপ্রকারের দেওয়া হইতে লাগিল। বাবা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে পাইল না পাইল, সব দেখিয়া বেড়াইতে ছিলেন, এবং এক একবার মধ্যে মধ্যে আমার কাছেও আসিতেছেন। বাবা ব্যতীত আরও আট দশজন লোক কে কি পাইল না পাইল তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সময় বাবা একবার আমাকে বলিলেন, "দেখ বাবা, লোককে ভোজন করানর মত এমন তৃপ্তিকর কার্য্য আর নাই। পয়সা, কড়ি, টাকা, রত্ন লোককে যতই দাও না কেন, কিছুতেই কেহ কখনও বলিবে না যে, 'আমার আর চাহি না'; ধন রত্ন অর্থাদি যতই দাও না কেন, কিছুতেই কাহারও আশার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু আহার

করিতে করিতে পেট ভরিয়া গেলে যতই ভাল জিনিষ দাও না কেন, কিছুতেই কেহ আর তাহা লইতে চাহে না।” এই কথা বলিয়াই বাবা উঠিয়া গেলেন, আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্নব্যঞ্জন খাওয়া হইতে হইতেই পাতে লুচি দেওয়া হইতে লাগিল। ছোট ছোট খোকারা সব লুচি পাতে না লইয়া, হাতে লইয়া কাপড়ে বাঁধিতে লাগিল, বড় বড় খোকারা সব লুচি পাতেই লইতে লাগিলেন। লুচির সঙ্গে সঙ্গে আবার তরকারী, কালিয়া, দেওয়া হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য আমাদের বাড়ীতে মৎস্যের ব্যাপার নাই সব নিরামিষ, পূজার সময় আমাদের বাটীতে এমন কি আঁসবঁটি পর্য্যন্ত লুকাইতে হয়। লুচির সঙ্গে কচুরী, নিম্‌কি, মিঠেগজা, পাঁপর ভাজা, সিঙ্গেড়া প্রভৃতি ঘৃতপক্ক দ্রব্য দেওয়া হইতে লাগিল। এই সব দ্রব্য খাওয়া প্রায় শেষ হইবার সময় দধি বাহির হইল। সকল পাতে দধি দিবার পর পায়স ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দেওয়া হইতে লাগিল। এই সময় বাবা আর একবার আমার নিকটে বসিয়া, নিকটস্থ লোকদিগকে সব দেখিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, “মা দুর্গা বা নারায়ণ সব ভোজন করিতেছেন। সকল ঘটেই নারায়ণ আছেন, এই বিবেচনা করিয়া ভক্তির সহিত সকলকে সাধ্যমত আহার করান উচিত। নচেৎ অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া, নিজে কর্তা সাজিয়া গদির মোহন্তের মত তমোভাবে থাকিয়া ভোজন করান বৃথা; তাহাতে কেবল নিজের তমোভাবেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র, অপর কিছুই হয় না।” তাহার পর বাবা প্রত্যেক পংক্তিতে পংক্তিতে ঘুরিয়া কাহারও কোন খাদ্যদ্রব্য চাহি কিনা, তাহা বিনীতভাবে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন একটা রব উঠিয়া গেল, “আর কিছু চাহি না, এখন আমাদের উঠিবার অনুমতি দিউন, আমরা আর কিছুই চাই না এখন আঁচাইতে পারিলেই হয়।” ইহার পর সকলকে পান দেওয়া হইলে, সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। লোকজন বন্দোবস্ত সব ঠিকই ছিল; যেমন ব্রাহ্মণগণেরা উঠিয়া পড়িলেন, অমনি চকিতের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্ছিষ্ট পাতা সকল সরাইয়া ফেলিয়া গোবরজল দিয়া ধুইয়া সমস্ত স্থান পরিষ্কৃত করা হইল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল ব্রাহ্মণ প্রায় ছয় সাত শত হইবে।

যাহা হউক আমি এই সময় বাবাকে বলিলাম, “বাবা আমি মার কাছে যাব।” বাবা তখন আমাকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। আসিবার সময় শুনিলাম, বাবা বলিতেছেন, “এইবার কায়স্থ ও নবশাক মহাশয়দের জন্য তৎপর ভোজনের স্থান কর, কারণ বেলা প্রায় একটা বাজে।” এই কথায় বুঝিলাম এইবার কায়স্থদের জায়গা হইবে। যাহা হউক আমি ক্রমশঃ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ীতে আসিয়া মাকে আর খুঁজিয়া পাই না। কাজের বাড়ী, মা'ও নানা কার্য্যে ব্যস্ত। এঘর ওঘর করিয়া শেষে শুনিলাম মা রান্নাবাড়ীতে আছেন। তথায় গিয়া মা'কে পাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। আমি জানি আমার মা'ই জগদম্বা। অনেকক্ষণের পর মা'কে পাইয়া আমার

মুখে আর হাসি ধরে না। মাকে বলিলাম, "মা বাহিরে ব্রাহ্মণ খোকারা সব ভোজন করিতেছিলেন, আমি বাবার সঙ্গে বসিয়া সব দেখিয়াছি, আবার কায়স্থ খোকাদের জন্য জায়গা হইতেছে।" মা'ও রান্নামহলে মেয়েদের জায়গা করাইতেছেন, উপরে ব্রাহ্মণ মেয়েদের জায়গা হইয়া, উঠানে কায়স্থদের মেয়েদের জায়গা হইতেছে। এখানে মেয়েরা অর্থাৎ বড় খুকীরা সব পরিবেশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। জায়গা হইয়া যাওয়ায়, সকলকে ডাকাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। উপরে এবং নীচে মেয়েরা সকলে পরিতোষ পূর্বক আহার করিতে লাগিলেন। মা এবং আমার পিসিমা ও অপর সকলে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সময় মা একবার মাত্র আমাকে একটু দুগ্ধ ও কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া সকলকে খাওয়ানর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন আমি সেইখানে বসিয়া ছোট বড় সব খুকীদের ভোজন দেখিতে লাগিলাম। বেশ আনন্দের সহিত কত রকমের কথাবার্তা কহিতে কহিতে সকলেই ভোজন করিতেছেন। পূজার উৎসবের আনন্দ অপেক্ষা ভোজনের আনন্দই অধিক বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। ভোজনের আনন্দ লোকের যতটা বেশী, পূজা বা ভজনের আনন্দ তত' নহে।

যাহা হউক সকলে বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। তৃপ্তি কাহারও আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ যাঁহারা প্রবৃত্তিরূপা, তাঁহাদের বাসনার নিবৃত্তি না হইলে তৃপ্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মাতৃরূপিণী ভগবতীগণের তৃপ্তিসাধন দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক আমার মাতৃদেবী অতি যত্নের সহিত সকলকে পরিতোষ পূর্বক আহারাদি করাইতে লাগিলেন; যাহাতে কোনও বিষয়ের ত্রুটী না হয়, এমনভাবে সতর্কতার সহিত সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এমন কি প্রত্যেকের নিকট হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা আপনাদের কাহার কি দরকার বলুন, আমি তাহা আনাইয়া দিতেছি। "যাহা হউক সকলে যেন বেশ সন্তোষপূর্বক আহার সমাপন করিলেন। বলা বাহুল্য বাহিরে ব্রাহ্মণগণকে যেরূপভাবে সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ও ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি দেওয়া হইয়াছিল, ইঁহাদিগকেও সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী তুল্যভাবেই পরিবেশন করা হইল। সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ইঁহাদের আহার শেষ হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল অর্থাৎ সামান্য মাত্র বেলা রহিল। শুনিলাম, বাহিরে কায়স্থ বাবুদের ও নবশাক বাবুদেরও ভোজন শেষ হইয়া, অপর সাধারণ জাতিগণকে বসানর উদ্যোগ হইতেছে। আমি আর বাহিরে যাইলাম না। কারণ আমার যেন একটু নিদ্রার আবেশ আসিতেছে দেখিয়া, আমি মা'কে বলিলাম, "মা আমার ঘুম পাইতেছে, আমি ঘুমাব।" মা তখন আমাকে উপরে লইয়া গিয়া শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দেওয়াতে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য মা একজন লোককে আমার কাছে রাখিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। আমিও অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাবস্থায় আমার শরীরের বিশ্রাম হইলেও, আমার মনের বিশ্রাম নাই। আমার

যেমন খোকাভাব, আমার মনেরও তদ্রূপ খোকাভাব, সুতরাং আমার দেহের বিশ্রামরূপ নিদ্রাবস্থাতে মন খোকাভাবে খোকা সজিয়া নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছে। জাগ্রত অবস্থাতে আমি আবার খোকাদের সহিত যেমন নানারকম খেলা খেলিয়া থাকি, নিদ্রাবস্থাতেও তাহার বিরাম নাই। তবে আমার এখন শরীরের ওজন কম থাকায়, স্বপ্নাবস্থায় আমার চিন্তার বিষয়ও কম ওজনের অর্থাৎ এক্ষণে আমার চিন্তার এমন কোনও গুরুতর বিষয় নাই, যাহা আমাকে গুরুতররূপে দাহ করিতে পারে। তবে চিন্তা বিষয়টাই এমন গুরুতর যে, যদি কাহারও সামান্য পরিমাণ চিন্তা থাকে, সে চিন্তাতেও শরীরকে কথঞ্চিৎরূপে দাহ করে। বর্তমান আমার বিষয়ের মধ্যে, আমার পোষাক, খেলনা, আমার মা ও বাবা; উপস্থিত আমার বিষয় এই কয়টি মাত্র। সুতরাং এই সামান্য বিষয়গুলির চিন্তা, আমাকে এখন তত বেশী দাহ করিতে পারে না। অপার্থিব বিষয় চিন্তা এখন আমার কিছুই নাই। অপর পার্থিব চিন্তা না থাকায়, আমার নিদ্রাবস্থায় প্রায়ই আমার গর্ভাবস্থার চিন্তারূপ ভাব আসিয়া থাকে। এই চিন্তায় আমার শরীর বা মন দাহ করিতে পারে না, বরং সময়ে সময়ে যখন গর্ভাবস্থার ধ্যানরূপ চিন্তা আইসে, সেই অবস্থায় ক্ষণিক থাকার পরই, বিষয় চিন্তা দগ্ধ হইয়া গিয়া আমি চিন্তাশূন্য হইয়া যাই। আবা উক্ত অবস্থার অবস্থান্তর হইলেই 'অপর খোকা যেন আমার পোযাক লইতেছে' বা 'অপর কোনও একটা খোকা যেন আমার মা'র কোলে বসিয়া মাই খাইতে যাইতেছে' এইরূপ চিন্তা স্বপ্নে আসিয়া উপস্থিত হয় ও এই চিন্তা আমাকে যে কিঞ্চিৎ জ্বালাও না দেয়, তাহা নহে, বরং সময়ে সময়ে বিলক্ষণরূপে দাহ করিয়া থাকে। জীবশরীরকে ও জীব শরীরস্থ মনকে দাহ করাই চিন্তার একমাত্র ধর্ম। এই সময় স্বপ্নে আমার একটি শ্লোকের কথা মনে পড়িল। সেই শ্লোকটি এই—"চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তৈব চ গরীয়সী।" অর্থাৎ চিতা অপেক্ষা চিন্তা শ্রেষ্ঠ, কারণ চিতা শবদেহকে দান করিয়া থাকে কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকে দহন করে অর্থাৎ বিষয় চিন্তাদ্বারা সজীব দেহ দগ্ধ হয়। কেবল প্রাণশক্তিরূপ আত্মচিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইলে, চিন্তা নিজেই দগ্ধ হইয়া গিয়া নিশ্চিন্ত অবস্থা আনাইয়া দিয়া থাকে; এই নিশ্চিন্ত অবস্থাই অমৃত। মন এই অমৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শরীর ও মন অমৃতত্ব লাভ করিয়া, সদা শান্তিলাভ করিয়া থাকে। চিন্তারূপা রাক্ষসী, জীবের মনের সহিত দেহকে সর্পের আহারের ন্যায় ক্রমশঃ গলাধঃকরণ মানসে, সর্বদা চেষ্টিত রহিয়াছে। ব্যালী (সর্প) যেমন নিজ আহারীয় বস্তু ভেক বা মুষিককে ধৃত করিয়াই একেবারে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ চিন্তারূপ ব্যালী, জীব ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরেই জীবকে দাহ ও যন্ত্রণা দিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করে ও পরিশেষে একবারে উদরস্থ করিয়া জীবের জীবলীলা সমাপন করিয়া থাকে। এ কারণ ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান কর্ম যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তাহাই আপনাতে আপনি থাকিয়া

সম্পাদন করা জীব মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। কারণ ইহাই চিন্তারূপ ব্যালীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়। আমার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে এই সকল কথা মনে মনে আন্দোলিত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ কি শব্দ হওয়ায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমি কাঁদিয়া উঠিলাম।

যে ঝি আমার নিকট ছিল সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ভয় কি, আমি তোমার কাছেই আছি, কোনও ভয় নাই, বাহিরে আরতি আরম্ভ হওয়ায় ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিয়াছে চল, আমার সঙ্গে আরতি দেখিতে যাইবে।" ঝির কথায় কতকটা শান্ত হইয়া বলিলাম, "মা কোথায়, আমাকে মা'র কাছে লইয়া চল।" তাহার পর ঝি আমাকে লইয়া মা'র নিকট চলিল। আমি ঝির কোলে যাইতে যাইতে দেখিলাম যে, সমস্ত বাড়ী যেন দিনের ন্যায় আলোকিত হইয়াছে। আমার প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, এখনও বেলা আছে। কিন্তু ঝির মুখে শুনিলাম অনেক রাত্রি হইয়াছে। প্রথমে ঘুমের ঘোর থাকায় আমি তত বুঝিতে পারি নাই, শেষে সব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীর মধ্যে অন্দর মহলে এখনও অনেক লোকজন খাইতেছে দেখিলাম এবং ঝির মুখে শুনিলাম যে বাটীর বাহিরেও ছোট লোক অনেক-খাইতেছে। যাহা হউক ঝি আমাকে কোলে করিয়া, বাহিরে পূজার দালানে লইয়া গিয়া মা'র নিকট নামাইয়া দিল। মা তখন গলায় কাপড় দিয়া, যোড়হস্তে প্রতিমার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি মা'কে দেখিয়াই দৌড়িয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিলাম, মা তখন আমাকে নিজ কোলে উঠাইয়া লইলেন। আমি তখন পূজার দালানের প্রতিমার শোভা দেখিতে লাগিলাম। পূজার দালানের প্রত্যেক ফোঁকরে বড় বড় ঝাড় রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে মোমের বাতি জ্বলিতেছে। প্রতিমার সম্মুখে দুইদিকে দুইটি বসা ঝাড়েও বাতি জ্বলিতেছে। প্রতিমার অঙ্গে ডাকের গহনা ও রংতা লাগান থাকায় এবং তাহাতে আলো পড়ায় সেগুলি চন্দ্র সূর্যের কিরণের ন্যায় জ্যোতিঃবিশিষ্ট বোধ হইতেছে এবং দেবীর মূর্ত্তিও খুব উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। ধূপ ধুনার ধূম উজ্জ্বলতার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় শোভার বৃদ্ধিই হইয়াছে এবং সুগন্ধও বহিতেছে। যাহা হউক আমি এইসব দেখিতেছি, ইতিমধ্যে আরতি শেষ হইয়া গেল। সকলেই প্রণাম করিতে লাগিল, আমিও মা'র সঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলাম। আরতির পর নানাপ্রকার ঘৃতপক্ক আহারীয় দ্রব্য এবং নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য যথা, সন্দেশ, রসগোল্লা এবং ক্ষীরেলা মেওয়ার নানাপ্রকার দ্রব্য এবং নানাপ্রকার ফল মূল ও দধি ক্ষীর রাবড়ি আদি ভোগের দ্রব্য সমূহ পূজার দালানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় উক্ত দ্রব্য সমুদয় দেবীকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। ভোগদ্রব্য উৎসর্গ হওয়ার পর মা পুরোহিত মহাশয়দিগকে কহিলেন, "আপনারা এইবার আহারাদি করুন, আপনাদের হবিষ্যের সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "রাত্রে আর আজ এখানে হবিষ্য করিব না, কারণ সমস্ত দিন উপবাসের পর আহার করিয়া এখান হইতে বাড়ী যাইতে ক্লেশ হওয়া সম্ভব। এ কারণে আরো কিছু জল টল খাইয়া যাইতেছি, বাড়ী গিয়া হবিষ্য

করিব।" এমন সময় বাবা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি বলিতেছেন?" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "গিন্নিমা আমাদিগকে এখানে হবিষ্য করিয়া যাইতে বলিতেছেন, তাহাতে মা'কে আমরা বলিতেছিলাম যে, উপবাসের পর আহার করিয়া যাইতে কষ্ট হইবে, এ কারণ সামান্য কিছু জল খাইয়া যাইতে চাহিতেছিলাম, আর না হয় আমাদের সঙ্গে কিছু জলখাবারের দ্রব্য দিতে পারেন। বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে কি? তাহা হইবে না, আমরা স্ত্রীপুরুষ এখনও কেহ জল স্পর্শও করি নাই, বাড়ীতে এখন আর কেহ অভুক্ত নাই, সকলেরই আহারাদি হইয়া গিয়াছে। আমি অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, বাড়ীতে বা বাহিরের কোনও লোক আর অভুক্ত নাই, কেবল আপনারা মাত্র আছেন, আপনাদিগকে আহার করাইয়া তাহার পর আমরা আহার করিব। আপনারা এখানেই হবিষ্য করুন, তাহার পর আমি গাড়ী করিয়া আপনাদিগকে পাঠাইয়া দিব এবং বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য মিষ্টান্নাদি আপনাদিগের সঙ্গে দিব।"

এই কথা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় বিশেষ আনন্দের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে"। বিশেষতঃ বাটী যাইবার সময় বাবা গাড়ী আনাইয়া দিবেন এবং তাঁহাদের বাটীস্থ লোকজনের জন্য মিষ্টান্নাদি দিবেন এই কথা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় সন্তোষ হইয়া মা'কে বলিলেন, "তবে আমাদের হবিষ্যের আয়োজন করিয়া দিন।" মা বলিলেন, "আমি সব আয়োজন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, এমন কি পিতলের হাঁড়িতে জল চড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছি এবং ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে, আরতির ঢাক ঢোলের বাদ্য বন্ধ হইলেই হাঁড়িতে চাউল ও অপর উপকরণ সব যেন দেওয়া হয়। এতক্ষণ বোধ হয় সব হইয়া গিয়াছে, আপনারা বাড়ীর মধ্যে চলুন।" ইহা বলিয়া মা বাড়ীর মধ্যে গেলেন। বাবা পুরোহিত মহাশয়দিগকে এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। তথায় আসিয়া পুরোহিত মহাশয়দের ভোজনের স্থান কোথায় হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, একজন বলিল, "উপরের দালানে।" ইহা শুনিয়া বাবা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া উপরে দালানে উঠিয়াই দেখিলেন যে, পুরোহিত মহাশয়দের ভোজনের সমস্ত আয়োজন করিয়া আমার মা তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। মা পুরোহিত মহাশয়দের পদ প্রক্ষালনের জন্য জল ও নূতন গামছা আনিয়া স্বয়ং তাঁহাদের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া নূতন গামছা দ্বারা তাঁহাদের পদদ্বয় মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহারা আচমন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। বাবা তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দুই একটা মিষ্ট কথা বলিতেছেন, মা একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

বাবা বলিলেন, "আপনাদের সমূহ কষ্ট গিয়াছে; সমস্ত দিন উপবাস করিয়া তাহার পর পূজার কার্য্যাদিতে কতই যে কষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনারা উপবাস করিয়া পূজা করেন, তবে আপনারাই বলিয়া থাকেন উপবাস করিয়া পূজা করা উচিত, সুতরাং আমি আর বেশী কি বলিতে পারি। আমার বিবেচনায় 'উপবাস' শব্দের অর্থ নিরম্বু বা অনাহারে থাকা অবস্থা (যাহা আপনারা করিয়া থাকেন)

নহে, কারণ অনাহারে থাকার জন্য কত ক্লেশ আপনারা পাইয়া থাকেন।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তা বাবু, যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, ক্লেশ হয় বৈকি, ক্লেশ যে কিছু হয় না তাহা বলিতে পারি না। তবে বাবু কি জানেন অভ্যাসে সবই সহ্য হইয়া যায়, আর যজমানের মঙ্গলের জন্য সবই সহ্য করিতে হয়।" পুরোহিত মহাশয় স্বগত কিন্তু বলিতেছেন "পাওনা গণ্ডা ভাল হ'লে তত কষ্ট হয় না, পাওনার মুখে গাওনা" এবং প্রকাশ্যে বাবাকে বলিলেন, "তা বাবু আপনার এখানে আমাদের কোনও কষ্ট হয় না।" অদূরে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়ায় পুরোহিত মহাশয় মা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর ঐ মা লক্ষ্মীর জন্য আমাদের কোনও কষ্ট নাই, ওঁর যত্নে ও ভক্তিতে আমাদের সকল কষ্ট দূর হইয়া যায়; বাবু, আপনাদের সম্মুখে আর অধিক কি বলিব, সকল স্থানেই আপনাদের গুণ কীর্তন করিয়া থাকি, আপনার এখানে যেমনটি হইয়া থাকে এমনটি আর কোথাও দেখিতে পাই না। বাবা বলিলেন "আমি তাহা বলিতেছি না; আমার বিবেচনায় উপবাস করিয়া অনর্থক কষ্ট পাবার দরকার কি? 'উপবাস' শব্দের অর্থ 'অনাহার' নহে। 'উপবাস' শব্দের অর্থ, উপ-সমীপে, বস্—বাস করা অর্থাৎ ভগবৎ সমীপস্থ হইয়া থাকার নাম 'উপবাস'। ধাতু ঘটিত অর্থ করিলে 'উপবাস' শব্দের অর্থ 'অনাহার' হয় না, ওটা ব্যবহারিক অর্থ মাত্র।" এই কথার পর বাবা একটি শ্লোক বলিলেন—

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাস গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীর বিশোষণং।।

বাবা শ্লোকটি বলিলে পর, পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তাই নাকি? আর একবার শ্লোকটি বলুন ত' শুনি।" তাঁহার কথা শুনিয়া বাবা আর একবার শ্লোকটি বলিলেন। শ্লোকটি পুনরায় শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তাই ত', ইহা ভাল শ্লোক দেখছি, তাহা হইলে আমরাই বা কেন উপবাস করিয়া শুকাইয়া করি, আর ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের বিধবারাই বা কেন একাদশীতে অনাহারে কষ্ট পায়? যাহা হউক এই শ্লোকটি অন্য সময়ে আপনার নিকট হইতে লিখিয়া লইব।" এই সকল কথার পর পুরোহিত মহাশয়গণ দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ ও ক্ষীরের বরফি প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন, "আর না যথেষ্ট হইয়াছে, এইবার আচমন করি।" এই কথা বলিয়া কতকটা পানীয় জল পান করিয়া আচমন করিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। নিকটেই আঁচাইবার জল ছিল তদ্দ্বারা আঁচাইয়া গামছা দ্বারা হাত মুখ মুছিতেছেন এমন সময় মা একটা বাটীতে করিয়া কতকটা ছাড়ান হরিতকী আনিয়া পুরোহিত মহাশয়দের সম্মুখে রাখিলেন। হরিতকী পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা বাবাকে বলিলেন, "এই দেখুন বাবু, মা লক্ষ্মী আমাদের জন্য হরিতকীটি পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিয়াছেন, সাধে কি বলিতেছিলাম 'এমনটি আর কোথাও হয় না।' যাহা হউক নারায়ণ সর্ব বিষয় মঙ্গল

করুন, আর কি বলিব মা, আজ আমরা চলিলাম।" বাবাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "এইবার আপনি আহার করুন, আপনার আহার না হইলে, মা লক্ষ্মীরও আহার হইবে না, আর দেরী করিবেন না, হাত ও মুখ ধুইয়া আহার করুন।" এই সময় দুই জন লোক তিনটা খাবারের চাঙ্গারা আনিয়া বাবার সম্মুখে রাখিয়া দিল। বাবা ঐ চাঙ্গারা সকল একবার খুলিয়া দেখিলেন যে, প্রত্যেক চাঙ্গারার মধ্যে চার পাঁচ জনের যথেষ্ট হইতে পারে এমন ভাবে লুচি-কচুরী ও মিষ্টান্নাদি রহিয়াছে। তৎপরে বাবা পুরোহিত মহাশয়দিগকে বলিলেন, "আপনারা প্রত্যেকে এক একটি খাবারের চাঙ্গারা লইয়া যান।" বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত মহাশয়েরা উহা লইলেন। যাহারা খাবার আনিয়াছিল বাবা তাহাদিগকে গাড়ী আনা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "গাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।" তৎপরে বাবা দপ্তরখানা হইতে পুরোহিত মহাশয়দিগকে গাড়ী ভাড়া দিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং পুরোহিত মহাশয়গণ যাইতে উদ্যত হইলে বাবা বলিলেন' "আগামী কল্য চারি দণ্ডের মধ্যে পূজা আরম্ভ, ইহা বুঝিয়া কাল আসিবেন।" তাঁহারা বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা ঠিক সময় আসিব, উদ্যোগ যেন সব ঠিক থাকে।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা নীচে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর বাবা হাত মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ওদিকে মা'ও ঠিক ছিলেন, বাবার হাত মুখ ধুইবার সময়ের মধ্যে আহারের জায়গা সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন। বাবা হাত মুখ ধুইয়া আহার করিতে বসিলেন এবং নিরামিষ ব্যঞ্জনাদি সহ গরম গরম ভাত খাইলেন মিষ্টান্নাদি কিছুই খাইলেন না। আহার সমাপনান্তে আঁচাইয়া পান খাইতে খাইতে মা'কে বলিলেন "তুমিও এইবার আহার কর, আমি বাহিরে যাই। দিনমানে যাঁহারা আসিতে পারেন নাই তাঁহারা রাত্রিতে আহার করিতে আসিবেন, সুতরাং আমাকে বাহিরে গিয়া তাঁহাদের দেখাশুনা করিতে হইবে, তাঁহারাও বোধ হয় এতক্ষণ সকলে বাহিরে আসিয়াছেন।" ইহা বলিয়া বাবা বাহিরে গেলেন। তাহার পর আমার মা, পিসিমাদিগকে এবং জ্ঞাতিদের ভিতর যাঁহার সম্বন্ধে আমার খুড়ী জেঠাই তাঁহাদিগকে আহারে বসাইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া, নিজে ডাকিয়া আনিলেন। ইঁহারা ব্যতীত আর কেহই এখন আমাদের বাটীতে অভুক্ত নাই। ঝি, চাকর, রসুয়ে ব্রাহ্মণী (ইহারা প্রতিবেশী ভদ্র মহিলা) দিবাভাগে যাঁহারা পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পর্য্যন্ত আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আমার মা, পিসিমা, খুড়ি মা, জেঠাই মা প্রভৃতি সম্পর্কে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আসিয়া আহারে বসাইয়া দিলেন। তাঁহারা আমার মা'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বউ! তুমিও আহার করিতে বস, তুমি না বসিলে আমরা বসিব না।" মা বলিলেন, "আপনারা বসুন, আমি তারপর বসিতেছি।" তাঁহারা সে কথা না শুনায়, অগত্যা আমার মা'কে বসিতে হইল। বাবা যে পাতে খাইয়াছিলেন, সেই পাতখানা মা তথায় উঠাইয়া আনিয়া, তাঁহাদের নিকটেই একস্থানে রাখিলেন এবং

তাঁহারা আহার করিতে বসিলে পর, মা'ও সেই পাতে আহার করিতে বসিলেন। দুইজন স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের আহারাদি সমাপন হইলে, সকলেই হাত মুখ ধুইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় মা তাঁহাদিগকে বলিলেন "আপনারা একটু সকাল সকাল আজ শয়ন করুন, কারণ কাল সকাল সকাল উঠিয়া মহাষ্টমী পূজার আয়োজন করিতে হইবে এবং মহাষ্টমী পূজার পর সন্ধিপূজা বেলা ২টার সময় হইবে, উনি (কর্তা) বলিয়া গেলেন। সুতরাং আপনারা যাইয়া বিশ্রাম করুন।" তাহার পর সকলে আপন আপন শয়ন ঘরে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর মা পূজার জিনিষের ভাণ্ডার ঘর দেখিতে গেলেন; আমি মা'র সঙ্গেই আছি। আজ আমার এখনও নিদ্রা নাই, কারণ অল্পক্ষণ হইল নিদ্রা হইতে উঠিয়াছি। তাহার পর মা পূজার ভাণ্ডারে সমস্ত জিনিষপত্র ঠিক আছে দেখিয়া, যেখানে তরকারী কোটা হইতেছে তথায় যাইলেন এবং দেখিলেন যে, ৩০/৩৫ জন স্ত্রীলোক নানারকম কাঁচা তরকারী (মহাষ্টমীর জন্য) কুটিতেছে। আমার মা'ও একখানা বঁটি লইয়া, তাঁহাদের সঙ্গে কুটনা (আনাজ কাঁচা তরকারী) কুটিতে লাগিলেন ও নানারকম গল্প করিতে লাগিলেন। মা'র নিকট কতকগুলি সাজা পান ছিল, তাহা সকলকে খাইতে দিলেন। তাহারা আনন্দের সহিত পান খাইতে খাইতে কাঁচা তরকারী যথা—আলু, পটল, লাউ, কুমড়া, বেগুন, উচ্ছে, ডেঙ্গো ডাঁটা, থোড়, মোচা, শাক, কাঁচাকলা, মূলা, ঢেঁড়স ইত্যাদি আনাজ সকল স্তূপাকারভাবে কুটিতে লাগিলেন, এবং যে যে তরকারী রান্না হইবে, সেই সেই তরকারীতে কি কি আনাজ দেওয়া হইবে, তাহা ঠিক করিয়া পৃথক পৃথকভাবে সব রাখিতে লাগিলেন। সকলের হাতও যেরূপ চলিতেছে, মুখও তদ্রূপ চলিতেছে। তরকারী কোটার স্থানটা যেন খুকিদের বৈঠকখানা হইয়াছে, এ স্থানে বড় বড় খোকাদের সমাগম মোটেই নাই, খোকাদের মধ্যে কেবল আমিই একমাত্র এখানে আছি। কিন্তু আমি ছোট খোকা থাকায়, আমার জন্য তাঁহাদের হাস্যামোদের কোনও বাধা হইতেছে না। সকলেই আনন্দভরে হাত মুখ দুইই সমানভাবে চালাইতেছেন। কুটনা কোটার সময় হাত মুখ দুই-ই সমানভাবে চালান কঠিন; কারণ শাণিত ক্ষুরের মত ধারাল বঁটিতে কুটনা কোটা চলিতেছে এবং পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া নানারকম কথাবার্তাও চলিতেছে, অথচ কাহারও হাতের অঙ্গুলি কাটিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। অভ্যাস একটা স্বতন্ত্র বিষয়, অভ্যাসে হয়না এমন কার্য্যই নাই। এই অভ্যাসপটুতা যাঁহার সর্ববিষয়ে সমানভাবে আছে বা থাকে, তিনি খোকাদের ভিতর দেব পদবাচ্য, এবং খুকীদের ভিতর হইলে দেবী পদবাচ্য। নচেৎ বড় বড় খোকারা বা খুকিরা আহ্লাদের পুতুলের মত হইলে, তাহারা কোন কার্য্যেরই হয় না, কেবল সংসারের (জগতের) কণ্টক স্বরূপই হইয়া থাকে এবং তাহাদের দ্বারা তাহাদের এবং সাধারণের অনিষ্টই হইয়া থাকে। এ কারণ বৃথা সময়

নষ্ট না করিয়া, কোনও কার্য্য না জানিলেও, সমস্ত কার্য্যের অভ্যাসে রত থাকা নিতান্ত কর্তব্য। কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া, কুড়ের মত বসিয়া সময় নষ্ট করিলে, আপন আপন মস্তকের মধ্যে নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তি উদয় হইয়া মস্তিষ্ক ভূতের আবাসভূমি হইয়া উঠে এবং জীব আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়া থাকে। আমি মা'র কোলে বসিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে থাকায়, খুকিদের কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া উক্ত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় মা বলিলেন, "খোকা তোমার কি ঘুম পাইয়াছে?" আমি বলিলাম, "না মা, আমার ঘুম পায় নাই, তবে কুটনা কোটা দেখিতে দেখিতে ঘুমের মত আসিয়াছিল, কিন্তু এখন আর নাই।"

তাহার পর আমি মা'র কোল হইতে উঠিয়া, বেড়াইতে বেড়াইতে তরকারী কোটা দেখিতে লাগিলাম। যাঁহারা তরকারী কুটিতেছিলেন, মা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে "পূজার ফলও কিছু কিছু অদ্যই ছাড়াইয়া রাখিতে হইবে, কারণ কল্য চারিদণ্ডের মধ্যে পূজা আরম্ভ হইবে।" মা'র কথার উত্তরে জনৈক স্ত্রীলোক কহিলেন, "তবে ভাই তুমি চারি পাঁচজনকে এখান হইতে লইয়া গিয়া ফল ছাড়াইবার কার্য্য দাও গে, এখানে আমরা অনেক আছি এবং এখানকার কার্য্যও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।" মা তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে চারি পাঁচজনকে সঙ্গে লইয়া, ফলের ভাণ্ডার হইতে ফলমূল বাহির করিয়া যে সব ফলমূল ছাড়াইতে বিলম্ব হয় তাহাই ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন সকলে আক, পানিফল, কেশুর, শশা, শাঁকআলু ইত্যাদি ফলমূল ছাড়াইয়া আস্তভাবে অর্থাৎ টুকরা টুকরা না করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে লাগিল। আকগুলিকে তিন চারি টুকরা করিয়া উহার ছিলকা উঠাইয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হইল। এই সময় মেয়েদের মধ্য হইতে একজন আমার মা'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খোকার মা, তুমি না হয় অপর কাজ যাহা বাকি আছে সেইগুলি দেখ গে।" এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "আচ্ছা ভাই সেই ভাল; তবে আমি রান্নাঘরে যাই, দেখিগে বাটনা বাটা হইল কিনা এবং রান্নাঘর পরিষ্কার ও বাসন সব মাজা হইয়াছে কিনা। রাত্রিও অনেক হইয়াছে, ইহার পর একটু একটু বিশ্রাম ত' সকলকেই করিতে হইবে। বাহিরের লোকজনও সব রাত্রে খাইয়াছেন, এক্ষণে তোমাদিগকে কিছু কিছু খাওয়াইয়া দিব।" এই বলিয়া আমাকে কোলে করিয়া মা রান্নাঘরে চলিলেন।

রান্নাঘরের সম্মুখে দালানে গিয়া দেখিলেন, বাটনা বাটা সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্যকার জন্য কি কি বাটনা কতটা করিয়া বাটা হইয়াছে তাহা দেখিয়া বুঝিলেন যে, যে সমস্ত মসলা বাটিতে দিয়া গিয়াছিলেন তাহা সমস্তই বাটা হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সরিষা, জিরা, মরিচ, লঙ্কা, হরিদ্রা, আস্ত ধনে প্রভৃতি সবই বাটা হইয়া গিয়াছে, কেবল খারাপ হইবার ভয়ে গরম মসলা বাটিতে দেন নাই, তাহা আগামী কল্য বাটিয়া লইতে

হইবে, কারণ গরম মসলা বাসী চলে না। মসলা বাটা শেষ হইয়াছে দেখিয়া, মা রান্নাঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, রান্নাঘর সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। উচ্ছিষ্ট বাসন যাহা ছিল তাহা সব মাজা ঘসা হইয়া গিয়াছে। মাজা বাসনগুলি দেখিয়া মা আমাদের ঝি গিন্নিকে বলিলেন যে, "মাজা বাসনগুলি সব আর একবার জল দিয়া ধোয়াইয়া ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখাইয়া দিও।" এই ঝি আমার পিতামহের আমল হইতে আমাদের বাটীতে থাকায় ইহাকে "ঝি গিন্নি' কহা হইয়া থাকে। আমাদের সংসারে ইহার আধিপত্যও খুব আছে; কোনও কার্য্য অন্যায় হইলে এই ঝি গিন্নি সময়ে সময়ে আমার মাকে বা বাবাকে বকিয়া থাকে। মা ও বাবা ইহার কথার উপর কোন কথা কহেন না, এ কারণ ইহাকে সকলে "ঝি গিন্নি' বলিয়া ডাকিয়া থাকে। মা'র কথা শুনিয়া ঝি গিন্নি বলিলেন, "ওসব আমি ঠিক করিয়া রাখিব তুমি যাও। খোকাকে এত রাত্রি পর্য্যন্ত হিম লাগিয়ে কোলে করে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন? খোকাকে ঘুম পাড়ায়ে কি সব দেখাশুনা হয় না, হিম লেগে শেষে কি আবার খোকার একটা অসুখ বিসুখ করবে?" মা বলিলেন, "খোকা আজ বৈকালে ঘুমাইয়াছিল, তাই আজ আর শুইতে চাহিতেছে না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে।" এই কথার পর মা সেখান হইতে যেখানে তরকারী কোটা হইতেছিল তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, সব তরকারী কোটা বাছা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সেখানে ছিলেন তাঁহারা আমার মা'র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। মা আসিবামাত্র তাঁহারা বলিলেন, "খোকার মা, আমরা ভাই তোমার কার্য্য সব শেষ করিয়া রাখিয়াছি, এখন ভাই আমাদের মজুরী (পারিশ্রমিক) দাও।" মা বলিলেন, "আমি আর ভাই তোমাদের মজুরী (পারিশ্রমিক) কি দিব, মজুরীর বদলে আমিই চরিকালের জন্য তোমাদের মজুরণী হইয়া থাকিব।"

তখন তাঁহারা সকলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও মা, তাও কি হয় গা, ও কথা কি বলতে আছে; তবে তুমি বড় বনেদি ঘরের মেয়ে, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলিয়াছ, তোমার সামনে আর কি বলিব, তোমার মত গিন্নি সকল ঘরে যদি থাকে বা হয় তবে সংসার উজ্জ্বল হয়। আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাই গিন্নিরা প্রায় ঠেকারে, কথাই কহেন না। নিজেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকেন, কেহ এলে গেলে ঠেকারে বড় মানসি চালে ভাল কথাই কন না। ওই ও পাড়ার রায়েদের বড় গিন্নিকে দেখিয়াছ ত', ভাই মুখের কথার ছটাই বা কত! আবার কথা যা' বলে, তা'র ভিতর আবার দু'টো চারটে ইংরাজীর বুকনী দেয়, মধ্যে মধ্যে দু'টো পাঁচটা ইংরাজী কথাও বলে, কেবল ভাই কথা সার, 'কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে'; শাশুড়ির সঙ্গে তত' বনিবনাও নাই, তারপর জা, ননদকে দাসীর ন্যায় মনে মনে দেখিয়া থাকে, কেবল নিজের বাপের বাড়ীর সুখ্যাতি আর মুখে ধরে না; বাপ যেন কত বড় জমিদার; পোড়া কপাল আর কি! তবুও যদি বাপের জমিদারী থাকত তা হলে বোধ হয় বড়

গিন্নির মাটিতে পা পড়ত না।" এমন সময় তাঁহাদের ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় গিন্নির বাপ করেন কি?" যিনি রায় গিন্নির কথা বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "বাপ আবার কর্বে কি, পরের গোলামি করে; তাতেই ত' বলছি যে জমিদারের মেয়ে হ'লে মাটিতে পা প'ড়ত না। তবে ভাই, আজকাল জমিদার গিন্নিরাও প্রায় ঠেকারে হয়ে পড়েছেন; তাহার কারণ জমিদাররাও সব ভিতর ভিতর ফোপরা হওয়ায় হাড়সার হয়ে পড়েছেন; সুতরাং বাইরে মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্য, বাইরে চটকসার হয়ে পড়ায় গিন্নিরা বাহিরে মান রাখতে গিয়ে ঠেকারের ভাব দেখান, তবে বনেদি ঘরের মেয়েদের ভিতর প্রায় তাহা নাই। রায় গিন্নি বলে থাকেন 'আমার সব দেবরগুলা বাঁদরের মত, আহা আমার ভাইদের দেখলে লোকের চক্ষু জুড়ায়, নিজের ভাই বোনের সুখ্যাতি করতে করতে যেন লাল পড়ে; রায় গিন্নির যেরূপ গতিক, তাহাতে রায় মহাশয়দের বড়বাবু নাকি বড় শক্ত লোক তাই এখনও ভাইদের পৃথক করিয়া দেন নাই, তাহা না হইলে এতদিন কোন কালে দেওরদের পৃথক করিয়া দিত, কেবল বাবুর গুণেই এখনও সব এক অন্নভুক্ত আছে, এক অন্নভুক্ত থাকলেও রায়গিন্নি দিনরাত শাশুড়ী ননদের সঙ্গে বা জায়েদের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করিয়া ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করে; রায় ম'শায়ের বাড়ীতে ঘোর অশান্তি, রায় ম'শায় তিলমাত্রও সুখী হইতে পারেন না। আজকাল প্রায় সব ঘরেই এই রকম, কার কথা আর বলব, এটা আমাদের জাতি মাত্রেরই কলঙ্ক। আজকালকার মেয়েদের কল্যাণে আর আমাদের মুখ দেখবার যো নাই, কারণ আমরাও ত' ভাই মেয়েমানুষ; এখনকার মেয়েরা আর একসঙ্গে একান্নভুক্ত হইয়া গুরুজনের কথামত কেহই আর ঘর করতে চায় না, আমাদের মেয়ে জাতির মধ্যে একটা কি কম লজ্জার কথা।'

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই মা বলিলেন, "রাত্রি ঢের হইয়াছে আর পরের কথার চর্চ্চা করিবার আবশ্যক করে না, আপনার আপনার পায়ের ধূলা ভাই সব মাথায় দাও, ওটা প্রায় আমাদের জাতির স্বধর্ম হয়ে পড়েছে, এ সমস্তই আধুনিক শিক্ষার ফল; আপনার আপনার পিতামাতাকে দেখিয়া যেমন সব শিখিয়া থাকে, শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াও সেইরূপ করিয়া থাকে। পিতামাতার দোষেই ভাই, মেয়েই কি আর ছেলেই কি সব দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে।" মা এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যেখানে ফলমূল ছাড়ান হইতেছিল, তথায় গিয়া দেখিলেন, তাঁহারাও আপন আপন কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা যাইতেই তাঁহারা উঠিয়া আমার মা'কে বলিলেন, "খোকার মা, আমরা সকলে ফলমূল যাহা তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, তাহা সব ঠিক করিয়া ছাড়াইয়া দিয়াছি।" মা তাহাদের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাই তোমাদিগকে কত কষ্ট দিতেছি, কিছু মনে করিও না। ইহা বলিয়া মা ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজহস্তে মটর, বরবটি, আস্ত মুগ, সাদা ছোলা, ছোলা, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস

এইগুলি সব ভিজাইয়া দিয়া বলিলেন, এইগুলি সব কল্য নৈবেদ্যের খুরিতে সাজাইয়া দিতে হইবে।” তাঁহারা বলিলেন, “খোকার মা, রাত্রি প্রায় ১২টা বাজে, খোকা এখনও ঘুমায় নাই, রাত্রে হিম লাগিয়া ও রাত্রি জাগিয়া খোকার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব ভাই তুমি খোকাকে লইয়া শয়ন করগে, আর এদিকেও সব অদ্যকার মত শেষ হইয়াছে, আর কোনও কার্য্যই বাকী নাই, আমরাও ভাই এখন যাই, শয়ন করিগে।” মা বলিলেন “তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাই করিতেছি, তবে ভাই তোমাদের এখনও কিছু খাওয়া হয় নাই, চল, তোমাদিগকে খাওয়াইয়া দিই।” মা’র কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, “না ভাই, আজ রাত্রে আর আমরা কিছুই খাব না, কারণ অবেলায় আহার করায় ক্ষুধার নাম মাত্র নাই, এখন কিছু খাইলে পরিপাক হইবে না, আবার ভোর রাত্রে উঠিতে হইবে। সুতরাং অদ্য রাত্রে আর কিছুই আহার করা ঠিক নহে।” মা বলিলেন, “ওমা তাও কি হয় গা, না হয় সামান্য একটু আধটু জল খাওয়ার মতও ত’ খাওয়া চাই, তা আমি কিছু জল না খাওয়াইয়া ছাড়িব না।” অবশেষে তাহাই হইল। মা কিছু জল খাওয়াইয়া দিয়া শয়নঘরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে শয়ন করিতে বলিলেন। শয্যা সব প্রস্তুত ছিল। তাঁহারা বলিলেন, “আমরা এখন শয়ন করিতেছি, তুমি ভাই যাও, খোকাকে শয়ন করাও গে।” “তবে ভাই আমি খোকাকে লইয়া শয়ন করিতে যাই”, এই কথা বলিয়া মা আমাকে লইয়া উপরে আসিলেন এবং আমাকে কোলে করিয়া শয্যাতে শয়ন করিলেন। আমিও মা’র কোলে শয়ন করিয়া মাই খাইতে লাগিলাম। কখনও বা আমার নিদ্রার আবেশ আসিতেছে এবং ক্ষণিক পরে উহা যেন আবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মত হইতেছে। মা কিন্তু আজ অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আমার অদ্য ভাল ঘুম হইতেছে না। কারণ অদ্য আমি যথেষ্ট পরিমাণে দিবানিদ্রা দিয়াছি, সেই জন্য আমার ভাল ঘুম হইতেছে না, মধ্যে মধ্যে ঘুম আসিতেছে, আবার যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তখন অগ্রেই দেখিতেছি যে, মা আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন কি না। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবং মাকে অকাতরে নিদ্রিত দেখিয়া, আমার মাই খাইবার আজ বেশ সুবিধাই হইয়াছে। আমি শয়ন করিয়া মাই খাইতেছি ও এক একবার ঘরের ভিতর চারিদিকে দেখিতেছি, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, সুতরাং ঘরের ভিতর সকল জিনিষই দেখা যাইতেছে। বাবাও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। বাবা যে কখন আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ যে সময় আমার নিদ্রার আবেশ আসিতেছিল, সেইরূপ কোন সময়ে আসিয়া তিনি শয়ন করিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক আজ আমার নিদ্রা ভাল হইতেছে না। আমি কখনও বা মাই খাইতেছি, কখনও বা ঘরের মধ্যস্থিত জিনিষপত্র দেখিতেছি, কখনও বা ঘরের মধ্যে যে আলো

জ্বলিতেছে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতেছি। আলোটা প্রথমরাত্রে যেরূপ উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেরূপ বোধ হইতেছে না; আলো কোমলভাব ধারণ করিয়া যেন ঈষৎ ম্লানভাবে রজনীর অবসান বার্তা জ্ঞাপন করিতেছে। আমি খোকা, প্রত্যহ রাত্রে এই সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, ঘরে যে আলো জ্বলিয়া থাকে তাহা দেখিয়া আলোর অবস্থা সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। ঘরের দক্ষিণদিকে ফুলের বাগানে নানাজাতীয় ফুলগাছে পুষ্প সকল ফুটিয়া আমাদের শয়ন ঘর ও বাটির প্রায় সকল স্থানই যেমন প্রত্যহ সুগন্ধে আমোদিত করিয়া থাকে, ঘরের দরজা খোলা থাকায় আজও সেইরূপ করিতেছে। আমি অবশ্য খোকা, সকল ফুলের নাম জানি না, তত্রাচ দুই একটা ফুলের নাম শুনিয়া ও দেখিয়া শিখিয়াছি। অদ্য আমার বোধ হইতেছে যেন শিউলি ফুল (শেফালিকা) ফুটিয়াছে, প্রভাতী বায়ু তাহার গন্ধ বহন করিয়া আমাদের ঘরে ও বাটীর সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতেছে। আমার অবস্থা এখন এরূপ যে, আমি নিদ্রিতও নহি এবং বেশ জাগিয়া আছি তাহাও নহে; তবে ঘরের আলোর বেশ স্নিগ্ধভাব থাকায় এবং প্রভাতী বায়ু শিউলি ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহন করিয়া মৃদুমন্দভাবে আমার গাত্র স্পর্শ করায়, পুষ্পের সৌরভে আমার অন্তরে কেমন একরকম স্নিগ্ধভাব আসিয়া আমার প্রাণ ও মনকে পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ করিয়া দিল। কেন যে এমন হইল, তাহা আমি জানি না, তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বুঝি যে রাত্রে বিছানার গরম জন্য শরীর গরম ছিল, তাহার পর স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে লাগায়, বায়ুর স্পর্শসুখ জন্য এবং সুগন্ধ গ্রহণ করার জন্য ক্ষণিক স্নিগ্ধভাব আসিয়া থাকিতে পারে। ইহার অধিক আর আমার কোনও জ্ঞান নাই, থাকাও অসম্ভব, কারণ আমি খোকা। আমি ত' ছোট খোকা, আমার ত' না জানাই সম্ভব, বড় বড় ওজনের খোকারাও জানেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক আমার উপরোক্ত না নিদ্রা না জাগ্রত ভাব আসায় আমার পূর্ব ভাবের আভাস আসিয়া পড়িল এবং মনে মনে নানা বিষয়ের বিচার আপনা আপনি হইতে লাগিল এবং কথা কহার মত ভাবে ভিতরে ভিতরে কথায় মীমাংসা হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ গন্ধ সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন হইল যে, গন্ধ গ্রহণ করে কে এবং কোন শক্তির দ্বারাই বা গন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে? এই সম্বন্ধেই আমার মনে মনে আপনা আপনি বিচার চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ আমি অর্থাৎ আমি এই শব্দ বা দেহদ্বারা যে গন্ধ গ্রহণ করিতেছি ইহা বলা আমার ঠিক নহে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কারণ আমার দেহ যদি গন্ধ গ্রহণে সক্ষম হয়, তাহা হইলে একটা মৃত শরীরে গন্ধ বা অপর ইন্দ্রিয় সুখানুভব হয় না কেন? মৃত শরীরের ইন্দ্রিয়াধার সমস্তই বর্তমান থাকে, অথচ কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয়েরই সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না। এ স্থলে আমি বলিতে পারি, মনই সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকে, মন ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, মনই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। মৃত শরীরে মনের ও বুদ্ধির

অস্তিত্ব না থাকায়, কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অনুভব হয় না। মন বা বুদ্ধির কোনও বিষয় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই; উহারা মাত্র সুখ দুঃখভোগী। মৃতশরীরে উহাদের অস্তিত্ব নাই, সুতরাং সুখ দুঃখ বোধ করিবে কে? জীবিত শরীরেও উহারা কোনও বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। গ্রহণ করিবার শক্তি উহাদের নাই; উহারা প্রাণশক্তির শক্তিতে বলীয়ান হইয়া প্রাণশক্তিকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া অর্থাৎ তাহাতে লক্ষ্য করিতে না দিয়া আপনা আপনি সকলে অকর্তা হইয়াও কর্তা সজিয়া কর্তৃত্বাভিমানে কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন গন্ধ গ্রহণ করাকে মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে না। জীবশরীরে প্রাণশক্তির প্রবেশকালে গন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবের নিশ্বাস গ্রহণকালে যে যে ইন্দ্রিয়ের যে সকল বিষয়, সেই সেই বিষয়গুলি বাহু নামক বায়ু ইন্দ্রিয়াধার হইতে বহন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে মাতৃকাস্থানে উপনীত করিতে বিষয়গুলি বুদ্ধি কর্তৃক বিচারিত হইয়া তাহার পর মনের গোচর হইয়া থাকে এবং জীব তখন ভালমন্দ সমস্ত বিষয় অনুভব করিয়া থাকে। গন্ধগ্রহণ কার্য্য ও উপরোক্তভাবে হইয়া থাকে। উপরে মাতৃকাস্থান বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা হইল, উহাকে ব্রহ্মযোনি বলে এবং ডাক্তারী মতে উহাকে মেডুলা অব্ লংগেটা (medula of longata) বলে। যে সময় নিশ্বাস ফেলা যায়, যে সময় কোনও গন্ধ গ্রহণ হয় না; ইহাতে জীবের লক্ষ্য না থাকায় জীব মনে করিয়া থাকে যে মনই গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, এ কারণ জীব মনকেই প্রধান বলিয়া বিশ্বাস করে; বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। প্রাণশক্তি দেবীই—রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সমস্ত বিষয় গ্রহণের মুখ্যকারণ এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গৌণ কারণ মাত্র। প্রাণশক্তির অভাবে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোনও তত্ত্বের কোনও ক্ষমতা থাকে না। জীবভাবে উক্ত তত্ত্বসকল প্রাণশক্তির প্রাধান্য আচ্ছাদন রাখিয়া, আপনারাই স্ব স্ব প্রধান হইয়া জীবভাবকে স্থায়ী করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক যিনি কর্তা তিনি অকর্তাভাবে কামনা রহিত হইয়া আপনার কর্ম করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার কর্ম, যাহা জীবদেহে দিবারাত্রে সমান ভাবে চলিয়া জীবের পোষণ হইতেছে; তাঁহার অভাবে জীবের বা মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সকল সুখের অবসান হইয়া যাইবে। জীব ইহা জানিয়াও মোহবশতঃ বর্তমান মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের ছলনায় মোহিত হইয়া, ইন্দ্রিয় বিষয় চরিতার্থ করাকেই একমাত্র সুখ মনে করিয়া, আশু সুখবোধে পরিণামে জ্বালার উপর জ্বালা পাইতেছে। বস্তুতঃ গ্রহণ, কথন, স্পর্শন, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কার্য্যসমূহ প্রাণশক্তির অস্তিত্বেই হইয়া থাকে, নচেৎ কাহারও কিছুই করিবার শক্তি নাই। গন্ধ গ্রহণাদি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াধারের কোন ক্ষমতা নাই, গন্ধবাহ বায়ু শক্তির প্রবাহ দ্বারায় গন্ধ বোধ হইয়া থাকে, পরে বাহ নামক বায়ু কিছুক্ষণ ঐ বোধকে চালায় এবং উহাতে নিযুক্ত থাকে, পরে ঐ প্রবাহ কিছুক্ষণ থাকায় ভোগিকান্ত নামক বায়ুর গতি দ্বারায় ঐ গন্ধের পুনঃ প্রাপ্তির কামনা হয়, যেমন সুগন্ধ পুষ্পের একবার গন্ধ লইলে আবার ঐ গন্ধ লইবার ইচ্ছা হয়। সেইরূপ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এক এক বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া পূর্বোক্ত ভাবে মনের গ্রহণ হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় আমার মনে হইতেছে, এমন সময় কে একজন লোক আসিয়া আমার মা'কে ডাকিতে লাগিল। সেই শব্দে আমার মানসিক আন্দোলন লোপ পাইয়া, আমি জাগিয়া উঠিলাম এবং মাকে ডাকিয়া বলিলাম, "মা বাহিরে কে ডাকিতেছে।" আমার কথায় মা উঠিয়া বলিলেন, "আমি যাইতেছি" এবং এই কথা বলিয়া বিছানাতেই ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাবাও উঠিয়াছেন, দেখিলাম তিনি আপন শয্যাতে উঠিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া, আমিও মা'র সঙ্গে উঠিয়া বাহিরে যাইলাম। বলা বাহুল্য, মা যেমন প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়াই ঠাকুর প্রণাম করিয়া তাহার পর বিছানা হইতে নামেন, আমিও মা'র দেখাদেখি মা'র মত ভাবে প্রণাম করিয়া প্রত্যহ বিছানা হইতে উঠি। তবে আমি যে কাহাকে প্রণাম করি তাহা আমি জানি না, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়া থাকি "ঠাকুরকে প্রণাম করি।" ঠাকুর যে কে তাহা আমি বিশেষ জানি না। মা ও বাবা যাহাকে ঠাকুর বলেন, আমিও তাহাকে ঠাকুর বলি মাত্র, নচেৎ ঠাকুর সম্বন্ধে আমার কোনও বিশেষ জ্ঞান নাই। যাহা হউক মা উঠিয়াই প্রথমে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ মহাষ্টমী, আজ ত' আমরা গঙ্গাস্নানে যাইব?" বাবা বলিলেন, "হাঁ আজ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে পার। প্রতি বৎসরই ত' গিয়া থাক তাহা জানি এবং সেই কারণে আমি কয়েকখানা গাড়ী আনাইয়া রাখিবার জন্য বাহিরে বলিয়া রাখিয়াছি। সম্ভবতঃ গাড়ীগুলি এতক্ষণে আসিয়া থাকিবে। তোমরা হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হও, আমি বাহিরে গিয়া দেখি গাড়ী আসিয়াছে কি না।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "গাড়ীর দরকার কি? এখনও অন্ধকার রহিয়াছে, কে আর এখন রাস্তায় বসিয়া আছে।" বাবা বলিলেন, "না গাড়ী করিয়াই যাওয়া চাহি, রাস্তায় অনেক রকম মন্দ লোক থাকে, পরস্ত্রী দর্শন করা এবং তাহাদিগকে ঠাট্টা তামাসা করা তাহাদের স্বভাব; এ কারণ আমার বিবেচনায় হাঁটিয়া যাওয়া ভাল নয়, বরং যাবার সময় গাড়ী করিয়া যাও, আসিবার সময় যাঁহারা পুজার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন বা ভোগ রাঁধিতে ব্যাপৃত থাকিবেন তাঁহারা না হয় আস্তে আস্তে হাঁটিয়া আসিবেন, আর গাড়ী ও লোকজন সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।" মা বলিলেন, "সে কথা মন্দ নহে, তাহাই করা যাইবে।" বাবা তখন বলিলেন, "তোমরা তৎপর হও, এখনও ভোর হয় নাই, অন্ধকার আছে, আবার অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া বাবা বাহিরে গেলেন, মাও আমাকে ঝির কাছে দিয়া হাত মুখ ধুইতে যাইতেছেন, এমন সময় আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমি তোমার সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাব।" মা বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকেও লইয়া যাইব, তুমি ঝির কাছে হাত মুখ ধুইয়া লও।" আমি তাহাতে রাজী হইয়া ঝিকে বলিলাম, "ঝি আমার হাত মুখ ধোয়াইয়া দাও।" ঝি আমাকে লইয়া গিয়া পায়খানার নিকটে নর্দ্দমার ধারে বসাইয়া দিল। অভ্যাস বশতঃ তথায় বসিবামাত্র আমার দাস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পর ঝি আমাকে জলশৌচাদি করাইয়া ও হাতমুখ ধোয়াইয়া দিল।

তৎপরে মা আসিয়া আমাকে পোষাক পরাইয়া দিতেছেন, এমন সময় আমার একজন কাকা (শুনিয়াছি ইনি আমার জ্ঞাতি কাকা এবং ইঁহাকে কাকা বলিয়াই ডাকিয়া থাকি) ও মামা আসিয়া মা'কে বলিলেন, "গাড়ী উপস্থিত রহিয়াছে, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র আইস, দাদা ডাকিতে পাঠাইলেন।" মা বলিলেন, "ঝি তুমিও আমার সঙ্গে চল, আমি যখন স্নান করিব, সেই সময় তুমি খোকাকে কোলে করিয়া থাকিবে।" তাহার পর মা আমাকে কোলে করিয়া নীচে খিড়কীর দরজায় আসিলেন। খিড়কীর দরজার কাছে সব খুকীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রাচীনা বা গিন্নি বান্নির মত প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন, আর অর্দ্ধবয়স্কা এবং মধ্যবয়স্কা খুকী প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন। অর্দ্ধবয়স্কা ও মধ্যবয়স্কা খুকীদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, মা প্রাচীনা গিন্নিদের সঙ্গে আমাকে কোলে করিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিলেন। গাড়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্তে আস্তে আসিতে লাগিল। আমি মা'র কোলে চড়িয়া সব দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। আজ আর আমার পায়ে মা জুতা পরাইয়া দেন নাই। কারণ আমার পায়ে জুতা থাকিলে, স্নান করিয়া ফিরিবার সময় চামড়ার জুতা ঠেকিয়া মা'র কাপড় অপবিত্র হইতে পারে এই আশঙ্কাতেই আমার পায়ে জুতা পরাইয়া দেন নাই। যাহা হউক রাস্তায় যাইবার সময় সব দেখিতে দেখিতে যাইতেছি, তবে অল্প অল্প অন্ধকার থাকায় দেখিবার বাধাও হইতেছে, এখনও রাস্তায় লোক চেনা যাইতেছে না। রাস্তায় ভিড়ও মন্দ নাই, তবে খুকীদের ভীড়ই বেশী; প্রাচীনা, যুবতী বালিকা সব রকম খুকীরাই চলিতেছে। আমার বোধ হইল, সকলেই আমার ন্যায় গঙ্গাস্নানে যাইতেছে; মা'কে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলিলেন যে, উহারা সকলেই গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছে। রাস্তায় বড় বড় খোকাদের ভিড় খুব কম, তবে আমার মত খোকা বা আমা অপেক্ষা কিছু বড় বড় খোকা অনেক চলিয়াছে; কেহ কোলে কেহ বা হাঁটিয়া আপনার আপনার মা'র সঙ্গে যাইতেছে; যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহারা আপন খোকাভাবের বশীভূত হইয়া কখনও বা দৌড়িয়া কখনও বা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। এইরূপভাবে যাইতে যাইতে আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে ঝির কোলে দিয়া এবং অপরাপর যাঁহারা গাড়ীতে বা পদব্রজে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গার জলের নিকট গিয়া আগে খানিকটা গঙ্গাজল আপন আপন মাথায় দিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন, তাহার পর গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিবার জন্য গঙ্গার জলে নামিলেন। গঙ্গার এই ঘাটে কেবল খুকীরাই স্নান করিতেছে; কোন খোকা এ ঘাটে স্নান করিতেছে না। আমি মা'র দিকেই লক্ষ্য করিয়া আছি, কারণ আমি খোকা মা'র উপর লক্ষ্য রাখাই আমার স্বভাব। গঙ্গার ঘাটে এত ভীড় যে, স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খুকীদের কথার শব্দে যেন গঙ্গার ঘাটে হাট বসিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলেই আপন সুখদুঃখের কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেহ বা বাড়ীতে কাল কী রান্না করিয়াছেন, আবার আজ কি

করিবেন এই সব আন্দোলন করিতেছেন, কেহ বা আপনার ঘরকন্নার কথা তুলিয়া সুখদুঃখ বোধ করিতেছেন, কাহারও স্বামী বিদেশ হইতে আসিতে পারেন নাই এবং কোনও সংবাদ দেন নাই, সেই জন্য সে ম্রিয়মানা হইয়া পূজার আনন্দোৎসব ভুলিয়া গিয়া তৎচিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়া নিজের দুঃখের কাহিনী অপরকে কহিতেছে। খোকারা যেমন পাঁচজন একত্র হইলেই আপন আপন কর্মস্থল এবং আপিসের কথা কহিয়া পেট খালি করেন, খুকীদের ত' কর্মস্থল বা আপিস নাই, তাহাদের কর্মস্থল বা আপিস আপন গৃহস্থালী, সুতরাং অনেক খুকী একত্র হওয়ায় পরস্পরের গৃহস্থালীর কথাবার্তা চলিতেছে এবং এই সকল কথাবার্তা কহিয়া আপন আপন মনোভাব প্রকাশ করতঃ খুকীরা যেন নিজেদের মনের বোঝা নামাইতেছে। কেহ কেহ বা ফুল চন্দন এবং বিল্বপত্র সহ গঙ্গার জলে পূজা করিতেছে; পূজা করিলে কি হয়, আপন আপন স্বভাব বশতঃ একদিকে হস্তের দ্বারা পূজা চলিতেছে, অপরদিকে মুখের কথা কিছুমাত্র বন্ধ নাই তাহাও মধ্যে মধ্যে বেশ চলিতেছে; কেহ কেহ বা মুখে কথা না বলিয়া হাঁ হুঁ দিয়া কথার উত্তর দিতেছেন। এই সময় আমার ঝিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঝি এখনও অন্ধকার রহিয়াছে, ওদিকে পার্শ্বের ঘাটে বড় বড় খোকারা এত ভোরে কেন স্নান করিতে আসিয়াছে?" ঝি বলিল, "ওরা সব পুরুত খোকা, ভট্‌চাজ্জি মহাশয়রা; ওঁরা রোজই ভোরে স্নান করেন, প্রাতেঃ স্নান করিয়া লোকের বাড়ীতে পূজা করিতে যান, সুতরাং উহাদের ভোরে স্নান না করিলে চলে না।"

এমন সময় মা স্নান করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঝিকে বলিলেন, "খোকাকে নামাইয়া দাও।" ঝি আমাকে নিজ কোল হইতে নামাইয়া দিলে, মা আমাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গার জলের নিকট লইয়া গিয়া আমার মাথায় জলের ছিঁটা দিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আমাদের বাড়ীর যাঁহারা স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্নান করিয়া ক্রমে ক্রমে একত্র হইতে লাগিলেন। সকলে আসিলে পর, যাঁহারা গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, মা তাঁহাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া স্বয়ং প্রাচীনাদের সঙ্গে বাড়ী আসিবার জন্য চলিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, যাঁহাদের সঙ্গে জানা শুনা ছিল, স্নান করিয়া অসিবার সময় মা তাঁহাদিগকে আমাদের বাড়ীতে আসিবার জন্য এবং ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য বিশেষ মিনতির সহিত বলিয়া দিলেন এবং ইহাও বলিলেন, যে, গাড়ী বা পাল্কী যাইলে তাঁহারা যেন নিশ্চয়ই আসেন। তাঁহারাও মাকে বলিলেন, "হাঁ আমরা নিশ্চয়ই যাইব, তবে মা গঙ্গাজল কাপড়ে কেমন করিয়া বলি বল, যাহা হইবার তাহা হইবে, আমাদের ত' পূর্বে সব বলা হইয়াছে, আর কতবার বলিবে?" তাঁহাদের মধ্য হইতে অমনি আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ও মা সে কি গো, তোমার ওখানে যাবনা ত' কোথায় যাব মা; কাল সপ্তমী পূজার দিন আমি গিয়েছিলাম। আহা মা, তোমার আদর যত্ন ভুলিতে পারিব না, আমাদের আর বেশী

বলিতে হইবে না, তবে মা গঙ্গাজল কাপড়ে আর কি বলিব, ওসব কথা এখন থাক। যাব বই কি, তোমার বাড়ী আমাদের বাড়ী ওত আর আলাহিদা নয়, তবে মা যাই এখন স্নান করিগে; তুমিও যাও তোমার অনেক কাজ আছে মা, একা গিন্নি, সব তোমাকেই দেখিতে হয়।" এই কথা বলিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। মা'ও আমাদিগকে লইয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া সকলকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। যাহা হউক আমি মা'র কোলে উঠিয়া চলিলাম; তবে মা অতি ধীরভাবে চলিয়াছেন, দেখিলে বোধ হয় যেন আমাকে কোলে লইয়া আমার ভারের কারণ চলিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ তাহা নহে, আমার মা'র চলনই স্বভাবতঃ ধীর ভাবের, তিনি বেশী জোরে চলিতে পারেন না; আমি কোলে থাকার জন্য যে, তাঁর কোনও ভার বোধ হয় নাই, তাহা আমি মা'র কথাতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ আসিবার সময় একজন বড় খুকী মা'কে বলিয়াছিলেন, "খোকার মা, খোকাকে আমার কোলে দাও; খোকাকে লইয়া চলিতে তোমার কষ্টবোধ হইতেছে। মা বলিয়াছিলেন, "বাছা, গাছের পক্ষে কি ফল ভারি হয়।" অর্থাৎ লাউ কুমড়ার গাছে বড় বড় লাউ কুমড়া ঝুলিয়া থাকে, উহাদের ভারে গাছের লতা যেমন কখনও ছিঁড়িয়া যায় না, তদ্রূপ "আমার বাছাকে কোলে করায় আমার কোনই কষ্ট নাই বাছা।" আমি মা'র মুখে এই কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, এই কারণেই আমার ধারণা যে, আমার ভারের জন্য মা'র কষ্ট হইতেছে না। যাহা হউক এই রকমভাবে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ যেন বাড়ীর নিকটে আসিয়াছি বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ী হইতে গঙ্গা বেশী দূর নহে, পনের কুড়ি মিনিটের রাস্তা মাত্র; সুতরাং আমার যাহা বোধ হইতেছিল তাহা সত্যই হইল। কারণ দেখিতে দেখিতে আমরা বাড়ীর পশ্চাতে খিড়কী দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাঁহারা গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতর যাইলেন, আমরাও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অষ্টমী পূজা

এখন আর অন্ধকার নাই, তবে বেশ ফরসাও হয় নাই, দূরের লোক চেনা যাইতেছে না, তবে নিকটের লোক সব বেশ চেনা যাইতেছে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমি মা'র কোল হইতে নামিলাম। আমাকে নামাইয়া দিয়া মা ঝিকে বলিলেন, "ঝি খোকাকে উপরে লইয়া যাও, আমি যাইতেছি।" ইহা বলিয়া, মা পা ধুইয়া উপরে আসিলেন, তৎপূর্বে আমি উপরে আসিয়াছি। মা উপরে আসিয়া ঝিকে বলিলেন, "ঝি তুমি খোকাকে লইয়া ওইখানেই থাক, আমি একবার নীচে যাইয়া পূজার আয়োজন সব কি হইল না হইল

দেখিব, খোকা যদি বাহিরে যাইতে চাহে, তাহা হইলে উহার পায়ে জুতা মোজা পরাইয়া বাহিরে লইয়া যাইও।" এই কথা বলিয়া মা নীচে যাইবেন, এমন সময় আমি মা'কে বলিলাম, "মা আমি এখানে থাকিব না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব এবং তোমার কাছে থাকিয়া ঠাকুর পূজা এবং আর সব দেখব।" মা আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গেই এস।" মা যেমন বলিলেন, অমনি হাসিতে হাসিতে খালি পায়ে হাঁটিয়াই আমি মা'র সঙ্গে চলিলাম। মা প্রথমে পূজার ভাণ্ডারে যাইলেন; তথায় পূজার পুষ্পপাত্রে একজন ব্রাহ্মণ ফুল, চন্দন, বিল্বপত্র, তুলসী প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, "ফুল সাজান সব ঠিক হইয়াছে, তুমি উপস্থিত এই পুষ্পপাত্র পূজার দালানে দিয়া আইস; ফুল, বিল্বপত্রের মালা ও জবাফুলের মালা মালী আনিলে আমি তাহা পাঠাইয়া দিব। আমি নৈবেদ্য উপকরণাদি শীঘ্র পাঠাইয়া দিতেছি, সবই প্রায় প্রস্তুত আছে; পুরোহিত মহাশয় আসিয়া চারিদণ্ডের মধ্যে যাহাতে পূজা আরম্ভ করিতে পারেন, সে বন্দোবস্ত আমি সব করিয়া রাখিয়াছি, তুমি ফুল বিল্বপত্র সব লইয়া যাও।" এই বলিয়া যে ঘরে নৈবেদ্য তৈয়ারী হইতেছিল, মা সেই ঘরে গিয়া নৈবেদ্যর কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিলেন। সমস্ত যোগাড়ই ঠিক ছিল, কেবল নৈবেদ্যের আতপ চাউল বড় বড় মাটির গামলায় ভিজাইয়া দেওয়াইলেন। মা বলিলেন, "এই তিন বস্তায় ছয় মণ চাউলের নৈবেদ্য হইবে, এবং নৈবেদ্যর সংখ্যাও অদ্য বেশী হইবে, কারণ অদ্য মহাষ্টমী; চিনির নৈবেদ্যও করিতে হইবে এবং নৈবেদ্যর সংখ্যাও অদ্য বেশী হইবে, কারণ অদ্য মহাষ্টমী; চিনির নৈবেদ্যও করিতে হইবে সন্ধিপূজার জন্য এবং মহাষ্টমী পূজার জন্য দুসেরা চিনির নৈবেদ্য কুড়িখানা হইবে এবং পাঁচসের চিনির নৈবেদ্য চারিখানা, কারণ মা দুর্গার ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য খোকার জন্য আমার মানত আছে। আতপ চাউলের নৈবেদ্য পাঁচসের চাউলের হিসাবে ত্রিশখানা করা চাহি, আর প্রধান মূল নৈবেদ্য আধমণ চাউলের হিসাবে দুইখানা। এইগুলি তোমরা সব তৈয়ারী কর; আর দুইখানা কুঁচা নৈবেদ্য বড় বড় থালে করিয়া দিবে, এবং বড় বড় বারকোসে জলপানি (যাহাতে নানা রকম ফল এ মিষ্টান্ন থাকে) দুইখানা তৈয়ারী কর; এবং এক একটি মালসাতে চিনির পানা, মধুর পানা, মিছরির পানা প্রত্যেক দেব ও দেবীমূর্তির জন্য তিনখানা করিয়া তৈয়ারী কর।" যে সকল স্ত্রীলোকেরা নৈবেদ্য তৈয়ারী করিতেছিলেন, মা তাঁহাদিগকে উপরোক্ত কথা সকল বলিয়া, নিজেও কতক কতক তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। মাকে তৈয়ার করিতে দেখিয়া, তাঁহারা সকলে একবাক্যে কহিলেন, "খোকার মা, আজ তোমার বাছা এক জায়গায় বসিয়া কোনও কাজ করা উচিত নহে, তাহা হইলে অপর কাজকর্ম কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, তাহাতে তোমার লক্ষ্য রাখা হইবে না। তোমার লক্ষ্য না থাকিলে সব কার্য্যে গোলমাল হইয়া যাইবে, তুমি গিন্নি তোমার নজর সব জায়গায় থাকা চাহি; অবশ্য তুমি মা সবই করিতেছ এবং দেখিতেছ, আমরা এতগুলা লোক এখানে রহিয়াছি, তোমার

থাকিবার দরকার নাই, তুমি অপর কার্য্য দেখগে, যাহা যাহা করিতে বলিলে, আমরা সব ঠিক করিয়া রাখিতেছি তুমি যাও।" মা এই কথাতে তথা হইতে রান্না মহলে গেলেন। রান্না মহলে যাঁরা যাঁরা ভোগের রান্না করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই সব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া দেখিলেন যে, রসুয়ের দ্রব্যসম্ভার সমস্তই রান্নাঘরে আসিয়া পৌছিয়াছে; উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে এবং কতক কতক রান্না আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; যেখানে যাহা লাগিবে ও যেখানকার জিনিষ দরকার, তাহা ভাণ্ডার হইতে আনিয়া দিবার লোক মা পূর্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কারণ কার্য্য সকল সব ঠিক হইয়া যাইতেছে। যিনি যে কার্য্য করিতেছেন, সেই কার্য্য ব্যতীত অপর কার্য্য তাঁহাকে দেখিতে বা করিতে হইতেছে না। ভাণ্ডারের কোন জিনিষ কোন হাঁড়াতে বা হাঁড়িতে আছে তাহা খুঁজিতে ভাণ্ডারীর কোনও কষ্ট হইতেছে না, কারণ জিনিষের নাম কাগজে লিখিয়া মা হাঁড়ির বা হাঁড়ার গায়ে লাগাইয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং কোনও জিনিষ খুঁজিবার জন্য কাহারও কোনও ক্লেশ হইতেছে না; সব যেন কলে হইয়া যাইতেছে এমন ভাবে আমার মা সব গুছাইয়া রাখিয়াছেন।

আমার মা রান্নাও বেশ করিতে পারেন; এমন কি সকলকে বলিতে শুনিয়াছি যে, খোকার মা একা আট দশটা উনন জ্বালিয়া একশত লোককে নানারকম ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া খাওয়াইতে সক্ষম। যাহা হউক আমি মা'র সঙ্গে কখন হাঁটিয়া, কখনও বা তাঁর কোলে চড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; আমার খাবার আমার সঙ্গেই আছে, অর্থাৎ মা আমার যেখানে একবার বসিতেছেন, আমিও সেই ফাঁকে অমনি আহারের থলি মাই খাইয়া লইতেছি, সুতরাং আমার ক্ষুধার উদ্রেক এখনও হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও এই সময় মা আমাকে একটু গরম গরম মোহনভোগ ও একটা বাটিতে করিয়া দুগ্ধ আনাইয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন তাহার পর আমার হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া মা পূজার দালানে এইবার আসিলেন। পূজার দালানে আসিয়া পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহির হইতে পূজার সব বস্ত্র এবং চেলীর শাট পূজার জন্য দিয়া গিয়াছে কি?" মার প্রশ্ন শুনিয়া, পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "পূজার সমস্ত কাপড় ও চেলীর শাড়ী, পূজার আসন, অঙ্গুরী, স্বর্ণের নথ, স্বর্ণের লোহা, শাঁখা, সিন্দুর চুপড়ি, চার সুট, সিন্দুর চার বাণ্ডিল এবং পূজার অপর দ্রব্য বাবু স্বয়ং আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন; মা'র সন্ধিপূজার জিনিষ পর্য্যন্ত প্রস্তুত, মা আপনার সংসারে কোনও বিষয়েরই অভাব নাই।" মা বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয়, এ সংসার আমার নহে, আমি জানি এই সংসারে আমি একজন দাসীমাত্র এবং ভগবান আমাকে দাসীরূপে এই সংসারে নিযুক্তা রাখিয়াছেন; আমার পতিকেই আমি ভগবানের রূপ বলিয়া জানি এবং তদধ্যানে আমি দাসীভাবে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি; তাঁহারই উপদেশে এবং তাঁহারই শক্তিতে আমি বলশালিনী

হইয়া তাঁহার আজ্ঞামত সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমস্ত কার্য্যাদি করি বলিয়া, আমার কোনও অশান্তি বা জ্বালা মনে স্থান পায় না এবং সেই কারণে আমার মনে আনন্দ বিরাজ করায়, আমি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও কোন ক্লেশবোধ করি না, বা আমার কোন ক্লান্তিবোধও হয় না। ইহাতে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়া ত' দূরের কথা, বরং অন্যান্য নারীগণের অপেক্ষা আমার স্বাস্থ্য সর্ব্বরকমে ভাল ব্যতীত মন্দ নহে। আমার বিশ্বাস যাঁহারা নিজ পতির পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র নিজের অঙ্গ সেবায় সতত রত থাকেন এবং পরিশ্রম ভয়ে সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না এবং সাংসারিক কার্য্য সমূহে মন সবর্দা ব্যাপৃত না থাকায়, স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী মন কুৎসিত বিষয়ে চালিত হইয়া কুটিল বুদ্ধিসম্পন্না হইয়া পড়েন এবং নিজে নানারকম অশান্তি ও জ্বালাপ্রাপ্ত হইয়া নিজেও সুখী হইতে পারে না এবং নিজ নিজ পতিকেও সুখী করিতে পারেন না। পুরোহিত মহাশয়, আপনাদের আশীর্বাদে আমার বর্তমান মতি যেন এইরূপ স্থায়ীভাবে থাকে।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তাই হবে মা, ভগবতীর কৃপায় আপনার সবই ভাল হইবে; যাক এখন আমরা পূজা আরম্ভ করি, পূজার সময় উপস্থিত।" এই কথা বলিয়া পুরোহিত মহাশয় পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন, আমার মা'ও আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া পূজার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

আমি আমার মা'র কোলে বসিয়া থাকিলাম; ক্ষণিক বসিতে বসিতে মা'র কোলে শয়ন করিবার জন্য যেন আমার ইচ্ছা হইল। আমি খোকা, ইচ্ছামাত্রই ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করাই আমার একরকম অভ্যাস; ইচ্ছাকে সংযত করিবার চেষ্টা আমার এই খোকাভাবে আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড় বড় খোকা যাহারা, তাহারাই যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে চাহে না, বরং ইচ্ছা চরিতার্থ করাই ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তখন আমি ছোট খোকা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব। তবে আমি ছোট খোকা বলিয়া আমার ইচ্ছাও ছোট রকমের, অর্থাৎ সামান্য সামান্য বিষয়ের ইচ্ছামাত্র। আমার খোকাভাবের এই ছোট ছোট ইচ্ছা এক্ষণে ইচ্ছার অঙ্কুর মাত্র। এই ইচ্ছার অঙ্কুর অবস্থাতেই সময়ে সময়ে ইহা আমাকে যে কষ্ট দেয় তাহাই বর্ণনাতীত। কোনও একটা সামান্য বিষয় পাইবার ইচ্ছা হইলে এবং তাহা না পাইলেই হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিয়া নিজেও কষ্ট পাই এবং অপরকেও কষ্ট দিই। আমার জন্য অপরে কষ্ট পাইবার কারণ এই যে, যাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা করিতে আইসেন, তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া অন্ততঃপক্ষে মনে মনেও বিরক্ত হইয়া কষ্টবোধ করেন। বড় বড় খোকারা নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ না হইলে আমার মত হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদেন না সত্য, কিন্তু মনে মনে অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। আমি

বরং হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষণিক পরে ক্লান্তিবোধ হইলে ইচ্ছার যে বিষয়ের জন্য কাঁদিতেছিলাম, সেই বিষয়ের ইচ্ছাটা নিবৃত্তি পাইয়া পরিশেষের যাহা তাহা কোনও একটা জিনিষ হাতে পাইলেই, ঠাণ্ডা হইয়া আনন্দভরে হাঁসিতে থাকি। বড় বড় খোকাদের উহা হয় না। তাহারা লোকলজ্জার ভয়ে হাত পা ছুঁড়িয়া আমার মত কাঁদিতে পারেন না, অথচ ইচ্ছা চরিতার্থ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের ও অপরের অনিষ্ঠ সাধন করিয়া জ্বালার উপর জ্বালা পাইয়া থাকেন। আমি ছোট খোকা আমার ইচ্ছা চরিতার্থ না হইলে আমার যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহাতে অপরের ক্ষতি হয় না, কারণ আমি ছোট খোকা আমার অস্থিমাংসের ওজন কম, সে কারণ আমার বলও কম, সুতরাং আমার ক্রোধের জন্য অপরের কোনও অনিষ্ঠ হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বড় বড় খোকাদের তাহা নহে, কারণ তাহাদের অস্থিমাংসের ওজনের ভার বেশী থাকায়, ইচ্ছার ভারও বেশী এবং ক্রোধের বেগও বেশী, তাহার উপর অস্থিমাংসের ওজন বেশী থাকায় বলের আধিক্য আমার অপেক্ষায় অনেক বেশী। বল বেশী থাকায়, ইচ্ছার চরিতার্থ না হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া ক্রোধ কর্ত্তৃক বুদ্ধি যেটুকু আছে তাহাও বিনষ্ট হইয়া পরিশেষে হাতাহাতি রক্তপাত ইত্যাদি হইয়া, ক্রোধের সহিত ইচ্ছার নিবৃত্তি হইয়া শেষে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়; ইহাতেই যে নিস্তার হইল তাহা নহে, অনেক সময়ে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় এবং ক্রোধের কার্য্যের গুরুত্ব হিসাবে কাহাকে কাহাকে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও ভোগ করিতে হয়। ইচ্ছারূপ চামারণীর সহবাসে আমাকে কাম (কামনা) রূপ চামারে পরিণত করে এবং তখন আমার কৃতকার্য্য চামারের কার্য্যের ন্যায় হইয়া আমার দেহান্তের আশঙ্কা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমি খোকা, আমি আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার মোহিনী মায়ায় পড়িয়া, আত্মবিস্মৃতিভাবে ইচ্ছাদির বশীভূত হইয়া স্বার্থের সহিত কত যে অমঙ্গলকর কার্য্যাদি করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। কে করায় এবং কেনই বা করি, তাহা আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় প্রণিধান করিবার উপায় নাই; যদিও উপায় থাকে, আমার খোকাভাবে উহা আমার জানা নাই। তবে আমি ছোট খোকা, আমার ওজন কম থাকায় বড় বড় খোকাদের অপেক্ষা আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার বহির্ম্মুখী গতি অনেক কম, সুতরাং আমার আসুরিকভাবের সম্পদরূপ কামাদি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিসমূহের এক্ষণে অঙ্কুর অবস্থা মাত্র। বড় বড় খোকাদের অপেক্ষা আসুরিক সম্পদরূপ কামাদি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিসমূহ এবং আসুরিকভাবের শক্তি-সমূহ কম থাকায়, দৈবী সম্পদের ভাব আমার মত ছোট ছোট খোকাদের মধ্যে বর্তমান থাকে এবং সেই কারণে বড় বড় খোকারা আমার মত ছোট ছোট খোকাদিগকে প্রীতিচক্ষেই দেখিয়া থাকে এবং সেই জন্য আমি ছোট খোকা থাকায় আমার প্রতি সকলে দয়া, স্নেহ, ভালবাসা দেখাইয়া আমাকে কোলে লইয়া থাকেন। ভয়ানক পাষণ্ড হইলেও ছোট ছোট খোকাদের

উপর প্রায় কেহই পীড়ন করেন না, ইহার প্রধান কারণ দৈবী সম্পদের ভাব ছোট ছোট খোকাদের অন্তরে থাকায়, আসুরিক সম্পদের ভাবাদি উপেক্ষা করিয়া সকলেই প্রায় ছোট খোকাদের উপরে দৈবী ভাবের কার্য্যই করিয়া থাকে। বড় বড় খোকারা অবশ্য তাহা বিশেষরূপে জানে না যে, ছোট ছোট খোকাদের দেখিলে কেন দয়া বা স্নেহভাবের উদয় হইয়া থাকে বা কেনই বা তাহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। পশুপক্ষী হইতে নর পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন শিশুকে প্রীতিচক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু অপরের ছোট ছোট খোকাদের দেখিলে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও মানব সমূহের চিত্ত স্নেহভাবে ধাবিত হইয়া থাকে। যদি কোনও পাষণ্ড কোনও ছোট খোকাকে পীড়ন করিতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই পাষণ্ডের হস্ত হইতে ছোট খোকাকে উদ্ধার করিতে সকলেই চেষ্টিত হইয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ছোট ছোট খোকাভাবে যেন জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণরূপ আত্মানারায়ণের বালভাবরূপ গোপাল বেশ দেখিয়া আসুরিক ভাবসমূহ মুগ্ধপ্রায় হইয়া যাওয়ায় লোকে করুণাদৃষ্টিতে খোকা সকলকে দেখিয়া থাকে।

যাহা হউক আমি আমার মা'র কোলে বসিয়া আছি। বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমার শয়নের ইচ্ছা হইল, সুতরাং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া মা'র কোলে শয়ন করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ যাহা হইতেছিল, তাহা শুনিতে লাগিলাম এবং দেবীর সম্মুখে যে ঘট রহিয়াছে তাহার উপর মধ্যে মধ্যে পুষ্প চন্দনাদি প্রক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিতে লাগিলাম। অদ্য আর 'ঘট স্থাপন' কার্য্য হইল না, কারণ উহা গত কল্য সপ্তমী পূজার দিনই হইয়া গিয়াছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হইল না কারণ তাহাও (বাহ্যিক নাম মাত্র প্রাণ প্রতিষ্ঠা) গতকল্য হইয়া গিয়াছে, চক্ষুদানও তথৈবচ। যাঁহারা নিজের জ্ঞান চক্ষুলাভ হয় নাই, তিনি অপরের চক্ষুদান দিবেন কি প্রকারে? আমি যাঁহার চক্ষুদান দিতে যাইতেছি, তাঁহার চক্ষুর অভাব, না আমার চক্ষুর অভাব? কাহার চক্ষুর অভাব আছে তাহাই যখন আমার জানা নাই তখন আমি চক্ষুদান দিই কাহার? যিনি নিত্যা সদা সর্বত্রে বিদ্যমানা, তাঁহার চক্ষুর অভাব আছে একথা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। তাঁহার চক্ষু নাই, আমার চক্ষু আছে, আবার তাহার উপর আমা কর্ত্তৃক তিনি চক্ষুষ্মান হইবেন, ইহাও কম রহস্যের কথা নহে; এই সব কারণেই পূজাদি কার্য্যে লোকে এত হতশ্রদ্ধ হইতেছে। বস্তুতঃ চক্ষুদান ক্রিয়া হাস্যজনক ব্যাপার নহে, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। তবে আমি খোকা, আমার তাহা জানা না থাকায় আমার পক্ষে উহা হাস্যজনক হইতে পারে, বস্তুতঃ উহা হাস্যজনক নহে। তবে উহার রহস্যভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিবার লোকাভাব থাকায় আমার নিকট উহা হাস্যকর হইয়া রহিয়াছে মাত্র, নচেৎ মূলে ঠিক আছে। যাহা হউক পুরোহিত মহাশয়েরা যে সব মন্ত্রপাঠ করিয়া যাইতেছেন, তাহা শুনিতে শুনিতে আমার নিদ্রাভাব আসিতে লাগিল। তাঁহারা ভূতশুদ্ধির মন্ত্রগুলির আবৃত্তি শেষ করিয়া

মাতৃকান্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ একটি পুষ্প হস্তে লইয়া প্রণবমন্ত্র ও ঊনপঞ্চাশ বর্ণ (অক্ষর) ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিয়া শরীরের স্থানে স্থানে ন্যাস করিতেছেন, যেমন পং ন্যাস দক্ষিণ পার্শ্বে—এইরূপভাবে সমস্ত বর্ণমালায় মাতৃকা ন্যাস হইতেছে। তাহা শুনিতে শুনিতে আমার নিদ্রাবেশ আসায় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি ঘুমাইয়া পড়িলেই আমার যেন পুনরায় গর্ভাবস্থার ধ্যান আসিয়া থাকে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহাই হইল এবং আমার মনে মনে প্রথমতঃ দেবীর চক্ষুদান সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় যেভাবে দেবীর চক্ষুদান ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন তাহার ঠিক যেন আমার ন্যায় খোকাদের ভুলাইয়া তাহা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। পূজার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেব বা দেবীর ধ্যান পাঠ করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে রাখিয়া তাহার পর পূজ্যদেব বা দেবী যেন নিজ মস্তকে রহিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করা হয়। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, নিজ শরীরেই সমস্ত দেব বা দেবী রহিয়াছেন। এমত স্থলে চক্ষুদান নিজ শরীরস্থ দেবীরই করিতে হইবে, উহা বাহিরের কার্য্য নহে, বাহিরে যাহা করা হয় তাহা প্রকৃত চক্ষুদান নহে। চক্ষুদান নিজের না হইলে অপরে চক্ষুদান করা যায় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যেমন একজন অন্ধ অপর একজন অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি যে একটি কুশে কজ্জল মাখাইয়া সেই কুশ হস্তে লইয়া কতকগুলি সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঐ কুশস্থিত কজ্জল মৃন্ময়ী দেবীর চক্ষে লাগাইয়া দিতেছি, তাহাতে দেবীর চক্ষুদান করা হয় না, উহা কেবল একটা বাহ্যিক ক্রিয়া মাত্র, বস্তুতঃ উহা প্রকৃত চক্ষুদান নহে।

পূর্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে, আমার দেহ আমি নহি বা 'আমি' শব্দও আমি নহি; আমার 'আমি' শব্দের ও আমার দেহের উৎপত্তি স্থানই 'আমি' শব্দবাচ্য। এই আমি প্রাণস্বরূপ, প্রাণই 'আত্মা' পদবাচ্য। সেই প্রাণাত্মা সংজ্ঞারূপ জ্ঞানচক্ষুহারা হইয়া (জ্ঞানান্ধ হইয়া) জীবভাবে (আত্মবিস্মৃতিভাবে) অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে দেবীর পূজা করিতেছি, তিনি আমার নিজ শরীরস্থা বর্তমান প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দুর্গা। তাঁহার চক্ষুদানের সঙ্গে আমার চক্ষুদানের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমার চক্ষুদান হইলেই দেবীরও চক্ষুদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই চক্ষুদান, গুরু শিষ্যকে করিয়া দিয়া থাকেন। যেমন গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চক্ষুদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" (গীতা ১১শ অঃ ৮ম শ্লোক); অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি তাহার দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক রূপ বা ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।" গুরু জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন; গুরুবাক্য বিশ্বাস করিয়া সেই চক্ষুতে মনঃসংযোগ করিলে সাধক আত্মরূপ ও আত্মৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। গুরু মাতা স্বরূপ। যেমন

জন্মদাতা পিতা সম্বন্ধে কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে এবং মাতা ব্যতীত সে সম্বন্ধে যেমন অপর কাহারও জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে এবং মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যেমন সকলেই জন্মদাতা পিতাকে নির্ণয় করিয়া ঐ পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া, পিতার স্নেহ, ভালবাসা এবং পরে পিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে, তেমনি মাতাস্বরূপ গুরু চক্ষুর ন্যায় গোলাকার যে জ্যোতির্ময় পদার্থ দর্শন করাইয়া দেন মাতৃবাক্যের ন্যায় গুরু বাক্য বিশ্বাস করিয়া যিনি উক্ত চক্ষুতে মনঃসংযোগ করিতে পারেন, তিনিই পিতা বা পতিস্বরূপ আত্মভাব হইতে সমস্ত আত্মৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন, নচেৎ কিছুতেই উহা হইবার নহে। গুরু প্রণাম মন্ত্র হইতে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।"

শ্লোকে "তৎপদং দর্শিতং যেন" বলা হইয়াছে, "তৎপদং কথিতং যেন" একথা বলা হয় নাই। বর্তমানে সব, কথাতেই পরিণত হইয়াছে। শ্লোকোক্ত অখণ্ড এবং মণ্ডলাকার, জ্যোতির্ময়, চক্ষুগোলকের জ্যোতিঃমধ্যস্থ আত্মরূপকে যিনি দেখাইয়া দেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য, অপরে নহেন। ইহাই প্রকৃত চক্ষুদান। প্রাণশক্তিরূপা মহামায়া দেবী দুগাল সংজ্ঞাহারা হইয়া আমার দেহ মধ্যেই রহিয়াছেন। বাহিরের প্রতিমার চক্ষুদান করিলে কি হইবে বা হইতে পারে? উপরোক্ত জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া যিনি তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারেন, তিনিই আত্মস্বরূপ দেবীকে দেখিতে পান, অপরে নহে।

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্যানচক্ষুষঃ।।"

গীতা ১৫শ অঃ ১০ম শ্লোক।

অর্থাৎ দেহান্তর গমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত, অথবা বিষয় ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট দেহীকে মূঢ়েরা দেখিতে পায় না, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান। ইহার পরেই কে যেন আমার মনে মনে আবার প্রকাশ করাইয়া দিতে লাগিল যে, "পূর্বে তুমি মাতৃকান্যাস যাহা দেখিতেছিলে, উহা প্রকৃত্ত মাতৃকান্যাস নহে।" আমার মনে অনুভূত হইতে লাগিল যে, মাতৃকান্যাস করিতে হইলে মাতৃকা পদবাচ্য কে বা কাহারা, তাহা আমার জানা না থাকিলে মাতৃকান্যাস করা আর না করা উভয়ই তুল্য। প্রাণই মাতাস্বরূপঃ; "প্রাণঃ হবৈ মাতা", শ্রুতি। প্রাণ যখন মাতাস্বরূপ হইতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, বর্তমান জীবশরীরে যে উনপঞ্চাশ প্রাণ উনপঞ্চাশ বর্ণরূপে রহিয়াছেন, তাঁহারই মাতৃকা পদবাচ্যা, অপরে নহেন; সেই উনপঞ্চাশ প্রাণাদি বায়ুর রূপই উনপঞ্চাশ বর্ণ, যাহা বাহ্যিকে অক্ষররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব ক্রিয়াটি দেবাসুর যুদ্ধ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সাধন সমর আরম্ভ হইলে উভয় পক্ষের আপন

আপন সৈন্যবিন্যাস করাই ন্যাস পদবাচ্য। আত্মপক্ষে প্রাণাদি বায়ুগণকে যথাস্থানে রাখাই ন্যাস। ন্যাস (নি—অস্ ক্ষেপণ করা) অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ মাতৃকা রূপিণী বায়ু সকলকে শরীরের প্রধান প্রধান স্থানে ক্ষেপণ করা অর্থাৎ বিন্যাস বা স্থাপন করাই ন্যাস। ইহাই মাতৃকান্যাস; অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের দ্বারা মাতৃকারূপিণী ঊনপঞ্চাশ বায়ুকে যথাস্থানে রক্ষা করা বা সন্নিবেশিত করারূপ কার্য্যই মাতৃকান্যাস। ইহা গুরুপদেশ গম্য। এই ঊনপঞ্চাশ মাতৃকারূপিণী বায়ুগণের অধিকাংশই বিদ্যুৎবর্ণ এবং কতকগুলির বর্ণ সূর্য্য রশ্মির ন্যায়, কতকগুলি স্থিতিরূপ অবস্থা, বর্ণ নীলাভা এবং কয়েকটি নিমগ্নভাব, বর্ণ ঈষৎ নীলাভা; ইহাই মাতৃকাগণের রূপ; ইঁহাদের আকার কতকটা দেবনাগর বর্ণরূপে যাহা বাহিরে চিত্রিত হইয়া থাকে তাহারই অনুরূপ; অর্থাৎ দেবনাগর বর্ণের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত; বাহিরে সেই আকার ঠিক নির্দেশ করা যায় না। উক্ত রূপ বা আকার সকল যে সর্বদা দেহের মধ্যে চিত্রিত ভাবে বর্তমান থাকে তাহা নহে। আকাশে রামধনু বা ইন্দ্রধনু যেমন সর্বদা প্রকাশ থাকে না, জলকণা, তেজ ও বায়ুর সম্মিলনে যেমন সময়ে সময়ে উহা প্রকাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ুর ক্রিয়াকালীন ষট্‌চক্রপথে বা অপর অপর অঙ্গে উক্তরূপ সকল সাধকের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার প্রকাশে মন, ইন্দ্রিয় ও আসুরিক সম্পদের বহির্বিষয় অন্তর্বিষয়ে লক্ষ্য পড়ায় ক্রমশঃ মনের চঞ্চলতা দূর হইয়া গিয়া মন স্থিরত্বপদ লাভ করিয়া আত্মতুল্য বা ব্রহ্মতুল্য হইয়া যায় অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থায়, উহার অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যায়। পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাসের ন্যায় কার্য্য; উহা ক্রিয়াযোগের দ্বারা করিতে হয়; উহাও কেবল কিছুকাল মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে হয় না। জীবের বর্তমান অবস্থায় আত্মক্রিয়া বা ক্রিয়াযোগের অভাব হেতু, আসুরিকভাবে প্রবল হওয়ায় দৈবী সম্পদাদির এবং প্রধান প্রধান বায়ুর অন্তর্মুখী ক্রিয়া রহিত হইয়া, প্রাণাদি বায়ু সমূহ আপন আপন স্থানভ্রষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে শরীরস্থ মেরুর উপরিভাগে থাকেন। তৎপরে সাধন সমর অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ আরম্ভ হইলে, উক্ত মাতৃকাগণকেও স্ব স্ব আসনে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ মাতৃকারূপিণী বায়বী শক্তি সমূহকে আপন আপন স্থানরূপ আসনে বসান হইলে, তাঁহাদের ক্রিয়ারূপ কার্য্য আরম্ভ হয়। পীঠ—আসন, ন্যাস—ক্ষেপণ করা বা রাখা অর্থাৎ নিজ শরীরে যথাস্থানরূপ আসনে বায়বীশক্তিগণকে রাখাই পীঠন্যাস; ইহাই প্রকৃত পীঠন্যাস। বাহ্যিক যাহা করা হয়, উহা তাহার অনুকরণ মাত্র। দেবদেবীর পূজার পুঁথিতে যে সব বিষয় লিখিত আছে, তাহা সমস্তই ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে; উহা পাঠে তাহার কিছুই হয় না; পুঁথি দেখিয়া কার্য্য করিতে যাইলে কিছুই হয় না। এমন সময় আমার মনে উদয় হইল, "পুঁথি মেরা থুতি, চারো বেদ পড়ে মজুর। কথ্‌নি কে ঘর বহুৎ হ্যায়, কর্‌নি কে ঘর দুর।" অর্থাৎ মুখে পুঁথি পড়ে কষ্ট পাবার দরকার কি? যাহারা মজুর, তাহারাই চারিবেদ পাঠ করিয়া থাকে।

বেদ পাঠ করিয়া কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে না, কেবলমাত্র মুখে পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা লোককে বশীভূত করিয়া অহঙ্কারী হইয়া থাকে; কথা বলিবার লোক অনেক আছে, কিন্তু কৃতকর্মা লোকের বড়ই অভাব।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমি আমার মা’র কোলে শয়ন করিয়া একেবারে নিদ্রাতে অভিভূত হইয়াছিলাম, অবশ্য আমার দেহ জড়বৎ হইয়া থাকিলেও আমার মনের বিশ্রাম হয় নাই, মন আপন কার্য্য করিতেছিল। যাহা হউক আমার মা আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া ছিলেন; হঠাৎ তিনি আমাকে কোল হইতে নিজ বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া লইয়া দাঁড়াইলেন; ইহাতে আমার যে নিদ্রাভাব ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেখি যে, ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হইয়াছে, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘড়ি ইত্যাদি মহাশব্দে ধ্বনিত হইতেছে। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইলেও, নিদ্রার ঘোর এখনও আমার কাটে নাই। নিদ্রার ঘোর থাকায় এবং নানাপ্রকার গম্ভীর বাদ্যধ্বনি হইতে থাকায়, আমি যেন হতভম্ব হইয়া গিয়া কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছি। ক্ষণিক পরে আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া যাওয়ায় আমি আমার মা’র কোল হইতে নামিয়া মা’র নিকটে দাঁড়াইয়া দেবীর আরতি দেখিতে লাগিলাম। সপ্তমী পূজার দিনের মত নানারকমভাবে আরতি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ঝাড় প্রদীপের চালনা হইল; তৎপরে কর্পূরের আরতি হইল, তাহার পর পানিশঙ্খের চালনা হইল, তাহার পর একখানি গামছা হস্তে লইয়া উহা চালনা হইল; পরে একখানি দর্পণ লইয়া উহা চালনা করা হইল! তাহার পর পুষ্প একটা লইয়া তাহার চালনা করা হইল, তাহার পর একটা চামর লইয়া উহার চালনা করা হইল। উহার পরেই আরতি সম্পন্ন হইয়া গেল; সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিল, আমিও মা’র সঙ্গে প্রণাম করিলাম। বলা বাহুল্য মহাষ্টমী পূজার শেষে খিচুড়ী ভোগের পর এই আরতি হইল। ইহার পর খিচুড়ী ভোগ বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলে মা আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন। বাড়ীর মধ্যে আসিয়া আমি মা’কে বলিলাম, “মা আমার ক্ষুধা পাইয়াছে আমি ভাত খাইব।” মাকে এই কথা বলিবামাত্র মা আমাকে সঙ্গে করিয়া যেখানে সাধারণ অন্ন ব্যাঞ্জনাদি পাক হইতেছে তথায় লইয়া গিয়া একজনকে বলিলেন, “খোকার জন্য চাট্টি ভাত ও একটু ব্যঞ্জন দাও, খোকাকে খাওয়াইয়া দিব।” এই কথা শুনিয়া একজন একখানি থালাতে করিয়া ভাত ও কয়েক রকম ব্যঞ্জন আনিয়া দিলে মা আমাকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দিলেন, পরে একটু দুগ্ধ আনাইয়া তাহাতে ভাত দিয়া উহাও আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং পরে আমার হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পূজার দালানে আসিলেন। পূজার দালানে আসিয়া শুনিলাম, অদ্য মহাষ্টমী, সকলে ধুনা পোড়াইবে। আমার মনে হইল ধুনা পোড়ান, সে আবার কি রকম? মা’কে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, “ধুনা পোড়ান এখনি হইবে, দেখিলেই

বুঝিতে পারিবে, কথায় আর তোমাকে তাহা কি বুঝাইব?" আমি আমার মা'র বাক্যে চুপ করিয়া থাকিয়া ধুনা পোড়ান দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক ঘন্টা পরে দীপমালা উৎসর্গ হইলে পর ধুনা পোড়ান আরম্ভ হইল। পনের ষোল জন বড় বড় খুকী আসিয়া দেবীর সম্মুখে সকলে পাশাপাশি করিয়া বসিলে পর এক এক খানি ভিজে গামছা জড়াইয়া বিঁড়ের মত করিয়া প্রত্যেকের উভয় হস্তের উপর ও মস্তকের উপর দেওয়া হইল। তাহার পর ঐ বিঁড়ের উপর প্রত্যেকের উভয় হস্তে ও মস্তকে একখানি করিয়া ছোট সরা দেওয়া হইল এবং প্রত্যেক সরাতে কতকগুলি করিয়া পাট কাঠি দিয়া উহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইল এবং পাট কাঠিগুলি সময় মধ্যে মধ্যে তিনবার করিয়া তাহাতে ধুনা দেওয়া হইতে লাগিল, ধুনা দিবামাত্রই সরার অগ্নি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এ দৃশ্য আমার পক্ষে নূতন কারণ আমি ছোট খোকা, তবে আমার এই অবস্থা দেখিতে ভাল লাগিতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধুনা পোড়ানর বাদ্যও বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। বালস্বভাববশতঃ বাদ্যের সঙ্গে আমি নৃত্য করিতে লাগিলাম। আমার নৃত্য কি! ক্ষণিক লাফান মাত্র। বলা বাহুল্য এই ধুনাপোড়ান দলের মধ্যে আমার মা'ও একজন আছেন তিনিও বসিয়া সকলের সঙ্গে ধুনা পোড়াইতে লাগিলেন। ধুনা পোড়ান শেষ হইলে, সকলে আপন আপন খোকা বা খুকীকে কোলে করিলেন, তাহার পর সকলে উঠিয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, ধুনা, পোড়ানর পর আমার মা'ও আমাকে কোলে করিয়া লইলেন। শুনিলাম ধুনা পোড়ানটা পূজার অঙ্গ নহে। আপন আপন বিপদের সময় লোকে মানত করিয়া থাকে যে, "আমার বিপদ কাটিয়া গেলে, আম দেবীর সম্মুখে ধুনা পোড়াইব।" ধুনা পোড়ান দলের মধ্যে দুই একজন নরুণ দিয়া আপন আপন বক্ষঃস্থল সামান্যভাবে চিরিয়া নিজ শরীরের রক্তও দান করিলেন; অবশ্য এ রক্তও এক আধ ফোঁটা মাত্র। ইহাও আপন আপন কাম্য বিষয় এবং ইহাও পূজার অঙ্গ নহে। এই সকল কার্য্য হইয়া যাইলে পর, সাদা ভোগ অর্থাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি ও পায়েস ও মিষ্টান্নাদি, দেবীর ভোগ হইল। এই ভোগের পর দেবীর আর একবার আরতি হইল। তাহার পর যাহা বাহ্যিক হোম তাহাও হইল।

সপ্তমী পূজার দিনের মত অদ্যও লোকজন ভোজন করিতে আসিয়াছেন, তবে অদ্য যেন লোক সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়াছে একথা সকলেই বলিতে লাগিল। বাহিরের লোকজন যাঁহারা ভোজন করিতেছেন, আমার পিতা পূর্ব্ব দিনের মত নিজেই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, যাহাতে কোনও বিষয়ের ত্রুটি না হয়। এদিকে ধুনা পোড়ান হইয়া গেলে, আমি মা'র সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসিলাম। বাড়ীর মধ্যে আসিয়া মা খুকীদের আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বড় বড় খুকী, যাঁহাদের আমার মত খোকা আছে শুনিলাম আজ তাঁহারা অষ্টমী থাকিতে আহার করিবেন না, সন্ধিপূজা হইয়া

যাইলে পর আহার করিবেন। যাহাদের খোকা বা খুকী হয় নাই তাহারাই আজ আহার করিতে বসিল, মা সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের আহার প্রায় সমাপন হইয়া আসিল দেখিয়া, মা তত্ত্বাবধানের ভার অপরের উপর দিয়া বলিলেন, "আমি পূজার দালানে যাই, কারণ সন্ধিপূজার সময় আগত প্রায়, আমাকে এই সময় একবার পূজার দালানে যাইতে হইবে।" ইহা বলিয়া মা আমাকে কোলে করিয়া পূজার দালানে যাইতে লাগিলেন; আমি মা'কে বলিলাম, "মা, আমি হাঁটিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব, আমাকে নামাইয়া দাও।" মা আমাকে নামাইয়া দিলেন। আমি কখনও বা দৌড়িয়া কখনও ধীরভাবে এবং আনন্দভরে হাসিতে হাসিতে মা'র সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। পূজার দালানে আসিয়া মা পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরোহিত মহাশয়, সন্ধিপূজার কি দেরী আছে, না সময় উপস্থিত হইয়াছে?" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "না মা, আর সময় বেশী নাই, সন্ধি পূজা আরম্ভ হইতে আর আধ ঘন্টা মাত্র বিলম্ব আছে; পূজার দ্রব্য সমাগ্রী সমস্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, আমরা সময় প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।" মা বলিলেন, তবে আমিও আর এখন বাড়ীর মধ্যে যাইব না, এইখানেই বসিয়া থাকি। ইহা বলিয়া মা তথায় বসিলেন, আমিও মা'র কোলে বসিলাম। মা'র কোলে বসিয়া আমি মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা সন্ধিপূজা কি মা? সন্ধিপূজা কাহাকে বলে?" মা'কে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে তাহার উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময় মা'কে বলিতে না দিয়া পুরোহিত মহাশয় নিজেই আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "খোকা দাদা, উভয় তিথির মধ্য অবস্থায় দেবীর যে পূজা করা হয় উহাকেই সন্ধিপূজা বলে; উভয় তিথির মধ্য অবস্থাকেই সন্ধি কহে; উক্ত সন্ধিক্ষণে দেবীর পূজা করিলে দেবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং দেবীও সন্ধিক্ষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পূজার সার্থকতা করিয়া থাকেন; এই কারণে সন্ধিপূজার বিশেষত্ব রহিয়াছে।" আমি খোকা, পুরোহিত মহাশয় আমাকে যাহা বলিলেন, আমি তাহাই গল্প শুনার মত শুনিতে লাগিলাম, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একবার হুঁ হাঁ, করিয়া সায় দিয়া যাইতে লাগিলাম। ইহাতে যেন আমার তত তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তবে আমি খোকা, আমাকে যে যাহা বলে আমি প্রায় তাহাতেই হুঁ, হাঁ করিয়া সম্মতি দিয়া থাকি, ইহা ব্যতীত আমার এ খোকাভাবে উপায়ও নাই। আরও বিশেষ, পুরোহিত মহাশয় বয়ঃজ্যেষ্ঠ, উনি আমার তুলনায় বড় খোকা, ওজনেও অনেক বেশী, সুতরাং আমার অপেক্ষায় তাঁহার খোকাত্বভাব অনেক বেশী থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব। সুতরাং তিনি বড় খোকা, তিনি যাহা বলিতেছেন, আমি ছোট খোকা, আমার তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু আমি পুরোহিত মহাশয়ের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, উহাতে যেন আমার সংশয় থাকিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধি পূজা

যাহা হউক, আমি এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময় ভাবিতে ভাবিতে আমার তন্দ্রাভাবটা যেন গাঢ়ভাবে আসিয়া পড়ায়, আমি আমার মা'র কোলে শয়ন করিলাম। শয়ন করিবার পরই কেমন একটা কি ভাব আমার মনে উদয় হইয়া আমার বাহ্যজ্ঞান যেন রহিত হইয়া গেল এবং আমি আমার কপালদেশে একটা মহান গোলাকার জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রকাশ দেখিতে পাইলাম এবং উহা হইতে যেন এই বাক্যগুলি প্রকাশ হইতে লাগিল; যথা—"আমিই সন্ধি বা সন্ধ্যারূপিণী, আমিই অজপা গায়ত্রীরূপিণী ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর সঙ্গলমস্থলে আমিই অবস্থিতি করিয়া থাকি; অর্থাৎ সুযুম্না নাড়ী অন্তর্গত সপ্তমচক্রে আমার স্থান। তুমি যেরূপ আমায় দেখিতেছ, ইহাই আমার প্রকৃত রূপ; আমি শরীররূপ দুর্গে থাকি বলিয়া, ঋষিরা- (আমাকে যাঁহারা দেখিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তবে বলেন তাঁহারাই ঋষি পদবাচ্য) আমাকে তাঁহারা 'দুর্গা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমার এই রূপ, ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রকাশ হয় না। ঈড়া হইতে শ্বাসের গতি যখন পিঙ্গলায় যায় অর্থাৎ যে অবস্থায় শ্বাসের গতি পিঙ্গলাতেও যায় নাই অথচ ঈড়াতেও নাই, অর্থাৎ যে অবস্থায় শ্বাসের গতি ঈড়া হইতে পিঙ্গলায় যাইবার মুখে অথবা পিঙ্গলা হইতে ঈড়ায় যাইবার মুখে মধ্য মার্গে অর্থাৎ সুযুম্নায় শ্বাসের স্থিরভাব ক্ষণিকমাত্র থাকে তাহাকেই 'সন্ধি' কহে, এবং উহা ক্ষণমাত্র থাকে বলিয়া উহাকে 'সন্ধিক্ষণ' কহে। জীবরূপ সাধক অজপারূপ প্রাণশক্তির গতি ক্রিয়াযোগের দ্বারা অন্তর্মুখী করিয়া সুযুম্নামার্গে গতি করাইতে পারিলে, উক্ত সন্ধিকালের স্থিতি বৃদ্ধি হয়; এই সন্ধিকালের স্থিতি বৃদ্ধিরূপ সম্বর্দ্ধনই আমার একমাত্র পূজা। এই সম্বর্দ্ধনরূপ ক্রিয়া দ্বারা আমি জীবদেহে প্রকাশ হইয়া দেহস্থিত আসুরিক ভাব সমূহকে দমিত করিয়া, জীবকে শিবে পরিণত করিয়া লইয়া থাকি। যাহারা বাহ্যিকভাবে আমার প্রতিমাদি তৈয়ার করাইয়া পূজা করিয়া থাকে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে এবং ঐরূপ পূজার দ্বারা কর্মকর্তার শ্রদ্ধার কিঞ্চিত বৃদ্ধি পায় মাত্র, নচেৎ অপর কিছুই হয় না। তুমি যে আমার এই রূপ দর্শন করিলে, ইহা তোমার বালভাব প্রযুক্তই তুমি দেখিতে পাইলে। তোমার এই বালভাব যে পরিমাণে অন্তর্হিত হইবে, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ তোমার আসুরিক ভাব বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার হৃদয়ে আসুরিক ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া তুমিই একটি প্রধান অসুররূপে পরিণত হইলেও হইতে পার। যদি কখন সাধনদ্বারা নিজ প্রাণশক্তির উল্টা গতির স্থিরত্বভাব সুযুম্নায় স্থিতি করিয়া পুনরায় তোমার বালভাব

আনয়ন করিতে পার, তাহা হইলেই আমার দর্শন পাইবে, নচেৎ নহে। বাহ্যিকভাবে সন্ধিপূজা যাহা হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত সন্ধিপূজা নহে। কারণ তোমাদের পুরোহিত মহাশয় অষ্টমীর শেষভাবে সন্ধিপূজা আরম্ভ করিয়া থাকেন। অষ্টমী তিথির শেষভাগও অষ্টমী পদবাচ্য; তাহার পর নবমী তিথিরও প্রথম অংশের কতকটা পর্য্যন্ত সন্ধিপূজা হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সন্ধিক্ষণে পূজা না হইয়া অষ্টমী ও নবমী তিথিতেই পূজা করা হইল; কেবল অষ্টমী তিথির ক্ষয় সময়ে বলিদান মাত্র করিয়া পাঁঠা বেচারীর দেহান্ত করা হয় মাত্র; তাহাও যে ঠিক অষ্টমী তিথির শেষ সময় করা হয় তাহা নহে; কারণ ঘড়ি দেখিয়া সাধারণতঃ যে কাল নিরূপণ করা হয়, সেই ঘড়িই যে ঠিক তাহা বলা যায় না; কারণ বাহিরের কাল নিরূপণ করিতে যাইলে, তাহাতে যে অন্ততঃ দুই চারি সেকেণ্ডের তফাৎ হইবে না তাহা বলা যায় না, বরং প্রায়ই তাহা হইয়া থাকে। সুতরাং বাহ্যিক পূজায় প্রকৃতভাবে সন্ধিপূজা হয় না; কারণ উভয় তিথির মধ্য অবস্থারূপ সন্ধিসময় গো শৃঙ্গে একটা সরিষা যত কাল স্থায়ী হইতে পারে, সেই কালই সন্ধিক্ষণ, এই ক্ষণকাল সময়ের মধ্যে না পূজা হইয়া থাকে, না বলিদান হইয়া থাকে। আরও বিশেষ আমি জগজ্জননী, জীব মাত্রেই আমার পুত্র কন্যা। মাতার সম্মুখে সন্তানের দেহান্ত করাইলে মাতার তাহাতে কদাপি সন্তোষ লাভ হইতে পারে না; ইহাও অবিধি পূর্বক কার্য্য হইয়া থাকে। আমি সকল দেহেই প্রাণশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছি। সেই প্রাণশক্তির সম্বর্দ্ধনরূপ পূজা করিতে হইলে শরীরস্থ পশুভাব সমূহকে বলি (উপহার) দিতে হয়। অর্থাৎ পশুভাব সমূহ আমাকে অর্পণ করিয়া আমার দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থাৎ আমি যে দেবতার পূজা করিতেছি, আমিই সেই দেবতা এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করিয়া (দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ) পূজা করিতে হয়। বাহ্যিক পূজা যাহা আজকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহাতে সমস্তই বিপরীত হইয়া থাকে সমস্তই অবিধিপূর্বক কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার ফলও বিপরীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শান্তি স্থানে অশান্তি লাভ হইয়া থাকে।

শুক্লপক্ষে বাহ্যিক পূজা যাহা করা হয় তাহাও ভিতরের ভাবের সহিত একটু জড়িত আছে। অর্থাৎ ঈড়া বা চন্দ্রনাড়ীতে বায়ুর বহনকালের শেষ সময়ে কোনও শুভকার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। পিঙ্গলা নাড়ীতে তাহা হয় না, এ কারণ ঈড়া নাড়ীর প্রথম কলাতে পূজা আরম্ভ করা উচিত। চন্দ্রের প্রথম কলাই প্রতিপদ। বাহ্যিক চন্দ্রের প্রথম কলা হইতে নবম কলা পর্যন্ত্য বাহ্যিক পূজা হইয়া থাকে। চন্দ্রের নবম কলাই নবমী তিথি। বাহ্যিক পূজা এই নবমীতেই শেষ করিয়া চন্দ্রের দশম কলা দশমী তিথিতে আমার কল্পিত প্রতিমার বিসর্জন করা হয়। অজ্ঞ লোকেরা না জানিয়া আমার আবাহন বা বিসর্জন করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, আমি নিত্যা, আমি প্রতি ঘটে ঘটে জীবদেহে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছি, দেহের নাশে আমার নাশ হয় না, যেমন জলবিম্বের নাশে জলের নাশ হয় না তদ্রূপ। দশমী তিথির বিসর্জন ব্যাপারকে বিজয়োৎসব কহিয়া থাকে, ইহাও তাহাদের ভ্রম কারণ আমার বাহ্যিক পূজার দ্বারা

কাহারও বিজয়লাভ হইতে পারে না; কেন না যাহারা আমার বাহ্যিক পূজা করে, তাহারা আমার পূজার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তামসিক ও রাজসিক ভাবের অভিনয়রূপ পূজা করিয়া আসুরিক ভাবেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। জীবরূপী রাজা সুরথ (সুন্দর শরীরবিশিষ্ট বলিয়া ইঁহার নাম সুরথ, সু—অর্থে সুন্দর, রথ—অর্থে শরীর, সুন্দর রথ যাঁহার অর্থাৎ সুন্দর শরীর যাঁহার তিনিই সুরথ অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মারাম) নিজ শরীরস্থ আসুরিক বা রাক্ষসভাবকে দমিত করিবার জন্য আমার পূজা করিয়া থাকেন। যেহেতু আমি সর্ব দেহেই প্রাণশক্তিরূপিণী, এবং আমি কাহারও নিকট পরাজিতা হই না, এ কারণ আমার নাম 'অপরাজিতা' বলিয়া জগতে খ্যাত। সাধারণ অজ্ঞ লোকে আমাকে না জানিয়া বিজয়া দশমীর দিন অপরাজিতা নামক লতার তাগা তৈয়ার করিয়া নিজ হস্তে ধারণ করিয়া থাকে এবং তাদ্বারা আমার মহিমা তাহারা খর্বই করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি না থাকিলেও তাহাতে সাধারণ জীবের সংশয় উৎপাদন করাইয়া, আমি যে প্রাণশক্তিরূপা অপরাজিতা তাহা জানিতে দেয় না; ইহাও আসুরিকভাবের প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ আসুরিকভাবে সকল দেহেই বর্ত্তমান আছে; এই আসুরিক ভাব সকল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া আমি অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপিণী দেবীই যে সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তিশালিনী ইহা আসুরিক ভাবাপন্ন জীবের নিকট অপ্রকাশ রাখিতে সদাই চেষ্টিত থাকে এবং এই কারণে আমার প্রকৃতভাব গোপন রাখিয়া আমাকে তাহারা অপরাজিতা বলিয়া জানিয়া, ক্রিয়াযোগের দ্বারা আমার সম্বর্দ্ধনরূপ পূজা করিয়া আমার স্থিরত্ব সাধন করতঃ আমাকে ধারণার দ্বারা ধারণ করেন, তিনি অপরাজিতা হইয়া আমার ন্যায় বলশালী হয়েন অর্থাৎ তখন জীব শিব হইয়া যান এবং তখন তিনি আসুরিক বা রাক্ষস ভাব সমূহকে জয় করিয়া বিজয় লাভ করতঃ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অপর কাহারও ঐ অবস্থা হয় না। বাহ্যিক পূজার দ্বারা কেহ নিজেই নিজের আসুরিক ভাব সমূহকে জয় করিতে পারেন না, বরং আসুরিক ভাবের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কুশলরূপ বিজয় তাঁহারা প্রাপ্ত হন না। আসুরিক ভাবসমূহ দমিত না হইলে সিদ্ধ বা সিদ্ধি প্রাপ্ত কেহই হইতে পারেন না। সিদ্ধ-সিধ্ নিষ্পন্ন হওয়া; অর্থাৎ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নামই সিদ্ধিপ্রাপ্তি, ইহাই কৈবল্যরূপ মুক্তির অবস্থা। বাহ্যিকে ঐ সিদ্ধি বৃক্ষবিশেষের পত্র যাহা খাইলে মত্ততা জন্মে। ঐ সিদ্ধি গাছের পাতা মসলা দিয়া বাঁটিয়া তাহার পর জলে গুলিয়া পান করা হয়। ইহাতে যে আসুরিক ভাবের প্রশ্রয় হয় জীব তাহা জানে না। কারণ যাহা দ্বারা মত্ততা জন্মায় তাহাই আসুরিক ভাবের প্রধান নায়ক মদরূপ প্রধান আসুরিক ভাব। ভ্রমান্ধ জীব আমাকে (প্রাণশক্তিকে) না জানিয়া এইরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া সমস্ত অকার্য্যই কার্য্যবোধে করিয়া থাকে। তাহার পর বাহ্যিক পূজার অবসানে সকলের মস্তকে শান্তিবারি দেওয়া হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ইহাতে কাহারও শান্তিলাভ হয় না; (বর্তমান মনের বিচ্ছেদরূপ এ মনের আর এক রকম অবস্থাকেই শান্তি বা মোক্ষ কহা যায় ইহা সাধন সাপেক্ষ) ঃ শান্তি ত' দূরের কথা, কর্মকর্তার পরিশ্রম জনিত শরীরের ক্লান্তি (ক্লেশ) এবং বহুতর অর্থব্যয় জন্য

শান্তিস্থানে অশান্তিই দেখা যায়। প্রকৃত শান্তি, ইচ্ছা বর্তমান থাকিতে, কাহারও হইতে পারে না। ইচ্ছাত্যাগ করিবার ইচ্ছাও ইচ্ছা; সুতরাং ইচ্ছাত্যাগ করাও সমূহ কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ ইচ্ছাত্যাগ, এক মরিয়া গেলে হয় এবং জীবদ্দশায় মরার মত হইতে পারিলে হয়। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়েতেই ইচ্ছা রহিয়াছে; যেমন 'আমি সন্দেশ খাইব' ইহা আমার ইচ্ছা এবং 'আমি সন্দেশ খাইব না' ইহাও আমার ইচ্ছা; সুতরাং এমন অবস্থায় কৌশল ব্যতীত ইচ্ছা রহিত হওয়া যায় না। এই ইচ্ছা রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে আমার (প্রাণশক্তির) সঙ্গ করিতে হয়। আমার (প্রাণশক্তির) সঙ্গ ব্যতীত কেহই ইচ্ছা রহিত হইতে পারে না, অর্থাৎ আমার (প্রাণশক্তির) ঊর্দ্ধাধঃ গতি যাহা হইতেছে তাহাতে কোনও কামনা বা ইচ্ছা নাই। আমার (প্রাণশক্তির) সম্বর্দ্ধনরূপ পূজার দ্বারা যিনি আমার সঙ্গ করিয়া বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা লাভ করিয়া আমার (প্রাণশক্তির) স্থিরত্বভাবে স্থিতি করিতে পারেন, তিনিই ইচ্ছা রহিত অবস্থারূপ শান্তিলাভ করেন। নচেৎ শান্তি কাহারও হয় না। শান্তিশব্দ লক্ষ লক্ষবার মুখে উচ্চারণ করিলেও কাহারও শান্তি হয় না, বা শান্তিশব্দ মুখে উচ্চারণ করিয়া কাহারও মস্তকে জল প্রদান করিলে তাহার শান্তি লাভ হয় না! শান্তি সাধন দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। শান্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনিচ্ছার ইচ্ছায় যাহাতে সকল ভূতের মঙ্গল হয় এমনভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। যেমন আমার (প্রাণশক্তির) কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা না থাকিলেও আমি (প্রাণশক্তি) কার্য্য করিয়া যাইতেছি, কারণ আমি কার্য্য না করিলে সমস্ত জগৎ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, তদ্রূপভাবে শান্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিও কার্য্য করিয়া থাকেন। জীবের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ যাহাতে জীব রক্ষা পায় শান্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমন কার্য্যে রত থাকেন।

উপরোক্ত কথা যেমন শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়াকাশস্থিত (কপালদেশকে আদিত্য হৃদয় কহ' যায়) যে মহজ্জ্যোতিঃ আমি দেখিতেছিলাম, উহা আমার হৃদয়াকাশে যেন বিলীন হইয়া পরব্যোম স্বরূপ মহাকাশে মিশিয়া যাওয়ায় কেবল গগণ-গুহার প্রকাশ মাত্র রহিল। তৎপরে গগণ-গুহাতে আমার লক্ষ্য পড়ায় আমি দেখিতে পাইলাম যে, তন্মধ্যে অনেক পুরুষ আপন আপন ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কাহারও দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না, সকলেই যেমন আপন আপন ভাবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহার পরই যেন একটা ঘোর অন্ধকার আসিয়া আমাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠিলাম এবং আমার নিদ্রারূপ অবস্থা যাহা আসিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। যে অবস্থা আমার আসিয়াছিল, উহা যে নিদ্রা কহিতেছি। ঐ অবস্থা আমার ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র আমি মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলাম, "মা আমার কি হইল? আমার কি যেন কে চুরি করিয়া লইল।" আমার এই কথা শুনিয়া মা বুঝিলেন যে, খোকা ঘুমাইয়াছিল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া খোকা ওরূপ বলিতেছে। মা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "না বাবা কেহই তোমার কিছুই চুরি করিয়া লয় নাই, তোমার সবই রহিয়াছে। তোমার যাহা আছে তাহা কেহই লইবে

না এবং তাহা লইতে পারে না এবং সময় হইলে তুমি আবার পাইবে। মা'র মুখে যখন শুনিলাম, যে আমার যাহা আছে তাহা কেহই চুরি করিয়া লইতে পারে না তখন যেন আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। তাহার পর মা আমাকে বলিলেন, "এইবার উঠিয়া আমার কোলে বইস, এখনই সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবে।" আমি আমার মা'র কোলে উঠিয়া বসিলাম; ক্ষণিক পরেই সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। আমার বাবাও এই সময়ে পূজার দালানে আসিয়া বসিলেন, তিনিও বসিয়া সন্ধিপূজা দেখিতে লাগিলেন। অষ্টমীর শেষ ভাগেই পূজা আরম্ভ হইল; পুরোহিত মহাশয়, পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেমন জ্ঞান ও বুদ্ধি, পূজা তদনুরূপই হইতে লাগিল। যাহা হউক বাহ্যিক ভাবে যেমন সর্বত্রই হইয়া থাকে, আমাদের বাড়ীতেও সেই ভাবে হইতে লাগিল। এই সময়ে ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল খুব জ্বালান হইতে লাগিল, তাহাতে সমস্ত বাড়ীই সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া আমার শরীর ও মনকে যেন পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার ন্যায় খোকার পক্ষে ইহা বিশেষ প্রীতিকর হইতে লাগিল। বড় বড় খোকারা এই সময়ে সকলে গলায় কাপড় দিয়া জোড় হস্তে দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপন আপন মনোভাবের কামনা ভগবতীকে জানাইতে লাগিল। আমি ছোট খোকা, আমার এখন কামনার বিষয় কম এবং কামনা যে করিতে হয় তাহাও আমি জানি না। বিশেষতঃ আমি আমার মা'র নিকট কোনও রকম বায়নারূপ কামনা করিলে, মা কখনও আমার বায়না পূরণ করেন না। বরং বায়না না করিলে মা আপন ইচ্ছামত ভাল ভাল খেলনা ও পোষাক নানারকম ভাল ভাল জিনিষ আমাকে দিয়া থাকেন। এই কারণে ভগবতীর নিকট বায়নারূপ কামনা করিতে আমার ইচ্ছা হইল না, বরং মনে হইতে লাগিল, যে বায়নারূপ কামনা করিলে মা ভগবতী হয়ত বিরক্ত হইয়া আমাকে কিছুই দিবেন না। এমন স্থলে আমার বায়নারূপ কামনা করা ঠিক নহে, এই বিবেচনায় আমি কেবলমাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, মা'কে যেমন ভাবে ভালবাসি, সেই প্রকার ভালবাসার সহিত মৃন্ময় প্রতিমাকে দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর ভগবতীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালা হইল। দীপমালাগুলি সমস্ত জ্বালিয়া দেওয়ায়, তাহার শোভা আমার পক্ষে বড় প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহার পরই আরতি আরম্ভ হইল। আরতি শেষ হইলে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন; আমার মা'ও প্রণাম করিলেন এবং মা'র সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রণাম করিলাম। ইহার পর সকলেই আপন আপন কার্য্যে গমন করিলেন। তাহার পর আমার মা কুমারী পূজা করিতে বসিলেন। একটি ছোট খুকীকে মা পূজা করিতে লাগিলেন, পুরোহিত মহাশয় পূজার মন্ত্র বলাইতে লাগিলেন। কুমারী পূজা শেষ করিয়া মা বাড়ীর মধ্যে যাইলেন, আমি বাবার সঙ্গে যেখানে লোকজন সব খাওয়ান হইতেছে তথায় যাইলাম।

সপ্তমী পূজার দিন যে রকমভাবে সকলকে খাওয়ান হইয়াছিল, অদ্যও তাহার অপেক্ষায় কোনও ত্রুটি নাই, বরং অদ্য লোকের সংখ্যা বেশী হইয়াছে সকলেই বলিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ এখানে থাকিয়া তাহার পর বাবাকে বলিলাম, "বাবা, মা'র নিকট

যাইব।" বাবাকে এই কথা বলায় বাবা একজন লোকের সঙ্গে আমাকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি, সেখানেও খুব হৈ হৈ রবে খুকীদের খাওয়ানর জায়গা হইতেছে। প্রথমে আমাকে নীচের দালানে আনিল, তথায় আমার মা'কে দেখিতে পাইলাম না; তথায় কতকগুলি মধ্যমগোছের খুকীরা বসিয়া পান সাজিতেছে ও একমুখ করিয়া পান চিবাইতেছে, ও আপন আপন সমবয়স্কাগণের সহিত কতরকম ঠাট্টা তামাসা করিতেছে। ইহাদের বয়স কম থাকায় চঞ্চলভাব খুব বেশী। কাহারও মস্তকে কাপড় আছে কাহারও বা নাই। যে চাকর আমাকে তথায় লইয়া গেল, তাহাকে দেখিয়া যাহার যাহার মস্তকে কাপড় ছিল না, তাহারা সকলে নিজ হস্তের দ্বারা আপন আপন মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কতকটা ঘোমটা দেওয়ার মত ভাব হইয়া বসিয়া পান সাজিতে লাগিল। আমার সঙ্গের চাকরটা জিজ্ঞাস করিল, "দিদিমণি গিন্নি মা কোথায়? তদুত্তরে উহাদের মধ্য হইতে কতকটা প্রবীণা রকমের একজন বলিলেন, "গিন্নি মা রান্নামহলে আছেন।" এই কথা শুনিয়া চাকরটা আমাকে তথায় লইয়া চলিল। রান্নামহলে আসিয়া আমি মা'র নিকট যাইবামাত্র মা আমাকে নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আহার করাইতে লাগিলেন। অদ্য মহাষ্টমী বিধায় যাঁহারা পুত্রবতী তাঁহারা কেহই ভাত খাইতেছেন না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কেবলমাত্র ফলাহার করিতেছেন, আবার কেহ কেহ বা লুচী পুরী ও মিষ্টান্নাদি খাইতেছেন। এদিকে বেলাও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে; ইঁহারা আহার করিয়া উঠিতেই সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। ওদিকে বাহিরে ভদ্রলোকদের আহারও প্রায় এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র বাজে লোক, চাকর, চাকরাণী প্রভৃতি যাহারা বাকী ছিল, মা তাহাদের সকলকেই বসাইয়া দিলেন। তাহারা চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সবই বেশ আহার করিতে লাগিলেন; মা দাঁড়াইয়া ইহাদের সকলকে আহার করাইতে লাগিলেন। ইহারাও সকলে আনন্দের সহিত পেট ভরিয়া আহার করিয়া শেষে আপন আপন উচ্ছিষ্ট পাতা হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িল; তাহার পর সকলে আপন আপন আহার স্থান গোবর জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেল। আহারাদি করিতে আর প্রায় কেহই বাকী নাই; কেবল যাঁহারা পাক কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারই মাত্র বাকী আছেন। এই সময়ে যাঁহারা পরিবেশন করিয়াছিলেন, মা তাঁহাদের সকলকে ডাকাইয়া বসাইয়া দিলেন। তাঁহাদের আহার শেষ হইলে, যাঁহারা পাক করিয়াছিলেন, মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা মা এইবার সকলে গা হাত পা সব ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করুন।" তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বলিলেন, "আমার মা, গা হাত পা অবশ্য সকলেই ধুইতেছি, কিন্তু মা, ভগবতীর আরতি ও শীতল ভোগ (রাত্রের ভোগ) না হইলে আমরা কেহই আহার করিব না।" মা বলিলেন, "তবে তাই হবে, আমিও তবে এই সময়ে স্নান করিয়া লই, ইহার পর রাত্রি হইয়া যাইবে।" মা'র এই কথায় সকলে বলিলেন, "এত অবেলায় আপনারও স্নান করা ঠিক নহে, গা. ধুইয়া কাপড়

ছাড়ুন, কোলে কচি ছেলে, স্নান করিবার আবশ্যক নাই। মা আমার তাহাতেই সম্মত হইয়া আমাকে ঝির কাছে দিয়া গা ধুইতে গেলেন।

ঝি আমাকে কোলে করিয়া একেবারে উপরে ছাদে লইয়া আসিল। ছাদের উপর আসিয়া আমারও যেন বেশ তৃপ্তিবোধ হইতে লাগিল; কারণ কার্য্যের বাড়ী, বহুলোক সমাগম হইয়াছে, তাহাতে যেন শরীরে কেমন একটা গরম গরম ভাব অনুভূত হইতেছিল। ছাদের উপর আসায় আমার মনের এবং শরীরের উপরোক্ত গরমভাব দূরীভূত হইয়া মনের এবং শরীরের একটা জড়তাভাব যেন কাটিয়া গেল। কারণ একে শরৎকাল, তাহার উপর সান্ধ্য সমীরণ মন্দ মন্দ ভাবে বহিয়া আমার গাত্র স্পর্শ করায় আমার শরীর যেন পুলিকিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমকুল আপন আপন স্বভাব-সিদ্ধস্বরে সন্ধ্যাদেবীর আগমন বার্তা ঘোষণা করিতে করিতে আপন আপন কুলায় অভিমুখে ধাবমান হইতেছে; বায়সকুল সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া ক্ষুণ্নমনে 'কা' 'কা' রবে আপন আপন কুলায় অভিমুখে শন্ শন্ শব্দে যেন আকাশ ভেদ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চিম গগণ দিবাবসান দেখিয়া যেন বৃথা ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া আকাশের মধ্য পথে চন্দ্রমার প্রতি ভ্রূকুটি ভঙ্গী করিতেছে; চন্দ্রমা সে ভাবকে যেন কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া ক্রমশঃই আপনার ছটা বাড়াইতেছেন এবং পশ্চিম গগণের আরক্তভাবকে পরাভূত করিতেছেন এবং "যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য ক্রোধ করিলে নিজের গায়ের ঝাল নিজে গায়েই মিটাইতে হয়, অপরের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না" এই ধ্রুব সত্য জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। এই সময়ে ঝি আমাকে কোলে করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া "আয় চাঁদ", "আয় চাঁদ" বলিয়া আমাকে আকাশের চাঁদ দেখাইয়া আকাশের চাঁদকে যেন ধরিয়া দিবে এই অভিপ্রায়ে নিজ হস্ত বাড়াইয়া চাঁদকে আহ্বান করিতেছে; আমিও তাহার দেখা দেখি খোকাভাবের বশীভূত হইয়া আমার হাত বাড়াইয়া 'আয় চাঁদ', 'আয় চাঁদ' বলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি ডাকিলে চাঁদ আসিবে কেন? চাঁদ ত' আমার মত খোকা নহে যে, চাঁদ আমার কাছে আসিবে এবং চাঁদ যে আসে না তাহাও আমার খোকাভাবে জানা নাই। যাহা হউক আমি ঝির কোল হইতে নামিয়া ছাদের উপর জ্যোৎস্নার আলোকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বেশ আনন্দবোধ করিতে লাগিলাম। ছাদের দক্ষিণ দিকে নানারকম ফুলগাছের বাগান থাকায় তথা হইতে সুমধুর গন্ধ বায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া আমাদের ছাদের উপর দিয়া যেন অন্যত্র নীত হইতেছে। একে পুষ্পের সুগন্ধ তাহার উপর চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলা রজনী এবং তাহার সহিত মৃদুমন্দভাবে শরতের সন্ধ্যা সমীরণ; এই কয়েকটি একত্র হওয়ায় আমি ছোট খোকা আমার মনকে হরণ করিতে উহাদের কতক্ষণ সময় লাগে। বড় বড় খোকারা এই অবস্থার উপভোগ অধৈর্যভাবে কত কি করিয়া থাকে; আমি ছোট খোকা, আমি আর কি করিব। এই সীমাবদ্ধ ছাদের উপর দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করা ব্যতীত আমার দ্বারা আর কিছুই হইবার নহে। যাহা হউক লাফালাফি করিতে আমি সাধ্যমত ত্রুটি করিতেছি না; এমন সময় আমাদের বাগানের

পশ্চাৎ হইতে 'হুয়া, হুয়া, ক্যা হুয়া' রবে শৃগালকুল আনন্দভেরী বাজাইয়া ত্রিযামার প্রথম যামের ঘোষণা করিতে লাগিল। আমি খোকা, আমি শৃগালের ডাক শুনিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া ঝিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ঝি, আমার ভয় করছে আমি মা'র কাছে যাব।" ঝি আমাকে কোলে লইয়া আমাকে ভুলাইবার জন্য কহিতে লাগিল, "দূর হ' শিয়াল।" শৃগাল ঝির কথা শুনিবে কেন? তাহারা সমস্ত দিন যেন সূর্য্যের ভয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া যামিনীর আগমন দেখিয়া যামিনীর উপভোগ জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উপহাসচ্ছলে যেন সূর্য্যদেবকে সমবোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতেছে, "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া।" অর্থাৎ তোমার আধিপত্যের ক্যা হুয়া, যামিনীর আগমনে তোমার সেই দিবাভাগের প্রচণ্ড তেজ ও রশ্মির ক্যা হুয়া। প্রচণ্ড তেজ বা দর্প কাহারও স্থায়ী হয় না, সময় উপস্থিত হইলেই স্বভাব কর্তৃক উহা খর্ব হইয়া থাকে, তাই বলিতেছি তোমার ক্যা হুয়া। তোমার বাল্যভাব অসহনীয় নহে, কিন্তু তোমার যৌবনরূপ মধ্যভাব প্রখর তেজ ও দর্প পূর্ণ থাকায় তুমি নিজেও সুখী হইতে পার না এবং জগতের যাবতীয় পদার্থের সহিত জীবকুলকেও আপন তেজে দগ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হও না। এক্ষণে তোমার কালরূপিণী যামিনীর আগমনে স্বভাবকর্তৃক তোমার সকল তেজের অবসান হইল। তোমার বালভাব ও অস্তভাব কাহারও অপ্রীতিকর নহে, কিন্তু তোমার মধ্য অবস্থারূপ যৌবনভাব বড়ই প্রখর তেজপূর্ণ। তোমার আদিও অন্ত ভাব লক্ষ্য না থাকায় তোমার মধ্য অবস্থারূপ যৌবনভাব বড়ই প্রচণ্ড হইয়া পড়ে, উহা যে স্থায়ী হইবে না এবং উহার যে ধ্বংস নিশ্চিত আছে তাহা ধ্রুব সত্য জানিবে; তাই যামিনী আগত সময়ে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া।" আমরা কালের অনুচর শিবারূপী, কালরূপিণী যামিনীর আগমনে জগতের সহিত জগতের যাবতীয় জীবসমূহ সকলেই একদিন আমাদের ভক্ষ্যবস্তু মধ্যে পরিণত হইবে। কালরূপী যামিনীর আগমন যে অবশ্যাম্ভাবী ইহা জানা থাকিলেও তেজও দর্প জন্য উহা ভুলিয়া ছিলে। দেখ জীব, কালরূপিণী যামিনী যখন সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিল তখন তোমাকে গ্রাস করিতে কালের আর কত সময় লাগিতে পারে? তাই বলিতেছি 'সময় হুয়া, সময় হুয়া'; এখনও কালের শরণাপন্ন হও, নচেৎ আমাদেরই ভক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইবে দেখ, সূর্য্য যেমন এখন অস্তমিত, তেমনি তুমিও একদিন অস্তমিত হইবে, তখন তোমার আত্মীয়েরা সকলে মিলিয়া কহিবে, "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া।"

যাহা হউক শৃগালের ধ্বনি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় আমি আর ছাদে ঝির নিকট থাকিতে না চাওয়ায় ঝি আমাকে ছাদ হইতে আমার ঘরে লইয়া আসিল। আমি ঘরে আসিয়া ঝির কোল হইতে নামিতেছি, এমন সময় আমার মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা'কে দেখিয়াই মা'র কাছে যাইয়া আমি শৃগালের ডাক শুনিয়া ভয় পাইছিলাম, তাহা সমস্ত বলিলাম। মা আমাকে বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর শৃগালের ভয় নাই; বাবা বাড়ীর ভিতর শৃগাল আসিতে পারে না।" মা'র বাক্যে আমার ভয় দূর হইলে আমি মা'কে বলিলাম, "মা আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।" আমার এই কথা শুনিবার পরই মা ঝিকে বলিয়া

দিলেন, “ঝি নীচে গিয়া আমার বড় দিদিকে (মা’র বড় ননদ) বলিয়া আইস, দুখানা গরম গরম লুচি ও একখানা বেগুন ভাজা ও একটু দুগ্ধ যেন খোকাকে দিয়া যান। ঝি মা’র কথা শুনিয়া নীচে চলিয়া গেল, আমি মা’র কোলে শুইয়া এই অবসরে মাই খাইতে লাগিলাম। মাই খাইতে খাইতে আমার যেন একটু নিদ্রামত ভাব আসিতেছে, এমন সময় আমার পিসিমা একখানি রেকাবিতে করিয়া বেগুন ভাজা ও লুচি এবং একটা বাটীতে করিয়া খানিকটা দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আমাকে মা’র কোলে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, “ওমা খোকা যে শুইয়া পড়িয়াছে, তা হতেও পারে, সন্ধ্যাও অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রিও অনেক হইয়াছে।” পিসিমার এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, “না, খোকা এখনও ঘুমায় নাই, জাগিয়া আছে।” তাহার পর মা আমাকে কোল হইতে উঠাইয়া নিজ হস্তে বেগুন ভাজা দিয়া ধীরে ধীরে লুচি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন, লুচি খাওয়া হইয়া গেলে আমাকে বাটীতে করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিতেছেন। দুগ্ধ খাইতে খাইতে এক আধবার আমার ঢুল (ঘুমের আবেগে ঢুলিয়া পড়ার মত ভাব) আসিতেছে। যাহা হউক কোনও গতিকে দুগ্ধ খাওয়া হইয়া গেলে মা আমার হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া আমাকে আমার শয্যাতে শয়ন করাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে আমার গা চাপড়াইতে লাগিলেন এবং ঝিকে বলিলেন, “খোকা ঘুমাইলে তুমি খোকার নিকটেই থাকিও, যতক্ষণ না আমি নীচে হইতে আসি, কারণ এখনও আরতি হয় নাই। আরতি হইয়া গেলে, তাহার পর বাবুর খাওয়া হইয়া গেলে সকলকে খাওয়াইয়া আমি আসিব।” মা আমার গা চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঝিকে এই সব কথা বলিতেছেন, ঘুমের ঘোরে আমি কতক কতক বুঝিতেছি। কতকটা বা আংশিক ভাবে বুঝিতেছি। যাহা হউক ক্ষণিকের মধ্যেই আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ইহার পর কে কোথায় কি করিতেছে না করিতেছে তাহা আমার আর বোধগম্য হইল না, কারণ এক্ষণে আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

রাত্রিশেষে আমার বালস্বভাব প্রযুক্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সামান্যভাবে নিদ্রার আবেশমাত্র আছে; গৃহের আলোকটি সামান্য মৃদুভাবে জ্বলিতেছে; আমার কাছে আমাকে মা’কে দেখিতে পাইতেছি না, শয্যাতে শুইয়াই মধ্যে মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছি, এমন সময় টং টং টং টং করিয়া ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। আমি মা’কে আমার কাছে দেখিতে না পাইয়া, মা কোথায় গেলেন তাহা দেখিবার জন্য সামান্য ভাবে মাথা তুলিয়া দেখি, মা ও বাবা ঘরের মেঝেতে পৃথক পৃথক আসনে বসিয়া ধ্যানস্থভাবে যেন কি করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে বংশীধ্বনির ন্যায় যেন কি একরকম বেশ সুমধুর শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উক্ত মধুর ধ্বনি আমার বড় প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। আমি আস্তে আস্তে (নীরবে) তাহা শুনিতে লাগিলাম, এবং মনে হইতে লাগিল যে, আমার পিতা ও মাতা সংসারে থাকিয়া সংসারের সমস্ত লৌকিক আচার ব্যবহার রক্ষণ করিয়া গুপ্তভাবে গভীর রাত্রি হইতে কোনও গুপ্তসাধন করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে

বা অপর কাহাকেও জানিতে দেন না। যাহা হউক বালভাব প্রযুক্ত আমার একটু চঞ্চলতা আসায়, বাবা তাহা জানিতে পারিয়া মা'কে এই মাত্র বলিলেন যে, "খোকা জাগিয়াছে।"

মা অমনি যে আসনে বসিয়াছিলেন তথা হইতে উঠিয়া, আমার শয্যাতে আমাকে কোলে করিয়া শয়ন করিয়া বলিলেন, "বাবা খোকা, তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে?" আমি মা'কে সাড়া দিয়া মা'র কোলের ভিতর গিয়া মাই খাইতে লাগিলাম। মাই খাইতে খাইতে আমার যেন আমার সামান্য নিদ্রার মত আবল্য ভাব আসিল—ইহা আমার নিদ্রা নহে, মাই খাইতে খাইতে আমার আরাম বোধ হওয়ায়, আমি যেন অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া পড়িয়া মাই খাইতে থাকি। ইহা আমার খোকাভাবের ভাব, খোকাভাবে আমার প্রায় এরকম হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা আমার নিদ্রা বা ঘুম নহে। অমন সময়ে ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া গেল, বাবা উঠিয়া বাহিরে যাইবার সময় মাকে বলিয়া গেলেন, অদ্য মহানবমী পূজা, সব যেন ঠিক থাকে। মা বলিলেন, সবই ঠিক আছে, আমি সমস্তই রাতে ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর মা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে উঠিলে, আমিও মা'র দেখাদেখি প্রণাম করিয়া তাঁহার সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া মা আমাকে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিলেন ও তাহার পর ঘরে লইয়া গিয়া ঝিকে পোষাক পরাইয়া দিতে বলিলেন। পোষাক পরান হইলে আমি সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়া জল খাইলাম। তাহার পর ঝি আমার পায়ে জুতা মোজা পরাইয়া দিলে, মা ঝিকে বলিলেন, খোকাকে লইয়া বাহিরে বাবুর নিকট দিয়া আইস। আমি স্নান করিতে যাইব; আমি মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মা তুমি কোথায় স্নান করিতে যাইবে?" মা বলিলেন, "আজ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইব না, বাড়ীর পুকুরেই স্নান করিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিব। মা স্নান করিতে যাইলেন। আমি ঝির সহিত খোকাভাবে বিভোর হইয়া হেলিতে দুলিতে যাইয়া বৈঠকখানার বারান্দায় যেখানে বাবা এবং অপরাপর বড় বড় খোকারা চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নানারকম কথাবার্তা কহিতেছেন, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। তথায় আসিবামাত্র প্রাচীনেরা আমাকে এস এস খোকাদাদা এস বলিয়া কোলে করিয়া লইলেন। প্রথমে প্রায় সকলেই আমাকে এক একবার কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন, শেষে বাবা তাঁহার কাছে একখানা চেয়ারে আমাকে বসাইয়া রাখিলেন, ঝি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বাড়ীর নীচে মধে মধ্যে ঢোল বাজিতেছে আবার থামিলেই নহবৎ রসুন চৌকির বাজনা বাজিতেছে, আমি মধ্যে মধ্যে বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছি। যদিও আমি রসুন চৌকি বা নহবতের বাজনা কিছুই বুঝি না তত্রাচ, খোকাভাবের বশীভূত হইয়া আমার তাহা শুনিতে বেশ ভাল বোধ হইতে লাগিল। আরও বিশেষ আমার বালস্বভাব প্রযুক্ত এক জায়গায় অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে ভাল না লাগায়, এক আধবার এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে ভাল লাগে, তবে তাহাও বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। আমার যে কি ভাল লাগে তাহা আমিই জানি না। যেটা যখন নূতন রকমের নয়ন গোচর হয় তখন তাহাকেই ভাল মনে করিয়া লইয়া থাকি বা দেখিয়া থাকি। আবার

কিছুক্ষণ পরে অপর কোন বিষয় দেখিলেই তাহা প্রাপ্তির লালসা হয়। লালসা চরিতার্থ আর হয় না। সাময়িক লালসা চরিতার্থ হইলেও আমার অন্তরে যেন লালসার বীজ বর্ত্তমান থাকায়, লালসার ক্ষয় আর কিছুতেই হয় না। আমার খেলা করার লালসা খুবই চলিতেছে। দুঃখের বিষয় কে খেলে, কেন খেলি, তাহার কিছুই অবগত নহি। বুঝিবার ইচ্ছাও যে আছে তাহাও নহে, এবং তাহা যে বুঝিতে হইবে তাহাও আমার জানা নাই। সকল খোকাতেই খেলে, আমিও তাহাদের দেখাদেখি খেলিয়া থাকি। তবে আমার মা ও বাবার সামনে সামনে থাকিয়া যাহা কিছু খেলা করিতে হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নবমী পূজা ও বলিদান

যাহা হউক আমি বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া বাজনা শুনিতেছিলাম, তাহা ভাল না লাগায় আমি বাবার কাছে আসিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় একজন লোক বাবাকে বলিল, নবমী পূজা আরম্ভ হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয় আপনাকে এই সংবাদ জানাইতে কহিলেন। বাবা পূজা আরম্ভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, পূজার দালানে যাইবার জন্য উঠিলেন। যাঁহারা যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ বা বসিয়া রহিলেন। আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। বাবা আমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমার ঝিও আসিতে লাগিল। সে বোধ হয় এতক্ষণ কোন স্থানে বসিয়াছিল; যাইতে দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। আমি বাবার সঙ্গে পূজার দালানের সিঁড়ির কাছে আসিতেই বাবা ঝিকে বলিলেন, ঝি খোকার পায়ের জুতাটা খুলিয়া লও। ঝি তাহাই করিল, আমার পায়ের জুতা খুলিয়া সে বাড়ীর মধ্যে যাইল। আমি বাবার সঙ্গে পূজার দালানের মধ্যে যেদিকে পরদা ফেলা আছে সেই পরদা ফেলার ভিতরে যাইলাম। তথায় গিয়া দেখি, আমার মা'ও তথায় রহিয়াছেন। মা'কে দেখিয়া আমার আর আনন্দ ধরে না, আমি তাড়াতাড়ি মা'র কাছে গিয়া, মা মা, করিয়া, তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মা'ও আমাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন। তাহার পর বাবা একটা আসনে বসিবার পর একজন ব্রাহ্মণ একটা বড় পুষ্পপাত্র করিয়া ফুল, বিল্বপত্র, চন্দন, জবাফুল, একশত আটটী পদ্ম ফুল বাবার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল। বাবা কোশার জলে আচমন করিয়া তাহার পর পূজায় বসিলেন। বলা বাহুল্য, পুরোহিত মহাশয় দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। মা আমাকে কোলে করিয়া সামান্য একটু তফাতে বসিয়া রহিলেন। বাবা সোজা হইয়া বসিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে একটি করিয়া পদ্ম পুষ্পে চন্দন লাগাইয়া তৎপরে মনে

মনে কি বলিয়া এক একটি পদ্মপুষ্প দেবীকে অর্পণ করিতে লাগিলেন, আমরা বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বাবার পূজা হইয়া গেলে বাবা আমার মাকে বলিলেন,—"আজ নবমী, আজ আমাদের বাড়ীতে ভোজনের লোক সংখ্যা কম হইবে, কারণ যে সকল বাড়ীতে বলি বেশী আছে, মাংসাশী জীব আজ তথায় সব ভোজন করিতে যাইবে। আজ নবমী, আজ অনেক বাড়ী পূজাবাড়ী স্থলে কসাই বাড়ীতে পরিণত হইয়া থাকে। সাধারণ তন্ত্র মতাবলম্বীগণ তামসিক ও রাজসিকভাবে পূজার অনুষ্ঠান করিয়া পশুবলি দিয়া তন্ত্রের মর্য্যাদা হানিই করিয়া থাকে। তন্ত্রে তামসিক ও রাজসিক ভাবে পঞ্চমকার যাহা লিখিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণিত। উহা পশুভাবাপন্ন মদ্য মাংস প্রিয় জীবকে ধর্মপথে প্রথম আনয়ন করিবার কৌশল মাত্র এবং অযথা পশুহিংসা কমাইবার উপায় মাত্র বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোন রকম একটা দেবীপূজা করিয়া পশু বলিদান দিয়া মাংস ভোজন করিতে হইলে, অন্ততঃ পূজাদিতে এবং অপর ব্যয় যাহা হইয়া থাকে, সকলে তাহাতে সক্ষম হইতে পারে না, প্রকারান্তরে তাহা আপনা আপনি কমিয়া থাকে। গুরু ও শিষ্য উভয়ে মদ্যপায়ী ও মাংসাশী হইলে, তাহার বিপরীত ফলই হইয়া থাকে, যেমত বর্ত্তমানে ঘটিয়াছে। নচেৎ মদ্যপান করিয়া ও মাংস ভোজন করিয়া এবং পশু বলিদান করিয়া যদি স্বর্গলাভ হয় তাহা হইলে নরকে কে যাইবে?

"যূপং কৃত্বা, পশুন্ কৃত্বা, কৃত্বা রুধির কর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যত স্বর্গো নরকো কেন গম্যতে।।"

ইতি যোগোপনিষদে শুকবাক্য। অর্থাৎ যূপকাষ্ঠে (হাঁড়িকাঠে) পশুবধ করিয়া যদি স্বর্গ লাভ হয় তাহা হইলে নরকে কে যাইবে? বৈদিক কার্য্যে পশুহিংসাদিরূপ যে সকল দোষ আছে তৎসম্বন্ধে কপিল দেব বলেন—"দুঃখাদ্দুখং জলাভিষেকবন্নজাত্য বিমোকঃ।" ইতি কপিল সূত্র ৮২ প্রথম অধ্যায়। অর্থাৎ জলের দ্বারা যেমত শীত নিবারণ না হইয়া বরং শীতের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে তদ্রূপ মেষ মহিষাদি পশু বধ করিয়া যজ্ঞ কর্ত্তার দুঃখের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। সুতরাং এইরূপ বলিদান, "লাভঃ পরং গোবধঃ।" বলি শব্দের অর্থ উপহার, সাধনরূপ যজ্ঞকালে সাধকের নিজ শরীরস্থ আসুরিক ভাবাদি পশুভাব সকলকে বলি (উপহার) দিয়া দেবভাবে পূজা করাই বলির উদ্দেশ্য। প্রাণিবধ করিয়া বলি দেওয়া শাস্ত্র কর্তার অভিপ্রায় নহে, তবে আমার বুঝিবার দোষে আমি অকার্য্যকেও কার্য্য বোধ করিয়া থাকি তাহা শাস্ত্রকারগণের দোষ নহে, সে দোষ আমার নিজেরই। জীবরূপ রাজা সুরথও অজ্ঞানে ও অজ্ঞানী লোকদের কথায় লক্ষ পশুবলি দিয়াছিলেন। আত্মক্রিয়া সাধন দ্বারায় তৎপরে দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলেন, তুমি যে এই লক্ষ পশুবলি দান করিয়াছ তাহাতে তোমাকে লক্ষ পশুজন্ম ধারণ করিয়া লক্ষ আঘাত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে সুরথ অজ্ঞানকৃত পাপের খণ্ডন জন্য দেবীর স্তব করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া বলেন, তোমাকে লক্ষ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। এক জন্মেই এক সঙ্গে লক্ষ আঘাত পাইয়া তাহার পর মুক্ত হইবে। ইহাই যদি পশু বলিদানের ফল হয় তাহা

হইলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিদান কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারেন। বাস্তবিক পশু বলিদানে নিজেরই অনিষ্ঠ করা হয় তাহাতে দেবীর সন্তোষ আদৌ হয় না। তান্ত্রিকগণ, সাত্ত্বিক পঞ্চমকার তন্ত্রে থাকিতেও আপন রুচি অনুযায়ী, রাজসিক ও তামসিক পঞ্চমকার ব্যবহার করিয়া আপন আপন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকেন মাত্র। নচেৎ অপর কিছুই হয় না। মদ্যপান করাটা মহাপাতকের মধ্যে গণ্য, তাহাই পান করিয়া নিজেকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ইহা অপেক্ষা আর বাতুলতা কি হইতে পারে?"

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেতবৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্বে, সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ।।
মাংসভক্ষণ মাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্বে পুণ্যভাজো ভবন্তহ।।
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং লভেতবৈ।।
সর্বেঽপি জন্তবো লোকে স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ।।"

অর্থাৎ মদ্যপানের দ্বারায় যদি মানুষ সিদ্ধি লাভ করে তাহা হইলে যাহারা মদ্যপায়ী তাহারাও সিদ্ধিলাভ করুক মাংসভক্ষণ মাত্রই যদি পুণ্যা গতি হয় তাহা হইলে জগতে মাংসাশী সকলেই পুণ্যাভাক হউক। হে দেবেশি, স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারায় যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে স্ত্রীসেবা হেতু জগতে সকল জীবই মুক্ত হউক। ইতি কুলার্ণব তন্ত্র।

আরো আশ্চর্য্য ছাগল, মেষ, মহিষ বলিদান প্রদান করা হইয়া থাকে; ছাগলের মাংস ও মেষের মাংস মহাপ্রসাদ বোধে আহার করিয়া রসনা চরিতার্থ করা হইয়া থাকে। মহিষের বেলায় আর মহাপ্রসাদ হইল না, অখাদ্য বোধে পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। যদি মহিষের মাংস অখাদ্য হইল, তাহা হইলে সেই অখাদ্য বস্তু দেবীকে বলি প্রদান করাটা কোন যুক্তি অনুসারে হইয়া থাকে তাহাও বলিতে পারি না। ভ্রান্ত জীবের সমস্তই ভ্রান্ত ভাবে কার্য্য হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক ভাবের কার্য্যাদিতে কাহারও লক্ষ্য হয় না। (এইখানে আর্য্য মিশনের "ধর্ম পূজাদি মীমাংসার" ১৩০ হইতে ১৪২ পর্য্যন্ত যে সাত্ত্বিক পঞ্চমকারের বর্ণনা আছে তাহা দ্রষ্টব্য)।

আমার বাবার এই সব কথা বলা শেষ হইলে, পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "বাবু আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য। বলিদান যাহা হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অবিধি পূর্বকই হইয়া থাকে। উহা বাস্তবিক ঠিক নহে।" বাবা তদুত্তরে পুরোহিত মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি আমার নিকটে আমার মতন বলিতেছেন, আবার যেখানে বলিদান হইয়া থাকে সেখানে উপস্থিত থাকলি সেখানে তাহাদেরই মতন ভাবে তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন যে, "বলি না হইলে কি পূজা হয়?" ইত্যাদি বলিতেও বোধহয় কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—"তা, বাবু আপনি যাহা বলিলেন সবই সত্য, অনেকে আপন আপন যজমানের মনঃসন্তোষের জন্য ঐরূপ বলিয়া থাকে বটে। তা বাবু আমি ওরূপ নহি আমি আপনার বাড়ী ব্যতীত কোথাও যাইও না, যাইবার

আবশ্যকও হয় না।" ইহা বলিয়া পুরোহিত মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চুপ করিয়া রহিলেন। বাবা তাহার পর মা'কে বলিলেন, "আজ যেন বেশী লোকের আয়োজন না হয়।" মা বলিলেন—"আমি তাহা জানি, আমি সব ঠিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বাবা চলিয়া গেলেন।

তাহার পর মা কুমারী পূজা করিয়া ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আমাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইলেন। মা বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেবীর প্রাতঃকালীন খিচুড়ি ভোগের যাবতীয় দ্রব্য পূজার দালানে পাঠাইয়া দিলেন। খিচুড়ী ভোগ হইয়া গেলে পর, একবার দেবীর আরতি হইল। যেমত পূর্বদিন হইয়াছিল সেই মত সমস্ত কার্য্য হইয়া গেলে, মধ্যাহ্নে সাদা ভোগ ও আরতি সমাপন করিয়া তৎপরে হোমকার্য্য সমাপনান্তে পূর্ণাহুতি দিয়া, দক্ষিণান্ত করা হইয়া নবমীপূজা শেষ হইয়া এইখানেই একপ্রকার পূজার কার্য্য শেষ হইল। মধ্যাহ্নে লোকজনও পূর্বদিনের মতন ভাবে ভোজন করিল, তবে অদ্য লোকের সংখ্যা পূর্ব দিনের অপেক্ষায় কিছু কম হইল। আমি খোকা, আমার এই পূজা উপলক্ষে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটিয়া যাইতেছে। আনন্দে কাটিয়া যাইতেছে, বলিতেছি সত্য, কিন্তু আমি খোকা, আনন্দ যে কি তাহা বিশেষ জানি না। কারণ আমি খোকা আমার অপেক্ষায় যাঁহারা বড় বড় ওজনের খোকা, তাঁহাদেরও যে আমার অপেক্ষায় কিছু বিশেষ জ্ঞান আনন্দ সম্বন্ধে আছে, তাহা আমার বিশ্বাস নাই। কারণ যাঁর যত শরীরের ওজন বেশী, তাঁর তত পরিমাণ আকাঙ্ক্ষাও বেশী। আকাঙ্ক্ষা কাহারও যে পূরণ হয়, খোকাভাব থাকিতে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। তবে ছোট খোকা আর বড় খোকা। বড় বড় খোকাদের আকাঙ্ক্ষাও বায়না সব বড় বড় বিষয়ের। আমি ছোট খোকা, আমার ওজন অনুযায়ী আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও কম। আকাঙ্ক্ষার বিষয় আমার কম বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমার নিকট অধিকাংশ বিষয় অজ্ঞাত থাকায় আমার তৎ তৎ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও হইতে পারে না। তবে এই যে যাহা আমাকে দেওয়া হয়, বা বড় বড় খোকাদের দ্বারা আনিত বিষয় যাহা প্রথমে আমি দর্শন করিয়া থাকি, তাহাতেই কেমন একটা হর্ষভাব, হাঁসি হাঁসিভাব আমার আসিয়া থাকে। আমার এই হাঁসি হাঁসি ভাবকেই আমি মোটামুটি আনন্দ বলিয়া জানি। আমার অপেক্ষায় বড় বড় ওজনের খোকারাও এই মনের হাঁসি হাঁসি ভাবকেই আনন্দ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও কোন একটা আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রাপ্ত হইলে না হয় একটু জোরে হাঁসিয়া আনন্দ করিয়া থাকেন, প্রভেদ এই মাত্র। বড় বড় খোকাদের আকাঙ্ক্ষার বীজ একেবারে মন হইতে না যাওয়ায় তাঁহাদের কোন বিষয়েই বিশেষ আনন্দ হয় না। যাহা হয় তাহা ক্ষণিক, কারণ আকাঙ্ক্ষার বীজ বর্তমান থাকায় আবার অন্য দিকে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য ধাবিত হয়, সুতরাং বড় বড় লোকেরা নিরানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছোট খোকাই হউন, আর বড় বড় ওজনের খোকাই হউন, সকলের নিকট যে আকাঙ্ক্ষাভাব রহিয়াছে, তাহা খোকা ভাবের বর্তমান অবস্থায় অপূরণীয়, সুতরাং প্রকৃত আনন্দের বোধ ছোট খোকা বা বড় বড় খোকার উভয়েরই থাকা সম্ভবপর নহে।

বড় খোকাদের ভিতরে কেহ কেহ আনন্দের পরিচয় দিতে গিয়া বা আনন্দের অর্থ করিতে গিয়া বলিলেন, 'সত্যং জ্ঞানামানন্দং ব্রহ্ম''। সত্য কি তাহা জানি না, জ্ঞান ও তদ্রূপ, আনন্দও তথৈবচ, ব্রহ্মত অনেক দূরের কথা। ব্রহ্ম শব্দ মাত্র বলিয়া থাকি। ব্রহ্ম কি তাহা জানি না। জানিব কোথা হইতে, আকাঙ্ক্ষার জ্বালায় অস্থির। আকাঙ্ক্ষার উৎপীড়নে, ব্রহ্ম বা ভগবান সব লোপ করাইয়া নিরানন্দের ভাবে কালক্ষয় করিয়া, কোন গতিকে দিন যাপন করিতে হয়। সুতরাং সত্যের বোধ থাকা অসম্ভব। কারণ সত্যের বোধ থাকিলে আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। যখন আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে তখন সত্যের বোধ নাই বলিতে হইবে। মুখে সত্য শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে সত্য বোধ আমার হইয়াছে তাহা বলা আমার উচিত নহে। কারণ আমি যাহা কিছু দেখিতেছি সবই অনিত্য; অনিত্য বস্তু কখন সত্য হইতে পারে না। যাহা নিত্য তাহাই একমাত্র সত্য পদবাচ্য। মিথ্যার বিপরীত যাহা তাহাই সত্য স্বরূপ। অনিত্য বস্তু বা বিষয় মাত্রই মিথ্যা। আমার খোকাভাবে নিত্য স্বরূপ সত্যে লক্ষ্য না থাকায় আমার নিকট অনিত্য স্বরূপ মিথ্যা বস্তু মাত্রই সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। আমি একরকম সত্যহারা হইয়া সত্য সত্য করিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছি, সত্যের সাড়া শব্দ উদ্দেশ পাইতেছি না। এরূপভাবে ডাকিলে যে কোন কালে উদ্দেশ পাইব তাহা আমার বিশ্বাস নাই, কারণ কোন খোকাই ডাকিয়া ডাকিয়া উদ্দেশ পান নাই। তখন আমি ছোট খোকা, আমার সে আশা দূরাশা মাত্র।

ডাকিয়া উত্তর না পাইবার প্রধান কারণ, যেমত কোন একটা শূন্য স্থানে, যেখানে কেহ নাই, সেইখানে যদি কোন সত্য নামক খোকা 'সত্য কোথায় আছ' 'সত্য কোথায় আছ' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উত্তর দেয় কে? যে ডাকিতেছে তাহার নামই সত্য। সেই শূন্যময় স্থলে অপর সত্যের অভাব হেতু সাড়া দিবা লোকাভাব থাকায়, শূন্য স্থলে সত্য শব্দ উচ্চারিত হওয়ায়, শব্দের প্রতিশব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া 'সত্য' 'সত্য' শব্দ হইতে লাগিল; 'সত্য' নামক খোকা প্রতিধ্বনি শুনিয়া সেই শব্দেরই অনুসন্ধান করিতে লাগিল; যখনই ডাকে তখনই সেই ডাকের সহিত প্রতিধ্বনি হয়, অথচ সত্যকে খুঁজিয়া পায় না; সত্যহারা ব্যাকুল হইয়া শেষে সত্যের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চাহে না। আমি খোকা, আমি জানি না যে, প্রতিধ্বনিতে যে 'সত্য' শব্দ হইতেছে, তাহা আমারই 'সত্য' 'সত্য' শব্দের প্রতিধ্বনি এবং আমারই নাম যখন সত্য তখন অপর কেহ এখানে না থাকায় উত্তর কে কাহাকে দেয়? তদ্রূপ সত্যস্বরূপ স্থির প্রাণরূপ আত্মা আমাকেই (আমার দেহেতে) বর্তমান, আমি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছি; দেহের বাহিরে অনুসন্ধান করিলে বা ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইলে উত্তর কে কাহাকে দিবে? সুতরাং ডাকিয়া উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার উপর আকাঙ্ক্ষারূপ চাবুকের আঘাতে জরিত হইয়া, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে হয়; সুতরাং সত্য আমার নিকট যেমত অজ্ঞাত রহিয়াছেন, তদ্রূপই অজ্ঞাত থাকিয়া যান। সত্য অজ্ঞাত থাকায়, সত্যের জ্ঞানারূপ জ্ঞান আমার নাই, কেবল সত্য

শব্দ মাত্র শুনিয়াছি। শুনা কথা আর জানা কথায় সম্পূর্ণ পৃথক। শুনা কথায় নিজের আনন্দ হয় না এবং শুনা কথা সত্য হইতে পারে, নাও পারে, সুতরাং শুনা কথাকে জানারূপ জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমি খোকা, আমার সত্যের জ্ঞান না থাকায় আমার আত্মা নন্দরূপ (সচ্চিদানন্দরূপ) আনন্দ নাস। আমার প্রাণকর্ম্মের বর্তমান অবস্থায় অতীতাবস্থার জ্ঞান না হওয়ায় বা না থাকায় আমার প্রকৃত আনন্দ নাই, তবে আনন্দের ছায়া মাত্র আছে। তাহাতেই কখন কখন দুঃখ জড়িত সুখের সময় হর্ষ বা হাসি হাসি ভাব দেখা যায়। দুঃখ জড়িত সুখ বলিবার তাৎপর্য্য, আমার খোকাভাবে বা আমার বর্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্য অবস্থায় যে সকল সুখ আমি বোধ করিয়া থাকি, সেই সকল সুখের অন্তরালে দুঃখের ছায়া অবস্থিতি করিয়া থাকে। কারণ আমি যে সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া থাকি সে সমস্তই আশু সুখ; আশু সুখের পরিণাম দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। পরিণামে সুখকর এমত সুখ আমি এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। আমিত ছোট খোকা, আমার তাহা না পাওয়াই সম্ভব। বড় বড় খোকারাও কেহ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ, সুতরাং নির্ম্মল আনন্দ যে কাহারও আছে তাহা আমার প্রতীতি হয় না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়োৎসব

পূর্বে বলা হইয়াছে, নবমী পূজা, হোম, দক্ষিণান্ত সবশেষ হইয়া গিয়াছে। অদ্য বিজয়া, দেবীর নিরঞ্জন হইবে, অর্থাৎ প্রতিমার নিরঞ্জন হইবে, ইহাকে দেবীর বিসর্জনও কহিয়া থাকে। বিজয়া শব্দটী শুনিবামাত্র সাধারণতঃ ঠাকুর বিসর্জন হইবে অর্থাৎ ঠাকুরকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে ইহাই বুঝায়। বস্তুতঃ তাহা নহে, বিজয়া শব্দের মহান ভাব রহিয়াছে। আমি খোকা, সুতরাং বিজয়া, 'ঠাকুর বিসর্জন হইবে', ইহা ব্যতীত ইহাতে আর কি মহান ভাব থাকিতে পারে তাহা বুঝিবার থাকিলেও তাহাতে খোকাভাবে প্রায় লক্ষ্য হয় না। সাধারণতঃ ছোট বড় সকল খোকারই আমার মতন ঠাকুর বিসর্জ্জন বলিয়াই জানা আছে। পূর্বে যে আনন্দের কথা বলা হইতেছিল, বিজয়াই সেই আনন্দরূপিণী এবং আনন্দসদায়িকা। এই বিজয়াই একমাত্র জীবকে সচ্চিদানন্দরূপ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণশক্তিরূপা দেবীই, অপরাজিতা বিজয়ারূপিণী। প্রাণশক্তিরূপা ভগবতী দুর্গার, (ক্রিয়াযোগের দ্বারা) সম্বর্দ্ধনরূপ পূজার যে নিগূঢ়ত্ব আছে অর্থাৎ প্রাণশক্তির সম্বর্দ্ধনরূপ আত্মক্রিয়ার অন্তর্ম্মুখিনী গতিরূপ শক্তিদ্বারা, আসুরিক ভাব সমূহ মর্দ্দিত হইলে যে অবস্থা হয়,তাহাই বিজয়া পদবাচ্য।

"বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলং।
বিজয়া তেন সা দেবীলোকে চৈবাপরাজিতা।"

প্রাণশক্তিরূপা দেবীর সম্বর্দ্ধনরূপ ক্রিয়া সাহায্যে আসুরিক ভাবরূপ দৈত্য বা রাক্ষসকুল দমিত হয় বলিয়া, প্রাণশক্তিরূপা দেবীই একমাত্র বিজয়া অর্থাৎ আত্মানন্দ পদবাচ্য। সম্বর্দ্ধনরূপ পূজার দ্বারা বর্তমান প্রাণের চঞ্চল অবস্থার স্থিরত্ব সাধনে মনের আসুরিকভাব দূরীভূত হইলে, বর্তমান মনের সহিত চঞ্চলা প্রাণশক্তিকে, প্রাণের প্রাণ স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে মিলন করাইয়া, বর্তমান মনের ও চঞ্চলা প্রাণশক্তির জয় সাধন করাই বিসর্জন করা। ইহাই প্রকৃত বিজয়োৎসব; ইহাই সাধকের কার্য্য সিদ্ধির অবস্থা বা সিদ্ধ অবস্থা। ইহা ক্বচিৎ কোন ভাগ্যবান সাধকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'ক্বচিৎ' বলিবার উদ্দেশ্য—আমার খোকাভাবে ও আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার ফেরে পড়িয়া, আমার দৃষ্টি বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, অন্তর্ব্বিষয়ে আসক্ত হইতে প্রায় চাহে না; একারণ 'ক্বচিৎ কোন ভাগ্যবান প্রাপ্ত হন' বলা হইয়াছে নচেৎ সকলেরই প্রাপ্ত হইবার সমান অধিকার আছে। বহির্ভাবে, প্রতিমা নিরঞ্জন বা বিসর্জন, জলে যাহা করা হইয়া থাকে তাহারও উদ্দেশ্য—জল নারায়ণের স্বরূপ, একারণ জলে নিমগ্ন করাকে বিসর্জন বলা হইয়া থাকে। আমাদের বাড়ীতে অদ্য প্রতিমা বিসর্জন হইবে শুনিলাম। আমাদের কুলপ্রথা অনুযায়ী মধ্যাহ্নকালের পূর্বেই প্রতিমা বিসর্জন হইয়া থাকে; একারণ পুরোহিত মহাশয় আসিয়া বিসর্জনের পূজা সাঙ্গ করিয়া, ভোগ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অদ্য দেখিলাম, ভোগ যাহা দেওয়া হইল তাহা ভিজে ভাত, ব্যঞ্জনাদিও বাসি—অর্থাৎ ব্যঞ্জনাদি নবমীর রাত্রে পাক করিয়া শুদ্ধাচারে ভোগের জন্য রাখা হইয়াছিল। দেবীর ভোগের জন্য যাহা রাখা ছিল তাহাই ভোগ দেওয়া হইল এবং একটা পাত্রে কতকগুলি মুড়কি ও দধি একত্রে দেবীকে দেওয়া হইল। ইহাকে দইকর্মা বা দধিকর্মা বলা হইয়া থাকে। সমস্ত উৎসর্গ হইয়া গেলে পর, আরতি একবার হইল, তাহার পর দেবীর প্রথম দর্পণ বিসর্জন হইল—অর্থাৎ একটা পাত্রে জল রাখিয়া তাহা দেবীর সম্মুখে রাখিয়া তৎপরে একখানি দর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলে নিমগ্ন করা হইল। এই সময়ে ঢুলিরা যাহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া থাকে, তাহাদিগকে বির্সজনের বাজনা বাজাইতে বলা হইল ও তাহারা বিসর্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল।

বিসর্জনের কার্য্য হইয়া গেলে, মা বাড়ীর ভিতর গেলেন। বাড়ীর ভিতর যাইয়া, মা উপরে গিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া, সাধারণ গহনা, অর্থাৎ বাড়ীর কর্ত্রীরা যেরূপ গহনা পরিয়া থাকেন তদনুরূপ কিছু গহনা, অঙ্গে ধারণ করিলেন; এবং একখানি বেনারসী কাপড় পরিধান করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলেন। নীচে আসিয়া অন্যান্য স্ত্রীগণকে বলিলেন, "তোমরা সব প্রস্তুত হইয়াছ? বাহিরে বরণ করিতে যাইতে হইবে।" মা'র উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের আর দেরী নাই আপনার সঙ্গেই যাইতেছি!" এমন সময় বাবা বাহির হইতে আসিয়া মা'কে বলিলেন, "ঠাকুর উঠানে নামান হইয়াছে, তোমরা বরণের সামগ্রী সব লইয়া বাহিরে আইস।" মা বলিলেন, "আমরা সব প্রস্তুত

আছি, যাইতেছি।" তাহার পর মা সকলকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে যাইলেন, আমিও মা'র সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া বাহিরে আসিলাম। বলা বাহুল্য এস সময় বাহিরে বাড়ীর খোকারা ব্যতীত অপর লোক উঠানে নাই। মা উঠানে আসিয়া আর চারজন সধবা স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া, কেহ বা জলের গাড়ু হাতে করিয়া জল ধারা দিতে দিতে কেহ বা বরণ ডালা মাথায় করিয়া, কেহ বা শ্রী মাথায় করিয়া দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাতপাক ঘুরিয়া অবশেষে সকলে দেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মা নিজ হস্তদ্বারা বরণ করিতে লাগিলেন। কখন বা দুই হস্তে জল দিয়া দেবীর পা হইতে কপাল পর্য্যন্ত হস্তের অঙ্গুলি কাঁপাইতে কাঁপাইতে তিনবার বরণ করিলেন। কখন বা ঐরূপে পানের বরণ করিলেন। তাহার পর শ্রী লইয়া বরণ এবং তৎপরে ১ খানা কুলায় মঙ্গলি ভাঁড় সমেত হস্তে করিয়া বরণ করিয়া তাহার পর বরণ ডালা (বস্তু সমেত) হস্তে ধরিয়া দেবীর পা হইতে কপাল দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া বরণ করিলেন। এইরূপে বরণ করিয়া তাহার পর সকলে দেবীমূর্ত্তির মুখে একটু করিয়া মিষ্টান্ন, সন্দেশ ভাঙা দিলেন। তৎপরে ছেঁচা পান সকল দেবমূর্ত্তির মুখে দিয়া, নিজ বস্ত্রের দ্বারা দেবমূর্ত্তিগণের পদধূলি লইবার অভিপ্রায়ে, দেবীর পদে বস্ত্র স্পর্শ করাইয়া, যাঁহারা যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মস্তকে দিলেন; আমারও মস্তকে মা সেই বস্ত্র স্পর্শ করাইয়া দিলেন। সর্বশেষে আমার বাবাকে ডাকান হইল। বাবা আসিয়া কনকাঞ্জলি দিলেন। অর্থাৎ বাবা দেবীর পশ্চাৎ হইতে, একখানা রেকাবিতে এক রেকাবি চাউল এবং একটা পান, একটা সুপারি ও একটা টাকা এই সমস্তগুলি রেকাবি সমেত, মা'র আঁচলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর আমার মা কনকাঞ্জলির দ্রব্য লইয়া জল ধারা দিতে দিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও মা'র সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে আসিলাম, মা আমাকে কিছু খাওয়াইয়া দিলেন। আমি দুগ্ধ ও সন্দেশ খাইয়া জল খাইলাম। তাহার পর মা একটা জামা গায়ে পরাইয়া দিয়া ও পায়ে জুতা পরাইয়া দিয়া, ঝিকে দিয়া আমাকে বাবার নিকট, ঠাকুর বিসর্জন দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আমি ঝির সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া পূজার দালানে ঠাকুরকে না দেখিয়া, পূজার দালানটা যেন ফাঁকা ফাঁকা কি এক রকম দেখিতে লাগিলাম। এই কয়দিন পূজার দালানে বেশ শোভা হইয়াছিল, আজ যেন অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। আজ আর সে আনন্দভাব কাহারও নাই, সব যেন কি এক রকম নিরানন্দ ভাব। নিরানন্দ হইবারই কথা, কারণ বিজয়লাভ কাহারও ত' হইল না। সকলেরই যে অভাবের ভাব ছিল সেই অভাবের ভাবই আবার ঘুরিয়া আসিল। কয়দিন লোক যাহা হউক আহারাদির লোভে ও আমোদ আহ্লাদে, একরকম গোলেমালে কাটাইতেছিল। আজ তাহার অবসানে মনের যে আনন্দ যেন আর কাহারও নাই। তাহার পর অদ্যকার বিসর্জনের বাদ্যও যে দাঁড়কাকের শব্দের মতন বোধ হইতেছে। বাড়ীতে কোন লোকের কঠিন পীড়া হইলে এবং নিকটে দাঁড়কাক ডাকিলে তাহা যেমন শ্রুতি

কঠোর হইয়া মনের একটা বিষাদ ভাব আনয়ন করিয়া থাকে, অদ্যকার বিসর্জনের বাজনাও তদ্রূপ বোধ হইতে লাগিল।

তাহার পর ঝি আমাকে বর্হির্বাটীর দরজার কাছে আনিয়া উপস্থিত হইল। দরজার সামনে রাস্তার ধারে ঠাকুরকে নামাইয়া কাঠামোর নীচে তিনটা মোটা মোটা বাঁশ দিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতেছে। লোকজন সকলেই দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি বাবাকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বাবা, আমি ঠাকুর ভাসান দেখিতে যাইব'। বাবা তাহাতে আমাকে বলিলেন 'আচ্ছা চল'। ইহা আমাকে বলিয়া ঝিকে বলিলেন, 'ঝি, তুমি খোকাকে কোলে করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস'। তাহার পর বেহারারা ঠাকুরকে কাঁধে করিয়া তুলিলে, সকলেই প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। বেহারারাও আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল, ঢাক, ঢোল, ঘড়ি, কাঁসর, সব বাদ্য বাজনা বাজাইতে বাজাইতে চলিল। (এখন যেমন রাস্তায় বাদ্য বাজনা করিয়া যাইতে হইলে, পাশ করিতে হয়, তখন তত হাঙ্গামা ছিল না। সুতরাং বাদ্য বাজনা সব বাজাইতে বাজাইতে যাইতে লাগিল)। ক্রমশঃ আমরা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার ঘাটে আসিয়া একবার প্রতিমা নামান হইল। তাহার পর একখানা বড়নৌকা ভাড়া করিয়া, নৌকার উপর প্রতিমাকে উঠান হইলে কতক লোকজন ও কতক বাদ্য ভাণ্ড নৌকার উপর উঠান হইল। কেবল বাবা আমি ও আমার ঝি ও আর দুই চারিজন লোক আমরা নৌকায় উঠিলাম না। বাবার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা গঙ্গার মধ্যখানে যাইলে, নৌকা হইতে প্রতিমাকে জলমগ্ন করা হইল। বাবাও সেই সঙ্গে, পূজার ফুল বিল্বপত্র যাহা আনা হইয়াছিল তাহা সমস্ত জলে ফেলিয়া দেওয়াইলেন। তৎপরে বাবা নিজ ঘটের জল গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া ঘটটি মস্তকে করিয়া, ঘটশুদ্ধ গঙ্গার জলে ডুব দিয়া, আবার ঘটটী জল পূর্ণ করিয়া, নিজ মস্তকে ঘটটি স্থাপন করিয়া, দুই হাতে ঘটটিকে ধরিয়া, উপরে উঠিলেন। ওদিকে যাহারা নৌকা করিয়া প্রতিমা বিসর্জন করিতেছিল, তাহারাও ফিরিয়া আসিল। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া বাড়ীর দিকে আগমন করিতে লাগিলেন, আমিও ঝির কোলে আসিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমরা বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম, বাবা ঘট মাথায় করিয়া, ভিজে কাপড়ে পূজার দালানে উঠিয়া মস্তকস্থিত ঘটটি, যে সিংহাসনে প্রতিমাকে বসান হইয়াছিল, সেই সিংহাসনের মধ্যস্থলে বসাইয়া ভিজে কাপড় পরিবর্তন করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বাবাকে বলিলেন, আপনারা সকলে এইখানে উপবেশন করুন, এইবার শান্তিজল দেওয়া হইবে। শান্তিজল দেওয়া হইবে বলায়, বাবা একজন লোককে বলিলেন, "ভিতর হইতে মেয়েদের আসিতে বল, শান্তি জল লইবে।" লোকটা বাড়ীর ভিতর গিয়া খবর দিলে পর আমার মা ও অপরাপর অনেক আমাদের জ্ঞাতি কুটম্বগণের ছোট বড় খুকীরা পূজার দালানে আসিয়া, মাথায় কাপড় দিয়া এবং আপন আপন পা ঢাকিয়া সকলে উপবেশন করিলেন, এবং ছোট

বড় খোকারা দালানের অপরদিকে সকলে আপন আপন পা ঢাকিয়া বসিলেন। পা ঢাকিয়া বসিবার উদ্দেশ্যে—শান্তি জল আপন আপন পায়ে না লাগিতে পারে। আমি আমার বাবার কোলে সকলের দেখাদেখি পা ঢাকিয়া বসিলাম। তাহার পর পুরোহিত মহাশয়, (দু'টা বড় পাথরে সিদ্ধি গোলা ছিল), তাহা ঠাকুরকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, একটা আম্রশাখা হস্তে করিয়া সেই আম্রশাখা জলে ডুবাইয়া, মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সকলের মস্তকে শান্তিজল আম্রশাখার দ্বারা ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। শান্তিবারি সকলকে দেওয়া হইলে, সকলে প্রথমে পুরোহিত মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, বাবাও লৌকিক প্রথানুযায়ী পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। তাহার পর সকলে বাবাকে প্রণাম করিতে লাগিল, আমি পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া, তাহার পর আমার মা'কে প্রণাম করিয়া, বাবাকে প্রণাম করিলাম। তাহার পর পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম, আলিঙ্গন (কোলাকোলি) করিতে লাগিল। ছোট ছোট খোকারা বড় খোকাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিল। খুকীদের ভিতর বড় বড় খুকীদিগকে ছোটরা প্রণাম করিতে লাগিল, বড় বড় খুকীরা সকলে "পাকা মাথায় সিঁদুর পর, হাতের লোহা ক্ষয় যাক, অর্থাৎ বজায় থাকুক" ইহা বলিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। আমার মা'ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা আমার মা'কে প্রায় সকলেই প্রণাম করিতে লাগিল। মা সকলের হাতে মিষ্ট দিয়া পূর্বোক্ত ভাবে সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। আমার বাবা, ছোটবড় সকলের হাতে মিষ্ট দিতে লাগিলেন। বাবার বয়ঃজ্যেষ্ঠ খুব কম ছিল, কেবল বাবার জ্ঞাতি খুড়ার পুত্র, বাবার জ্যেষ্ঠ খুরতুত ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া বাবা প্রণাম করিলেন। তিনিও বাবার সহিত কোলাকোলি করিলেন। আমিও বাবার দেখাদেখি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর, তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া আমার মুখচুম্বন করিয়া, আমার মস্তকে হাত দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন;—"বাবা খোকা, তুমি আমার মতন দীর্ঘ জীবন লাভ কর, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। তাহার পর আমি আমার জেঠা মহাশয়ের কোল হইতে নামিলাম। বলা বাহুল্য জেঠা মহাশয় তাঁর পুত্র অপেক্ষাও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, আমিও জেঠা মহাশয়কে বড় ভালবাসিতাম। তাহার পর সকলে সিদ্ধির খোরা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। মধ্য অবস্থার খুকীরা সিদ্ধির খোরা হইতে কতকটা সিদ্ধি ঢালিয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার পর খোকারা সব সিদ্ধি খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল বাবা ও আমার মা আর প্রাচীন যাঁহারা, তাঁহারা সিদ্ধি খাইলেন না। কেবল মাত্র কপালে একটা সিদ্ধির ফোঁটা পরিলেন, আমাকেও একটা সিদ্ধির ফোঁটা মা কপালে দিয়া দিলেন।

তাহার পর আমার বাবা সকলকে সিদ্ধি খাইতে দেখিয়া বলিলেন, সিদ্ধিটা বুঝিয়া সুঝিয়া খাইও, কারণ ইহাতে মাদকতা শক্তি আছে। ইহার দ্বারা মত্ততা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ইহা সাধারণের ও সাধকের পরিত্যাজ্য বিষয়। অনেকে ভ্রান্তভাবে বলিয়া থাকেন, সিদ্ধি মহাদেবের প্রিয়বস্তু, সুতরাং সিদ্ধি মহাদেবকে উৎসর্গ করিয়া তাহা পান করা

ফলদায়ক। যাহারা সিদ্ধিখোর বা গাঁজাখোর তাহারাই এইরূপ কহিয়া থাকে। তাহাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য, কেবল নিজেদের দোষ স্খলন অর্থাৎ মহাদেবের যখন প্রিয় বস্তু তখন ইহা পানে আর দোষ কি? নিজেরা ত' মাদকসেবী হইয়াছে, তাহার উপর মহাদেবকেও সাধারণ মাদকসেবীর ন্যায় করিয়া রাখিতে চাহে। ভ্রান্ত জীবের সবই ভ্রান্ত ভাব, ভ্রান্তভাবের বশীভূত হইয়া আপন আপন ভাব অনুযায়ী বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। পূজার অন্তে সিদ্ধি খাওয়াটা বাহ্যিক পূজায় চলিয়া আসিতেছে। পূজা যখন বাহ্যিকভাবে হইতেছে তখন তাহার সমস্ত অঙ্গই বাহ্যিকভাবে হইতেছে। বাহ্যিকভাবের সিদ্ধিও বাহ্যিক সিদ্ধি, বস্তুতঃ এ সিদ্ধি প্রকৃত সিদ্ধি নহে। পূজার পর মন্ত্রসিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধিপদবাচ্য। বাহ্যিক সিদ্ধি মত্ততা কারক, সুতরাং সাধারণ ও সাধকের একেবারে পরিত্যজ্য, ইহা সেবন করা চাহিনা।

আমার বাবা এই সকল কথা বলিতেছেন, আমি স্থবিরের ন্যায় স্থির ও অচলভাবে মনঃসংযোগ করিয়া শুনিয়া যাইতেছি এবং এর পর বাবা আর কি বলেন, তাহা শুনিব এই অপেক্ষায় আছি। অপর লোকেরা বাবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে একচুমুক সিদ্ধিও খাইয়া ফেলিতেছে, তবে বাবার কথায় কিছু কম মাত্রায় খাইতেছে। কেহ কেহ বা যাহাতে বাবা দেখিতে না পান এমন গোপনভাবেও সিদ্ধি খাইতেছে। যাহা হউক বাবা কথা বন্ধ করিলে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! ও সিদ্ধি যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্র সিদ্ধির মন্ত্রই বা কি আর সিদ্ধিই বা কি তাহা আমাকে বল না।" আমি আমার বাবাকে এই কথা বলায়, তাহার পর আমাদের পুরোহিত মহাশয়ও আমার বাবাকে অনুরোধ করিলেন, "বলুন না বাবু আপনি এতক্ষণ যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে বেশ ভাল লাগিল এবং যাহা যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই। তবে বাবু আমরা একরকম ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছি, যেমত আমাদের বহির্ভাবে জানা আছে তাহাই করিয়া থাকি। যাহা হউক খোকা দাদা বলিতেছে এবং আমিও বলিতেছি, আপনি বলুন আমরা সকলেই শুনি, ওসব ভাল কথা সকলেরই শ্রবণ করা দরকার।" পুরোহিত মহাশয় আমার বাবা অপেক্ষায় বয়সে জ্যেষ্ঠ, ইনি আমাদের কুল পুরোহিত। শুনিয়াছি, পূজাদি দশকর্ম করিতে বিশেষ পটু এবং শাস্ত্রজ্ঞানও ইঁহার আছে। পুরোহিত মহাশয়ের কথা শেষ হইলে, বাবা সিদ্ধি সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন।

বাবা বলিলেন, সিদ্ধি শব্দের অর্থ মন্ত্রসিদ্ধি বুঝিতে হইবে। তবে বিজয়ার সম্বন্ধে যে সিদ্ধি তাহা জয়লাভ বুঝিতে হইবে। জয়লাভ কিসের এবং কাহাকে জয় করিয়াছি যে, আমার বিজয়রূপ সিদ্ধিলাভ হইবে, বা কাহার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল বা হইতেছে, তাহাও আমি অবগত নহি, সুতরাং আমার জয় লাভরূপ সিদ্ধিই বা হইবে কি প্রকারে? আমার প্রথমতঃ জানা আবশ্যক যে, আমার সহিত কাহার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বস্তুতঃ আমি জীবভাবে মোহবশতঃ তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছি না যে, কে আমার শত্রু আর কেই বা আমার মিত্র এবং কাহাকেই বা আমাকে জয় করিতে হইবে; ইহা

কিছুই আমি অবগত নহি এবং অবগত হইয়াও শত চেষ্টায়ও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। আমার মিত্রপক্ষকেও সময়ে সময়ে লোভের বশীভূত হইয়া শত্রুমনে করি শত্রুপক্ষকে মিত্র বোধে আলিঙ্গন করিয়া থাকি। যেমত আমাদের সৎ প্রবৃত্তি আর কুপ্রবৃত্তি। সৎপ্রবৃত্তি আমার মিত্রপক্ষ, আর কুপ্রবৃত্তি আমার শত্রুপক্ষ। সৎ প্রবৃত্তির মতানুযায়ী কার্য্য করিলে, আমি পরিণামে সুখী হইতে পারিব ইহা নিশ্চিত, কিন্তু আমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আশু সুখের লোভে মোহিত হইয়া, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া, পরিণামে কত জ্বালা, অশান্তি, নানা কষ্টকর রোগ ভোগ করিয়া থাকি। ইহা কেবল আমার কুপ্রবৃত্তিকে মিত্রবোধে আলিঙ্গন করার ফল, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এইরূপ সুনীতি, সুমতি, সদিচ্ছা, আত্মরতি, আত্মজ্ঞানের উপরে নিষ্ঠা, দান (সাত্ত্বিক দান), ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ (প্রাণযজ্ঞ), আত্মধ্যান, তপস্যা (তপোলোকে থাকা, ভ্রূর মধ্যে মনকে রাখা) সত্য, অকাম ভাব, অক্রোধ, অহঙ্কাররাহিত্য ভাব, খলতাশূন্যভাব, লোভ শূন্যতা ইত্যাদি ইহারা আমার মিত্র-পক্ষ। আর কুপ্রবৃত্তি, কুনীতি, কুমতি, অসদিচ্ছা, আত্মবিরতি, আত্মজ্ঞান উপায়ে আস্থা বিহীনতা, দান বিহীনতা, যদি কিছু দান করা হয় তাহা তামসিক দান, যেমত বেশ্যাদিগকে অর্থদান বা যশঃ প্রত্যাশায় অর্থদান, বা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থদান ইত্যাদি, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলের সংযমে বিরতি অর্থাৎ অনাস্থা, বাহ্য যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি যেমত বেশ্যালয়ে পূজা করান বা দম্ভসহকারে যশঃ প্রত্যাশায় বাহ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি, কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদিব্রত ও পঞ্চতপাদি এবং বাহ্য সন্ন্যাসাদি বিষয়ে প্রবৃত্তিরূপ তপস্যা, অকামস্থলে সর্ব্বত্র কামনাদি সহিত কার্য্যকরণ প্রবৃত্তি, ক্রোধভাব, অহঙ্কার, খলতা, হিংসা, দম্ভ ইত্যাদি ইহারা আমার শত্রুপক্ষ এবং জীবমাত্রের শত্রুপক্ষ। অবশ্য এই শত্রুপক্ষদিগকে যে জীব একেবারে জানে না তাহা নহে, জানিয়া শুনিয়াও জীব ইহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্ধবৎ অনেকেই শত্রুপক্ষেরই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলেন। আবার অনেকে বাহ্য ধর্মহীন নীতির দ্বারা শত্রুপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেবল যে, বাহ্য নীতির দ্বারায় এই মহান শত্রুপক্ষীয়গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের কার্য্যকলাপে, মনে মনে বা গোপনে, শত্রুপক্ষের অনুমোদিত সমস্তই চরিতার্থ হইয়া থাকে, কেবল বাহিরে রাজদণ্ড ভয়ে কোন কুৎসিত কার্য্য প্রকাশ পায় না। আবার কেহ কেহ বাহ্যিক ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিয়া বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া শত্রুপক্ষগণকে জয় করিতে যান। ইঁহারা ভ্রান্ত, কারণ শত্রুপক্ষ সকলেই অনঙ্গ একরকম শূন্যস্বরূপ বা বায়ুরূপী সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিরোধ দ্বারা শত্রু বশীভূত হইবার নহে। তাহা জানা না থাকায়, শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিণামে শত্রুপক্ষের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বা বাহ্য ধর্মের উৎকট আচারাদি পালন করিয়া ও ইন্দ্রিয় নিরোধ বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহদ্বারা উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে বা কালে কাল কবলে পতিত হইয়া কালের ভক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হন। আবার কেহ কেহ বা যেমত

স্ত্রীগণের মধ্যে, কেহ আপন পতিকে বেশ্যাসক্ত দেখিয়া বা দুর্মতিযুক্ত দেখিয়া মন্ত্র ঔষধি দ্বারা বশীভূত করিতে গিয়া শেষে মন্ত্র ঔষধি দ্বারা পতিকে পাগল বা উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে, তদ্রূপভাবেও অনেকে শত্রুপক্ষকে জয় করিবার জন্য মন্ত্রৌষধি ব্যবহার ও মাদকাদি সেবন করিয়া পরিণামে উন্মাদগ্রস্ত বা উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ও বিফল মনোরথ হইয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বা মন্ত্র চৈতন্য বা মন্ত্র সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মন্ত্রজপাদি, কুলপ্রথানুযায়ী কৌলিক ভাবে মন্ত্র চৈতন্য করিতে গিয়া পরিণামে মদ্যপায়ীতে পরিণত হয়েন; আবার কেহ বা মদ্যাদি পান না করিয়া সাদা সিদে ভাবে, শত্রুকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে, মন্ত্রজপাদি বিধিপূর্ব্বক আগমাদি করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া থাকেন তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র চৈতন্য বা মন্ত্র সিদ্ধি ব্যতীত যে শত্রুপক্ষ জয় হইবে না তাহা ধ্রুব সত্য হইলেও মন্ত্র কি তাহা আমার জানা নাই। আমার জানা আছে কয়েকটি যুক্ত বর্ণই মন্ত্র। বাহ্যিক যুক্ত বর্ণ যাহাকে আমি মন্ত্র বলিয়া থাকি বাস্তবিক তাহা মন্ত্র পদবাচ্য নহে। উহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, উহা কোটি কোটি বার জপ করিলে কাহারও কিছু হইবে না; বা সেই মন্ত্রের দেবতার কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করিলেও কিছু হইবে না। ইহাও শত্রুপক্ষের ছলনা ইহার দ্বারা আমাকে বাহ্যিক ধ্যানে আসক্ত করাইয়া আত্মধ্যানে বঞ্চিত করাইয়া, শত্রুপক্ষ আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া শত্রুপক্ষের অনুমোদিত কার্য্য করিয়া, ধর্ম্মের ভাণে অনেক কুৎসিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হই না। বস্তুতঃ যতক্ষণ আমি মন্ত্র কাহাকে বলে তাহা না বুঝিব ততক্ষণ আমার শত্রুপক্ষকে জয় করিতে যাওয়া একপ্রকার বিড়ম্বনা, তবে বিড়ম্বনা হইলেও শত্রুপক্ষকে জয় করিবার চেষ্টা সততপরত করা চাহি। কৃতকার্য্য না হইলেও চেষ্টার ত্রুটি কোনরকমে করা চাহি না বা শত্রুপক্ষের পক্ষভূত হইয়া শত্রুপক্ষের মনোরথ পূর্ণ করা চাহিনা। যতটা পারা যায় বাধা দেওয়া চাহি এবং মন্ত্র কি তাহা জানিয়া মন্ত্র সিদ্ধির জন্য "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই ভাবে চেষ্টা সহজকে অবলম্বন করিয়া করা চাহি। সহজ পথে গমনাগমন করিলে একদিন কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

মন্ত্র শব্দের অর্থ আমার ন্যায় জীবের পক্ষে ধারণা করা বা ধারণা হওয়া বহু পূর্ণ্য সাপেক্ষ। স্বয়ং পার্ব্বতী জীবের শিক্ষার জন্য মহাদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, মন্ত্র কাহাকে বলে আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, আমাকে বুঝাইয়া দিন। পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে ভগবান গুরুরূপী মহাদেব বলিয়াছিলেন,—

"শিবাদি বা (ব্রহ্মাদি) কৃমি পর্য্যন্তং প্রাণীনাং প্রাণবর্দ্ধনং।
নিশ্বাস শ্বাসরূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।।"

অর্থাৎ প্রাণিগণের নিশ্বাস যাহা শ্বাসরূপে চলিতেছে তাহাই মন্ত্র শব্দবাচ্য, ইহাকেই অজপামন্ত্রও কহিয়া থাকে, ইনিই চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবী মহামায়া দুর্গা। এই নিশ্বাসরূপ শ্বাসকে সাধনদ্বারা জয় করিতে পারিলে, অর্থাৎ জিতশ্বাস হইলে, তবে

শত্রুপক্ষকে জয় করা যায় নচেৎ নহে। কারণ শত্রুপক্ষরা বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থারূপ প্রাণকর্ম যাহা শ্বাসরূপে চলিতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আছে এবং বর্তমান চঞ্চল মনেরও উৎপত্তি স্থান প্রাণকর্ম। মন দুই প্রকার, স্থির ও চঞ্চল। চঞ্চল প্রাণ হইতে বর্তমান চঞ্চল মন এবং প্রাণের স্থিরত্ব অবস্থায় স্থির মন। যাহার দ্বারা বর্তমান মনের ত্রাণ হয় অর্থাৎ উদ্ধার হয় তাহাই মন্ত্র। বর্তমান চঞ্চলভাব দূর করিয়া স্থিরভাবে পরিণত করাই, মনের সঙ্কটাবস্থা হইতে ত্রাণ পাওয়া। স্থির মনই আত্মস্বরূপ। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থারূপ শ্বাস প্রশ্বাসই মন্ত্র শব্দবাচ্য, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বর্তমান প্রাণকর্মের স্থিরত্ব সাধন করাই একমাত্র মন্ত্রসিদ্ধি, অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের স্থিরত্ব সাধনে, (বর্তমান মন স্থিরত্ব প্রাপ্তে) বর্তমান মনের যে সংজ্ঞা হারাইয়াছে তাহা সে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই মন্ত্রচৈতন্যের অবস্থা বা ইহাই মন্ত্রচৈতন্য। এই অবস্থাই জীবের প্রকৃত বিজয় অবস্থা কারণ জিতশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্তে জীব জিতেন্দ্রিয় হইয়া শত্রুপক্ষকে সম্যকরূপে জয় করিয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব শিবত্ব প্রাপ্তে, বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ সিদ্ধিপান করিয়া তাহাতে মগ্ন থাকেন, ইহাই প্রকৃত শিবের সিদ্ধিপান করা। নচেৎ শিব বাহ্যিক মাদকরূপ সিদ্ধি পান করেন ইহা অজ্ঞ লোকেরাই কহিয়া থাকে। তবে বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ সিদ্ধি ইহা শিবের একমাত্র প্রিয় বস্তু তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। শান্তি ও সিদ্ধি একই অবস্থা। উপরিউক্ত শত্রুপক্ষকে জয় করিতে না পারিলে কাহারও শান্তিলাভ হয় না, এবং মুখে শান্তি শান্তি শব্দ করিলেও কেহ শান্তি প্রাপ্ত হয় না। মন্ত্ররূপ বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থাই একমাত্র শান্তির অবস্থা।

ইহা বলিয়া আমার বাবা নিরস্ত হইলে পর আমাদের পুরোহিত মহাশয় বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবু, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, কারণ পূজাদির কার্য্যপ্রণালী যাহা পুঁথিতে লিখিত আছে তাহা সমস্তই বায়ুক্রিয়াতে পরিপূর্ণ। আমাদের বায়ুক্রিয়ার কোনরকম সাধন করা নাই এবং তাহার অভ্যাসও আমরা করি না। তবে মোটামুটি নাসিকাতে হস্ত দিয়া, পূরক, কুম্ভক, রেচক, অল্প স্বল্প সময় সময় করিয়া থাকি। তাহাতে কিছুই হয় না, বরং বেশী করিলে শরীরে নানাপ্রকার উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের বায়ুক্রিয়া জানা না থাকায় এবং প্রকৃত অন্তর্পূজা জানা না থাকায়, আমরা কেবল পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পূজা শেষ করিয়া থাকি। তাহাতে কার্য্য ঠিক হয় না, তাহা যে একেবারে বুঝিতে পারি না তাহা নহে, তবে আমরা পূর্বাপর ঐরূপ ভাবেই কার্য্য করিয়া আসিতেছি এবং তদপেক্ষা ভাল শিক্ষা আমাদের নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বা বৈদিক পূজার শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া সেই পাঠের পরীক্ষা দিয়া কোন কার্য্য হয় না; কারণ আমি তন্ত্রশাস্ত্রের পরীক্ষাও অনেককে দিতে দেখিয়াছি তাহারাও যেমন পূজার অঙ্গ জানে আমরাও তদ্রূপ জানি। তন্ত্রশাস্ত্র বা বৈদিক কর্মকাণ্ডের—প্রকৃত গুরু সন্নিধানে কর্ম অভ্যাস ব্যতীত বাবু কিছুই হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রের বা বৈদিক গ্রন্থের বাহ্যিক অর্থ যাহা ব্যাকরণাদি দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহা আমিও

জানি এবং তদনুসারে অপরকে শিক্ষা দিতে পারি, তবে তাহাতে ফল কিছুই হয় না। কারণ তাহা সব বাহ্যিক কর্মে পরিণত হইয়া থাকে। ক্রিয়াযোগের অভ্যাস ব্যতীত কিছুই হইবার নহে। আমরা আমাদের শিক্ষানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই বাহ্যিকভাবে করিয়া থাকি। কারণ আমাদের শিক্ষা যাহা হইয়াছে তাহা সমস্তই বাহ্যিক ভাবের। আমরা বাহ্যিক ভাবের যে সমস্ত কর্ম কাণ্ড করিয়া থাকি, তাহা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জন্য নহে। স্বয়ং রঘুনন্দনও তাঁহার স্মৃতি শাস্ত্রে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল কর্মকাণ্ড লিখিত হইল তাহা মুমুক্ষুগণের জন্য নহে। অদ্য আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহা জানা দূরের কথা কখন শ্রবণও করি নাই।

পুরোহিত মহাশয় এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে, বাবা বলিলেন, "বেলাও ঢের হইয়াছে, অনুমতি করেন ত', এইবার সকলের আহারের স্থানের উদ্যোগ করি।" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তার আর অনুমতি কি বাবু, 'শুভস্য শীঘ্রং' আর দেরী করিবার প্রয়োজন নাই।" তাহার পর বাবা সকলের জায়গা করিবার কথা লোকজনকে বলিয়া দিলেন। ভোজনের স্থান প্রস্তুত হইতে লাগিলে, খানিক পরে ভোজনের স্থান হইলে, সকলকে ভোজন করিতে ডাকা হইল। তাহার পর সকলে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অদ্য লোক সংখ্যা কম, কেবল আমাদের বাড়ীর লোক ও জ্ঞাতিরা এবং যে সকল কুটুম্বগণ পূজা উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন তাঁহারাই মাত্র, আর বাহিরের নিকটস্থ প্রতিবেশীরা, সকলে আহারের স্থানে আসিলেন। আমাদের পুরোহিত মহাশয়ও অদ্য এই সঙ্গে ভোজনে বসিলেন। সকলে বসিলে পর, অন্ন ব্যঞ্জন সব দেওয়া হইতে লাগিল। অদ্য মৎস্যেরও নানারকম ব্যঞ্জন হইয়াছে! সকলে বেশ তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিতে লাগিলেন। আমার বাবা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আমি পূজার দালানে চৌকিতে বসিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। আমি খোকা, আমার দ্বারা দেখা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। তবে ইহা আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগিতে লাগিল। আরো বিশেষ, অদ্য যাহারা যাহারা সিদ্ধি খাইয়াছিল তাহারা ভোজন করিতে করিতে এত হাসিতে লাগিল যে, তাহাদের হাসি আর থামে না। হাসিতে হাসিতে যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইতে লাগিল এবং নেশার ঝোঁকের অধিক ভোজন করিতে লাগিল, আর নেশার দরুণ শুষ্ক মুখ হওয়ায় জলও বেশী খাইতে লাগিল। তাহাদের চক্ষুও যেন সব ছোট হইয়া গিয়াছে বোধ হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা চক্ষু প্রায় বুজিয়াই ভোজন করিতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বড় খোকাদের কষ্ট দেখিয়া আমারও যেন কষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক বড় খোকারা নেশার ঝোঁকে খুব খাইতে লাগিল, তাহার পর মিষ্টান্ন আসিলে মিষ্টান্ন দ্রব্য সব বেশী পরিমাণে খাইতে লাগিল। এই সময় বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আমি বাড়ীর ভিতর যাইব।" বাবা আমাকে একজন লোকের সহিত বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ীর ভিতর যাইয়া মা'র কাছে আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া লোকটা

চলিয়া গেল। আমি যখন আমার মা'র নিকট উপস্থিত হইলাম, মা তখন ছোট বড় খুকীদিগকে, ভোজন করাইতে ছিলেন। আমি মা'কে দেখিয়া বলিলাম, "মা, আমার খিদে পাইয়াছে।" মা আমাকে সেইখানেই খুকীদের সহিত একটা পাতা করিয়া বসাইয়া দিয়া খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন এবং বসিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিলেন। এখানেও খুকীদের মধ্যে যাহারা একটু আধটু সিদ্ধি খাইয়াছিল তাহারাও সব ভোজন করিতে করিতে লজ্জাহীনা হইয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। কেহ বা বলিতেছে, "মা আমার জিভটা যেন পেটের ভিতর টানিতেছে, আর মুখ শুখাইয়া আসিতেছে, আর সব যেন ঘুরিতেছে, মধ্যে মধ্যে যেন শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে।" ইহাদের মধ্যে দু'একজন বলিলেন, "আমি আর খাইতে পারিতেছি না, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি খাইয়া একটু শয়ন করি গে।"

আমার মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বাছা, আমি ত' পূর্বেই বলিয়াছিলাম, উহাতে নেশা হয়, এবং বড় কষ্ট হয়, উহা খাইও না। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ উহাতে কত সুখ। এইবার বুঝিবে আর কখন খাইতে চাহিবে না। নেশার জিনিষ ব্যবহার করা স্ত্রীগণেরই কি, আর পুরুষেরই কি, সকলের পক্ষেই একেবারে অবিধেয়। মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া মাদকের অপকারিতা উপলব্ধি করা চাহি না, মাদক দ্রব্যের অপকারিতা মাদক সেবীগণকে দেখিয়া উপলব্ধি করাই ঠিক; এবং যাহারা মাদক সেবী তাহাদের সঙ্গ করাও ঠিক নহে। কারণ যে যেমত লোকের সঙ্গ করিবে, সে সেই রকম লোকের গুণই প্রাপ্ত হইবে। সঙ্গ দ্বারা কামনার উৎপত্তি হইয়া মাদক দ্রব্য সেবন করিবার ইচ্ছা হয়। আমি মাদক সেবীর সঙ্গ করিলে, মাদক সেবীর নিকট হইতে মাদক দ্রব্যের প্রশংসাই শুনিব। মাদক দ্রব্যের প্রশংসা শুনিয়া তৎ বিষয় প্রাপ্তির কামনা, অল্প অল্প করিয়া আমার মনের স্থান অধিকার করিয়া লইয়া শেষে মাদক সেবীর দলভুক্ত করিয়া, পরিণামে আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করায়। এ কারণ যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য হউক না কেন, তৎ তৎ মাদক দ্রব্য যাহারা সেবন করিয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা সকলের প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ মাদকের ন্যায় শরীর নাশক এবং মনের অনিষ্টকারক, অর্থাৎ মনকে অধোগামী করিবার এমত বিষয় আর দ্বিতীয় নাই। যত প্রকার ঘৃণিত বিষয় এবং যত প্রকার পাপকর্ম জগতে আছে, তৎসমুদয়ই মাদকসেবীর দ্বারা কৃত হইয়া থাকে।" আমার মা সকলকে এবং আমাকে শুনাইয়া বলিতেছেন এমন সময় যে কয়জন বড় বড় খুকী ভোজন করিতে করিতে নেশার দরুণ কষ্টবোধ করিয়া শয়ন করিতে গিয়াছিল, তাহারা পুনরায় আমার মা'র নিকট আসিয়া বলিল, "জেঠাই মা, মনে করিলাম শয়ন করিলে নেশাটা কাটিবে; ওমা, শয়ন করার পর, যেন একেবারে সমস্ত শরীরটা শুদ্ধ উপরে উঠাইয়া উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিতে লাগিল। আর অসহ্য কেমন এক রকম যন্ত্রণা হইতেছে, জিভটা যেন শাঁড়াসি দিয়া কে টানিয়া রাখিতেছে, আর সহ্য হইতেছে না, আর মা কখন খাব না, ডান হাতে করিয়া বিষ্টা ভক্ষণ করিয়াছি, সমস্ত

মাথাটা জল দিয়া ভিজাইয়া দিয়াছি, তাহাতেও কমিতেছে না। একটা উপায় করিয়া দিন যাহাতে কমিয়া যায়।

তারপর মা একজন লোককে বলিলেন, "খানিকটা তেঁতুল গুলিয়া আন ত', মেয়েগুলোকে খাওয়াইয়া দিই।" তেঁতুল গোলা খাবার কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, "মা ওসব খাইয়াছি, তাতে কমিতেছে না।" তখন মা আর একজনকে বলিলেন, "কতকগুলা কাঁঠাল পাতার রস করিয়া আন ত', কাঁঠাল পাতার রস খাইলে এখনি কমিয়া যাইবে।" ইহা বলায় অল্পক্ষণের মধ্যে একজন কাঁঠাল পাতার রস করিয়া আনিয়া দিলে মা তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এইবার গিয়া শোও এখনি কমিয়া যাইবে।" তারপর তাহারা শয়ন করিতে গেল। মা আমাকে বলিলেন, বাবা খোকা, কখন সিদ্ধি বা কোনরকম মাদক দ্রব্য সেবন করিও না, এইত দেখিতেছ সিদ্ধি খাবার সুখ কত। এই রূপ সমস্ত মাদকদ্রব্য সেবনে পরিণামে লোকে সমূহ কষ্ট পাইতে থাকে। অতএব, কোন রকম মাদক দ্রব্যের নিকটও কখন যাইবে না বা মাদক সেবীর নিকটেও যাইবে না, তাহারা মিত্রভাবে সকলের নিকটে আসিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। লোককে মাদক সেবন করাইবার উদ্দেশ্য, পরের মাথায় হাত বুলাইয়া পরের পয়সায় নিজেরা নেশা করিয়া নিজেদের পয়সা বাঁচায় ও নিজেদের দলপুষ্ট করিয়া লয়। মাদক সেবীগণকে পরম শত্রু বিবেচনা করিয়া তাহাদের ছায়াও কখন স্পর্শ করিও না।" এমন সময় একজন লোক আসিয়া খবর দিল, যাহারা কাঁঠালপাতার রস খাইয়া গেল তাহারা সব শয়ন করিবার পরই অগাধে নিদ্রা যাইতেছে। মা বলিলেন, "আর ভয় নাই, এইবার কমিয়া গিয়াছে না কমিলে নিদ্রা যাইত না।

তাহার পর মা আমাকে সঙ্গে লইয়া উপরে গিয়া, বাবার ভোজনের জায়গা করিয়া বাবাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তাহার পর বাবা আসিয়া ভোজনে বসিলে পর, মা বাবাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বাবার পায়ের ধূলা লইলেন। পরে মা তথায় বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। বাবা আহার করিতে লাগিলেন, মা খুকীদের সিদ্ধির নেশার কথা গল্প করার মতন ভাবে বলিতে লাগিলেন। বাবাও বলিলেন, বাহিরেও তদ্রূপ, তবে এখন সব শুইয়া পড়িয়াছে এখন আর কোন উপদ্রব না। তাহার পর বাবা ভোজন সমাপন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মা সকলের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। ইহাদের ভোজন সমাপন হইয়া গেলে জেঠাইমা মাকে বলিতে লাগিলেন "দেখ্ ভাই ছোটবউ, আমরাও ত' এই বাড়ীর বউ হইয়া একদিন আসিয়াছিলাম, তুমিও তাহাই আসিয়াছ, তুমিও এই সংসারে কিনা করিতেছ, আমাকইে বা কিনা করিতে হইতেছে? বউদিগকে কোন কাজের কথা করিতে বলিলেই মুখ তো'ল হাঁড়ির মত করিয়া বেজায় ভাবে, কোন গতিকে একটু আধটু কাজ দেখিয়া ফাঁকি দেবার চেষ্টা, কেবল বসিয়া বসিয়া বই পড়িবে, আর মধ্যে মধ্যে তাস খেলিবে। পাঁচ ছেলের মা হ'ল, এখনও কোন বিষয়ই দেখিতে চাহে না। আমরা শাশুড়ি ননদের কত সেবা করিয়া আসিয়াছি, তাহা তুমিও

ত' ভাই দেখিয়াছ। আমার সেবা করা চুলোয় যাক, বউয়ের সেবা করিতেই আমি অস্থির। আমি কাহারও সেবা চাহিনা, নিজের গতর যতদিন আছে ততদিন কাহারও সেবা লইতে ইচ্ছাও করি না। আমার গতর কুশলে থাকুক। তবে ছেলেদের কষ্ট দেখিয়া মনে কষ্ট হয়। আমার বড় ছেলে গোপাল আমাকে কত বলে যে, 'মা তুমি কেন এত পরিশ্রম কর, বউদের দিয়ে সব কাজ করাইয়া লও'। তা বোন আমি গোপালকে বলিয়া থাকি, বউরাই ত' সব করে, আমি আর কি করি? ইহা বলি, পাছে বউয়ের উপর গোপাল আমার রাগ করে বা কোন রকম কথা শুনিলে পাছে রাগ করিয়া বউকে কোন অকথা কুকথা বলিয়া বসে। সেই ভয়ে বোন কোন কথা বলি না। আরো বিশেষ, একটু কোন কথা হইলেই অমনি ভয় দেখাইয়া বলে, আমি বিষ খাইয়া মরিব। বোন, সেও এক ভয়। বউগুলা বোকা, এটা ভাবে না বিষ খাইয়া মরিলে কাহার ক্ষতি। যে খায় সে আপনিই মরে, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হয়? অনর্থক নিজের প্রাণটা সামান্য কারণে, নষ্ট করিয়া বসে, শেষে মুদ্দফরাস, ডোমেতে টানিয়া লইয়া, কাটা ছেঁড়া করিয়া, বে-ইজ্জতের একশেষ হইয়া থাকে। নিজের জীবনটা নষ্ট করিয়া, যন্ত্রণার লাঘব না করিয়া, পরজন্মে আরও যন্ত্রণার বৃদ্ধিই করিয়া থাকে, তাহাও জানে না—কেবল দু'পাতা বই পড়িতে জানে। তাহাও সব ঐ রকম ধরণের বই পড়ে। আর আমাদেরই স্ত্রীজাতির কি উন্নতি হইতে পারে? আমরা ত' কোন বই পড়ি নাই, আমাদেরই বা কি অবনতি হইয়াছে? বা কিছু লেখা পড়া না করার দরুণ আমাদেরই বা কি অভাব বোধ করিতে হইতেছে, তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এত কথা বলিলাম, কেবল এর পর যে ছেলেরা দু'মুঠো ভাত তরকারী বউদের দ্বারা পাইবে সে আশা আর নাই। শেষে বামুন রান্না অপবিত্র ভাত তরকারী খাইতে হইবে। রাঁধুনি বামুনদের গুণ ত' বোন সব জানা আছে, তাহারা সবই কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত এবং কুচরিত্র সম্পন্ন, তাহাদের হাতে খাইতে হইলে, স্বাস্থ্য যে ঠিক থাকে তাহা বোধ হয় না। বাড়ীর লোকে পাক করিয়া দিলে তাহাতে যেমন পতি-পুত্রের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং যেমন ভাল রকেম জিনিষগুলি তৈয়ার হয়, সেরূপ ভাবে কি রাঁধুনি বামুন দ্বারা হওয়া সম্ভব? তাহা বোধ হয় কদাচ সম্ভব পর নহে। আর দেখ বোন, বউগুলি এত বোকা যে তারা জানে না যে, তাহাদিগকেও একদিন শাশুড়ী হইতে হইবে। আমি যদি আমার শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া যাই তাহা হইলে আমার পুত্রকন্যারাও তদ্রূপ শিক্ষা পাইয়া আমার প্রতিও পরিণামে তদ্রূপ আচরণ করিবে। আর আমি যদি আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে কষ্ট দিই বা তাঁহাদের অবাধ্য হই তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকেও আমার পুত্র বা পুত্রবধুর দ্বারা কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ বংশ সকল নষ্ট হইয়া কুশিক্ষায় সকলেরই সংসারে বিশেষ অশান্তিকর অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাই বড় কষ্ট হয়, যাক ওরা যাতে ভাল থাকে তাই করুক; তবে আমি উহাদের পরিণাম ভাবিয়া, আজ বোন তোমার কাছে

বলায়, যেন পেটটা হালকা হইল। দেখো ছোট বউ, এই সব কথা যেন আমার বউরা কেহ না জানতে পারে। জানিলে আমাকে আবার নানা কথা শুনাইয়া দিবে।”

জেঠাই মা নিরস্ত হইলে, আমার মা বলিলেন, “না, না, আমি আবার ঐ কথা লইয়া তোলাপাড়া করিব? আর ঐ কথা তোমার বউদিগকে সব বলিব; তাও কি সম্ভবপর? তবে ভাই আজকাল আমাদের জাতির মধ্যে কেমন একটা স্বভাবই দেখা যাইতেছে, এর কথাটি ওর কাছে, ওর কথাটি এর কাছে, এই রকম সব ঝগড়া বাধাইবার জন্য কথা বলিয়া, পরস্পরের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয় আর সামান্য কথাগুলিকে, বড় বড় করিয়া গুরুতর ভাবে বলিয়া থাকে। ইহাও মহৎ দোষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার বৌ ঝিয়েরাও বাড়ীর সামান্য সামান্য কথাগুলিকে গুরুতর করিয়া, ঘর নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, আপন আপন পতির কাণে কাণে বলিয়া, পতির কাণভারী করিয়া, বাড়ীর সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহা করিবার একমাত্র অভিপ্রায়, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজ পতিপুত্রকে লইয়া সংসার করা। পাঁচজনকে লইয়া সংসার করিতে এখনকার মেয়েরা আর প্রায় কেহ চায় না। এসব শিক্ষা, মেয়েরা নিজ পিতা মাতার নিকট পাইয়া থাকে। নিজ মাকেও দেখে যে, তার মা আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পতিপুত্রকে লইয়া সংসার করিতেছে। তাহাতে তাহারা কখনও সুখী হইতে পারে না এবং দু' পয়সা প্রায় চক্ষে দেখিতেও পায় না। তবে শৃগাল কুক্কুরে যেমন আপনার ছেলেপিলে লইয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করে, তাহারাও প্রায় তদ্রূপভাবে মনের অশান্তিতে কালাতিপাত করিয়া থাকে। আর দিদি তোমার বউদের দোষ কি দিব, আজকালকার সব ঘরেই ঐরূপ হইয়াছে। এখন সকলে বুড়ো বুড়ো মেয়েকে বউ করিয়া আনে, বউ যখন বাপের বাড়ী হইতে আসে তখন সে একরকম বাপের বাড়ী হইতেই কুশিক্ষা পাইয়া আইসে। তখন শ্বশুর বাড়ীকে প্রথমে তার বোধ হয়, এ একটা কা'দের বাড়ী আসিলাম এবং বাপের বাড়ীকেই সে অতি মনোরম স্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং তার সর্বদা এই চেষ্টাই থাকে যে, সে কিসে স্বামীকে তার বাপের বাড়ীর অনুরক্ত করিতে পারে। এই জন্য এখনকার বৌদের মুখে কেবল বাপের বাড়ীর এবং তার নিজের ভাই বোনদের সুখ্যাতি শুনিতে পাইবে, ননদ বা ছোট ছোট দেবরদের সুখ্যাতি প্রায় শুনিতে পাইবে না। আরো বিশেষ এখন ব'নেদি ঘর প্রায় কমিয়া গেল, বনেদি ঘরের অবস্থা প্রায় খারাপ হওয়ায়, তা'রা এক রকম মরিয়াই আছে, তাহা হইলেও সে সব ঘরের মেয়েদের এক নজর আলাদা, তা'রা পাঁচজনকে লইয়াই ঘর করিতে চাহে। দিদি এখন যা' সব আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘর দেখিতেছ তা'রা সব প্রায় দু'তিন পুরুষে; নিজেই হঠাৎ কোন গতিকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেই নিজেকে বড় মনে করিয়া থাকে। এই সব ঘরের মেয়েরাই প্রায় দুষ্টা হইয়া থাকে। এক গরিবের মেয়ে ভাল, আর না হয় ব'নেদি ঘরের মেয়ে ভাল। নচেৎ হঠাৎ বাবুদের ঘরের মেয়েরা প্রায় ঘর ভাঙ্গিয়া থাকে। যাহা হউক ওসব অনেক কথা, আজ বেলা গেল, খোকাকে পোযাক পরাইয়া

দিতে হইবে, এখন ওসব কথা থাক। দিদি তোমার ওসব ভাবিয়া দরকার নাই, তুমি সৎ শিক্ষা যেমন দিতেছ, সেইরূপ দিয়া যাও। না শুনে ওরাই কষ্ট পাবে, আমাদের আর ক'দিন, সময়ও প্রায় হইয়া আসিতেছে।" ইহা বলিয়া মা উঠিলেন, জেঠাই মা'ও বলিলেন, "তবে আমিও একবার আসি, তার পর আবার সন্ধ্যার সময় আসিব।" এই বলিয়া জেঠাইমা চলিয়া গেলেন।

তাহার পর মা আমার গা, হাত, পা মুছাইয়া দিয়া পোষাক পরাইয়া দিতে লাগিলেন। পোষাক পরান হইয়া গেলে, ঝির সহিত বাবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঝি আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে বাবার কাছে পোঁছাইয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বাবা আমারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি আসিলে পর বাবা বলিলেন, "এইবার চল, আমরা সব যাই", তাহার পর সকলে উঠিলেন। আমার জেঠা মহাশয়, এবং আমার জেঠা মহাশয়ের পুত্রকন্যা তিন চারটি, সর্ব সমেত সাত আট জন আমরা চলিলাম। একজন চাকর আমাকে কোলে করিয়া লইল। আমারা ক্রমশঃ গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; সূর্য্য এখনও অস্ত যান নাই, তবে বেশী বেলাও নাই। আমরা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া পোঁছিলে পর আমাদের যে নৌকা ভাড়া করা ছিল, সেই নৌকার মাঝি আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "বাবু আসুন নৌকা প্রস্তুত আছে।" মাঝির কথায় বাবা ও আমরা সকলে নৌকায় গিয়া উঠিলাম। নৌকাতে উঠিবার পর, নৌকা গঙ্গার তীর হইতে একটু ভাসান জলে রাখিয়া দাঁড়িরা দাঁড়গুলি পরাইয়া ঠিক করিল। প্রত্যেক দাঁড়ে একটি করিয়া কাল বর্ণের নিশান বাঁধা আছে। নৌকাখানিতে ছয়টী দাঁড় পরাইয়া, দাঁড়িরা দাঁড় টানিয়া বাহির গঙ্গায় লইয়া যাইল। আমরা যে ঘাট হইতে নৌকাতে উঠিলাম, সে ঘাটে বড় জনতা ছিল না। তাহার পর মাঝি সব ঘাটে ঘাটে নৌকা লইয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেক ঘাটেই প্রায় জনতাপূর্ণ নৌকা হইতে কেবল লোকের মাথা দেখা যাইতেছে, আর কোলাহলও খুব। আমরা যেরূপ নৌকাতে উঠিয়াছি তদপেক্ষা অনেক ভাল ভাল নৌকাতে নিশান বাঁধিয়া কেহ বা আট দাঁড়ে নৌকায় চড়িয়াছে, কেহ বা ছয় দাঁড়ের নৌকাতে চড়িয়াছে। নৌকার সংখ্যা এত বেশী যে, গণনা করা যায় না। আবার অনেকে বজরায় চড়িয়া, বজরার ছাদের উপর গান বাজনা করিতে করিতে যাইতেছে। বজরার সংখ্যাও অনেক। আবার কোন কোন বহরের (মালের) নৌকার মাঝখানে তক্তা পাড়ান করিয়া দিয়া তাহার উপর বিছানা তাকিয়া সব দিয়া, তাহার উপর করিতে, পাঁচালি সব ঢোল বাজাইয়া নানারকম ভাবে গান করিতে করিতে সারি দিয়া চলিতেছে। প্রতিমাও সব বড় বড় নৌকাতে তুলিয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে, কেহ বা রসুন চৌকির বাজনা বাজাইতে বাজাইতে, গঙ্গার উপর শোভা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যা আগত দেখিয়া সকল নৌকাতে রংমশাল এবং সাদা মশাল সব জ্বালিয়া, গঙ্গাবক্ষ যেন দিনমানের মত করিয়া তুলিয়াছে। জলের উপর আলোকের প্রতিবিম্ব পড়ায় বোধ হইতে লাগিল, গঙ্গাদেবীও যেন জলের ভিতর হইতে আলোকমালা সাজাইয়া

আমাদের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। আমাদের নৌকাতে রংমশাল এবং তৈলের মোটা মোটা বড় বড় সাদা মশাল প্রত্যেক দাঁড়ে একটি করিয়া দেওয়া হইল। এখনও সামান্য ঝিকিমিকি বেলা আছে, মধ্যে মধ্যে অপর অপর নৌকায় বহু খেলাও হইতেছে। আমাদের নৌকাখানি যেন কেমন নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, কখন বা একদিক উঁচু হইতেছে, আবার তখনি নীচু হইতেছে, কখন বা খুব দ্রুতবেগে তীরের ন্যায় যাইতেছে। মাঝিরা খুব শক্ত এবং তাহাদের সাহসও খুব বেশী। বাবা বরং মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, "আরে মাঝি, আস্তে আস্তে ধারে ধারে যা, ছেলেপিলে সমেত উঠিয়াছি।" মাঝি অমনি বাবাকে বলিতেছে, "বাবু ভয় কি? আমাদেরও ঘরে ছেলে পিলে আছে, নৌকাতে ছেলেপিলে চড়াইলে কিরূপ ভাবে যাইতে হয়, তাহা বাবু আপনার আশীর্বাদে সব জানি। কোন ভয় নাই, খোকা দাদাকে কোলে করিয়া সব দেখান, ভয় কি? আজ খোকা দাদার নিকট হইতে আমরা বখশিস পাইব।" এই বলিয়া তালে তালে দাঁড় টানিতে লাগিল। সকল দাঁড়াতেই ঘুমুর বাঁধা আছে। দাঁড় টানার সঙ্গে সঙ্গে, ঘুমুরের ঝুন্ ঝুন্ শব্দে মন বেশ পুলকিত হইতে লাগিল। এইরূপে চারিদিকে নৌকা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকল নৌকাই আলোর দ্বারা এবং নানারকম রঙ্গের নিশান্ দ্বারা বেশ সাজাইয়াছে এবং বড় নৌকার উপরেই সব গান বাজনা হইতেছে। সেই বড় বড় নৌকার গায়ে সব ছোট ছোট নৌকা লাগাইয়া অনেকে গান বাজনা শুনিতেছে। বাবা নিষেধ করায় আমাদের নৌকা কোন নৌকার গায়ে লাগাইল না। তাহার পর বাবা মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাঝি এইবার আমাদের ঘাটে নামাইয়া দাও, রাত্রিও হইয়া আসিল, ছোট ছোট খোকারা সব রহিয়াছে, হিম লাগিবে।"

মাঝি এই কথা শুনিয়া, আমরা যে ঘাট হইতে নৌকায় উঠিয়াছিলাম সেই ঘাটে নৌকা আনিয়া কিনারায় লাগাইয়া আমাদিগকে আস্তে আস্তে তীরে উঠাইয়া দিল। গঙ্গার ঘাটে উঠিয়া দেখি, একেবারে লোকে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া ভার। যদিও আমি একজনকার কোলে আছি তাহা হইলেও যে লোকটা আমাকে কোলে করিয়া লইয়াছিল, ভিড় ঠেলিয়া উপরে উঠিতে তার কষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক আমরা কোন গতিকে উপরে উঠিলাম। ঘাটের উপর উঠিয়া বাবা কতকগুলি সোলার পাখী, সোলার ফুলগাছ ইত্যাদি অনেক রকম খেলনা কিনিয়া, আমরা যে কয়জন ছোট ছোট খোকা খুকী ছিলাম, আমাদের সকলকে কিছু কিছু সমান ভাগে বাঁটিয়া দিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে আমরা ক্রমশঃ বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলাম। আসিবার সময়ও রাস্তায় দু'দশখানা প্রতিমা বাজনা বাদ্য, আলো, মশাল, রংমশাল জ্বালিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। রাস্তাতেও লোকের জনতা কম নাই তবে গঙ্গার ঘাটের তুলনায় কিছুই নহে। কারণ রাস্তায় লোকজন অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে, গঙ্গার ঘাটে বা গঙ্গার ধারের রাস্তায় লোক চলাচল করা দারুণ কষ্টকর ব্যাপার। তবে সুখের বিষয় গাড়ীর ভিড় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ এখনকার

মতন গাড়ী তখন ছিল না। যা দু'চারখানা ছিল, তাহা কেবল বড় বড় লোকদের ছিল, তাহাও কোন গতিকে দড়ি দড়া দিয়া বাঁধিয়া চালাইত; তবে পালকির চল খুব ছিল এবং দু'দশখানা ভাড়াটে গাড়ীও কখন কখন দেখা যাইত। অধিকাংশ লোকই হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন। খুব বড় জমিদার বা হাউসের মুচ্ছদ্দিরা পালকি বা উপরিউক্ত ভাবের ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া যাইতেন। হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে কেহই প্রায় অপমান বোধ করিতেন না। এবং হাঁটিয়া অফিসাদি যাইতে কাহারও পায়ে খিল ধরিত না। এখন যেমন আমার মতন খোকার দু'পা চলিয়া গেলেই পায়ে খিল ধরে বা হাঁটিয়া যাইতে অপমান বোধ করে, তখন তাহা ছিল না। একারণ এখনকার তুলনায় পূর্ব্বেকার খোকাদের অভাব বোধও খুব কম ছিল। কারণ এখনকার মত বিলাসিতা বাবুয়ানার স্রোত তখনকার প্রধান গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে বড়লোকদের ভিতর বিলাসিতা যে ছিল না তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা বাবুয়ানা খুব বেশী ছিল, সেই কারণ তাহাদের বংশধরেরা এক্ষণে পূর্ব সম্মান নষ্ট করিয়া অতি দীনভাবে, মৃতপ্রায় হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। আপন আপন অবস্থা ও সামর্থ্য না বুঝিয়া চলিলেই পরিণামে কষ্ট অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

আমি কোলে চাপিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ এই সব বিষয় আমার মনে মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। কেন আমার মনে এই সব উদয় হইতে লাগিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি খোকা, আমার মনে নানারকম ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহাও তাহার মধ্যে একরকম। যাহা হউক তাহার পর আমরা ভাসান দেখিয়া, ক্রমশঃ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যাহার কোলে আসিয়াছিলাম, বাড়ীতে আসিয়া তাহার কোল হইতে নামিয়া, সোলার ফুল ও সোলার পাখী নিজে হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতে লাগিলাম। আমি একা যাইতেছি দেখিয়া, বাবা আমার সঙ্গে একজন লোক দিলেন। আমি তাহার সঙ্গে মা'র কাছে আসিয়া মাকে প্রণাম করিলাম, তাহার পর মা আমাকে কোলে তুলিয়া আমার মুখ চুম্বন করিয়া, আদর করিতে লাগিলেন। আমি মা'র কোলে বসিয়া, মাকে ঠাকুর ভাসানর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক যাহা যাহা দেখিয়াছি, সমস্ত বলিতে লাগিলাম। মাও আমার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন এবং কখন কখন বা হাসিতে হাসিতে আমার কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। শেষে মা'কে আমি সোলার ফুল, পাখী সব দেখাইতে লাগিলাম মা তাহা দেখিয়া আমার সন্তোষের জন্য সেগুলির খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা সোলার পাখীগুলি যেন ঠিক জীবন্ত পাখীর মতন, কেবল প্রাণ নাই। আহা! মানুষ সবই নকল করিতে পারে, কেবল প্রাণ দিতে পারে না। আমরাও এক রকম সোলার পাখীর ন্যায়। তবে আমাদের প্রাণ আছে বলিয়া সোলার মানুষ বলা যায় না। প্রাণের অভাবে আমাদের দেহ ও সোলার মত গলিয়া যাইবে। এমন প্রাণকেও কেহ যত্ন করে না।" আমি মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! প্রাণ কাকে বলে মা, আর প্রাণের যত্নই বা কি রকমে করিতে হয় মা?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাণ

মা বলিলেন, "বাবা খোকা, তুমি যাহা সর্বদা নিশ্বাস টানা ও ফেলা করিতেছ, ইহাকে যিনি রক্ষা করিতেছেন তিনিই প্রাণ পদবাচ্য। ইঁহার স্থান হৃদয়ে, ইঁহার স্বভাব স্থির। এই স্থিরভাবই বলস্বরূপ। আমাদের যাহা বল বা শক্তি রহিয়াছে তাহা ঐ স্থিরত্ব হইতে। এই স্থিরত্বের বৃদ্ধি হইলে বল ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। এই স্থিরত্ব তুমি এখন ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কারণ তুমি এখনও খোকা। নিশ্বাস টানার সময়ে ও ফেলার সময়ে, স্বভাবতঃ বিনা অবরোধে ক্ষণিক স্থির হইয়া থাকে; কিন্তু তুমি এখন তাহাতে লক্ষ্য করিতে পারিবে না। তবে ক্রমশঃ চেষ্টার দ্বারা লক্ষ্য হইতে পারে কিন্তু তাহা কষ্ট সাধ্য। প্রাণের যত্ন করা যাহা জানিতে চাহিয়াছ, তাহার উত্তরে আমি ইহাই বলি, প্রাণেতে লক্ষ্য করাই প্রাণের যত্ন করা; কারণ প্রাণের উপরে লক্ষ্য পড়িলে নিশ্বাস টানাফেলা, উপস্থিত তুমি যাহা আপনা আপনি করিতেছ, তাহা কিছু কমিয়া গিয়া স্থিরভাব হইয়া থাকে। সেই স্থিরভাব আনয়ন করাই প্রাণের যত্ন করা। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক্ বুঝিতেও পারিবে না, ধারণাও হইবে না। বড় হইলে গুরু উপদেশে জানিতে চেষ্টা করিও, নিজে কখন স্বয়ং চেষ্টা করিও না। আর এই নিশ্বাস কদাচ বন্ধ করিও না। ইহাতে নানা রকম উৎকট ব্যাধিও হইয়া থাকে।"

এই সব কথা মা'র নিকট শুনিতে শুনিতে আমার নিদ্রার ভাব আসিতে লাগিল। আমার নিদ্রার ভাব আসিতে দেখিয়া মা আমাকে বলিলেন, খোকা ঘুমাইও না, এখনও তোমার খাওয়া হয় নাই, রাত্রিও হইয়াছে, চল তোমাকে খাওয়াইয়া আনি। ইহা বলিয়া মা আমাকে কোলে করিয়া নীচে রান্না ঘরের কাছে আসিয়া আমাকে খাওয়াইতে বসিলেন। একটা পাতা করিয়া রান্না ঘর হইতে আমার জন্য গরম লুচি দু'চার খানা এবং একটু তরকারী ও বেগুন ভাজা আনিলেন। আমাকে বেগুন ভাজা দিয়া লুচি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। তরকারীতে ঝাল থাকায় তাহা আমি খাইলাম না। তারপর একটু দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন, দুগ্ধ খাইতে খাইতে আমার ঘুমের ঢুল আসিতে লাগিল দেখিয়া মা আমার মুখ ধোয়াইয়া দিয়া আমাকে কোলে করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য শয্যায় আমার নিকট নিজেও শয়ন করিলেন। ক্ষণিক পরেই আমি নিদ্রায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, তাহার পর কি হইল না হইল আমি আর তাহা কিছুই জানিনা।

তাহার পর রাত্রে হঠাৎ একটা ভয়ানক গোলমালের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া

গেল। দেখিলাম, মা আমার কাছে বসিয়া রহিয়াছেন এবং বাবা বারান্দা হইতে খুব চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, ঐ গেল, ঐ গেল, ধর ধর! এবং অপরাপর লোকেরাও বলিতেছে, ধর ধর। আমি তাহা শুনিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! কি হইয়াছে? মা বলিলেন, বাড়ীতে চোর আসিয়াছে। আমি চোরের নাম শুনিয়াই ভয়ে মার কোলের ভিতর যাইয়া জড় সড় হইয়া মা'কে বলিলাম, মা, আমার বড় ভয় করিতেছে। মা বলিলেন, ভয় কি? আমি তোমার কাছে বসিয়া আছি, আর বাবু বারান্দায় আছেন, আমরা উপস্থিত থাকিতে তোমার ভয় কি বাবা! আমি মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, চোরে কি করে মা? মা বলিলেন, চোরে জিনিষ পত্র ধনাদি সব চুরি করিয়া লইয়া যায়। পরের দ্রব্যাদি না বলিয়া গোপন ভাবে যাহারা লইয়া যায়, তাহাদিগকেই চোর বলে। আমি মা'কে বলিলাম, আচ্ছা মা চোরকে সকলে ধর ধর বলিতেছে কেন? চোর ধরিয়া কি হইবে। চোরকে লইয়া কি করিবে মা। মা বলিলেন, চোরকে ধরিতে পারিলে প্রথমে ফাঁড়িতে (থানায়) দারোগার নিকটে পাঠাইয়া দিতে হয়। তাহার পর দারোগা চুরির তদন্ত করিয়া চোরকে (রাজকর্মচারী) বিচার হাকিমের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকেন। পরে হাকিম, চুরির প্রমাণ লইয়া চুরি সাব্যস্ত হইলে ঐ চোরকে রাজবিধি অনুযায়ী দণ্ড দিয়া থাকেন। আমি বলিলাম, চোরের চুরি সাব্যস্ত হইলে রাজকর্মচারীরা কি দণ্ড দিয়া থাকেন মা? মা বলিলেন, চোরের প্রথম অপরাধ হইলে দশ বিশ ঘা বেত উপযুক্ত অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া, লোক দ্বারা চোরকে বেত মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকেন এবং মুখেও বলিয়া দিয়া থাকেন যে, আর যেন সে চুরি না করে, পুনশ্চ চুরি করিলেই ইহা অপেক্ষা আরও কঠিন দণ্ড দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় তৃতীয় বার অপরাধ হইলে বা তদতিরিক্ত বার চুরি অপরাধে অপরাধী হইলেই কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড এক বৎসর হইতে যাবজ্জীবন পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, বহুবার বড় বড় চুরি করিলে এবং কিছুতেই তার চুরি করা কাজ বন্ধ না হইলে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া থাকেন।

আমি ইহা শুনিয়া মা'কে বলিলাম, আচ্ছা মা, চোরদিগকে কারাবাস বা বেত্রদণ্ড না দিয়া তাহাদিগকে যদি নীতি শিক্ষা বা সৎশিক্ষা দিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, চুরি করা বড় দোষ, চুরি করিলে সাজা হয় ইত্যাদি, তাহা হইলে বোধহয় তাহারা আর চুরি করে না। মা বলিলেন, বাবা তাহাও কি হয়, "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। যাহাদের বাল্যকাল হইতে চুরি করা স্বভাব হইয়া গিয়াছে তাহারা কি আর চুরি না করিয়া থাকিতে পারে। ছোট লোকের ঘরে শিক্ষা না থাকায় তাহারা ছেলেবেলা হইতে নিজেদের পিতা মাতার নিকট চুরি শিক্ষা করিয়া থাকে। ক্রমশঃ অভ্যাসবশতঃ চুরি করাটা দোষ জানিয়াও লোভ সামলাইতে না পারায় চুরি করিয়া থাকে। আমি বলিলাম, আচ্ছা মা চোরদের পিতা মাতারা চুরি শিক্ষা কেন দেয় মা। মা বলিলেন মূলো চুরিও চুরি, শাক চুরিও চুরি, আর ঘড়ি চুরিও চুরি, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলেই চুরি করা হয়। কিন্তু

অনেকে তাহা না বুঝিয়া নিজের ছেলেকে বলিয়া থাকে, দেখ ওদের বাড়ীতে বেশ বড় বড় মূলো হইয়াছে গোটা কতক চুপি চুপি নিয়ে আয়। দেখিস কেউ যেন না টের পায়। অথবা নিজের বাড়ীতেই হয়ত ছেলে খাবার চুরি করিয়া খাইল, মা তাহা জানিতে পারিয়াও ছেলেকে মোটেই শাসন করিলেন না, বরং যদি কেহ বলে যে, তোমার ছেলে খাবার চুরি করিয়া খাইয়াছে, তাহ'লে অমনি তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া আপনার ছেলের দোষ ঢাকিয়া সাধুতা প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়া থাকেন, ওমা, আমার ছেলের ও দোষ নাই, তাকে খেতে দিলেও সে খেতে চায় না, সে কেন চুরি করিয়া খাইবে, তার অভাব কি। এস্থলে ছেলেও দেখিল যে মা যখন আমার কোন দোষ দেখিলেন না, তখন ইহাতে আর দোষ কি? এই রূপে ক্রমশঃ নানারকম দোষ বাড়িয়া গিয়া শেষে প্রকৃত চোরে পরিণত হয় ও পরিণামে লোক সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়া কালাতিপাত করে। কাহারও বাটীতে যাইলে লোকে চোর আসিয়াছে বলিয়া তাড়াইয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়া থাকে। চোরের কথায় কেহ বিশ্বাস করে না, চোর অপবাদ মনুষ্যের পক্ষে বিষম অপবাদ এবং মহাপাপের কার্য্য।

আমার মা'র সহিত এইসব কথা হইতেছে, এমন সময় বাবা ঘরের মধ্যে আসিলে, মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চোর কি ধরা পড়িল? বাবা বলিলেন না, চোর পলাইয়া গিয়াছে। লোকগুলো দৌড়িয়া আর একটু এগিয়ে গেলে ধরা পড়িতে পারিত, কিন্তু আমি নিষেধ করিলাম কারণ চোরের পশ্চাদগমন করা ঠিক নহে, তাহাদের নিকট প্রায় অস্ত্রাদি থাকে, তাহা ছাড়া ইট বা পাথর ছুড়িয়াও মারিতে পারে, একারণে চোরের পশ্চাৎ দৌড়িয়া যাওয়াটা ঠিক নহে। জাগা ঘরে চুরি হয় না, "জাগরণে ভয়ং নাস্তি"। চোরেরা চুরির অবসর খুঁজিয়া থাকে, আমার পূর্ব হইতে সন্দেহ ছিল যে, আজ চোর আসিতে পারে, কারণ পূজার কয়দিন লোকজন সকলে অধিক পরিশ্রম করার পর, আজ বিজয়ার দিন নিশ্চয়ই সকলে ঘুমাইয়া পড়ার সম্ভাবনা; এই রকম অবসর খুঁজিয়া চোরেরা কাজের বাড়ীর কার্য্য অবসানের দিন প্রায়ই চুরি করিতে আইসে। আমার সাধারণতঃ নিদ্রা খুব কম হয়, আমি প্রায় জাগিয়াই থাকি। অদ্য আমি জাগিয়া না থাকিলে চোরে আজ সর্বস্যই লইয়া যাইত। আমি প্রথমতঃ চোরের আগমন জানিতে পারিয়া সাড়া দিই, সাড়া দিবার কারণ, তাহারা আমার সাড়া পাইয়া একটু লুক্কায়িত হইবার বা পালাইবার চেষ্টা নিশ্চয় করিবে, তাহা হইলেই আমি ঘরের বাহির হইতে পারিব, সাড়া না দিয়া একেবারে ঘরের বাহির হইলে চোরের সম্মুখে গিয়া পড়ার সম্ভাবনা, সেটাও ঠিক নহে।

কারণ তাহারা প্রাণভয়ে পালাইবার চেষ্টা করার সময় আমাকে খোঁচা বা ছুরিকা দ্বারা আঘাতও করিতে পারে। এই কারণে হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হওয়াটাও ঠিক নহে। আমার চোর ধরিবার অভিপ্রায় নাই, কারণ চোর ধরা আমার কার্য্য নহে, চোর না হইলে চোর ধরা যায় না। আমার উদ্দেশ্য চোরকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, বিশেষতঃ

চোরেরা যে বাড়ীতে চুরি করিতে আইসে, সেই বাড়ীর লোকের সাড়া পাইলে বা বাড়ীর লোক জাগ্রত আছে জানিতে পারিলে তাহারা আপনা আপনিই পলাইয়া যায়। সেই অবস্থায় একা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া ঠিক নহে, কারণ চোরেরা আত্ম রক্ষার্থে চেষ্টা করিবেই করিবে, সুতরাং তাহাদের সম্মুখীন হইয়া হঠাৎ যে ব্যক্তি চোর ধরিতে যায়, চোরেরা আত্মরক্ষার্থে তাহাকে গুরুতর আঘাত করিতেও কণ্ঠিত হয় না। একারণে চোরের সম্মুখে বা পশ্চাদগমনে যাওয়া বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য নহে। ধনৈশ্বর্য্য থাকিলেই চোরের উপদ্রব হইয়া থাকে। পূর্বে বলিয়াছি বাড়ীর লোক জাগিয়া থাকিলে চোরেরা সাড়া পাইয়া আপনা আপনি পলাইয়া যায়, অগাধে নিদ্রা যাইলে চোরে সর্বস্য লইয়া গিয়া থাকে। এমত স্থলে জাগ্রত থাকাই চোরের হস্ত হইতে পরিত্রাণের সহজ উপায়। (পিতল, কাঁসা, সোনা, রূপা ইহাই যে কেবল ঐশ্বর্য্য পদবাচ্য তাহা নহে)। জাগ্রত থাকিতে না পারিলে ইহাই যখন (বাহ্য ধনৈশ্বর্য্য) রক্ষা করা যায় না, তখন প্রকৃত ঐশ্বর্য্য আমরা বিনা জাগরণে কিরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইব। সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা ইহা বাহ্য ঐশ্বর্য্য পদবাচ্য, চোর বা ডাকাতে ইহা লইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বর্য্য একবার লাভ করিতে পারিলে এই চোর ডাকাতগণ তাহা অপহরণ করিতে পারে না ইহা সাধারণেও কহিয়া থাকেন। সে ঐশ্বর্য্য একমাত্র বিদ্যা; বিদ্যাই প্রকৃত ঐশ্বর্য্য পদবাচ্য। শরীর মধ্যে আসুরিক ভাবরূপ চোর ডাকাতগণ যাহা রহিয়াছে, ইহাদিগকে নির্ম্মুল করিতে না পারিলে এই বিদ্যারূপ ঐশ্বর্য্য ঐ চোর ডাকাতগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃত বিদ্যা

বিদ্যা দুই প্রকার, আত্ম বিদ্যা ও আসুরিক বিদ্যা। আসুরিক বিদ্যাই অবিদ্যা। আসুরিক বিদ্যা কর্তৃক আত্মবিদ্যা অপহৃত হইয়া আসুরিক ভাবরূপ চোর ডাকাতগণের করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে। একারণ বর্তমানে আত্মবিদ্যা জীবের কাছে থাকিয়াও নাই, থাকিয়াও নাই বলিবার অভিপ্রায় এই যে, জীব মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া অর্থাৎ বাহ্যিক "আমি আমার" বিষয়ে আচ্ছন্ন থাকায় জীবভাবে আসুরিক ভাব কর্তৃক সদা হীনতা হেতু আত্মার অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হইতেছে না, এই হেতু উপরে বলা হইয়াছে, আত্মবিদ্যা জীবের নিকট থাকিয়াও নাই অর্থাৎ আত্মবিদ্যা না থাকার মতন জীবের বোধ হইয়া থাকে। নচেৎ আত্মবিদ্যা যে জীবের দেহে নাই তাহা কদাচ মনে করিও না। যিনি এই আত্ম বিদ্যার্থী হইবেন, তিনি সদ্‌গুরুর উপদেশে সাধনের দ্বারা ঐ বিদ্যা লাভ করিতে যত্নবান হইবেন অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে তাঁহাকে আত্মবিদ্যার্থী বুঝায় তাহা

নহে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠের দ্বারা কেহ আত্মবিদ্ বা আত্মজ্ঞ হইতে পারেন না ইহা নিশ্চয়ই সত্য। গুরু বলিয়াছেন।

"পুঁথি মেরা থুঁথি, চারো বেদ পড়ে মজুর,
কথনিকে ঘর বহুৎ হ্যায়, করনিকে ঘর দূর"।

অর্থাৎ আমার মুখ ও ঠোঁটই পুঁথি, চা'র বেদ, যারা মজুর তাহারাই পাঠ করিয়া থাকে। কথা বলিবার লোক ঢের আছে, কিন্তু কর্মীর ঘর অর্থাৎ কর্মীলোক বড় কম। অতএব যে জীব আত্মবিদ্যা লাভের অভিলাষী তিনি গুরুর উপদেশ মত সাধনের দ্বারা চেষ্টিত হইবেন ও গুরূপদেশ লব্ধবস্তুতে সর্বদা জাগ্রত ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। সর্বদা লক্ষ্যরূপ পাহারা দ্বারা রক্ষা না করিতে পারিলে এই আত্মবিদ্যারূপ ধন আসুরিক ভাবরূপ চোর ডাকাতগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়া যাইবে।

সাধকরূপ আত্মবিদ্যার্থীর সাধনারূপ আত্মপূজা (পূজা অর্থে সম্বর্দ্ধন বুঝিতে হইবে) যত বৃদ্ধি পাইবে, নিদ্রাও তত কমিয়া আসিবে। নিদ্রা কমিবে অথচ স্বাস্থ্যহানি হইবে না, বরং স্বাস্থ্য সাধারণ অপেক্ষায় সহস্রগুণে ভালই থাকিবে। যখন একেবারে জিতনিদ্র অবস্থা লাভ হইবে, তখন চোর আসিয়াও জাগ্রত ভাব দেখিয়া আপনিই পলাইয়া যাইবে। ধন থাকিলেই চোর চুরি করিবার অভিপ্রায়ে আসিবার চেষ্টা করে ও করিয়া থাকে। জানা থাকা উচিত যে, যতক্ষণ বিনিদ্র অবস্থায় অভ্যস্ত না হইবে, ততক্ষণ চোর আসিতে পারে। চোরের ভয় যদি থাকে তো নিদ্রাও কমিয়া যাইবে অর্থাৎ যাহার চোরের ভয় আছে, সে নিদ্রায় নিমগ্ন না হইয়া সর্তক ভাবে সাধন করিয়া থাকে। সাধন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাসে, কালে জিতনিদ্র অবস্থাও আসিয়া থাকে ইহা নিশ্চয় জানিও। আত্মপূজা (সম্বর্দ্ধন) রূপ ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত কেহই জিতনিদ্র হইতে পারে না। সাধারণ একটা কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। ঘুম নাই যোগীর, ঘুম নাই রোগীর, ঘুম নাই নির্ধন পুরুষের। সাধারণ ধনহীন ব্যক্তির নিদ্রাও প্রায় হয় না, ধন চিন্তাতেই ছট্‌ফট্ করিয়া থাকে, রোগীর অবস্থাও তদ্রূপ। আর যোগীপুরুষ রাত্রে আত্মসঙ্গে প্রকৃত আত্মসহবাসে জাগরণের সহিত রাত্রি কাটাইয়া থাকেন। যুবক ও যুবতি প্রথম সম্মিলনের রাত্রি যেমন কথায় কথায় জাগরণেই কাটিয়া যায়, তদ্রূপ আত্মসহবাসে সাধকের জাগরণের সহিত রাত্রি কাটিয়া থাকে, সুতরাং চোর আসিয়াও কিছু করিতে পারে না, আপনিই পলাইয়া যায়। জাগা ঘরে চুরি হয় না ইহা নিশ্চয় জানিবে।

আমার বাবা চোর সম্বন্ধে এই সকল কথা যাহা বলিতেছেন, আমি মা'র কোলে বসিয়া তাহা সবই শুনিতেছি, বাবার কথাগুলি আমি গল্প শুনার মতন বেশ মন দয়া শুনিতেছিলাম, শুনিতে আমার বেশ ভালও লাগিতেছিল, এমন সময় আমাদের ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া দু'টা বাজিয়া গেল। মা বলিলেন, দু'টা বাজিয়া গেল, মা'র কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, খোকা জাগিয়া রহিয়াছে উহাকে ঘুম পাড়াও। আমি বলিলাম,

"না বাবা আমি ঘুমাইব না, আপনি যে গল্প বলিতেছেন, তাহা আমার বেশ ভাল লাগিতেছে, আপনি আরও বলুন, আমি শুনিব।" যদিও আমার অল্প ঘুম আসিতেছিল, তাহা হইলেও বাবার কথাগুলি বেশ ভাল লাগায় আমি শুনিতে চাহিতেছিলাম, মা আমাকে বলিলেন, না না খোকা তোমার ঘুম আসিয়াছে, কেননা কথা শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে তোমার ঘুমের (নিদ্রার) ঢুল আসিতেছিল, রাত্রি ঢের হইয়াছে, এখন শয়ন করিগে চল। এখন যাহা যাহা শ্রবণ করিলে, এই কথাগুলি তুমি মনে রাখিবার চেষ্টা করিও; বাবা বলিলেন, ছেলেরা ছেলেবেলায় গল্প যাহা শুনে, তাহা প্রায় অনেকের মনে থাকে, বোধ হয় খোকারও মনে থাকিবে। আমি বাবাকে বলিলাম, হাঁ বাবা, আমার খুব মনে থাকিবে। তাহার পর মা আমায় কোলে করিয়া বিছানাতে লইয়া শয়ন করিলেন। বাবা আপন আসনে বসিয়া কি করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখিলাম আজ একেবারে বেলা হইয়া গিয়াছে—মা আমার কাছে নাই, বাবাকেও ঘরে দেখিতে পাইলাম না, কেবল আমার ঝি ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছে। আমি বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলে ঝি আমাকে খাটের উপর হইতে নীচে নামাইয়া দিল। আমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝি, মা কোথায় গিয়াছেন? ঝি বলিল, মা হাত মুখ ধুইতে গিয়াছেন। তাহার পর ঝি আমাকে আমার হস্ত, মুখ প্রক্ষালন জন্য যথাস্থানে লইয়া গিয়া আমার শৌচাদি সমাপন করাইয়া আমার হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া আমাকে উপরে আনয়ন করিল। উপরে আসিয়া দেখি, আমার মা'ও আসিয়া নিজের রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিতেছেন। আমি মা'কে দেখিয়া মা, মা করিয়া আদুরে ভাবের কথার সহিত মা'র কোলের কাছে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলাম, মা আমিও হাত মুখ ধুইয়াছি আমাকে খাবার দাও। এমন সময় বাবা বাহির হইতে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বাবা ঘরে আসিতেই মা বাবাকে বলিলেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া খোকার বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে খোকার জন্ম মাস, তাহার পূর্বেই খোকার হাতে খড়িটা ত' দেওয়া চাহি, আর দেরী করা ত' ঠিক নয়। পূজার গোলমালও সব চুকিয়া গেল, আমার বিবেচনায় এই আশ্বিন মাসের ভিতরেই খোকার হাতে খড়িটা হইয়া গেলে ভাল হয়।

বাবা বলিলেন, আমি সেই কথা বলিবার জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি। অদ্য বৃহস্পতি বার, বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতিবারই বিদ্যারম্ভের পক্ষে প্রশস্ত বার। আজ তিথিও মন্দ নহে, এই কারণে তোমার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, যদি আজ খোকার বিদ্যারম্ভ কার্য্য লৌকিক ভাবে করা হয় তাহাতে তোমার কি মত? তাহাতে আমার মা বলিলেন, ও বিষয়ে আর মতামত কি আছে, আপনি যেদিন ভাল বিবেচনা করিবেন সেই দিনেই বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিবেন, আমি স্ত্রীলোক দিন ক্ষণ অত বুঝিওনা,

ভগবানকে স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলে অশুভ দিন হইলেও শুভ হইয়া থাকে, তাহার সহিত আপনার অভিপ্রেত যেদিন হইবে, সেই দিনকেই আমি শুভ দিন বলিয়া মনে করিয়া লইব, তবে পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হইতে আর দেরী নাই, এক্ষণে যত শীঘ্রই হয় ততই ভাল। আরও বিশেষ, আজ যখন দিন ভাল আছে বলিতেছেন, তখন অদ্যই কার্য্য হইয়া যাক। এরপর কি জানি আবার কি বাধা পড়িবে, শেষে হয়ত হইবে না, অতএব আজই বিদ্যারম্ভ করিয়া দিউন, আপনার মতেই আমার মত, আপনার মতের বিরুদ্ধে আমার কোন মতই নাই। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। বাবা বলিলেন, তবে খোকাকে এখন কিছু খাইতে দিওনা, আমি বাহিরে গিয়া পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাই, যাহাতে সকাল সকাল কার্য্য হইয়া যায়। তুমি এদিকে সব ব্যবস্থা কর, পূজার উদ্যোগ ঠিক রাখিও, খান চারেক নৈবেদ্য এবং একখানা কুঁচা নৈবেদ্য ও জলপানি করাইয়া রাখিও। বাকি বস্ত্র ইত্যাদি সব আমি বাহির হইতে পাঠাইয়া দিতেছি, আমি বাহিরে গিয়া (শারদীয়া পূজার) বাদ্যকরদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া আসি, তাহারা বিদায়ী বাজনা বাজাইতেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যারম্ভ এবং পৌগণ্ড অবস্থা বর্ণন

আমার হাতে খড়ি হইবে শুনিয়া, প্রথমতঃ আমার মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। ভয় হইবার কারণ, আমি চোরেদের হাতখড়ি দেওয়া দেখিয়াছি, চোরদের হাতে লোহার বালার মতন, মাঝে একটু শিকলের মতন দেওয়া তাহা দুই হাতে পরাইয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া থাকে, তাহাতে হাত বাঁধা থাকে, লোকে তাহাকে হাতে হাতখড়ি বলিয়া থাকে, আমার ভয় হইল যে, আমাকে কি সেই রকম হাতে হাতখড়ি দিবে। যাহা হউক ইহাতে আমার দারুণ ভয় হওয়ায় আমি কাঁদিতে কাঁদিতে আমার মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! আমার হাতেখড়ি ত' লোকে চোরেদের দিয়া থাকে, আমি ত' মা কোন জিনিষ চুরি করি নাই, মা! তবে কেন আমার হাতেখড়ি দিবে? মা আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, বালাই ষাট ষাট, তোমাকে হাতখড়ি কেন দিব, তুমিত' চোর নহ যে, তোমাকে হাতখড়ি পরাইয়া বাঁধিয়া রাখিব। তুমি হাতেখড়িটা কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভয় পাইয়াছ, হাতেখড়ি মানে চোরেদের হাতখড়ি নহে। হাতেখড়ি মানে, পূজাদি করিয়া তাহার পর পুরোহিত মহাশয় তোমার হাতে কাঠখড়ি দিয়া তোমাকে

লেখা শিখাইবেন। কাঠখড়িতে লেখা যায়, উহা সাদা রঙ্গের পাথরের মতন। ঐ খড়ি দ্বারা পুরোহিত মহাশয় তোমাকে সমস্ত অক্ষর লিখাইবেন, তাহার পর কিছু পড়াইবেন। এখন হইতে তোমাকে লেখা পড়া করিতে হইবে অদ্য তাহারই প্রথম আরম্ভ দিন। সকল কার্য্যেরই প্রথম আরম্ভ সময়ে ভগবানের পূজা করিয়া কার্য্য করিতে হয়, একারণ অদ্য পূজাদি করিয়া তোমার লেখা পড়া আরম্ভ হইবে। ইহাতে তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই, বরং আনন্দের বিষয় জানিবে। তোমার হাতেখড়ি উপলক্ষ্যে আমরাও অদ্য কত আনন্দ করিতেছি, যদি ইহা মন্দ বিষয় হইত তাহা হইলে আমরা আনন্দ করিতাম না, ইহা বলিয়া মা আমার মুখে চুম্বন করিয়া আদরের সহিত বলিলেন, বাবা খোকা তুমি কাঁদিও না ইহাতে কোন ভয় নাই।

মা'র মুখে সমস্ত অবগত হইয়া আমার যে হাতখড়ির আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়া গেল। আরও বিশেষ মা যখন বলিতেছেন, কোনও ভয় নাই, তখন আমার ভয়ের কোন কারণ নাই বলিয়া বুঝিলাম। তবে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মা বলিয়াছেন, লেখা পড়া করিতে হইবে, লেখাটা কি করিতে হইবে তাহার বিশেষ কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না, না পারিলেও বুঝিলাম, যে আর ক্ষণিক পরেই তাহা বুঝিতে পারিব। পড়াটা সম্বন্ধে আমার তত' আশঙ্কা হইতেছে না, কারণ পড়ার অভ্যাস আমার কতকটা আছে, যদিও এখন আর আমি তত' পড়ি না, তাহা হইলেও মনে হইল একটু সাবধানে পড়িলেই হইবে, না হয় একটু নরম জায়গা দেখিয়া হাত পা না ভাঙ্গে এইরূপ একটু সাবধানে পড়িলেই হইবে। তবে আমার ওজন এখন পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে, তাহার উপর আমার মাংস অপর খোকাদের অপেক্ষায় কিছু বেশী থাকায় একটু থপ্ থপে ভাবও আছে, একারণ যদি দৌড়িয়া দৌড়িয়া বা লাফাইয়া লাফাইয়া পুরোহিত মহাশয় পড়িতে বলেন, তাহা হইলে একটু কষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক সে ভাবনা এখন আমার করা চাহিনা, পড়্‌বার সময় তখন দেখা যাইবে। এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া আমি হাসিতে হাসিতে মা'কে বলিলাম, মা, আমি লেখা পড়া করিব, তাতে আর আমার ভয় না; এমন সময় বাবা আমাদের ঘরে আসিয়া মাকে বলিলেন, পুরোহিত মহাশয়কে খবর পাঠাইয়াছিলাম, তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যত শীঘ্র হয় তিনি আসিতেছেন তুমি এদিকের সব ঠিক করিয়া রাখিও। মা বলিলেন, সমস্তই ঠিক আছে, কেবল সামান্য ফল মূল আনাইয়া দিবেন। আপনি খোকার হাতে খড়ির কথা বলিয়া নীচে যাইলে পর, খোকা যাহা বলিয়াছে, তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরন করিতে পারিবেন না, ইহা বলিয়া মা হাতেখড়ি সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তৎসমুদায় আনুপূর্বিক বাবাকে বলিতে লাগিলেন।

বাবা মার মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, খোকার এ ভয় হওয়া অসম্ভব নয়, বর্তমানে বিদ্যা বা বিদ্যারম্ভ হাতখড়িতেই পরিণত হইয়াছে। কারণ ভ্রমান্ধ জীব

বিদ্যাবোধে অবিদ্যার আলোচনা বা পাঠ করিয়া মোহরূপ হাতখড়িতে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাকে বিদ্যাবোধে, ঐ বিদ্যামদে মত্ত হইয়া আসুরিক ভাবেই বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং বর্তমানের বিদ্যা শিক্ষা একপ্রকার হাতখড়ি বিশেষই বটে। বর্তমানে বিদ্যা অভ্যাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা বিদ্যাবোধের পরিবর্তে ভাষা শিক্ষা করা হইয়া থাকে; ভাষা কখনও বিদ্যা হইতে পারে না। ভাষা অর্থে—বলা বা কথনকে কহা যায়। নানা দেশের নানা জাতীয় বুলি, যাহারা যে যে রকম বুলি বলিয়া আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, সেই সকল বুলিকেই ভাষা কহা যায়। স্থানভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে। এই ভাষা নানাপ্রকারের আছে, যেমন বাঙ্গালা, হিন্দি, সংস্কৃত, প্যালি, তামিল, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রি, আরবি, পারসী, তাহার পর পাশ্চাত্য দেশেরও নানা ভাষা আছে, আমাদের রাজভাষা ইংরাজী। এইরূপ নানা রকম ভাষা, পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল ভাষা শিক্ষাকে বিদ্যা শিক্ষা করা বলা যে কতটা যুক্তি সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারি না। এইরূপ নানা রকম ভাষা শিক্ষা করিয়া যদি আমি আমাকে বিদ্যাবান মনে করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার অপেক্ষা মূর্খ আর জগতে কে আছে, তাহাত' বলিতে পারি না। তবে যখন যে জাতি যে কোন মহাদেশের রাজা হন বা রাজা থাকেন তখন সেই সেই মহাদেশের লোক সমূহ সেই রাজা বা রাজার জাতির বুলি রূপ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ করিয়া থাকে। কারণ রাজ ভাষা শিক্ষা করিলে, অর্থোপার্জ্জন হইতে পারিবে। এই অভিপ্রায়ে রাজ ভাষা এবং আইন কানুন শিক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদিগকে কথোপজীবীও বলা যাইতে পারে, কারণ কথা বলা দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন, সুতরাং ইঁহারা কথোপজীবী; ইঁহারা বিদ্বান পদবাচ্য নহেন। আপন আপন রাজভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক মত সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আপন আপন রাজভাষা অবগত না থাকিলে নিজ নিজ মনোভাব রাজা কিম্বা রাজার প্রধান কর্মচারিবৃন্দকে জ্ঞাপন করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। একারণ রাজভাষা সকলেরই কিঞ্চিৎ শিক্ষা করা প্রয়োজন। আরও বিশেষ, রাজা দেবতা বা পিতা মাতার স্বরূপ, এবং রাজার প্রধান প্রধান কর্মচারীবৃন্দকেও তৎস্বরূপ মনে করা উচিত। রাজাভাষা জানা থাকিলে আপন আপন অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে অপরের সাহায্য আবশ্যক হয় না; একারণ রাজভাষা শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। এই রাজভাষা জানা থাকিলেই যে আমি আমাকে বিদ্বান বলিতে পারি তাহা নহে। কারণ বিদ্যা স্বতন্ত্র বিষয়, আর ভাষা স্বতন্ত্র বিষয়। বিদ্যা ও ভাষাকে এক মনে করা বিদ্যৎ সমাজে বাতুলতার পরিচয়ই প্রদান করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ ভাষা শিক্ষা করা আর বিদ্যা শিক্ষা করা এক বিষয় নহে। অবশ্য প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ নীতি বা ধর্ম শিক্ষার বিষয় থাকিলেও তাহার দ্বারা বাস্তবিক কেহ নীতিবান বা ধার্মিক হইতে পারেন না, তবে রাজ ভয়ে

বা সমাজ ভয়ে কিম্বা উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইব এই ভয়ে, আমরা কুনীতি বিষয়ক কার্য্য করিতে ততটা সক্ষম হইতে পারি না বলিয়া তাহাতেই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে কতকটা বিরত থাকি মাত্র। অথচ মনে মনে বা গোপনে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া বাহ্যিকে আমি যেন খুব নীতিবান, ধার্মিক ইত্যাদি দেখাইয়া থাকি, অন্তরে সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। নিজের স্বার্থ হানি হইতে দেখিলে তখন আর কোন নীতি বা ধর্ম বোধ আমার থাকে না।

ভাষা শিক্ষার দ্বারা আমি যে বাহ্যিক নীতি বা ধর্ম শিক্ষা পাইয়াছি তাহা দ্বারা আমার বাহ্যিক বিনয় (নম্র ভাব) লোকে দেখিতে পায় সত্য, কিন্তু, আমার অন্তর ভাষারূপ বিদ্যা শিক্ষার মদে দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ। যেখানে দাম্ভিকতা বর্তমান থাকে, তথায় কি বিনয় ভাব থাকা কদাচ সম্ভব পর হইতে পারে? নিশ্চয়ই অন্তরে বিনয় ভাব নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমি কিছুই জানিনা বা বুঝি না ইহা কেহ বলিলেন যখন আমার সর্ব শরীর ক্রোধে উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন আমার নম্রভাব কোথায় আছে তাহাত' বলিতে পারি না। এক বিদ্যা শিক্ষার অভাবে আমি আমাকে আসুরিক সম্পদের স্রোত হইতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমার ভাষা শিক্ষার ফলে, আমাকে আসুরিক সম্পদের ভোগ লালসা চরিতার্থ রূপ স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া আমার বাহ্যিক নীতির সহিত পাশবিক ব্যাপার রূপ অগাধ সলিলে ডুবাইয়া দিয়া পাশবিক ব্যাপার চরিতার্থ করাইতেছে। যখন ভাষা শিক্ষার দ্বারা আমি চরিত্রবান হইতে পারিলাম না, এমত স্থলে আমি ভাষা শিক্ষা শিক্ষাকে বিদ্যা বলিতেই পারি না। একারণ পূর্বে বলিয়াছি যে, বর্তমানে ভাষা শিক্ষারূপ বিদ্যা শিক্ষা প্রকারান্তরে হাতখড়ির ন্যায়ই হইয়াছে। যেহেতু অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে হাতখড়ি পরিধান করিতে বেশী বিলম্ব হয় না। তবে আমি বর্তমানের আইন কানুন কতকটা জানি এবং আইন বাঁচাইয়া চলি বলিয়া হাতখড়ি ধারণ করিতে হয় না। যাহা হউক আমার বক্তব্য এই যে, ভাষা শিক্ষা ও বিদ্যা স্বতন্ত্র বিষয়।

বর্তমানে আর প্রায় বিদ্যা শিক্ষা হয় না, সবই ভাষা শিক্ষা হইয়া থাকে। বিদ্যাও দুই প্রকার, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। বর্তমানে পরাবিদ্যা প্রায় লোপ পাইবার মতন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে পরাবিদ্যা লোক করিবার কাহারও ক্ষমতা না থাকায় উহা ক্বচিৎ হাজারের মধ্যে এক আধজন মনুষ্যের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় (অবশ্য নরের মধ্যে নয়, মনুষ্যেরই মধ্যে)। প্রকৃত মনুষ্যও অতি বিরল। নরের মধ্যে সকলেই পশুভাবাপন্ন, আকারে কেবল চতুষ্পদ নহে, এই মাত্র প্রভেদ। আর অপরা বিদ্যা, যাহা পরাবিদ্যা নহে, তাহাকেই অপরা বিদ্যা কহা যায়। এই অপরাবিদ্যাই অবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা আসুরিক ভাবের পোষণ হয়, তাহাকেই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা বলা হইয়া থাকে, যেমন ভাষা শিক্ষা। এই ভাষা শিক্ষাও বিদ্যা শিক্ষা নহে।

ইহা বিদ্যা শিক্ষার ভাণ মাত্র জানিবে। বিদ্যা শিক্ষায় হাতেখড়ি, (খোকা যাহা বলিয়াছে) হাতখড়ি ধারণ করিতে হয় না।

এক্ষণে বিদ্যা কাহাকে বলে এবং উহার অভ্যাস কিরূপ ভাবে করিতে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ বিদ্যা কি, তাহাই বলিতেছি। বিদ্যাবিদ্ জানা, যাহার দ্বারা ধর্মাধর্ম জানা যায়, তাহাই বিদ্যা পদবাচ্য। যখন বিদ্যাদ্বারা ধর্মাধর্ম জানা যায়, তখন বিদ্যাটি কি বিষয় তাহা বিশেষ করিয়া জানা উচিত। "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি র্বিদ্যেতি ভন্যতে"। অর্থাৎ আমি দেহ নহি, আমি চিদাত্মা স্বরূপ, লোক আমাকে বুদ্ধি বা বিদ্যা কহিয়া থাকে। তাহা হইলে চিদাত্মাই প্রকৃত বিদ্যা পদবাচ্য। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা, এই বিদ্যা লাভের দ্বারা সকল বিদ্যাই জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ আত্ম বিদ্যার অন্তর্গতই সকল বিদ্যা। যেমন বেদবিদ্যা। বেদ পাঠ মাত্রে বেদ বিদ্যা লাভ কাহার হয় না। বেদ পাঠ আজন্ম করিলেও কাহার আত্ম জ্ঞান হয় না। বেদাধ্যায়নকে স্বাধ্যায় কহা হয়; স্বাধ্যায় কাহাকে কাহাকে বলে তাহাই দেখা যাউক।

"ধর্মঃস্যাৎ পরমার্থায় সত্যং স্যাদাত্মশুদ্ধয়ে।
ক্ষমাস্যাৎ লোক লাভায় স্বধ্যায়ো ব্রহ্মহেতবে"।।

অর্থাৎ ধর্মদ্বারা পরমার্থ, সত্য দ্বারা আত্ম শুদ্ধি হয়; ক্ষমাদ্বারা লোক জয়ী হয় এবং স্বাধ্যায় দ্বারা পরমার্থ লাভ হয়। স্বশব্দে—স্বাধিষ্ঠান চক্র এবং অধ্যায় শব্দে অভ্যাস। ক্রিয়া যোগের অভ্যাস দ্বারা স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থিতি হইয়া থাকে, ক্রিয়া যোগের অভ্যাসই অধ্যায়, এই অভ্যাসরূপ অধ্যায় দ্বারা মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইয়া থাকে, ইহাই প্রকৃত বেদ পাঠ। বেদের ভাষা পাঠ বা ভাষা শিক্ষা দ্বারা আমাকে আসুরিক সম্পদের স্রোত হইতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সুতরাং বাহ্যিক বেদ পাঠ দ্বারা আমার গতি আসুরিক সম্পদের দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। তবে সামাজিক ভয়ে আমি বাহ্যিক আচার আদি দেখাইয়া নিজেকে বঞ্চনা করি মাত্র। নচেৎ মন আমার সর্বদাই আসুরিক বিষয় লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকে। বেদ নহে, বেদকে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। "নবেদং বেদ মিত্যাহুঃ বেদ ব্রহ্ম সনাতন।" ইতি জ্ঞান সঙ্কলিনণীতন্ত্রম। এমত স্থলে বেদের পুঁথি পাঠ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইয়া বে'দে হইতে হয়; (বে'দেপাক্ মারাকে বলে) অর্থাৎ পরিণামে ব্যাধ রূপে পরিণত হইতে হয়।

যাঁহাকে চিদাত্মা কহা যাইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম পদবাচ্য, আত্মার বৃহত্ব হেতু আত্মাকে ব্রহ্ম কহা যায়, ব্রহ্ম শব্দটি ব্রহ্ম পদবাচ্য নহে, (বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে) ব্রহ্ম শব্দ চিদাত্মার উপাধি মাত্র। এই উপাধিরূপ চিদাত্মা শব্দ ও চিদাত্মা পদবাচ্য নহেন, স্থির প্রাণই হইতেছেন আত্মা, (যে রুদ্রাস্তে খলু-প্রাণাঃ যে, প্রাণাস্তে তদাত্তকাঃ) ঐ স্থির প্রাণরূপ আত্মার উপাধি চিদাত্মা, এই স্থির প্রাণ জ্ঞানময়, এবং স্থির প্রাণই বিদ্যা পদবাচ্য। এই বিদ্যাকে দুর্গাও কহা যায়, কারণ স্থির প্রাণরূপা আত্মবিদ্যা, এই দেহরূপ দুর্গে রহিয়াছেন

বলিয়া ইহকে দুর্গা কহা যায়। এবং দুর্গা শব্দে আত্মাকে বুঝায়, কারণ স্থির প্রাণরূপা পরমা প্রকৃতি যিনি তিনিও পরমাত্মা পদবাচ্য। অতএব স্থির প্রাণরূপ আত্ম বিদ্যাই বেদ বিদ্যা পদবাচ্য। এই স্থির প্রাণরূপ আত্মার জ্যোতির্ময় রূপই অঙ্গ (জ্যোতিঃই হইতেছে অঙ্গ স্বরূপ) ইহাই বেদাঙ্গ পদবাচ্য। অর্থাৎ গাঢ় নীল বর্ণের গোলাকার পদার্থের চতুর্দিকে পীত বা শ্বেত বর্ণের জ্যোতিঃ যাহা দেখা যায়, তাহাই প্রাণাত্মার অঙ্গ বিশেষ। এই অঙ্গকেই বেদাঙ্গ কহা যায় বেদাঙ্গের ভাষা পাঠ দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায় না, তাহা পূর্বোক্ত রূপ ভাষা শিক্ষা হয় মাত্র। তাহাতে চির জীবনটা কোন অবলম্বন না পাইয়া কেবল ভাষার উপর ভাসিয়া ভাসিয়াই বেড়াইতে হয়। এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে পরিণামে হাঙ্গর কুম্ভীর রূপ আসুরিক বৃত্তির উদরস্থ হইয়া নানা রকম জ্বালার সহিত কালাতিপাত করিতে হয়। যদ্রূপ বেদাঙ্গের ভাষা পাঠ করিয়া স্থির প্রাণরূপ আত্মা নারায়ণের জ্যোতিরূপ অঙ্গ ইত্যাদির কোনই অনুভব হয় না; তদ্রূপ পুরাণাদি গ্রন্থের ভাষা পাঠ করিয়াও (পুরাণের প্রকৃত মর্ম অবগত না হইয়া) ভাষার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে হয়।

এক্ষণে পুরাণ কাহাকে বলে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পুরাণ পুরা—পূর্বকালে (একমাত্র আদিতে) স্থির প্রাণরূপ ঈশ্বর মাত্র ছিলেন অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব কালে (অনাদি কাল যাহাকে বলে) যে অবস্থায় চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না, কেবল পরব্যোম স্বরূপ প্রকাশ অব্যক্ত (নিজবোধ রূপে অবস্থিতি) ভাব মাত্র ছিল। সেই পরব্যোম স্বরূপ তিনিই একমাত্র পুরাণ পদবাচ্য। "ত্বমাদিদেবঃপুরুষ পুরাণ স্ত্বমস্য বিস্বস্য পরং নিধানম্"। গীতা ১১ অঃ ৩৮ শ্লোক। তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ পুরুষঃ, তুমি বিশ্ব সংসারের নিঃশেষ রূপে স্থিতির স্থান, অর্থাৎ তুমিই বিশ্বের লয় স্থান এবং জ্ঞাতা জ্ঞাতব্য, তুমিই তোমাকে জানিতে পার, অপর কেহই তোমাকে জানে না, অর্থাৎ যখন তুমি ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে, কি জানিবে, যে জানিতে যায় সে তুমিই হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রাণময় জগৎ প্রাণই ঈশ্বর পদবাচ্য বিশ্ব সংসারে ঈশ্বরই, প্রাণ হইতেছেন, কারণ প্রাণ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং প্রাণেতেই লয় হইয়া থাকে অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণ স্বরূপ স্থির প্রাণ, অনিচ্ছার ইচ্ছায় ঘটস্থ হইয়া জীবভাবে যে সমস্ত লীলা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং করিতেছেন বা করিবেন, তাহার বিবরণই (শাস্ত্রই) পুরাণ পদবাচ্য। উহা দেহস্থিত প্রাণরূপা (আত্মশক্তি রূপা) বিদ্যার আলোচনায় অর্থাৎ ক্রিয়া যোগরূপ অভ্যাস দ্বারা পাঠ করিলে, তবে বিদিত হওয়া যায়, নচেৎ ভাষা পাঠ দ্বারা পুরাণ বিদিত হওয়া যায় না। ভাষা পাঠ দ্বারা জ্ঞান লাভ ত' হয়ই না উপরন্তু আমার অজ্ঞানতার জন্য পরমাত্মা ভাবকেও আমি কলঙ্কিত করিয়া থাকি।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভাষা পাঠ করিয়া আমি সময় সময় কথোপজীবী হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি মাত্র, নচেৎ পুরাণের উদ্দেশ্য আমার জানা নাই। আমাকে যে

প্রকৃত পুরুষরূপ পুরাণকে জানিতে হইবে, তাহা আমার ভাষা পাঠে জানা হয় নাই। জানা হইলে নিশ্চয়ই আমি পুরাণ পুরুষকে জানিতে চেষ্টা করিতাম। পুরুষ শব্দের অর্থ—পুর—শি-শয়ন করা; দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন, তিনিই পুরুষ শব্দবাচ্য। অর্থাৎ স্থির প্রাণ চিদাত্মা, ইনিই প্রকৃত বিদ্যা পদবাচ্য (ইঁহাকেই জানিতে হইবে) এবং এই বিদ্যারূপ আত্ম ক্রিয়ার অভ্যাসই প্রকৃত পাঠ। এই পাঠ বিধি পূর্ব্বক করিতে পারিলে বেদ বেদাঙ্গপুরাণের প্রকৃত মর্ম (যাহা ভাষা পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না), প্রাণ বিদ্যার ক্রিয়া যোগের সাহায্যে সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই প্রাণবিদ্যার ক্রিয়া যোগের অভ্যাসে নিযুক্ত হইতে পারিলে, আমি আমাকে আসুরিক স্রোতের টান হইতেও রক্ষা করিতে পারিব এবং হায়রে পয়সা! করিয়া পয়সার লোভে সত্যের অপলাপও আমার দ্বারা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমি এক বিদ্যা শিক্ষার ভাণে অবিদ্যারূপ নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রকৃত বিদ্যাকে অবিদ্যা বোধে দর্শন করিয়া থাকি। আমার চক্ষু থাকিতেও আমি অন্ধ; কারণ ভাষারূপ বিদ্যা পাঠ দ্বারা আমি চক্ষুষ্মান হইতে পারি নাই, অথচ আমি বলিয়া থাকি আমার দর্শনের জ্ঞান আছে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে, আমি অন্ধ হইয়া বলিতেছি আমার দর্শনের জ্ঞান আছে। যিনি বাস্তবিক আত্ম বিদ্যার অভ্যাসে প্রকৃত চক্ষুষ্মান হইয়াছেন, তাঁহার নিকট কি আমি হাস্যাস্পদের বিষয় হইব না? তবে আমার ন্যায় অন্ধের দল বেশী থাকায় কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আমার নিকটে আসিলে আমি তাহাকে অন্ধ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। যেমন কোন স্থলে যদি কতকগুলি লোক উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া থাকে (এবং তাহারা উলঙ্গ ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে) আর তাহাদের সম্মুখে যদি কোনও এক ব্যক্তি কাপড় পরিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেমন উলঙ্গ ব্যক্তিগণের মধ্যে বস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তিই অগ্রাহ্যনীয় হয় তদ্রূপ অন্ধ লোকের মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমার যে চক্ষু থাকিতেও নাই তাহা আমি ভাষা শিক্ষা দ্বারা বোধ করিতে পারি নাই, ভাষা শিক্ষার দ্বারা যে আমি চক্ষুষ্মান হইতে পারিব না তাহাও আমার বোধ নাই। আমি ভাষা পাঠ দ্বারা বরং সময় সময় সাহঙ্কারে বলিয়া থাকি যে, আমার দর্শনে জ্ঞান আছে। দুঃখের বিষয় আমার আত্ম বিদ্যার অভাবে দর্শনে যে, সমস্তই অদর্শন হইয়া রহিয়াছে। তবে পোড়া পেটের দায়ে বলিতে পারি না যে আমার দর্শনের জ্ঞান নাই বা দর্শন হয় নাই। দর্শন কার্য্য ভাষা বা পুঁথি পাঠে হয় না। দর্শন চক্ষু ব্যতীত কাহার হইতে পারে না। সেই চক্ষু বুদ্ধি বিদ্যার দ্বারা লাভ হইতে পারে, স্থির প্রাণরূপ চিদাত্মার সম্বর্দ্ধন রূপ পূজার দ্বারা বুদ্ধি বিদ্যার প্রকাশ হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অযুক্তি ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; তবে যে বুদ্ধি সাধারণে দেখা যায়, তাহা সাধারণ পশুর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"নাস্তি বুদ্ধির যুক্তস্য নচা যুক্তস্য ভাবনা।
নচা ভাবয়তঃ শান্তির শান্তস্য কুতঃ সুখম্।।"
গীতা ২য় অঃ ৬৬ শ্লোক।

অর্থাৎ অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই, বুদ্ধি না থাকা হেতু আত্মচিন্তা বা আত্ম ভাবনা হইতেই পারে না। আত্মচিন্তা বা আত্মভাবনার অভাবে শান্তিও প্রাপ্ত হইতে পারে না যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কোথায়? বুদ্ধি এখানে আত্ম বিষয়িণী বুদ্ধি বুঝিতে হইবে। কারণ অযুক্ত ব্যক্তি বুদ্ধি নাই; ইহাই গীতার শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকেই অযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর যাঁহারা পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া স্থির প্রাণরূপ চিদাত্মাতে যুক্ত থাকিয়া অনাসক্ত ভাবে জীবের হিতকর কার্য্য করিয়া যান, তাঁহারাই যুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, এই বুদ্ধির দ্বারা তাঁহারা সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন।

"পশুঃ পশ্যতি গন্ধ্যো, বুদ্ধ্যা পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
রাজা পশ্যতি কর্ণ্যাভ্যাং ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।।"

পণ্ডিতেরা বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, অবশ্য ভাষার পণ্ডিত পণ্ডিতবাচ্য নহেন, "পণ্ডিতা সবদর্শিনিঃ" সমদর্শী ব্যক্তিই পণ্ডিত পদবাচ্য। সর্বত্রে সর্বজীবে যিনি এক আত্মাই দেখিতেছেন এবং মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ; আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ; "যিনি এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি তিনিই পণ্ডিত পদবাচ্য, অপরে নহেন। এরূপ পণ্ডিত পদবাচ্য ভাষার পুঁথি পাঠ দ্বারা হয় না ইহা নিশ্চয় জানিবে। মনে কর আমাকে যদি কেহ পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে আমি তাহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। কিন্তু যদি কেহ হঠাৎ আমাকে গাধা বা মূর্খ বলিয়া সম্বোধন করে তাহা হইলেই আমার চক্ষু আরক্তবর্ণ, ক্রোধে অন্ধ হইয়া সামর্থ থাকিলে হাতাহাতি করিতেও কুণ্ঠিত হই না, ইহাই কি আমার সমদর্শনের ফল? তাহার পর আমি আমার নিজের পুত্র কন্যার প্রতি যতটা মমতা রাখি ততটা কি অপরের পুত্র কন্যার প্রতি হইয়া থাকে, তাহা কদাচ হয় না। অপরের পুত্র কন্যা মরিলে তাহাকে বচন দ্বারা বুঝাইয়া থাকি, আর নিজের পুত্র কন্যা মরিলে একেবারে অধৈর্য্য ভাব আসিয়া পড়ে, তখন আর আমার নিজের বচন দ্বারা আমার শোক অপনোদন হয় না, হয়ত বাটী হইতে পাঁচদিন আর বহির্গত হই না, ইহাই কি আমার সমদর্শিতার ফল? ভাষার পুস্তক বা পুঁথি পাঠ দ্বারা কেহ পণ্ডিত হইতে পারেন না, সাধন দ্বারা আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে তবে পণ্ডিত পদবাচ্য হইতে পারা যায়, নচেৎ নহে।

সাধন দ্বারা আত্ম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির আত্ম সম্বন্ধীয় সকল সত্ত্বই দর্শন হইয়া থাকে। নচেৎ সাঙ্খ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রের (ভাষায়) পুঁথি পাঠে কোন তত্ত্বই অবগত

হওয়া যায় না। তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে সাধন প্রয়োজন। বিনা সাধনে দর্শনের কোন তত্ত্বই অবগত হওয়া যায় না। যেমত সাঙ্খ্য দর্শন, সাঙ্খ্য দর্শনের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ তত্ত্বের সহিত আপনাকে আপনি জানা, আপনাকে আপনি জানিতে হইলে সাঙ্খ্য দর্শনের পুঁথি পাঠের দ্বারা জানা হয় না, তাহাতে শোনা হয় মাত্র। শ্রবণ করিয়া যদ্যপি আমার আমাকে জানিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মায় এবং আমি আমাকে জানিবার জন্যে সাধন মার্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও আমার ভাষা পাঠের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হইল বলিতে পারি। নচেৎ ভাষা মাত্র পাঠ করিয়া আমার সাঙ্খ্য দর্শনের জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কার করাটা কি বাতুলতার পরিচয় নহে? কারণ জানা আর শুনা তুল্য নহে ইহা নিশ্চিত। যেমত একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সূর্য্য দেখিতেছেন, আর অপর এক অন্ধ ব্যক্তি সূর্য্যের বিষয় শুনিতেছেন, এই উভয়েতে কি পার্থক্য নাই? আরও বিশেষ আমি সূর্য্য দর্শন করিতেছি, আমার সূর্য্য দর্শন করিয়া যে তৃপ্তি লাভ হইবে, অন্ধ ব্যক্তির শ্রবণ করিয়া কি এই দর্শনের তুল্য তৃপ্তি সম্ভবে, তাহা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নহে। যেমত আমি ভোজন করিতেছি আর অপর এক ব্যক্তি ভোজন না করিয়া ভোজন শব্দ মাত্র আবৃত্তি করিতেছে। যে ব্যক্তি ভোজন শব্দ মাত্র আবৃত্তি করিতেছে, তাহার ভোজন না করার দরুণ পেটও ভরে না এবং ভোজনের তৃপ্তিও হয় না বরং ক্ষুধার জ্বালায় পেটের দায়ে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া সত্যকে চাপা দিয়া, সত্যের ভাণে মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যাচারী হইয়া জীবন কাটাইতে হয়, ভাষা পাঠ করিয়া ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিড়ম্বনা কি হইতে পারে তাহাত' বুঝিতে পারি না।

সাঙ্খ্য দর্শনখানি মহাত্মা কপিল মুনি প্রণীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাতে প্রকৃতি, মন, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, সুক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব, স্থূল পঞ্চতত্ত্ব ও দশ ইন্দ্রিয়, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ সহিত পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব। "সম্যক ব্যাখ্যায়তে—প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্ব; মনযেতি সঙ্খ্যা সম্যক জ্ঞানম্ তস্যাং প্রকাশ মান মাত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যম"। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাহার দ্বারা তত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে সাঙ্খ্য কহে। ভাষার পুঁথি পাঠে কাহারও যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাত' এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। কারণ সকলকেই মানসিক ও দৈহিক জ্বালায় আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কোন জ্বালা থাকা সম্ভব পর নহে। সুতরাং দৈহিক ও মানসিক জ্বালা যাঁহার রহিয়াছে, তিনি কদাচ আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন ইহাই বলিতে হইবে। এবং তিনি সাঙ্খ্য দর্শনের ভাষা পাঠে, সকল বিষয়েরই অদর্শন হেতু জ্ঞানান্ধ রহিয়াছেন বলিতে হইবে। যিনি ত্রিতাপে সদাই তাপিত তিনি বলেন কিনা আমি ষড়দর্শন বেত্তা; ইহা অপেক্ষা আর হাস্যাস্পদের বিষয় কি হইতে পারে?

এক্ষণে ত্রিতাপ কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিনটীকে ত্রিতাপ কহা যায়। প্রথম, আধ্যাত্মিক কাহাকে বলে তাহা

শুন। স্থির প্রাণরূপ আত্মার অজপারূপ প্রকৃতি হইতে জীবের শরীর ও মন উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকেও আধ্যাত্মিক বা আত্ম সম্বন্ধীয় বলা যায়। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, যথা শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ধাতুর ব্যতিক্রম বর্তমান জীব শরীরে যে সকল ব্যাধি জন্মিয়া থাকে তাহাই শারীরিক দুঃখ এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি প্রিয় বিষয়ের বিয়োগ জনিত কষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তা মাত্রেই মানসিক দুঃখ বা (আধিরূপ) ব্যাধি বলিয়া কথিত হয়, ইহাকেই আধ্যাত্মিক তাপ কহিয়া থাকে। আর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জনিত চারিপ্রকার দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। অর্থাৎ মনুষ্য হইতে বা পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, দংশ, মশক, উৎকুন, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর আদি ও বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু হইতে যে সকল দুঃখ হয় তাহা আধিভৌতিক পদবাচ্য জানিবে। তাহার পর আধিদৈবিক, অর্থাৎ দিব্‌শব্দে আকাশ হইতে উৎপন্ন, দাহ, শীতাদি, অতিবাত, অতিবৃষ্টি ও বজ্রপাতাদি জনিত যে দুঃখ তাহকে আধিদৈবিক দুঃখ কহা যায়। এই ত্রিতাপ জনিত দুঃখ কাহারও ভাষা শিক্ষার দ্বারা নিবারণ হয় না বরং ত্রিতাপে তাপিত হইতেই দেখা যায়। অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত কাহার ত্রিতাপ দূর হইতে পারে না। অধ্যাত্ম বিদ্যা, ভাষার পুঁথি পাঠে হইবার নহে। অধ্যাত্ম বিদ্যা ক্রিয়া যোগের অন্তর্গত, এবং এ বিদ্যা গুরু বক্ত গম্য (গুরু অবশ্য বেশধারী গুরু বা কাণ ফোকা গুরু নহেন)। এই অধ্যাত্ম বিদ্যায় পুঁথি বা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, ইহাতে স্থির প্রাণরূপ আত্মার পূজারূপ সম্বর্দ্ধন ক্রিয়া অভ্যাস যোগের সাধন দরকার। সাধনরূপ অভ্যাস দ্বারা যখন আমার বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থার অনুভব হইবে তখন ত্রিতাপের অল্প নিবৃত্তি হইবে, তাহার পর উক্ত প্রাণ কর্মের সাধন করিতে করিতে কর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় সাধকের যখন অবিচ্ছেদে স্থিত হইবে, তখন সাধকের ত্রিতাপের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ পদবাচ্য হইবেন। ক্রিয়া যোগের অভ্যাস ব্যতীত সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞান কাহারও লাভ হয় না, ইহা স্থির এবং নিশ্চয় জানিবে। এইরূপ পাতঞ্জল দর্শন ও ভাষা শিক্ষার অভ্যাস করিয়া দর্শনে অদর্শন হইয়া রহিয়াছে।

পাতঞ্জল গ্রন্থখানি পাতঞ্জলি মুনি প্রণীত দর্শন শাস্ত্র। ইহা চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম যোগ পাদ, যোগ পাদে যোগ সম্বন্ধে যোগের লক্ষণাদি। দ্বিতীয় সাধন পাদ,—ক্রিয়া যোগাদি সাধন পাদ। তৃতীয় বিভূতি পাদ, ধ্যান ধারণাদি বিভূতি বিবরণ। চতুর্থ কৈবল্যঁ পাদ, সিদ্ধি পঞ্চকাদি কৈবল্য। পাতঞ্জল দর্শন খানিতে যে চারিটী পাদের বিষয় লিখিত আছে, তাহার ভাষা পাঠ করিয়া কাহার যে কি লাভ হয় তাহা বলিতে পারি না। প্রথম যোগ পাদ, এই যোগ পাদ সম্বন্ধে পতঞ্জলি গ্রন্থের শিক্ষকেরও যদ্রূপ জ্ঞান, ছাত্রেরও তদ্রূপ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। আমি শিক্ষক, আমার যদি যোগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে আমার ছাত্রেরই বা তৎসম্বন্ধে বিশেষ কি জ্ঞান লাভ

হইতে পারে। তাহার পর দ্বিতীয় সাধন পাদ, সাধনের ধার আমি কোন কালেই ধারি না। সাধন কাহাকে বলে তাহার অভ্যাস আমার করা হয় নাই, তবে আমার ভাষার জ্ঞান কিঞ্চিৎ থাকায় মোটামুটি একরকম অর্থ করিয়া দিয়া কোন গতিকে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি মাত্র। যোগ শব্দ বুঝাইতে গিয়া ছাত্রকে বলিলাম, "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ",—অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করার নাম যোগ, ইহাই যোগ শব্দবাচ্য। ছাত্রও আমার কথায় মাথা নাড়িয়া বুঝিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিল, আমারও গাত্র হইতে ঘর্ম বাহির হইয়া জ্বর ছাড়িল, মনে মনে বলিলাম আ! রাম বাঁচলুম। ছাত্রেরও পাতঞ্জল দর্শন খানি পাঠ করার উদ্দেশ্য, কোন গতিকে উপাধি পরীক্ষায় পাশ হওয়া। আবার হয়ত আমিই পরীক্ষক হইব, সুতরাং আমার ছাত্র আর বেশী আমাকে উত্যক্ত করিতে সাহস করে না। ছাত্র মনে করে কি জানি, শিক্ষক মহাশয় যদি পরীক্ষার সময় আমাকে নম্বর কম দেন, সুতরাং আর বেশী ঘাঁটাবার দরকার নাই, এই ভাবিয়া ছাত্রও আমার কাছে চুপ করিয়া থাকে।

ছাত্র যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে মহাশয় চিত্ত কাহাকে বলে এবং চিত্তের নিরোধই বা কিরূপে করিতে হয়? তাহা হইলেই শিক্ষকের চক্ষু স্থির হইয়া যায়, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বলিতে হয়, দেখ বাপু যোগ বিষয়ক কর্মকাণ্ড এখন হয় না, যোগ টোগ ও-সকল কথা মাত্র আছে, আরও বিশেষ, যোগ করিলে লোকে মারা যায় ওসব কাজ কলিকালে হয় না। ওসব তোমার জানিবার দরকার নাই, যাহাতে কোন গতিকে উপাধি পরীক্ষায় পাশটা হইতে পার তাহারই চেষ্টা কর। এসব বাজে কথায় দরকার নাই, আমি তোমাকে পড়াইতে আসিয়াছি যোগ শিক্ষা দিতে আসি নাই। যেমন গুরু, শিষ্যও তদ্রূপ হইয়া থাকে, শিক্ষক নিজেও এইরূপ ভাবে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ইহার বেশী আর কি শিক্ষা দিবেন; শিক্ষকের কর্মকৃত জ্ঞান না থাকায় ভাষার জ্ঞানে আর কতদূর হইতে পারে। যাহারা পরিণামে ধর্ম যাজক হইবে, তাহাদের শিক্ষা যদি এইরূপ কেবল মৌখিক শিক্ষা মাত্র থাকে ও কার্য্যতঃ যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে আর তাহাদের দ্বারা সমাজের বা সাধারণের কি উপকার সাধিত হইতে পারে? এইরূপ শিক্ষার দ্বারা না সমাজের উপকার সাধিত হয়, না নিজেরও কিছু বিশেষ উপকার হয়, আজীবন কাঙ্গালের বেশে পর মুখাপেক্ষী হইয়া দিন কাটাইতে হয়। বস্তুতঃ ভাষা পাঠের দ্বারা শাস্ত্রীয় কর্মকৃত জ্ঞান না হওয়ায় ইহাদের দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না তবে সভা সাজাবার সময় যেমন নানা প্রকার আসবাব দরকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ সভার নানা প্রকার আসবাবের মধ্যে এরাও একপ্রকার আসবাব স্বরূপ। যাহা হউক সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল এই দুইটি বিষয়ের উদ্দেশ্য প্রভেদ নাই, যেমত বেদ আর বেদান্ত। বেদান্ত শব্দের অর্থ বিদ্—জানা, অন্ত শেষ, অর্থাৎ জানার শেষ অবস্থা। জানার শেষ অবস্থা কি

বেদান্তের ভাষা পাঠ করিলে হয়? ভাষাপাঠ করিলেই কি আমার জানার শেষ অবস্থার জ্ঞান হইল, তাহা কখনই হয় না, বেদোক্ত, বৈদিক কর্মের অভ্যাস দ্বারা যখন আমার কর্মের অন্ত অবস্থারূপে ক্রিয়ার অতীত অবস্থার জ্ঞান (কর্ম করিয়া) কর্ম দ্বারা স্বতঃ প্রকাশ হইবে তখনই আমার যথার্থ বেদান্ত দর্শনের দর্শন ভাব প্রকাশ পাইবে, কর্ম না করিয়া যদি ভাষা পাঠ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হই, তাহা হইলে আর আমার বেদান্তের জ্ঞান দর্শন—কোথা হইতে হইবে। সুতরাং বেদান্ত দর্শন পাঠে, আমার দর্শন করা হইল না সমস্ত বিষয়ই অন্ধের ন্যায় অদর্শন রহিয়া গেল।

এইরূপ ন্যায়—বৈশেষিক মীমাংসা শাস্ত্রের ভাষা পাঠ করিয়াও অন্ধের ন্যায় বেড়াইতে হয়। ন্যায় শব্দের অর্থ নি—নিশ্চয়, ই—গমন করা, অর্থাৎ যাহার দ্বারায় নিশ্চিতরূপে সংশয় ছেদ হইয়া পরমাত্মা ঈশ্বরের সত্ত্বা নিরূপণ হয়, তাহাই ন্যায় শব্দ পদবাচ্য। এই ন্যায় শাস্ত্রের ভাষা পাঠের দ্বারা বাহ্যিক যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আমার পরমাত্মা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইলেও পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের অভাব হেতু আমার মনে নাস্তিকতার ভাব রহিয়া গেল। সুতরাং ন্যায় দর্শন পাঠে আমি যে অন্ধ সেই অন্ধই রহিলাম, পরমাত্মা ঈশ্বরের দর্শন অভাব হেতু আমার সমস্ত বিষয়ই অন্ধের ন্যায় অদর্শন ভাব থাকিয়া যাওয়ায় আমাকে আসুরিক ভাবের স্রোত হইতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছি না; নানা রকম তাপে আমাকে তাপিত হইয়া অবলম্বন হীন অন্ধের ন্যায় অবস্থায় সংসারের শোক তাপরূপ গর্তে মধ্যে মধ্যে পতিত হইয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া বেড়াইতে হইতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর কি হইতে পারে? আমার ভাষা শিক্ষার ফলে আমাকে ভাসিয়াই বেড়াইতে হইতেছে। সকল বিষয়েই উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অবগত না হইলে কোন বিষয়েই সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, ষড় দর্শন, বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অবগত না হইলে সমস্তই ব্যর্থ বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রগুলি সমস্তই ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত, তাহাকে ভাষার মধ্যে আনিয়া অবিদ্যায় পরিণত করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। তবে বর্তমানে প্রকৃত কর্মকাণ্ড লোপ হইয়া অবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।

ষড় দর্শনের মধ্যে কোনটি বা জ্ঞানকাণ্ড কোনটিতে বা কর্মকাণ্ড নিহিত আছে এবং কোনটিতে বা জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সন্নিবেশিত আছে, যেমন সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল। সাঙ্খ্য জ্ঞান কাণ্ড, পাতঞ্জল কর্মকাণ্ড, বেদে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের কিছু কিছু সন্নিবেশিত আছে বেদান্ত জ্ঞান বিষয়ক, বেদ উক্ত কর্ম করিয়া তাহার পর কর্মজনিত জ্ঞানাবস্থা আপনি আসিয়া থাকে, পুঁথি বা শাস্ত্র পাঠের আবশ্যক হয় না। শাস্ত্র সাক্ষী স্বরূপে, অবস্থিতি করিয়া থাকে অর্থাৎ সাধক কর্ম দ্বারা যে যে অবস্থা লাভ করেন, সেই সেই অবস্থার সম্বন্ধে শাস্ত্র সাক্ষী স্বরূপ ভাবে থাকিয়া সাধককে উৎসাহিত করিয়া থাকে, এই সকল কারণে শাস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, নচেৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়া অপরের

সহিত বাদ প্রতিবাদ করিবার জন্য বা অর্থোপার্জন জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন হয় নাই, কর্মজনিত যে জ্ঞান তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে, শাস্ত্রের ভাষা পাঠে কেহই সংশয় রহিত হইতে পারে না।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পাতঞ্জল গ্রন্থখানি চারিপাদের বিভক্ত ও উহার প্রথম পাদে যোগ এবং যোগের লক্ষণাদি বর্ণিত আছে। যোগ কি তাহা আমার জানা উচিত। যোগ সম্বন্ধে আমার কর্মকৃত জ্ঞান থাকিলে আর আমি বলিতে পারিব না যে, কলিকালে যোগ হয় না বা যোগ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যোগ সম্বন্ধে আমার কর্মকৃত জ্ঞান না থাকিলেও আমি যোগ সম্বন্ধে অযথা যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? তবে যোগ শাস্ত্র দেখিয়া যোগাভ্যাস করা চাহি না। কতকগুলি অপরিণামদর্শী লোক, গুরু বা সাধু সাজিয়া যোগ শাস্ত্র পাঠ দ্বারা আপন আপন শিষ্যগণকে যোগ শাস্ত্র অনুযায়ী কর্মকাণ্ড শিখাইতে গিয়া নিজে এবং শিষ্য উভয়েই অধোগামী হইয়া সময়ে সময়ে উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া থাকেন। এই সকল অপরিণামদর্শী লোকগণের দ্বারা যোগ সম্বন্ধে নানারকম কলঙ্ক লোক সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। পুস্তক বা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা যোগভ্যাস হয় না। যোগ কি বা যোগ কাহাকে বলে তাহাও জানা যায় না, যেমন মুখে রুটী প্রস্তুত করিতে শিখিলে পেট ভরে না তদ্রূপ জানিবে। পাতঞ্জল বলিলেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ", এই কথার অর্থ করিলাম, চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধ করার মান যোগ। ইহা দেখিয়া বা শুনিয়া যোগ করিতে গিয়া আমি যদি চিত্তের বৃত্তি সকলকে নিরোধ করিতে যাই, তাহা হইলে কি কোনকালেও আমার চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ হইতে পারে? তাহা কি সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়? প্রথমতঃ চিত্ত কি তাহাই আমার জান নাই, মন বলিতে চিত্তকে বলি, আর চিত্ত শব্দের অর্থ করিতে বলি মনই চিত্ত। চিত্ত বা মন কি পদার্থ তাহা আমার জানা নাই, সুতরাং নিরোধ করিব কাহার। ভাল, না হয় স্বীকার করিলাম মনই চিত্ত তাহা হইলেও মনের যে সকল বৃত্তি রহিয়াছে, তাহার নিরোধ করিব কি প্রকারে? তাহার উপায় আমার জানা না থাকায় আমি যোগ শাস্ত্র বা ঘেরণ্ডাদি অপর শাস্ত্র সকল হইতে উৎকট উপায় সব অবলম্বন করিয়া নিজে না করিয়া অপরকে ঐ নিরোধ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি; তাহার পর প্রাণ লইয়া টানাটানি হয় ইহাই কি ধর্ম?

আমার যোগ শাস্ত্র পাঠে ইহা জানা হয় নাই যে, বাহ্য শম দম ইত্যাদি উপা— দ্বারা চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ হইতে পারে না, বায়ু রোধ দ্বারা মনের বৃত্তি সমূহ নিরোধ হয় না, বরং বায়ু রোধ দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অনেক প্রচার ব্যাধি আসিতে পারে। গৃহস্থিত বায়ুকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা যেমন কোনক্রমেই সহজ সাধ্য নহে, তদ্রূপ মনের বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করাও তদপেক্ষা কঠিন বলিয়া মনে করা উচিত।

তবে যদি আমি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কর্ম সমূহকে নিরোধ করিয়া এই কথা বলি যে, আমার মনোবৃত্তি নিরোধ হইয়াছে, তাহা হইলে আর আমার অপেক্ষা ভ্রান্ত জগতে কে আছে। বস্তুতঃ বাহ্য ইন্দ্রিয় জনিত কর্ম সমূহকে নিগ্রহ করিলে চিত্ত বৃত্তির নিরোধ সাধিত হয় না ইহা নিশ্চয় জানিবে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করা প্রয়োজনও লক্ষিত হয় না। ঋষিরাও কেহ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করেন নাই। প্রকৃতির নিগ্রহ করাই পাপ, যোগ বিষয়টি শাস্ত্র দেখিয়া বুঝিতে গেলেই বিড়ম্বিত হইবে।

বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গীতে আছে, “আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধরি গগনের চাঁদ” অর্থাৎ আকাশ শব্দের অর্থ শূন্য [“শূন্য ধাতুর্ভবেৎপ্রাণঃ”], প্রাণই আকাশ, অর্থাৎ প্রাণরূপ আকাশে ফাঁদ পাতিয়া মনোরূপ চন্দ্রকে ধরিয়া থাকি। ফাঁদ, ফাঁসকে কহে—ধরিবার যন্ত্র, গগন,—গতি, অর্থাৎ গতিশীল যে চন্দ্র, (চন্দ্র মনকে কহা যায়) ঐ গতিশীল মনকে প্রাণের ফাঁদরূপ ক্রিয়া কৌশল দ্বারা ধরিয়া থাকি। কিম্বা ইহাও বলিতে পারি যিনি স্থির প্রাণ রূপ আত্মা স্বরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, সেই স্থির প্রাণে ফাঁসরূপ ক্রিয়া কৌশল দ্বারা, গতিশীল যে প্রাণ, তাহাতে অবস্থিত মনোরূপ চাঁদকে ধরিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত মনকে ধরিবার অপর উপায় নাই জানিবে। গতিশীল প্রাণেতেই মন অবস্থিতি করিয়া থাকে; মন দুই প্রকার, স্থির প্রাণে যে স্থির মন রহিয়াছে তাহাই আত্ম পদবাচ্য, আর চঞ্চল প্রাণ বা বর্তমান প্রাণ কর্মের (প্রাণের গতির) মধ্যাবস্থায় যে মন রহিয়াছে তাহাই বর্তমান মন বা চঞ্চল মন পদবাচ্য, (চঞ্চল প্রাণের অবস্থাই চঞ্চল মনের অবস্থা)। বায়ু রোধের দ্বারা বা অপর কোন উপায়েতেই এই বর্তমান মনকে বা মনের বৃত্তি সমুদায়কে নিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। যেমত আমি দোলনায় দুলিতেছি। ঐ দোলনার দোল যতক্ষণ থাকিবে, আমাকেও ততক্ষণ দুলিতে হইবে; দোলনার দোলায়মান অবস্থার স্থিরত্ব সাধন না হইলে আমারও যেমন দোলা বন্ধ হইতে পারে না তদ্রূপ বর্তমান প্রাণকর্মরূপ প্রকৃতির দোল-বর্তমান থাকিতে মনের ও দোলায়মান অবস্থারূপ চঞ্চলতা নিবারণ হইবার নহে। এই চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য যোগ শাস্ত্রাদি দেখিয়া উৎকটভাবে শম দম ও অপরাপর উৎকট কার্য্য দ্বারা এবং বায়ু রোধের দ্বারা মনের বৃত্তি নিরোধ করিতে যাইয়া বিফলতা প্রাপ্ত হই বলিয়া মুখে বলিয়া থাকি, যোগ করিলে কিছু হয় না, ওসব কলিতে হইবার নহে। বরং যোগ করিলে মরিয়া বৃথা হইয়া যায়। কারণ যোগ ক্রিয়া, সমস্ত শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। যোগের দ্বারাই শাস্ত্র বাক্য প্রত্যক্ষ হইবে। সেই যোগই যদি কলিতে না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য কি টাকা রোজগার করা? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বর্তমান রাজভাষা শিক্ষার দ্বারা ত' অনেক অর্থ উপার্জন হইতে পারে। শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন ইহা বলা নিতান্ত ঘৃণার বিষয়। আর যদি বলি জ্ঞানার্জ্জন করাই শাস্ত্র পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা হইলে যোগ কলিকালে হয় না বা যোগ করিলে

মরিয়া যায় ইহাও বলা উচিত নহে, যেহেতু যোগ ব্যতীত কেবল শাস্ত্র পাঠ দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, কারণ জ্ঞান লাভ হইলে জীবের জ্বালাও নিবারণ হইয়া থাকে জ্বালা নিবারণের জন্যই জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। কেবল শাস্ত্র পাঠের দ্বারা কাহার কোন জ্বালাই নিবারণ হইতে দেখা যায় না, তবে শুষ্ক জ্ঞানের বৃথা পরিশ্রমের আবশ্যকতা কি। আরও বিশেষ অনেকে বলিয়া থাকেন, যোগ ব্যতীতই যে কেবল জ্ঞান লাভ হয় না তাহাও নহে! তাহা হইলে আরও অপর বিষয় এমন অনেক রহিয়াছে যে, সে সকল অনুষ্ঠানও উঠাইয়া দিতে হয়, যেমন পূজা সন্ধ্যা, আহ্নিক ইত্যাদি।

হিন্দুর পূজাদি সমস্ত কার্য্যই বায়ু ক্রিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। সে সকল কার্য্যও যোগ অভাবে পুতুল খেলায় পরিণত হইয়াছে, যোগকর্ম ব্যতীত যখন পূজা হইতে পারে না আর সেই যোগ যদি কলিকালে হয় না, তাহা হইলে ঐ কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের উচিত পূজাদি কার্য্যও উঠাইয়া দেওয়া; কারণ লোকের বৃথা অর্থব্যয় তাঁহারা কেন করান, ইহা কি তাঁহাদের সঙ্গত কথা? বস্তুতঃ যোগ কিছু নহে বা কলিতে যোগ হয় না এরূপ বাক্য ভাল লোকে কদাচ বলেন না। যাঁহারা অর্বাচীন, কোন বোধই যাঁহাদের নাই তাঁহারাই বলিয়া থাকেন মাত্র। মনে কর আমার শত্রুপক্ষ যদি মহাবলশালী হয় আর সেই শত্রুকে দমিত করিতে না পারিলে আমার সকল সুখের আশা ভরসা সবই শত্রুপক্ষ দ্বারা যদি নষ্ট হয়, সেস্থলে কি আমার ছলে বলে কৌশলে তাহাদের দমন করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য নয়? বর্তমান শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমার মন ও ইন্দ্রিয়গণ, ইহাদিগকে দমন করা আমার নিতান্ত কর্তব্য তাহাও দেখিতেছি এবং সেই মন আমাপেক্ষা শত সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে ইহাও দেখিতেছি। এমত স্থলে তাহার উপর কেবল বল প্রয়োগ করিতে গেলে সে আমাকেই নষ্ট করিয়া দিবে তাহা আমার জানা নাই, না জানিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রতি বল প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের নিগ্রহ করিতে গিয়া আমিই আমার নিগ্রহ করিয়া বসি এবং পরিশেষে ইন্দ্রিয়গণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া থাকি। আমি যোগ না জানিয়া নিজের বুদ্ধিতে ভিমরুলের চাকে কাঠি দিয়া ভিমরুলের কামড়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া নিজের দোষ না দেখিয়া যোগের দোষ দিয়া থাকি। বস্তুতঃ যোগের দোষ কিছুমাত্র নহে, দোষ আমার বর্তমান আসুরিক ভাবের বুদ্ধির। আমার যে বর্তমান বুদ্ধি রহিয়াছে তাহা অযুক্ত বুদ্ধি। সুতরাং তাহা আসুরিক বুদ্ধি। আমি আমার আসুরিক বুদ্ধির দ্বারা কার্য্য করিয়া লাঞ্ছিত হইতেছি সে দোষ অপরের নহে সে আমারই নিজের দোষ। আমি যদি কোন যুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন কৃত কর্মা লোকের উপদেশ মত কার্য্য করিতাম তাহা হইলে আমায় উক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। তবে সময়ে সময়ে আমার আসুরিক ভাবের বুদ্ধি বর্তমান থাকায় আমি ভাল লোকের নিকট উপদেশ পাইলেও নিজেকে আমি বুদ্ধিমান মনে করিয়া এবং আমার বাহ্যিক শৌচাশৌচ আদি ও বাহ্যিক শম দম ইত্যাদি বিষয়ে

উপদেষ্টার বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার নিজের বুদ্ধি কতক কতক উপদেষ্টার মতের সহিত যোগ করিয়া চলিতে গিয়া বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমার উপদেষ্টা বলিয়া দিয়াছেন, "এক সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়," ইহা অমান্য করিয়া আমি একের সাধনের সহিত আরও অপর বিষয়ও সাধন মনে করিয়া নানারকম বাহ্য সাধন করিতে গিয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শত্রুপক্ষকে দমন করিতে হইলে ছলে বলে কৌশলে শত্রুপক্ষকে আয়ত্ত করা সহজ সাধ্য। যে কৌশল দ্বারা শত্রুপক্ষগণকে নিজ আয়ত্তাধীনে আনা যায়, তাহার নাম যোগ শব্দবাচ্য।"

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম সুকৌশলম্।।"
(গীতা ২য় অঃ ৫০ শ্লোক)

বুদ্ধি যুক্তঃ (বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ব্রহ্মণি ইতি শেষঃ) ইহ (ইহৈব জন্মনি) উভে সুকৃত দুষ্কৃতে জহাতি (ত্যজতি); তস্মাৎ যোগায় (কর্ম যোগায়) যুজ্যস্ব সুকৌশলং [যৎ] কর্ম [স এব] যোগঃ। অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মেযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য পাপ) উভয়ই ত্যাগ করেন। অতএব তুমি (বুদ্ধির অনুকূল) কর্মযোগে নিযুক্ত হও, সুকৌশল কর্মই যোগ। এক্ষণে সুকৌশল কর্মই যদি যোগ শব্দবাচ্য হইল এবং ইহা যখন ভগবৎ বাক্য, তখন এই বাক্যে আমার সংশয় রাখা উচিত নহে। কারণ "সংশয়াত্ম বিনশ্যতি" সংশয়চিত্ত মানব কর্ম ভ্রষ্টই হইয়া থাকে, সুতরাং আমার ভগবৎ বাক্যে সংশয় না করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করাই উচিত। এক্ষণে সুকৌশল কর্ম কাহাকে বলে, তাহাই দেখা যাক। সু—উত্তম বা শুভ, কৌশল—উপায়, অর্থাৎ উত্তম বা শুভ উপায়ই সুকৌশল। তাহার পর কর্ম কাহাকে বলে তাহা জানা চাহি, যাহা করা যায় তাহাই কর্ম পদবাচ্য। এই কর্মও দুই প্রকার—মোক্ষ কর্ম, আর গৌণ কর্ম। হস্ত পদাদিও ইন্দ্রিয়গণের কৃত কর্ম সমুদায়কে গৌণ কর্ম বলিয়া জানিতে হইবে, এই গৌণ কর্ম দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ পায় না, মোক্ষ কর্মই প্রকৃত কর্ম পদবাচ্য। মোক্ষ কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অব্যক্ত, অক্ষর হইতে হইয়াছেন। "অব্যক্ত্যাৎ জায়তে প্রাণঃ" এই প্রাণই (অব্যক্তই) প্রাণের প্রাণ, ইনিই ব্রহ্ম পদবাচ্য। উক্ত প্রাণের প্রাণ (স্থির প্রাণ) চঞ্চল হওয়ায় তাহার কর্ম হইতেছে, ইহাই বহিঃ প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞ। এই যজ্ঞ হইতে বর্তমান চঞ্চল মনের উৎপত্তি। এই প্রাণ কর্ম যাহা চলিতেছে তাহাই একমাত্র মোক্ষ কর্ম এবং এই মোক্ষ কর্মই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্মবাচ্য। ইন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদির দ্বারা কৃত যে কর্ম তাহা রাজসিক ও তামসিক কর্ম বলিয়া জানিবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যাহা করা যায় তাহাকেই কর্ম বলা হইয়া থাকে। হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের কৃত কর্ম ব্যতীত অপর আর একটি কর্ম (উপরোক্ত রূপ প্রাণকর্ম)

আমাতে রহিয়াছে, অথচ আসুরিক ভাবের ফেরে পড়িয়া আমার তাহাতে লক্ষ্য হইতেছে না। আবার বর্তমান প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে, তাহাই প্রকৃত মোক্ষ কর্ম। আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর এই প্রাণকর্ম চলিতেছে না, ইহা আপনা আপনি চলিতেছে, অথচ আমিই শ্বাস প্রশ্বাসের টানা ফেলা করিতেছি, ইহাই এক মাত্র মোক্ষ কর্ম পদবাচ্য। অর্থাৎ আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার যাহা যাতায়াত রূপ ক্রিয়া চলিতেছে তাহাকে প্রকৃত মোক্ষ কর্ম বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাণকর্মরূপ মোক্ষ কর্মই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে কর্ম নিয়ত সঙ্গ রহিত, অনুরাগ বা আসক্তি শূন্য, প্রীতি বা দ্বেষ বশতঃ কৃত নয়, এইরূপ কর্মই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

"নিয়তংসঙ্গরহিতমরাগদ্বেযতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্ সুনাকর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে"॥

গীতা ১৮ অঃ ২৩ শ্লোক।

উক্ত প্রাণকর্ম সঙ্গ রহিত হইয়া আপনা আপনি হইতেছে। প্রাণকর্ম কোন সঙ্গে ধার ধারেন না, ইহা প্রীতি বা দ্বেষ বশতঃ ও কৃত নয় এবং কোন কামনা নাই, সুতরাং ইহাই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্মবাচ্য। ইহা ব্যতীত অপর সমস্ত কর্মই রাজসিক বা তামসিকের মধ্যে গণ্য। এই প্রাণকর্মই ব্রহ্ম বিদ্যা, জীব দেহে যে প্রাণকর্ম চলিতেছে, তাহাই মধ্যাবস্থা; এই প্রাণকর্মের আদি অন্ত স্থির ও অব্যক্ত, কেবল নিজবোধ রূপ মাত্র। আসি ও অন্ত অবস্থা—তুল্যাবস্থা কেবল স্থান ভেদ থাকায়, আদি, অন্ত কথিত হইয়া থাকে। প্রাণকর্মই এক মাত্র যোগকর্ম। 'আমি আমার' বোধ যে অবস্থায় নাই, সেই অবস্থার সহিত, 'আমি আমার' বোধ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাকে মিলন করিয়া দেওয়ার নাম যোগ। অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধ যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাকে 'আমি আমার' বোধ শূন্য অবস্থার সহিত মিলন করিয়া দেওয়ার নামই যোগ।

'আমি আমার' বোধ যেখানে নাই, তথায় চিত্ত বা মনের বৃত্তি সকল থাকিয়াও নাই, আমার প্রাণের মধ্যাবস্থারূপ প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে, ইহাই মহামায়া রূপিণী আদ্যা প্রকৃতি জগন্মাতা। আমার মধ্যাবস্থারূপ প্রাণকর্মের গতি যাহা চলিতেছে, সেই গতি বিচ্ছেদ কৌশল দ্বারা (অর্থাৎ ক্রিয়া কৌশলরূপ উপায় দ্বারা) এই চলিত প্রাণকে নাসাভ্যন্তরচারা করিয়া ইহাকে (বর্তমান প্রাণকর্মের এই মধ্যাবস্থাকে) প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার সহিত সম্মিলন করিয়া দিতে পারিলে, তখন 'আমি আমার' বোধ রহিত হইয়া সমভাব হওয়ায় যোগ শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। কারণ "সমত্বং যোগউচ্যতে"। আরও বিশেষ এই প্রাণকর্ম যখন একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম, তখন যদি আমি এই প্রাণকর্মের সহবাসে নিয়ত (ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া) থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমিও

সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারিব, নচেৎ নহে জানিবে। যেমন অঙ্গারকে শত শত বার ধৌতকর, তাহার মলিনত্ব কিছুতেই দূরীভূত হইতে পারে না, তদ্রূপ দেহ বা মনোরূপ অঙ্গারের মলিনত্ব জলের দ্বারা বা অপর কোন পার্থিব বিষয়ের দ্বারা ধৌত হইবার নহে, ইহাও নিশ্চয় জানিবে। অঙ্গারকে অগ্নি সংযোগে রাখিলে অঙ্গারের যেমত সহজে মলিন ভাব নষ্ট হইয়া অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনকে সাত্ত্বিক কর্মরূপ প্রাণকর্মেতে লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, মন নিশ্চিত প্রাণসঙ্গ করতঃ প্রাণতুল্য হওয়ায় মনের মলিন ভাব বিদূরিত হইয়া বর্তমান মন আত্মাতে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণকর্মই পরা বিদ্যা পরম পুরুষার্থ স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানের হেতু ভূতা। ইহা নাভিমূল হইতে প্রথমোদিত হইয়া নাদ স্বরূপ ব্রহ্ম সোহং বর্ণরূপে আপনা আপনি নাদিত হইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, এই প্রাণকর্মই পরাবিদ্যা বিধায় এই প্রাণই উপনিষদ পদবাচ্য। কারণ উপনিষদ শব্দের অর্থ,—উপ—সমীপ, নি—নিশ্চয়, সদ গমন করা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা আত্ম সমীপস্থানে নিশ্চয় গমণ করা যায় তাহাই উপনিষদ পদবাচ্য। উপনিষদের ভাষার পুঁথি বা পুস্তক পাঠে কাহার যে ত্রিতাপ দূর হইয়াছে তাহাত' দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যাঁহার ত্রিতাপ দূর হয় নাই তাঁহার মন যে আত্ম সমীপস্থ হইয়াছে তাহা কোন মতে স্বীকার করা যায় না ইহাও নিশ্চয় জানিবে। অতএব সাধকের পক্ষে ভাষার জ্ঞানকাণ্ড অপাঠ্য বিশেষ কারণ তাহাকে জ্ঞানরূপ যোগ বিঘ্ন মনে করা উচিত। যোগ বিঘ্ন বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারা কর্মে ক্রমশঃ অনাস্থা জন্মিয়া কর্ম ও জ্ঞান উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বাহ্যিক জ্ঞানে আসক্ত হইয়া আসুরিক ভাবের (প্রকারান্তরে) দল বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। কারণ তিনগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহস্থিত দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম সম্বন্ধেই প্রখররূপে দৃষ্টি রাখা চাহি। বাহ্যিক জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি খর্ব করাই কর্তব্য। কর্মের অভ্যাসে জ্ঞান আপনিই প্রকাশ পাইবে, বাহ্যিক শাস্ত্রাদির জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানের ছায়া মাত্র।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্রাদি পাঠ জ্ঞান লাভের জন্য করা হইলে তাহা বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ শাস্ত্রাদি পাঠের জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান দূর হয় না, বরং জ্ঞান পাপী হইয়া মিথ্যাচারীর ন্যায় থাকিতে হয়; মুখে জ্ঞানের কথা কহিতেছি, আর কার্য্য অজ্ঞানীর ন্যায় করিতেছি, (অর্থাৎ শোক, তাপ, মোহ, প্রভৃতি সমস্তই পশু ভাবের অভিনয় করিতেছি), তাহাতে আমার শাস্ত্র পাঠের কি ফল লাভ হইল? কেবল অনর্থক সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করা ব্যতীত অপর কিছুই বিশেষ লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ কারণ সাধকের পক্ষে উহা জ্ঞানরূপ বিঘ্ন বলিয়া কথিত হইয়া

থাকে। আরও বিশেষ জ্ঞান দ্বারা জীবকে আসুরিক ভাবের দলে আবদ্ধ করিয়া থাকে, যাহাতে গুণাতীত অবস্থা জীব প্রাপ্ত হয় না। আসুরিক ভাবের দল মনকে আশ্রয় করিয়া, মনের প্রবৃত্তি কর্তৃক বাহ্যিক জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। "সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি, জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ" (গীতা)। অর্থাৎ সুখে আসক্ত করিয়া এবং বাহ্য জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। সুতরাং কর্মীর পক্ষে বাহ্যিক জ্ঞান চর্চা আদৌ প্রার্থনীয় নহে বলিয়া জানিবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগ

বর্তমান প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে, তাহাই পরাবিদ্যা, এই পরাবিদ্যার অভ্যাসরূপ পূজা কর্মকে যোগকর্ম কহা যায়। যোগকর্ম আপনা আপনি হইতেছে, কাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিতেছে না। এই প্রাণকর্মই একমাত্র যোগকর্ম পদবাচ্য। যোগকর্ম যাহা আপনা আপনি বহির্ভাবে চলিতেছে ইহাও যোগ, তবে বর্হিভাবে ইহার সম্যক্ গতি থাকায় যোগ অবস্থার স্থিতি হইতে পারিতেছে না। আরও বিশেষ আমার বর্তমান প্রাণের মধ্যাবস্থা রূপ প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে, তাহার গতির পর গতি রূপ অবস্থা, অর্থাৎ স্থিতিরূপ অবস্থাতে আশ্রয় না পাইয়া পুনরায় মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রবেশ মুখে গতি হইয়া আগম দ্বারে পুনঃ প্রবেশ হইতেছে। ইহাই বহিঃ প্রাণায়াম পদবাচ্য। এই বহিঃ প্রাণায়াম জীব দিবারাত্র একুশ হাজার ছয় শতবার করিয়া আপনা আপনি শ্বাস প্রশ্বাস টানা ফেলা করিতেছে। এই বহিঃ প্রণায়াম দ্বারা জীবের আয়ু দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং আসুরিক ভাবের বুদ্ধি হইয়া জীব নানা জ্বালা ও অশান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমার বর্তমান প্রাণের মধ্য অবস্থারূপ প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে, তাহার গতির পর গতিরূপ অবস্থা না পাইয়া, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস টানা ও ফেলার পর ক্ষণকালের জন্য স্থিরভাব আপনা আপনি হইয়া থাকে। তাহা এত অল্প সময় যে, জীব তাহাতে লক্ষ্য করিতে পারে না, লক্ষ্য করিতে না পারায় এবং বহির্মুখীন গতি থাকায় উক্ত গতিরূপ স্থিতির আশ্রয় না পাইয়া পূর্বোক্তভাবে পুনরায় প্রবেশ মুখে গতি হইয়া থাকে। ঐ গতিরূপ স্থিতির অবস্থা না জানা থাকায় ও বহির্গতি থাকায় জীব নাশকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব যদি নিজের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার উল্টা গতির অভ্যাস দ্বারা (অন্তর্মুখীন ভাবে) প্রাণকর্মের সম্বর্দ্ধন

রূপ পূজা করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আরোগ্যের সহিত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।

পূর্বে বহিঃ প্রাণায়ামের বিষয় বলিয়াছি, এক্ষণে অন্তঃ প্রাণায়ামের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতি রূপ বহিঃ প্রাণায়াম যাহা হইতেছে, তাহাতে প্রাণের আয়াম রূপ বিস্তার অন্তরে না হইয়া বহির্দ্দেশে গতি হওয়াতে জীবের আয়ুক্ষয় হইতেছে। অন্তর প্রাণায়ামে গুরুপদেশে প্রাণের বক্ষিমুখীন গতি কৌশলে ফিরাইয়া, ঐ গতিকে অন্তর্মুখীন করিবার চেষ্টা করা, এইরূপে প্রাণের অন্তর্মুখীন গতি বিস্তার করার নাম অন্তরঙ্গ সাধন বা অন্তরঙ্গ প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম তিন প্রকার হইয়া থাকে, উত্তম, মধ্যমত্ত ও অধম। প্রথমাভ্যাসীর প্রথম অভ্যাসকালে অধম প্রাণায়ামই হইয়া থাকে। উত্তম প্রাণায়ামের লক্ষণ, প্রাণায়ামের শব্দ ঠিক বংশীধ্বনির ন্যায় হইয়া থাকে। আগম নিগম মার্গে ষটচক্রের ভিতর দিয়া প্রাণের বিস্তার করিয়া ষটচক্র পথে যাতায়াত করার নাম প্রাণায়াম। অবশ্য ইহা যেন কথা শুনিয়া আপনা আপনি কেহ চেষ্টা না করেন, আপনা আপনি চেষ্টা দ্বারা ঠিক পথে গতি না হওয়াই সম্ভব, একারণ ভাল কর্মীসাধকের নিকট বা উপযুক্ত লোকের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। উপযুক্ত লোকের উপদেশ মত কার্য্য করিলে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। উপযুক্ত অর্থাৎ উপ—সমীপে, যুক্ত—আটকাইয়া থাকা অর্থাৎ যিনি কর্ম করিয়া কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ বা কর্মের অতীতাবস্থার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই উপযুক্ত পদবাচ্য। প্রাণায়ামে বায়ুরোধ করা একেবারেই চাহি না, যাহারা ভ্রান্ত বুদ্ধি সম্পন্ন তাহারা নাসিকাতে অঙ্গুলি দিয়া পূরক, কুম্ভক, রেচকরূপ বহিঃ প্রাণায়াম করিয়া থাকে, এই বহিঃ প্রাণায়াম সাধারণে যাহা করিয়া থাকে, ইহা ধীর ব্যক্তি একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, উহাতে নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধি হইতে পারে।

"বালবুদ্ধিভিরঙ্গু ল্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্র ঘবরুধ্য।
যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে, স খলু শিষ্টৈস্ত্যাজ্যঃ।।"

অর্থাৎ অল্প বুদ্ধি লোকে যে অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলি দ্বারা নাসাছিদ্র রোধ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকে, তাহা সাধুগণের পরিত্যজ্য। ক্রমশঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা উত্তম প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, তাহার পর প্রত্যাহার। দ্বাদশটি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার বিধি পূর্বক সাধিত হইলে, তাহার পর ১৪৪টি উত্তম প্রাণায়ামে ধারণা হইবে। তৎপরে ধারণা বশীভূত হইলে, ১৭২৮টি উত্তম প্রাণায়াম দ্বারা ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ধ্যানাবস্থা বশীভূত হইলে তাহার পর ২০ হাজার ৭ শত ছত্রিশটি প্রাণায়ামে সমাধির জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহার পর এই সমাধিকে বশীভূত করিবার জন্য অর্থাৎ সমাধি অবস্থা স্থায়ী করিবার জন্য (যতদিন বা যতকাল সমাধি অবস্থা স্থায়ী না হয়, ততদিন ঐ সমাধিকে স্থায়ী করিবার জন্য) গুরুপদেশমত উত্তম প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে হইবে। এই

প্রাণায়াম যোগে বাহ্যিক শম ও দমরূপ অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই বা অতিরিক্ত আচারবান হওয়ারও আবশ্যকতা নাই। সাধনের প্রথমে শম, দম করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। শম দমাদি কার্য্যে আজীবন সময় ক্ষেপণ করিলেও কোন ফল লাভ হইবার নহে।

শম, দম সাধনে সময় ক্ষেপণ না করিয়া সেই সময়ে প্রাণায়ামের যথেষ্ট অভ্যাস করিলে প্রাণায়াম দ্বারা শম, দম ভাব আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ বর্তমান মনের সাম্য ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত শম, দমের অভ্যাসে সময় নষ্ট করা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্তর এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করা সাধনের উদ্দেশ্য নহে। অন্তর এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলেই যে মনের সাম্যভাব হইয়া চিত্ত স্থির হয় তাহা নহে, বরং চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়া মনের আধিরূপ ব্যাধিতে মনকে জর্জরিত করিয়া থাকে। অতএব যাঁহার যেরূপ প্রকৃতিতে জন্ম হইয়াছে, তিনি আপন বংশ অনুযায়ী আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিলেই যথেষ্ট। তবে অনাচার ভাবেও থাকা চাহি না। আবার বাহ্যিকে আমাকে লোকে আচার বান্ বলিবে বলিয়া নিজের অঙ্গ শুদ্ধির জন্য অত্যন্ত আচারবান্ হওয়াও চাহি না। কারণ জল বা মৃত্তিকা দ্বারা দেহ যতই শুদ্ধ করিবার চেষ্টা কর না কেন, মনের শুদ্ধতা তাহার দ্বারা হইবে না; প্রাণায়াম দ্বারা দেহের ও মনের শুদ্ধতা হইলে তখন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ভাব মন থেকে একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইবে। যেহেতু আমি অশুদ্ধ অবস্থায় আছি বা শুদ্ধ অবস্থায় আছি, ইহা মনেরই কার্য্য, মন শুদ্ধ হইয়া যখন আত্মস্থ হইবে, তখন সবই শুদ্ধ স্বরূপ (আত্মাই সর্বত্রে) বোধ হইবে। তখন আর অশুচি বা অশুদ্ধ ভাব কোথাও দৃষ্টি গোচর হইবে না। একারণ অগ্রে যাহাতে মনের শুদ্ধতা হয়, তাহারই যত্ন প্রাণপণে করা চাহি। ইহাতে সাধারণতঃ স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, যোগ শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের লক্ষণ সকল যাহা লিখিত আছে, সেই অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে শম, দম সাধনের উল্লেখ রহিয়াছে, প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা প্রত্যাহার হইতে আরম্ভ করিলে অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে ঐ যম, নিয়ম, আসন পরিত্যক্ত হইলে অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত মতভেদ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যম, নিয়ম আসন যে পরিত্যাক্ত হইবে এমত নহে, ইহা প্রাণায়াম দ্বারা আপনা আপনিই হইবে, যম নিয়ম বা আসনের অভ্যাসের আবশ্যকতা নাই এই মাত্র প্রভেদ। আসনের সম্বন্ধে যাঁহার যে ভাবে বসিলে সুবিধা হয় এবং যাহাতে সুখে ও স্থিরভাবে এক আসনে বেশীক্ষণ বসিতে পারেন, তাহাই আসন পদবাচ্য। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন যে, "স্থির সুখবাসনা" অর্থাৎ যাহাতে স্থির ও সুখ বোধ হয় তাহাই আসন। নচেৎ যোগ শাস্ত্র উক্ত ৮৪ (চুরাশী) প্রকার আসনের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিবার আবশ্যক নাই, উহা সাধারণ ব্যায়াম বিশেষ, লোককে দেখাইবার পক্ষে ভাল।

যোগকর্ম অষ্টাঙ্গ অপেক্ষা ষড়ঙ্গই প্রশস্ত, তাহা শাস্ত্র বাক্যে উক্ত আছে, যথা—

"প্রত্যাহার স্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কৈশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে"।।
ইতি অমৃত বিন্দু উপনিষৎ।

তাহার পর প্রথমে যম, নিয়ম অনাবশ্যক বোধে মহাত্মা গোরক্ষ নাথও যোগকে ষড়ঙ্গ বলিয়াছেন, যথা—

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধি বেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানিষ্ট"।।
ইতি গোরক্ষ সংহিতা।

অতএব শাস্ত্র প্রমাণে ও প্রথমে শম, দামরূপ যম নিয়মের উৎকট্ অভ্যাস করিয়া কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই এবং সময় নষ্ট করিবারও প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ ধ্যানাবস্থা গাঢ় হইলে তাহার পর ধারণা, ধারণার অতিক্রম সময়ে সাধকের, ধ্যানাবস্থায় যে বিষয়ের দর্শন হইতেছিল, ঐ দর্শন সম্বন্ধে মনে মনে তর্ক হইতে থাকে, অর্থাৎ তখন মন হইতে বহির্বিষয় সকল আপনা আপনি নিবৃত্ত হইয়া, মূলাধারস্থ পিণ্ডরূপী স্থিরবায়বী শক্তি রূপিনী কুণ্ডলিনী শক্তিকে, আজ্ঞাচক্রে স্থিতি করিয়া, স্থিরতারূপ ধারণা পর সাধকের মনে মনে আপনা আপনি তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, এই ভাবে, "যাহা দর্শন হইতেছে তাহা কি"? এবং কেহ বা দর্শন করিতেছে? এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধে মনে মনে তর্ক বিচার হইতে হইতে পরমাত্মার সত্ত্বা সাব্যস্ত হইয়া (মীমাংসা হইয়া) সমাধির অবস্থা আসিয়া থাকে। অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের অবস্থাই জীবাত্মা, এই বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপ জীবাত্মার প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ (স্থির প্রাণরূপ) পরমাত্মা ভাবের সহিত ঐক্য হইয়া, 'আমি আমার' বোধ রহিত ও সংকল্প বিকল্প শূন্য ভাব এবং মনের ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় চিন্তন রহিত ভাব হইয়া বর্তমান প্রাণ, প্রাণকর্মের অতীতাবস্থায় ঐক্যভাবে অবস্থিত হইয়া থাকেন, ইহাই সমাধি পদবাচ্য। সমাধিঃ—সমতাবস্থা!

জীবাত্ম পরমাত্মনো নিস্তরঙ্গপদ প্রাপ্তিঃ পরমানন্দ রূপিনী,
নিশ্বাসোচ্ছ্বাস মুক্তোবা নিষ্পন্দোঽচল লোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে"।।

বর্তমান প্রাণকর্মরূপ জীবাত্মা ও প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্ম ভাব ঐ দুয়ের ঐক্যভাবরূপ সমতাবস্থা তরঙ্গহীন স্থির জলের ন্যায় অর্থাৎ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার যে তরঙ্গ (চঞ্চলতারূপ ঢেউ) রহিয়াছে, তাহা স্থির প্রাণরূপ পরমাত্মার সহিত মিলন হওয়ার তরঙ্গহীন অবস্থা প্রাপ্তে শ্বাস প্রশ্বাসের উচ্ছ্বাস মুক্ত হইয়া (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস যাহা চলিতেছে তাহার দীর্ঘগতি স্থির হইয়া নাসাভ্যন্তরচারী

হওয়ায় উচ্ছ্বাস মুক্ত হইয়া) পরমানন্দভাবে মগ্ন অবস্থায় লোচনের স্পন্দন রহিত ভাব হইয়া বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ মঙ্গলময় শিবভাবে সুন্দররূপে লীন হইয়া থাকেন, তাহাকেই সমাধিস্থ কহা হয়।

উপরোক্ত ধারণার অতিক্রম সময়ে আপনা আপনি তর্ক হইয়া স্থির প্রাণরূপ পরমাত্মা ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারায় যেমন সত্য সাব্যস্ত হইয়া থাকে, তদনুরূপ কি তর্কশাস্ত্রের ভাষা পাঠ দ্বারা কাহারও এ পর্য্যন্ত পরোক্ষ জ্ঞানলাভ হইয়াছে? যদি তাহা হইত তাহা হইলে তর্ক শাস্ত্রে ভাষা বেত্তা লোকদিগের ত্রিতাপের সমতা ভাবও দেখিতে পাওয়া যাইত। কারণ ঈশ্বরের সত্ত্বা যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে, তাঁহাদের তাপত্রয় থাকা সম্ভবপর নহে। যখন তাপত্রয় তাঁহাদের বর্তমান রহিয়াছে, তখন ঈশ্বরের সত্ত্বা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভব হয় নাই, ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্র প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য,—জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করা এবং কর্মের দ্বারা জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাপত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিবে এই উদ্দেশ্যেই ঋষিরা শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সমস্ত শাস্ত্রেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল শাস্ত্রে তাহাই বিবৃত আছে। এই কারণে শাস্ত্রসকল ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের পাঠ্য নহে, তাহাও শাস্ত্রে স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের অপাঠ্য বলাতে মনে স্বতঃই উদয় হইতে পারে যে ঋষিরা পক্ষপাত শূন্য ছিলেন বলিয়া সকলেরই জানা আছে, এমতস্থলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের শাস্ত্র সকল অপাঠ্য যখন বলিয়াছেন, তখন তাঁহারা পক্ষপাত শূন্য ছিলেন একথা বলা ত' সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ ঋষিদিগের উক্ত বাক্য বলিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা না জানিয়া বাহ্যিক ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতে গেলে পক্ষপাত দোষ আসিয়া পড়ে সত্য। কিন্তু তাহা বলা চাহি না। কারণ পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা সকলেই কর্মযোগের দ্বারা কর্মের অতীতাবস্থার জ্ঞান লাভ করতঃ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ও ব্রহ্মবিদ (ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ হইয়া) জাতি নির্বিশেষে যাঁহারা ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ প্রার্থী হইতেন তাঁহাদের কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া, সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কর্ম গায়ত্রী দীক্ষা—আদি প্রদান করিতেন।

তাৎপর্য্য, কর্মী ভিন্ন অপরে শাস্ত্রের ভাষা কেহ যেন পাঠ না করে, কারণ ভাষা পাঠ করিয়া বা ভাষা শিক্ষা করিয়া বাহ্যিক পণ্ডিত হইলে পাণ্ডিত্যাভিমানে অহঙ্কারে ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কর্মে অনাসক্ত হইয়া শুষ্ক জ্ঞান লাভের দ্বারা আজীবন তাপত্রয়ে তাপিত হইয়া কষ্ট পাইবে, এই নিমিত্ত শাস্ত্রের ভাষা কর্মী সাধক ভিন্ন অন্যের অপাঠ্য বলিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের অর্থ যুক্ত ব্যক্তির নিকট অবগত হইলে শাস্ত্রীয় ভাষা কাহারও অপাঠ্য নহে। কারণ যুক্ত ব্যক্তির বিদ্যার্থীকে

শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝাইয়া দিতে সক্ষম। অযুক্ত ব্যক্তির নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অপেক্ষা না করাই ভাল। কারণ অযুক্ত ব্যক্তি যিনি, তিনি আত্ম কর্ম সম্বন্ধে অন্ধ বিশেষ, সুতরাং অন্ধের নিকটে আত্ম বিদ্যা লাভ আমার কিরূপে হইতে পারে। বরং অন্ধ পরাবিদ্যাকে অপরা বিদ্যায় পরিণত করিয়া তদনুরূপ ব্যাখ্যা আমাকে শিক্ষা দিবেন, যেমন বর্তমানে চলিতেছে; ইহাতে না শিক্ষকের না ছাত্রের কাহারও ত্রিতাপ দূর হইতে দেখা যায় না। দাম্ভিক কর্মশূন্য পণ্ডিতগণ টিকা দ্বারা ঋষিগণের ভাব সকলকে বিপর্য্যয়ভাবে অর্থ করিয়া নিজে বিষয়াসক্ত ভাবের বশীভূত হইয়া ব্যাকারণের সাহায্যে বিপরীতভাবে টীকা টিপ্পনী করিয়া যাওয়াতে প্রকৃত মূলের ভাব অপেক্ষা টীকার ভাব বিপরীত হইয়া রহিয়াছে।

মূল শ্লোক সকল ঋষিগণের দ্বারা রচিত; ঋষিগণ যুক্ত ছিলেন; আমি অযুক্ত, ঋষির ভাব আমার অবগত হওয়া কঠিন। আমি ভাষা যাহা পড়াইয়া থাকি, তাহা টীকা দেখিয়া পড়াইয়া থাকি। প্রথমতঃ টীকাকারগণ শাস্ত্রকে পাণ্ডিত্যাভিমানে পদদলিত করিয়া মাটি করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর আমার ভাষার জ্ঞানও অল্প, টীকা যাহা আছে, তাহাও সমস্ত স্থানে বুঝিতে অক্ষম। আমিও সেই মাটি বিশেষ টীকাতে আমার অযুক্ত বুদ্ধি যোগ করিয়া যাহা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি তাহা এক কিম্ভুত কিমাকার বিষয় পরিণত হইয়া আসুরিক ভাব রক্ষণের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। টীকাকারগণের মধ্যে বাদানুবাদ সম্পূর্ণ রহিয়াছে। একজন অপরের টীকা খণ্ডন করিতেছেন, অপর অন্যের টীকা খণ্ডন করিতেছেন, এইরূপ পরস্পরের সহিত মতের পার্থক্য থাকা হেতু, পরস্পরের মধ্যে কাহারও মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। টীকাকার পরস্পরের মধ্যে হয় উভয়েই ভ্রান্ত, না হয় একজন ভ্রান্ত নিশ্চয়ই আছেন। এমত স্থলে কাহার টীকা গ্রাহ্য করিব তাহা বুঝিতে পারি না, সুতরাং টীকাকারেরা অভ্রান্ত তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক বর্তমানে ভাষা শিক্ষাকেই বিদ্যা বোধে লোকে শিক্ষা করিয়া থাকে, বস্তুতঃ ভাষা শিক্ষা করাকে বিদ্যাশিক্ষা বলা ঠিক নহে। ভাষা শিক্ষা আর বিদ্যা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া জানা উচিত।

আত্ম বিদ্যাকে বা যোগ বিদ্যাকেই পরাবিদ্যা বলিয়া জানিবে। শরৎকাল এই আত্ম বিদ্যা বা যোগ বিদ্যা আরম্ভে প্রশস্ত কাল। যোগ বিদ্যাবলে সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় এবং জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া, জীব ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমস্তই লাভ করিয়া থাকে জানিবে। যাহা হউক আর তোমাকে এ সম্বন্ধে কত বলিব, কারণ যাহা করিয়া জানিতে হয়, তাহা কথার দ্বারা আর বিশেষ কি জানিবে। এক্ষণে বেলা হইয়া আসিল তুমি ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত রাখগে, পুরোহিত মহাশয় সম্ভবতঃ আগত প্রায়; আমি বর্হিবাটীতে চলিলাম, এই বলিয়া আমার বাবা বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় মা বাবাকে

প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি আমার একমাত্র গুরু, কারণ "পতিরেকো গুরু স্ত্রীনাম", স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গুরু পদবাচ্য। আপনি যে সকল সারগর্ভ উপদেশ বাক্য কহিলেন, ইহাতে আমার মন প্রাণ শীতল হইয়া গিয়াছে, আপনার বাক্য সকল শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে আমার বোধ হইতেছিল যেন আমি "আমি" হারা হইয়া ঠিক দৈব বাণী শ্রবণ করিতেছিলাম। যদিও এই সকল বাক্য সাধারণের প্রিয় না হইতে পারে; যেহেতু "হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ" অর্থাৎ হিতবাক্য সকল কদাচিৎ মনোহারী হইয়া থাকে; কিন্তু নাথ, আমার পক্ষে তাহা নহে, আমার নিকটে এই সকল সারগর্ভ বাক্যগুলি মধুর হইতেও সুমধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল এবং শাস্ত্র সকলের উদ্দেশ্য কি, তাহা শুনিয়া আমার যে স্ত্রী জাতি সুলভ বুদ্ধি মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রের বহির্ভাবে ধাবিত হইত ও ভাষাকেই যে বিদ্যা বলিয়া বোধ ছিল, এক্ষণে আপনার বাক্যে উহা আমার মন হইতে বিদূরিত হইয়া গেল। খোকার অদ্য বিদ্যারম্ভ হইবে, অতএব অদ্য খোকার কোন বিদ্যা আরম্ভ হইবে আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।

বাবা বলিলেন, খোকা অগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা করিবে এবং মাতৃভাষার সঙ্গে রাজভাষাও শিক্ষা করিতে হইবে, তাহার সহিত পরাবিদ্যা বিষয়ক কর্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিবে। তবে পরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য খোকার নিজের প্রার্থিত হওয়া চাহি, নিজে প্রার্থিত হইলে তাহার পর তবে খোকাকে পরাবিদ্যা বিষয়ক কর্ম যোগের শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে। কর্ম যোগের অভ্যাস খোকা যদি করিতে পারে, তাহা হইলে পরাবিদ্যার দ্বারা সমস্তই অবগত হইতে পারিবে। মা বলিলেন, খোকার মাতৃভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সত্য, কিন্তু রাজভাষা শিক্ষার জন্য বহু সময় নষ্ট করিয়া উহার কি লাভ হইবে? বড় জোর না হয় উহার রাজদ্বারে উচ্চ বেতনের বড় চাকুরী প্রাপ্তি কিম্বা না হয় রাজসভায় একজন গণ্যমান্য সভাসদ রূপেই পরিগণিত হইবে। অনেকে ত' বড় চাকুরী বা উচ্চ বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে কি তাঁহারা শান্তি পাইতেছেন তাহা ত' দেখিতে পাইতেছি না। বরং তাহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা আধিব্যাধি ও ত্রিতাপে জ্বালাতে অস্থির হইয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন, এবং নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অপরের স্বার্থ নষ্ট করিতেও সময় সময় কুণ্ঠিত হন না। আর যদিই খোকা রাজভাষা শিক্ষা করিয়া ব্যবহার জীবী হয়, তাহাতেই বা খোকার কি লাভ হইতে পারে? তবে স্বীকার করি, ব্যবহার জীবীরা বেতন ভোগী কর্মচারীদের অপেক্ষা শত শত গুণে অর্থ উপার্জন (প্রায়) অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ পরের সর্বনাশ করিয়া অর্থ উপার্জন করাটা কি যুক্তি সঙ্গত। ব্যবহার জীবীরা কি চেষ্টা করিলে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে পারেন না? তাহা না করিয়া নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রথমতঃ মামলা রুজু করিয়া

আপন আপন মক্কেলকে মামলা জিতাইয়া দিব বলিয়া উৎসাহ দিয়া থাকেন। বিনা পয়সায় বা সামান্য পয়সায় কাহার পক্ষ প্রায় অবলম্বন করেন না ইহাই কি ধর্ম?

আমি শুনিয়াছি, কোন ব্যবহার জীবী এক সময় রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময় একজন পথিক তাহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! "আমি রাস্তায় যাইতে যাইতে একখানি স্বর্ণের মোহর কুড়াইয়া পাইয়াছি, ইহা কাহার তাহাও জানি না, আমি ইহা কি করিব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিতে পারেন? ব্যবহার জীবী মহাশয় পথিককে কহিলেন, কই দেখি, কিরূপ মোহর পাইয়াছ? পথিক মোহরখানি তাঁহার হস্তে দিলে পর, ব্যবহার জীবী মহাশয় মোহরখানি নিজের পকেটে রাখিয়া পথিককে বলিলেন "তুমি এই মুহূর্তে পুলিশে যাইয়া রির্পোট কর যে, আমি একখানি মোহর কুড়াইয়া পাইয়াছি। পুলিশ তোমার নিকট হইতে মোহর চাহিলে পুলিশের নিকট হইতে রসিদ লইয়া তুমি একখানি মোহর পুলিশে দিয়া দিবে।" তাহার পর পথিক ব্যবহার জীবীর নিকট হইতে মোহরখানি ফেরৎ চাহিলে ব্যবহার জীবী বলিলেন, "এ মোহর ত' আমি তোমায় যাহা পরামর্শ দিলাম তাহার কি স্বরূপে লইয়াছি ইহা তুমি আর ফেরৎ পাইবে না"। ইহা বলিয়া ব্যবহার জীবী আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। পথিক খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ব্যবহার জীবীর ধর্ম দেখিয়া দুঃখিত মনে আপন ঘরে চলিয়া গেল।

আমাদের খোকা যদি রাজভাষা শিক্ষা করিয়া এইরূপ ব্যবহার জীবে পরিণত হয়, ইহা আমার প্রর্থনীয় নহে। আমার বিশ্বাস উক্তরূপ ব্যবহার জীবগণের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই উক্তরূপ ঘৃণিত ও পাপ বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত যে অর্থ, তাহা ঐহিক সুখের লালসায় ভোগ করিয়া সকলেই পাপের অংশ ভাগী হইয়া পরিণামে বা ঐহিকের শেষ সময়ে নানাপ্রকার পাপরূপ অশান্তির জ্বালা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে যে রাজভাষার দোষ আছে, তাহা আমি বলি না। পরপীড়ন করা বা ছলে বলে কৌশলে পরের অর্থ গ্রহণ করা ইহা সকল ভাষাতেই নিষিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু লোকে লোভের বশীভূত হইয়া পরপীড়ন করিয়া কৌশলে অর্থ উপার্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বর্তমান রাজভাষার কোন কোন শ্রেণীর ব্যবহার জীবীকে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, আমরা কাহার নিকট অর্থ চাহিব না, তবে দয়া করিয়া ভিক্ষা স্বরূপ আমাদের ঝুলিতে যে যাহা আপন ইচ্ছায় দিবে তাই মাত্র গ্রহণ করিব। ইহারা ফি বাবদ টাকা কাহারও নিকট হইতে নালিশ করিয়াও আদায় করেন না। সুতরাং ভাষার দোষ কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। দোষ আপন আপন কর্মের। ভাষা শিক্ষার দরুণ ধর্ম বিশ্বাস লোপ হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হয় না আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেও কেহ লজ্জিত হয় না, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে বা হইতে পারে। আমি রাজভাষা শিক্ষার বিরোধী নহি, বরং রাজভাষা শিক্ষা করা আমার বিশেষ

অভিপ্রেত। তবে আমার ইচ্ছা পরাবিদ্যা শিক্ষার অভ্যাসের সহিত খোকা রাজভাষা শিক্ষা করে। পরবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা চরিত্রবান হইতে পারিবে; দয়া, ধর্ম, সরলতা, পর দুঃখে কাতর ইত্যাদি দৈবী সম্পদ সকলের ভাব, অন্তরে স্থায়ী হইলে তাহার সহিত রাজভাষার জ্ঞান থাকিলে খোকার দ্বারা দেশের ও সাধারণের এবং নিজের উপকার সাধিত হইবে। চরিত্রবান না হইলে কেহই নিজের উপকার নিজে করিতে পারে না এবং অপরেরও উপকার করিতে পারে না। পরাবিদ্যাতে খোকা যদিই সম্যক্ কৃতকার্য্য না হইতে পারে তাহা হইলেও হিতাহিত জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থের বিষয় হইতে আপনাকে আপনি যে রক্ষা করিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খোকার প্রারব্ধ বশে খোকা যদি পরাবিদ্যারূপ প্রাণকর্মের অভ্যাসে যত্নবান না হয়, তাহা হইলে আপনিই কষ্ট পাইবে, তবে আমাদের কর্তব্য খোকার পরাবিদ্যারূপ আত্মকর্মে যাহাতে রুচি হয়, তাহার বিহিত চেষ্টা করা। পরাবিদ্যা শিক্ষার সহিত রাজভাষার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার পর খোকা বড় চাকুরীই করুক বা ব্যবহার জীবীই হউক অথবা অন্য কোন রকম হউক, তাহা হইলে খোকা নিজের স্বার্থ জন্য পরপীড়ন করিয়া কোন প্রকার অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে না, ইহাই আমার অনুমিত হয়। তাহার পর আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে তাহাই খোকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। আমার যতটুক বক্তব্য ছিল, তাহা আপনার চরণে জ্ঞাপন করিলাম।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আর্য্যাবর্ত্ত ও চারিবর্ণ

বাবা মা'র কথা শ্রবণান্তে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে, আমার অভিপ্রায়ও তাহাই। খোকাকে যে কেবল ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। বালকগণের শিক্ষা পুস্তকই পিতা মাতা। পিতা মাতা নিজ কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার দেখাইয়া আপন আপন বালকগণকে প্রথমতঃ শিক্ষা দিবেন। পিতা মাতা অনার্য্যভাবে বর্তমান থাকিলে পুত্রকন্যাগণ নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতা মাতার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বালকেরা প্রায়শঃ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা আর্য্য ভাবাপন্ন তাঁহাদের পুত্র কন্যা প্রায়শঃ অনার্য্য ভাবাপন্ন হয় না, তবে অনার্য্য সঙ্গ হইলে আর্য্যভাবা শূন্য ও অনার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। আর্য্য শব্দ, অর্য্য শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্য্য শব্দের অর্থ, ঋ—গমন করা, পাওয়া, য—ক, যে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়, অথবা যে কৃষি কর্ম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অর্য্য বা আর্য্য কহা যায়; কৃষি কর্ম প্রাপ্ত হয় বলাতে তোমার মনে হইতে পারে তবে কি আর্য্যেরা

চাষা ছিল? প্রথমতঃ কৃষি কর্ম যাহারা করে তাহারা চাষাই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা নহে। সামান্যতঃ কৃষি কর্ম শুনিলেই সাধারণে চাষাই কহিয়া থাকে, কিন্তু এ কৃষি সাধারণ কৃষি নহে, কৃষি কার্য্য অবশ্য বৈশ্য বৃত্তি, বৈশ্যদের কার্য্যই কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ("কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম স্বভাবজং"। ইতি গীতা)। পূর্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, 'এই শরীরই ক্ষেত্র পদবাচ্য, এই শরীররূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা কৃষি কর্ম করিতেছেন, অর্থাৎ কৃষি—কৃষ্ কর্ষণ করা, প্রাণায়ামরূপ কর্ষণ ক্রিয়াই কৃষি পদবাচ্য।' রাম প্রসাদ সেনও নিজ সঙ্গীতে বলিয়া গিয়াছেন "মন তুমি কৃষি কাজ জান না এমন মানব জমিন রইল পড়ে, আবাদ কল্লে ফলত সোণা" ইত্যাদি। এই কৃষি কর্ম দ্বারা সংসার মুক্তি হইয়া থাকে। ইহা সামান্য কৃষি (চাষ) পদবাচ্য নহে।

তাহার পর দ্বিতীয় গোরক্ষা করা। গো শব্দের অর্থ গো—গমন করা, চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়িদ্বয় দিয়া যে প্রাণরূপ আদিত্য গমন করিতেছেন, ঐ গোস্বরূপ প্রাণরূপ সূর্য্যকে রক্ষা করা, অর্থাৎ কৃষি কার্য্যের স্থিতিরূপ অন্ত অবস্থায় ঐ স্থিতিকে রক্ষা (স্থায়ী) করাই গো রক্ষা পদবাচ্য। এই কৃষি কার্য্য আরম্ভ সময়ে কিছু না কিছু কামনা থাকে, সেই কামনার সহিত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করাই বাণিজ্য পদবাচ্য। বিশেষতঃ এই বর্তমান দেহস্থিত কৃষি কর্ম যাঁহার স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে লাভ করিবার জন্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আর্ত অর্থাৎ ভব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, অর্থার্থী অর্থাৎ দৈবী সম্পদ প্রার্থী ব্যক্তি, আর জ্ঞানী যিনি রূপাতীত অবস্থাকে জানিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ যিনি বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি পদকে জানিতে ইচ্ছারূপ কামনা করেন; এই চারি প্রকার ব্যক্তি ও বৈশ্য ভাবাপন্ন। কারণ কিছু না কিছু কামনারূপ বৈশ্য ভাব ইঁহাদের থাকার দরুণ, ইঁহারা সাধন সম্বন্ধে বৈশ্য। তাহার নর ক্রিয়া যোগের দ্বারা প্রণায়ামরূপ কৃষিকর্মের অন্তাবস্থার স্থিতি হয় নাই অথচ ঐ অবস্থার স্থিতি পাইবার জন্য আসুরিক ভাবের সহিত সমরে নিযুক্ত, অর্থাৎ সাধকের আসুরিক ভাবকে মর্দ্দিত করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহাই ক্ষত্রিয় ভাব। এই আসুরিক ভাব মর্দ্দিত হইয়া [অবিচ্ছেদে প্রাণায়াম রূপ] কৃষি কর্মের অন্তঅবস্থারূপ কর্মাতীতাবস্থায় যাঁহার স্থিতি হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। সংসারাসক্ত ভাব নিবৃত্তির জন্য যাঁহার প্রাণায়াম রূপ কৃষিকর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অর্য্য বা আর্য্য পদবাচ্য। আর যাঁহারা ক্রিয়া যোগের অন্তর্গত নিজ শরীররূপ ক্ষেত্রে প্রাণায়ামরূপ কৃষিকর্মের অভ্যাস (পূর্বোক্ত ভাবের ঐ গোরক্ষা) করেন না, তাঁহারাই অনার্য্য পদবাচ্য বলিয়া জানিবে। বহু প্রাচীন কালে আর্য্যেরা সকলেই সংসারসিক্ত ভাব নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়া যোগের অন্তর্গত কৃষিকর্মরূপ অন্তর্যাগ দ্বারা শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বল, বুদ্ধি ইত্যাদিতে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিয়া প্রভুত্ব করিয়া ছিলেন, তাহার পর কাল বশে ক্রমশঃ অনার্য্য সহবাসে হীন বুদ্ধি হইয়া বর্ণ সঙ্কর উৎপত্তির দ্বারা ক্রমাবনতি

হইতে হইতে বর্তমানে সমস্তই অনার্য্য ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বহির্ভাবে আর্য্যগণের মধ্যে তিন বর্ণ মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণই আর্য্য বলিয়া কথিত হইত। ধর্ম তিন বর্ণের একই প্রকার ছিল অর্থাৎ সকলেই পূর্বোক্ত ক্রিয়া যোগের অন্তর্গত কৃষি কর্ম দ্বারা বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থা লাভের জন্য যত্নবান ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ উক্ত কৃষি কর্মের উপদেষ্টা ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ অনার্য্য জাতিগণের হস্ত হইতে আর্যগণকে রক্ষা করিতেন এবং শূদ্র নামক অনার্য্য জাতিকে বশীভূত করিয়া আপনাদের সমাজভুক্তও করিয়া লইতেন। বৈশ্যগণ বাহ্যিক ভাবে জীবিকা নির্বাহ জন্য বাহ্যিক চাষ আবাদরূপ কৃষিকর্ম এবং পশু পালনও ক্রয় বিক্রয় রূপ বাণিজ্য (ব্যবসা) করিতেন। আর্য্যাবর্তই আর্য্যগণের বাসভূমি ছিল। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্বে পূর্ব সমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র, এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূখণ্ড মধ্যে আর্য্যগণ বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম আর্য্যাবর্ত। তাহার পর ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত স্থান অকুলান হইলে ভারতবর্ষের অপর স্থান অধিকার করিয়া এবং তৎ তৎ স্থানের শূদ্রাদি বর্ণগণকে বশীভূত করিয়া আর্য্য সমাজ ভুক্তও করিয়া লইতেন, এই রূপে ক্রমশঃ সমস্ত ভারতবর্ষ আর্য্য ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিয়া, আত্মোন্নতি জন্য আর্য্য ব্রাহ্মণগণের নিকট কৃষি কর্মরূপ গায়ত্রী দীক্ষা প্রাপ্ত হইত। অদ্যাপিও পশ্চিমদেশে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে আপনি ক্ষত্রিয় বলিতে চাহেন না, বরং তাহাতে সম্মানের, (বংশমর্য্যাদার) লাঘবই মনে করিয়া থাকেন। বর্তমানে সমস্ত ভারত এবং আর্য্যাবর্ত অনার্য্যভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তবে ইহার মধ্যে কোন কোন স্থানে কেহ কেহ কেবলমাত্র বাহ্যিক আচার দেখাইয়া নিজেকে পবিত্র মনে করিয়া লোক সমাজে আচারবান্ বলিয়া দম্ভের সহিত বাহিরে আপন পবিত্রতা দেখাইয়া নিজে সম্মানিত হইতে চাহে, নচেৎ আর্য্যোচিত কার্য্য কাহারও প্রায় দেখা যায় না। আর্য্যোচিত কার্য্য হইতে সকলেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্যোচিত প্রধান কার্য্যই, আত্মোন্নতি জন্য কৃষিরূপ আত্মবিদ্যার অভ্যাস। তাহা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র (কায়স্থ) এই চারি বর্ণের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্যিক সন্ধ্যাও গায়ত্রী মাত্রও জানে না, জানিবার আগ্রহও নাই। আগ্রহ হইবে কোথা হইতে, বাহ্যিক আবৃত্তি দ্বারা যদি কেহ সুখ শান্তি পাইতেন তাহা হইলে সাধারণের আগ্রহ ও থাকিত, সুখ শান্তি না পাওয়াতে তাদৃশ আগ্রহও কেহ করে না। বাহ্যিক সন্ধ্যা বা গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সুখ শান্তি প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। তবে কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল, যত দিন না অন্তর্গায়ত্রী (কৃষি কর্মরূপ আত্মা) পাওয়া যায়।

আপনাকে আপনি অনার্য্য ভাব হইতে রক্ষা করিতে না পারায় এখন সমস্তই অনার্য্য

ভাবে ব্যাপৃত হইয়া গিয়াছে। আরও বিশেষ বৌদ্ধ এবং মুসলমানগণের উৎপীড়নে আর্য্যভাব একরমক প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছিল। পরে আমাদের দেশের খ্রীষ্টান রাজার ধর্মসম্বন্ধে উদার ভাব দেখিয়া পর্য্যন্ত এক্ষণে ধর্ম সম্বন্ধে আর কাহার কোন ভয়ের কারণ নাই? মুসলমান রাজত্বকালে অনেককে প্রাণ রক্ষার্থে জাতি ধর্ম ত্যাগ করিতেও বাধ্য হইতে হইত। বর্তমানে যে সকল মুসলমান দেখিতে পাও, তাহারা সমস্তই প্রায় 'আর্য্য বংশীয়। মুসলমান রাজত্বকালে ইঁহাদের পূর্ব পূর্ব বংশধরেরা হিন্দু বা আর্যগণের উপর সাধ্যমত উৎপীড়ন করিতে ত্রুটী করিতেন না এবং কিসে হিন্দু বা আর্য্যগণের ধর্ম লোপ হয় সে চেষ্টা সর্বতোভাবে তাঁহাদের থাকিত। পরে খৃশ্চান রাজার রাজত্ব কাল অবধি রাজার শাসন গুণে হিন্দুর বা আর্য্যের সে ভয় আর কাহারও এখন নাই জানিবে। বর্তমান সময়ে অনার্য্য ভাবের প্রলোভন বড় ভয়ঙ্কর ভাবে চারিদিকে রহিয়াছে। উপস্থিত রমণীয় আশু সুখকর অনার্য্যভাব সমূহের হস্ত হইতে বাহ্যিক ধর্ম ও বাহ্যিক নীতির দ্বারা আপনাকে আপনি রক্ষা করা একেবারেই দুরাশা জানিবে। তবে পরা বিদ্যা (কৃষি কর্মরূপ আত্ম বিদ্যা) অবলম্বনে কতকটা আপনাকে আপনি অনার্য্য ভাবাপন্ন লোকেরা ইহার বিরোধী হইয়া প্রায়শঃ নানা প্রকার বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এই বাধাটুকু কাটাইয়া যিনি পূর্বোক্ত কৃষি কর্মরূপ পরা বিদ্যার অভ্যাস করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ অপেক্ষা অনেকাংশে মনের শান্তি পাইবেন। অনেক অংশে বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আত্মোন্নতি জন্য সাধন কার্য্যে বেশী সময় কেহ প্রায় দিতেই চাহে না, তবে যেরূপ ভাবে যিনি সাধন করিবেন, তিনি সেই রূপ ভাবে কিছু না কিছু স্বাস্থ্য সুখ বা শান্তি লাভ যে করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যারম্ভ

এই সময় পুরোহিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে মা পুরোহিত মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তে বলিলেন, আপনার এত দেরী হইল, খোকা এখনও কিছু খাইতে পায় নাই, পূজা না হইলে ত' খাইতে পাইবে না।

পুরোহিত। মা, আমার পূর্বে জানা ছিল না, সেই কারণে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আমি এখনি পূজা শেষ করিয়া খোকার হাতে খড়ি দিয়া দিতেছি, বিদ্যারম্ভের পূজায় আর কত দেরী হইবে।

বাবা পুরোহিত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া ঠাকুর ঘরে চলিয়া গেলেন। মা আমাকে

নীচে আনিয়া আমার গাত্রে তৈল মাখাইয়া গঙ্গাজল দিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য আমাদের জলের ভারী নিত্যই গঙ্গাজল আনিয়া রাখে। স্নানান্তে মা আমাকে চেলির কাপড় পরাইয়া সঙ্গে করিয়া ঠাকুর ঘরে লইয়া আসিলেন, আমি তথায় গিয়া বাবার নিকটে বসিলাম, মা ও ঠাকুর ঘরের মধ্যে একটু তফাতে বসিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিলাম। পূজা কি, তাহার বিশেষ জ্ঞান আমার নাই, তবে ঠাকুরের পূজা হয় তাহা অনেক বার দেখিয়াছি। কারণ বাড়ীতেই ঠাকুর আছেন এবং মধ্যে মধ্যে অপর পূজাও হইয়া থাকে, যেমন এই দুর্গোৎসব হইয়া গেল। লোকে কথায় বলে, ব্রাহ্মণের বাড়ী, বারোমাসে তের পার্বণ লাগিয়াই আছে। পূজা যে দেখি নাই, তাহা নহে, তবে পূজার জ্ঞান আমার নাই, আরও বিশেষ আমি খোকা, সুতরাং খোকার পূজার জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে।

পুরোহিত মহাশয় পূজার মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, আমার পিসিমা ধুনুচিতে মধ্যে মধ্যে ধুনা দিতেছেন এবং ধুনুচির অগ্নি নির্বাণ না হয় এই কারণে দক্ষিণ হস্তদ্বারা পাখার বাতাস দিতেছেন। পুরোহিত মহাশয় মধ্যে মধ্যে পূজার ধূপ দীপ উৎসর্গ করিয়া নাড়িয়া রাখিতেছেন। ধূনা গুগ্‌গুলের সুগন্ধে ঠাকুর ঘরটি আমোদিত করিয়া দিয়াছে। আমার ঐ সকল সুগন্ধে মনেও বেশ আনন্দভাব হইতেছে। কারণ অদ্য একটা কি নূতন বিষয় হইবে, যাহা আমার জানা নাই, তাহাই দেখিবার ও জানিবার জন্য যেন আমার মন উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। আমার মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ভয়ের আশঙ্কাও আসিতেছে। কারণ বিদ্যা বিষয়টা কি তাহার আমি জানি না। পড়িতে হইবে শুনিয়াছিলাম, এই পড়াতে আমার কিছু ভয় হইয়াছিল, কি জানি পড়িতে গিয়া পাছে হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলি, তবে মা বলিয়াছিলেন কোন ভয় নাই। মাতৃবাক্যে আমার বিশ্বাস থাকায়, যখন মা'র স্মরণ হইতেছে, তখন ভয় রহিত হইয়া আনন্দ আসিতেছে, আবার মা'র কথা যখন ভুলিয়া যাইতেছি, তখন ভয় হইতেছে। যাহা হউক অদ্য আমার মন যেন বিশেষ উৎসুক ভাবে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার বর্তমান মনের অদ্য এত উৎসুক ভাবের কারণ, এই বর্তমান মন অন্ধ, বর্তমান অযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা এই মন চালিত হইয়া থাকে। অদ্য বিদ্যারম্ভ হইবে ইহা বর্তমান অযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনের গোচর হওয়াতে আমার বর্তমান মনের কখনও হর্ষ আবার কখনও বা বিষাদ আসিতেছে। হর্ষ আসিবার কারণ, যদি প্রকৃত বিদ্যালাভ আমার হয়, তাহাতে মনের লাভ আছে। (বলা বাহুল্য আমার লাভে মনেরই লাভ হইয়া থাকে, আমার অলাভে আমার মনেরই অলাভ হইয়া থাকে)। এবং বিদ্যারম্ভ হইবে শুনিয়া যখন বর্তমান বুদ্ধি দ্বারা বিবেচিত হইতেছে ইহা পরাবিদ্যা নহে, তখন মন হতাশ ভাব অবলম্বন করিতেছে। মন দুর্মতি বা দুর্বুদ্ধির বশীভূত, সুতরাং দুর্মতি যখন যেমন বুঝাইয়া দেয় মন তাহাকেই

সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া থাকে। আমার মন যাহা মানিয়া লইয়া থাকে তাহা আমারও মানিয়া লওয়া হয়, কারণ আমিই বর্তমানে এক রকম মন হইয়া রহিয়াছি। আমাকে মনের অবিদ্যাতে বিদ্যাবোধ থাকায়, আমার অবিদ্যারূপ বিদ্যারম্ভ হইতেছে কি প্রকৃত পরাবিদ্যা আরম্ভ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। পরাবিদ্যা আরম্ভ হইলে দুর্মতি প্রভৃতি আসুরিক ভাবের সমূহ ক্ষতি সম্ভাবনা, সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য মন বিশেষ উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। আমার কোন কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্বেই আমার অলক্ষিত ভাবে মনের মধ্যে অযুক্ত বুদ্ধি কর্তৃক বিচারিত হইয়া সাব্যস্ত হইয়া গেলে তাহার পর আমার মনের ইচ্ছা আমি জানিতে পারি; পরে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইয়া থাকে। এই সময় পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, এস খোকাদাদা, এইবার তোমার হাতে খড়ি দিয়া দিই, পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে।

পুরোহিত মহাশয়ের কথায় আমি নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ও মা, পিসিমা ও বাবাকে প্রণাম করিয়া, শেষে পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিলাম। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় আমাকে নিজের কাছে বসাইয়া আমার হাতে একটা খড়ি দিয়া বলিলেন, বেশ জোর করিয়া মুষ্টিবদ্ধন করিয়া খড়িটা ধর। আমি তাহাই করিলাম, পুরোহিত মহাশয় আমার হাতের মুষ্টি ধরিয়া কতকগুলা কি নানা রকম দাগ কাটিয়া বলিলেন, এই তোমার লেখা হইল, এইবার আমি যাহা বলিব আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও তাহা বলিবে। বল স্বরে অ, স্বরে আ ইত্যাদি, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরে অ, স্বরে আ বলিলাম তাহার পর হ্রস্ব ই—এইরূপে সব পড়াইয়া বলিলেন, ইহাই স্বরবর্ণ। তাহার পর কতকগুলি আবার দাগ কাটিয়া বলিলেন, বল ক, খ। আমিও তাহাই বলিলাম। তাহার পর গ,ঘ, ইত্যাদি সব পড়াইয়া বলিলেন, ইহাই ব্যঞ্জনবর্ণ।

আমি সমস্ত শুনিয়া এবং খড়ির দাগ কাটিয়া পুরোহিত মহাশয়কে বলিলাম, আমার বিদ্যারম্ভের কি হইল? এতো কতকগুলা দাগ কাটিয়া তাহার পর সে গুলা মুছিয়া ফেলিলেন, ইহাতে আর আমার কি হইল? আমিত’ অনেক সময় এইরূপ দাগ আপনা আপনি কাটিয়া থাকি, ও আমি শুনিব না, আমাকে বিদ্যা দিন, আমি আরম্ভ করি, আমি ঐ কতকগুলা খড়ির দাগ কাটা বিদ্যা চাহি না। আমার এই সব কথা শুনিয়া বাবা ও মা হাসিতে লাগিলেন, এবং পিসিমা বলিলেন, ছি বাবা খোকা ও কথা কি বলিতে আছে? ও দাগ কাটা নহে, ওকেই বিদ্যা কহে, এরপর কত বই পড়িবে, এখন থেকে ঐ রকম দাগা বুলুতে বুলুতে সব অভ্যাস হবে। আমার মনে হইতে লাগিল, আজ একটা ভাল জিনিষ পাইব, তাহা না হইয়া কতকগুলো খড়ির দাগ কাটিয়া পুরোহিত মহাশয় আমাকে ফাঁকি দিতেছেন। ভাল জিনিষ পাইবার আশা ভঙ্গ হওয়ায় আমার চক্ষে জল আসিল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলাম, আমাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বিদ্যা দিন, আমি খড়ির দাগের বিদ্যা চাহি না। বিদ্যা কি তাহা আমি এখন জানি না, বিদ্যা যে একটা ভাল বিষয় হইবে তাহা মনে হইয়াছিল। কারণ আমার পিতা মাতা যখন বিদ্যারম্ভ করাইতেছেন, তখন বিদ্যা নিশ্চয়ই ভাল বিষয় হইবে, কিন্তু তাহা যে কেবল খড়ির দাগে পরিণত হইবে তাহা আমি মনে করি নাই। সুতরাং আমি খড়ির দাগ কাটিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না, একারণ (আমার আশা ভঙ্গ হওয়ায়) আমি ক্রন্দন করিতেছি। আমার এ ক্রন্দন করিবার উদ্দেশ্য, আমার পিসিমা বা পুরোহিত মহাশয় সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা বুঝিলে আমাকে কতকগুলা বাজে কথা কহিয়া বুঝাইতেন না। বরং পুরোহিত মহাশয় যেন আমার উপর একটু বিরক্ত ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি মা'র কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলে পর, মা আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কান্না কি বাবা, উপস্থিত এই রকম যাহা হইবার তাহা হইল, এর পর তুমি তোমার বাবুর নিকট হইতে সব শিক্ষা পাইবে। আমি মা'র নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া বাবার নিকটে যাইয়া বাবাকে বলিলাম, বাবা আমাকে ভাল বিদ্যা আরম্ভ করাইয়া দিন এ খড়ির দাগ কাটা বিদ্যা আমি চাহি না।

বাবা যেন আমাকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন যে, তুমি কাঁদিও না, এরপর তোমাকে পুস্তকে সব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিব, এক্ষণে পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম কর। আমি পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে একটা ফুল দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, খোকা দাদা খুব ভাল করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা কর ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। তৎপরে তিনি দক্ষিণার টাকা ও পূজার কাপড়গুলি লইয়া কিছু জল খাইয়া নিজবাড়ী চলিয়া গেলেন। বাবাও বাহিরে গেলেন, আমি মা'র সঙ্গে আমাদের ঘরে আসিয়া স্ব-ইচ্ছায় খাবার খাইলাম এবং মা'র জেদে দুগ্ধ খাইতে বাধ্য হইলাম। কারণ দুগ্ধটা আমার বড় ভাল লাগে না, তবে না খাইলে মা বিরক্ত হন সেইজন্য খাইতে হয়। আমার এক্ষণে লবণাক্ত রসের দ্রব্য এবং মিষ্টান্ন খাইতে ভাল লাগে। আহারান্তে মা'র নিকট বসিয়া আছি এমন সময় বাবা আসিয়া বলিলেন, খোকা তোমার জন্য এই দেখ কেমন বই (পুস্তক) আনিয়াছি। আমি অমনি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গিয়া তাঁহার হস্ত হইতে বইখানি চাহিয়া লইলাম ও কহিলাম বাবা এ বই-কি হইবে? বাবা বলিলেন এ বই তুমি পড়িবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা এই বই-এর নাম কি? বাবা বলিলেন, ইহার নাম শিশুবোধ।

আমি বলিলাম শিশুবোধ কাহাকে বলে বাবা? বাবা বলিলেন, পঞ্চম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত খোকাদিগকে শিশু কহা হইয়া থাকে, এইরূপ শিশুদিগকে বুঝাইবার পুস্তককে শিশুবোধ কহে। বোধ শব্দে জ্ঞানকে কহিয়া থাকে। যাহা পাঠে শিশুদের

(খোকাদের) জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকেই শিশুবোধ কহিয়া থাকে। আমি বাবার কথা শুনিয়া বাবাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, জ্ঞান কাহাকে বলে বাবা? বাবা বলিলেন, জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথমতঃ তুমি জানাকেই জ্ঞান বলিয়া জানিবে। যেমন তোমার কোন একটা জিনিষ দেখিয়া সে জিনিষটা সম্বন্ধে তোমার জানা হইল যে, এটা এই জিনিষ। ইহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহিয়া থাকে। আর লোকের মুখে কোন বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলে না। তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান কহে, অর্থাৎ যাহা দেখা হয় নাই কেবল তাহার সম্বন্ধে শ্রবণ মাত্র তাহাকেই পরোক্ষ জ্ঞান কহে।

আমি। বাবা, এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে, কোন প্রকার জ্ঞান আমি লইবার বা পাইবার জন্য চেষ্টা করিব?

বাবা আমি তোমাকে তাহা বলিব না, তুমি তাহা নিজে বিবেচনা করিয়া আমায় বল, তুমি কোন প্রকার জ্ঞান পছন্দ কর এবং কোন প্রকার জ্ঞান পাইতে চেষ্টা করিবে।

বাবা আমার প্রতি এই যে উল্টা চাপ দিলেন, তাহার জন্য আমার কোন ভাবনা (চিন্তা) হইল না। কারণ আমি খোকা, ভাবনা কাহাকে বলে তাহা জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং আমার ভাবনার কোন বিষয় থাকিয়াও নাই। যাহা হউক বাবা আমাকে বলিবা মাত্র আমি খোকাভাবে হাসিতে হাসিতে কহিলাম, বাবা আমি কি রকম জ্ঞান চাহি জান? যেমন আমরা এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করায় ঘরের মধ্যস্থিত সমস্ত জিনিষ নিজের চক্ষে দেখিতেছি এবং ঘরের জিনিষগুলি কোন্‌টা কি তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি আর আমাদের এই ঘরের বাহিরে যে দাঁড়াইয়া আছে সে ঘরের ভিতরের কোন বিষয় দেখিতে পাইতেছে না কেবল শুনিতেছে, আমি ঐ বাহিরের লোকের মতন কেবল শুনিতে চাহি না। আমি চাহি, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদ্রূপ, ঘরের ভিতরস্থিত সব বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমি চাহি বাবা। কারণ ঘরের ভিতরের বিষয়গুলি দেখিয়া আমার যেরূপ আনন্দ হইতেছে, বাহিরে যে আমাদের কথা মাত্র শ্রবণ করিতেছে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের বিষয়গুলি দেখিবার চেষ্টা করিতেছে না এস্থলে কথামাত্র শ্রবণ করিয়া তাহার কি সেরূপ আনন্দ হইতে পারে? অতএব আমি এরূপ জ্ঞানের প্রার্থী নহি। এই কথা শুনিয়া মা ও বাবা হাসিতে লাগিলেন। বাবা আমার কথায় খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এখন বেলা ঢের হইয়াছে, আহারের সময় হইয়াছে, আহারাদির পর তোমাকে শিশুবোধ পড়াইয়া দিব, তুমি যেরূপ জ্ঞানলাভ করিতে চাহিলে, ঐরূপ জ্ঞানই যেন ভগবৎ কৃপায় তুমি লাভ করিতে সক্ষম হও। ইহাই ভগবৎ চরণে আমাদের উভয়েরই প্রার্থনা। এক্ষণে আমি স্নান করিতে যাই, স্নান করিয়া আসিয়া আহার করিব।

বলা বাহুল্য আমার বাবা দিবাতে একবার মাত্র ও রাত্রিতে একবার মাত্র আহার করেন, এই দুইবার ব্যতীত দিবা রাত্রিতে আর কোন রকম আহার করেন না। এমন কি কোন জলখাবারও খান না। যাহা হউক তিনি স্নান করিয়া আসিয়া আহার করিতে বসিলেন। আমিও তাঁহার নিকটে বসিয়া আহার করিলাম।

আহারান্তে বাবা আমাকে নিকটে বসাইয়া শিশুবোধ পুস্তকস্থিত বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। নূতন পুস্তক পাইয়া আমার বড় আনন্দ হইল। প্রথমতঃ পুস্তকখানি পাইয়া তাহার গন্ধ শুঁকিতে লাগিলাম, তাহার পর পুস্তকের ভিতর নানা রকম চিত্র ছিল তাহাও দেখিলাম। বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় বাবা চিত্রগুলি কাহার প্রতিমূর্ত্তি তাহা আমাকে বলিয়া দিলেন, আমি তাহা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হইল। পরে আমাকে বর্ণগুলির মধ্যে প্রথমে স্বরবর্ণ অ, আ, মুখস্থ করাইলেন। আমি অল্পক্ষণ মধ্যে তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। এখন আমি নিজে বেশ আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। আমার আবৃত্তি করা ঠিক হইতেছে দেখিয়া, বাবা বেশ সন্তুষ্ট হইয়া ব্যঞ্জন বর্ণ ক, খ, ইত্যাদি মুখস্থ করাইতে লাগিলেন। পুস্তকে যে অক্ষর লিখিত আছে, তাহা দেখাইয়া কোন্ অক্ষরকে কি বলে তাহাও আমাকে চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। আমিও বাবার কথামত মুখস্থ করিতে লাগিলাম এবং বর্ণগুলিও চিনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার বর্ণগুলি চিনিতে বেশ কষ্ট হইতেছে না দেখিয়া বাবা আমার চিবুক ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। বাবার আদর পাইয়া আমারও যেন উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি খুব উৎসাহের সহিত অক্ষরগুলি আবৃত্তি এবং বর্ণগুলির বাহ্যিক আকার মনে স্মরণ করিতে লাগিলাম। বাবার নিকটে বসিয়া পড়িবার সময় আমার মনের চঞ্চলতার জন্য দুই একবার মন অপর বিষয়ে যাইতে লাগিল। আমি বাবাকে কহিলাম, বাবা, আমি মুখস্থ করিতেছি, কিন্তু আমার মন যেন মধ্যে মধ্যে খেলার বিষয়ে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আমি কিন্তু আমার মনকে খেলার চিন্তায় যাইতে না দিয়া পড়াতেই রাখিয়াছি, কে যেন আমার মনে বলিয়া দিল, যখন যে কার্য্যে রত থাকিবে তখন সেই কার্য্যেই মন রাখিবে, তাহা হইলে সব কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, সেইজন্য বাবা আমি অন্য বিষয়ে মন দিতেছি না এবং আমি অপর বিষয়ে মন না দেওয়াতে আমার আপনার কাছে বসিয়া অভ্যাস করা বেশ ভালও লাগিতেছে।

বাবা। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, মনের ধর্ম্মই চঞ্চলতা, সে এক বিষয়ে থাকিতে চাহে না, তোমাকে আমি মনঃস্থিরের উপায় পরে বলিয়া দিব। উপস্থিত তুমি যখন যে কার্য্য করিবে, (বকের মতন) সেই কার্য্যেরই ধ্যানে মনকে রাখিবে। তুমি বক্ দেখিয়াছ কি?

আমি। হ্যাঁ বাবা আমি বক দেখিয়াছি, পুষ্করিণীর ধারে, বেশ সাদা রঙ্গের বড়পক্ষী।

বাবা। বক্ জলচর পক্ষীবিশেষ, ইহারা মৎস্য ধরিবার জন্য জলাশয়ের তীরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। দেখিলে বোধ হয়, যেন (বক্) পরম ধার্মিক, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন ভগবৎ ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে, বকের লক্ষ্য মৎস্যের প্রতি, মৎস্য শিকার করিবার মানসে বক্ স্থিরনেত্রে জলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া দেখিতে থাকে, কোথায় মৎস্য আছে, মৎস্য দেখিলেই নিঃশব্দে পদবিক্ষেপ করিয়া মৎস্যের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। বিদ্যার্থীরও এইরূপ বিদ্যালাভের জন্য বিদ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত বিদ্যা দুই প্রকার, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা; পরাবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান তুমি ইহার পর ক্রমশঃ পাইতে পারিবে। মানবের মধ্যেও উক্ত প্রকার বক্ ভাবাপন্ন স্বার্থপর অনেক আছে। তাহারা বাহ্যিকে স্থির ও সাধুভাব দেখাইয়া নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য কখন ধর্ম, কখন পার্থিব, যখন যেমত আবশ্যক মনে করে তখন তদনুরূপ প্রলোভন দ্বারা মীনরূপী মানবের প্রাণসংহারেও কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ লোকের সহবাসে তুমি কদাচ যাইও না। অবশ্য তুমি এই বকোধার্মিকের ন্যায় মানবকে চিনিতে পারবে না, তাহাদের নিকট হইতে সাবধান থাকিতে হইলে তুমি অপরিচিত কোন ব্যক্তির নিকট যদি প্রথমে আদর যত্ন পাও, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। এই আমি তোমাকে এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা তুমি মনে রাখিতে চেষ্টা করিও, ভুলিও না।

আমি। হ্যাঁ বাবা, আমি ও কথা ভুলিব না।

পরে বাবার আদেশে স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণগুলি, পুস্তক বন্ধ করিয়া মুখস্থ বলিলাম। বাবা খুব সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় আমার চিবুক ধারণ করতঃ আমায় আদর করিতে করিতে বলিলেন, বেশ বাবা, বেশ বাবা, অতি উত্তম হইয়াছে। তাহার পর পুস্তক খুলিয়া আমাকে বলিলেন, দীর্ঘ ঈ বাহির করত খোকা; বাবা বলিবামাত্র আমি দীর্ঘ ঈ, বাহির করিয়া দেখাইলাম। এইরূপে সমস্ত বর্ণ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি প্রায় সমস্তই বলিলাম, তবে একটা আধটা একটু দেরীতে বলিতে হইল। এমন সময় আমার মা আসিয়া বসিলেন। বাবা মা'কে বলিলেন, তোমার খেকা এই তিন ঘন্টার মধ্যে স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ সমস্ত মুখস্থ করিয়াছে এবং বর্ণগুলি সমস্তই চিনিয়াছে, আমি আজ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি ইতি পূর্বে আসিলে সব দেখিতে পাইতে।

বাবার নিকট হইতে আমার সুখ্যাতির কথা শ্রবণ করিয়া মা'র মুখ মণ্ডলে যেন কি এক অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দের ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, অথচ তিনি হাস্য সম্বরণ করিয়া রহিয়াছেন। কারণ আমি তাঁহার আনন্দের ভাব বুঝিতে পারিলে পাছে আত্ম গরিমা প্রযুক্ত, শ্রেষ্ঠাভিমানে মত্ত হই এই আশঙ্কায়, মা নিজহাস্য সম্বরণ

করিয়া বাবার নিকট আমার সুখ্যাতি শুনিতে লাগিলেন। জননীরা স্বভাবতঃ পুত্রবৎসল থাকায় পুত্রের সুখ্যাতি শুনিলে আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন, এমন কি অনেক খোকার মা নিজ পুত্রের সুখ্যাতি শুনিতে এতই মধুর বোধ করিয়া থাকেন যে, তদপেক্ষা অপর কিছুই ভাল লাগে না। অনেক খোকার মা পুত্রের সমস্ত দোষ গোপন করিয়া নিজ পুত্রের সুখ্যাতিই করিতে থাকেন। ইঁহাদের নিকট ইঁহাদের খোকাদের দোষ যদি কেউ বলে, তাহা হইলে ইঁহারা সমূহ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিজ খোকার গুণ কীর্তন করিয়া মাতারা নিজ নিজ খোকাদের ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিয়া থাকেন। আমার মা সেরূপ নহেন, আমার মা আমার কোন রকম দোষের বিষয় দেখিলে, আমাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন এবং মা'র নিকট কেহ আমার সুখ্যাতির কথা বলিলে, মা যেন তাহা শুনিয়াও শুনিতেছেন না এমন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই জন্য আমি আমার বাবা অপেক্ষা মা'কেই ভয় করিয়া থাকি। তবে বাবাকে যে ভয় করি না তাহা নহে, বরং আমার মা ও বাবার প্রতি ভয় ও ভালবাসা উভয়ই প্রায় তুল্য, তবে ভয়টা যেন মা'র উপরেই বেশী। মা'কে ভয় করিলেও আমি মা ব্যতীত অপর কিছু জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, মা আমার বাবার কথা শুনিয়া বলিলেন, হ্যাঁ ও এই তিন ঘণ্টায় সমস্ত বর্ণমালা চিনিয়া ফেলিল এবং সমুদয় মুখস্থ করিয়া ফেলিল, ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য? আপনি আমাকে রহস্য করিতেছেন, খোকার সুখ্যাতি শুনিলে আমার খুব আনন্দ হইবে, এই জন্যই বোধ হয় বলিতেছেন। বাবা বলিলেন, না, না আমি সত্যই বলিতেছি, খোকা সমস্ত মুখস্থ করিয়াছে; তুমিও দেখ না, তুমি এতক্ষণ এখানে থাকিলে সব দেখিতে পাইতে। ইহা বলিয়া বাবা আমাকে বলিলেন, বাবা একবার তোমার মা'কে সব শুনাইয়া দাও ত' যাহা যাহা মুখস্থ করিয়াছ। আমি বাবার কথায়, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্ত মুখস্থ বলিয়া শুনাইলাম। তাহার পর মা কোন্‌টা কি অক্ষর জিজ্ঞাসা করায় তাহাও বলিলাম।

যখন সব বলা শেষ হইল তখন মা আমাকে কোলে করিয়া আমার মুখ চুম্বন করিতে করিতে বাবাকে বলিতে লাগিলেন, "আমার আহার করিয়া আসিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ আপনার বড় ভাজ ও বধু মাতারা, বিশেষ আপনার ভাজ (বড় দিদি) বলিতে ছিলেন, যে ঠাকুরপো কি খোকাকে পড়াইবার জন্য দেশে আর কোন বই পাইলেন না। এখন কত ভাল ভাল পুস্তক সব ছাপা হইতেছে তাহা না পড়াইয়া কোথাকার একখানা অখ্যাত পুস্তক শিশুবোধ তাহাই পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বই কি আর এখন চলন আছে। তা বোন বলব কি, তোমার ভাসুর ও আমার গোপালকে, গোপালের যখন হাতে খড়ি হয়, তখন ঐ শিশুবোধ বই খানাই পড়াতে চান, আমি ভাই কিছুতে ও শিশুবোধ পড়াতে দিই নাই, আমি

বলিয়াছিলাম, আমার ছেলে মুখ্যু (মুর্খ) হইয়া থাকিবে সেও ভাল, তত্রাচ আমি শিশুবোধ বই পড়াতে দিব না। যাহাদের পয়সা নাই, গরীব লোক, তাহারা ঐ বই পড়াতে পারে, আমার ছেলে শিশুবোধ পড়ে, শিশুবোধ পড়ে শুনিয়াই লোকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না, ও বইখানা বুড়োটে বই, পুরান সেকেলে, যে কোন বই ছিল না, তখন ঐ বই পড়াতে পারে, আমরা কেন ছেলেকে শিশুবোধ পড়াতে যাব, এমা এটা কি লজ্জার কথা নয়? লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে, তোমার ছেলে কি বই পড়ে গা? তখন ত' আমাকে বলতে হবে যে আমার ছেলে শিশুবোধ পড়ে, শিশুবোধ পড়ে শুনিয়াই লোকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না, ও বইখানা বুড়োটে বই, পুরান সেকেলে, যখন কোন বই ছিল না, তখন ঐ বই পড়ান হইত, এখনকার দিনে কি আর ছেলেদের শিশুবোধ পড়ান শোভা পায়, লোকে বলবে কি? তা ভাই আমি অনেক বলাতে তোমার ভাসুর আমারই কথামত শিশুবোধ পড়ান বন্ধ করিয়া অপর বই ধরাইয়া ছিলেন। ছোট বৌ! তুমিও আমার মত ঠাকুরপোকে বলিও। আমি বড় দিদিকে (এদেশে মেয়েরা বড় জাকে বড় দিদি কহিয়া থাকে) বলিলাম, না ভাই আমি তাহা বলিতে পারি না, লেখা পড়া সম্বন্ধে আমার কোন কথা কহা উচিত নয় বলিয়া বোধ হয়। ছেলের পাঠ্য পুস্তক কি হওয়া উচিত, তাহা ছেলের পিতার উপর নির্ভর থাকাই ভাল। কারণ আমরা স্ত্রীজাতি, লেখাপড়া সম্বন্ধে আমার কোন কথা কহা উচিত নহে। যদিও আজকাল মেয়েদের ভিতর অনেকে লেখাপড়া শিখিয়া পাস টাস করিতেছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা অরুচিকর বলিয়াই বোধ হয়। কারণ আমরা যদি দিন রাত্রি পড়াশুনা লইয়া রহিলাম, তাহা হইলে গৃহস্থালি কে দেখিবে, বাড়ীর পুরুষরা কি আসিয়া কুট্না কোটা, বাট্না বাটা, রান্নার কার্য্য সব করিবেন? ইহা অপেক্ষা আর স্ত্রীজাতির লজ্জার বিষয় কি আছে? আর যদি পয়সা থাকে তাহা হইলে না হয় একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া তাহার দ্বারা রান্নার কার্য্য কোন গতিকে সম্পন্ন করা হইল কিন্তু তাহাই কি ঠিক। একজন অসৎ চরিত্র দুষ্কিয়াসক্ত লোকের হাতে আমার স্বামী পুত্রকে খাইতে দিব, তাহাতে কি আমার স্বামী পুত্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না। এইসব কারণে বর্তমান কালে লোকে অল্পায়ুও হইতেছে, আমরা কি লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী করিব? ইহাতে স্বামী পুত্রের মুখ উজ্জ্বল হইয়া থাকে, না মুখ অবনত হইয়া থাকে? আজকাল প্রায়শঃ দেখা যায়, মেয়েরা যেন একটু স্বাধীন চেতা হইতে চাহে, আমাদের স্ত্রীজাতির আবার স্বাধীন ভাব কিসের! স্ত্রীজাতিদের মধ্যে কাহার যদি কোন একটা পুরুষে হঠাৎ হস্ত ধারণ করে, তাহা হইলে হয়ত' সে কাদার ডেলার মতন গলিয়া যায়, না হয় সে আপনাকে আপনি রক্ষার্থে অক্ষম হইয়া অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, এইরূপ স্ত্রীজাতিদের স্বাধীনতার কি অবনতির

কারণ নহে? অবনতিরই বা আর বাকি কি আছে, পবিত্র সুখ শান্তি আর প্রায় কাহারও দেখা যায় না। সকলেই যেন একট না একটা অশান্তিতে রহিয়াছে, কেহ অর্থ কষ্টে, কেহ বা শারীরিক ব্যাধিজন্য কষ্টে কেহ বা মনের কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। বড় দিদি! সুখ কি ভাই অর্থ থাকিলেই হয়? স্বামী যদি চরিত্রহীন হয় তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সুখ কোথায় বলিতে পার? দুদিন না হয় আমরা যৌবন মদে মত্ত হইয়া গৃহস্থালী ছাড়িয়া বাহ্যিক লেখা পড়া লইয়া রহিলাম, তাহার পর আমার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি কেহ দেখে। আচ্ছা বড় দিদি! তুমিত' লেখাপড়া বেশী জান না, তোমার লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কি কিছু কাজ আটকাইতেছে? বড় দিদি বলিলেন কেন আমার কাজ আটকাইবে, বরং যদি লেখাপড়া শিখিতাম তাহা হইলে হয়ত' আমার সংসারই চলিত না; এই আমার বৌগুলো, ওরা লেখাপড়া জানে বলিয়া অহঙ্কারে ফেটে মরে, আমার বড়বৌ আবার ছাত্র বৃত্তি পাস করিয়াছে, তাঁরত' মাটিতে পাই পড়ে না, কোন কার্য্য করিতে বলিলেই তাঁর হিষ্টিরিয়ার ফিট হইয়া থাকে। আর ওকথা বলো না ভাই, লেখাপড়া জানা বৌকে বাড়ীতে আনিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছি, লোককে বলিতেও পারি না, কিল খেয়ে কিল চুরি করিতে হইতেছে। যাক্ ওসব কথার আর কাজ নাই, আমি এখন যাই, এরপর ঠাকুরপোকে আমিই বলিব, যে খোকাকে শিশুবোধ পড়াতে পারবে না। ইহা বলিয়া বড় দিদি চলিয়া গেলেন, তাহার পর আমি তাড়াতাড়ি উপরে আসিতেছি।"

মা'র কথা শেষ হইলে বাবা আমার মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, শিশুবোধ পড়ান সম্বন্ধে তোমার কিছু আপত্তি আছে বলিতে পার? মা বলিলেন "না, না, আমার কোন আপত্তি নাই, খোকাকে পড়ান সম্বন্ধে বা অপর যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, আমার কোন বিষয়েই মতামত কিছু নাই; আপনি তো তাহা বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন। তবে আপনি আমার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া গৃহস্থালী সম্বন্ধে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে যখন যে বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, আমার জ্ঞান মত আমি পরামর্শ দিয়া থাকি। আমার নিজের কোন প্রকার মতামত নাই জানিবেন। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাই হইবে, তবে বড় দিদি আমায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আপনাকে বলিলাম এবং বড় দিদিকে আমি বলিয়াছি যে পড়া শুনা সম্বন্ধে তোমার দেবর যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন, আমারও সম্বন্ধে কোন কথা কহা উচিত নহে। খোকার পড়াশুনা বা অপর যাহা যাহা খোকার সম্বন্ধে আপনি ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তাহাতে আবার আমার মতের দরকার কি? আরও বিশেষ লেখা পড়া সম্বন্ধে আমার জ্ঞানই বা কি আছে, যে সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিব।"

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

শিশুবোধ পুস্তক

বাবা বলিলেন, দেখ, শিশুবোধ পুস্তকখানি আমার বিবেচনায় আধুনিক যে সকল পুস্তক রচনা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। বরং শ্রেষ্ঠ। তবে কুরুচিপূর্ণ জীবের চক্ষে মন্দ বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নহে। শিশুবোধ পুস্তকখানি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহারই অনুকরণ লইয়া অনেকে নিজ নিজ না, দিয়া স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্তন করিয়া নূতন আকারের বই বাহির করিয়া নিজের প্রতিপত্তি দেখাইয়াছেন মাত্র। নচেৎ শিশুবোধই বাল্যশিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক। তবে ক্রমশঃ শিশুবোধেরও কলেবর ছোট হইয়া অনেক বিষয় শিশুবোধ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অনেক বিষয় অভাবও হইয়া পড়িয়াছে। কালে ইহাতে লোকের অনাদর হওয়ায় ইহার অবনতিই হইয়াছে, পুস্তকখানির মূল্য পাঁচ পয়সা কি ছয় পয়সা মাত্র। শিশুবোধের অনুকরণ করিয়া অনেক পুস্তক প্রকাশ হওয়ায় ইহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং শুভঙ্করীর অংশ হইতেও অনেক বিষয় বাদ পড়িয়াছে এবং বানান্ হইতে ও অনেক বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে, ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে খরচ কমাইবার জন্য হইয়াছে। শিশুবোধের মধ্যস্থিত অনেক বিষয় উঠাইয়া দিয়া শুধু পুস্তকখানির অস্তিত্ব এখন বজায় আছে। এই শিশুবোধের মধ্যে চাণক্য শ্লোকও রহিয়াছে, দুঃখের বিষয় তাহা কেহই দেখেন না। অপর চাণক্য শ্লোকের নূতন গ্রন্থ অনেকে আগ্রহ সহকারে দেখিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় শিশুবোধের মধ্যে রহিয়াছে তাহাও কেহ কেহ দেখিতে ঘৃণা বোধ করেন, অথচ অপর একখানা কোন নূতন গ্রন্থকারের শুভঙ্করী পাইলেই আগ্রহ সহকারে দেখিয়া থাকেন। এইরূপ বর্ণমালা বানান্ শিশুবোধে যাহা আছে তাহাও কেহ দেখেন না, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বর্ণমালা বা বানান অপর কোন গ্রন্থকারের হইলে লোকে আগ্রহ পূর্বক দেখিয়া থাকেন। শিশুবোধ অমনি কোন গতিকে জীবন্মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছে। শিশুবোধের পিতামাতা না থাকায় শিশুবোধ অভিভাবক শূন্য, তাহার উপর সুপারিশের জোর নাই, এবং লোকবলও নাই, সুতরাং বিদ্যালয় সমূহে ইহার প্রবেশাধিকার রহিত হইয়া গিয়াছে। শিশুবোধের অপরাধ, বড় বড় সংস্কৃত শব্দ মিশ্রভাবে নাই। মাতৃভাষার পুস্তক এরূপ হওয়া চাহি, যাহা আমরা সর্বদা সেই সকল শব্দ কথার ছলে ব্যবহার করিয়া থাকি।

মাতৃভাষার মধ্যে ভয়ানক ভয়ানক শব্দ সকল বাঙ্গালা কথার সহিত যোগ করায়, শিক্ষকেরও প্রাণান্ত ছাত্রের ত' কথাই নাই। অভিধান ব্যতীত তাহা বোধগম্য হইবার

নহে। মনে কর খোকা যদি সেই সকল শব্দ শিক্ষা করিয়া তোমার সহিত কথা কয়, তুমি হয়ত তাহার উল্টা অর্থই বুঝিবে, শিশুর শিক্ষা শিশুর মতন হওয়া চাহি; আচ্ছা আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহা কত বুঝিতে পার তাই দেখি। এই বলিয়া বাবা আমার মা'কে বলিলেন, গতকল্য ভূমিতে বেলাতলে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে করিতে পদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। বল দেখি, তুমি আমার এই কথার কি অর্থ বুঝিলে? মা বলিলেন, এ আর কি একটা শক্ত কথা যে বুঝা যায় না। ওকথা আমি বুঝিয়াছি। বাবা বলিলেন, বুঝিয়া থাক ভালই, আচ্ছা কি বুঝিয়াছ আমায় বুঝাইয়া দাও। মা বলিলেন, ও-কথার মানে গত কাল বেল গাছের তলায় বেড়াইতে বেড়াইতে পায়ে বেল কাঁটা ফুটিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া বাবা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

মা। আপনি হাসিতেছেন কেন, আমার কি অর্থ করা হইল না? আমার বলাতে কি ভুল হইয়াছে?

বাবা। হাঁ ভুলই হইয়াছে, ঠিক হয় নাই। বেলাতলের অর্থ তুমি কি মনে করিতেছ?

মা। বেলতলে মানে বেল গাছের তলায় যে মাটি তাহাই বেলাতল, আর বেল গাছে কাঁটাও হইয়া থাকে, সুতরাং বেল তলায় খালি পায়ে ভ্রমণ করাতে পায়ে কাঁটা ফোটাও অসম্ভব নয়।

বাবা। না তাহা নহে, বেলাভূমি অর্থে সমুদ্র তট, সমুদ্র তীরকে বেলা কহিয়া থাকে।

মা। তাই নাকি? বেলা মানে সমুদ্র তীর? বেলা না বলিয়া সমুদ্র তীর বলিলেই বা কি শ্রুতি কঠোর হয়। বরং সমুদ্রতীর বলিলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যাহা অনায়াসে সকলের বোধগম্য হইয়া থাকে, এমত ভাষা প্রয়োগ করাই আমার বিবেচনায় যুক্তি সঙ্গত। বিশেষ আমাদের মাতৃভাষা যখন বাঙ্গালা; তখন বাঙ্গালায় লিখন পঠনাদি সব হওয়াই ভাল, আমাদের ভাষা ত' সংস্কৃত নয়, আর সংস্কৃত হইলেও কতক বাঙ্গালা কতক সংস্কৃত এরূপ ডাল খিচুড়ী করিয়া মিশ্র ভাষায় পরিণত করিয়া কি গৌরব বৃদ্ধি হয়। বেলা শব্দ যে বাঙ্গালায় ব্যবহার নাই তাহা নহে, যেমন দুপুর বেলা, (দুই প্রহর বেলা) দুপুর বেলা বলিলে কে না বুঝিতে পারে? দুপুর বেলা অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর হয়, এই রকম দুই প্রহর বেলাকে দুপুর বেলা কহিয়া থাকে। অর্থাৎ বেলা অর্থে সময়, ইহা আমরা বাঙ্গালীর ঘরে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলকেই অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকি। বেলাভূমি অর্থে সমুদ্র, ইহা অভিধান না দেখিলে অর্থ হয় না, তাহা হইলে কথা বুঝিবার জন্য প্রতি পদে পদে অভিধান দেখিয়া কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে দেখিতেছিল প্রতি ঘরে ঘরে একখানা করিয়া অভিধান না রাখিলে কোন ক্রমেই চলিতে পারে না। তবে যার পক্ষে যেটা উপযোগী তার পক্ষে সেই রকম শব্দ সকল ব্যবহার করাই উচিত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন

করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে বেলা শব্দ বুঝিতে কষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা বাঙ্গালা পাঠ করিতেছে তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হওয়াই সম্ভবপর। আরও বিশেষ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যখন বাঙ্গালা কথা প্রয়োগ নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত বাক্য মিশাইয়া দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।

মা ইহা বলিয়া চুপ করিলে পর, বাবা পুনরায় বলিলেন, তাহার পর বর্ণ পরিচয়ের মধ্যে বানান্ যাহা আছে, তাহার মধ্যে মধ্যেও এমন কঠিন শব্দের বানান্ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা বালকেরা কেন বালকদের পিতাদেরও কঠিন বোধ হইয়া থাকে। শব্দের বানান্ গুলা মুখস্থ করিলাম কিন্তু তাহা আমার কোন কাজে শীঘ্র প্রয়োজন হইবার আশা নাই। যেমন মনে কর, কৈতব একটি কথা, শিশু কৈতব বানান্ মুখস্থ করিল, কিন্তু কৈতব কাহাকে বলে তাহা জানে না; মা ইহা শুনিয়া বলিলেন, তাইত কৈতব মানে কি আমিও তা জানি না। বাবা বলিলেন, তুমিত' স্ত্রীলোক, তোমার না জানিবারই কথা, অনেক শিশুর পিতারাও বোধ হয় জানে না। তবে তাঁহাদের অভিধান দেখিবার ক্ষমতা আছে, হয়ত' অভিধান দেখিয়া বলিয়া দিবেন, তাহা ঠিক নহে, বালকের পক্ষে এরূপ শব্দ বানানোর মধ্যে থাকা যুক্তি বিরুদ্ধ। মা আমার বাবার কথা শুনিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈতব শব্দের অর্থটা কি, আমাকে বলিয়া দিলে আমার জানা থাকিবে। বাবা বলিলেন, এইরূপ কত কথা আছে, তুমি কত জানিবে। আচ্ছা কৈতব শব্দের অর্থ তোমাকে বলিতেছি, কৈতব অর্থে বঞ্চক বা জুয়ারী অর্থাৎ যাহারা জুয়া খেলিয়া থাকে। এইরূপ ভাবের শব্দ কত আছে, তোমাকে আর কত বলিব।

শিশুগণের পক্ষে এমন পুস্তক হওয়া চাহি, যাহাতে শিশুগণের বাল্যাবস্থা হইতেই একটু ধর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, গুরু বা শিক্ষককে মান্য করে এবং পিতা মাতাকে মান্য করে। নচেৎ বিড়াল কুকুরের কটা পা, কটা নখ, কটা দাঁত এই সকল প্রাণীতত্ত্ব অল্প বয়স্ক শিশুগণের পক্ষে একেবারেই উপেযোগী নহে। ইহাতে আমি এমত' বলিতেছি না যে, প্রাণীতত্ত্ব শিক্ষা করা চাহি না, প্রাণীতত্ত্ব শিক্ষারও সময় আছে। আরও বিশেষ ৮ম বা ৯ম বর্ষীয় বালকেরা স্বভাবতঃ সকলেই জানে, ঘোড়ার কটা পা, গরুর কখানা খুর, কুকুরের বা বিড়ালের কটা নখ বা কটা পা। ইহা শিক্ষা করার জন্য প্রথমে বালকগণের সময় নষ্ট করিয়া বৃথা কষ্ট দেওয়া যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বালকেরা অল্প বয়স হইতে এইরূপ পশু চরিত্র পাঠ করিয়া পরিণামে পশু ভাবাপন্ন হইয়া পিতা, মাতা, রাজা, গুরুজন ও শিক্ষক প্রভৃতিকে মানিতে চাহে না, অনেক স্থলে ছাত্রেরা শিক্ষককেই মারিতে উদ্যত হয় বা পিতা মাতার অবাধ্য হয়, ইহা হয় কেন? কাহার দেশে এইরূপ হইয়া থাকে? আর পূর্বেই বা এইরূপ ঘটিত না কেন? বর্তমানে বালকগণের পিতা মাতারাও পাঁচজনের দেখাদেখি অল্প বয়স্ক বালকগণকে

বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং মনে করিলেন, পুত্রের প্রতি পিতার যাহা কর্তব্য তাহা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াই যেন সেই কর্তব্য শেষ হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে পিতা মাতাই পুত্রের একমাত্র শিক্ষা পুস্তক, তাহা হয়ত প্রায় অনেক স্থলে অনেক পিতা মাতার জানা নাই। মনে কর যদি কোন পাওনাদার আমার কাছে টাকা আদায়ের তাগাদা করিতে আসে, আর আমি যদি খোকাকে দিয়া বলিয়া পাঠাই যে, বাহিরে গিয়া বলিয়া আইস, বাবা বাড়ী নাই, এই কথা বলিতে কি আমার খোকাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইল না? এইরূপ কত ঘৃণিত বিষয়ের কুশিক্ষা যে বালকেরা নিজ বাড়ী হইতে পায়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাহার উপর বিদ্যালয়ের কুসঙ্গ আছে, আবার শিক্ষা পুস্তক যাহা আছে তাহাতেও সব পশু চরিত্র বিন্যস্ত থাকে, দেব চরিত্র মোটেই থাকে না, সুতরাং তরল মতি বালকেরা আর করে কি। এইসব কারণে আমি খোকাকে প্রথমে শিশুবোধ পাঠ করাইয়া তাহার পর যেমন বুঝিব সেইমত ব্যবস্থা করিব।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন

শিশুবোধ মধ্যস্থিত কলঙ্ক ভঞ্জনটা এখনকার লোকের অপ্রিয় হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ কৃষ্ণলীলার বহিরর্থ সকলের প্রিয় হইতে পারে না। কলঙ্ক ভঞ্জন ব্যাপারটী অতি সুন্দর বিষয়, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলে অপ্রিয় হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। মনে কর, জীবদেহে দোষের অভাব নাই, সহস্র সহস্র দোষরূপ ছিদ্র জীবদেহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দোষরূপ ছিদ্রযুক্ত দেহরূপ কলসে জলস্বরূপ নারায়ণকে যিনি স্থিতি করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সতীপদবাচ্য। বর্তমানে জীবদেহে জীবনকৃষ্ণ, মূর্চ্ছারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচৈতন্য রহিয়াছে। জীবনকৃষ্ণকে (প্রাণকে) এই মূর্চ্ছারূপ ব্যাধি হইতে চৈতন্য করিবার চিকিৎসক গুরুরূপী কৃষ্ণ। গুরুরূপী প্রাণকৃষ্ণ বলিলেন, দোষরূপ সছিদ্র (দেহরূপ) কলসে যিনি বারি ধারণ করিতে সক্ষম তাঁহার সেইবারি দ্বারায় জীবনকৃষ্ণের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতে পারে। নচেৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে না।

রাধাই একমাত্র ছিদ্র কলসে বারি ধারণে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সতী বলা হইয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে, জীবদেহে জীবনকৃষ্ণ মূর্চ্ছারূপ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক, অর্থাৎ আমার শরীররূপ ক্ষেত্রে বর্তমান প্রাণকর্মরূপ কৃষিকর্ম যাহা চলিতেছে তাহার নিবৃত্তিরূপ

স্থির অবস্থাই কৃষ্ণ শব্দবাচ্য। এই নিবৃত্তি অবস্থারূপ (অর্থাৎ প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ) কৃষ্ণ যোগনিদ্রারূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন (ঢাকা), রহিয়াছেন, অজ্ঞান কর্তৃক উক্ত স্থিরবস্থার উপলব্ধি হইতেছে না, ইহাই কৃষ্ণের মূর্চ্ছারূপ ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থা। ক্রিয়া—যোগের অন্তর্গত কর্ষণ ক্রিয়ারূপ অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা যিনি প্রাণকর্মের নিবৃত্তিরূপ (কর্মের অতীতাবস্থারূপ) বারিকে (অর্থাৎ জল স্বরূপ আত্মানারায়ণকে) দেহরূপ কুম্ভে স্থিতি করিতে পারেন তিনিই সতী, অর্থাৎ বারি অর্থে বৃক্রি—আবরণ করা, আবরণ অর্থে অবরোধ বুঝিবে, এই অবরোধ—যিনি অবরোধে অবরোধ, এইরূপ অবরোধ দ্বারা জল স্বরূপ আত্মানারায়ণকে দেহরূপ কুম্ভে স্থিতি করিতে একমাত্র রাধাই সক্ষম হইয়াছিলেন। এ কারণ বাধাই প্রধানা গোপী বলিয়া বিখ্যাত। কর্ষণ ক্রিয়ার নিবৃত্তি অবস্থারূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যাঁহারা পতিভাবে সাধন করিয়া থাকেন, সেই পতিভাবে সাধন করাকেই গোপীভাব করা হইয়া থাকে।

ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই প্রাণশক্তিরূপা ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ সম্বর্দ্ধন (সম্যকরূপ বৃদ্ধি) ক্রিয়ার অভ্যাসে স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণকে প্রাপ্তির জন্য নিত্য সাধনা করিতেন। তন্মধ্যে প্রধানা গোপীকে রাধা বলা হইয়া থাকে, তাহার কারণ রাধা শব্দের অর্থ—রাধ্—সিদ্ধ করা, ইনিই জিতশ্বাস হইয়া জীবাত্মার চঞ্চলভাব এবং পরমাত্মার স্থিরভাব (স্থিরভাবই নিবৃত্তি) এই উভয় অবস্থার ঐক্যভাব করিয়া পরম ব্রহ্মের ভাব, (অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মরূপ মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থা) সাধন দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রধানা গোপী বৃষভানু নন্দিনী-কে রাধা কহা যায়। তাহার পর তুমি গোপী অর্থে সাধারণ গোয়ালিনী মনে করিও না। গোপী অর্থে, গো শব্দে—গম্—গমন করা, প—শব্দে—পবন, ঈ—শব্দে শক্তি (স্থির বায়বী শক্তি), অর্থাৎ প্রাণরূপী পবন যাহা আগম নিগম পথে (নাসারন্ধ্রে) গমনা গমন করিতেছে, তাহাকে ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত স্থির বায়বী শক্তির দ্বারা যাঁহারা বিনা অবরোধে নাসাভ্যন্তরচারী করিয়া, অভ্যাসরূপ সাধন করেন তাঁহারাই গোপী শব্দবাচ্য বলিয়া জানিবে এবং ব্রজপুরী শরীরকেই বুঝিবে। কারণ ব্রজ—গমন করা, প্রাণকৃষ্ণ এই দেহরূপ পুরীতেই গমনাগমন করিতেছেন, সুতরাং জীবদেহই প্রকৃত ব্রজপুরী। এই শরীররূপ ব্রজপুরীর মধ্যে মথুরা সমীপস্থ গোকুল স্থানকে ব্রজধাম কহা যায়। মথুরা—মথ্ বধ করা, যেখানে মধু নামক দৈত্যকে মর্দিত করা হয় তাহাকেই মথুরা কহা যায়, অর্থাৎ ভোগিকান্ত নামক বায়ু। মধু—মন বোধ করা অর্থাৎ যে অবস্থা কর্তৃক 'আমি আমার' বোধের দ্বারা মত্ততার সহিত সুখ দুঃখ বোধ হইয়া থাকে তাহাই মধু নামক দৈত্য। জীবদেহস্থিত মেরু মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের সমীপস্থ স্থানে মধু নামক অসুর (অজ্ঞানরূপ মত্ততাজনক মোহরূপ অসুর) জ্ঞানোদয়ে মর্দিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হইলেই মোহের বিনাশ হইয়া থাকে।

আজ্ঞাচক্রই প্রকৃত ব্রজধাম। এই আজ্ঞাচক্রে যাহাদের বাস, তাহারাই ব্রজবাসী।

বাস—বস্—থাকা, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে যাঁহাদের মনের স্থিতিরূপবাস হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রজবাসী পদবাচ্য, অপরে নহে। আর এই আজ্ঞাচক্রকে গোকুলও কহা যায়। গো শব্দে মাতাকে বুঝায়, "প্রাণঃ হবৈ মাতা", প্রাণই জীব মাত্রের মাতা স্বরূপ, কূল শব্দে ভবন অর্থাৎ প্রাণের স্থিতি স্থানরূপ ভবনই আজ্ঞাচক্র জানিবে। কলঙ্ক জীব মাত্রেই কিছু না কিছু থাকেই, সাধন অবস্থাতেও একেবারে দোষ শূন্য কেহ হইতে পারে না। সাধনের অতীতাবস্থাতে দোষ শূন্য হইয়া থাকে; সাধক বা সাধিকা যাঁহারা পতিভাবে সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও প্রথমতঃ বিষয় স্পৃহা কিছু থাকে, রাধারও কলঙ্ক তদ্রূপ। ক শব্দে শরীর, ল শব্দে দান করা, ঙ শব্দে বিষয় স্পৃহা, ফের আর একটি ক আছে, এই ক শব্দে মন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শরীর ও মন স্থিরপ্রাণরূপা কৃষ্ণকে দান করিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পতিভাব থাকায় দ্বৈতভাব রহিত হয় নাই; এই দ্বৈতভাব রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাধার কলঙ্ক ছিল। ইহাই বিষয় স্পৃহা অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনা। তাহার পর যখন রাধাদেহরূপ কলসে জলস্বরূপ জীবনকৃষ্ণকে ক্রিয়াযোগ দ্বারা (বর্তমান প্রাণকর্মরূপ জীবাত্মার চঞ্চল ভাবরূপ কর্ষণ ক্রিয়াতে) ক্রিয়ার অতীতাবস্থারূপ নিবৃত্তি অবস্থার সহিত ঐক্য সাধন করিয়া বিনা অবরোধে স্থিতিরূপ নিবৃত্তির সহিত মিলন করিয়াছিলেন, সেই মিলনরূপ অবস্থাই পরম ব্রহ্মভাব। এ অবস্থায় সাধক বা সাধিকার দ্বৈতভাবরূপ কলঙ্ক থাকে না, অর্থাৎ মনে প্রাণে ঐক্যরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া সব এক হইয়া গিয়া বলিবার লোকও থাকে না অর্থাৎ তখন এক মাত্র ব্রহ্মভাব ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু না থাকায় একই বা তখন বলে কে! তখন কেইবা পতি কেই বা স্ত্রী, উভয় মিলিয়া একভাব হইয়া গিয়া উপাধি রহিত ভাব হয়। ইহাই কলঙ্ক রহিত অবস্থা। রাধার এই অবস্থা প্রাপ্তির পরই জীবনকৃষ্ণের মূর্চ্ছাভাবরূপ ব্যাধি বিদূরীত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ (ব্রহ্ম) ভাবের প্রকাশ অবস্থা দৃশ্যমান হইয়াছিল; ইহা নিজবোধরূপ অবস্থা। জীবনকৃষ্ণের সংজ্ঞা লাভ হইলে দেহাভিমান শূন্য হওয়ায় রাধা সাধ্বী (সতী) পদবাচ্যা হইয়াছিলেন।

জীব মাত্রেই পতি, জীবের জীবন স্বরূপ স্থির প্রাণরূপ কৃষ্ণ; সাধন সাধিকারা কেহ পতিভাবে, কেহ পিতৃ মাতৃভাবে, কেহ বন্ধুভাবে ইত্যাদি ভাবে সাধন করিয়া থাকেন। রাধা পতিভাবে প্রাণ রূপ কৃষ্ণের তন্ময় হওয়ায় প্রাণপতির সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সতী পদবাচ্যা হইয়াছিলেন। সাধন সিদ্ধ হইয়া রাধার দ্বৈতভাবরূপ কলঙ্ক ভঞ্জন হইয়াছিল। ইহাই প্রকৃত কলঙ্ক ভঞ্জন জানিবে। বাহ্যিকে কলঙ্ক ভঞ্জনের বিষয় যাহা বর্ণিত আছে, তাহা বহিরর্থে বর্ণিত হওয়ায় কলঙ্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে ব্যতীত কলঙ্ক ভঞ্জন করা হয় নাই। রাধার বাহ্যিক সহস্র ছিদ্র কলসে জল আনয়ন ব্যাপারটী কবির ছলনা মাত্র, ভিতরে সাধনভাব গোপন রাখিয়া ধর্মভাবের সহিত বাহ্যিকে যুবক যুবতী

প্রেম বর্ণনা করা হইয়াছে। বাহ্যিক ভাব ও সদ্‌ভাবে গ্রহণ করিলে, বিশেষ আপত্তিকরও হইতে পারে না।

কারণ যাঁহারা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত অন্তর্ম্মুখীন আত্মকর্মের সাধনায় রত থাকেন, তাঁহাদের আত্মরতি (যুবক যুবতীর ভাব) রূপ প্রেম থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ জীবমাত্রেই প্রথমতঃ নিজ শরীরস্থ প্রাণ কৃষ্ণকে বা নিজ প্রাণকে আত্মা বোধ করিতে সক্ষম হয় না, প্রাণই যে আত্মা পদবাচ্য, তাহা বুঝিয়াও ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। কারণ জীব প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়াও আসুরিক ভাব কর্তৃক তাহা ধারণা করিতে পারে না। রাধার যে বাহ্যিক কলঙ্কভাব, তদ্বারা যে জীবের কিছু শিক্ষার বিষয় নাই তাহা নহে। স্ত্রীলোকের অসতী অপবাদ অপেক্ষা অপর অপবাদ সামান্য মাত্র, পুরুষের পক্ষে চৌর্য্যাপদ এবং ব্যভিচারগ্রস্ত ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপবাদ আর নাই। রাধা জটিল বুদ্ধি ও কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন জটিলা কুটিলারূপ মানব কর্তৃক নানাপ্রকার কুৎসিৎ ঘৃণাকর অপবাদ পাইয়াও সব সহ্য করিয়া জীবনকৃষ্ণরূপ আত্মরতি হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। সমস্তই সহ্য করিয়া নিজ দেহস্থিত জীবনকৃষ্ণেতে সমভাবেই ভালবাসা রাখিয়াছিলেন, (ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে) ভাল শব্দে কপাল দেশ—ভ্রূ মধ্যস্থ স্থান (আজ্ঞাচক্র), বাসা অর্থাৎ থাকা, ইহা ভালবাসা। সাধনতত্ত্ব অতি গুপ্তভাবেই করা বিধেয়, রাধাও তাহা করিতেন। ইহাতে সাধারণের মনে হইত রাধা গুপ্তস্থানে থাকিয়া সম্ভবতঃ কাহার সহিত গুপ্তভাবে প্রেমালাপ করিয়া থাকেন।

সাধারণে বাহ্যিক পূজা—মালা জপ, হোম ইত্যাদি লোককে দেখাইবার জন্য সকলের সম্মুখেই করিয়া থাকে। কিন্তু সাধক ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত অন্তর্যাগরূপ (সম্পর্দ্ধনা রূপ) পূজা গুপ্তভাবেই করিয়া থাকেন, সুতরাং সাধারণের স্বতঃই এইরূপ মনে হইয়া থাকে যে, আমরা কি আর পূজা, জপ, হোম ইত্যাদি করি না? আমরা জপ, পূজা, সকলের সম্মুখেই করিয়া থাকি এবং এইরূপ সকলেই ত' করিয়া থাকে, ইহাইত' বিধি অর্থাৎ সাধারণের জানা আছে, আমরা যাহা করিয়া থাকি বা বাপ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইহা ব্যতীত অপর কিছু সাধনাদি নাই। কেহ গুপ্তভাবে কোন রকম সাধনাদি করে শুনিলেই ঈর্ষাবশতঃ নানা রকমভাবে যাহার যেমন প্রবৃত্তি তিনি তদ্রূপ নানা কথা বলিয়া থাকেন। রাধারও মিথ্যা কলঙ্ক (সাধারণে যাঁহার বাহ্যিক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত পূজা জপাদি কার্য্য করিয়া থাকেন না করিতেন) তাঁহারাই ঈর্ষা পরবশ হইয়া রটনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রধানা গোপী বৃষভানু নন্দিনী ব্যভিচারিণী ছিলেন না, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। বর্হিভাবে রাধাকে প্রধানা গোপী বা প্রধানা সাধিকা বলিয়া জানিবে এবং নিজ দেহস্থিত প্রাণস্বরূপ কৃষ্ণকে রাধাভাবে (রাধার ন্যায় পতিভাবে) রাগের সহিত (অনুরাগের সহিত) সাধন ও গুরুপদেশে ভজন

করিবে। ভজন, সেবা, পূজা করার নাম ভজন, প্রাণে সর্বদা লক্ষ্য রাখার নামই সেবা; সেবা পরিচর্য্যাকে কহিয়া থাকে, পরি—প্রকৃষ্টরূপে চর্—গমন করা (আগম নিগম পথে)। অর্থাৎ নাসারন্ধ্র দিয়া যে প্রাণ গমনাগমন করিতেছেন, তাহাতে লক্ষ রাখার নামই সেবা, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা, ইহাকেই প্রকৃত সেবা বলিয়া জানিবে। দেখিও কেবল বাহ্য সেবায় যেন তোমার প্রবৃত্তি না যায়।

পূজা শব্দে প্রাণক্রিয়ার সম্বর্দ্ধন বুঝিবে, অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্ম্মের অন্তর্ম্মুখীন গতি সম্যক্ বৃদ্ধি করার নাম সম্বর্দ্ধন বা পূজা বুঝিবে। এইরূপ নিজ দেহস্থিত প্রাণকৃষ্ণের সেবা সদা সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া রাধাভাবে অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইলে অচিরাৎ বৃষভানু নন্দিনীর ন্যায় রাধাভাব প্রাপ্ত হইবে। দেখিও, যেন বেশ্যার ন্যায় বৃত্তি অবলম্বন করিও না, যাহাদের পঞ্চপতি তাহাদিগকেই বেশ্যা কহিয়া থাকে, তুমি তাহা হইও না, একমাত্র নিজ দেহস্থিত স্থিরপ্রাণ কৃষ্ণকে জগৎ পতি মনে করিয়া রাধার ন্যায় পতিভাবে পূর্বোক্ত রূপে সেবা, পূজা করিবে। 'না করিবে অন্য দেবের নিন্দন পূজন। না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ।" প্রাণস্বরূপ আত্মা ব্যতীত অপর দেব দেবীর নিন্দা বা বাহ্যস্তুতি বা পূজা করিও না, কারণ ইহা মুমুক্ষুগণের পক্ষে ধর্মরূপ যোগ বিঘ্ন বলিয়া জানিবে। প্রসাদ অর্থে ভোজনের অবশিষ্ট ভাগ যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা প্রসাদ মনে করিও না, উহা প্রকৃত প্রসাদ পদবাচ্য নহে, উহা বাহ্য প্রসাদ মাত্র, এ প্রসাদ মুমুক্ষুগণের উপযোগী নহে বলিয়া জানিবে। বাহ্য ভাবের প্রসাদ অর্থে অনুগ্রহ বুঝিবে অর্থাৎ কোন বাহ্য দেব বা দেবীর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থী হইও না, তুমি যখন নিজ দেহস্থিত প্রাণকৃষ্ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি রাধার ন্যায় জগতে পূজ্যা হইতে পারিবে।

বর্তমান প্রাণকর্ম্মরূপ প্রাণযজ্ঞের অতীতাবস্থাই প্রাণকৃষ্ণের প্রসাদ পদবাচ্য। বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার স্বচ্ছতা ও নির্মলতা হেতু তাহাকে প্রসাদ কহা যায়, ইহাই আত্ম প্রসাদ। ইহা যিনি প্রাপ্ত হন তিনিও জ্ঞানের স্বচ্ছ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাধাও তাহাই হইয়াছিলেন অর্থাৎ রাধাতে কোন মলিন ভাব ছিল না। সুতরাং রাধার ভাব জীব মাত্রেরই অনুকরণ করা উচিত। তবে বাহ্যিকে কোন কোন লোক রাধা ভাবের অনুকরণ করিতেছি ইহা লোক সমাজে দেখাইবার অভিপ্রায়ে নিজে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নিজেকে রাধা বা আমি কৃষ্ণের সখী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, এইরূপ ভাবের লোকগণকে বঞ্চক বা ধূর্ত মনে করিবে। কারণ দেহের পরিচ্ছদাদি বদল করিলেই স্ত্রীভাব হয় না, এ কারণ বেশধারী মাত্রকেই বঞ্চক মনে করিবে। ভগবৎ সাধনে বেশভূষা পরিবর্তনের কোন আবশ্যক নাই জানিবে। কারণ যাঁহাকে পাইবার জন্য বেশভূষা পরিবর্তন করিতেছি, তিনি বেশভূষা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না, তাঁহার নিকট যাইতে হইলে মনের বেশভূষা করা

নিতান্ত আবশ্যক। মনের বেশভূষা বস্ত্রাদি আভরণ করা যায় না, মনের মলিন ভাব দূর করাই মনের বেশ-ভূষা; বর্তমানে মনের বিষয়াসক্ত ভাবই মনের মলিন ভাব। এই পার্থিব বিষয় প্রাপ্তির বাসনারহিত অবস্থারূপ বেশভূষাই তাঁহার অতীব প্রিয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতিতে জন্ম হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ বংশে জন্ম হইয়াছে, তাহার বংশ পরম্পরায় যেরূপ বেশভূষা, আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা বজায় রাখিয়া গুপ্তভাবে সাধন করাই উচিত বলিয়া জানিবে। শিশুবোধের মধ্যে শিশুগণের এবং শিশুগণের পিতা মাতারও এই কলঙ্ক ভঞ্জনের বিষয়ে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

মনে কর, বিদ্যা অভ্যাস করা কি কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য? তাহা বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। কিম্বা যশ বা পাণ্ডিত্য প্রচারের জন্য বিদ্যাভ্যাস করার উদ্দেশ্য নহে, যাঁহারা কেবল মাত্র এইরূপ অভিপ্রায় বিদ্যাভাস করিয়া থাকেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ঘৃণার পাত্র বলিয়া জানিবে। পার্থিব পদার্থ লাভের জন্য বিদ্যাভ্যাস করা বা আপন আপন বালকগণকে পার্থিব বিষয় লাভের জন্য বিদ্যাভ্যাস করানয় মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হয় নাকি? জগতের আদিকাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত অর্থের দ্বারা কাহারও অভাব দূর হইয়াছে কি? অর্থের দ্বারা অভাব দূর হয় না ইহা নিশ্চয় জানিবে। নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও বহুতর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহা প্রায়শঃ দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের অভাব দূর হয় না। অর্থ উপার্জ্জন যাহার যতবেশী হইবে তাহার অর্থ প্রাপ্তির আশা ততই বাড়িতে থাকিবে, সেই আশার নিবৃত্তি অর্থ প্রাপ্তিতে কাহারও হয় না, এবং অভাব দূরও হয় না, আশা বা অভাব বর্তমান থাকিতে সুখ কোথায়? সে আশার দাস, তাহাকে জগতের দাস মনে করা চাহি।

"আশায়াস্তু যে দাসাঃ তে দাসাঃ জগাতমপি।
আশা দাসী কৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ।।"

অর্থাৎ যিনি আশার দাস, তিনি জগতের দাস, যিনি আশাকে দাসী করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার নিকট জগৎ দাসের মতন। অতএব বিদ্যাভ্যাস দ্বারা পার্থিব পদার্থের আশা করা নীচতা মাত্র।

বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য থাকা চাহি—কর্মজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ, ভক্তি ও প্রেমশিক্ষা। বাহ্যিক ভক্তি, প্রেম শিক্ষা হইলে তাহার পর কর্মের দ্বারায় (আত্মকর্মের দ্বারা) জ্ঞান লাভ করা; এই জ্ঞান আত্মকর্ম ব্যতীত লাভ হয় না। আত্মকর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, অহৈতুকী ভক্তি বা প্রেম আপনিই হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় আত্মা কর্ম দ্বারা জ্ঞান হইলে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা প্রেম আপনি হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা ভক্তি একই অবস্থা, প্রেমও তাহাই অর্থাৎ ভালবাসার যখন যেরূপ পাত্রে অর্পিত হয়, তখন তদনুরূপ উপাধি, ভালবাসার হইয়া থাকে। পিতা মাতা গুরুজনের উপর অর্পিত

হইলে তাহাকে ভক্তি কহা যায়, পুত্র বা পুত্রতুল্যগণের প্রতি হইলে স্নেহ কহা যায় এবং স্ত্রী বা পতির প্রতি হইলে তাহাকে প্রেম কহা যায়, বন্ধু বা মিত্রের প্রতি যে ভালবাদা জন্মে তাহাকে সখভাব কহা যায়। এই সকল ভালবাসার ভাব মোক্ষ কল্পে প্রয়োগ হয় না, কারণ ইহা ব্যক্তি বিশেষের উপর স্বার্থের সহিত ভালবাসা; সুতরাং ইহাকে গৌণ কল্প বুঝিতে হইবে। তবে এই ভাবগুলি নিঃস্বার্থভাবে প্রয়োগ হইলেই মোক্ষ কল্পে প্রয়োগ হইতে পারে। তবে ভাবের ঘরে চুরি না হয় তাহা সাধকের লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সাধারণেরও লক্ষ রাখা উচিত। উক্ত ভাবসকল কপটভাবে প্রয়োগ হইলে বা স্বার্থের সহিত প্রয়োগ হইলেই ভাবের ঘরে চুরি হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃত ভাব চুরি হইয়া অভাবের ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। কপটতা বা স্বার্থের সহিত ভালবাসার যে ভাব, তাহা কার্য্যকরী হয় না। উক্ত ভাব সকলের দৃঢ়তা থাকিলে, দৃঢ়তার সহিত ভালবাসায় থাকিতে থাকিতে ভাবের কিছু অশুদ্ধতা থাকিলেও ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া যায়।

ভালবাসা শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে, তত্রাচ স্মরণার্থে পুনরায় বলিতেছি, ভাল শব্দে কপাল দেশ, (আজ্ঞাচক্র), বাসা শব্দে বস্—বাস করা, ইহাকেই ভালবাসা কহে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে (বাস করা রূপ) থাকিতে থাকিতে (মনকে রাখিতে রাখিতে) আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থমণ্ডলের জ্যোতির দীপ্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, ভাবের শুদ্ধতাও সেই পরিমাণে হইতে থাকিবে। তবে পূর্বোক্ত পিতৃ, মাতৃ, পতি ইত্যাদি ভাব সকলের মধ্যে যেমন কপটতা একেবারে না থাকে, সেইরূপ ভাবসকল ঐকান্তিক হওয়া চাহি। স্বার্থ প্রথম অবস্থায় কিছু না কিছু জীব মাত্রেই থাকে, তাহা ভালবাসায় উক্ত ভাবের সহিত থাকিতে থাকিতে সাধক স্বার্থ শূন্য হইয়া থাকে। অবশ্য এই সকল ক্রিয়াযোগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে জীবিত কালের মধ্যে কোন সময় না কোন সময় জীব কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিজ শরীরস্থ স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণে রূপ জীবমাত্রেই ভাল দেশে (কপাল অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র) প্রকাশমান আছে। রাধা ক্রিয়াযোগের দ্বারা (কাত্যায়নীরূপা প্রাণশক্তির সংবর্দ্ধনরূপ পূজাদ্বারা) নিজ ভ্রূমধ্যস্থ কপালে কূটস্থের রূপে পতিভাবে মনকে রাখিতেন এবং তাহাতে পতিভাবে তন্ময় হওয়ায় রাধা, কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রতি ঘটে ঘটেই তাঁহার জীবনকৃষ্ণ বিরাজমান রহিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীয়মান হইয়াছিল।

স্থিরপ্রাণই জগৎপতি, জীবমাত্রেই প্রভু এবং জীবমাত্রেরই ভরণ কর্ত্তা, প্রাণের দ্বারাই জীবের পোষণ হইতেছে। মনে কর যদি তুমি এই প্রাণপতির সাধনায় রত হও, বা নিজ প্রাণে আসক্ত হও, তাহা হইলে কি তুমি ব্যাভিচারিণী হইবে? ইহা কি সম্ভবপর কখন হইতে পারে! তুমি আমার স্ত্রী, আমি যদি অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে লোকের কথায় ব্যাভিচারিণী বলি, তাহা হইলে তুমি সত্যই ব্যাভিচারিণী হইবে?

তাহা কখন হইতে পারে না। এমন অবস্থায় তুমি যদি যথার্থ এবং আন্তরিক পতিভাবে বা উপরোক্ত অন্যভাবে নিজ প্রাণস্বরূপ পতিতে তন্ময় হইতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রতি যে সমস্ত উৎপীড়ন হইয়া থাকে তাহা সহ্য হইয়া যাইবে এবং কালে প্রাণই (প্রাণই সকল ঘটে আছেন) আমার এবং অপরের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া তোমাকে সে সকলের পূজ্য করিয়া দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। রাধারও তাহাই হইয়াছিল।

শিশুবোধের মধ্যে অনেক শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে, তবে শিক্ষাগুরুর অভাবে এই সকল শিক্ষা যাঁহারা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের আপন আপন অন্তরে পশুভাব থাকায় তাঁহারা শিশুবোধের মধ্যস্থিত কলঙ্ক ভঞ্জনকে অশ্লীল কহিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রথমে পশুচরিত্র পাঠে বা পশুভাবাপন্ন লোকের চরিত্র পাঠে বালকগণের চরিত্র গঠনও হয় না এবং জীবনের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য ভগবৎ ভক্তি বা প্রেম তাহার শিক্ষাও লাভ হয় না। বালক যদি দেবভাবের বিষয় প্রথমে অবগত হইতে না পারে, তাহা ত' ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বাল্য জীবনে হৃদয়ে যাহা একবার অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার সংশোধন করা কত কঠিন তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

এইজন্য বাল্যজীবনে বালকদিগের হৃদয়ে যাহাতে আসুরিক ও পশুভাব প্রবেশ করিতে না পারে তাহার বিধিমতে যত্ন ও চেষ্টা করা বালকগণের অভিভাবকদের নিতান্ত আবশ্যক। একারণ বালকগণের পক্ষে বর্তমানে শিশুবোধ অতি উত্তম পাঠ্য পুস্তক জানিবে। শিশুবোধে নাই কি? শিশুবোধের মধে চাণক্য শ্লোক রহিয়াছে, এই চাণক্য শ্লোকগুলি যদি বালকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বালকের বা বৃদ্ধের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

তাহার পর দাতাকর্ণ যাহা করিয়াছেন, এই কর্ণ চরিত্রে কি কিছু শিক্ষার বিষয় নাই? কর্ণ নিজে জানিয়াও নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া পরোপকারের জন্য নিজ জীবন দান করিয়াছিলেন। ইহা কি শিক্ষার বিষয় নহে? কর্ণের বীরত্বের অনুকরণ শিক্ষা করা কি জীব মাত্রের বাঞ্ছনীয় নহে? কর্ণের ভগবৎ ভক্তি, কর্ণের ন্যায় দাতার পরাকাষ্ঠা হওয়া, কর্ণের তুল্য সহ্যগুণ শিক্ষা করা কি জীবের বাঞ্ছনীয় নহে? কর্ণের মাতৃভক্তি কি শিক্ষার অনুপযুক্ত? কর্ণের কর্তব্যনিষ্ঠতা, কর্ণের ন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কি জীবের শিক্ষণীয় বিষয় নহে? তাহার পর কর্ণপুত্র বৃষকেতুর ন্যায় পিতৃমাতৃ ও ভগবৎ ভক্ত শিশু এক্ষণে কি আর কুত্রাপি দেখিয়াছ? বৃষকেতু পিতামাতার কথায় নিজ জীবন দান করিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত জীবন দিয়াছিলেন? ইহা কি শিশুগণের বা শিশুদিগের পিতার শিক্ষণীয় বিষয় নহে?

বর্তমানে অধিকাংশ স্থলে পিতামাতা সামর্থ্য হীন হইলে অর্থাৎ পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিবার মতন হইলেই পিতা মাতা দাস দাসীর ন্যায় অবস্থান

করিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে পিতামাতাকে পুত্র বা পুত্রবধূর নিকট হইতে তাড়না ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়া থাকে, ইহাই কি পুত্রের শিক্ষা? ইহাকেই কি শিক্ষিত পুত্র বলিতে হইবে। এইরূপ ভাবের পুত্র থাকা অপেক্ষা না থাকা কি পিতামাতার পক্ষে মঙ্গল জনক নহে? হায়! হায়! এইরূপ ভাবে বর্তমান শিক্ষার গুণ প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে চলিতেছে, অথচ কেহই দেখিয়াও দেখিতেছে না, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? আবার কোন কোন পুত্র পিতামাতাকে যৎকিঞ্চিত গুদাম ভাড়া স্বরূপ খোরাকি দিয়া পিতামাতার প্রতি যথেষ্ট কর্তব্য পালন করা হইল বলিয়া মনে করিয়া নিজে পিতামাতা হইতে (১ কুরী স্থলে) স্বতন্ত্র স্থানে স্ত্রী পুত্রকে লইয়া বসবাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজ পিতামাতার প্রতি এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ আত্মীয়গণের প্রতি যে কিরূপ সৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা আর বলা বাহুল্য মাত্র। তাহার পর পাঠ অভ্যাসকালে শিক্ষাগুরুর প্রতি ছাত্রের কি কর্তব্য এবং পাঠ সমাপ্তেই বা কি কর্তব্য তাহাও শিশুবোধ সামান্য ভাবে যাহা আছে, তাহাও বর্তমান শিক্ষায় প্রায় দেখা যায় না।

বর্তমানে কোন কোন ছাত্র শিক্ষাগুরুকে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, প্রায় সমস্ত বালককেই শিক্ষকের অবাধ্য দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমানে যে শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়াছে ইহা বলাও অত্যুক্তি হয় না জানিবে। শিশুবোধে গণিতের বিষয় অর্থাৎ অঙ্ক শাস্ত্রের বিষয় যেটুকু আছে তাহা সংসার ধর্ম করিতে আবশ্যক হইয়া থাকে, মহাজনী, জমিদারী হিসাব করিতে যাহা আবশ্যক হইয়া থাকে তাহা শিশুবোধে আছে। এবং তাহার অভ্যাস পটুতা হইলে প্রায় অধিকাংশ কার্য্য চলিয়া গিয়া থাকে।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রহ্লাদ চরিত্র

শিশুবোধে প্রহ্লাদ চরিত্র যাহা আছে, তাহাও শিশুগণের অপাঠ্য মনে করা চাহি না। প্রহ্লাদের চরিত্র কি অনুকরণীয় নহে? যদি বল প্রহ্লাদ পিতার অবাধ্য হইয়া ধর্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার চরিত্র অপাঠ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ পিতার অবাধ্য ছিলেন না, তবে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু আসুরিক ভাবাপন্ন থাকায় আত্মস্বরূপ হরির বিরোধী ছিলেন, প্রহ্লাদ সেই আত্মস্বরূপ হরির ভক্ত ছিলেন। যেমত জল এই শব্দ মাত্র জল নহে, তদ্রূপ হরি এই শব্দ মাত্র হরি নহে। জল এই শব্দ বলিলে জল উপাধি বিশিষ্ট একটি বিষয়কে বুঝায়। যাহা পান করিলে পিপাসা নিবারণ

হয়, তাহাকেই জল বলা হইয়া থাকে; তদ্রূপ হরি এই শব্দ মাত্র উচ্চারণে কোন একটি বিষয়ের অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকে, সেই বিষয়টী জানা না থাকিলে হরিশব্দ উচ্চারণে হরিরূপ অবস্থার জ্ঞান হয় না। যেমন জল এই উপাধি বিশিষ্ট পদার্থটী জানা না থাকিলে জল জল করিলে জলও আসিয়া উপস্থিত হয় না এবং পিপাসারও শান্তি হয় না, হরি শব্দও তদ্রূপ জানিবে। হরি অর্থে—হৃ—সকল মনুষ্যের হৃদয়ে যিনি আছেন, বা হৃ—রুদ্ররূপে যিনি বিশ্বকে সংহার এবং পালন করেন তিনিই হরি শব্দবাচ্য। হরি শব্দে বায়ুকে বুঝায়, অর্থাৎ প্রাণবায়ু; আর হরি শিবকেও বুঝায়, অর্থাৎ স্থির প্রাণই হরি পদবাচ্য। কারণ স্থির প্রাণের অবস্থার জীবের ত্রিতাপ দূর হইয়া শোক, তাপ, সমস্ত আসুরিক ভাব হরণ হইয়া-(হরণ হয় বলিয়া স্থির প্রাণকে হরি কহা যায়)—আত্মনন্দে প্র—প্রকৃষ্টরূপে, হ্লাদ—আহ্লাদিত অবস্থা হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে প্রহ্লাদ কহা হইয়া থাকে। উপরে হরি শব্দে বলা হইয়াছে, হৃ—রুদ্ররূপে যিনি বিশ্বকে সংহরণ করেন, তিনিই হরি পদবাচ্য। রুদ্র প্রাণকেই কহা যায়, "য রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ যিনিই রুদ্র তিনি নিশ্চিতই প্রাণ। অর্থাৎ অন্তকালে প্রাণ রুদ্ররূপে (শ্লেষ্মাভাবে) হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে, সাধারণ কথায় লোকে বলিয়া থাকে যে "ওগো গলা ঘড় ঘড় করিতেছে, আর দেরী নাই" অর্থাৎ শ্লেষ্মা (কফ্) রূপে প্রাণই এই জীবদেহকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাই প্রাণের সংহার মূর্ত্তি। প্রাণকর্তৃক সৃষ্টি, স্থিতি, পালন চলিতেছে।

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকোযোহি হরিস্তেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

জীবের জীবনরূপ প্রাণ হরি পদবাচ্য জানিবে। এই প্রাণকৃষ্ণ বা জীবন হরিতে প্রহ্লাদ তন্ময় হওয়ায় প্রহ্লাদের আসুরিক ভাবাপন্ন পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক তিনি নানা রকম যন্ত্রণা পাওয়াও ভীত হন নাই বা সাধন হইতে বিরত হন নাই। পুত্রের সাধন কার্য্যে সহায়তা না করিয়া যে পিতা নিজ পুত্রের সাধন কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি নাম মাত্র পিতা পদবাচ্য—হিরণ্যকশিপুর ন্যায় দৈত্য বিশেষ। সুতরাং সেরূপ পিতার বাক্য লঙ্ঘন ভয়ে সাধন হইতে বিরত হওয়া চাহি না। প্রহ্লাদও তাহা হন নাই। বর্তমানে এইরূপ পিতার অভাব নাই এবং ষণ্ডামার্কের পাঠশালার মতন পাঠশালারও অভাব নাই। যাহা হউক শিশুবোধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করিলাম। এক্ষণে তোমার খোকাকে শিশুবোধ পাঠ করাইবার যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অপর পুস্তকও পাঠ করাইতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই কারণ তোমার অনভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিতে আমি ইচ্ছুক নহি জানিবে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আধুনিক শিক্ষা

মা বলিলেন, আমার প্রথমতঃ বক্তব্য বিষয় ইহাই জানিবেন যে, আমি আপনার মতের বিরুদ্ধে বা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বয়ঙ্কৃত ভাবে কোন কার্য্য করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহি, ইহা স্থির ও নিশ্চয় জানিবেন। খোকার বিদ্যা অভ্যাস সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নাই, আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে তাহাই করিবেন। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, আমি ইচ্ছা করিয়া খোকার জীবন আসুরিক ভাবে পরিণত করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহি জানিবেন। খোকার যাহাতে আত্মরতি বৃদ্ধি পায়, স্বধর্ম (আত্মধর্ম) পালন করিয়া চরিত্রবান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখা নিতান্ত কর্তব্য। তাহার পর চরিত্রবান হইয়া খোকা যদি ইচ্ছা করে বা আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে নানা রকম ভাষা শিক্ষা করিতে পারে বা আপনি শিক্ষা করাইতে পারেন, তাহাতে আমার অনিচ্ছার কোন কারণ নাই। বর্তমান পশুভাবের ও আসুরিক ভাবের অভিনয় প্রত্যেক সংসারেই প্রায় প্রবল স্রোতে চলিতেছে, খোকা স্বধর্মে রত না থাকিলে খোকাকে পশুভাবের ও আসুরিক ভাবের স্রোত হইতে টানিয়া রাখা দায় হইবে।

পুত্রকে সৎপথে চালিত করা পিতামাতার প্রধান কর্তব্য। যে পিতামাতা তাহা না করেন, সে পিতামাতাকে পুত্রের পরম শত্রুই বিবেচনা করা উচিত। বর্তমানে প্রায়শঃ পিতামাতারা আসুরিক ভাবের মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ পুত্রকে বিদ্যাবোধে অবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, ছেলে যাহাতে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা হইলেই হইল। অনেকে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্থোর্জ্জন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ কি সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন? সকলকে ত' পেটে ভাতার চাকরের ন্যায় দেখা যায়। পোড়া পেটে যাহা খাইতেছেন, আর মোটামুটি না হয় ভাল রকম দু'খানা বস্ত্র বা দু'টা জামা, পা জামা পরিতেছেন, ইহা ছাড়া আর সুখলাভ কি হইয়াছে? সুখ ত' মনে, সেই সংসারের ভাবনাতেই যদি সর্বদা কাতর থাকে, তাহা হইলে সুখ কোথায়? না মনের সুখ আছে, না শরীরের সুখ আছে, গুরুতর পরিশ্রম করিয়া এক রকম ব্যাধি মন্দির হইয়া রহিয়াছে, কোন ক্রমে কষ্টে শ্রেষ্টে দিন কাটাইতেছেন মাত্র। মনের

শান্তি কিছুমাত্র নাই, যিনি যত উপার্জ্জনক্ষম হউন না কেন, মৃত্যুভয় সর্বদা মনে আসিয়া শরীর, মন আরও দুর্বল করিয়া দিতেছে। ভাল জিনিষ পেটে হজম হয় না, অম্বল ডিসপেপ্সিয়া, ধাতুরোগ প্রভৃতি একটা না একটা লাগিয়া আছে, শরীরের সেবা করিতে করিতেই প্রাণান্ত হইতেছে, ইহা কি আধুনিক শিক্ষার ফল নহে? নিজে কষ্ট পাইতেছি ইহা দেখিয়াও নিজ প্রাণতুল্য পুত্রগণকে কি সুখের আশায় অবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছি তাহা সকলে বুঝিয়াও বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাকেন।

যাহা হউক আমি খোকাকে এরূপ কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জনক্ষম করাইতে চাহি না, আমার সেরূপ ইচ্ছাও নাই। আরও বিশেষ, আমি আপনার কৃপায় শিশুবোধ সম্বন্ধে যাহা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার বিশ্বাস, শিশুবোধের বিষয়গুলি খোকা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহার পর আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী খোকাকে শিক্ষা দিবেন, ইহাই আপনার চরণে দাসীর এক মাত্র নিবেদন। খোকার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আর আমার কোন বক্তব্য নাই। মা নিজ বক্তব্য শেষ করিয়া বাবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। বাবা পুনরায় কহিলেন, তোমার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমি খোকাকে যে কেবল মাত্র বাহ্যিক শিশুবোধ মাত্র পাঠ করাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিব তাহা নহে। প্রথমে শিশুবোধ পড়াইয়া দেখি, খোকা কিরূপভাবে তাহা গ্রহণ করে, ইহা দেখিয়া খোকার স্মৃতিশক্তি ও ধারণা শক্তি কিরূপ আছে তাহাও বুঝিতে পারিব, তাহার পর উহার পক্ষে যাহা উপযুক্ত হইবে তাহাই করা যাইবে। উপস্থিত আজ যেরূপভাবে বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় কয়েক ঘণ্টায় মুখস্ত করিয়া স্মরণ রাখিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় খোকার স্মরণশক্তি খুব প্রবল আছে। যাহা হউক, আমি এক্ষণে বহির্বাটিতে যাইতেছি, সন্ধ্যার পর খোকাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।

ইহা বলিয়া বাবা বাহিরে যাইতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় আমার জ্যাঠাইমা ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বাবাকে বলিতে লাগিলেন যে, ঠাকুরপো! তুমি না কি খোকাকে শিশুবোধ পাঠ করাইতে আরম্ভ করিয়াছ?

বাবা। কেন তাহাতে কি আমার কিছু অধর্ম করা হইয়াছে?

জ্যাঠাইমা। না আমি তাহা বলিতেছি না, যে তোমার অধর্ম করা হইয়াছে, তবে আজকাল বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ভাল ভাল পুস্তক সব ছাপা হওয়ায় শিশুবোধের ন্যায় পুরান পুস্তক এখন আর কেহই আপন আপন ছেলেদিগকে পড়ায় না; আমার তোমার একটি মাত্র খোকা, আর নাই, পুরান কত কালের পচা গল্পের বই কেন তুমি পড়াবে? তোমার পয়সারও যখন অভাব নাই।

বাবা। আচ্ছা বড় বৌ! ভাল, ভাল বই তুমি কাহাকে বল? বইখানি দেখিতে বেশ রংচঙ্গে ভাল মলাটে বাঁধান এইরূপ ভাবের বই হলেই কি ভাল বই হইল, না আর কিছু ভাল তোমার জানা আছে?

জ্যাঠাইমা। আজকাল নতুন ধরণের অনেক ভাল গল্পের পুস্তক সব ছাপা হইয়াছে পুরাতন পচা গল্পের পুস্তক পড়াবার প্রয়োজন কি? নূতন রকম পুস্তক খোকা পাঠ করে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

বাবা। দেখ বড় বৌ। পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে এবং উহার অন্ন সহজে পরিপাক হয়। নতুন চালের অন্ন সহজে পরিপাক হয় না, শেষে অজীর্ণ রোগও হইতে পারে; বর্ত্তমানে যে তাহা না হইতেছে তাহাও নহে। আমরা যেরূপ প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের চাল, চলন, ধরণ সেইরূপ প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া চাহি; শিক্ষা দীক্ষাও আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া উচিত, তাহা না হইলেই কুফল ফলিয়া থাকে, নুতন চালে চলায় কুফল ফলিতে বাকিও আর নাই। আমাদের পুরান চাল, চলন, আচার, ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া নূতন চাল, চলন, আচার, ব্যবহার গ্রহণ করায় আমাদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে কি হ্রাস পাইতেছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, পুরাতন চাল চলন ভাল কি নুতন চাল ভাল। বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের লোকের নগদ টাকার আমদানী বেশী হইয়াছে ব্যতীত কম হয় নাই, অথচ ভদ্র সমাজের মধ্যে প্রায় অনাটন সকলেরই দেখা যায়। এই সংসারের অনাটন ভাব হইবার কারণ কি? নূতন শিক্ষাই কি ইহার প্রধান কারণ নহে? নূতন শিক্ষার ফলে বিলাসিতার স্রোত প্রবল ভাবে চলার দরুণ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ভাবে হওয়ায় প্রায় সকল ঘরেই অনাটন ভাব চলিতেছে। অনাবশ্যক ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে যাইলেই কষ্ট ব্যতীত সুখ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। বর্তমানে অনাবশ্যক ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে প্রায় সকলেই ব্যগ্র। সুতরাং পরিণামে কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে পরিণামদর্শী লোকের বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে, পরিণামদর্শিতা না থাকায় সকল সংসারেই কষ্টের অবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে।

যদি বল নূতন শিক্ষার দোষে সংসারে অনাটন হয় নাই—সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী দুর্ম্মূল্য হওয়ায় আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়াতে সংসারের অনাটন বশতঃ অনেকের কষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাহা নহে, যেমত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, তেমনি লোকের আয়ও বাড়িয়াছে, পূর্বে কি সাধারণ লোকের বর্তমানের মতন আয় ছিল? পূর্বে বর্তমানের আয় অপেক্ষায় অতি সামান্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে সাধারণের আর্থিক উন্নতি হইলেও বিলাসিতা এবং অমিতব্যয়িতা দোষে আয় অপেক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ বা তাহার অধিক ব্যয়ও সাধারণে করিয়া থাকে, এই কারণেই লোকের অনাটন বেশী হইতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি নহে। দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হওয়া ভাল ব্যতীত মন্দ নহে, কারণ সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইলে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। মনে কর, যখন আট আনা মণ ধানের দর ছিল, তখন চাষাদের কি আয়

ছিল? তাহাদের ঘরে সোণা রূপার জিনিষ মোটেই ছিল না, এমন কি একটা পিতলের কলস ও তাহাদের জুটীত না, মেটে কলসেতে জল আনিতে এবং মেটে পাথরে ভাত খাইত। এক্ষণে চাষাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়া দেখিয়া আইস, সকলের ঘরেই পিতলের বাসন, পিতলের ঘড়া, দু'খানা চা'র খানা রূপার অলঙ্কারও দেখিতে পাইবে। তবে চাষাদের ঘরে যাহারা একটু একটু করিয়া বাবু সাজিতেছে, চাষ বাসের কার্য্য ছাড়িয়া নূতন ধরণের শিক্ষা করিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতেছে, তাহাদেরই কষ্টের সূত্রপাত হইতেছে।

পূর্বে ভদ্র সমাজের ভিতর সকলেরই জোত আবাদ থাকায় সংসারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই কৃষিকার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সংসারের খরচ হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহা বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিত মাত্র পাইতেন। কারণ তখন ক্ষেত্রজাত শস্য এবং তরিতরকারীর মূল্য সামান্য থাকায় অর্থ বেশী পাইতেন না। পূর্বে সকল ভদ্র লোকেরই জমি জমা থাকায় সকলেই স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাহার পর ক্রমশঃ ভদ্র সমাজে নূতন শিক্ষার চালচলন প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকলেই বাবু হইতে লাগিলেন, এবং নিজে শিক্ষিতাভিমানে চাষবাসের কার্য্য দেখিতে লজ্জাবোধ করিয়া আপন জমি, জমা সব প্রজাবিলি করিয়া দিয়া চাকরীতে বা ওকালতিতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। নিজেও চাকরীতে প্রবেশ করিলেন, উপরন্তু নিজেদের পুত্র ও আত্মীয়গণ যে যেখানে আছে সকলকেই চাকরীতে প্রবেশ করাইলেন, ইহারা যদি পরিণামদর্শী হইতেন, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি সকলেই চাকরীতে প্রবেশ করিতেন না, অন্ততঃ দুই একজনকে যদি নিজ জোত আবাদের কার্য্য দেখিবার জন্য রাখিতেন, তাহা হইলে আর কাহারও কষ্টের কারণ হইত না। প্রথমতঃ দু'দশ জন লোককে চাকরী বা ওকালতি দ্বারা উন্নতি করিতে দেখিয়া সকলেই আগ্রহের সহিত নূতন ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশ শুদ্ধ লোক চাকরী ও ওকালতির জন্য নূতন ধরণের বাবু সাজিয়া পুরাতন চাল চলন, আচার ব্যবহার ছাড়িয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত হইলেন। চাকরী করা যে কতদূর সম্মানের বিষয় তাহা নূতন শিক্ষার ফলে বোধ করিবার ক্ষমতা নাই। পাঁচ টাকা মাহিনার খানসামা ও চাকর, আর দু'শত টাকা মাহিনার চাকরও চাকরের আর মনিবের নিকট সম্মান কি!

দেশ শুদ্ধ লোক যদি চাকরী বা ওকালতি করে, তাহা হইলে এত চাকুরীই বা আসে কোথা হইতে? তবে আমাদের রাজ অনুগ্রহেও রাজার জাতির অনুগ্রহে অনেক রকম চাকরীর সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক চাকুরীর জন্য লালায়িত হইলে সকলের চাকুরী জুটিতে পারে না। আরও বিশেষ, আমি যদি একজন সরকার আট টাকা মাসিক বেতনে পাই, তাহা হইলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে লোক কেন

রাখিব? সকলেই ত' আপন আপন সুবিধা দেখিয়া থাকে, বর্তমানে চাকরের সংখ্যা বেশী হওয়ায় বেতনও সকলের কমিয়া যাইতেছে। কারণ লোকের অভাব নাই। বাজারে একটা মুটে খুঁজিলে অনেক সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু কোন জায়গায় একটা কেরাণীগিরি বা অপর কোন কার্য্য খালি হইলে অমনি দু'শত খানা দরখাস্ত পড়িয়া থাকে। যাহার লোক দরকার তিনিও অল্প বেতনে লোক পাইলেন। সুতরাং চাকুরী পেশার দুরবস্থার শেষ সীমা বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের শিক্ষাভিমান থাকায় কৃষিকর্ম করিতে লজ্জাবোধ হয়। নূতন শিক্ষার প্রভাবে শরীরেও বল নাই, নানা রকম ব্যাধিও প্রায় সকলের আছে, তাহার পর বাবু সাজাও একেবারে বন্ধ করিতে পারেন না, এদিকে নিজের কাপড় জামা কষ্টের সহিত করিতে হয়, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নয়!

একটা কথায় বলে পহিলে ক্ষেতি, দুসরে বাণ, নিঘিন সেবা ভিখ্ নিনান্।" অর্থাৎ কৃষিকর্ম চাষবাস প্রথম স্থানীয়; দ্বিতীয় বাণিজ্য কর্ম, কৃষিকর্ম করিতে করিতে বাণিজ্যও চলিয়া থাকে, দাসত্ব (সেবা) নিতান্ত ঘৃণার বিষয় এবং ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা নিন্দনীয় কার্য্য। দাসত্ব বৃত্তিতে সুখ প্রাপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহার পর এই নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে বাণিজ্য ব্যবসা করিবেন, সে রাস্তাও ইহাদের বাবুয়ানা বিলাসিতার দরুণ বন্ধ। ব্যবসাও গরিবানা চাল ব্যতীত প্রথমে চলিতে পারে না। বাবুরা টানা পাখার হাওয়া খাওয়ার অভ্যাসে, দোকানে বসিয়া কেবল সোডাওয়াটার বরফ খাইবেন, ইহাতে কি আর ব্যবসা চলে, মাথার ঘাম পায়ে আসিয়া না পড়িলে ব্যবসা চলে না, এরূপ কষ্ট সহিষ্ণুতা বাবুদের নাই, সুতরাং বাবুদের দ্বারা ব্যবসাও চলিতে পারে না, শেষে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে মূলধন শেষ হইলে ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া কপাল চাপড়াইতে হয়। আরও বিশেষ আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যে যেরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে এমন ব্যবসা খুব বিরল যাহাতে শতকরা বারো টাকা সুদ পোষায়; সুতরাং যাহারা দেনা করিয়া দশ টাকা বা বারো টাকা সুদে টাকা ধার করিয়া ব্যবসা করিতে যান, পরিণামে তাঁহাদের ভিতর অনেকেরই প্রায় বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। তবে আজকাল নূতন শিক্ষার ফলে একটা ব্যবসা বেশ চলিতেছে, যাঁহারা প্রথমে নিজ সম্পত্তি সকল বেনামি করিয়া অপরের নামে রাখিয়া অর্থ লইয়া খুব আড়ম্বরের সহিত ব্যবসা করিয়া মহাজনগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া কার্ত্তিকের টুপি গণেশের মাথায় গণেশের টুপি কার্ত্তিকের মাথায় দিতেছেন, অথচ লাভের উপর তত' দৃষ্টি রাখেন না, তাহার পর যখন দেখিলেন বাহিরের মহাজনদিগের বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা বা ততোধিক টাকা নিজের হাতে আসিয়াছে, তখন অমনি দোকানের গণেশ উল্টাইয়া দেউলিয়া হইয়াছি বলিয়া

পাওনাদারদিগকে বলিয়া থাকেন, আমার আর কিছুই নাই, সব লোকসান হইয়া গিয়াছে। অবশ্য বলা বাহুল্য ইহাদের খাতা-পত্র প্রায় দু'রকম ভাবে থাকে। তাহার ইন্‌সল্‌ভেন্সি অপিসে দরখাস্ত করিয়া ৫০ টাকা জমা দিয়া নিজেকে ঋণ দায় হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্ত হন, দেনার দায়ে জেল খাটিতে হয় না এবং পাওনাদারদিগকে ঋণের টাকাও দিতে হয় না। তাহার পর পোড়ার মুখ লইয়া বাবুরা ভদ্র সমাজে যাইতেও কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ প্রকৃতির মানবকে কি শিক্ষিত বলিবে?

যাঁহারা উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ওকালতি ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহাদের আর ব্যবসা চলে না। প্রথমতঃ জন কতক লোককে অতুল পয়সা রোজগার করিতে দেখিয়া দলে দলে সব উকিল হইতে লাগিলেন। দেশশুদ্ধ লোক যদি উকিল হয়, তাহা হইলে মক্কেল হয় কে? বর্তমানে আয় সেরূপ নাই। কাহার কাহার এমন কষ্ট আছে যে, আদালতে যাইবার ট্রাম ভাড়া বা অপর গাড়ি ভাড়ার পয়সা জোটে না। অভাবে অভুক্ত ছারপোকার ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে। অপরা বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা মানবের মানবত্ব নষ্ট হইয়া পশুভাবের আধিক্য বশতঃ পরস্পরে হিংসা দ্বেষে জড়ীভূত হয়। পরস্পর পরস্পরকে নষ্ট করিয়া নিজের আধিপত্য বজায় করিতে চেষ্টিত হইয়া থাকে। যেমত কোন একটা পশু, অপর একটা পশু আহার করিতেছে দেখিলে অমনি তাহার আহারীয় বস্তু কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে কামড়া কামড়ি গুঁতো গুঁতি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, বর্তমান মানবের মধ্যেও নিজ নিজ কার্য্যের প্রতিযোগিতায় পশুভাবের অভিনয় হইয়া থাকে। যেখানে পশুভাবের অভিনয় বর্তমান থাকে, সেখানে সুখের আশা করাও কি বিড়ম্বনার বিষয় নহে? মনে কর একজন প্রধান শাস্ত্রীয় পণ্ডিত তিনি নিজের প্রাধান্য দেখাইয়া অপর একজন প্রধান পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া প্রধান বিদায়টা পাইবার জন্য কি প্রয়াস পান না? প্রধান বিদায়টা যাহাতে নিজের আয়ত্ত হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে তর্করূপ লড়াই করিয়া একজন আর একজনকে পরাস্ত করিতেছেন, ইহা কি পশুভাবের অভিনয় নহে? ইহাই কি পণ্ডিত কার্য্য? এইরূপ যাঁহাদের ব্যবসা তাঁহাদিগকে কি পণ্ডিত কহিতে হইবে? তাঁহারা মানব হইয়াও যখন পশুবৎ কার্য্য করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণা করা উচিত। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" সেই বিনয় বা বিনীত ভাব যখন নাই, তখন মানব কোথায়? পশু অপেক্ষাও অধম মনে করিতে হইবে। একজন পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজায়গায় চাকুরী করিতেছেন, আমি সেই স্থলে যাইয়া তাহার কার্য্যটি লইবার প্রত্যাশায় যদি মনিবকে বলি উক্ত কার্য্যটি আমায় দিন, আমি পঁচিশ টাকায় করিব, ইহাতে কি পশুভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না? এইরূপ প্রায়শঃ প্রত্যেক চাকুরীস্থলে একজন আর একজনের

চাকুরিটী লইবার জন্য মনিবের নিকট তাহার নিন্দা, কার্য্যে অপুটতা ইত্যাদি বলিতে প্রায় কেহই কুণ্ঠিত হইতেছে না, ইহা কি পশুভাবের অভিনয় নহে? একজন উকিল অপর একজন উকিলের নামে মক্কেলের নিকট নিজ প্রতিপত্তি জাহির করিবার জন্য বলিতেছেন, অমুক উকিল, ও কি জানে, ও লোকটা বরাতে খায় ইত্যাদি শ্লেষ বাক্য বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, ইহা কি পশুভাবের অভিনয় নহে! এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারূপ করিয়া নিজের সাধুতা দেখাইয়া থাকেন, ইহা কি বিদ্যা শিক্ষার ফল? অপরা বিদ্যার মহিমায় এইরূপ চারিদিকে পশু ভাবের ও আসুরিক ভাবের বিস্তার হইয়া দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে, লোক সকল অল্পায়ু হইতেছে। মনের আনন্দ ধনী থেকে গরীব পর্য্যন্ত কাহারও নাই, এখন যদি সকলে পুরাতন চাল, চলন, আচার, ব্যবহার পালন করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইয়া পুনরায় সুখশান্তি আসিতে পারে, নচেৎ নহে। যদি আর্য্যভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ পদে পদে যেমন অমঙ্গল সহ্য করিতে হইতেছে, কালে ইহা অপেক্ষাও বেশী অমঙ্গলকর বিষয় সহ্য করিতে হইবে। আর্য্যভাব রক্ষা করিতে হইবে। আর্য্যভাব রক্ষা করিতে হইলে, বর্তমানে যিনি যাহা করিতেছেন, তাহা যতটা পর্য্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব, সেই ভাবে বর্তমান কার্য্য রক্ষার সহিত অর্ন্তবাহ্য ভাবে কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য বজায় করিয়া চলা উচিত। নিজ কৃষিকর্ম হইতে উৎপন্ন ফসল আপন আপন সংসারের খরচ মতন তিন বৎসর চলিতে পারে এমত পরিমাণে রাখিয়া বাকি ফসল বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য করা উচিত।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষি ও বাণিজ্য

পূর্বে বলা হইয়াছে, অর্ন্তবাহ্য ভাবে কৃষিকর্ম করিতে হইবে। অন্তর্ভাবের কৃষিকর্মই পরাবিদ্যার অভ্যাস। এই অর্ন্তমুখীন কৃষিকর্ম রূপ করা বিদ্যা অভ্যাসের সহিত রাজভাষা যিনি যতটুকু পরিমাণে অভ্যাস করিতে পারেন, তিনি তাহা করিতে পারেন। তবে পরা বিদ্যায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে তাহার পর রাজভাষা বা অপর ভাষা শিক্ষা করিলে কোন রকম অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পরা বিদ্যাবলে মনের অভাব বোধ কম হইয়া আসিলে পশুভাবের হ্রাস আপনিই হইয়া আসিবে। পশুভাবের হ্রাস হইলে বিষয়াসক্ত ভাবও কমিয়া গিয়া অনাবশ্যক বিষয়ের ইচ্ছা কমিয়া আসিবে।

অনাবশ্যক ইচ্ছা কমিয়া আসিলে তাহার সহিত বিলাসিতার স্রোত না কমিয়া থাকিতে পারে না, বিলাসিতা কমিলেই বাবুয়ানার ভাবও কমিবে। বাবুয়ানা কমিলে তখন কার্য্যপটুতাও আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই বাবুয়ানাই আমাদের পরম শত্রু, কারণ মনে বাবুয়ানা ভাব থাকায়, আমরা অনেক সময় অনেক আবশ্যকীয় কার্য্য করিতেও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইয়া থাকি।

বাবুয়ানা না থাকিলে আমরা নিজের আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইব না। আমরা যখন আর্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন আর্য্যোচিত চাল, চলন, আচার, ব্যবহার সমস্তই রক্ষা করিয়া চলা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক জানিবে। আমি যে পুরাতন চাল, চলন, আচার, ব্যবহারের কথা বলিতেছি, তাহা মুসলমান রাজত্বের এবং বৌদ্ধ আধিপত্যের ও পূর্ব্বের রীতি, নীতি, চাল, চলন, আচার, ব্যবহার যাহা ছিল, তাহাই পুনরায় অবলম্বন করিতে বলিতেছি। আমি আর্য্যদিগের পরবর্তী সময়ের চাল, চলন, আচার, ব্যবহারের অনুকরণ করিতে বলিতেছি না, ইহা স্মরণ রাখিও। কারণ আর্য্যদিগের পরবর্তী সময় হইতে অর্থাৎ বৌদ্ধদের আধিপত্যকাল হইতে আমাদের (অর্থাৎ আর্য্যদের) অধঃপতন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ রাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের (আর্য্যদিগের) আচার ব্যবহার, ধর্ম, চাল চলন, সবই ক্রমশঃ পরিবর্তন হইতে হইতে বর্তমানে অনার্য্যভাব প্রায় ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনার্য্যের ভাব বর্তমান থাকিতে আমাদের অভাবের ভাব এবং অনটনের ভাব কিছুতেই হ্রাস পাইবে না।

আমাদের বর্তমান উদার প্রকৃতি রাজা এবং রাজার স্বদেশবাসীরা আমাদের উন্নতির পথ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, তবে আমরা বুদ্ধির দোষে তাহাদের উদারভাবের ভাব বিপরীতভাবে বুঝিয়া নানাভাবে কষ্ট পাইতেছি। তাঁহারা আমাদের দেশের রাস্তা ঘাট প্রশস্ত করিয়া দেওয়ায় আমাদের যাতায়াতের আর কোন কষ্ট নাই এবং ব্যবসায়ীগণের মালপত্র একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইবারও কোন কষ্ট নাই, বর্তমানে কোন স্থানই আর দূরত্ব বলিয়া বোধ হয় না এবং রাস্তা ঘাটে দস্যু তস্করের হস্তে প্রাণও আর প্রায় কাহাকে দিতে হয় না। বর্তমান রাজার পূর্ব রাজার সময়ে আমরা আমাদের ধর্ম, স্ত্রী, রত্ন ইত্যাদি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতাম। জোর জবরদস্তি পূর্বক আমাদের স্ত্রী জাতির সতীত্ব নষ্ট করিয়া, গৃহস্থের স্ত্রী ও রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। ধর্মের বিষয় আর কি কহিব, তাহা বলিতেও কষ্ট হয়। মনে কর, পত্রের পশ্চাতে যে সাড়ে চুয়াত্তরের অঙ্ক লিখিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ বোধ হয় তোমার জানা নাই, কোন সময়ে কোন যবন রাজা ব্রাহ্মণগণের ধর্ম নষ্ট করিয়া সাড়ে চুয়াত্তর মণ যজ্ঞোপবিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাতে অনুমান কর তাহা হইলে কত লোকের ধর্ম নষ্ট হইয়াছিল। যবনগণ আমাদের প্রাচীন দেবালয় ধ্বংস করিয়া

তৎ তৎস্থানে কীর্ত্তি স্তম্ভরূপ মসজীদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা কি অত্যাচার নহে? ইহা অপেক্ষা আর কি অত্যাচার সম্ভবপর হইতে পারে? এখন ত' ঐ অত্যাচার আর নাই। যবন রাজার রাজত্বকালে ধর্ম, স্ত্রী ও রত্নাদি সমস্তই লুণ্ঠিত হইত। বৌদ্ধ রাজত্বকালে ধর্ম সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ হইয়া আর্য্যভাব নষ্ট হইয়াছিল।

কোন কোন হিন্দু রাজত্বেও ধন রত্নাদি লুট পাট হইত। মনে কর তোমরা যে এখনও ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার সময় সুর করিয়া বলিয়া থাক, "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে, বর্গী এলো দেশে"। এই বর্গী কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় জান না; বর্গীরা আমাদের দেশের লোককে লাঞ্ছিত করিতে ত্রুটি করে নাই। বর্গী মহারাষ্ট্র দেশের রাজার সৈন্যদের উপাধি বিশেষ। ইহারা হিন্দু। আমাদের দেশের লোকসমূহ বর্গীর আগমণ বার্তা শ্রবণ মাত্র প্রাণভয়ে স্ত্রী, পুত্র, রত্ন লইয়া নিবিড় জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিত। বর্তমানে আর কাহাকেও স্ত্রী, পুত্র লইয়া বনে বা জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হয় না। ইহা কি সুখের বিষয় নহে? বর্গীরা উৎপাত এত ছিল যে, ছোট ছোট ছেলেদিগকে শান্ত করিবার জন্য বর্গীর নাম করিয়া ভয় দেখান হইত। বর্তমান রাজার রাজত্বকালের পূর্বে, আমাদের দেশের লোককে সদা সর্বদা ভয়ের সহিত কালযাপন করিতে হইত, অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া জঙ্গলময় স্থানে জাতি, কূল, ধন, প্রাণ রক্ষার জন্য বসবাস করিতেন; সে ভয় এখন আর কাহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেমন ইহাত তুমি স্বীকার কর যে, পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে স্ত্রী, পুত্র ধন রক্ষার সম্বন্ধে আমাদের আর কোন আশঙ্কার বিষয় নাই?

আমার বাবা এই বলিয়া চুপ করিলে পর, জ্যাঠাইমা বলিলেন, ঠাকুরপো, এই সকল বিষয়ে আমাদের আর কোন রকম আশঙ্কা প্রায় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু দেশের লোক সকল পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, দেশের সমস্ত ফসল রপ্তানী হইয়া বিদেশে যাওয়ায় দ্রব্য সামগ্রী অগ্নিমূল্য হইয়া যাইতেছে। রাজা আমাদের দেশের উৎপন্ন ফসল বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের আহারীয় দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হইয়া যায় এবং সকলে পেট ভরিয়া খাইতেও পায়।

বাবা বলিলেন, দেখ বড়বৌ, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য নহে, তোমার বুঝিবার দোষে ঐরূপ বলিতেছ। বাণিজ্য ব্যতীত দেশের কখনও উন্নতি হইতে পারে না, পূর্বে তোমাকে এ সম্বন্ধে বলিয়াছি। তুমি আমার কথা সম্যক্ বুঝিতে না পারায় পুনরায় তাহা উত্থাপন করিতেছ। আমি পূর্বে বলিয়াছি, প্রত্যেক গৃহস্থ তিনি যে কোন বর্ণ হউন না কেন, প্রত্যেকেরই কৃষি কর্ম থাকা উচিত এবং কৃষিজাত ফসল নিজ নিজ সংসারের আবশ্যক মত তিন বৎসরের খরচ চলিতে পারে, এমত ফসল-সমূহ গোলাজাত করিয়া রাখা কর্তব্য। কারণ যদি মধ্যে দুই এক বৎসর অজন্মা হয়, তাহা হইলে নিজ নিজ সংসারের আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইবে না, তবে তিন

বৎসরের অধিক সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত নিজ নিজ সংসারের খরচ চলিতে পারে এমনভাবে ধান্য ফসল গোলাজাত করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের আর অজন্মা জনিত কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে না। ধান্য ফসলটা গোলাজাত করিয়া রাখিয়া তাহার পর অপর অপর ফসলও কিছু কিছু গোলাজাত করা চাহি। আপন আপন সংসারের খরচ মতন আহারীয় ফসল গোলাজাত করিয়া উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য; নচেৎ যে ফসল জন্মিল তাহা সমস্তই বিক্রয় করিয়া শেষে বাজার হইতে কিনিয়া খাওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? এরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থই পরিণামে কষ্ট পাইয়া থাকে। দেশের ফসল যাহা রপ্তানী হইয়া যাইতেছে তাহাত' আর কেহ অমনি লইয়া যাইতেছে না। বরং চতুর্গুণ মূল্য দিয়া এখানকার উৎপন্ন ফসল ক্রেতারা লইয়া যাইতেছে; এই বেশী মূল্য স্বরূপ অর্থটা যাহা গৃহস্থেরা পাইতেছে ইহাতে গৃহস্থেরা বা চাষারা কি লাভবান হইতেছে না? তবে এখনকার লোকের বুদ্ধি কম থাকায় তাহারা নিজেদের সংসারের খরচের মতন ফসল না রাখিয়া সমস্তই বিক্রয় করিয়া শেষে কষ্ট পাইয়া থাকে।

আজকাল এই পাটের চাষ করায় চাষারা যথেষ্ট লাভবান হইয়া থাকে। এইরূপ সংসারের আবশ্যকীয় ফসল উৎপন্নের সহিত পাট শণ ইত্যাদি যখন যে ফসলের মূল্য বেশী হইবে, সেই সকল ফসলও উৎপন্ন করা চাহি। তাহাতে অনেক লাভ হইয়া থাকে। রপ্তানি বন্ধ হইলে আদান প্রদান বন্ধ হইয়া অর্থাগম কমিয়া যাইবে সুতরাং রপ্তানির কার্য্য একেবারে বন্ধ হওয়া উচিত নহে জানিবে। তাহাতে ক্ষতি ব্যতীত দেশের লাভ নাই। আপন আপন সংসারের আবশ্যকীয় আহারের দ্রব্যাদি যদি আমাদের গৃহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে রপ্তানির দ্বারা আমাদের কোন রকম ক্ষতি সম্ভবপর হইতে পারে কি? বরং সকলেই আপন আপন কৃষিজাত ফসল বিক্রয় করিয়া কালে ধনবান হওয়াই সম্ভবপর। অন্ততঃ নিজেদের সংসারের আহারীয় দ্রব্যের যে অনাটন হইবে না ইহা ত' ঠিক। তাহার পর চাকুরী হউক, বা ওকালতি হউক, অথবা বাণিজ্য হউক, যাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। চাকুরী বা ওকালতিতে কি বেশী অর্থাগম হইতে পারে? কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে তুলনায় অকিঞ্চিতকর মাত্র। অপরা বিদ্যা শিক্ষায় যখন একমাত্র লক্ষ্য অর্থাগম করা, এমত স্থলে কৃষি বা বাণিজ্য শিক্ষা দ্বারা যাঁহারা বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন, তাঁহাদের তুলনায় চাকুরী ওকালতি বা ব্যারিষ্টারী ব্যবসা কিছুই নহে।

আজকাল যে আমাদের দেশে একটি বৈশ্য জাতি আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহাদের দেশে এখন প্রায় অনেকের কৃষিকর্ম আছে। ইঁহারা অগ্রসেন রাজার বংশধর বলিয়া শুনা যায়, অগ্রসেন নিজের সামর্থ দ্বারা রাজা হন, ইহার পূর্বে এই বংশে কেহ রাজা ছিল না। এই অগ্রসেন রাজা কর্তৃক আগ্রা নগরী এককালে

স্থাপিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, অগ্রসেন রাজা নাগ রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এই জন্য এই জাতির মধ্যে সর্প হিংসা প্রায় অনেকে করেন না। এবং অপর কোন জীব জন্তুর হিংসাও করেন না। এই জাতিরা আপনাকে আগরওয়ালা বণিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা ভয়ানক পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু জাতি এবং ভয়ানক অধ্যবসায় বিশিষ্ট, অর্থাৎ নিজেদের বাণিজ্য কর্ম নির্বাহ বিষয় অবিচলিত উৎসাহ ও দৃঢ়তাভাবে লাগিয়া থাকে শীঘ্র পশ্চাৎপদ হয় না। এই জাতিরা প্রায় অপর জাতির দাসত্ব করে না, ইহারা আমাদের দেশে সাধারণের নিকট মাড়োয়ারি বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের বাহ্যিক আচারে কোন কোন বিষয় এখনও প্রায় অনার্য্যভাব প্রবেশ করে নাই তবে সম্যক আর্য্যভাব নাই। ধর্ম সম্বন্ধে পূর্বতন আর্য্যগণের অনুষ্ঠিত, অন্তঃকৃষি কর্মরূপ পরাবিদ্যা হইতে এই জাতিরা বিচ্যুত হওয়ায় ইঁহাদের মধ্যে নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের অভিনয় প্রায়শঃ হইতে দেখা যায়। এই জাতিরা রাজভাষা বা অপর কোন ভাষা প্রায়শঃ শিক্ষা করে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা প্রায়ই সকলে অতুল ধনী। এমন কি অপরে রাজভাষা বা অপর ভাষা শিক্ষা করিয়া যে পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, ইহারা তাহা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু পরা বিদ্যার অভ্যাস ইহাদের না থাকায় ইহাদের মধ্যে পশুভাবের অভাব নাই এবং পরাবিদ্যার অভাব হেতু আজকাল বাবুয়ানা, বিলাসিতাও এই জাতির মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ইহার ফলে আরও পাঁচ ছয় পুরুষবাদে এই জাতির অবস্থা নিম্নগামী হওয়া খুব সম্ভব। তবে এখন হইতে সাবধান হইলে অধোগতি নাও হইতে পারে। ভাষা শিক্ষা ব্যতীতও অতুল অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে, তাহাই তোমাকে দেখান আমার প্রধান উদ্দেশ্য থাকায়, মাড়োয়ারি জাতির কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে তোমায় দেখাইলাম। নচেৎ মাড়োয়ারি জাতির ইতিহাস আমার বলা উদ্দেশ্য নহে জানিবে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য পশুভাব রহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে যাহাতে জীবিকা নির্বাহ হয়, তাহাই মানবগণের একমাত্র কর্তব্য। একারণ পরাবিদ্যা স্বরূপ অন্তঃকৃষিকর্মের সহিত বহিঃ কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া মানবগণ মনের শান্তিলাভ করিয়া অনায়াসে সুখলাভ করিতে পারে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবৎ কৃপায় ভারতবর্ষে প্রায়শঃ অনুর্বরা ভূমি নাই, ভারতবর্ষের সমস্তই প্রায় উর্বরা ভূমি। এখানকার ভূমি স্বর্ণভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ভারতবাসীদের অন্নাভাব হইয়া থাকে ইহা শুনিলেও কষ্ট হয়। কারণ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের অন্নাভাব হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া জানিবে। তবে যে অন্নাভাব হইয়া থাকে, তাহা ভারতবাসীদের বুদ্ধির দোষেই হইয়া থাকে এবং বর্তমানে সকলেই প্রায় অনার্য্য ভাবে চালিত হওয়ায় অন্নাভাব ঘটিয়াছে, ইহাও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।

ভগবানের অভিপ্রেত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতভূমি এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর গুরু স্থানীয় ছিল সমগ্র পৃথিবীর লোক পশুভাব উচ্ছেদ মানসে পরাবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভারতে আগমণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। আজ সেই ভারত সন্তানগণ পশুভাবে আক্রান্ত হইয়া ঐহিক সুখের লালসায় মত্ত হইয়া, পারলৌকিক কর্ম একেবারে বিস্মরণ হইয়া যাওয়ায় অন্নাভাবের প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ ভারতবাসীদের অন্নাভাব হইতে পারে না, এই ভারতবর্ষ একাই সমগ্র পৃথিবীকে বিনামূল্যে আহারীয় দ্রব্য দিতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীস্থ লোক সমূহকে বিনামূল্যে অন্নাদি দিয়াও ভারতবর্ষের অন্নাভাব হইতে পারে না। এমত স্থলে ভারতবাসীর অন্নাভাব হইয়াছে, ইহা কি হাস্যকর বিষয় নহে? ভারতের সমস্ত ভূমিই প্রায় উর্বরা, ইহা পূর্বে বলিয়াছি, ভারতবর্ষের ভূমিতে নানারকম সারের প্রয়োজন নাই। পচা গোবরই যথেষ্ট, কেবল একটু জলের প্রয়োজন। জমি যত উপর্য্যুপরি কর্ষণ করা হইবে, ততই জমির উর্বরা শক্তি বাড়িবে। প্রথমে একবার জমিকে কর্ষণ করিয়া তাহার পর দু'তিন দিন সেই জমিকে রৌদ্র খাওয়াইয়া আবার তাহাকে কর্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ উপর্য্যুপরি ক্ষেত্র কর্ষণদ্বারা যখন দেখা যাইবে জমিতে আর ঢেলা নাই, এবং মাটি বেশ হালকা হইয়াছে, তাহার পর উপযুক্ত সময়ে বীজ করা উচিত, জমির পাট করাই প্রথমতঃ আবশ্যক। তাহার পর রবি ফসল হইলে আবশ্যক মতন সেচন করা কর্তব্য; রবি ফসলে বেশী জলের আবশ্যক করে না। রবি ফসলের ভিতর সরিষা, বুট, প্রভৃতিতে জলের আবশ্যক হইয়া থাকে। আবশ্যক মতন পচা গোবরের সার দিতে পারিলে রবি ফসল অধিক জন্মিয়া থাকে। সারের অভাব হইলে, জমিতে বেশী চাষ দিয়া, মাটিকে যত ওলট পালট করা যাইবে, ততই জমির উর্বরা শক্তি বাড়িয়া যাইবে, সারের অভাব জনিত ফসল খারাপ বা কম হইবে না, তবে পচা গোবরের সার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে ফসল আরও বেশী পাওয়া যায়। আবার বেশী সার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে ফসল আরও বেশী পাওয়া যায়। আবার বেশী সার দেওয়াও ঠিক নহে। এইরূপ ভাবে আমাদের দেশে যদি সকল বর্ণ বা জাতির পূর্বের মতন কৃষিজীবি হইতে পারেন, তাহা হইলে কাহার অর্থেরও অভাব হয় না এবং অন্নেরও অভাব হয় না। ইহা না করিয়া শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা করিব, বা রাজনৈতিক চর্চা করিব, তাহাকে কাহার পেট ভরে না, বরং নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া দেশের লোক সাধারণের নানাপ্রকার কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, যেমন হইতেছে।

রাজনৈতিক চর্চা করা ইহা রাজা এবং রাজার পরিষদবর্গের শোভা পায়। প্রজার মঙ্গলের জন্য এবং রাজারও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি চর্চ্চা করা, রাজা বা রাজপরিষদগণের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। এই রাজনৈতিক চর্চ্চা করা প্রজাসাধারণের কর্তব্য

নহে। রাজা বা রাজপরিষদেরা প্রজাসাধারণের পিতামাতা স্বরূপ। আমরা যেন নিজ পিতামাতার নিকট আদর যত্ন পাইয়া থাকি, তদ্রূপ আমরা সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণ হইলে রাজাও আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া এবং আমাদের গুণে সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রবৎ স্নেহ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নচেৎ কেবল রাজার নিকট নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধনং দেহি রাজ্যং দেহি করিলে, রাজা এত ধন বা কোথায় পাইবেন যে, প্রত্যেককেই ধন বা রাজ্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা যেমন ভগবৎ সাধন করিতে যাইলে নিষ্কামভাবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সাধন করিয়া থাকি, তদ্রূপ রাজাকে বা রাজপরিষদ বর্গকে নবরূপে ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া অন্তর্বাহ্য কৃষিকর্ম করিতে করিতে, নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের কোন বিষয়ের অভাব যদি জ্ঞাত করাই, তাহা হইলে অভাব সঙ্গত হইলে রাজাও তদ্বিষয়ে আমাদের অভাব দূর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহাও নিশ্চয় জানিবে।

ভগবান পরমাত্মা সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, আমাদের অন্তরের ভাব তিনি সমস্তই অবগত আছেন এবং রাজা বা রাজপরিষদগণের দেহেতেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। আমাদের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তদ্বিষয়ে পরমাত্মাই আমাদের অনুকুলে রাজা বা রাজ পরিষদবর্গের মন চালিত করিয়া দিবেন, নচেৎ পরমাত্মার নিকট বা রাজা ও রাজ পরিষদবর্গের নিকট, উগ্রভাব ধারণ করিলে আমাদের ঐহিকেও সুখ নাই, পরলোকেও সুখ নাই, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। সমস্ত দেহেই আত্মনারায়ণ প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই আত্মরূপী প্রাণকে অন্তর্কৃষিকর্মে দ্বারা শান্ত করিতে পারিলে, আমি একদিন জগতের সমস্ত জীবকেই আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইতে দেখিব। অতএব অন্তর্বাহ্য কৃষিকর্মের জন্য মানোনিবেশ করিয়া তাহাকেই জীবন উৎসর্গ করাই কর্তব্য। ইহা সকলেরই করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে, অপর আর একটি জাতি আছেন, ইঁহারা বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করিয়া থাকেন, ইঁহাদের উপাধি ভুঁইহার বাভন। এই জাতির মধ্যে বড় বড় রাজাও আছেন, ইঁহাদের প্রধান কার্য্য কৃষিকর্ম। ইঁহাদের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী, তবে অন্তর্কৃষিরূপ পরাবিদ্যার চর্চ্চা প্রায় নাই। একারণ পশুভাবের নীতি ইঁহাদের মধ্যে যে নাই তাহা নহে, ভুঁইহার বাভন জাতিরা বাহ্য কৃষিকর্ম করার দরুণ অন্নাভাব প্রায় কাহারও নাই এবং অর্থের বড় অভাব নাই। সাধারণঃ বাবুয়ানা ইহাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না, এমন কি ইঁহাদের দেখিলে মনে হইবে যে, লোকটা হয়ত একটা সামান্য লোক। পরিধেয় বসন খানি মলিন, কেবল গাত্রের জামাটী ও মস্তকের পাকড়িটী সামান্য পরিষ্কার থাকে, অথচ ইহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, নিজের পাকড়ির মধ্যে লক্ষাধিক টাকার নোট রাখিয়া সামান্য ভাবে কোন মূল্যবান জমিদারী, বা বিষয় নিলাম খরিদ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়া

থাকে। ইহারা কৃষিকর্ম দ্বারা অতুল অর্থের অধিকারী হইয়াও সামান্য দীনভাবে থাকে। ইহাদের গৃহে অন্নাভাব, অর্থকষ্ট বা কোন দ্রব্যের অভাব নাই। তবে ফোতোবাবু সাজিয়া ইহারা বেড়ায় না। ইহারা পরিশ্রমী ও বলবান; ক্ষেত্রে সকল রকম ফসল উৎপন্ন করিয়া থাকে। বাড়ীতে ঘৃত দুগ্ধের অভাব নাই, তিন চার বৎসর ক্রমান্বয়ে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অজন্মা হইলেও ইহাদের অন্নাভাব জনিত কষ্ট হয় না। ইহারা প্রায় অপর জাতির দাসত্ব করে না।

মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা হওয়াটাও অস্বাভাবিক নহে, তাহা হইয়াই থাকে, পুরাকালে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হইলেও তখন কাহারও অন্নাভাব হইত না। কারণ পূর্বে অনেকে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে, এমন ভাবে ধান্য ফসল গোলাজাত করিয়া রাখিতেন। এখন যেমন লোভের বশীভূত হইয়া নিজের সংসারের আবশ্যক মত ফসল না রাখিয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া দেয়, পূর্বে তাহা ছিল না। সুতরাং বর্তমানের চাষারা এক বৎসর অজন্মা হইলেই হাহাকার করিয়া থাকে। ইহারা নিজের বুদ্ধির দোষেই কষ্ট পায়। কৃষি কর্মের নীতি অনুযায়ী চলিলে প্রায় কাহারও অন্নভাব বা অর্থাভাব হইতে পারে না ইহা ধ্রুব সত্য। তবে যিনি বাবুয়ানা বা বিলাসিতা করিবেন, তাঁহার অর্থাভাব বা অন্নাভাব চিরদিনই থাকিবে।

জীব মাত্রেরই সুখের ইচ্ছা করিয়া থাকে, ইহাতে আর বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈত নাই। যদি সুখই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হইল, তাহা হইলে আমার ইহা কি দেখা কর্তব্য নহে যে, আমি অপরা বিদ্যারূপ ভাষা শিক্ষা দ্বারা এ পর্য্যন্ত কি নির্মল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। অর্থের দ্বারায় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না মনের সুখই সুখ পদবাচ্য। অপরাবিদ্যার সাহায্যে আমি এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই নির্মল সুখ প্রাপ্ত হই নাই এবং অপরা কেহও যে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। কারণ বর্তমান মনের চঞ্চলতা এবং বিষয়াসক্ত ভাব থাকিতে মনের সুখ কখন হইতে পারে না ইহা ধ্রুব সত্য। এমত স্থলে আমি যদি আমার বর্তমান জীবনে অপরা বিদ্যার সাহায্যে কোন রকম স্থায়ী সুখ না পাইলাম, তাহা হইলে পর জীবনে যাহাতে আমি প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হই, তাহার চেষ্টা করা কি আমার কর্তব্য নহে? ইহা যে নিতান্ত কর্তব্য তাহাকে আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতদ্বৈত থাকিতে পারে না। আমার পরজন্ম বা পর জীবনই আমার পুত্র, কারণ পতি নিজ ভার্য্যাতে উপগত হইয়া অর্থাৎ পতি শুক্ররূপে (শুক্রই প্রাণের বীজরূপ, শুক্রধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ") কুক্ষিগত হইয়া, কালে পতিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এ কারণ ভার্য্যাকে জায়া কহা যায়। এমত স্থলে আমার পরজন্মই পুত্র এবং পুত্রের পূর্বজন্মই পিতা। এখন মনে কর, আমি আমার এই বর্তমান জন্মে যদি অপরা বিদ্যার দ্বারায় সুখ প্রাপ্ত না হইয়া থাকি, তবে আমার পুত্রকে আমি কোন সাহসে অপরা বিদ্যার অভ্যাস

করাই। আমার যখন অপরা বিদ্যার অভ্যাসে বর্তমান জন্মটা সদা অশান্তিতেই কাটিতেছে, এমত স্থলে আমার পরজন্মটা নষ্ট করি কেন? আমার পরজন্ম রূপ পুত্রকে অপরাবিদ্যা শিক্ষা করাইলেই আমার বর্তমানেও যাহা, আর পর জন্মেও তাহাই হইবে এবং এইরূপ জন্মজন্মান্তরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ করিয়া একেবারে অধোগতি হইয়া নানাকষ্টের কারণ হইবে, যেমত বর্তমানে সকলের হইতেছে। এইরূপেরই বংশপরম্পরায় অবিদ্যাবশে ক্রমাবণতি ঘটিয়া সকল বংশই প্রায় মলিন ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। একারণ আমার চেষ্টা যাহাতে আবার ক্রমোন্নতি লাভ হয়।

বংশ অবিদ্যাগত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া আত্মাবনতি হইয়া নীচ বর্ণ সকল উৎপন্ন হইয়া বংশের এক দেশের অধোগতি হইয়া থাকে। একারণ পিতামাতার আত্মোন্নতি করিয়া আপন আপন পরজন্মরূপ পুত্রকে পরাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কি নিতান্ত কর্তব্য কর্ম নহে! আপন আপন জীবনটা পর্য্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বিষয় ভোগ করিয়া কি সুখ শান্তি আমার লাভ হইয়াছে। বরং ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় আমার কষ্টের পর কষ্ট, জ্বালার বৃদ্ধি ব্যতীত কম নাই, এমন অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখের জন্য আমার জীবনটাকে অশান্তিময় করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? আরও বিশেষ পরাবিদ্যার অভ্যাস করিতে হইলে যে, আমাকে সংসার বা স্ত্রীপুত্র অর্থাদি বিসর্জন দিতে হইবে তাহাও নহে। তবে বর্তমানে অবিদ্যাগত হইয়া সংসার আশ্রমে কার্য্য করাতে জ্বালা পাইতেছি, ইহার উল্টা করিয়া আপনাতে আপনি থাকিয়া সমস্তই করা উচিত। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই একমাত্র সংসারের উদ্দেশ্য নহে। নিজ প্রাণে আসক্তির সহিত লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত বিষয়াদি কার্য্য করা উচিত। বর্তমানে ইহা কঠিন মনে হইতে পারে সত্য, তবে তত কঠিন নহে। বরং সমস্ত কার্য্য আমরা যাহ যাহা করিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা আরও সহজ। যেমন আমরা দক্ষিণ হস্তদ্বারা আহারাদি করিতেছি, ইহা আমাদের পক্ষে সহজ বোধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উপস্থিত যদি বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের কার্য্য সমুদায় করি, তাহা হইলে কয়েকদিন কিছু বাধ-বাধ ভাব আসা সম্ভব। কিন্তু কয়েকদিন অভ্যাস করিলে বাম হস্তও দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া যাইবে। তখন দক্ষিণ হস্তই বাম হস্তের ন্যায় বোধ হইবে। এইরূপে বর্তমানে আমরা অবিদ্যাভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করিতেছি। অবিদ্যা ভাবকেই আমাদের ভাল লাগিতেছে এবং তাহার বিপরীত করিতে আমাদের সাহসে কুলাইতেছে না। মনে হইবে যে, হয়ত পরাবিদ্যা ভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করিলে আমাদের সমূহ অসুবিধা হইবে বা সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ সমূহ কষ্টকরও নহে এবং ত্যাগও কিছু করিতে হইবে না। কষ্টের মধ্যে বাম হস্তের দ্বারা আহারাদি করিতে গেলে প্রথমে যেমন হইয়া থাকে তদ্রূপ। অভ্যাস দ্বারা পরাবিদ্যা-ভাবে থাকিয়া কার্য্য করিতে অবিদ্যা

ভাবে ঘৃণাবোধ হইলে তখন মনে চির শান্তি বিরাজ করিবে। এইরূপ অবস্থা কি আমার প্রার্থনীয় নহে? আমার বিশ্বাস, ইহা জীব মাত্রেই প্রার্থনীয় বিষয় হওয়া উচিত। আধি বা শারীরিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে চাহেন না কে, তাহা বলিতে পারি না, সুতরাং পূর্বোক্ত ভাব সকলেরই প্রার্থনীয়। আমার উক্ত অবস্থা প্রার্থনীয় থাকায় আমি খোকার (পুত্রের) হৃদয়ে ধর্মভাব অঙ্কুরিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে দেব চরিত্র পাঠ করাইতে অভিলাষী হইয়া নিজ খোকাকে শিশুবোধ পাঠ করাইতে চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে কি আমি কোন ঘৃণিত কার্য্যের উৎসাহ দিতেছি বলিয়া তুমি মনে কর?

জ্যাঠাইমা কহিলেন, না, না ঠাকুর পো আমি তাহা বলিতেছি না যে, তুমি খোকাকে শিশুবোধ পাঠ করাইয়া ঘৃণিত বিষয়ের উৎসাহ দিতেছ। তবে আমি এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলাম যে, আজকাল নতুন গ্রন্থকারগণ, অনেক সংগ্রহ পুস্তক নূতন আকারে ছাপাইয়াছেন, সেই সব পুস্তক সকলেই আপন আপন পুত্রদিগকে পাঠ করাইতেছে দেখিয়া থাকি, সেই কারণে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল আমাদের খোকাকেও আজকালের ধরণের পুস্তক পাঠ করান কেন বা না হয়। কিন্তু এক্ষণে তোমার নিকট হইতে যে সব সারগর্ভ কথা শুনিলাম, তাহাতে আমার আর তোমার মতের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। কি জান ঠাকুর পো, আমরা ভাই মেয়ে মানুষ, অত বুঝি না, ছেলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দশ টাকা উপার্জন করিতে পারিলেই মনে করিয়া থাকি, আমার ছেলের মতন গুণধর পুত্র আর নাই। পুত্রের চরিত্র দোষ থাকিলেও আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না, বরং লোকের নিকট পুত্রের সুখ্যাতি করিয়া থাকি। বিশেষ আমাদের অবিদ্যাতে বিদ্যাবোধ থাকায়, ছেলে যে মহাপণ্ডিত হইয়াছে তাহাই লোক সমাজে বলিয়া থাকি, ছেলে নেশাই করুক আর রাত্রে ঘরেই না থাকুক, তাহা দোষের মধ্যেই গণনা করি না। আরও বিশেষ ছেলের ভয়েও কিছু বলিতে সাহস হয় না, পাছে ছেলে রাগ করিয়া সংসারের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেয়, এ ভয়েও অনেকে আপন আপন পুত্রকে কোন কথা বলিতে সাহস করে না। আবার আজকালের বধুমাতারাও আপন আপন স্বামীকে বশীভূত রাখিবার জন্য স্বামীর আচার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট না হইয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বামীর মতানুযায়ী ভাবে চলিতে থাকে। একারণ আজকালের ছেলেরা পিতামাতার বাধ্য না হইয়া, নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসের মতন প্রায় হইয়া থাকে এবং প্রায়শঃ স্ত্রীবুদ্ধির মতে চলিয়া থাকে। স্ত্রী ও আজকালের মেয়ে, পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকিতে চাহে না, সর্বদাই স্বাধীনভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে, শেষে সময় বুঝিয়া একেবারে স্বামীকে লইয়া পৃথক হইয়া পড়ে। অবশ্য পিতা বর্তমানে কেহই পৃথক হইতে চাহে না, কারণ পিতা বর্তমানে ত' আর পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী নহে। সুতরাং পিতা বর্তমানে পৃথক হইবার নামটি পর্য্যন্ত

করে না। কোন গতিকে কাদায় গুণ ফেলিয়া এক রকম ভাবে থাকে। তাহার পর যেই পিতার মৃত্যু হয়, অমনি স্ত্রীর পরামর্শে আপন আপন ভ্রাতাদের সহিত পৃথক হইয়া পড়ে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর পুত্রবধুও নিজ শাশুড়িকে মনে করিয়া থাকেন, এ মাগী যেন একটা ক্রীতদাসী এবং শাশুড়ীর সম্বন্ধে নানারকম গ্লানি আপন স্বামীর নিকট চুপি চুপি কান ভাঙ্গাইয়া মা'র প্রতি অভক্তি জন্মাইয়া দিয়া থ.কে। পুত্রও গুদাম ভাড়া স্বরূপ মা'কে যৎকিঞ্চিৎ লোক লজ্জা ভয়ে খোরাকি দিয়া মাতৃঋণ হইতে উদ্ধার হইলাম মনে করিয়া থাকে। মন্দমতি স্ত্রীগণ সর্বাপেক্ষাও ভয়ানক খল স্বভাব। এ সম্বন্ধে তোমার দাদা একটি বেশ শ্লোক বলিয়া থাকেন, আমার ভাই মনে আসিতেছে না। আরও বিশেষ, শ্লোক, অত মনেও থাকে না।

বাবা বলিলেন, বড়বৌ, আমি যে শ্লোক জানি, শ্লোকটি,—

"অপূর্ব রসনা ব্যালী খলানন বিলেশয়া।
কর্ণমূলে দশত্যেকং হরতান্যস্য জীবিতম্"।।

অর্থাৎ খলের জিহ্বারূপ সর্প, খলের মুখ বিবরে থাকিয়া একজনের কর্ণমূলে পরনিন্দারূপ দংশন করিয়া অপরের জীবন নষ্ট করিয়া থাকে।

জ্যাঠাইমা। ঠাকুরপো, আজকালকার বধূরা প্রায় তদ্রূপ হইয়াছে, আপন আপন স্বামীর কানে কানে চুপি চুপি নানা কথা লাগাইয়া স্বামীর ভ্রাতাগণের বা পরস্পরের সহিত বিরোধ জন্মাইয়া শেষে বাঁটয়ারার মামলায় উকিল কৌন্সিলির খরচার দায়ে, সর্বস্বান্তও অনেককে হইতে দেখা যায়। ঠাকুরপো! তুমি যাহা যাহা বলিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে অবিদ্যা ভাবাপন্ন হওয়ায় এরূপ ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অদ্য তোমার নিকট হইতে দেশের লোকের হিতকরকার্য্য সকলের কথা শুনিয়া আমারও অনেক বিষয়ের ভুল ধারণা যাহা ছিল, তাহা দূর হইল। জ্যাঠাইমা আমার মা'কে বলিলেন, ছোট বউ, ঠাকুরপোর কথা শুনিয়া বুঝিলাম উহার মতই ঠিক। এক্ষণে আমি আসি, বেলাও আর নাই। ইহা বলিয়া জ্যাঠাইমা চলিয়া গেলেন, বাবাও বাহিরে গেলেন। আমি আমার মা'র কাছে বসিয়া অ, আ, ক, খ সব পড়িতে লাগিলাম, মা আমার কাছে বসিয়া সব শুনিতে লাগিলেন। আজ আমার নূতন বই পাইয়া পড়িবার খুব আটা লাগিয়া গিয়াছে, বই পড়া আর কিছুতেই বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, মনে বেশ আনন্দও হইতেছে। বেলা প্রায় অবসান দেখিয়া মা আমাকে বলিলেন, এখন পড়া থাক, আমি গা হাত ধুইতে যাইব, তুমিও আমার সঙ্গে চল। তৎপরে আমি মা'র সঙ্গে নীচে আসিয়া গা, হাত, পা ধুইবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মা'র নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা গাত্রধৌত করিয়া আমার গা হাত, পা সব ভিজে গামছা দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া আমকে সঙ্গে লইয়া উপরে আসিয়া নিজে কাপড় ছাড়িয়া তাহার পর আমায় কাপড় জামা পরাইয়া দিয়া আমাকে ঝির সঙ্গে বাবার

কাছে বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন; ঝি আমাকে বাবার নিকটে দিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

বাবার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা, যাহা যাহা তোমাকে পড়াইয়াছি সব তোমার মনে আছে ত'? আমি বলিলাম, হাঁ বাবা আমার সব মনে আছে। বাবা আমাকে নিকটে বসাইয়া আমার হস্ত হইতে বই লইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বাবার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম, একটিও ভুল হইল না। আমার সব মনে আছে দেখিয়া বাবা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্নেহ বাক্যে বলিলেন, খোকা তোমার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এইরূপ নিত্য পাঠ সকল অভ্যাস করিতে পারিলে, আমি তোমাকে বড় ভাল বাসিব। আমি তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যে সকল সৎ উপদেশ দিব, তুমি তাহা সাধ্যমত পালন করিবার চেষ্টা করিবে। তোমার মনে যখন যাহা ভাল বা মন্দ বিষয় উদয় হইবে, তাহা তুমি লজ্জা না করিয়া সমস্তই আমাকে বলিবে, আমার নিকট তোমার মনোভাব প্রকাশ করিলে আমি তোমাকে যাহা বাস্তবিক ভাল তাহা বলিয়া দিব। আর তোমার মনের মধ্যে যে সকল মন্দভাব উদয় হইবে তাহা আমাকে লজ্জা বা ভয় না করিয়া অকপটে কহিবে, কোন কথা গোপন করিবে না। পিতামাতার নিকট মনোভাব গোপন করাকে পাপ বলিয়া মনে করিবে, কোন কথা গোপন করিতে গেলেই মিথ্যা কথা কহা হইবে। মিথ্যা কথা কহা পাপ বলিয়া জানিবে, সত্যের অপলাপকেই মিথ্যা বলে। অর্থাৎ মনের প্রকৃত ভাবটি গোপন করিয়া অপর যাহা তাহা কোন একটা বলাকে মিথ্যা কথা বলে। অতএব তুমি তাহা কদাচ করিবে না।

আমি। না বাবা আমি তাহা কদাচ বলিব না। পিতামাতার নিকটে যদি আমি আমার মনোভাব গোপন করি, তাহা হইলে আমি সৎশিক্ষা লাভ, জগতে আর কার কাছে আশা করিতে পারি। পিতামাতার মতন হিতকারী বন্ধুই বা জগতে আর কে আছে? মনে যে সকল বৃত্তি উদয় হইবে, সে সকল পিতামাতার নিকট প্রকাশ করিলে, পিতামাতা দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণের উপায় বলিয়া দিবেন। কিন্তু অপরকে বলিলে তাহারা আমায় দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণের উপায় না বলিয়া আমাকে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপায় বলিয়া দিবে। বাবা! আমি মা'র নিকট হইতে শুনিয়া অবধি, এই বাক্যগুলিকে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, এবং প্রতিদিন একবার করিয়া স্মরণ করিয়া থাকি। বাবা! আপনিও অদ্য আমাকে যাহা যাহা বলিলেন, তাহাও আমি স্মরণ করিয়া রাখিব। ইহা নিশ্চয়ই ভুলিব না জানিবেন। ইহা যাহাতে পালন করিতে পারি তাহা প্রাণপণে স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিব এবং না পারিলে তাহাও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বলিব।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রী শিক্ষা

আমি বাবাকে এই কথা বলিতেছি এমন সময় চারজন ভদ্রলোক (বাবু) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নবাগত কয়েকটি বড় বড় খোকাকে আমাদের বাড়ীতে কখন দেখিয়াছি বলিয়া আমার বোধ হইল না। যাহা হউক, বাবা ইঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, মুখুজ্জ্যে মহাশয়, নমস্কার, সব খবর ভাল ত'? মুখুজ্জ্যে মহাশয়ও প্রতি নমস্কার দিয়া বলিলেন, হাঁ সব ভাল বই কি, এক রকম চলিতেছে। বাবা তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত সকলকে বসাইয়া নিজেও বসিলেন। বলা বাহুল্য নবাগত কয়েকটি খোকা আসিবামাত্র বাবা আপন আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, আমিও বাবার সহিত দাঁড়াইয়া ছিলাম, বাবা পুনরায় বসিলে পর আমিও বাবার নিকটে বসিলাম। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি বোধ হয় আপনার পুত্র? বাবা বলিলেন হাঁ এটি পুত্র। পরে বলিলেন, এই বাবু তিনটির কোন পরিচয় জানিতে পারিলাম না। তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সঙ্গে যে তিনজন বড় বড় খোকা আসিয়াছিলেন, ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। বাবা তাঁহাদের হঠাৎ আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার পরম বন্ধু, ইঁনি সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বক্ষম ইত্যাদি। বাবা সন্তোষ সহকারে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আপনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে যে সকল অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছেন, তাহাতে উনি অলঙ্কারের ভারে ভারি হইয়া না পড়েন। কারণ যাহারা অলঙ্কার প্রিয় তাহাদিগকে অলঙ্কারের গুণে বশীভূত করিয়া তমোরূপ মদভাবে মত্ত করাইয়া থাকে। এ কারণ অলঙ্কারে আসক্ত হওয়া জীব মাত্রেরই উচিত নহে। অবশ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সেরূপ দেখিতেছি না, বাহ্যিক বেশ সদাশয় ভাবই দেখিতেছি। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অলঙ্কার প্রিয়তা ভাব না থাকাই সম্ভব। যাক ওসব কথায় আর কাজ নাই, এক্ষণে আপনাদের আগমণের উদ্দেশ্য জানিতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রকাশ করিলে বড়ই সন্তোষ লাভ করিব।

মুখোপাধ্যায়। স্ত্রীগণের শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, অথচ স্ত্রী-শিক্ষার বিদ্যালয় আমাদের পাড়ায় ছিল না, ইঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

এক্ষণে যাহাতে বিদ্যালয়টির ব্যয় নির্বাহ হইয়া সুচারুরূপে চলিতে পারে, তাহার জন্যই ইঁহারা আপনার দ্বারস্থ হইয়াছেন এবং আমারও উক্ত কার্য্যে সহানুভূতি থাকায় আমিও আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি বিদ্যালয়টির রক্ষার্থে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং বিদ্যালয়টিকে মাসিক বা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বাবা। আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে আমি বড় সন্তোষ লাভ করিলাম, কারণ বালিকাগণের বা স্ত্রীগণের যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তবে আমার জানা আবশ্যক আপনারা বালিকাগণের বা স্ত্রীগণের কিরূপ শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন এবং বালিকা বা স্ত্রীগণের কোন শিক্ষার অভাব আছে এবং যে শিক্ষার অভাব আছে, সেই শিক্ষার অভাব মোচন করিতে যদি আপনারা উদ্যাগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই দেশের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র; তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

মুখোপাধ্যায়। প্রথমে বালিকাগণকে নীতি শিক্ষার সহিত নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা দিব। তাহার পর মধ্য প্রাথমিক, তাহার পর উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ ছাত্র বৃত্তি। তাহার পর ক্রমশঃ মধ্য ইংরাজি পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে উচ্চ শিক্ষায় অর্থাৎ এল, এ, বি, এ. এম. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালকগণ যেমন উচ্চ শিক্ষা লাভে সভা উজ্জ্বল করিয়া থাকে, মহিলাগণও ঐরূপ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া নারী সভা যাহাতে উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হয়েন, তাহাই আমাদের সঙ্কল্প।

বাবা। আপনাদের রুচি অনুযায়ী সাধু উদ্দেশ্য হইলেও আমার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমি জানি আপনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি, আপনার ধন রত্নের অভাব নাই, ইহা কি সত্য নহে?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষণিক চুপ করিয়া স্বগত ভাবিতেছেন, এইবার বুঝি আমার ঘাড়েই বা সব চাপায় এবং যেরূপ ভাবের কথা দেখিতেছি, তাহাতে নিজে কিছু না দিয়া বা কিছু সাহায্য না করিয়া আমার ঘাড়েই বা কাঁঠাল ভাঙ্গে, যাহা হউক সাবধানে কথার উত্তর দিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, না না আমার কি আয় আছে, যা আছে তাহাতে কোন গতিকে সংসারটা চলে, তাহার পর এসব সাধারণের কার্য্য, একজনের দ্বারা সব কুলায় না, তবে আমি যে কিছু সাহায্য করিব না তাহাও নহে, আমার শারীরিক সাহায্যে যাহা হয়, তাহা আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

বাবা। না না, আমার ওকথা বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে, আপনি অর্থ সাহায্য সমস্ত করিবেন না আংশিক ভাবে করিলেন, আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বলিতেছি না, আমার প্রশ্ন কেবল মাত্র আপনার ধন রত্ন কি পরিমাণে আছে, তাহা আপনার নিজ মুখ হইতে শুনিতে চাহিতেছি মাত্র।

মুখোপাধ্যায়। তাহাত' পূর্বেই বলিয়াছি। যাহা সামান্য কিছু আছে, কোন গতিকে চাকরী বা অপর কোন কার্য্য না করিয়া এক রকমে চলিয়া যায়।

বাবা। দেখুন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়! আপনি এখন আপনার রত্নাদি সম্বন্ধে গোপন করিতেছেন, আপনার নিজ রত্ন সম্পত্ত্যাদি কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইহাই অনুমিত হইতেছে।

মুখোপাধ্যায়। দেখুন নিজ সম্পত্ত্যাদি কেহই কাহার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হয়েন না, আমিও একজন সাধারণের মধ্যে; তখন আমার মুখ হইতে ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে প্রকাশ হওয়াটাও সম্ভবপর নহে। আরও বিশেষ ধন রত্ন লোকের প্রকাশ হইলে সকলের চোখ পড়ে, এবং দস্যু তস্করেরা জানিতে পারিলে চুরি যাইবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং সকলে স্ব স্ব ধন রত্ন গোপন ভাবেই রাখিয়া থাকে। কেহ আর সকলের সম্মুখে হাটেবাজারে বাহির করিয়া দেখায় না এবং বলেও না। ইহা লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং সে কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

বাবা। এইবার আমার শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য বিষয় আছে, সেইগুলি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়! আপনিই নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন, "আপনার রত্ন কেহ হাটে বাজারে বা লোকের সম্মুখে বাহির করে না এবং কাহাকে মুখে বলে না যে, আমার ধন রত্ন আছে। কারণ পাছে কেহ অপহরণ করিয়া লয়।" মনে করুন স্ত্রীজাতি মাত্রেই রত্ন স্বরূপা। বিশেষ ভদ্র ও উচ্চ বংশীয়া স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্য মহারত্ন বিশেষ। সাধারণ রত্নাদির যেমন দস্যু তস্করের অভাব নাই, তদ্রূপ স্ত্রী চোরেরও অভাব নাই (স্ত্রীচোর কামুক, লম্পট), এমত স্থলে কোন সাহসে সেই মহারত্নকে ঘরের বাহির করিতে সক্ষম হইতে পারি? তাহার পর দ্বিতীয়তঃ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী দর্শনমাত্রেই অসংযমী পুরুষমাত্রেই চিত্ত অপহৃত হইয়া তদ্দর্শনের জন্য বা তদ্‌লাভের জন্য তাহারা লালায়িত হইয়া থাকে, এবং কন্যাগণেরও তাহাই। অবিবাহিতা কন্যাগণ যাহাকে ইচ্ছা কামনা করিতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে কন্যা কহা যায়। বিদ্যালয়ে নানা রকম পুরুষ দেখিয়া মনের ইচ্ছা বলবৎ হইয়া নানা পুরুষের কামনা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া যায় ও ভবিষ্যতে পিতা মাতা কর্ত্তৃক যখন তাহারা কোন পাত্রের হস্তে অর্পিত হয়, তখন তাহারা অগত্যা উহাতে সম্মত হইয়া চির জীবনটা মনের অসুখে কালযাপন করিয়া থাকে। কারণ উহাদের বহু পুরুষ দর্শন করায় মনের ইচ্ছামত সৎ অসৎ বা নীচ ও উচ্চ বংশীয় না দেখিয়া সৌন্দর্য্যের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গিয়া নিজ কামনা মত পতি না পাইলে মনের ক্ষোভ মনেই থাকিয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার অধিকার এক পিতা, মাতা এবং পতি, তদ্‌ব্যতীত অপর পুরুষের দ্বারা হওয়া উচিত নহে। নারী জাতির শিক্ষা নারীগণের দ্বারাই হওয়া উচিত। তাহা না হইলে মনে মনে ব্যাভিচারগ্রস্ত হইতে হয়। কারণ ছাত্রী বা শিক্ষক উভয়ের কেহই সংযমী নহেন অসংযত চিত্ত ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। তবে রাজ ভয়ে বা

সমাজ ভয়ে কোন কোন বিষয় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, নচেৎ মনে মনে সবই সম্ভব। এক সময় ব্যাসদেব একটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্লোকটি আপন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার অভিপ্রায় করিতেছিলেন। শ্লোকটি এই—

"অবিদ্বাংস মলং লোকে বিদ্বাংস মপি বা পুনঃ।
প্রমদাপ্যুৎ পথং নেতুং কাম ক্রোধ বসানুগং।।

ব্যাসদেব শ্লোকটি রচনা সমাপন করিলে তখন জৈমিনি মুনি কহিলেন, এ শ্লোকটি ঠিক হইল না। কারণ অজ্ঞানী লোকের সম্বন্ধে সবই সম্ভব; কিন্তু বিদ্বাংস মপি অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব বিদ্বাংস মপি এই চরণটা বদলাইয়া দিন্। জৈমিনি ইহা বলায়, ব্যাসদেব বলিলেন, আচ্ছা, এখন ইহা বদলাইব না, পরে না হয় বদলাইয়া দিব।

তাহার পর একদিন রাত্রিকালে খুব ঝড়, শিলা বৃষ্টি, বজ্রপাত হইতেছে এমন সময় ব্যাসদেব স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া জৈমিনির দ্বার দেশে আসিয়া কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, ঘরে কে আছে, আমার জীবন রক্ষা কর, আমি ঝঞ্ঝাবাতে কাতর হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তৎপরে জৈমিনি গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন, একটি রূপ লাবণ্যবতী নব-যৌবনা কামিনী সিক্ত বস্ত্রে দ্বারদেশে শীতার্ত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জৈমিনির একটি মাত্র পর্ণ কুটীর ব্যতীত দ্বিতীয় আর গৃহ নাই। তিনি নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি রমণী আমি পুরুষ, এক গৃহে উভয়ে রাত্রি বাস করা যুক্তি বিরুদ্ধ, অতএব আপনি গৃহের অভ্যন্তরে থাকুন আমি দ্বারদেশে কোন রকমে অবস্থান করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিব। রমণীবেশধারী ব্যাস তাহাতেই সম্মত হইয়া, গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ গৃহের দ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে জৈমিনির সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। জৈমিনির প্রথমেই উক্ত নারীকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিত মন বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্বরণ করিয়া কতক্ষণ রাখিবেন, ক্রমশঃ উক্ত নারীর সহিত আলাপ করিতে করিতে কামোদ্বেগ অসহ্য ভাবে উদ্দীপিত হওয়ায় জৈমিনি নিজ মনোভাব গৃহস্থিত রমণীকে ব্যক্ত করিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে বলিলেন। রমণী তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, তখন জৈমিনি দ্বার খুলিবার মানসে দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। যখন দ্বারে আঘাত করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইলেন, তখন গৃহের চালে উঠিয়া, চালের তৃণপত্র সরাইয়া ফেলিয়া উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ রমণীকে আলিঙ্গন করিবার মানসে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। সেই সময়ে স্ত্রীবেশধারী ব্যাসদেব বলিলেন, কেমন জৈমিনি? আমার—

"অবিদ্বাংস মলং লোকে বিদ্বাংস মপি বা পুনঃ।
প্রমদাপ্যুৎ পথং নেতুং কাম ক্রোধ বসানুগং"।।

এই শ্লোকটিকে কি আর এখন অসম্পূর্ণ বলিবে? জৈমিনি তখন অবনত মস্তকে

নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মনে করুন মুখোপাধ্যায় মহাশয়! জৈমিনি, মীমাংসা দর্শন শাস্ত্র প্রণেতা মুনি। ইঁহার যখন প্রমদা দর্শনে এই গতি হইয়াছিল, তখন বর্তমান কালের ভাষার পণ্ডিতগণ বা বেশধারী সাধুগণ যে বিচলিত হইবেন না, ইহা আশা করিতে পারা যায়?

বর্তমানে গৈরিক বস্ত্র ও জটা ধারণ করিয়া যাহারা সাধুবেশ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কি আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন? কারণ জৈমিনি মুনির তুলনায় ইহারা সামান্য লোক মধ্যে গণ্য, সুতরাং এমত স্থলে স্ত্রী শিক্ষা দিবে কে? একারণ স্ত্রীজাতির শিক্ষার স্থান একমাত্র পিতা, মাতা ও পতি। তদ্ব্যতীত স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্র আর দ্বিতীয় নাই। নারী জাতির প্রমদা নাম হইবার কারণ—প্র—উৎকৃষ্ট, মদ—যাহার দ্বারা মত্ততা জন্মায়—রূপ সৌভাগ্য জনিত গর্ব। অর্থাৎ রূপবতী নারীকে দর্শন করিলে পুরুষগণের মত্ততা জন্মায় বলিয়া কামিনীগণকে প্রমদা বলা হইয়া থাকে। নারীগণ যেমন অসংযমী পুরুষ মাত্রেরই চিত্তহারী, তদ্রূপে পুরুষ মাত্রই অসংযমী স্ত্রীগণের চিত্তহারী। একারণ পরস্পরে একত্র সংমিলিত হইয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহার পর আপনি বলিতেছেন, নারীগণকেও বালকগণের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। বালকগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কয়জন সংযতেন্দ্রিয় হইয়াছে বলিতে পারেন? মনের সংযত ভাব কাহার আছে? উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত বালকগণের মধ্যে সকলেই কি চরিত্রবান্ হইয়াছে আপনি মনে করেন? আমার কিন্তু সে বিশ্বাস নাই। তবে প্রকাশ্যে সকলেই চরিত্রবান্ হইতে পারেন, গোপনে প্রায়ই কলুষিত ভাব থাকা সম্ভব। কারণ কাহারও মনের স্থৈর্য্য ভাব নাই, মনের স্থৈর্য্য ভাবের অভাব হেতু মনের বিষয় ভোগ লালসার নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং লোক লজ্জা ভয়ে বা রাজভয়ে প্রকাশ্যে কোন কার্য্য ঘটে না, গোপনে অন্ততঃ মনে মনে সমস্তই চরিতার্থ হইয়া থাকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়! আপনিও ত' উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি আপনার মনের উপর কি কোন দিন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিয়াছেন? বরং মনই আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। আপনার অনিচ্ছায় কি আপনার মনে সদসৎ কার্য্যের প্রবৃত্তি উদয় হয় না?

মুখোপাধ্যায় মহাশয়। নিয়তই মনে নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে, তবে সকল সময় সকল কার্য্য করিতে সাহসে কুলায় না বলিয়া মনে মনেই মনের কার্য্য হইয়া শেষে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কোনটাই অসত্য নহে। অযৌক্তিকও নহে।

বাবা। দেখুন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, উচ্চ শিক্ষা লাভে যদি আমরাই সংযতেন্দ্রিয় হইতে না পারিয়া থাকি, তাহা হইলে সরলমতি বালিকাগণকে বা স্ত্রীগণকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতে প্রয়াস পাওয়াটা কি বিড়ম্বনার বিষয় নহে?

যে নারী জাতি আত্মরক্ষা করিতে সর্বদা অক্ষম, তাঁহাদিগকে সুরক্ষিতভাবে গৃহে রক্ষা করাটা কি অযৌক্তিক, না গৃহে বাহিরে পশুপক্ষীর ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত? আমার বিবেচনায় জীবদেহে যতকাল পশুভাব বর্তমান থাকিবে, ততকাল ঘৃতকুম্ভসম নারী জাতিকে, জ্বলন্ত অঙ্গার স্বরূপ পরপুরুষের নিকট হইতে যতদূরে রাখা যায়, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। চাণক্যও বলিয়া গিয়াছেন—

"ঘৃত কুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃপুমান্।
তস্মাদ্ঘৃতঞ্চ বর্হ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।।"

অর্থাৎ যুবতী নারী ঘৃতকুম্ভ সমান এবং পুরুষ মাত্রেই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ, একারণ পণ্ডিতগণ এই উভয়কে একত্র স্থাপন করিবেন না। একত্রে রাখা হইলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সমূহ প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। চাণক্য একজন আধুনিক পণ্ডিতের ন্যায় ছিলেন না, তাঁহার বহুদর্শিতারও অভাব ছিল না। তিনি সামান্য শ্লোকের ভিতর রাজনীতি, সমাজনীতি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অকাট্য বিষয়। পূর্বোক্ত ঋষিতুল্য পণ্ডিতগণের নীতিবাক্য সকল রক্ষা না করায় অমাদের দুর্গতিরও অভাব নাই! আজকাল এই চাণক্য শ্লোকের মধ্যে কিছু কিছু অশ্লীলতা বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ পাছে বালকেরা অশ্লীলতা শিক্ষা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয়ের গুণে ছাত্রগণের অশ্লীল বাক্য জানিতে কাহারও বাকি নাই। এমন কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বা গ্রন্থকারগণ যে সকল অশ্লীল বিষয় না জানেন, বালকেরা সকলেই তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ বেশী জানে। কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিলে কন্যাগণেরও তদ্রূপ অশ্লীল বাক্য জানিতে বাকি থাকিবে না। ভিতরে ভিতরে সবই জানিবে বা শিক্ষা পাইবে। আরও বিশেষ সকল জাতির আচার ব্যবহার সমান নহে। বিদ্যালয়ে নানা জাতীয় কন্যাগণের সম্মিলনে আপন আপন জাতীয় আচার ব্যবহার নষ্ট হইয়া যাইবে, বালকগণের দশাও এইরূপ হইয়াছে কন্যাগণকে ঘরের বাহির করিয়া নানারকম আচার ব্যবহার শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? বালকগণের না হয় অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে চলিবে না, অগত্যা দায়ে পড়িয়া করাইতে হয়, কন্যাগণ অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দাসত্ব করিবে না। আমরা ত' দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি, কন্যা বা স্ত্রীগণকেও কি ঐ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে হইবে? ইহা আমাদের দেশের উপযোগী নহে। মনে করুন দু'টা দশটা দেবদেবী বা ভগবানের স্তোত্র পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ বলিতে পারিলেই কি শিক্ষার চরম হইল?

কন্যাগণ যদি বালকগণের ন্যায় বিদ্যালয়ে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীলতা শিক্ষা পায়, তাহা হইলে দু'টা কি দশটা স্তোত্র মুখস্থ করিতে পারিলে আর কি হইবে? স্তোত্র পাঠের দ্বারা কন্যাগণের মনের চঞ্চলতা নিবারণ কখন হইতে পারে না, স্রোত্র পাঠ করান ছলনা মাত্র। ভিতর ভিতর সব অরুচিকর শিক্ষাই লাভ হইবে। কন্যাগণকে কি আপন

আপন বাটীতে সৎনীতি, সদাচার শিক্ষা দেওয়া যায় না? বা দু'একখানা আবশ্যক মত পুস্তক পাঠ করান যায় না? ইহাতে কন্যাগণের পিতামাতারা অনায়াসে বাড়ীতেই শিক্ষা দিতে পারেন, বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া কুশিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে এমন গৃহস্থ বা ধনী লোক অনেক আছেন, যাঁহারা (তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই) আপন আপন কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান না। বিদ্যালয়ে না পাঠানর দরুণ তাঁহাদের কন্যাগণের আচার ব্যবহার সৎশিক্ষার অভাব আছে কি? বরং যে সব কন্যা বিদ্যালয়ে যাইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা শত শত গুণে নম্রতায়, লজ্জাশীলতায়, দয়ায়, আচার ব্যবহারে, সকল রকমেই শ্রেষ্ঠ ব্যতীত কম নহে। বিদ্যালয়ে যাইয়া কন্যাগণও ডেঁপো হইয়া পড়ে এবং বাক্যপটুতা বশতঃ অহঙ্কারী হইয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয় থাকে। এবং গৃহলক্ষ্মী না হইয়া গৃহের অলক্ষ্মী হইয়া পড়েন। কারণ গৃহস্থিত কার্য্য কর্ম্ম করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক হইয়া থাকেন, সদাই বিলাসিতা চরিতার্থে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। যাহা হউক মুখোপাধ্যায় মহাশয়, রুচি সকলের সমান নহে, (ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ)। বর্তমানে স্ত্রী শিক্ষার রুচির স্রোত যেরূপভাবে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা আমার রুচির অনুরূপ নহে। ইহা আমার দোষ হইতে পারে, যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে রুচি অনুরূপ। আমরা আর্য্য বংশীয়, আমাদের আর্য্য রমণীরা আর্য্যকৃত দীক্ষা, শিক্ষা যাহাতে প্রাপ্ত হন তাহা কি আমাদের কর্তব্য নহে? আর্য্য রমণীরা কখনও বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন না, বা বালকগণের ন্যায় গুরুগৃহে যাইয়াও শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহারা আপন আপন মাতা পিতার নিকট সমস্ত শিক্ষাই প্রাপ্ত হইতেন। কোন শিক্ষারই তাঁহাদের অভাব থাকিত না।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বালকগণকে না হয় অগত্যা অর্থাভাব বশতঃ ভ্রান্তভাবে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে, কন্যাগণকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আপন কন্যাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ঘৃণার বিষয়। স্ত্রীগণের উপযোগী শিক্ষায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বর্তমানের শিক্ষা প্রণালী শিক্ষারই উপযোগী নহে। শিক্ষা সৎশিক্ষা হওয়া চাহি। শিক্ষা শব্দের অর্থ অধ্যয়ন বা উপদেশ বা দমন। অধ্যয়ন শব্দে অধি + অয়ন = অধ্যয়ন, অধি—উপরি, অয়ন—অয়, ইন্—গমন করা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা উপরিস্থিতি পরমাত্ম সমীপে গমন করা যায়, তাহার নাম অধ্যয়ন। ইহা অপরাবিদ্যা শিক্ষার দ্বারা হইতে পারে না। তাহার পর উপদেশ শব্দের অর্থও উহাই, উপ-সমীপে বা উপ-উপরি অর্থাৎ উপরোক্ত পরমাত্মার সমীপে গমন করিবার উপায় দেখান, ইহাকেই উপদেশ কহে। তাহার পর শিক্ষা অর্থে দমন করিবার উপায় দেখান, ইহাকেই উপদেশ কহে। তাহার পর শিক্ষা অর্থে দমনও হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আসুরিকভাব সমূহকে দমন করিবার উপায় জানার নামই শিক্ষা। ইহা

অপরাবিদ্যায় অভ্যাসে দমিত হয় না, তাহার প্রমাণ যাঁহারা অপরাবিদ্যার অভ্যাসশীল, তাঁহারা নিজ নিজ মনকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মনোবৃত্তি কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে এবং আপন আপন ইন্দ্রিয় বৃত্তি দমিত হইয়াছে কি, না। দমিত হওয়া অনেক দূরের কথা; বরং সর্বদাই নিজ নিজ মন ইন্দ্রিয় ভোগ লালসাতে লালায়িত, ইহা বলাও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক নিজেত অপরাবিদ্যার অভ্যাসে মজিয়াছি এমত অবস্থায় আর ঘরের অবলাগণকে গৃহের বাহির করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ছলনায় মজাই কেন? বর্তমানে এখনও গৃহে গৃহে কিঞ্চিৎ আচার ব্যবহার ধর্মভাব, স্ত্রীগণের হৃদয়ে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমান অপরাবিদ্যার চর্চা স্ত্রীগণের ভিতর আধিক্যভাবে প্রবেশ করিলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই আচারভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হইয়া অনার্য্য ভাবে পরিণত হইবে। যদিও অনার্য্য ভাব প্রবেশ করিতে বাকি নাই, তত্রাচ যতটা পরিমাণে কমিয়া আইসে তাহারই যত্ন পাওয়া উচিত। স্ত্রীগণের মধ্যে অনার্য্য ভাবের আধিক্য হইবার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। বিশেষ বর্তমানে মানবগণ প্রায়শঃ স্ত্রীগত প্রাণ, এরূপ স্থলে নারীগণকে যদি আর্য্যোচিত কার্য্যের শিক্ষা প্রদান করিয়া আর্য্য ধর্মের তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একদিন নিশ্চয়ই নারীগণের অনুরোধে মানবগণ ও আর্য্য ভাবাপন্ন হইয়া দেশ আর্য্যময় হইতে পারে। নচেৎ নরনারী উভয়েই অবিদ্যা স্রোতে ভাসমান হইয়া আর্য্য বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া আর্য্য শব্দ মাত্র কেবল অভিধান মধ্যেই নিহিত থাকিবে; ইহাপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি আছে বা হইতে পারে, তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের আর্য্য ভূমিতে আর্য্যা রমণীই দেখিতে ইচ্ছা করি, আর্য্যা রমণীদিগকে অনার্য্যা রমণীর ন্যায় হইতে দেখিলেও কষ্ট বোধ হইয়া থাকে।

নারীগণ যাহাতে আত্ম সংযম করিবার শিক্ষা পান, তাহার ব্যবস্থা প্রত্যেক গৃহেই হওয়া উচিত। ইহার জন্য বিদ্যালয়ে যাইবার আবশ্যক হয় না; আত্ম সংযমে অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নারীগণকে ঘরের বাহির করিলে তাহাদের পদে পদে বিপদের আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব নারীরূপা মাতৃগণ যতদিন না সংযতেন্দ্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হন, ততদিন তাঁহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে রক্ষা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের এক মাত্র কর্ত্তব্য। কারণ অসংযতেন্দ্রিয় নর নারী একত্র সম্মিলিত হইলে পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদের মন যে বিচলিত হয় না তাহা বলিতে পারি না। অসংযত মনের কুপ্রবৃত্তির অভাব নাই এবং অসংযত মনের অসাধ্য কর্ম কিছু আছে বলিয়াও বোধ হয় না। এ কারণ অসংযত অবস্থাপন্ন মনকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত নহে। অসংযত মনের কোন একটা সুন্দর বিষয়ের সঙ্গ হইবামাত্র তৎ প্রাপ্তির কামনা স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে, ইহা বর্তমান অসংযত মনের স্বাভাবিক ধর্ম। তবে ভয় প্রযুক্ত অনেক সময় কামনা চরিতার্থ হয় না, কিন্তু অসংযত মন কামনা চরিতার্থের অবসর খুঁজিতেও ত্রুটি করে না, ইহাও অসংযত মনের স্বাভাবিক ধর্ম। উক্ত মন নানাপ্রকার বাহ্যিক

সৎ অসৎ ভাবের ছলনা ও কৌশল করিয়া যখন ব্যর্থ মনোরথ হয় তখন ক্রোধের উদয় হইয়া নানাপ্রকার অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। তবে যেখানে ধনবল ও শারীরিক বলের অভাব এবং সামাজিক ভয় অত্যন্ত বেশী থাকে, তথায় মনের ইচ্ছা মনেই থাকিয়া প্রায় আজীবন মনে মনে অশান্তি ভোগ হইয়া থাকে। আর যেখানে ধনবল, লোকবল ও শারীরিক বল বর্ত্তমান থাকে তথায় আর কামনা চরিতার্থের বেশী বিলম্ব হয় না এবং অনিষ্টেরও অভাব হয় না বরং সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে। এ কারণ অসংযত অবস্থাপন্ন নর ও নারীর একত্রে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়াটা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

মহাত্মা মহম্মদ সাহেব তাঁহার পত্নীকে কোন একজন অন্ধ ব্যক্তিকে নিজ হস্তে করিয়া ভিক্ষাদান করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি অপর পুরুষের সম্মুখে বাহির হইয়া ভিক্ষা দিতেছ, ইহা কি তোমার ন্যায় সঙ্গত কার্য্য হইতেছে? তাহার পত্নী বলিয়াছিলেন, ও ব্যক্তি অন্ধ আমি উহাকে অন্ধ জানিয়া উহার সম্মুখে বহিষ্কৃত হইয়া ভিক্ষা দিয়াছি, ব্যক্তি ও আমাকে দেখিতে পায় নাই। মহাত্মা মহম্মদ সাহেব তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন, ও ব্যক্তি অন্ধ তাহা সত্য, কিন্তু তুমিত' অন্ধ নহ, তুমিত' চক্ষুষ্মান, ও ব্যক্তি তোমাকে দেখে নাই, তুমিত' উহাকে দেখিয়াছ, তোমার মনত' উহাতে আসক্ত হইতে পারে? কারণ মনের অসাধ্য কিছুই নাই, মন অনেক সময় সৌন্দর্য্য বা কোন অঙ্গহীন ইহা না দেখিয়া অন্য পুরুষ বা অন্য নারী দর্শন মাত্রেই তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, ইহা মনের ধর্ম, অতএব তোমার এ কার্য্য করা ভাল হয় নাই। যাহা হইবার তাহা অজ্ঞানতা হেতুই হইয়াছে, তবে আর যেন না হয়।

অসংযতা নারীগণের পুরুষ দর্শন মাত্রেই সেই পুরুষ প্রাপ্তির ইচ্ছা মনে উদয় হইয়া থাকে, মনু ও এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

"নৈতারূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়োসি সংস্থিতিঃ।
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুনানিত্যেব ভুঞ্জতে"।।

ইতি মনু ৯ অঃ ১৪ শ্লোক।

অর্থাৎ নারী জাতিরা সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ, সুরূপ বা কুরূপ ইহাও প্রায় দেখে না, পুরুষ পাইলেই ভোগ ইচ্ছা করিয়া থাকে। ইহা অসংযত নারীগণের পক্ষেই যে বিহিত আছে, তাহা মনে করা চাহি না, অসংযত পশুভাবাপন্ন পুরুষগণের পক্ষেও ঐ ভাব জানিবেন। চিত্ত স্থৈর্য্য না থাকিলে অর্থাৎ মনের সংযত ভাব না থাকিলে ঐ ভাব সকলেতেই সম্ভব; নারী কি আর পুরুষই বা কি, উভয়ের পক্ষেই তুল্য। পুরুষ দর্শন মাত্রেই স্ত্রীগণের ভোগ ইচ্ছা হইবার প্রধান কারণ, চিত্তের সংযত ভাবের অভাব। চিত্ত সংযম না থাকিলে মনের ও সংযমতার অভাব থাকে, মনের বেগ ধারণ করা অসংযত ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অসাধ্য, অন্ততঃ মনে মনে ও সকল কার্য্য

চরিতার্থ করাইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন,—

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতাধিবিকুর্ব্বতে"।
ইতি মনু ৯ অঃ ১৫ শ্লোক।

অর্থাৎ পুরুষ দর্শন মাত্র স্ত্রীদিগের উহার সহিত ক্রীড়ার ইচ্ছা জন্মে ইহা চিত্তের স্থিরতার অভাব হেতুই জন্মিয়া থাকে। একারণ স্ত্রীলোকে স্বভাবতঃ ভর্ত্তৃ বিরুদ্ধে ব্যাভিচার প্রভৃতি কুক্রিয়া করিয়া থাকে। তবে আমি ইহা বলিতেছি না যে, কেবল স্ত্রীলোকগণই এই দোষে দূষিত হইয়া পড়েন। আত্ম সংযমের অভাব হেতু পুরুষও ব্যাভিচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। আত্ম সংযম উভয়েরই আবশ্যক; তাহার মধ্যে নারীগণের কিছু বিশেষ আবশ্যক। কারণ নারীগণ বিবাহের পরে বা বিবাহের পূর্বে অন্য পুরুষে আকৃষ্টা হইলে, পুত্র কন্যা যাহা জন্মিয়া থাকে তাহারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রজ দোষে দূষিত হইয়া পিতার গুণ প্রায় প্রাপ্ত হয় না। এ কারণ কন্যাগণ বাল্যকালে গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া আপন আপন পিতামাতার নিকট হইতে আত্ম সংযমের কৌশল শিক্ষা করিবে। পতিভক্তি, পতি সেবা ও পতি সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায় নিজ মাতার নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করা উচিত। আর গৃহস্থালির সমস্ত কার্য্যাদি ও নিজ মাতার কার্য্য করণ দেখিয়া শিক্ষা করা দরকার এবং অপর বালক বা অপর পুরুষের সহিত খেলা করা একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নারীগণ যাহাতে আর্য্য রীতি অনুযায়ী শাস্ত্র মতের বিরুদ্ধ পথে চালিত না হয়, সেই বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; আমার বিবেচনায় নারীগণকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করাই উচিত। বিদ্যালয়ে যাইয়া বালকগণের ন্যায় শিক্ষা লাভ করা নারীগণের পক্ষে একেবারে পরিত্যজ্য হওয়াই উচিত। ভগবানেরও ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, নরনারী পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে একই প্রকার শিক্ষা লাভ করে। কারণ ভগবান যখন আকার ভেদ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তখন উভয়ের কার্য্যেরও ভেদ রাখা উচিত এবং বিষয় কর্মেরও ভেদ থাকা উচিত। প্রকৃতির কার্য্য, রক্ষা করা, পালন করা, পোষণ ও সেবা করা। পুরুষের কার্য্য জীবিকা নির্বাহ জন্য অর্থাদি যথাসাধ্য সংগ্রহ করা ও মিতব্যয়ীভাবে সংসারে চলা, এবং সংসারের দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করা ও আত্মশুদ্ধি করণ জন্য নিজ পত্নীকে পরাবিদ্যার শিক্ষা দান করা এবং নিজে আত্মশুদ্ধির অবস্থায় থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করা।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নারীজাতির কর্তব্য

নারীগণের, গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য নিজে পর্য্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। পতি যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করিয়া দিবেন, তাহার অপচয় না করিয়া যথাযথ ভাবে রক্ষা করা ও যথাবিধি ব্যয় করা কর্তব্য। পতির সেবা করা এবং পতির সহিত একত্রে আত্ম শুদ্ধির জন্য আত্ম বিদ্যার অভ্যাস শিক্ষা করা কর্তব্য। নিজ পুত্র কন্যাগণকে সৎ শিক্ষার সহিত পালন করা, পতির অবাধ্য না হওয়া, অপ্রিয়বাদিনী না হওয়া, নিজ শ্বশুর শ্বাশুড়ির অবাধ্য না হওয়া, তাঁহাদিগকে পিতামাতার ন্যায় ভাবিয়া তাঁহাদের সেবা করা, দাস দাসীর প্রতি কটু বাক্য না বলা, অতিথি অভ্যাগতকে গুরু বোধ করা, নিজ দেবরকে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিয়া যত্ন করা, এবং নিজ পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার ন্যায় মান্য করা নারীগণের কর্তব্য। পতির ভগ্নীগণকে নিজ ভগ্নী বোধ করা, পতির আত্মীয় স্বজন হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা না করা, পতিকে গুরুর ন্যায় বোধে সর্বদা পতি আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত থাকে; কারণ পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং অর্থাৎ স্ত্রীগণের পতিই একমাত্র গুরু, একারণ পতির ধ্যান মগ্ন থাকিয়া পতির আজ্ঞানুযায়ী সমুদায় কার্য্য করা কর্তব্য। পতির নিকট কোন লোকের অযথা গ্লানি না করা, এবং পতির নিকট কোন মনোভাব গোপন না করা কর্তব্য। পতির নিকট লজ্জা না করা, প্রকাশ্যে পতির নিকট লজ্জা করা, লজ্জাহীনতা যাহাতে প্রকাশ না পায় তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করা, পতি ব্যতীত অপর পুরুষ মাত্রের মুখাবলোকন না করা, অপর পুরুষের পদের হাঁটুর উপর মুখ পর্য্যন্ত অবলোকন না করা, অর্থাৎ অবনত মস্তকে তাহাদের সহিত আবশ্যকমত কথাবার্তা কহা এবং সৎগুণ বিশিষ্ট হওয়া নারীগণের কর্তব্য।

নারীগণ উপরোক্ত গুণে অলঙ্কৃত হইলে সংসার উজ্জ্বল হইয়া থাকে এবং পুত্র কন্যাগণও মাতার কার্য্য দেখিয়া তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, নচেৎ যেমন পিতামাতার কার্য্য দেখিবে পুত্র কন্যাগণও ঠিক তদনুরূপ হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। নারীগণের গুণই সৌন্দর্য্য, যে নারীর উপরোক্ত গুণের অভাব থাকে, সে নারী মাকাল ফলের ন্যায়, কোন কার্য্যই প্রায় লাগে না। নারীগণের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করা বাতুলতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। কারণ নারী জাতির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অস্তিত্ব কতদিন থাকে? যাহাকে লইয়া আজীবন কাটাইতে হইবে তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে

মুগ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। নারীগণের বাহ্যিক বেশ, ভূষা, অলঙ্কারাদির শোভায় মুগ্ধ হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কারণ নারীর প্রথম অলঙ্কার মাত্র পতি; যে নারী নিজ পতিকে অলঙ্কার বোধে ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই জগতে ধন্যাপদবাচ্য, অপরে নহে। বিধবার অঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার থাকিলে তাহার শোভা সধবা নারীর নিকট হেয় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, অতএব নারীগণের সাধারণ অলঙ্কারের প্রতি একেবারেই আসক্তি রাখা চাহি না। তবে নিজ স্বামী যেভাবে তাঁর পত্নীকে সাজাইয়া সন্তুষ্ট হন, পত্নীরও তাহাতেই পরম সন্তোষ বোধ করা চাহি, কারণ পতির সন্তোষেই নারীগণের সন্তোষ।

আত্ম শুদ্ধি সম্পন্ন সংযতেন্দ্রিয় পতি ও উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন নারীর কদাচ অসন্তোষ উৎপাদন করেন না, পরস্পরের গুণের ব্যতিক্রমে নানাপ্রকার গণ্ডগোল ও অশান্তি উপস্থিত হয়। মনে করুন স্বামী সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, সত্ত্বগুণ সম্পন্ন পুরুষের রাজস্তমোগুণের নারীর সহিত পরিণয় হইলে গুণের তারতম্যে প্রথমতঃ একটু পরস্পরের ঘর্ষণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নারীজাতি লতাবিশেষ, লতা যেমন যখন যে বৃক্ষের আশ্রয় লয়, তখন সেই বৃক্ষেরই গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে কিম্বা স্বাদুজল বিশিষ্ট নদী সকল যেমন সমুদ্রে পতিত হইলে নদীর জলের আস্বাদ রহিত হইয়া, সমুদ্রবারির ন্যায়ই লবণাক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নারী জাতিও যেমন গুণাক্রান্ত পতির হস্তে অর্পিত হয়, তদনুযায়ী পতির সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে; এ কারণ কন্যা উচ্চগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন পাত্রের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত। পাত্র নিকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন হইলে বা আসুরিক কি তামসিক গুণ সম্পন্ন হইলে, তাহাকে অপাত্র বোধে কন্যাদান করা বিধেয় নহে। নিকৃষ্ট পাত্রে কন্যাদান করিলে অধোগতিই হইয়া থাকে। উপরন্তু মনের জ্বালা অশান্তি আজীবন ভোগ করিতে হয়। এ কারণ অপাত্রে কন্যাদান আদৌ বিধেয় নহে। আপনাদের নিকট স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়া কন্যাদান কিরূপ পাত্রে হওয়া উচিত তাহাও আমাকে বলিতে হইল। ইহা বলিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, কন্যাগণকে বাল্যে গৃহে যতদূর শিক্ষার আবশ্যক তাহা করাইয়া অবশেষে কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে যদি সৎপাত্রে কন্যাকে দান করা যায়, তাহা হইলে কন্যা পিতামাতার নিকট যতদূর শিক্ষা পাওয়া সম্ভব তাহা পাইয়া, অবশেষে পতি সমীপে গমণ করিয়া ক্রমশঃ সকল রকম শিক্ষার সম্পূর্ণতা করিবেন। কারণ বিবাহের পর স্ত্রীজাতির পতিই একমাত্র গুরু পদবাচ্য। সুতরাং পত্নী আপন পতির নিকট পরাবিদ্যা শিক্ষার সহিত সমস্ত শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকেন।

আর্য্যাদিগের বিবাহ প্রথা যাহা চলিয়া আসিতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ নয়। যাহারা আসুরিক ভাবাপন্ন জীব, তাহারাই বলিয়া থাকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য। বিবাহ প্রথা যদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলে

বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিলেই চলিতে পারে। বিবাহ প্রথাটি উঠাইয়া দিলে নারীর সুখ শান্তির মূলে কি কুঠারাঘাত করা হয় না? যে সকল দেশে বিবাহ প্রথা শিথিল আছে, তথায় স্বার্থের সহিত কিছুদিন প্রণয় থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু স্বার্থ ফুরাইলে প্রণয় চটিয়া যায়, পুরুষের নারীর প্রতি স্বার্থ থাকে, যতদিন নারীর রূপ ও যৌবন। নারীরও স্বার্থ, যতদিন পুরুষের অর্থ থাকে। অর্থ যতদিন থাকে ততদিনই তাহার প্রতি নারীর প্রণয়ও থাকে, অর্থের অভাব হইলে প্রণয়ও চটিয়া যায়। উক্ত প্রণয়ের ফলে বর্ণসঙ্করে দেশ প্লাবিত হওয়া সম্ভব। শেষে পাশ্চাত্যে দেশের ন্যায় অনেক স্থানে পিতার পরিবর্তে মাতার নামে পরিচিত হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষায় আর পুত্রের পক্ষে কষ্টের বিষয় কি আছে বা হইতে পারে, তাহা বলিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় উৎকট্ সংক্রামক ব্যাধিরও অভাব হয় না। অবিবাহিত অবস্থায় নরনারীর কাহার সুখ শান্তি থাকিতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। মানবজীবনে ঐহিকে দাম্পত্যসুখের ন্যায় আর অপর সুখ নাই। এই কারণে আর্য্যগণ পূর্ব হইতে বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়া আমাদের ঐহিক এবং পারত্রিকের মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ প্রথা শিথিল হইলে নরনারীর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ফল লাভের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নারীগণের রজস্বলা হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং পুরুষের সপ্তদশ হইতে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে, বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল জন্য অনাবশ্যক ইচ্ছা রহিত হইয়া আবশ্যকমত সকল কর্ম করিয়া চলিবেন। অতএব কন্যাগণের অপরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের আবশ্যক নাই। কারণ কন্যাগণের অপরাবিদ্যা শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই। অবশ্য ইহা আমি আমার রুচি অনুযায়ী বলিলাম, আপনাদের ইহা ভাল নাও লাগিতে পারে, তবে আপনারা আমার এই রুচি পরিবর্তন ও যুক্তির দ্বারা সংশোধন করিয়া দিলে আমি বড় সুখী হইব, আপনাদের নিকট ইহাই আমার অনুরোধ। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার আরও কোন বক্তব্য বিষয় থাকিলেও আমি এইখানেই স্ত্রীশিক্ষার বিষয় সংক্ষেপতঃ বর্ণনা শেষ করিলাম। এক্ষণে যদি কিছু আমার উপরোক্ত কথার কোন প্রতিবাদ থাকে, বা কোন বিষয় বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে আপনারা তাহা বলিতে পারেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আপনি যে সমস্ত কথা বলিলেন তাহার প্রতিবাদ অবশ্য করিতে পারি না। কারণ নারীগণের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা যে নারীগণের পক্ষে অকরণীয় তাহা কোন মতে বলিতে পারি না এবং নারীগণের পূর্বোক্ত আচরণ করাই যে উচিত তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীলোকের অপরাবিদ্যা শিক্ষা করায়ও বিশেষ কোন লাভ দেখিতে পাই না। অপরাবিদ্যার দ্বারা অর্থাগম হইলেও নারীগণের দ্বারা ত' হওয়া সম্ভবপর নহে, তাহাদের দ্বারা অর্থাগম হইলেও তাহা দৃশ্যত ভাল দেখায় না; স্ত্রী, কন্যা বা পুত্রবধু, ইহারা দাসত্ব স্বীকার

করিয়া অর্থ উপার্জন করিবে ইহাও আমাদের দেশে কাহার বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, সে সকল লাঞ্ছনা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে সর্বদা সহ্য করিয়া থাকি, সেই সব লাঞ্ছনা নারীগণকে ভোগ করিতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। আপনি যাহা বলিলেন তাহার কোনটিই অসত্য নহে, তবে আজকাল লোকের রুচি অনুযায়ী এবং বাড়ীতে বাড়ীতে খৃষ্টান মিশনের স্ত্রীগণের যাতায়াত বন্ধ করিবার জন্য আমাদের স্ত্রীশিক্ষার অভিপ্রায়ে বিদ্যালয় খুলিতে হইতেছে, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় করা আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে।

বাবা বলিলেন, আপনাদের খৃষ্টান মিশনের হস্ত হইতে রক্ষা করার এই উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ইহার জন্য স্ত্রীগণকে ঘরের বাহির না করিয়া অপর উপায় অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারেন। প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষকে খৃষ্টান মিশনের অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া, খৃষ্টান মিশনের নারীগণকে গৃহস্থ বা ধনী লোকের বাড়ীতে প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। বর্তমান প্রণালীতে কন্যাগণকে শিক্ষার জন্য ঘরের বাহির করিলে, তাহারা বালকগণের ন্যায় নানা বিষয় দেখিয়া কুরুচি সম্পন্ন হইবে, ইহা সদুপদেশ দ্বারায় সকলকে বুঝাইয়া দিবেন। বালক বালিকা সকলেই যদি কুরুচিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সংসারে সকলেরই সুখ শান্তি একদিন লোপ পাইয়া ঘোর অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অশান্তির সূত্রপাতের বাকিও নাই, ধীরে ধীরে প্রায়শঃ সকল সংসারেই সুখ শান্তির অভাবের ছায়া আসিয়া পতিত হইয়াছে। যাহাদের লইয়া সংসার, তাহারাই যদি কুরুচিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করা কি কঠিন হইবে না? যিনি স্ত্রী, তিনি পতির বাধ্য নহেন, অধিকন্তু পতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন, পতির প্রতি ভক্তির অভাব, পতির অবাধ্য এবং পতির প্রতি অপ্রিয়ভাষিণী ইত্যাদি যদি হয়, তাহা হইলে সেই সংসারে পতি বা পত্নীর কি সুখ শান্তি থাকা সম্ভবপর হইতে পারে?

> "মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয় বাদিনী,
> অরণ্যংতেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং।"

অর্থাৎ যাহার সংসারে জননী নাই এবং পত্নী অপ্রিয় বাদিনী (কটুভাবিনী) তাহার অরণ্যে যাওয়াই ভাল, অরণ্যও ঠিক্ নহে, কারণ তাহার পক্ষে সংসার আর অরণ্য উভয়ই কষ্টকর স্থান। অর্থাৎ না অরণ্যে থাকিয়া সুখ, না সংসারে থাকিয়া সুখপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্ত্রীর গর্ভের যে সকল পুত্র কন্যা জন্মে তাহারাও কুরুচিপূর্ণ হইয়া পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া, মাতা পিতাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়া থাকে ও দিতেছে। এমত স্থলে আপনারা প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে গিয়া বালকগণকে প্রথমে পরাবিদ্যা শিক্ষার সহিত কিছু কিছু অর্থকরি বিদ্যাও শিক্ষা দিবার পরামর্শ দিতে পারেন। দেশের মঙ্গলের জন্য আপনাদের ইহা করা কি কর্ত্তব্য নহে? বালকগণের কুরুচি দোষ

কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে যাইবার নহে, বরং বৃদ্ধি পাইবে। বালিকাগণ যাহাতে আপন আপন পিতামাতার নিকট সংযতেন্দ্রিয় হইবার জন্য পরাবিদ্যা শিক্ষার অভ্যাস করেন এবং সংসারের যাবতীয় কার্য্য যদি আপন আপন জননীর নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সংসারে নরনারীর কোন অশান্তির কারণ থাকিবে না এবং নারীগণের জন্য আপনাদেরও বিদ্যালয় খুলিবার আবশ্যক হইবে না। তখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাটিতেই বালিকা বিদ্যালয় হইয়া প্রত্যেক সংসার স্বর্গতুল্য স্থানে পরিণত হইবে। বর্তমানে প্রায়শঃ গৃহস্থের বাটী অরণ্যবৎ হইয়া অশান্তির আগার হইয়া রহিয়াছে। দেশের এবং জীবের মঙ্গলের জন্য আপনারা চেষ্টা করুন, যাহতে নরনারী সকলেরই উপকার হয়। অবশ্য কোন কোন স্থলে কৃতকার্য্য হইতে বিলম্ব হইবে, তাহাতে হতাশ্বাস হওয়া চাহি না, যত্ন ও চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, একদিন না একদিন সফলকাম নিশ্চয়ই হইতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আমার আর একটি বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইতেছে; আপনি ইতি পূর্বে বলিয়াছেন নারীগণের রজস্বলা হইবার পূর্বে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, ইহা কিরূপ ন্যায় সঙ্গত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বিবেচনায় নারীগণের রজস্বলা হইবার পর বিবাহ দেওয়া উচিত। কারণ কন্যা রজস্বলা হইলেই বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপনি বলিতেছেন, কন্যা রজস্বলা হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত, ইহাতে আমাদের মনে একটি বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, এই সন্দেহটাও আপনার ভঞ্জন করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

বাবা বলিলেন, দেখুন আমি পূর্বে বলিয়াছি, আর্য্যাগণের বিবাহ বন্ধন প্রথা যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য নহে। আর্য্যাগণের বিবাহের প্রথম উদ্দেশ্য প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে সম্মিলিত হইয়া পরাবিদ্যারূপ ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা করা; স্ত্রী ব্যতিরেকে একাকী সাধন করা বিধি নহে; কারণ পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের অভ্যাসকালে যে সকল দৈহিক ও মানসিক বিঘ্ন (বাধা) উদয় হইয়া থাকে, সে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা সস্ত্রীক ব্যতীত জীবের সাধ্যায়ত্ব নহে। পক্ষী যেমন উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পক্ষীরূপী জীব (পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয় পক্ষরূপ) প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে সম্মিলিতভাবে সাধন দ্বারা ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ধর্ম ও কর্মবীর উৎপন্ন করা, অর্থাৎ ধার্মিক ও কর্মী সৎপুত্র উৎপন্ন করা। বিবাহের তৃতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে, গৃহস্থ আশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একারণ ঋষিরা সকলেই সস্ত্রীক গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, সাধ্বী ধর্ম-পত্নীরূপা স্ত্রীই গৃহস্থাশ্রমের শ্রীরূপা—সংসাররূপ গৃহ উজ্জ্বলকারিণী। (শ্রীরূপা বলিবার অভিপ্রায়, শ্রী শব্দের অর্থ যাঁহাকে সকল লোক পূজা করিয়া থাকে, তিনিই শ্রী শব্দবাচ্য; সাধ্বী পতিব্রতা

রমণীগণ দেবগণের ও পূজ্যা হইয়া থাকেন)। কন্যাগণের পুষ্পদর্শন কালকে অর্থাৎ কন্যাগণের পুষ্প দর্শন হইলে তাহার পর বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে মনে করা নিতান্ত ভুল, কারণ পুষ্প দর্শন হইলে কন্যা গর্ভ ধারণের উপযুক্তা হইয়াছেন, ইহাই মনে করা উচিত। আমি রজস্বলা হইবার পূর্বে বিবাহ হওয়া উচিত যাহা বলিয়াছি, তাহারও বিশেষ কারণ রহিয়াছে; নারীগণ রজস্বলা হইবার চতুর্থ দিন হইতে তাদের পতি কামনায় মন বিচলিত হইয়া থাকে, একারণ আমাদের দেশে বিবাহিতা নারীগণ নিজপতি গৃহে না থাকিলে ঋতুর চতুর্থ দিবসে পতিমুখ দর্শনের অভাবে নিজপতির রূপ ধ্যান করিয়া সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া থাকে, পাছে মন অপর পুরুষে আকৃষ্টা হয় এই আশঙ্কায়। মন অপর পুরুষে আকৃষ্টা হইলে পতিসহবাসে পুত্র হইলেও ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নানের পরই যে পুরুষকে অবলোকন হইয়াছিল, পুত্রের রূপগুণ সেই পুরুষের রূপগুণ অনুযায়ী হওয়া সম্ভব। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম বুঝিতে হইবে। অবিবাহিতা কন্যাগণের পুষ্প দর্শন হইলে পতি অভাবে মন পতিকামনায় বিচলিত হইয়া অসংযত মন নানাদিকে ধাবিত হইয়া তাহাতে কুফল জন্মাইতে পারে এবং অনেক সময় কুফল ফলিতেও দেখা গিয়াছে। অবিবাহিতাবস্থায় প্রথম পুষ্প দর্শনকালের পর চতুর্থ দিবসে কোন পুরুষের রূপ মনে অঙ্কিত হইয়া গেলে, সুসন্তান হইবার আশা কম থাকে, একারণ পুষ্প দর্শনের অগ্রেই কন্যাগণের বিবাহ দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য। তবে কন্যাগণের অসময়েও অনেক সময় রজোদর্শন হইয়া থাকে, এমন কি ছয় বৎসর বয়স হইতে অষ্টম বা নবম বর্ষ বয়সেও রজোদর্শন হইতে পারে, এরূপ অসময়ে পুষ্প দর্শন হইলে তাহাকে ব্যাধি মনে করা চাহি; কন্যাগণের পুষ্প দর্শনের স্বাভাবিক কাল, দশম হইতে একাদশ ক্বচিৎ দ্বাদশ বর্ষও হইয়া থাকে; অবশ্য ইহা আমাদের দেশে। শীত প্রধান দেশে আরও বেশী বয়সে হইয়া থাকে। কন্যাগণ অপর বালকগণের সঙ্গে সর্বদা খেলা করার কারণেও অল্প বয়সে পুষ্প দর্শন হয়। নিতান্ত অল্প বয়সে হইলে তাহা স্বাভাবিক নহে মনে করাই উচিত। কন্যাগণ ঝি চাকরের নিকট থাকাতেও অল্পবয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে, কারণ ঝি চাকরের নিকট সর্বদা থাকায় কন্যাগণ সর্বদা অশ্লীল কথা শ্রবণ করিয়া মনের চাঞ্চল্য বশতঃ ঋতুমতী হইয়া থাকে। যাহা হউক কন্যাগণের ঋতু হইবার পূর্বেই বিবাহের প্রশস্ত কাল; অবিবাহিতা কন্যাগণের ঋতু হইলে অসংযত মন পতিকামনায় বিচলিত হইয়া মনে মনে আসক্তির সহিত অপর পুরুষের দর্শন ইচ্ছা প্রবল হইয়া থাকে, এবং ইহাতে সর্বগুণযুক্ত উৎকৃষ্ট সন্তান হইবার আশা থাকে না। ভবিষ্যতে পাতিব্রত্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতে পারে, একারণ পুষ্প দর্শনের পূর্বেই কন্যাগণের বিবাহ হওয়া উচিত। স্বাভাবিক নিয়ম সর্বত্রে সকল জাতিতেই প্রায় সমান। গবাদি পশু জাতির মধ্যেও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, স্ত্রী জাতীয় পশুগণের গর্ভকাল উপস্থিত হইলে তাহার

স্বজাতীয় পুরুষ (পশু) পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া থাকে এবং যে কোন স্বজাতীয় পশু সম্মুখে দেখে, তাহাতেই উপগত হইয়া থাকে। তাহার পর গর্ভাধান হইয়া গেলে আর পুংজাতীয় পশুকে নিকটেও আসিতে দেয় না।

পশুগণের পতি পত্নীর স্থিরতা থাকে না, কারণ পশুগণ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য ইচ্ছা মতন পতি বা পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে, একারণ পশুভাব ঘৃণিত এবং হেয়। মানবগণের উহা অনুকরণীয় নহে। ইহাতে যদি বলা যায়, পশুগণ যখন উৎকৃষ্ট বলশালী সুন্দর সন্তান প্রসব করে, তখন পশুভাবেই বা বিশেষ দোষ কি? অতএব নরনারী আপন ইচ্ছামত সুন্দর উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারেন। ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে গবাদি পশুজাতি অপেক্ষা নরনারী সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ জাতি, জগতে ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মানব জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, পশুগণ সর্ববিষয়েই মানবগণ অপেক্ষা হীন দশা প্রাপ্ত। শরীরে, আকারে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, বুদ্ধিতে, কার্য্যে, রুচিতে, ক্রিয়াতে, গুণাদিতে মানবগণ সর্বপ্রকারেই গবাদি পশুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকারে বা বলে শ্রেষ্ঠ হইলেই উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হইতে পারে না, যিনি সর্বগুণসম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য। গবাদি পশুগণ সর্বগুণসম্পন্ন নহে, একারণ পশুভাব মানবগণের অনুকরণীয় নহে। গবাদি পশুগণের সংযত ভাবের একেবারে অভাব, কারণ পশুদেহে ও মনে সংযত ভাব হইতেই পারে না, কোন কোন পশু মানব অপেক্ষা অসাধারণ বলশালী দেখা যায়, যেমত হস্তী, গো, মহিষ, ইত্যাদি। ইহারা মানব অপেক্ষা অসাধারণ বলশালী হইলেও মানবগণ ইহাদিগকে বুদ্ধির দ্বারা অনায়াসে বশীভূত করিয়া থাকে। পশুগণের মস্তিষ্ক, বুদ্ধিস্থানও মানবগণের অপেক্ষা হীন থাকায় মানবগণ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিও অনেক হীন; একারণ শারীরিক বল থাকিলেও বুদ্ধির অল্পতা নিবন্ধন, তাহারা হীনবল হইয়া থাকে, মানবগণের এই সৎ অসৎ বিবেকিনী বুদ্ধি ঈশ্বর দত্ত। মানবগণ ইহা দ্বারা সৎ অসৎ বিচার করিয়া পশুভাবের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন, এই কারণেই ভগবান মানব হৃদয়ে সৎ অসৎ বুদ্ধি প্রদান করিয়া গবাদি পশু অপেক্ষা তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। আমাদের এই সদসৎ বুদ্ধি সত্ত্বেও আমি যদি গবাদি পশুগণের কার্য্যে অনুরক্ত হই, তাহা হইলে আমি নরপশু ব্যতীত মানব পদবাচ্য নিশ্চয়ই নই।

পূর্বে অসংযত নারীগণের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: মনের অসংযত অবস্থায় সদ্‌বুদ্ধির অভাব হইয়া থাকে। কারণ অসংযত মনের স্বভাবই, সে কুপথে জীবকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং অসংযত মন সর্বদা জীবের ভয়াবহ, কখন কি অনিষ্ট করাইয়া দিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। একারণ মানবগণ সৎ বুদ্ধির সাহায্যে সংযত মন হইবার চেষ্টা দ্বারা পরাবিদ্যার অভ্যাসে রত হইলে, সংযত মন হইতে পারে; অন্ততঃ সদসৎ কার্য্য বুঝিতে পারিয়া অসৎ পশুভাবের কার্য্য হইতে

নিবৃত্ত থাকিতে পারে। উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন করা,—মানবগণের ও পশুগণের মধ্যে কি উৎকৃষ্টতার পার্থক্য নাই? পশুগণের উৎকৃষ্ট সন্তান হইয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সবল, দেখিতে পশু আকারের মধ্যে অনেক পশু অপেক্ষা সুন্দর, ইহাই পশুর উৎকৃষ্টতা; মানবের পক্ষে তাহা নহে। মানবগণের প্রথম পুত্র কন্যা হইলেই ভাল মন্দ বুঝা যায় না। পুত্র উৎপন্ন হইলে অধিকাংশ লোক আনন্দিত হন; কন্যা সন্তান হইলে একটু বিষণ্ন ভাব প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। পুত্র উৎপন্ন হইতে লোকে আনন্দ করে কেন? পুত্রের কি রূপ দেখিয়া লোকে আনন্দ করে? বা দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ করে? তাহা বোধ হয় কেহ করে না। তবে পুত্র জাত হইলে আনন্দের মুখ্য কারণ, পুত্রের দ্বারা পিতৃকুল উজ্জ্বল হইবে, বংশের নাম থাকিবে, ইত্যাদি অনেক প্রকার সৎ আশার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে আনন্দ করিয়া থাকে। পুত্র বা কন্যা গুণবান ও গুণবতী হইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে ভাবিয়াই লোকে আনন্দ করিয়া থাকে। পশুভাবে অসংযত অবস্থায় পুত্র কন্যা জাত হইলে সদ্‌গুণ যুক্ত পুত্র বা কন্যা লাভ হইতেই পারে না।

গুণবান পুত্র বলিলেই যে দশটাকা উপার্জনক্ষম পুত্রকেই গুণবান বুঝিতে হইবে তাহা মনে করা চাহি না। কারণ অর্থ উপার্জন কুলি মজুরেও করিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহারাও ত' গুণবান। অর্থ উপার্জন করা ভাগ্যের কথা, অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাল লোকের অর্থাগম যথ সামান্য, আর অপর একজন সাধারণ লোক, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না অথচ সে বেশ উপার্জন করিতেছে। অতএব অর্থ উপার্জন করিতে পারিলেই যে গুণবান বুঝিতে হইবে, তাহা কদাচ বলিতে পারা যায় না। গুণবান শব্দের অর্থ ধনবান নহে, তাহার গুণ আছে তাহাকেই গুণবান বলা যায়। মনের যে ধর্ম থাকিলে ইহলোকে ও পরলোকে প্রশংসনীয় হওয়া যায়, তাহাকেই গুণ কহা যায়। যেমন দয়া,—দয়া একটি প্রধান সদ্‌গুণ; দয়া হইতেছে ধর্মের রূপ। দয়া অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়া; যে ক্ষেত্রে দয়া আছে, সেখানে ধর্মও আছে বুঝিতে হইবে। দয়া অর্থাৎ পরদুঃখে দুঃখানুভব এবং পরদুঃখ নিবারণের ইচ্ছা, ইহাকেই দয়া কহা যায়। তাহার পর দাক্ষিণ্য অর্থাৎ সরলতা; আর ধৈর্য্য অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, মনে এই সকল গুণ থাকিলে, কাম, ক্রোধ, শোক, ক্লেশ, যাতনা, বিপদ প্রভৃতি কারণে মনকে বিচলিত করিতে পারে না, একারণ ধৈর্য্যগুণও অসাধারণ গুণ। তাহার পর গাম্ভীর্য্য; গাম্ভীর্য্য শব্দের অর্থ অল্প কারণে মনের অস্থিরতা বা ব্যাকুল ভাব না হওয়া; তাহার পর ঔদার্য্য অর্থাৎ উদারভাব (উদারতা বা বদান্যতা বা শত্রু ও মিত্রে সমভাব)। তাহার পর সৎ সাহস, পরাক্রমশালী, সংযতেন্দ্রিয়তা, সত্যতা এবং যাহাতে আমার উৎকর্ষ সাধন হয়, এমন জ্ঞান ও যুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন, এই সকল দৈবী সম্পদ গুণ বিশিষ্ট যিনি বা উক্ত গুণ

সকল যাঁহার আছে তাঁহাকেই গুণবান কহা যায়। উপরোক্ত গুণ সকল যে পিতামাতাতে আছে, তাঁহাদের মনের সংযত অবস্থায় যে পুত্র কন্যা জাত হয়, তাহারাই দৈবী সম্পদ হইতে জাত বিধায় উপরোক্ত গুণ প্রায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ দেবভাবে গর্ভধান হওয়ায় দৈবীগুণ সম্পন্ন পুত্রই হইয়া থাকে। দৈবীগুণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইলে সেই সন্তানকে যদি দৈবী ভাবে লালন পালন না করা যায়, বা অসৎ সঙ্গে যদি লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে সঙ্গদোষে দৈবীগুণ নষ্ট হইয়া পশুভাবাপন্নও হইতে পারে। আর যেখানে পশু ভাবাক্রান্ত হইয়া অসংযত ভাবে কাম চরিতার্থ জনিত পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথায় পুত্র কন্যাগণ পশু বা আসুরিক ভাবাপন্নই হইয়া থাকে অর্থাৎ দম্ভ, দর্প গর্ব (ধনাদি জন্য গর্ব বা আসুরিকবলের গর্ব), অভিমান, অতি পূজ্যতাভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা, চপলতা, খলতা, ক্রুরতা, দয়াশূণ্যতা অর্থাৎ নির্দয়তা অসত্যতা, স্বার্থপরতা, সর্বদা কামভোগেচ্ছায় রত, ইত্যাদি অসৎ গুণ যুক্ত পুত্র কন্যা যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পশুভাব বা আসুরিক ভাব হইতে জাত হইয়া থাকে। অতএব নরনারী সকলেই সংযত ভাব হইয়া দৈবী ভাবের বশবর্ত্তী না হইলে উৎকৃষ্ট পুত্র কন্যা লাভের আশা কম, একারণ বলা হইয়াছে ঋতু স্নানের দিন এবং ঋতু কালীন সংযত আহার ও সংযত ভাবে থাকা (গর্ভাধান না হওয়া পর্য্যন্ত) নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে এরূপ কেহ মনে না করেন যে, গর্ভাধান হইয়া গেলে আর সংযত ভাবে থাকার আবশ্যক নাই, বস্তুতঃ সংযত ভাবে থাকা নরনারীর আজীবনই একান্ত কর্তব্য। তবে নারীগণের সুসন্তান লাভের জন্য উক্ত সময়ে সংযত ভাবে থাকা আরও বিশেষ কর্তব্য। যাহা হউক, আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন কন্যাগণের রজস্বলা হইবার পূর্বে বিবাহ দেওয়া কেন কর্তব্য? তাহার উত্তরে আমি নারীগণের রজস্বলা হইবার পূর্বে যে বিবাহ হওয়া উচিত তাহা সংক্ষেপতঃ কতিপয় যুক্তি দ্বারা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত কহিলাম; ইহাতে আপনাদের মনস্তুষ্টি হইবে কি, না, তাহা জানি না, কারণ রুচি সকল মনের সমান নহে। এক্ষণে আমি আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না, এই খানেই আমার বক্তব্য বিষয় শেষ করিলাম।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আমরাও আর আপনাকে অদ্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার সময় নষ্ট করিব না, আমরা সকলেই আপনার সারগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। আপনার বাক্যগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে যে, বিশেষ মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহাতে আর আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। তবে কার্য্যে পরিণত করা বর্তমানে বড় কঠিন, আবার চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। প্রথমে সকল কার্য্যই কঠিন বোধ হইয়া থাকে, তাহার পর চেষ্টাদ্বারা সকল কার্য্যেরই কঠিনতাভাব, অভ্যাসে সহজ হইয়া থাকে। যাহা হউক, অদ্য আমরা উঠিলাম, এই বলিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আমার বাবাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৎপরে আমি একজন লোকের সহিত বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ঐ সকল কথা যতদূর মনে ছিল, মা'র কাছে আধ আধ ভাষায় বলিতে লাগিলাম। আমার কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন এবং আমাকে কোলে করিয়া আমার চিবকু ধরিয়া কত আদর করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। মা তখন আমাকে রান্না ঘরে লইয়া গিয়া বেগুন ভাজা ও তরকারী দিয়া লুচি খাওয়াইয়া দিলেন পরে একটু দুধ খাওয়াইয়া আঁচাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম মা, আমার ঘুম আসিতেছে। মা তখন আমাকে কোলে করিয়া লইয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন। আমি শয়ন করিয়া মা'কে বলিলাম, "মা, একটা উপকথা বল না"। আমি গল্প শুনিতে বড় ভালবাসি, এই জন্য প্রায়ই সন্ধ্যার সময় পিসিমাকে গল্প বলিতে বলি। যাহা হউক মা গল্প বলিতে লাগিলেন ও আমি মা'র কথার মধ্যে মধ্যে সায় দিয়া যাইতে লাগিলাম। গল্প শুনিতে শুনিতে ক্ষণিক পরেই আমার নিদ্রা আসায়, আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

জগৎ ও আমি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"স্বপ্ন" ও "লিখন-পঠন"

আমার নিদ্রিত অবস্থায় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রাম হইলেও আমার বর্ত্তমান মনের বিশ্রাম নাই। আমার বর্ত্তমান মন এখন একটা বিষয় কার্য্যে ব্যাপ্ত; বলা বাহুল্য আমি খোকা, আমার বর্ত্তমান মনও খোকা। আমার বিষয়ের মধ্যে খেলার বিষয় ব্যতীত অপর কিছুই নাই; সুতরাং আমার বর্ত্তমান মনেরও বড় বড় খোকাদের মতন বিষয় কার্য্যে বোধ নাই। তবে আমি অদ্য একটা নূতন বিষয় পাইয়াছি, সে বিষয়টা লিখন, পঠন সম্বন্ধীয় বিষয়। অদ্য আমার মনও সেই লিখন পঠন বিষয়ের সম্বন্ধে ব্যাপৃত আছে, সুতরাং আমার মনে মনে লিখন পঠন সম্বন্ধেই নানারকম ভাবে আন্দোলিত হইতেছে। তাহার অব্যবহিত পরেই বোধ হইল আমার নিদ্রাভাব যে কাটিয়া গিয়াছে এবং সম্যক জাগ্রত অবস্থা যে আমার হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। এমন সময়ে যেন হঠাৎ কোন অব্যক্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রকাশ হইয়া কি বলিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ আমার অব্যক্ত জ্যোতির্ম্ময় ভাব অবলোকন হইবামাত্র তৎপরে আমি জ্যোতিঃরূপে তন্ময় হওয়ায় আর যেন কিছু দেখিতে পাইলাম না, দেখিতে না পাইলেও কতকগুলি অপৌরুযেয় বাক্য আমার শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। আমাকে যেন তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তুমি যে রূপ প্রথমে দেখিলে, তাহাই বেদোক্ত পুরুষ, আমিই বেদ পদবাচ্য। আমি প্রতি ঘটে ঘটে, প্রাণের প্রাণ স্থির প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছি; আমাকেই অধ্যয়ন কর অর্থাৎ অধ্যয়ন শব্দে অধি-নয়ন=অধ্যায়ন; অধি=উপরি; আমার উপরেই অয়ন=আশ্রয় স্থল। অর্থাৎ আমাকেই আশ্রয় স্থল মনে করিয়া আমার যজন রূপ আত্ম পূজা (আত্মার সম্বর্দ্ধনা) কর। সম্বর্দ্ধনা অর্থাৎ সম্যকরূপ বৃদ্ধি করা। এই আত্মার পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা করিলেই প্রকৃত অধ্যয়ন করা হইবে। কেবল পুঁথি পাঠের দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ হইবে না। অধ্যয়নের সহিত আত্মক্রিয়া করা রূপ যজ্ঞকে যজন কহা যায়, আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই যজন করিবে, অর্থাৎ আমার পূজারূপ সম্বর্দ্ধনা করিবে। ইহার সহিত লিখনও আবশ্যক, লিখন—কোন বিষয় দেখিয়া তাহার অবিকল চিত্র করার নাম লিখন। তুমি প্রথমে আমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ যাহা দেখিয়াছ, তাহা তোমার নিজ মনের মধ্যে চিত্রবৎ অঙ্কিত করিয়া রাখার নামই লিখন বলিয়া জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য মোটের উপর পুনর্ব্বার বলিতেছি শ্রবণ কর। অর্থাৎ তুমি

আমাকে (স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে) আশ্রয় করিয়া তোমার মনের মধ্যে আমার পূর্ব্বোক্ত রূপ যাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, সেই রূপকে নিজ মন মধ্যস্থিত চিত্রের লক্ষ্যস্থিত রাখিয়া আমার স্থির প্রাণরূপ আত্মক্রিয়া করিবে। ইহাই প্রকৃত অধ্যয়ন ও লিখন বলিয়া জানিবে।

ইহার দ্বারা তুমি বিজ্ঞানের সহিত সমস্ত জ্ঞান লাভ করিবে এবং শান্তি লাভ করিবে। তাহার পর তুমি সর্ব্বভূতের মঙ্গল জন্য অধ্যাপনা ও যাজন ক্রিয়া করিবে। অধ্যাপনা অর্থে আমার বিষয় যতদূর বলা সম্ভব, তাহা সকল প্রাণীকে বিশদরূপে বলার নাম অধ্যাপনা এবং যাজন অর্থে সকল প্রাণীকে আমার (স্থির প্রাণরূপ আত্মার) আত্মক্রিয়া শিক্ষা করানর নামই যাজন, তাহাই তুমি করিবে। অবশ্য ইহাও তুমি সম্যক মনে রাখিও যে, যতদিন না তুমি সম্যক পারদর্শী হও, ততদিন আমার (আত্মক্রিয়ার) যাজন-রূপ শিক্ষা তুমি দিও না। কারণ তাহাতে তোমার নিজের বিঘ্ন হইতে পারে, অর্থাৎ বৃথা অহঙ্কারাদি ভাব মনে আসিয়া তোমার আত্মাবনতি হইতে পারে এবং সাধারণ লোক দ্বারাও তোমাতে অনেক অযথা সাধু বাদাদি গুণের আরোপ করাইয়া তোমার আত্মাবনতি করাইয়া দিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা নিজের অণুত্ববোধ দ্বারায় সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না সম্যক আত্মোন্নতি লাভ হয়। আত্মোন্নতি লাভ হইলে পরে আর ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় বা লোক দ্বারায় কোন গুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে বা আশ্রয় করিতে পারিবে না। ইহার পর আর আমার কোন কথা শ্রুতিগোচর হইল না। তাহার পরই আমার সম্যক জাগ্রতভাব আসায় দেখিলাম, বাবা ঘরের ভিতর নাই, সামান্য বেলাও হইয়াছে। আমার মা আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন—খোকা আজ এত ঘুমাইতেছ কেন? তোমার কোন অসুখ করে নাই ত'। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম—না মা, আমার কোন অসুখ করে নাই। আমি আমার মা'র মুখের দিকে অবলোকন করা মাত্রই আমার পূর্ব্ব স্মৃতি একেবারে লোপ পাইয়া গেল। বিন্দুমাত্রও আর আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ নাই। আমার এই বিস্মৃতি ভাব কাহা কর্ত্তৃক আইসে, তাহাও আমার জানা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমার মাতৃদেবীর মুখাবলোকন করিবা মাত্রই আমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইয়াছে। তবে কি আমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইবার প্রধান কারণ আমার মাতৃদেবী? বস্তুতঃ তাহা নহে; আমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করাইবার মুখ্য কারণ আমার জননী রূপা মাতৃদেবী নহেন। আমার মাতৃদেবীও যাঁহা দ্বারা পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মরণ হইয়া আমাকে পুত্রবোধে বাৎসল্য ভাবে আবদ্ধ, আমিও তাঁহারই দ্বারায় পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মরণ হইয়া "আমি আমার" এই জ্ঞানের সহিত মাতৃস্নেহে আবদ্ধ। বস্তুতঃ আমিও যেমন জানি না যে, আমি কে বা আমার কে, তদ্রূপ আমার মাতৃদেবীও জানেন না যে তিনি কে বা তাঁহার কে; ইহা আমাদের উভয়ের নিকটই অজ্ঞাত অবস্থা থাকিবার প্রধান কারণ প্রকৃতির মায়া এবং আমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করাইবারও মুখ্য

কারণ প্রকৃতির মায়া। আমার প্রাণের মধ্য অবস্থা রূপ অজপা যাহা চলিতেছে, তাহাই প্রকৃতি পদবাচ্য। কারণ ইহা কর্ত্তৃক যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ সমস্ত প্রথমে কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাকেই আদ্যা প্রকৃতি বলা যায়। মায়া, যাহা নাই বা থাকিতে পারে না তাহার অস্তিত্ব বোধ করার নামই মায়া।

আমার প্রাণ কর্ম্মরূপ মধ্য অবস্থা থাকিয়াও নাই। কারণ যাহার আদি অন্ত স্থির বা শূন্য স্বরূপ, তাহার মধ্য অবস্থার চঞ্চলভাবে থাকিতে পারে না। যাহার আদি অন্ত শূন্য, তাহার মধ্য অবস্থাও শূন্য। এই মধ্য অবস্থা নাই, অথচ অনুভব হইতেছে, (যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব বোধ) সুতরাং ইহাই মায়া; ইহাতে যদি বলা যায় যে, অজপারূপ মধ্য অবস্থা যখন লক্ষ্য হইতেছে, তখন মধ্য অবস্থা নাই বলি কি প্রকারে। তাহার উত্তরে আমি আমাকে বলিতেছি যে, আমার মধ্যাবস্থা রূপ প্রাণকর্ম্মের আদি ও অন্ত অবস্থায় লক্ষ্য না থাকায় এই মধ্যবস্থা আমার অনুভব হইতেছে; যদি আমার বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মের আদি অন্ত অবস্থায় লক্ষ্য থাকিত তাহা হইলে আমার নিকট এই বর্ত্তমান মধ্যাবস্থা থাকিয়াও না থাকার ন্যায় আমার বোধ হইত। কারণ একস্থানে তন্ময় ভাবে লক্ষ্য থাকিলে অপর স্থানে বা অপর বিষয় না থাকার মতন গণ্য হইয়া থাকে। তদ্রূপ আমার বা আমার জননীর দেহ যাহা আমি দেখিতেছি, তাহাও আমার বর্ত্তমান অজপা রূপ মধ্য অবস্থার মায়িক জালে পড়িয়া মরীচিকাবৎ দর্শন করিতেছি। আমার সংস্কার অভাবে ইহা সত্যবৎ প্রণিধান করিতেছি; বস্তুতঃ আমার বা আমার মাতৃদেবীর বা অপর যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমস্থ জীবসমূহের অস্তিত্ব থাকিয়াও নাই, কারণ যাহা কিছু দেখিতেছি তৎসমুদায় পদার্থের আদি অন্ত শূন্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাহার আদি অন্ত শূন্য, তাহার মধ্য অবস্থাও শূন্য যেমত আমার জন্মের পূর্ব্বের অবস্থা এবং দেহত্যাগের পরাবস্থা উভয়ই শূন্য। যখন আমার জন্মের পূর্ব্বের অবস্থা এবং দেহত্যাগের পরের অবস্থা শূন্য হইল, তখন আমার দেহরূপ মধ্য অবস্থা কেমন করিয়া থাকিতে পারে। এমত অবস্থায় আমার আমি-র মধ্যাবস্থা থাকা সম্ভবপর নহে। আমার বর্ত্তমান মধ্যাবস্থা রূপ প্রাণ কর্ম্মের ক্রিয়া শক্তির বহির্মুখান গতি থাকায় আমার মধ্যাবস্থা বা আমার দেহ, আমি দেখিতেছি। আমার বর্ত্তমান মনের প্রাণ কর্ম্মের আদি অন্ত অবস্থায় লক্ষ্য না হওয়ায়, আমি বর্ত্তমান মধ্য অবস্থার ফেরে পড়িয়া, আমি আমার বোধের সহিত সমস্ত সত্যবৎ দেখিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক সমস্তই আমার বর্ত্তমান মধ্যাবস্থা রূপ মরুভূমির ফল স্বরূপ মরীচিকা। এই বর্ত্তমান মধ্যাবস্থা রূপ প্রাণ কর্ম্মের বহির্মুখীন গতি শক্তির গুণে আমার পূর্ব্বস্মৃতিও লোপ হইতেছে। বর্ত্তমান মন সংজ্ঞা হারা হওয়ায়, এই মনের অর্ন্তদৃষ্টি লোপ হওয়ার জন্য পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইতেছে। আরও বিশেষ প্রকৃতির গুণাদি বৃত্তি সমূহের কার্য্য তৎপরতার গুণে বর্ত্তমান মনের সর্ব্বদাই সম্মুখ দৃষ্টি থাকাতে মন নিজ সম্মুখে যাহা কিছু প্রকৃতির কার্য্য সকল দেখিয়া থাকে, তাহাতেই

মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি সব লোপ হইয়া যায়।

আমার বর্ত্তমান প্রাণ কর্ম্মরূপ মধ্যাবস্থার আদি অন্তে লক্ষ্য না থাকায় পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইয়া সম্মুখস্থ বিষয়েই লক্ষ্য পতিত হইতেছে। বলা বাহুল্য আমার বর্ত্তমান প্রাণ কর্ম্মের মধ্য অবস্থায় নিদ্রাকালীন আমি যে সকল স্বপ্ন দেখি তাহা প্রায়শঃ অনেক আমার মনে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার আদি ও অন্ত অবস্থায় যখন যখন নিদ্রার সময় আইসে, তখন আমার না নিদ্রা, না জাগ্রত এইরূপ কি একরকম অবস্থা যেন হয়। ঐ অবস্থায় আমার যাহা যাহা শ্রবণ বা দর্শন হয়, তাহা আমার একেবারে স্মৃতির বহির্ভূত হইয়া গিয়া কিছুই মনে থাকে না। আমি যাহাকে আমার জাগ্রত অবস্থা কহিয়া থাকি, তাহা আমার প্রকৃত জাগ্রত অবস্থা নহে। আমার বর্ত্তমান জাগ্রত অবস্থাও নিদ্রাবৎ স্বপ্নে আচ্ছন্ন। কারণ আমার নিদ্রাবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থায়, সম্মুখস্থ প্রকৃতির বিষয়েই লক্ষ্য থাকে। আমার সম্মুখস্থ প্রকৃতির বিষয়ে লক্ষ্য থাকায়, মোহ বশতঃ আমি সম্মুখস্থ বাহ্যিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মোহিত ও আত্মাহারা হইয়া গুণাদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থের বিষয় লাভের জন্য আশার ছলনায় আশা কর্ত্তৃক আশার আশায় মৃগ তৃষ্ণার ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যাকুল হইয়া থাকি। আমি ব্যাকুল হইলেও আমার আশা যায় না, এবং আমার যে সম্মুখস্থ প্রকৃতির বিষয় লাভের আশা কখন মিটিতে পারে তাহাও আমার জানা নাই। কারণ প্রকৃতির বিষয় অনন্ত থাকায় এবং আমার জীবন কাল অল্প হেতু প্রকৃতির বিষয় লাভের আশা আমার জীবন কালের মধ্যে সম্পূর্ণ চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব। আমার এই পার্থিব বিষয় লাভের আশা কর্ত্তৃকও আমার পূর্ব্বস্মৃতি প্রকাশ হইবার পথ স্বরূপ বর্ত্তমান মধ্যাবস্থা রূপ প্রাণ কর্ম্ম যাহা চলিতেছে তাহার আদি ও অন্ত অবস্থায় লক্ষ্য করিতে দিতেছে না। আমার বর্ত্তমান মধ্য অবস্থারূপ প্রাণকর্ম্মের আদি অন্তে লক্ষ্যস্থির না হইলেও পূর্ব্বস্মৃতি প্রকাশ পাইবার নহে, ("মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে রমণ"), সুতরাং আমার উপরোক্ত আদি ও অন্ত অবস্থায় লক্ষ্য না থাকায় পূর্ব্বস্মৃতি আসিতেছে না। ক্বচিৎ কখন প্রাণ কর্ম্মের আদি অন্ত অবস্থায় লক্ষ্য যাইলে আমার যাহা যাহা শ্রবণ বা দর্শন হয়, তাহাও আমার বর্ত্তমান মধ্য অবস্থা কর্ত্তৃক বিস্মৃত করাইয়া দিয়া থাকে। তদ্বিষয় আর কিছু মাত্র মনে থাকে না। যাহা হউক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমার শয়ন অবস্থা কালীন মা আমাকে যখন ডাকিতেছিলেন, তখন উঠিয়া আমার মা'র দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্রই শয়ন অবস্থায় যাহা যাহা দর্শন ও শ্রবণ হইতেছিল তদ্বিষয় এখন আর আমার বিন্দুমাত্রও মনে নাই। আমি শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র মা আমার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন আমার কোন অসুখ হইয়াছে কি না। আমার কোন অসুখ হয় নাই শুনিয়াও মা আমার গায়ে হাত দিয়া যখন দেখিলেন যে আমার কোন অসুখ করে নাই। তখন মা আমার ঝিকে বলিলেন—খোকার হাত মুখ ধুয়াইয়া দাও। ঝি আমাকে যথা স্থানে লইয়া যাইলে

আমি মল মূত্র ত্যাগ করার পর, ঝি আমার হাত মুখ ধুয়াইয়া দিয়া আমাকে আমার মার নিকট পুনরায় লইয়া আসিল। আমি আসিলেই আমার মা আমাকে কাপড় পরিতে বলিলেন।

বলা বাহুল্য আমি এখন কাপড় নিজে পরিতে পারি। তবে বড় বড় খোকাদের মতন তা ভাল পারি না। আমি নিজেই কাপড় পরিলাম। মা আমার কাপড়ের কোঁচা করিয়া দিয়া, আমার কাপড়ের ভিতর নাভির কাছে কোঁচা পরাইয়া দিলেন। তাহার পর জামা পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—আজ বাহিরে গিয়া তোমাকে লেখাপড়া করিতে হইবে। আমি বলিলাম,—হাঁ মা, তা আমি জানি। তবে কি জানি কেন আজ আমার ঘুম (নিদ্রা) ভাঙ্গিতে বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। বাবা হয়ত বিরক্ত হইবেন। আর দেরী করিব না, আমি বাহিরে বাবার নিকটে যাই। আজ আর আমি এখন কিছু খাইব না। বাহির হইতে লেখাপড়া করিয়া আসিয়া তাহার পর খাইব। মা তাহাতেই সম্মত হইলেন। তবে আমার জন্য বাটীতে করিয়া অল্প গরম দুধ আনাইয়া রাখিয়া ছিলেন। আমাকে বলিলেন, এই দুদ্ (দুগ্ধ) টুকু তবে খাইয়া যাও। আমার মা'র কথায় দুদ্ (দুগ্ধ) খাইয়া বাবার নিকট যাইতেছি। আমাকে যাইতে দেখিয়া মা আমার সঙ্গে ঝিকে দিলেন এবং ঝিকে বলিয়া দিলেন যে, আমাকে বাবার নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া আইস। আমি ঝির সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। ঝি আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহির বাটীতে আমার বাবার নিকট আমায় পৌঁছিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি বাবার নিকটে যাইয়া বাবাকে প্রণাম করিলাম। তাহার পর বাবা আমাকে আদরের সহিত নিজের কাছে বসাইলেন। বাবার নিকটে এখন আর অপর লোক বেশী কেহ ছিল না, কেবল একজন প্রাচীন লোক বসিয়া বাবার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। আমি বাবার নিকটে বসিলে সেই সময় বাবার ঘরের ঘড়িতে টং টং টং, টং টং টং, টং টং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল। আমি ঘড়ির বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, গুণিতে ছিলাম। বাজনা থামিলে পর বাবাকে বলিলাম,—বাবা, আটটা বাজিয়া গেল। বাবা আমার কথার উত্তরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হাঁ আটটা বাজিল, আজ তুমি আটটার সময় পড়িতে আসিলে। এত বেলায় কি পড়া হয়? লেখাপড়া যত সকাল সকাল করিবে ততই তোমার সব মনে থাকিবে। আরও বিশেষ সকাল বেলা মনের অবস্থা ভাল থাকে। আজ তুমি বেলা করিয়া আসায় অন্যায় করিয়াছ। বাবার কথা শেষ হইলে আমি কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিলাম—বাবা আমি রোজই ভোরের সময় উঠিয়া থাকি। গত রাত্রে কি যেন কি হইয়া আমার আজ আর ভোরে ঘমু ভাঙ্গে নাই, আমি মা'কেও তাহা বলিয়াছি যে, বাবা আজ আমার উপর বিরক্ত হইবেন। ইহা বলাও আমার যেমন শেষ হইল, অমনি আমার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল, আমি ফোঁস ফাঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাকে বলিলাম,—বাবা আর আমার বেলা হইবে না, এখন থেকে আমি রোজই ভোরে উঠিব। আমার রোদন করা ভাব দেখিয়া বাবা আমাকে কোলে করিয়া লইয়া বলিলেন,—

আচ্ছা বেশ আর যেন বেলা না হয়, তুমি কাঁদিও না, কোন ভয় নাই। আমি তোমার উপর বিরক্ত হইয়া কিছু বলি নাই, তোমাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতেছিলাম। তাহার পর বাবা আমাকে একটু আদর করিয়া বলিলেন,—তবে এইবার তুমি পড়িতে বস। ইহা আমাকে বলিয়া তাহার পর যে লোকটী ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন,—গুরুমহাশয় এইবার আপনি খোকাকে পড়ান এবং তালপাতা আনান আছে, তাহাতে অল্প অল্প লিখন কার্য্যও করাইবেন প্রথমে দাগা বুলান অভ্যাসটা করা চাহি, তাহার পর যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদায়ই আপনি দেখিবেন। আপনাকে আর অধিক কি বলিব, খোকাকে আপনি আপনার পুত্রের ন্যায় দেখিয়া কার্য্য করিবেন। গুরুমহাশয় বলিলেন,—আমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি যথা ধর্ম্ম ও জ্ঞান মত সমস্ত কার্য্য সাধ্যমত করিব, তাহার ত্রুটী হইবে না। তাহার পর বাবা আমাকে বলিলেন,—খোকা গুরুমহাশয়কে প্রণাম কর। অদ্য হইতে গুরুমহাশয়ের নিকট তুমি নিত্য পঠন লিখন সব করিবে, আমিও অবশ্য নিত্য তুমি কি করিলে না করিলে তাহা দেখিব। তুমি গুরুমহাশয়কে খুব ভালবাসার সহিত ভক্তি করিবে, উনি খুব ভাল লোক। এই সকল কথা আমাকে বলিয়া তাহার পর বাবা গুরুমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—ইনি আজকালকার মতন সাধারণ ব্যবসায়ী-শিক্ষক নহেন। আজকালের শিক্ষক মহাশয়েরা চাকরি বজায় রাখিবার জন্য ছেলের লেখাপড়া কিছু হউক আর না হউক, ছেলেদের (ছাত্রদের) খোসামোদ করিয়া চলেন, এবং (ছেলেদের অভিভাবকগণেরও এক রকম মনঃতুষ্টি করিয়া কার্য্যে ফাঁকি দিয়া থাকেন) ছেলেকে (ছাত্রকে) কিছু বলেন না, পাছে ছেলে (ছাত্র) বাড়ীতে গিয়া শিক্ষকের নিন্দা করে। ছাত্রকে শাসন করিলে এখনকার অভিভাবকগণ প্রায়শঃ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, নিজ পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি অল্প সময়ই থাকে। কেবল যে সময়াভাব বশতঃ দেখেন না তাহাও নহে। সময় যে একেবারে নাই তাহাও নহে। যখন সময় হয়, তখন বৃথা হাস্যামোদে সময় কাটাইয়া দেন। পুত্রের যিনি অভিভাবক তাঁহার এই অবস্থা। অভিভাবক নিজ পুত্রকে একটা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়া এবং বাড়ীতে পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষককে নিযুক্ত করিয়া তিনি তাঁহার দায়িত্ব কাটাইয়া থাকেন, প্রায় আর অপর কোন খবর রাখেন না। বর্ত্তমানে বাড়ীর কর্ত্তৃঠাকুরাণীরাই অভিভাবকের স্থলে অভিভাবিকারূপে পুত্রের কার্য্য করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা বাড়ীর শিক্ষক যদি ছাত্রের শিক্ষার্থে কিছু সামান্য শাসন করেন বা বকেন, তাহা হইলেই শিক্ষকের সর্ব্বনাশ। বিদ্যালয়ের একেবারে সর্ব্বনাশ হয় না, তবে কিছু আয় কমিয়া যায় মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ছাত্রকে শিক্ষার জন্য শাসন করিলে শিক্ষকের সর্ব্বনাশ, শিক্ষক মহাশয় যদি কিছু বলিলেন, তাহা হইলেই তাঁহার ছাত্র, তাহার পরই তাহার মাতার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—মা, আমার শিক্ষক আমাকে ভাল করিয়া পড়াও বলিয়া দেন না, উপরন্তু আমাকে যৎপরোনাস্তি

তিরস্কার করেন। স্কুলের মাষ্টারও সেইরকম; ও স্কুলটা ভাল নয়, আমি ওই স্কুলেও পড়িব না। আর আমার বাড়ীর এই মাষ্টারের নিকটও পড়িব না। আমাকে অপর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দাও এবং অপর শিক্ষক বাড়ীতে নিযুক্ত করিয়া দাও। তাহা না হইলে আমি কিছু আহারও করিব না, এবং পড়িবও না। কর্ত্তৃঠাকুরাণী পুত্রের রোদন করা দেখিয়া তাঁহারও পুত্রস্নেহে হৃদয় ব্যথিত হইয়া অমনি স্নেহভরে পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন,—আহা বাছা আমার! আমার বাছাকে পোড়ার-মুখো শিক্ষক বকে। আমার মাইনে খাচ্চে, ইস্কুলেও মাইনে দিয়া পড়াচ্চি। আমিতো আর আমনি পড়াই না যে, আমার বাছাকে নানা রকম বকবে। আজই বাবুকে বলে তোমাকে অপর স্কুলে ভর্তি করিয়া দিব, এবং ও পোড়ার-মুখো মাষ্টারটাকেও তাড়াইয়া দিয়া অপর মাষ্টার আনাইয়া দেওয়াইব। তুমি বাবা আর কাঁদিও না, আমার সঙ্গে এস খাবার খাবে। পুত্র অমনি বলিয়া উঠিল,—না মা আমি খাব না। কর্ত্তৃঠাকুরাণী অমনি বলিলেন,—না না তা কি হয়, খাবে বইকি, তুমি দেখনা, বাবু বাড়ীর ভিতর আসিলেই, তাঁহাকে বলিয়া সব ঠিক করিয়া দিব। তুমি খাবে এস, ইহা বলিয়া গালে হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে নিজ পুত্রকে আহারীয় দ্রব্য কিছু খাইতে দিলেন। বলা বাহুল্য কর্ত্তৃঠাকুরাণীদের পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটী নাই, তাঁহাদের ধারণা পুত্রকে পেট ভরিয়া রোজ চার-পাঁচবার খাওয়াইলে এবং পুত্রের সময়ে সময়ে যে রকম পোষাক দিলে ভাল হয় তাহা দেওয়া হইলে এবং পুত্রের বায়না মত সব দেওয়া হইলে বা করা হইলেই পুত্রের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য পালন করা হইল। তাহার পর আর একটা গুণ ইহাদের আছে, পুত্রের দোষ গোপন করিয়া পুত্রের গুণকীর্তন করা। নিজ নিজ পুত্রের দোষ আদৌ ইঁহারা চক্ষে দেখিয়াও দেখেন না, অপরে যদি কেহ তাঁহাদের পুত্রের দোষ দেখাইয়া দেয় তাহা হইলেই প্রতুল। যে দোষ দেখাইয়া দেয় তাহার সহিত ঝগড়া করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহার উপর যদি পুত্রের পিতামহী বা মাতাবহী বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে ত' সোণার উপর সোহাগা হইয়া পড়ে। যে পুত্রের পিতামহী বা মাতামহী বর্ত্তমান থাকেন তাঁহারা প্রায়শঃ ইহকাল পরকালের মাথা খাইয়া থাকেন! পুত্র শিক্ষকের ও বিদ্যালয়ের গ্লানি করিয়া মা'র বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, নিজ পিতার বাড়ীর মধ্যে আগমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পিতা বাড়ীর মধ্যে আসিলেই পুত্র অমনি নিজ মা'কে বলিল—মা, বাবা বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছেন। মা অমনি পুত্রকে বলিলেন আমি যাচ্ছি এখনি বাবুকে বলিব, তুমি আমার সঙ্গে চল। ইহা বলিয়া কর্ত্তৃঠাকুরাণী নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আরক্ত লোচনে গম্ভীর ভাবে মদমত্ত হস্তিনীর ন্যায় নিজ পতি সমীপে আসিয়া পুত্রের সুখ্যাতি করিয়া শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা কথা কহিয়া শেষে বলিলেন, এমন একটা লক্ষীছাড়া বিদ্যালয়ে ছেলেকে পড়িতে দিয়াছ এবং কোথাকার একটা মুখ্যু (মুর্খ) মাষ্টারের নিকটে পড়াইতে দিয়েছ যে, আমার অমন ছেলে ইহাদের হাতে পড়িয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে ইত্যাদি অনেক কথা

বলিয়া শেষে বলিলেন,—যদি ওকে অপর স্কুলে দিয়া অপর মাষ্টার না রাখাইয়া দাও, তাহা হইলে আর আমি এ সংসারে ভাত খাইব না। ইহা শ্রবণ মাত্রেই পুত্রের পিতার মাথা ঘুরিয়া গেল। পিতা স্বয়ং স্ত্রীগত প্রাণ, নিজ পত্নীর উপর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইলেও সংসারে মহাগন্ডগোল উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি অবনত মস্তকে পত্নীর বাক্য অনুযায়ী পত্নীবাক্যই রক্ষা করিয়া থাকেন। শিক্ষকগণও পূর্ব্ব হইতেই চাকরি বজায় রাখিবার জন্য বালকের মতানুযায়ীই চলিয়া থাকেন, এবং বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক আর নাই হউক ছাত্র ছাড়িয়া যাইবার ভয়ে নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উঠাইয়া দিয়া থাকেন, এরূপও অনেক স্থলে হইয়া থাকে। তবে এরূপ প্রায়শঃ সরকারী বিদ্যালয়ে (সরকার সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়ে) প্রায় ঘটে না। যাহা হউক, পণ্ডিত-মহাশয় আমি আমার বালকের উপরোক্ত প্রকৃতির অভিভাবক নহি, বলা বাহুল্য আপনি নিঃশঙ্কভাবে আমার বালকটিকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিয়া যথা ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া চলুন ইহাই আপনার প্রতি আমার অনুরোধ। তাহার পর গুরুমহাশয় বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হইবে, তবে আর কাল বিলম্বের আবশ্যক নাই, আমি কার্য্য আরম্ভ করি। এইখানেই কি বসিয়া পড়াইতে হইবে? ইহা শুনিয়া আমার বাবা বলিলেন,—না, এখানে লোকজন আসিতে পারে, পড়াশুনা স্বতন্ত্র গৃহে হওয়া আবশ্যক; আমার সঙ্গে আপনি আসুন, এই পার্শ্বের গৃহে আপনি খোকাকে লইয়া পঠন ও লিখন কার্য্য করান। তাহার পর আমাকে ও গুরুমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বের গৃহে আসিয়া বলিলেন,—আপনি এইখানে বসিয়া পড়ান, আর খোকা এই ছোট মাদুর খানাতে বসিয়া পঠন ও লিখন কার্য্য করুক। লিখিবার জন্য এই কয়েকটি তালপত্র আনাইয়া রাখিয়াছি, ইহাতে ইহাকে প্রথম লিখাইবেন। দোয়াত (মস্যাধার) কলম সবই ঐ রহিয়াছে এবং শিশুবোধ পুস্তকখানি লউন, এই পুস্তকখানি পড়াইবেন। বর্ণ পরিচয় উহার এক রকম প্রায় হইয়াছে, তত্রাচ আপনিও দেখিয়া ঠিক করাইয়া লইবেন। তাহার পর বাবা আমাকে বলিলেন,—খোকা তুমি এইখানে গুরুমহাশয়ের নিকট বসিয়া লেখাপড়া কর, আমি এক্ষণে আমার কার্য্যে যাই। আমার বাবা যাইতে উদ্যত হইলে পর আমি আমার বাবাকে পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিয়া তাহার পর গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিয়া পড়িতে বসিলাম। বাবাও আমার চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, আমার মা আমায় গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন; বাবাকে অবশ্য আমি আমার মা কথা মত রোজই প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর প্রণাম করিয়া থাকি। আমি গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠ আরম্ভ করিলাম; প্রথমে সমস্ত বর্ণগুলি আমার জানা হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে লাগিলেন, যখন দেখিলেন আমার বর্ণগুলি সব জানা হইয়াছে তাহাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাল পাতায় স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের দাগা অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং তাহার উপর হাত ধরিয়া

ধরিয়া বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। আমিও বর্ণগুলির নাম উচ্চারণ করিতে করিতে (অর্থাৎ 'ক' লেখ 'খ' লেখ বলিতে বলিতে) দাগা বুলাইতে লাগিলাম। এইরূপে তিনি চারবার স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাগা বুলাইবার পর আমার হাতের জড়তা যেন কতক কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম লিখিতে কিছু অসুবিধা হইলেও ক্রমশঃ অভ্যাসে তাহা অনেকটা আয়ত্ত হইয়া আসিল। আরও বিশেষ আমার মনে এই লেখাপড়াকে নূতন ধরণের খেলা বোধ হইতেছে। আমি খেলিবার সময় যেমন আনন্দের সহিত খেলা করিয়া থাকি, তদ্রূপ গুরুমহাশয়ের নিকট লেখা পড়ার অভ্যাস করাকে আমার খেলা মনে হইতেছে। বস্তুতঃ ইহাও যে খেলা নহে, তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ জগৎ রূপ সংসারে প্রকৃতি দেবীর খেলার দোকান চতুর্দ্দিকেই সাজান রহিয়াছে; এ খেলাতেও যেন প্রকৃতিদেবী আমাকে পরিহাস করিতেছেন। পরিহাস করিবার অভিপ্রায়,—আমি আমাকে ভুলিয়া লেখাপড়া রূপ খেলায় মগ্ন হওয়ায়, প্রকৃতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছি। ইহা দেখিয়া স্বয়ং প্রকৃতিই আমাকে যেন পরিহাস করিয়া বলিতেছেন,—"কেমন, তোমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করাইয়া আমার মধ্য অবস্থা রূপ জগৎ বেড়াজালে এখন তুমি আবদ্ধ"। যাহা হউক, আমার লেখাপড়া রূপ খেলায় বিশেষ নূতনত্ব কিছুই বোধ হইতেছে না। কারণ আমি যে সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকি, সেই সকল শব্দের বাহ্যিক নিজ কল্পিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহাকে বর্ণ রূপে কথিত হইয়া থাকে। শব্দের রূপ থাকিয়াও যে নাই তাহা আমি (খোকা) জানি না। আমাপেক্ষা বড় বড় ওজনের খোকারাও যে জানেন তাহাও আমি বলিতে পারি না। কারণ আমিও যেমন আমার মধ্য অবস্থার মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ, বড় বড় খোকাদের আমাপেক্ষা ওজন বেশী থাকায় তাঁহারাও আমাপেক্ষা মধ্যাবস্থার মোহিনী মায়ায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁহারাও আমার ন্যায় বাহ্যিক ভাবেই আসক্ত থাকায় শব্দের উৎপত্তি স্থানে লক্ষ্য না থাকায়, জানার স্থলে না জানা হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক আমি আমার এই বাহ্যিক লিখন পঠনও খেলা ভাবেই করিয়া চলিতেছি। আমি যখন যে খেলা করিয়া থাকি তখন তাহা তন্ময় ভাবেই করিয়া থাকি, অপর কোন বিষয় তখন আমার স্মরণ পথে আদৌ থাকে না। উপস্থিত লিখন পঠন রূপ কার্য্যকে আমার ইহাও এক প্রকার খেলা বোধ হওয়ায়, এবং তাহা নূতন ধরণের খেলা বোধে বোশ আনন্দের সহিত তন্ময় ভাবেই, গুরুমহাশয়ের উপদেশ মত লিখন পঠন রূপ খেলা করিয়া চলিতেছি। বলা বাহুল্য এক্ষণে আর আমার অপর কোন রকম খেলা বিষয়ে লক্ষ্য মাত্রও নাই, এ কারণে আমার লিখন পঠন রূপ খেলাও অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত হইয়া আসিতেছে। আমি আমার জনক জননীর নিকট প্রায় শুনিতাম যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তখন সেই কার্য্যই তন্ময় ভাবে করা চাহি অপর কার্য্যের না করিয়া কোন কার্য্যকরণকালে, মনের মধ্যে অপর ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের চিন্তা বর্ত্তমান থাকিলে, বর্ত্তমান যে কার্য্য করা যায় তাহা সহজে সুসম্পন্ন

হয় না। আমার জনক জননীর বাক্যে বিশ্বাস থাকায়, আমি যখন যে কার্য্য করিয়া থাকি তখন তাহাতেই প্রায়শঃ তন্ময় হইয়াই করিয়া থাকি। তবে এখন আমার কার্য্য কি আছে, তাহা আমি জানি না। আমার বর্ত্তমানে কার্য্যর মধ্যে খেলা করা, আর আহারাদি করা এ সমস্তই আমি খেলার মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি, এইরূপ অনেক খেলাই খেলিতেছি। দুঃখের বিষয় আমার বর্ত্তমান প্রাণ কর্ম্মরূপ মধ্য অবস্থার গুণে, কে খেলে, কে খেলায়, কি খেলি, তাহার কিছুই অবগত নহি। তবে যখন যে রকম খেলায় রত থাকি, তখন তাহাতেই তন্ময় হইয়া যাই। এইরূপ আমাপেক্ষা বড়বড় খোকারাও যেসকল কার্য্যরূপ খেলা খেলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের বিষয়ে আসক্তি থাকায় খেলা বোধ করেন না। বরং তাঁহারা যাহা যাহা করিয়া থাকেন তৎসমুদয়ই অতীত এবং ভবিষ্যৎ চিন্তার সহিতই করিয়া থাকেন। এ কারণে জ্বর জ্বর হইয়া অকালে কালের ভক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েন। বর্ত্তমানে আমার সহিত বড় বড় খোকাদের পার্থক্য এই বিষয়েই, আমার যখন যে খেলা রূপ কার্য্য বর্ত্তমানে আপনা আপনি বা কাহার দ্বারায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার ভবিষ্যৎ ও অতীত না ভাবিয়া তাহা খেলা বোধ করিয়া থাকি। আমার অপেক্ষা ওজনে অধিক, বড় বড় খোকারা তাহা করেন না। ইহাই আমার সহিত তাঁহাদের একমাত্র পার্থক্য। যাহা হউক আমি আজ লিখন পঠন রূপ যে খেলা পাইয়াছি, তাহা গুরুমহাশয়ের উপদেশ মত তন্ময় ভাবেই অভ্যাস করিয়া যাইতেছি। আমার বর্ত্তমান মনও আজ একটা নূতন বিষয় প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতেই বেশ লাগিয়া গিয়াছে। লিখন পঠনে আমার মন না লাগিয়া যদি আমার মন অপর বিষয় চিন্তা করিত তাহা হইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার দাগা বুলান শেষ হইত না। আমাকে গুরুমহাশয় তালপাতার পাতে যাহা বর্ণের দাগা আঁকিয়া দিয়াছিলেন এক্ষণে আমি তাহাতে দাগা না বুলাইয়া, বর্ণ সকল দেখিয়া দেখিয়া অনায়াসে তাহা লিখিতে পারিতেছি। ইহা দেখিয়া আমার গুরুমহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আদর করিতে লাগিলেন। আমার লিখন কার্য্য আজকার মত শেষ হইলে, আমাকে শিশুবোধের মধ্যস্থিত বর্ণের বানান সকল অভ্যাস করাইতে লাগিলেন এবং যুক্তবর্ণগুলিও বেশ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়া তাহা অভ্যাস করাইলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেশ অভ্যাস করিতে লাগিলাম। এইরূপ প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে আমি শিশুবোধের সমস্ত অংশ পাঠ শেষ করিলাম এবং তালপাতের লিখন কার্য্য শেষ করিয়া তাহার পর কলাপাতে দিনকতক পত্র লিখিবার ধারা অনুযায়ী লিখিয়া তাহার পর, কাগজের উপর এক্ষণে বেশ ছোট বড় অক্ষরে লিখিতে সক্ষম হইয়াছি এবং শিশুবোধের মধ্যস্থিত গণিত বিদ্যার মধ্যে তেরিজ, জমা, খরচ, গুণন, ভাগ, ছোট বড় রাশির অঙ্ক বেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আর মণ কসা, সের কসা, মাস মাহিনাও বেশ করিতে পারি, সাধারণতঃ খসড়া খাতা লেখার কার্য্য এক্ষণে করিতে পারি। বলা বাহুল্য, আমি নিত্য প্রাতে ছয়টা হইতে দশটা এগারটা পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের নিকট বসিয়া পাঠাদি

করি এবং বৈকালে বেলা ৩টার পর হইতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠাদি করিয়া থাকি। মধ্যাহ্নকালে আহারাদি করিয়া থাকি। আহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তাহার পর বাড়ীর অপর খোকাদের সহিত কিছু কিছু খেলাও করিয়া থাকি। আমার বাড়ীতে বিদ্যাভাস ও পাঠাদি কার্য্য ভাল হইয়াছে দেখিয়া আমার জেঠামহাশয় আমার বাবাকে একদিন বলিলেন,—খোকাকে এইবার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দাও। আমার বাবা প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর অগত্যা আমার জেঠামহাশয়ের বাক্যে কতকটা স্বীকার হইয়া বলিলেন,—আচ্ছা আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা করা যাইবে। অদ্য মধ্যাহ্নকালে আমি আমার বাবার সহিত আহার করিতে বসিয়াছি। আমার মা পাখা হস্তে করিয়া মক্ষিকা তাড়াইবার জন্য বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। এমন সময় জেঠামহাশয় আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমার মা'কে আমার বাবা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিয়া শেষে বলিলেন,—বড় দাদাকে আমি বলিয়াছি আপনি যেমত বলিতেছেন সেই মতই কার্য্য হইবে। আমি যখন তাঁহাকে বলিয়াছি তখন খোকাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি না তাহাই আমি জানিতে চাহি। আমার মা তদুত্তরে বলিলেন,—আমার আর তাহাতে আপত্তি কি আছে। বরং তাহাতে আমার উক্ত কথা শুনিয়া আনন্দই হইতেছে। তবে ভয়ে করে, কি জানি খোকা যদি অপর বালকগণের সঙ্গে মিশিয়া পরিণামে চরিত্রহীন হইয়া পড়ে। তাহাই একমাত্র আশঙ্কা, নচেৎ অপর কোন রকম আপত্তি আমার নাই। আরো বিশেষ, খোকার লেখাপড়া শিক্ষার সম্বন্ধে আপনি যাহা মত করিবেন, তাহাই হইবে। আমি স্ত্রীলোক, বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে আমার মতামতের কোন আবশ্যক করে না। তাহা আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন। আমার মা'র কথা শেষ হইলে, আমার বাবা তদুত্তরে আমার মা'কে বলিলেন,—তুমি যাহা আশঙ্কা করিতেছ আমারও সে আশঙ্কা আছে এবং তাহাও আমি বড় দাদাকে বলিয়াছি। তাহাতে তিনি বলিলেন,—এখন পূর্ব্বেকার মতন গুরু গৃহে বাস করিয়া আত্মবিদ্যা শিক্ষার স্থানাভাব। তাহার পর টোল, চতুষ্পাঠীও আর পূর্ব্বেকার মতন নাই। যাহা আছে তাহাও পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুকরণে উপাধি পরীক্ষা টোল চতুষ্পাঠীতে সংলগ্ন হওয়ায় এখন আর পূর্ব্বেকার মতন পন্ডিতও কেহ হইতে পারেন না। যেদিন হইতে উপাধি পরীক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই দেশ প্রায় পণ্ডিত শূন্য হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বতন পন্ডিতগণের স্থান অধিকার করিবার লোক আর হইতেছে না। এক্ষণে কোন গতিকে উপাধি পরীক্ষায় পাশ হইবার মতন কিঞ্চিৎ শিক্ষাই লোকে করিয়া থাকেন, সর্ব্বশাস্ত্রে পন্ডিত হইবার চেষ্টা আর কেহই করেন না। দুঃখের বিষয় আর দিনকতক বাদে পাশ্চাত্য দেশের লোকের নিকট আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইবে, ইহাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে তাহা জানি না।

আরো বিশেষ, দেশ প্রায় কর্মশূন্য হওয়ায় লোকের মনের বল কমিয়া যাওয়ায়, সদসৎ বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া যাহাতে অর্থাগম হয় তৎতৎ বিষয়েই সকলে ধাবিত হইতেছে। এমতস্থলে বালকগণের বর্ত্তমানে শিক্ষার স্থান আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এক্ষণে স্কুল কলেজ ব্যতীত অপর বিদ্যালয় আর নাই। এমতস্থলে অগত্যা তাহাতেই বালকগণকে অধ্যয়নের জন্য পাঠান হইয়া থাকে, অতএব তোমার পুত্রকেও বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী বর্ত্তমান কালের বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত। তবে তিনি ইহাও বলিলেন, আমাদের পাড়ার মধ্যে আমাদের কোন আত্মীয়ের দ্বারায় স্থাপিত একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। উপস্থিত তাহাতেই খোকাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত এবং বড় দাদা ইহাও বলিলেন, উক্ত বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতরূপে কার্য্যও করিয়া থাকেন। তিনি আমাদের আত্মীয় থাকায় খোকার তত্ত্বাবধান সর্বদা করিবেন যাহাতে খোকা অসৎ বালকের সঙ্গ না করে। আমার দাদার যখন এইরূপ ইচ্ছা আর তোমারও যখন অমত নাই, তখন অদ্যই খোকাকে বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া যাক, কারণ আজ দিনও ভাল আছে। ইহা বলিয়া আমার বাবা নিরস্ত হইলে পর, আমার মা বলিলেন,—তাহাই হউক, আপনি তাহা হইলে বট্‌ঠাকুরকে (পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেশীয় স্ত্রীগণেরা বট্‌ঠাকুর কহিয়া থাকেন, বট্‌ঠাকুর বড় ঠাকুরের অপভ্রংশ কথা) সঙ্গে করিয়া খোকাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসুন। তদুত্তরে বাবা বলিলেন, তাহাই হইবে। তাহার পর আমার বাবার আহার করা সমাপন হইলে তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং উঠিবার সময়ে আমার মা'কে বলিলেন,—খোকার আহার হইয়া যাইলে খোকাকে কাপড় জামা পরাইয়া বাহিরে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও, দেরি না হয়। আমি বাহিরে গিয়া বড় দাদাকে খবর দিয়া আনাইয়া লই। ইহা বলিয়া আমার বাবা হাত মুখ ধুইয়া পান খাইতে খাইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি আহার করিতে করিতে আমার মা ও বাবা যাহা যাহা বলিতেছিলেন তৎসমুদায়ই শুনিতেছিলাম এবং আমাকে আজই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে, ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ আমার মনে আনন্দই হইতেছিল। তবে আমার বাবা ও মা'র আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার ইচ্ছা তত' না থাকায় কেবল যেন আমার জেঠামহাশয়ের অনুরোধেই তাঁহারা আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন, ইহা শুনিয়া আমার একটু একটু ভয়ও আসিতেছে। তবে আমার বাবা সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া ভয় তত' বেশী নাই। মনে হইতেছে আমার বাবা যখন সঙ্গে রহিয়াছেন তখন আর ভয় কিসের। বাবা সঙ্গে থাকিবেন শুনিয়া ভয়টা আমার তিরোহিত হইয়া আনন্দের ভাবই আসিতেছে। তবে, বিদ্যালয় কি রকম তাহার বিষয় আমি কিছুই অবগত নহি এবং তথায় কি করিতে হয় তাহাও আমার বিশেষ কিছু জানা নাই। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আহার করিতেছি, তবে বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে শুনিয়া আনন্দের সহিত একটু তাড়াতাড়ি

(শীঘ্র শীঘ্র) আহার করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, আমার কতকটা খাওয়া শেষ হইলে আমি আমার মা'কে বলিলাম—মা, আমি আর খাব না, আমার খাওয়া হইয়াছে। আমার বাল্য স্বভাব বশতঃ কোথাও বেড়াইতে যাইবার নাম শুনিলে সকল কার্য্যই শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া লইয়া থাকি! আমার মা তাহা বুঝিতে পারায় আমাকে বলিলেন,—না না, খাওয়া এখনও হয় নাই, ভাল করিয়া খাও, এখন সময় ঢের আছে। আমার মা'র কথায় আরো একটু আধটু ভয়ে ভয়ে খাইলাম। কি জানি না-খাইলে মা যদি আমার উপর বিরক্ত হইয়া আমাকে বকেন সেই ভয়ে আরো কিছু খাইয়া মা'কে বলিলাম,—মা আর আমি খাইতে পারিতেছি না পেট ভরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে আমাকে আঁচাইয়া দিলেন। আমার মুখ ধোয়া আঁচান হইয়া যাইলে পর, মা আমাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া ভাল কাপড় জামা সব পরাইয়া দিতে লাগিলেন। মা আমাকে যে সময় কাপড় জামা পরাইয়া দিতেছিলেন সেই সময়ে আমি মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মা, আমাকে বাবা বিদ্যালয়ে কেন ভর্ত্তি করিয়া দিতেছেন, তথায় আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে? আমি মা'কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পর, মা আমার কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—খোকা, বাবা তোমাকে বিদ্যা লাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। বিদ্যালয়ে না যাইলে তোমার বিদ্যালাভ হইবে না। ইহা বিবেচনা করিয়া তোমার জেঠামহাশয়ের কহত মত তোমাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিতেছেন। বিদ্যালয়ে তোমাকে বিদ্যার অভ্যাস করিতে হইবে। বিদ্যাভ্যাস যদি সম্যকরূপে করিতে পার, তাহা হইলে বাবা, তোমার বিদ্যালাভ হইবে। তোমার বিদ্যালাভ হইলে তুমি পরিণামে সুখে শান্তিলাভ করিতে পারিবে এবং তোমার বিদ্যালাভ হইলে আমরাও সুখ লাভ করিয়া আনন্দিত হইব। নচেৎ তুমি অবিদ্যাগত হইয়া পরিণামে কষ্ট পাইবে এবং তাহাতে আমাদেরও বিড়ম্বনার একশেষ হইবে। অতএব তুমি বিদ্যালয়ে গিয়া, বিদ্যালাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিবে যাহাতে বিদ্যালাভ হয়।

মা'র কথা শেষ হইলে স্বাভাবিক খোকা ভাবের আদুরে আদুরে কথায় মা'কে আমি বলিলাম,—মা আমি বিদ্যালয়ে গিয়া বিশেষ যত্ন ও সেবার অভ্যাস দ্বারায় বিদ্যালাভ করিয়া, বিদ্যাকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়া, বিদ্যাকে তোমার দাসী করিয়া রাখিয়া দিব। আমি খোকা, আমার জ্ঞানও খোকার মতন থাকায় মা'র সমস্ত কথা শুনিয়া আমার বোধ হইয়াছিল বিদ্যালয়ে বোধ হয় কোন বিদ্যা নাম্নী খুকী আছে। তাহাকে যত্নের অভ্যাসের দ্বারায় আয়ত্ত করিয়া লাভ করিতে পারিলে পরিণামে সুখে শান্তিভোগ করিতে পারিব এবং আমার বিদ্যালাভ জন্য আমার পিতামাতাও যখন সংসারে গৌরবান্বিত হইয়া আনন্দলাভ করিবেন, তখন আমার বিদ্যালাভ করিয়া সেই বিদ্যাকে পিতামাতার দাসী করিয়া রাখিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ যে কার্য্য দ্বারায় পিতামাতার গৌরববৃদ্ধিসহ বংশের নাম উজ্জ্বল হয় তাহাই সন্তানের প্রধান বক্তব্য। সেই বোধে, আমি যখন শুনিলাম, আমার বিদ্যালাভ হইলে পিতামাতার সুখ

লাভ হইয়া আনন্দ বৃদ্ধি হইবে, তখন আমার স্বতঃই উদয় হইল, যে কোন প্রকারে হউক বিদ্যালাভ করিয়া তাহার পর সেই বিদ্যাকে আমার মার দাসী করিয়া রাখিয়া দিলেই আমার সহিত আমার পিতা মাতারও সুখে শান্তিলাভ হইতে পারিবে। এই বোধে, আমি খোকা ভাবে আমার মাকে বলিয়াছি—মা, বিদ্যাকে আমি লাভ করিয়া তোমার দাসী করিয়া রাখিয়া দিব।

মা ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বাবা খোকা, তুমি কি আমার বিদ্যাসুন্দর। সে সুন্দর যে বাবা, গুণসিন্ধু রাজার পুত্র। তিনি যে কাঞ্চিপুত্র হইতে ছয়মাসের পথ ছয় দিনে বর্দ্ধমানে মালিনীগৃহে আসিয়া সুড়ঙ্গ খনন দ্বারায় বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা, সেই বিদ্যালাভের জন্য সুড়ঙ্গ খনন করিয়া বিদ্যার আলয়ে প্রবেশ করণান্তর বিদ্যালাভ করিয়াছেন। তুমি কি আমার সেই সুন্দর, যে বিদ্যালাভ করিয়া সেই বিদ্যাকে আমাদের দাসী করিয়া দিবে। যদি তাহাই কর, তাহা হইলে বিদ্যা আমাদের পুত্রবধু হইবেন। পুত্রবধূ বাস্তবিক দাসী পদবাচ্য নহেন, তবে পুত্রবধুর আপনাকে আপনি গুরুজনের নিকট নিজেকে দাসী মনে করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া গুরুজনের, শ্বশুর-শাশুড়ীর, নিজ নিজ, পুত্রবধুকে দাসী মনে করা চাহি না। পুত্রবধুকে নিজ কন্যা মনে করিয়া নিজ কন্যাবৎ স্নেহ করাই উচিত। বাবা খোকা, আমাদেরও পুত্রবধু হইলে আমরা বউকে নিজ কন্যাই মনে করিব, বউ আমাদের দাসী তাহা কদাচ মনে করিব না।

মা এই সব কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে আমার বাবা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেরী হইয়া যাইতেছে, এখনও খোকা প্রস্তুত হইল না। বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য বড় দাদা বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছেন। আমিও বড় দাদার সঙ্গে যাইব, দেরী হইয়া যাইতেছে। মা তদুত্তরে বলিলেন,—খোকার কাপড় ছাড়া হইয়া গিয়াছে এই কাপড়ই পরিয়া যাইবে, কেবল জামাটা পরিলেই হয়। ইহা বলিয়া মা আমাকে জামাটা পরাইয়া দিয়া আমার বাবাকে বলিলেন,—এখন আপনি খোকাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। তাহার পর বাবা আমাকে বলিলেন,—খোকা তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস। বাবা ইহা বলিলে পর আমি মা'কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। মা আমাকে বিদ্যালাভ হউক, ইহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া বাবার সঙ্গে চলিলাম। আমরা বাহিরে আসিয়া সেখানে আমার জেঠামহাশয় বসিয়াছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি জেঠামহাশয়কে দেখিয়াই, তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। জেঠামহাশয়কে প্রণাম করায় জেঠামহাশয় আমাকে আদর করিয়া নিজের কোলের নিকট লইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর জেঠামহাশয়, আমার বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তবে এইবার চল যাওয়া যাক আর বিলম্ব করার প্রয়োজন কি। তদুত্তরে বাবা বলিলেন,—না আর দেরি করিবার আবশ্যক নাই। বাবা বলিবামাত্র জেঠামহাশয় উঠিয়া বলিলেন,—তবে

চল যাওয়া যাক। বাবা প্রস্তুত ছিলেন তিনিও জেঠামহাশয়ের সহিত আমার হাত ধরিয়া আসিতে লাগিলেন। আমরা তিনজনেই উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

আমার বাবা নীচে আসিয়া আমাদের পুরাতন একজন দারোয়ানকে বলিলেন,—খোকাকে কোলে করিয়া লও। ইহাতে আমি বলিলাম—না বাবা আমি কোলে যাইব না, আমি তোমাদের সঙ্গে হাঁটিয়াই যাইব, তাহাতে বাবা বলিলেন,—ভাল তবে তাহাই চল। ইহা বলিয়া দারোয়ানকেও বলিলেন,—তুমিও আমাদের সঙ্গে আইস। দারোয়ানটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, সে আমাদের সঙ্গে চলিল। আমরা এক্ষণে রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাস্তাটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। রাস্তার পশ্চিম দিক গঙ্গার ঘাটের দিকে গিয়াছে। আমরা পূর্বমুখীন হইয়া যাইতে লাগিলাম। রাস্তার দুইধারেই লোকেদের বাড়ী, কোনটা বা একতলা বাড়ী কোনটা বা দ্বিতল, আবার কোনটি ত্রিতল বাড়ীও রহিয়াছে। ত্রিতল বাড়ী অপেক্ষা দ্বিতল বাড়ীর সংখ্যা অধিক। দুই চারখানা একতলা বাড়ীও আছে। আবার মধ্যে মধ্যে দুই-দশখানা খোলার ঘরও আছে। এই সব খোলার চালা ঘরে প্রায় সমস্তই দোকান ঘর। রাস্তাটি চওড়া পনর-ষোল হাত হইবে। রাস্তায় লোকের ভিড় খুব কম, আরো বিশেষ মধ্যাহ্নকাল থাকায় অল্প সংখ্যকই লোক যাতায়াত করিতেছে। দোকানদারগণ প্রায়ই এ সময় ক্রেতার অভাব বশতঃ কেহ বা রামায়ণ মহাভারতের পুস্তক সুর করিয়া পাঠ করিতেছে। কেহ কেহ বা হুকো হাতে করিয়া তামাকে খাইতেছে এবং কেহবা বাক্সর উপর খাতা রাখিয়া খাতার হিসাব দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই-পাঁচ খানা গরুর গাড়ি মাল বোঝাই করিয়া কোঁ কোঁ শব্দ করিতে করিতে পথিকগণকে বিরক্ত করিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। আমি খোকা আমার দৃষ্টি চারিদিকেই, কোথায় কি আছে না আছে সমস্তই দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। এমন সময়ে আমরা বিদ্যালয়ের সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের বাড়ী হইতে বিদ্যালয় বেশী দূর না থাকায় আমরা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমার জেঠামহাশয় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাবা খোকা এই বিদ্যালয়। আমি তথায় একবার দাঁড়াইয়া দেখিলাম, বিদ্যালয় বাটীর সম্মুখস্থ দরজার উপরে একখানি কাল রং-এর তক্তার উপরে বড় বড় সাদা রং-এর অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা পাঠশালা। তাহার পর দেখিলাম, বিদ্যালয়ের সম্মুখে একখানি মণিহারীর দোকানও রহিয়াছে। মণিহারী দোকানখানি নানা রকম খোকা ভুলনা দ্রব্য সম্ভারে সাজান রহিয়াছে এবং কাগজ কলম পেনসিল দোয়াত ইত্যাদি রহিয়াছে। কাগজ কলম বিক্রয় করা ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য খোকাদের ভুলাইয়া নানা রকম খেলনার অল্প মূল্যের জিনিষকে বেশী দরে বিক্রয় করা। দেখিলাম কয়েকটা ছোট বড় খোকাও সেই দোকানে রহিয়াছে। দুই একজন দুই একটা জিনিষও খরিদ করিতেছে। এই দোকানগুলি খোকাদের আড্ডা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহ হউক তাহার পরই আমরা বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার জেঠামহাশয়কে

বিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষক বেশ ভদ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি ছেলেটিকে এখানে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছেন? জেঠামহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, হাঁ; ইহা শুনিয়া দ্বাররক্ষক অপর একটি লোককে বলিল, বাবুদের সঙ্গে করিয়া অফিস ঘরে লইয়া যাও। সেই লোকটি আমাদের সঙ্গে করিয়া অফিস ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি, আমার বাবা এবং জেঠামহাশয়ের সহিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অফিস গৃহের মধ্যস্থলে একটি মধ্যম রকমের টেবিল রহিয়াছে এবং গৃহের দুই পার্শ্বে কয়েক খানি চেয়ারও রহিয়াছে; টেবিলের সম্মুখে একটি বাবু চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার বাবাকে ও জেঠামহাশয়কে দেখিয়া বাবুটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক—আসুন আসুন আজ আমার বিদ্যালয় আপনাদের আগমণে পবিত্র হইল; ইহা বলিয়া আমার জেঠামহাশয়কে তাঁহার নিজ আসনে (চেয়ারে) বসাইয়া এবং আমার বাবাকেও আর একখানা চেয়ারে বসাইয়া তিনি নিজে আর একখানা চেয়ারে আমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আমি ইঁহাকে পূর্ব হইতে জানি, ইনি আমার সম্বন্ধে কাকা হন, আমার বাবার দূর সম্বন্ধে পিসতুত ভ্রাতা। যাহা হউক আমি আমার বাবার এবং জেঠামহাশয়ের সহিত বিদ্যালয়ে আসায় আমাদের আগমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহা আর জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে প্রথমেই আমার জেঠামহাশয়কে দাদা সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দাদা আজ কি খোকাজীবনকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?

ইহা শুনিয়া আমার জেঠামহাশয় বললেন, হ্যাঁ ভাই তাহাই উদ্দেশ্য। অদ্য দিন ভাল থাকায় আজই তোমার বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতে আমরা আসিয়াছি; তুমি ভাই শীঘ্র খোকাকে তোমাদের বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ভর্ত্তি করিয়া লও। এর পর দেরি হইলে বারবেলা পড়িবে, আজ বৃহস্পতিবার, শেষ এক প্রহর বারবেলা এখন প্রায় একটা বাজে আর দেরি করিও না। তারপর আমার কাকা আমাকে আর একখানা চেয়ারে বসাইয়া নিজে আর একখানা চেয়ারে বসিয়া, একখানা বাঁধান খাতাতে আমার বাবার নাম, আমার নাম ও আমাদের বাড়ীর ঠিকানা তাহার পর আমার বয়স কত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করায় আমার জেঠামহাশয় বলিলেন, খোকা এই অষ্টম বৎসরে মাত্র পড়িয়াছে তাহা শুনিয়া লিখিয়া লইলেন। তৎপরে আমার কত দূর পর্য্যন্ত বাড়ীতে পাঠ হইয়াছে তৎসমুদয় আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবা, আমার কাকার কথামত আনুপূর্ব্বিক আমার যাহা যাহা পাঠ হইয়াছে এবং শুভঙ্করীর অঙ্ক যাহা যাহা আমার হইয়াছে তৎসমুদয় আমার কাকাকে বলিবার পর কাকা আমাকে একবার পরীক্ষা করিবার মানসে কয়েকখানা পুস্তক আনাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আমাকে একখানি পুস্তকের কতক অংশ পাঠ করিতে বলিলেন। যদিও আমার এই পুস্তকখানি পাঠ করা ছিল না, তাহা হইলেও আমার সমগ্র শিশুবোধ পুস্তকখানি ভাল রকম অভ্যাস করা থাকায়, কাকা যে পুস্তক পাঠ করিতে বলিলেন তাহাতে আমার কোন অসুবিধা হইল না বরং সুখপাঠ্য হইল।

আমাকে সুন্দর রূপে পাঠ করিতে দেখিয়া কাকা বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পুস্তকের যে অংশটুকু পাঠ করিতে দিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইলে, তাহার অর্থ করিতে বলিলেন, অর্থও আমি অনায়াসে করিলাম। তাহার পর আমার কাকা পুস্তকখানির ভিতর হইতে আমাকে কয়েকটি বানান জিজ্ঞাসা করিলেন, বানানও প্রায় সমস্ত বলিলাম। কেবল দুই একটা বানানের ভিতর ভুল হইয়া গেল। তাহাতে আমার কাকা বলিলেন, ওরকম একটা আধটা বানানের ভুল মারাত্মক নহে, উহা ক্রমশঃ অভ্যাসে সংশোধন হইয়া যাইবে। এইবার আমাকে শুভঙ্করী হইতে কিছু অঙ্ক কষিতে দিলেন। অঙ্কেতে আমার একটিও ভুল হইল না। অধিকন্তু অঙ্কগুলি অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে কষিয়া দিলাম, ইহাতে আমার কাকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিজ কোলের নিকটে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। তাহার পর বাবাকে জেঠামহাশয়কে বলিলেন, খোকার বাড়ীতে বসিয়া যেরূপ পাঠ অভ্যাস হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় এবং আশাতিরিক্ত। আমি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে খোকা পঞ্চম শ্রেণীতে বেশ পারগ হইবে, অতএব খোকাকে পঞ্চম শ্রেণীতেই আমি ভর্ত্তি করিয়া লইব মনে করিতেছি। ইহা শুনিয়া জেঠামহাশয় ও বাবা বলিলেন, তবে তাহাই করিয়া লও। তৎপরে আমার কাকা নিজ খাতাতে আমাকে পঞ্চম শ্রেণীতেই ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। তাহার পর বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চম শ্রেণীর বেতন কত? ইহা শুনিয়া কাকা বলিলেন, খোকার জন্য আবার বেতন কি দিতে হইবে, আপনাদেরই বিদ্যালয়, খোকার বেতন কিছু দিতে হইবে না। বাবা বলিলেন, না না, তাহা হইবে না, আমাদের বিদ্যালয় হইলেও বিদ্যালয়কে সাহায্য করাও ত' আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পর ভগবৎ কৃপায় আমার অভাবও তাদৃশ নাই, অভাব থাকিলে না হয় তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তুমি বিনা বেতনে পড়াইতে, তাহা কদাচ হইবে না।

বাবা বিশেষ জেদ করায়, কাকা পরিশেষে অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিলেন, পঞ্চম শ্রেণীর বেতন দেড় টাকা। বাবা ইহা শুনিবামাত্র, আমার বিদ্যালয়ে প্রাবেশিক দেড় টাকা ও মাসিক বেতন বাবদে দেড় টাকা একুনে তিনটী মুদ্রা কাকার হস্তে দিলেন। তাহার পর কাকা টাকা লইয়া একখানা ছাপান বিলে কি কি লিখিয়া, আমার বাবার হস্তে দিয়া বলিলেন, তবে এইবার একবার চলুন খোকাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়া বসাইয়া আসি। ইহা বলিয়া আমার কাকা আমাদের সঙ্গে করিয়া আপিস গৃহ হইতে বাহির বাড়ীতে উঠানে নামিলেন। উঠানের তিন দিকে চক বন্দি একতলা ঘর, উঠানের উত্তর দিকে পাঁচ ফুকুরে পূজার দালান। পূজার দালানে প্রথমে আসিয়া উঠিলেন। পূজার দালানেও আমার মতন অনেক খোকা, সকলেই কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া আপন আপন পাঠ অভ্যাস করিতেছে। যে যে শ্রেণীতে যখন যখন আমরা উপস্থিত হইতে লাগিলাম, আমাদের দেখিয়া সকল খোকারা এবং শিক্ষক মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। আমার জেঠামহাশয় শিক্ষক মহাশয়কে বসিতে বলিয়া খোকাদেরও বসিতে বলিলেন। এইরূপ

প্রায় অধিকাংশ শ্রেণী ঘুরিয়া অবশেষে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিবামাত্র সকলেই সম্মান দেখাইবার জন্য একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর, সকলকে বসিতে বলায় সকলে বসিলে পর কাকা আমাকে বলিলেন, খোকা তোমাকে এই শ্রেণীতে পাঠ করিতে হইবে। তুমি নিত্য আসিয়া এই শ্রেণীতে বসিবে এবং পন্ডিত মহাশয় যাহা যাহা বলিবেন তাহা করিবে। ইহা বলিয়া আমাকে একবার বেঞ্চিতে বসিতে বলিলেন। আমিও অমনি জেঠামহাশয়কে ও বাবাকে ও কাকাকে এবং সেই শ্রেণীর পন্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তাহার পর বেঞ্চিতে বসিলাম। ক্ষণিক বসিবার পরই আমার জেঠামহাশয় বলিলেন,—তবে আজ আমার খোকাকে লইয়া যাই, খোকা আগামী কল্য হইতে নিয়ম মত রোজ আসিবে। আমার জেঠামহাশয়ের কথার উত্তরে কাকা বলিলেন,—বেশ তবে অদ্য বাটী যাউন। তবে খোকার পঞ্চম শ্রেণীর পুস্তক লিখাইয়া দিতেছি বাটী গিয়া পুস্তক আনাইয়া দিবেন। ইহা বলিয়া পন্ডিত মহাশয়কে বলিলেন,—এই শ্রেণীর পুস্তকগুলি একটা কাগজে লিখিয়া দিন ত'। আমার কাকার কথামত পন্ডিত মহাশয় একখানা কাগজে পুস্তকগুলি লিখিয়া দিলেন। আমার বাবা কাগজখানি লইলে পর, তথা হইতে আমরা বাহিরে আসিবামাত্র একটা পেটা ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজাইয়া তাহার পর ঢং ঢং করিয়া কয়েকটা বাজাইয়া দিল। যেমন ঘড়ি বাজিল, অমনি হো হো করিয়া সব খোকারা একটা শব্দ করিয়া উঠিল। আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি বাবাকে জড়াইয়া ধরিলাম। আমি বাবাকে জড়াইয়া ধরাতে তিনি বলিলেন,—ভয় নাই বেলা দেড়টা বাজাতে খোকাদের জলখাবার ছুটি হওয়ায় সকলে আনন্দে হো হো শব্দ করিয়া জল খাইবার জন্য ও খেলা করিবার জন্য হো হো রবে বাহিরে আসিতেছে উহাতে তোমার কোন ভয় নাই। বাবা যখন বলিলেন, কোন ভয় নাই, তখন আমি বাবার কথায় আশ্বস্ত হইয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। জেঠামহাশয় এবং বিদ্যালয়ের কাকাও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। আমরা বিদ্যালয়ের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিলে, আমার বিদ্যালয়ের কাকা, আমার বাবাকে এবং জেঠামহাশয়কে বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমি অদ্য সন্ধ্যার পর যাইয়া সাক্ষাৎ করিব। তাহাতে বাবা বলিলেন; হাঁ একবার যাইলে ভাল হয়, একবার যাইবে। ইহা বলিবার পরেই আমরা বাটী মুখে যাত্রা করিলাম।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের বাটী হইতে বিদ্যালয় বেশী দূর নহে, একারণ আমরা শীঘ্রই বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। জেঠামহাশয় আপন বাড়ীতে যাইলেন। আমি বাবার সঙ্গে উপরের বৈঠকখানা গৃহে যাইলাম। বাবা আপন আসনে বসিলে পর, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বাবা আমি এখন মা'র কাছে যাব কি? তদুত্তরে বাবা বলিলেন,—যাইতে পার। বাবা যেমন বলিলেন, যাইতে পার, আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিলাম। বাড়ীর ভিতর আসিয়াই, মা মা, করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমার গলার শব্দ শুনিয়াই মা উপর হইতে সাড়া দিলেন। মা উপরে আছেন

জানিয়া, আমি মা'র নিকটে উপরে যাইতে লাগিলাম। আমি বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি জানিয়া মা'ও উপর হইতে নীচে আসিতেছিলেন। উপরে যাইবার সিঁড়িতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি মাকে প্রথমে দেখিয়াই, আদর করিয়া মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—মা, বিদ্যালয় হইতে আসিলাম। ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি উপরের ঘরেই চলিলেন। আমরা উপরের গৃহে উপস্থিত হইলে, মা গৃহের মেঝেতে বসিলেন। আমিও মা'র কোলে বসিয়া পড়িলাম। মা'র কোলে বসিয়া বসিয়া বিদ্যালয়ে যাইবার কালীন রাস্তার ঘটনাবলি এবং বিদ্যালয়ে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম ও যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, যতদূর মনে ছিল সমস্তই বলিলাম। মা'ও আমার সমস্ত কথা যেন বেশ আগ্রহপূর্বক আনন্দের সহিত শুনিতে লাগিলেন। আমার কথা শেষ হইলে পর মা আমাকে বলিলেন, এখন হইতে বেশ মনোযোগ সহকারে যে যে পুস্তক তোমাকে নিত্য পাঠ করিতে হইবে তাহার অভ্যাস করিবে। ইহা বলিয়া, তাহার পর আমাকে বলিলেন, তোমার শিক্ষক মহাশয় যিনি তোমাকে নিত্য পড়াইবেন তাঁহাকে সম্মান করিবে এবং তাঁহার বাক্য সকল যত্নপূর্বক পালন করিবে এবং নিজ পাঠ্য বিষয়ে অমনোযোগী হইবে না। এবং সর্বদা মন্দ বালকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, কদাচ মন্দ বালকের সঙ্গ করিবে না। কারণ মন্দ বালকের সঙ্গ দ্বারা তুমি মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সকলের ঘৃণার পাত্র হইবে, তুমি তাহা না করিয়া সৎসঙ্গ করিবে বা অধীত বিদ্যার সঙ্গ করিবে। প্রথমতঃ, তুমি তোমার অধীত বিদ্যার সঙ্গ করিবে, কারণ তুমি খোকা। কে সৎ আর কেই বা অসৎ তাহা তুমি বুঝিতে এক্ষণে অক্ষম। তুমিত' খোকা, তোমাপেক্ষায় বড় বড় খোকাদের মধ্যেও অনেকে সৎ অসৎ বুঝিতে অক্ষম, একারণ, তোমার পক্ষে তোমার অধীত বিদ্যার সঙ্গ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। অবশ্য বিদ্যা কাহাকে বলে তাহাও তোমার জানা নাই, তাহাও তোমার জানা আবশ্যক বিধায় তোমাকে বিদ্যা কাহাকে বলে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ইন্দ্রিয়" ও "রিপু"

বিদ্যা দুই প্রকার—প্রথম পরা বিদ্যা, দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা। যাহা পরা বিদ্যা নহে তাহাকেই অপরা বিদ্যা কহা যায়। যাহা দ্বারা ধর্মাধর্ম জানা যায় তাহাকেই বিদ্যা বলিয়া জানিবে। এক্ষণে ধর্ম কি আর অধর্ম কি তাহাও তোমার জানা নাই, তাহাও তোমার জানা উচিত। ধর্মের বিপরীতই অধর্ম; ধর্ম—ধৃ-পোষণ করা যাহার দ্বারায় মনুষ্যের পোষণ হয় অর্থাৎ পালন হয় তাহাকে ধর্ম বলিয়া জানিবে। এক্ষণে কাহার দ্বারায় পোষণ বা

পালন হয় তাহাও তোমার জানা উচিত। তাহা না জানা থাকিলেও তোমার ধর্ম জানা হইবে না, কেবল ধর্ম এই শব্দ মাত্র জানা থাকিলে ধর্ম জানা হয় না, কারণ ধর্ম এই শব্দ মাত্র ধর্ম নহে। জীবসমূহ প্রায়শঃ ধর্ম কাহাকে বলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে বলিয়া অধর্মে অভিভূত হইয়া জ্বালার উপর জ্বালা প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অশান্তিতে কালাতিপাত করিয়া থাকে। এক্ষণে কাহার দ্বারায় মনুষ্যের বা জীবের পোষণ হয় তাহাই তোমাকে বলিতেছি বেশ মন দিয়া শ্রবণ কর। দেখ বাবা খোকা, আমাদের স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, মাতৃ দুগ্ধ বা গাভী দুগ্ধ বা গোধূমাদি অন্নের দ্বারায় আমাদের শরীরের পোষণ কার্য্য হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাদের দ্বারায় যে পোষণ কার্য্যে সাহায্য হয় না তাহা আমি বলি না, তবে উক্ত বিষয়গুলি পোষণ কার্য্যের গৌণ কারণ বলিয়া জানিবে। গৌণ কারণ হইলেও উহা অনাবশ্যক নহে বলিয়া জানিবে, কারণ শরীর রক্ষার্থে আহারের জন্য পূর্বোক্ত আহারীয় দ্রব্য বিশেষ আবশ্যক। জীবসমূহের পক্ষে, শরীরের প্রকৃত পোষণ কার্য্য বা পালন কার্য্য বর্ত্তমান প্রাণ কার্য্যের সাম্যাবস্থা রূপ স্থির প্রাণের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই স্থির প্রাণের অভাবে কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্যের দ্বারায় শরীরের পোষণ, পালন বা শরীর ধারণ হইতে পারে না বলিয়া জানিবে; সুতরাং স্থির প্রাণরূপ আত্মাই একমাত্র শরীর পোষণের বা পালনের বা শরীর ধারণের মুখ্য কারণ। পূর্বে বলা হইয়াছে যাহা দ্বারায় মনুষ্যের পোষণ বা ধারণ হয় তাহাকেই ধর্ম কহা যায়। এক্ষণে যখন দেখা যাইতেছে, প্রাণের অভাবে মনুষ্যের পোষণ বা শরীর ধারণ চলিতে পারে না তখন প্রাণই একমাত্র ধর্ম পদবাচ্য হইলেন এবং ইহাই আত্ম-ধর্ম, ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অধর্ম পদবাচ্য। তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গণের ধর্মকে অধর্ম বলিয়া জানিবে, ইন্দ্রিয়গণের কৃত কর্মকে ইন্দ্রিয় ধর্ম বলিয়া জানিবে। এই ইন্দ্রিয়গণের ধর্মকে পরধর্ম বলিয়া মনে করিবে। ইহারা আত্মা হইতে পৃথক হেতু ইহাদিগকে পরধর্ম বলা যায়। এই ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম সর্বদা ভয়াবহ বলিয়া জানিবে, কারণ ইহারা জীবকে সর্বদা কুপথে চালিত করিয়া জীবের সমূহ অনিষ্ট করিয়া থাকে, অতএব তুমি ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের ধর্ম হইতে সর্বদা স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিবে। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কাহাকে বলে তাহাও তোমার জানা। আবশ্যক বিধায় তোমাকে বলিতেছি তাহা তুমি শ্রবণ কর।

যাহা দ্বারায় পার্থিব সমূহের জ্ঞান জন্মে তাহাকেই ইন্দ্রিয় কহা যায়। এই ইন্দ্রিয় তিন প্রকার; যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহা যায়। ইহাদের উপর প্রথমতঃ বিষয়াদির প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহারা বিষয় গ্রহণের দ্বারা স্বরূপ মাত্র বলিয়া জানিবে। মনই সমস্ত বিষয় গ্রহণের প্রর্ত্তক, একারণ মনকে কর্মইন্দ্রিয় ও বলা যায়। তাহার পর অন্তরেন্দ্রিয়: মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—ইহারা শূন্যরূপী, ইহারা প্রাণ কর্মের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে জাত হইয়া শূন্যরূপে, বায়ুরূপে মাতৃকা স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্নে (মাতৃকা স্থান ব্রহ্ম যোনিকে কহে ভ্রূর পশ্চাৎদেশ)

অবস্থিতি করিয়া কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় ভোগ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী; যথা—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইহাদিগকেই তুমি ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে। ইহারা জীব শরীরে বাস করিয়া জীবকে আপন বশে রাখিবার জন্য সকাম সৎ অসৎ কর্মে চালিত করিয়া থাকে। ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তুমি সতত চেষ্টিত থাকিবে এবং সর্বদা সর্তক থাকিবে। কারণ ইহারা সর্বদা চেষ্টা করিয়া জীবকে পাপ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে। এইবার তোমাকে সংক্ষেপতঃ রিপুগণের বিষয় কহিব। রিপুগণ কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহা বলিয়া তাহাদের ধর্ম বা কার্য্য কি তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর।

যাহারা শত্রুতার সহিত বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে, তাহারাই রিপু পদবাচ্য। রিপুগণকে শত্রু বলিয়া মনে রাখিও। ইহারা জীবের পরম শত্রু। বর্ত্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থা হইতে জাত যে তিনগুন—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনগুণের মধ্যে রজোগুণ তমোগুণ হইতে ইহারা উৎপন্ন, ইহারাও শূন্য বা বায়ুরূপী, বর্ত্তমান প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থা হইতে জাত যে মন, সেই মনকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান অযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে বর্ত্তমান মনকে সকাম সৎ অসৎ কার্য্য করাইয়া মনকে ইহারা আবদ্ধ করিয়া রাখে। বর্ত্তমান প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থা হইতে জাত যে বর্ত্তমান অযুক্ত বুদ্ধি যাহা প্রতি জীবদেহে রহিয়াছে, সেই বুদ্ধিও এই রিপুগণের অনুকূলে বর্ত্তমান অযুক্ত বুদ্ধি যাহা প্রতি জীবদেহে রহিয়াছে, সেই বুদ্ধিও এই রিপুগণের অনুকূলে বর্ত্তমান মনের সম্মুখ মত প্রকাশ করিয়া মনকে রিপুগণের অনুগামী করিয়া থাকে। একারণ বর্ত্তমান বুদ্ধি যাহা তোমার রহিয়াছে তাহাকেও বিশ্বাস করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টিকে রিপু কহিয়া থাকে। আবার ইহাদের সহধর্মিণী আছে তাহারা ইহাদের অপেক্ষায় শিকারী বেশী, সহজেই জীবকে আবদ্ধ করিয়া থাকে অতএব তাহাদের প্রতি তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সতত রাখা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে। এই ছয় রিপু কাহাকে কাহাকে বলে তাহাও তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথম নিজ মনে সব প্রকার কামনা যে সকল উদ্ভব হয় তাহাকেই কাম বলিয়া জানিবে। কেবল পরমাত্ম জ্ঞান লাভের জন্য যে কাম বা কামনা তাহা জীবের সৎকাম বিষয়ে, উহা অকামের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ভগবৎ কাম ব্যতীত অপর সমস্ত কাম বা কামনা বদ্ধের কারণ। জীবকে এই কামরূপ মহা অসুর নানা প্রকার কাম্য বস্তুর প্রলোভন দ্বারায় আপন অধিকারে রাখিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকে, একমাত্র অকাম ভাব ব্যতীত। ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় জীবের নাই। এই কামের সহধর্মিণীকে রতি কহা যায়। রতি শব্দের অর্থ ইচ্ছা। এই রতি সহিত যে কাম তাহা অনর্থের মূল। জীবরে যাহা কিছু অশুভ ঘটিয়া থাকে তৎসমুদয়ের মূলীভূত কারণ রতি সহিত কাম। এই কাম ও রতি বা ইচ্ছাকে দমিত করা জীব মাত্রেরই এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। কামনা যেমত অকামের ভাবের দ্বারায় দমিত হইতে পারে,

ইচ্ছাকেও তদ্রূপ অনাবশ্যক ইচ্ছা ত্যাগ দ্বারায় দমিত করিবার চেষ্টা করিবে। ইচ্ছা রহিত যে কাম, তাহা জ্বালার কারণ হয় না, তদ্রূপ রতি বা ইচ্ছাবিহীন কামও কোন জ্বালার কারণ বা আবদ্ধের কারণ নহে জানিবে। তুমি হয়ত আমার নিকট হইতে এই ইচ্ছাই যখন দোষের কারণ, তখন আমি অপর কোন রকম ইচ্ছাই করিব না। তাহা হলেই আমার ইচ্ছার সহিত কামকে (কামনাকে) অনায়াসে জয় করা হইবে। যদি তুমি এমত বিবেচনা কর, তাহা হইতে কদাচ তুমি কামনা বা ইচ্ছাকে জয় করিতে পারিবে না, কারণ ইচ্ছা করিব না ইহাও ইচ্ছা, ইচ্ছা থাকিতে কাম বা কামনাকে জয় করা অসম্ভব বলিয়া জানিবে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়ই তুল্য; যেমত আমি সন্দেশ খাইব। ইহা আবার ইচ্ছা হইতেছে এবং আমি সন্দেশ খাইব না ইহাতেও আমার ইচ্ছা রহিয়াছে। কারণ সন্দেশ খাইব না ইহাও আমার ইচ্ছা। সন্দেশ খাইব না ইহাকেই আমরা অনিচ্ছা বলিয়া থাকি। এই অনিচ্ছাও কোন কারণবশতঃ হইয়া থাকে, কারণ থাকিলেই তাহার মূলে ইচ্ছা লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া ইচ্ছাই অনিচ্ছা রূপে প্রকাশ হইয়া ইচ্ছার কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। ইহাকে তুমি বলিতে পার, অনিচ্ছাও যখন ইচ্ছার তুল্য হইল তাহা হইলে ইচ্ছাকে দমিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

আর আমি উপরোক্ত কাম (কামনা) ও ইচ্ছাকে দমিত করিবার উপায় যাহা বলিয়াছি তাহাও কোন আবশ্যকতা বা প্রয়োজন নাই। কারণ তাহা যেন আকাশ কুসুমের মতন বাক্য বলা হইল। যাহা হইতে পারে না বা যাহা হয় না তাহাকেই করিতে বলা হইয়াছে এইরূপ তোমার মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মনে করিও না। অনিচ্ছা করা ইহা মন্দের ভাল বলিয়া জানিবে। বর্ত্তমানে তুমি যদি মন্দ কর্ম সমুদয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে বিরত থাক তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল হইবে। বর্ত্তমানে তুমি যাহা অনাবশ্যক ইচ্ছা তাহা করিবে না ইহারই অভ্যাস করিয়া চল। তাহার পর তুমি গুরুপদেশে যখন সাধন পথ পাইয়া সাধন কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন সমস্ত বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে আমি যাহা যাহা বলিতেছি তাহা স্মরণ রাখিয়া যতটুকু পার তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে। আমি উপরে বলিয়াছি অনাবশ্যক ইচ্ছা রহিতের দ্বারায় ইচ্ছাকে নাশ করিতে হইবে। ইহা মিথ্যা নহে জানিবে, কারণ অনাবশ্যক ইচ্ছার নাশ এই কথার দ্বারায় অনাবশ্যক ইচ্ছা নাশ হয় না। তবে ইহারও অভ্যাস করা দরকার। যেমত মনে কর আমরা কোন স্থানে যাইতেছি, যাইবার সময় রাস্তার কোন স্থানে আহারাদি করিবার জন্য কোন পান্থ নিবাসে (পান্থ নিবাস—পথিকদিগের থাকিবার স্থানকে কহা যায়, সাধারণ কথায় যাহাকে সরাই বলা হইয়া থাকে) আশ্রয় লইয়া আমাকে পাক করিতে হইবে। পাক কার্য্য করিতে হইলে কাষ্ঠ, উনন, চাউল, ডাল ইত্যাদি সবই দরকার হইয়া থাকে। সরাইয়ের দোকানদার আমাদের জন্য তাড়াতাড়ি একটি নূতন উনন তৈয়ার করিয়া দিল। হাঁড়ি, কাষ্ঠ ইত্যাদিও সব আনিয়া দিল। আমি উননে কাষ্ঠ দিয়া হাঁড়িতে জল

দিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম, পরে চাউল দালও হাঁড়িতে চড়াইয়া দিলাম। ইহাতে কি আমার ভাত দাল রান্না হইতে পারে? আমি মা'র এই কথা শুনিয়া বলিলাম, না মা ভাত দাল রান্না হইতে পারে না। কারণ উননে কাষ্ঠ মাত্র রহিয়াছে উহাতে অগ্নি প্রদান করা হয় নাই; সুতরাং বিনা অগ্নিতে কাষ্ঠ কিরূপে প্রজ্জ্বলিত হইবে। কেবলমাত্র অগ্নির অভাব রহিয়াছে, আগুন ধরাইয়া দিলেই ভাত দাল সব হইয়া যাইতে পারে।

আমার এই কথা শুনিয়া আমার মা আমাকে বলিলেন খোকা তোমার এই কথাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি ঠিক উত্তর করিয়াছ। এইবার আমার কথা আমি বলিতেছি তাহা তুমি শ্রবণ কর। মনে কর আমার অগ্নির অভাব মাত্র রহিয়াছে, অগ্নি অভাবে ভাত দাল ইত্যাদি কিছুই সুসিদ্ধ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধ বা অপক্ক ভাত, দাল ব্যঞ্জনাদি মনুষ্যের ব্যবহারে আসিতে পারে না। মনুষ্যের ব্যবহারে না আসিয়া উহা যেমত পশুদিগের ব্যবহারে আসিয়া থাকে, ঐরূপ ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ অসিদ্ধ বা অপক্ক অবস্থায় থাকিলে তাহা সাধুগণের কোন কার্য্যেই আইসে না জানিবে। তাহার পর মনে কর আমার পাক কার্য্যের জন্য অগ্নির অভাব থাকায় সরাইয়ের দোকানদারকে বলিলাম বাছা, কাষ্ঠ ধরাইবার জন্য আমাকে কতকটা অগ্নি দিয়া যাও। আমার এই কথায় দোকানদার আমাকে একটু অগ্নি দিয়া বলিয়া গেল, এই অগ্নি লউন আপনি অগ্নি ধরাইয়া লউন। আমি অগ্নি পাইয়া উননের মধ্যে কাষ্ঠের উপর অগ্নি দিয়া যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে কাষ্ঠ যাহা উননের মধ্যে আছে তাহা কি ধরিবে? আরো আমি যে উনন পাইয়াছি তাহা সদ্য তৈয়ারী বলিয়া ভিজা বা কাঁচা। তাহার উপর কাষ্ঠ যাহা আছে তাহাও ভিজা। এমত অবস্থায় আমি অগ্নি প্রদান করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি যে অগ্নিটুকু লাগাইয়া দিয়াছি তাহা প্রজ্জ্বলিত না হইয়া আপনা আপনি নির্ব্বাণ প্রাপ্তই হইয়া যাইবে। আমার উনন ধরান বা পাক করা বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। এ কারণ আমার কর্ত্তব্য, অগ্নি প্রাপ্ত মাত্র অগ্নিতে বাতাস দেওয়া, বাতাস না দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়াই সম্ভব। অগ্নিতে ব্যজন করিতে করিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে অপক্ক চাউল দাল ইত্যাদি যথা সময়ে আপনা আপনি সুসিদ্ধ হইয়া থাকে নচেৎ অপক্ক অবস্থায়ই থাকিয়া যায়।

অতএব গুরুপদেশে কর্ম্মরূপ অগ্নি প্রাপ্ত হইয়া গুরুপদেশে রূপ এই সকল বাক্য দ্বারায় রিপুকে দমিত করিতে হইবে। সেই সকল উপদেশ রূপ বাক্য সকল গুরুদত্ত কার্য্যরূপ অগ্নিতে বাতাস দিবার ন্যায় সর্ব্বদা মনে মনে স্মরণ করিয়া সৎ অসৎ বিচার করিলে তবে ইন্দ্রিয় ও রিপুকুল দমিত হইতে পারে জানিবে, নচেৎ অপক্ক অবস্থায় থাকিয়া যায়। অগ্নি ব্যতিত যেমন কেবল শাস্ত্রোক্ত নীতি বাক্য দ্বারায় ইন্দ্রিয় ও রিপুকুল কাহারও কোন কালে দমিত হইতে পারে না বরং অপক্ক অবস্থায় থাকিয়া যায়। অপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদি মনুষ্যের ভোগে না আসিয়া তাহা পশুর ভোগে আসিয়া থাকে। কারণ কাঁচা অপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদি মনুষ্য খাইতে পারে না। খাইলেও তাহা পরিপাক না হইয়া নানা রকম ব্যাধি

উৎপন্ন হইয়া শেষে জীবনান্তও হইতে পারে, তদ্রূপ অপক্ক ইন্দ্রিয়গণ ও রিপুগণের দ্বারায়ও মনুষ্যের এমত হয় যে শেষে নানা যন্ত্রণাদির সহিত অকালে কাল কবলে পতিত হইতে হয়। ইহা অপেক্ষায় আর শোচনীয় বিষয় কি হইতে পারে। অপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদি যেমন মনুষ্যের কোন কার্য্যেই আইসে না তদ্রূপ সাধকের ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ সুসিদ্ধ না হইলে সকল কর্মই ব্যর্থ হইয়া যায়। অপক্ক ইন্দ্রিয়গণ ও রিপুগণ কোন সৎকার্য্যেই আইসে না। এক্ষণে আমি তোমাকে দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ সম্বন্ধে কিছু বলিব তাহা শ্রবণ কর। সাধারণতঃ যাহাকে রাগ করা বা কাহারও উপর কুপিত হওয়াকে ক্রোধ কহা যায়। ইহার উৎপত্তি রজোগুণ হইতে, ইহার প্রকাশ লোভ হইতে,—একারণ ইহাকে লোভের পুত্রও বলা যাইতে পারে। প্রথমে তোমাকে বলিয়াছি রাগ করা বা রাগান্বিত হওয়াকে ক্রোধ বলা যায়। এই রাগ অর্থে অনুরাগ বুঝিও। লোভ কর্ত্তৃক বিষয়ানুরাগ বশতঃ ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ লোকর পত্নীতৃষ্ণা এই বিষয় তৃষ্ণার গর্ভে বিষয়প্রাপ্তির লোভবশতঃ, লোভ কর্ত্তৃক তৃষ্ণার গর্ভে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ক্রোধের দ্বারায় মানবের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া এবং সম্যকরূপে মোহ প্রাপ্ত করাইয়া পরিশেষে মানব আপনাকে আপনি নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই ক্রোধের একটি পত্নী আছে জানিবে, তাহার নাম হিংসা। এই হিংসা ক্রোধের ভগ্নী, ভগ্নীকেই ক্রোধ বিবাহ করেন। এই হিংসা ক্রোধ অপেক্ষাও ভয়ানক। সমস্ত রিপুগণেরই পত্নী আছে, রিপুগণের পত্নীরা রিপুগণ অপেক্ষায় ভয়ানক। পুরুষ অপেক্ষায় নারী রূপা প্রকৃতি সর্ব্বত্রেই ভয়ানক। একারণ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা অগ্রে করণীয় বলিয়া জানিবে। যেমন রতি বিহীন কাম সাক্ষাৎ পরমাত্মার রূপ। তদ্রূপ হিংসা রহিত ক্রোধও মানবকে শান্তি প্রদান করিয়া শান্ত ভাবে পরিণত করিয়া থাকে, শান্ত ভাবও পরমাত্মার রূপ। এই ক্রোধ হইতে হিংসার গর্ভে কলির উৎপত্তি জানিবে। কলি কাহাকে বলে তাহা তোমার নিশ্চয়ই জানা নাই। জানা না থাকিবারই কথা, কারণ তুমি খোকা। বড় বড় ওজনের খোকাদেরই ভিতর প্রায় অনেকে জানে না তখন তোমার ইহা জানা থাকা অসম্ভব।

সাধারণ লোকে বর্ত্তমান কালকে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়কে কলিকাল বলিয়া থাকে, অবশ্য ইহা ভ্রান্ত লোকেরাই বলিয়া থাকে। কারণ কাল কখন কলি হইতে পারে না। কালের নিত্যতা বিধায় কাল পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া জানিবে। কালের সাম্যাবস্থাই পরমাত্মার রূপ অর্থাৎ কালের সংযম রূপ অবস্থাই পরমাত্মার রূপ। কাল অনন্ত, এই কাল প্রাণ রূপে ঘটস্থ হইয়া বাম ও দক্ষিণ নাসিকা দিয়া গতি বিচ্ছেদ দ্বারায় গমনাগমন করে। উক্ত গতি বিচ্ছেদ রূপ অবস্থার নাম কাল ইহা জীব মাত্রেরই জনক স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এই কাল প্রতি ঘটে ঘটে বর্ত্তমান প্রাণ কর্মরূপে চলিতেছেন। এই বর্ত্তমান প্রাণকর্ম যাহা তোমার আমার এবং সকলকার শরীরে চলিতেছেন। এই বর্ত্তমান প্রাণকর্ম যাহা তোমার আমার এবং সকলকার শরীরে চলিতেছে ইহাকে আশ্রয় করিয়া রিপুগণ এবং

তাহাদের পত্নীগণ বায়ু রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে দেহে রিপুগণ ও তৎ তৎ পত্নীগণের অধিকার বর্ত্তমান থাকে তাহা সাক্ষাৎ কলির দেহ বলিয়া জানিবে। ক্রোধ হইতে হিংসার গর্ভে যখন কলির উৎপত্তি তখন তোমার ক্রোধকে ও হিংসাকে দমিত করা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে, তাহা না করিলে তুমি স্বয়ংই কলিরূপে পরিণত হইবে। কলির পত্নীর নাম দুরুক্তি, এই দুরুক্তিও ক্রোধের কন্যা। হিংসার গর্ভে দুরুক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং কলি নিজ ভগ্নীকেই বিবাহ করেন। দুরুক্তি অর্থাৎ কটুভাষিণী অর্থাৎ যে বাক্য প্রয়োগ দ্বারায় অপরের ক্রোধ ও হিংসার উদয় হইয়া থাকে তাহাকেই দুরুক্তি কহা যায় এই দুরুক্তিকে দমিত করিবার জন্য সর্বদা তুমি আপন মনে কটু ভাষাকে স্থান না দিয়া প্রিয় ও মিষ্ট ভাষাকে স্মরণ পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। কদাচ কটু ভাষা কাহার প্রতি প্রয়োগ করিবে না, ইহা নর নারীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। তাহার পর হিংসাকে দমিত করিবার জন্যও তোমার প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা যদি তুমি না কর তাহা হইলে তুমি হিংসার বশীভূত হইয়া চলিলে তোমার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়া তুমি কলিরূপে পরিণত হইবে। যত রকম দুষ্কর্ম জগতে আছে তৎসমুদয় কলি ভাবাপন্ন জীবের অকরণীয় বলিয়া জ্ঞান থাকে না।

একারণ তোমার কলির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রথমতঃ হিংসাকে দমন করা কর্ত্তব্য। কারণ হিংসার অস্তিত্ব তোমার মনে থাকিলেই কলিরও বর্ত্তমানতা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব হিংসাকে দমিত করিবার জন্য আপন মনে সর্ব্বদা জীবের প্রতি দয়া ভাব রাখিবে এবং অহিংসাকে মৈত্রী ভাবে সঙ্গিনী করিয়া রাখিবে। গুরুদত্ত আত্মকর্মের সহিত এই সকল বাক্য পালন করিয়া চলিলে নিশ্চয়ই তুমি একদিন হিংসাকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবে। হিংসাকে জয় করিতে পরিলে তোমার ক্রোধকে জয় করিতে বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আরো বিশেষ, হিংসা রহিত যে ক্রোধ উহা ক্রোধের মধ্যেই গণ্য নহে জানিবে। ক্রোধকে দমিত করিবার জন্য তুমি আপনাকে আপনি ছোট বোধ করিবে। জগতে জীব মাত্রকেই তুমি গুরুবৎ জ্ঞান করিয়া আপনাকে শিষ্য মনে করিবে, কারণ প্রত্যেক জীবেতেই সৎ অসৎ গুণ বর্ত্তমান থাকে। জীব মাত্রেরই ইহা ধর্ম। অতএব জীব মাত্রকেই গুরুবৎ জ্ঞানে জীবের অসৎ গুণ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা সদগুণ আছে তাহা আপনাকে আপনি শিষ্য বোধে সদগুণ সকল গ্রহণ করিবে। নিজেকে উচ্চ বা গুরু বোধ থাকিলে প্রত্যেক জীবেতে যে সকল সদগুণ আছে তাহা তোমার লক্ষ্য হইবে না, অতএব আপনাকে আপনি সর্বদা অণুবোধের দ্বারায় ক্রোধকে দমিত করিবার চেষ্টা করিবে।

জীবের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবে না এবং জীব মাত্রকেই কদাচ শত্রু বোধ করা চাহি না, কারণ জীবমাত্রই শিব স্বরূপ মনে করিবে। প্রতি ঘটে ঘটে প্রাণ রূপে নারায়ণ পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রাণের প্রাণই পরমাত্মা বিশেষ, ইহা বিশ্বাস করিয়া চলিবে। তাহা হইলে কালে সাধন দ্বারায়, ইহা তোমার অনুভবও হইবে। বর্ত্তমান চঞ্চল

প্রাণই জীব পদবাচ্য, ইহাকে শিব স্বরূপ মনে করিয়া বা নারায়ণ, ভগবান, ঈশ্বর মনে করিয়া কোন জীবের উপর তোমার ক্রোধ ভাব হওয়া বা শত্রু বোধ করা চাহি না। কারণ তাহা হইলে তোমার ভগবানের উপর বা ঈশ্বরের উপর ক্রোধ বা শত্রুভাব করা হইবে। তোমার প্রতি যদি কেহ ক্রোধিত হয় বা তোমাকে যদি কোন লোক শত্রু বোধ করে, তাহা হইলে তুমি যেমন তাহার প্রতি কখন সন্তুষ্ট থাকিতে পার না তদ্রূপ তুমি কোন জীবের প্রতি ক্রোধিত হইলে বা তোমার শত্রু বোধ থাকিলে, ভগবানও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না। কারণ জীবদেহ মাত্রেই তিনি রহিয়াছেন। দেহ তিনি নহেন দেহস্থিত প্রাণই তিনি। এই প্রাণই ঈশ্বর পদবাচ্য বলিয়া জানিবে। তোমার প্রতি কেহ ক্রোধিত হইলে তুমি যেমত তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাক না তদ্রূপ ঈশ্বরও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না। ভগবান ঈশ্বর দর্পণ স্বরূপ। তুমি যদি কোন দর্পণের সম্মুখে ক্রোধান্বিত হইয়া রাগ ভরে দন্ডায়মান হও তাহা হইলে দর্পণস্থিত তোমার প্রতিবিম্বও ঠিক তোমার মতন অবিকল তোমার অনুরূপা হইয়া থাকে। তদ্রূপ তুমি কোন জীবের উপর ক্রোধী বা রাগযুক্ত হইলে, প্রাণরূপ ঈশ্বরও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন না, বা তুমি তাঁহার নিকট হইতে দয়াও প্রাপ্ত হইবে না। অতএব তোমার কর্ত্তব্য সর্বদা জীবের প্রতি দয়া ভাব এবং প্রেম ভাব (ভালবাসা) রাখা; ইহা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। তাহা হইলে তুমিও ভগবান ঈশ্বরের নিকট হইতে দয়া ও প্রেম (ভালবাসা) নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে নচেৎ নহে।

তুমি আরো একটি বিষয়ে সর্বদা সর্তক ভাবে থাকিবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। যে বিষয় বা বস্তু তোমার নহে, তাহা প্রাপ্তির জন্য কদাচ লোভ করিও না। কারণ লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, একারণ পর দ্রব্যে বা অপরের কোন বিষয়ে কদাচ লোভ করিও না। অপরের কোন বিষয়ে বা বস্তুতে লোভ হইলে তাহার অপ্রাপ্তিতে লোভ কর্ত্তৃক ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, একারণ পর দ্রব্য বা পর বিষয়ের প্রাপ্তির ইচ্ছা মনে মনেও করিও না। মনে থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই একদিন কার্য্যে পরিণত হইয়া সেই মন মধ্যস্থ লোভ কর্ত্তৃক ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া তোমাকে সম্যক রূপে মোহিত করিয়া তোমার পূর্বস্মৃতি নষ্ট করাইয়া তৎপরে তোমার বিবেকিনী বুদ্ধি অর্থাৎ আত্ম বিষয়ণী বুদ্ধি নষ্ট করাইয়া তোমার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করাইতে পারে। অতএব সাবধান থাকিবে মনে মনেও কদাচ অপরের কোন বিষয় বা বস্তু প্রাপ্তির চিন্তা করিবে না। অবশ্য এক্ষণে তোমার মনে মনে তাহা চিন্তা হইতে পারে সত্য, কারণ তোমার বর্ত্তমান মনের উপর তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহা হইলেও তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করা চাহি। তাহার পর গুরুদত্ত আত্ম কর্মরূপ অগ্নি যখন প্রাপ্ত হইবে, সেই গুরুদত্ত অগ্নিতে বাতাস দিবার ন্যায় এই সকল বাক্য অনুযায়ী চলিতে চলিতে তোমার মন মধ্যস্থ আধিরূপ মনের বাহ্য চিন্তাও হ্রাস পাইয়া ক্রমশঃ তুমি অকামী অক্রোধী নির্লোভী হইতে পারিবে। যতদিন না তুমি গুরুদত্ত রূপ কর্ম প্রাপ্ত হও, এবং গুরুদত্ত রূপ অগ্নি স্বরূপ কর্ম প্রাপ্ত হইয়া যতদিন না গুরুদত্ত আত্ম কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পার ততদিন পূর্ব উক্ত অগ্নিতে

বাতাস দিবার ন্যায় উক্ত বাক্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই উপদেশ বাক্যগুলি আপন মনে অঙ্কিত করিয়া স্মরণ পথে রাখিবে। ইহাতে হয়ত তোমার স্বতঃই মনে হইতে পারে যে যদি ক্রোধই আমার দমিত হইয়া গেল বা কাহার প্রতি আমি ক্রোধ না করি তাহা হইলে লোকে আমাকে মারিতে আসিলে, আমি আমাকে বা আমার বিষয়াদি কিরূপে রক্ষা করিব। তদুত্তরে আমি একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর।

কোন একটি গ্রামের অনতিদূরে একটি নিবিড় অরণ্য ছিল, এবং সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ পর্বতও ছিল, পর্বতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বন পাদপে পরিপূর্ণ ছিল। সেই বনের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা আপন আপন গবাদি পশু সমূহকে চারণ করাইবার জন্য উক্ত বনে পশু সমূহকে চরাইতে অর্থাৎ আপন আপন পশুগণকে ঘাস, পাতা, লতা, খাওয়াইবার জন্য নিত্য পশুগণকে লইয়া যাইত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহাদের কাহার কাহার ছাগ বা মেষ একটি বা কোন দিন দুটি কাহার না কাহার কমিয়া যাইত। কেন কমিয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে একদিন কোন রাখাল দেখিতে পাইল যে একটি ভয়ানক মোটা অজগর সর্প একটা বৎসতরীকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতেছে, বৎসতরীটা প্রাণভয়ে চীৎকার করিতেছে। রাখাল তাহা দেখিয়া অপরাপর রাখালগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—ভাই সকল, অজগর সর্পে আমার বৎসতরীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, তোমরা আসিয়া রক্ষা কর। রাখালের আহ্বান সূচক উচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া অপরাপর রাখালগণ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, অজগর বৎসতরীকে গ্রাস করিতেছে। সকলে মিলিয়া বৎসতরীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা দূর হইতে করিতে লাগিল, নিকটে কেহই যাইতে সাহস করিতে পারিল না। অবশেষে অজগর বৎসতরীকে গ্রাস করিয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক রাখালগণকে আক্রমণ করিবার জন্য আগমণ করিতে লাগিল, এবং পলায়ন করিবার সময়ে আপন আপন পশুগণকে যথাসম্ভব, নিকটে যাহারা চরিতেছিল তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া পড়িল। তদবধি আর কেহ এই বনে আপন আপন গবাদি পশু চরাইতে যাইত না, এবং নরনারীও কেহ সেই বনে অজগরের ভয়ে যাইত না।

কিছুদিন পরে একদিন প্রত্যুষে উক্ত জঙ্গলের দিকে এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল; আপনি সম্মুখস্থ জঙ্গলে যাইবেন না। কারণ উক্ত জঙ্গলে একটি ভয়ানক অজগর সর্প গহ্বরে বাস করিয়া থাকে। আমরা কেহই উক্ত জঙ্গলে যাই না এবং আমাদের গবাদি পশুগণকে উক্ত জঙ্গলে চরাই না। ইহা শুনিয়া উক্ত ব্যক্তি বলিলেন আমি কাহাকেও ভয় করি না। আমি অজগরের ভক্ষ্য বস্তু নহি, কারণ আমি ভগবানের দাস। ইহা বলিয়া কাহারও নিষেধ না শুনিয়া তিনি উক্ত জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অজগর সর্পের সম্মুখীন হইলেন। সর্প সাধারণতঃ খল স্বভাব হইয়া থাকে। যে অপরের হিংসা করিয়া থাকে তাহাকে খল কহা যায়। সর্পই যে খল

স্বভাব বিশিষ্ট, অপর খল যে আর নাই তাহা মনে করিও না। নর-নারীগণের মধ্যেও অনেক সর্পের ন্যায় খল স্বভাব বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অন্তর খলতারূপ বিষে পরিপূর্ণ এবং মুখে মিষ্ট ভাষা, ইহারা সর্প অপেক্ষাও ভয়ানক জানিবে। কারণ সর্পকে মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা বশীভূত করা যায়, কিন্তু খল স্বভাব বিশিষ্ট নরনারীকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারা যায় না। ইহারা সৎ লোকের সর্বদা বড় হিংসা ও কুৎসা করিতে থাকে। একারণ ইহারা সর্প অপেক্ষায়ও ভয়ানক হিংস্রক বলিয়া জানিবে, এবং তুমিও কাহারও সহিত খলতা করিও না। সকলকে নিজের মতন দেখিয়া অহিংসা ভাবের দ্বারায় নিজের খল স্বভাবকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে।

তাহার পর উপরোক্ত ব্যক্তি সর্পের সম্মুখীন হইলে পর, সর্প মুখব্যাদান পূর্বক উপরোক্ত সাধু ব্যক্তিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, গুরুরূপী সাধু, সর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অজগর তোমার অহিংসাই ধর্ম, তুমি অকারণ হিংসা করিয়া কেন নিজের অধোগতি করিতেছ? ইহাতে তোমাকে জন্ম জন্ম সর্প যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে অতএব তুমি অকারণ হিংসা করিও না। কালরূপী অজগর সর্প সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুকে বিনীত ভাবে বলিল, তবে আমার গতি কি হইবে? অজগরের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুরূপী সাধু অজগরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অজগর কাহাকে বলে শ্রবণ কর। অজগর শব্দের সাধারণ অর্থ, যাহারা ছাগল ভক্ষণ করিয়া থাকে। কারণ অজ শব্দের অর্থ ছাগলও হয়, কেবল এই কারণেই যে তোমাকে অজগর কহা যায় তাহা নহে। অজ শব্দে, অজ-গমন করা, বর্ত্তমান প্রাণরূপ জীবাত্মা জীব দেহ হইতে সর্বদাই গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই জীবাত্মাও অজ স্বরূপ এই জীবাত্মার বহির্গমন তোমার স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ভাবে তুমি ভক্ষণ করিয়া অনায়াসে বাহ্যিক আহার পরিত্যাগ করিয়াও থাকিতে পার বলিয়া তোমাকে অজগর কহা হইয়া থাকে। সর্প জাতির সাধারণ নাম 'বায়ুভুক' অতএব তুমি কোন প্রাণীকে হিংসা না করিয়া বর্ত্তমান প্রাণবায়ু যাহা গমনাগমন করিতেছে তাহার উর্দ্ধাধঃরূপ গতিকে ভক্ষণ করিয়া উর্দ্ধাধঃরূপ গতির অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ কর। অজগর সাধু বাক্য স্বীকৃত হইয়া উপরোক্ত সাধুকে কহিল অদ্যাবধি আমি তাহাই করিব, আর কোন প্রাণীর হিংসা করিব না।

সাধু ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে, যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া বনের বাহির দিকে আসিতে লাগিলেন। অজগর সর্পও পর্বতের পাদদেশে কুণ্ডুলি পাকাইয়া পড়িয়া রহিল। সাধু ক্রমশঃ অরণ্য পার হইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র, গ্রামের লোক সকল সাধুকে অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া, সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় আপনি অরণ্য মধ্যে গিয়েছিলেন কি? এবং তথায় কোন অজগর সর্প দেখিয়াছেন কি? সাধু তদুত্তরে গ্রামস্থ লোক সমূহকে বলিলেন, হাঁ আমি একটি বৃহদাকার অজগর সর্পকে পর্বতের পাদদেশে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সেই অজগর সর্প কাহারও হিংসা করে না। সে অত্যন্ত নিরীহ। ইহা বলিয়া সাধু

তথা হইতে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। সাধু চলিয়া গেলে পর কেহ কেহ বলিতে লাগিল, উনি সাধু লোক, সাধু লোককে কোন হিংস্র জন্তুতে হিংসা করে না। আবার কেহ বা বলিতে লাগিল সর্পের সাধু অসাধু বোধ থাকা কি সম্ভবপর। সর্পটা হয়ত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে বা হয়ত মরিয়া পড়িয়া আছে, সুতরাং উহাকে হিংসা করে নাই। এইরূপ যাহার যে বিশ্বাস সে সেই মত বলিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি লোক বলিল, চল না ভাই আমরা একবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়া ব্যাপার কি দেখিয়া আসি। সকলে মিলিয়া যাইলে আর ভয় কিসের একলা যাইলে অবশ্য ভয় হইতে পারে। ইহাতে সকলে সম্মত হইলে, তথা হইতে সকলে জঙ্গলের দিকে যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চলিতে চলিতে পর্বতের কিছুদূর হইতে তাহারা দেখিতে পাইল সর্পটা কুন্ডুলি পাকাইয়া পর্বতের পাদদেশে পড়িয়া আছে। তাহারা ইহা দেখিয়া দূর হইতে সর্পকে লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। দু-চারটা পাথর সর্পের গায়েও লাগিল। অজগর সব সহ্য করিয়া পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভাবিল, সর্পটা নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন চল আমরা বাড়ী যাই আবার আহারাদি করিয়া আরো বেশী লোক সমভিব্যহারে আসা যাইবে। বেলা অনেক হইয়াছে ইহা বলিয়া সকলে ফিরিয়া আসিল।

লোক সকল ফিরিয়া আসিলেই পূর্ব্বোক্ত গুরুরূপী সাধু অজগর সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত হইয়া অজগরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বৎস অজগর, আমি তোমাকে হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছি কিন্তু গর্জ্জন করিতে নিষেধ করি নাই। কোন লোক তোমাকে মারিতে চেষ্টা করিলে, তুমি গর্জ্জন করিয়া তাড়া করিবে কিন্তু দংশন বা ভক্ষণ করিও না। তুমি গর্জ্জন করিয়া তাড়া করিলে সকলে ভয়ে পলায়ন করিবে। ইহা না করিলে তোমার মস্তকে যদি একটা পাথর আসিয়া পড়ে তাহা হইলে মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমাকে অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সর্প যোনিও প্রাপ্ত হইতে হইবে। একারণ তোমার কেহ অনিষ্ট করিতে আসিলে তুমি তাহাদের উপর গর্জ্জন করিয়া তাড়া করিবে তাহা হইলে তাহারা ভয়ে পলাইয়া যাইবে এবং তোমারও কোন অনিষ্ট হইবে না। ইহা বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন।

অতএব বাবা খোকা, তুমি কোন জীবের প্রতি ক্রোধ বা হিংসা না করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ক্রোধ ভাব দেখাইয়া চলিবে মাত্র। কাহার উপর আন্তরিক ক্রোধী হইও না বা কাহাকেও হিংসা কদাচ করিও না। কারণ ঈশ্বর সকল ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন; তুমি যাহার উপর ক্রোধ বা হিংসা করিবে উহা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের উপর যাইয়া পড়িবে। তাহা হইলে তুমি কখন ঈশ্বরের নিকট হইতে কোন কালেও দয়া প্রাপ্ত হইবে না জানিবে। জীবের ক্রোধের মতন শত্রু জগতে আর দ্বিতীয় নাই, ক্রোধোন্মত্ত জীব আপনাকে আপনিও হত্যা করিতে পারে। একারণ জীবের উপর ক্রোধ না করিয়া ক্রোধের উপর ক্রোধ করিয়া অলোভের দ্বারায় ক্রোধরূপ অসুরকে সমূলে মন হইতে

বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। কাম (কামনা) এবং ক্রোধ, রিপুর মধ্যে ইহারা মহাপাপী এবং দুরাত্মা, জীবকে সদাই কুকর্ম্মে লিপ্ত করিয়া, আত্মাতে থাকিতে না দিয়া অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিতে না দিয়া ইহাদের অধিকারে রাখিয়া থাকে। আত্মকর্ম ব্যতীত কেবল মৌখিক নীতি বা হিত বাক্যের দ্বারায় ইহাদের জয় করা অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে আমি তোমাকে তৃতীয় রিপু লোভ সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। মনের যে বৃত্তির দ্বারায় পর দ্রব্য বা অপরের বিষয়াদি গ্রহণ করিবার অভিলাষ হয় তাহাকেই লোভ কহা যায়। এই লোভের দুইটি সহচরী আছে তাহারা লোভের পত্নী বিশেষ—প্রথমটি তৃষ্ণা, দ্বিতীয়টি লালসা। প্রথম তৃষ্ণা—এই তৃষ্ণাকে কাম পুত্রী কহা যায়, কারণ কামনা হইতে তৃষ্ণার উদ্ভব হইয়া থাকে। কামনা না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে জীবের তৃপ্তি কোথায়। এই তৃষ্ণারূপা রাক্ষসীর দ্বারায় তৃপ্তি লাভে জীব বঞ্চিত হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান মনের মধ্যে পরবিত্তাদি লাভের যে আশা রহিয়াছে, তাহা কর্ত্তৃকও জীব তৃপ্তি লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে এই বিষয়াদি লাভের আশাকে লালসা কহা যায়। রামায়ণের লঙ্কা কান্ডের অভিনয়ে হনুমানের লাঙ্গুল দগ্ধের বিবরণ রূপকচ্ছলে যাহা লিখিত আছে তাহা এই আশাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। হনুমানের লাঙ্গুল আশার স্বরূপ। হনুমানের লাঙ্গুলে লঙ্কাস্থিত নর-নারীগণের বস্ত্র তৈলে ভিজাইয়া যত দেওয়া হয় দুধ আঙ্গুল ফাঁক পড়ে কিছুতেই আর সম্যকরূপে লাঙ্গুলে কাপড় বেষ্টন করিতে পারে না, তদ্রূপ আশাকেও জানিবে। জীবের আশা কিছুতেই মিটে না। সাধারণ লোক হইতে জমিদার, রাজা মহারাজ, সম্রাট—ইহাদের মধ্যে কাহার আশা জীবিতাবস্থায় মিটে না। যত বিষয় সম্পত্তি বাড়ে তাহার সহিত আশাও বাড়িয়া যায়। হনুমানের লাঙ্গুলের ন্যায় দু'আঙ্গুল ফাঁক থাকে। কিছুতেই পিপাশা বা বিষয় স্পৃহা যায় না। এই আশাকে নিস্পৃহ অবস্থা দ্বারায় দমিত করা উচিত, নিস্পৃহ না হইলে তৃপ্তিলাভ জীবের হয় না। এই নিস্পৃহ অবস্থা লাভ, নীতি বিচার দ্বারায় বা মৌখিক ধর্ম চর্চ্চার দ্বারায় কাহারও লাভ হয় না। বাহ্যিক ভাবে কেহ আপনাকে নিস্পৃহ ভাব দেখাইলেও তাহাকে কপটী মনে করা চাহি।

নিস্পৃহ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্পৃহা রহিত অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত অবস্থা। বর্ত্তমান প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থা বর্ত্তমান থাকিতে কেহই নিস্পৃহ বা ইচ্ছা রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে। যিনি সাধন দ্বারায় বর্ত্তমান প্রাণকর্ম রূপ মধ্য অবস্থার অতীত অবস্থার জ্ঞান সম্যক লাভ করিয়া তাহাতে নিজ মনকে যুক্ত করিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তিনি সম্যক নিস্পৃহ। তাঁহাকেই ইচ্ছা রহিত বলিয়া জানিবে। কারণ বর্ত্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার অতীতাবস্থায় কোন ইচ্ছাই থাকে না। ইহা নিজ বোধরূপ অবস্থা, আর যিনি বর্ত্তমান প্রাণকর্ম রূপ মধ্য অবস্থার অতীতাবস্থা লাভের জন্য উপরোক্ত নীতি সকল পূর্ব্বোক্তরূপ অগ্নিতে বাতাস দিবার ন্যায় পালন করিয়া সাধনের অভ্যাস

করিতেছেন, তিনিও মধ্য মধ্য কতকটা নিস্পৃহ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অপরের নহে জানিবে। এই নিস্পৃহ অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে তাঁহারই তৃপ্তিরূপ শান্তিলাভ হইয়াছে, কারণ বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্য অবস্থাই ইচ্ছার অবস্থা। এই অবস্থার অতীতাবস্থায় ইচ্ছা নাই, সুতরাং ইচ্ছা রহিত অবস্থাই তৃপ্তি বা শান্তি। ইচ্ছার সহিত অবস্থার কাহার তৃপ্তি বা শান্তি থাকিতে পারে না। যাহার শান্তি আছে তাহার সর্ব বিষয়েই সন্তোষ আছে। যাহার অন্তরে সর্বদা সন্তোষ থাকে তাহার অন্তরে লোভ থাকিতে পারে না, সুতরাং সন্তোষ যুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সকল ধন বা বিষয় ধুলির ন্যায় গণ্য হইয়া হতলোভ হইয়া থাকে। অতএব বাবা খোকা তুমি সন্তোষের দ্বারায় অর্থাৎ অন্তরে সর্বদা সন্তোষ ভাব রাখিয়া লোভকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিবে তাহা হইলে তুমি অনেকটা পরিমাণে বর্ত্তমানে লোভের হস্ত হইতে দূরে থাকিতে পারিবে।

এইবার আমি তোমাকে চতুর্থ রিপু মোহ সম্বন্ধে কিছু বলিব তাহা শ্রবণ কর। ইহাকে মহা মোহ কহা যায়, সাধারণ ভ্রান্ত বুদ্ধির মানবেরা যেমন বলিয়া থাকে, অমুককে ভূতে পাইয়াছে। বস্তুতঃ ভূত, প্রেত কিছু নাই। মনের যে অবস্থার দ্বারায় ভ্রান্তভাব উদয় হয় তাহাই ভূত, প্রেত পদবাচ্য। এই মোহরূপ অসুরও ভূত, প্রেত বা রাক্ষস বিশেষ। বর্ত্তমান প্রাণ কর্ম্মের মধ্যাবস্থার বিকার ভাব হইতে জাত যে ভোগ কান্ত নামক বায়ু, তিনিই মহামোহ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। ইনি বর্ত্তমান মনকে, ভূতে পাওয়ার মতন আশ্রয় করিয়া মনের পুত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া দেহাদিতে আত্ম বোধের সহিত আমি আমার বিষয়ে ভ্রান্ত ভাবে আসক্ত। বর্ত্তমানে এই মোহ প্রবৃত্তি পক্ষের নেতা বা রাজা ইহার অনেক সহচর আছে তাহার মধ্যে দম্ভ এবং অহঙ্কার এই দুটি প্রধান এবং ইহার দুটি প্রধান সহচরীও আছে। প্রথম বিভ্রম মতি, দ্বিতীয় নাস্তিকতা ভাব। যাহারা পরমাত্মা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাহাদিগকেই লোকে নাস্তিক কহিয়া থাকে। বস্তুতঃ মানবের মধ্যে কেহ নাস্তিক নাই, পরমাত্মা পরমেশ্বরই একমাত্র নাস্তিক পদবাচ্য। কারণ তিনি ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তিনিই একমাত্র আছেন ও থাকিবেন। তাঁহাকে নাস্তিক বলিবার আমার অভিপ্রায় এই কারণে, তিনি ব্যতীত যখন অপর কিছুই নাই তখন তিনি আর কাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন। সুতরাং তিনিই একমাত্র নাস্তিক পদবাচ্য অপরে নহে। তবে যে আপনাকে আপনি নাস্তিক বলিয়া প্রকাশ করে তাহা তাহার মোহ কর্তৃক বলিয়া থাকে। তাহা কেবল আপন ইন্দ্রিয় ভোগ চরিতার্থতার জন্য মোহ কর্তৃক মোহের সহচরী বিভ্রম মতি অর্থাৎ ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারায় বিমোহিত হইয়া কহিয়া থাকে।

মনে কর আমি যদি বলি ঘট নাই, তাহা হইলে কি আমার ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল না। স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন মানব ইহাতে অনায়াসে বলিতে পারেন, ঘট যখন

নাই তখন ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে না। বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ ঘট শব্দ উচ্চারণ করাতে ইহাই প্রণিধান হইতেছে যে ঘট ছিল হয়ত এক্ষণে নাই। ঘটের অস্তিত্ব না থাকিলে ঘট শব্দেরও আমার জ্ঞান থাকিত না। যখন ঘট শব্দের আমার জ্ঞান রহিয়াছে তখন ঘটের অস্তিত্বও অবশ্যম্ভাবী, এমন স্থলে আমার ঘট নাই বলায় কেবল ভ্রান্ত ভাবের পরিচয় দেওয়া মাত্র, তদ্রূপ ঈশ্বর শব্দ ও নাম যখন রহিয়াছে তখন তাহা নাই বলাও বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। ঘটের স্থুলত্ব বিধায় ঘট বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মনের গোচর হইয়া থাকে, কিন্তু ঘটাকাশ জড় ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। যাহাকে ঈশ্বর বলা হয় তিনি আকাশের অপেক্ষায় সূক্ষ্ম। আকাশের আকাশ অর্থাৎ পরব্যোম স্বরূপ মহাপ্রাণ, তিনি সকল ঘটে ঘটে বিরাজ করিয়াও জীবের বর্ত্তমান বাহ্যইন্দ্রিয়ের ও বর্ত্তমান বুদ্ধির অগোচর। বর্ত্তমান মনের অগোচর বলিবার কারণ বর্ত্তমান মনকে মোহরূপ অসুর, জীবকে ভূতে পাওয়ার ন্যায় আশ্রয় করিয়া থাকার ন্যায় ভূতরূপী মোহ আশ্রয় করিয়া থাকায় মোহের সহচরী বিভ্রম মতিরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি কর্ত্তৃক বর্তমান মনের বিকারভাব আনয়ন করিয়া বর্ত্তমান মনের পার্থিব বিষয় ব্যতীত অপার্থিব বিষয় সমূহে ভ্রান্তি আনয়ন দ্বারায় ভ্রান্তভাবে অপার্থিব বিষয় সমূহকে দর্শন করাইতেছে। মনুষ্যকে যেমন ভূতে পাইলে ভূতের রোজার দ্বারায় এবং মন্ত্র ঔষধি দ্বারায় ভূত ছাড়ান হইয়া থাকে, তদ্রূপ বর্তমান মনকে ভূত গ্রস্ত অবস্থা হইতে মুক্ত করা চাহি। বর্তমান মন অন্ধ, বর্তমানে তাহার চক্ষু নাই, তাহার চক্ষুষ্মান অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন তাহার মোহরূপ ভূতে পাওয়া অবস্থা অন্তর্হিত হইবে নচেৎ নহে।

সহজ কর্মের অভ্যাস দ্বারায় যখন সহজাবস্থা জীব প্রাপ্ত হইবে তখনই বর্তমান মন চক্ষুষ্মান হইবে নচেৎ আজীবন মোহরূপ ভূতে পাইয়া থাকিবে এবং নানাপ্রকার জ্বালা অশান্তি ভোগ করিতে হইবে যেমত জীবের হইতেছে। অতএব বাবা খোকা, তুমি নাস্তিকতা ভাবের সংক্ষেপতঃ কিছু বলিলাম। মনের মধ্যে নাস্তিকতা ভাব বর্তমান থাকিতে দুষ্টা প্রবৃত্তির কার্য্য যথা ইচ্ছা প্রবৃত্তির কার্য্য ইন্দ্রিয় উপভোগ সুচারু ভাবে চলিয়া কালে জীবন ক্রমশঃ কাল কবলে পতিত হইয়া কালের ভক্ষ্য বস্তুকে পরিণত হইয়া কালের করাল দন্তে পেষিত হইয়া বার বার নিকৃষ্ট যোনিতে যাতায়াত করিয়া দেহান্তে বা জীবদ্দশায় ঘোর অশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা প্রথমে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আত্মকর্মের দ্বারায় কালের সেবা রূপ পূজা (পূজা সম্বর্দ্ধন) করিয়া কালের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মহাকালরূপ পরমাত্মার অভক্ষ্য. তাঁহাদের কালের করাল দন্তে চর্ব্বিত বা পেষিত হইতে হয় না ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া জানিবে। একারণ বাবা খোকা, তুমি সতত নাস্তিকতা ভাব হইতে দূরে থাকিবে। সর্বদা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, আমার কিছু নহে এবং আমিও কিছু নহি, যাহা কিছু আমার বলিতে আছে তৎসমুদয় পরমাত্মা পরমেশ্বরের—এই ভাব অন্তরে রাখিয়া

আত্মকর্ম প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়া যাইবে। তাহা হইলে একদিন নিশ্চয়ই তুমি এই মোহরূপ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। নরনারী সকলেই মোহ কর্তৃক "আমার" সমস্ত এই বোধের দ্বারায় শোক তাপ নানাপ্রকার জ্বালা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব বাবা খোকা, তুমি "আমার" বোধ কোন বিষয়েই রাখিবে না। সর্বদা স্মরণ রাখিবে সব তাঁর, আমার কিছুই নহে।

মনে কর, তুমি এই যে কাপড়খানি পরিয়া আছ তোমার ঐ কাপড়খানিতে আমার বলিয়া বোধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। মনে কর, তোমার ঐ কাপড়খানি হারাইয়া গেলে তোমার কষ্ট হইয়া থাকে ত'? আমি আমার মা'র কথার উত্তরে বলিলাম,—হাঁ মা, আমার একটু সামান্য কষ্ট হয় সত্য—সামান্য কষ্ট হয়। কারণ আমার কাপড়খানি সামান্য কাপড়, ইহার দাম কম। কিন্তু আমার কোন বহু মূল্যের পোযাক, যে পোষাক আমি খুব ভালবাসি, তাহা হারাইয়া গেলে আমার বড় বেশী কষ্ট হইয়া থাকে মা। হাঁ বাবা খোকা, ইহাতে তোমারই ঐরূপ কষ্ট হইয়া থাকে তাহা নহে। সাধারণ নরনারীগণের যাহার যে যে বিষয়ে ভালবাসার সহিত আমার বোধ দৃঢ়ভাবে থাকে, তাহারা তৎ তৎ বিষয়ের অভাব জনিত নানারকম শোক তাপ জ্বালা আজীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আচ্ছা মা, আমি এইবার হইতে আমার কিছুই নহে সব ভগবানের এই কথা স্মরণ পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। কিন্তু মা আমার যখন কিছুই নহে, এমত স্থলে যদি কেহ আমার সাক্ষাতেই আমার কোন বস্তু লইয়া যায়, তাহা হইলে আমার তাহাকে কোন রকম বাধা দেওয়া বা লইতে নিষেধ করা উচিত নহে। এমত স্থলে অপরে অবাধে সকলের বিষয় সম্পত্তি লইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আমার বা অপরের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। এমন স্থলে আমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে বলিয়া দাও।

মা আমার এই সকল কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, বাবা খোকা আমি তোমার এই প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বাবা খোকা, মনে কর আমাদের এই সংসারের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি—যাহা কিছু আছে তাহা কি তোমার? না মা ইহা আমার নহে সত্য, ইহা সমস্তই আমার বাবার এবং তোমার। তবে ইহার মধ্য হইতে যাহা কিছু আমাকে তোমরা দিয়াছ তাহাত আমার। হাঁ বাবা খোকা তাহা তোমার সত্য, কিন্তু আমরা তোমাকে তাহা ভোগ করিতে দিয়াছি তাহার অপচয় করিতে ত' দিই নাই। তোমাকে যে সকল বিষয় ভোগ করিতে দিয়াছি এবং তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করিতেও বলিয়া দিয়াছি। যদি তুমি যত্নের সহিত সেই আমাদের দত্ত বিষয় সকল অসাবধানতার দরুণ অপচয় কর বা তাহা নষ্ট কর বা তোমার অসাবধানতায় সেই সকল বিষয় অপরে লইয়া যায় বা তুমি স্বয়ং কর্ত্তা বোধে আমাদের অজ্ঞাতে অর্থাৎ আমাদের না বলিয়া কাহাকেও দাও, তাহা হইলে তুমি যেমত আমাদের নিকট হইতে

দণ্ড বা তাড়না প্রাপ্ত হইয়া থাক, তদ্রূপ বর্ত্তমান দৃশ্যমান অনিত্য জগৎরূপ সংসারে যাহার যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই পরম পিতা পরমাত্মা ভগবানের। তিনি আমাদের আদি পিতা স্বরূপ, তাঁহার দত্ত বিষয় রত্ন যাহার যাহা আছে তৎসমুদয়ই তাঁহার, তাঁহাকে না বলিয়া বা তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত স্বইচ্ছায় কোন বিষয় নষ্ট করা বা ত্যাগ করা উচিত নহে। তিনি আমাদের যাহাকে যাহা দিয়াছেন, বা দিতেছেন তিনি ইহা বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা আপন আপন গৃহস্থালিকে আমারই সংসার বলিয়া জানিবে। আমি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। তোমরা আমারই সংসার বলিয়া জানিবে। আমি কর্ত্তাভাবে গৃহস্থালিস্থিত পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি যাহা যাহা আবশ্যক হয় তৎসমুদয় আমার স্বরূপ গৃহস্থ ধর্ম পালন করিয়া চল তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে।

তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা ইহা হয়ত তুমি বুঝিতে পারিলে না। একারণ ইহা তোমাকে আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর। পূর্বে বলিয়াছি এই অনিত্য বাহ্য জগৎরূপ সংসারে তিনিই পিতা স্বরূপ প্রভু। শাস্ত্রাদিতে এবং গুরুমুখে শুনিয়াছি এবং যুক্তি দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন আছে যে প্রাণই আত্মা পদবাচ্য। এই স্থির প্রাণরূপ আত্মা হইতে সর্বপ্রাণী ও সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং প্রাণই পিতৃপদবাচ্য। কাহার প্রাণ না থাকিলে পুত্র বা কন্যা কিছুই উৎপন্ন হয় না এবং নিজের অস্তিত্বও থাকে না। সুতরাং প্রাণ যে পিতৃপদবাচ্য তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। এক্ষণে মনে কর এই প্রাণ দেহাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়া অকর্ত্তাভাবে কার্য্য করিতেছে কি না জীবরে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণ আপন ভাবে মগ্ন হইয়া দেহের যথাসাধ্য পোষণ কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন কোন অশান্তির ছায়া মাত্র তাঁহাতে নাই। কিন্তু বর্তমান দেহের মধ্যস্থিত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির নায়ক, বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ হইতে জাত যে মন, সেই মন বিচলিত ভাবে ভ্রান্ত হইয়া অহং কর্ত্তা জ্ঞানে অর্থাৎ আমি কর্ত্তা জ্ঞানে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে দারুণ জ্বালা, অশান্তি ও কষ্ট পাইতেছে, ইহা সত্য কিনা? হাঁ মা, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই সত্য। কারণ আমি দেখিয়াছি আমার বর্ত্তমান মনের, যেখানে নিজের কর্ত্তৃত্বের অভাব হইয়া থাকে, অমনি আমারও অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি সবই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে মা। মা, আমি যেন বর্ত্তমান মন হইয়া রহিয়াছি। আমি বর্ত্তমানে মনের অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব মনে করিয়া থাকি। এক্ষণে মা, তোমার বাক্যে বুঝিলাম আমি মন নহি আমি প্রাণ স্বরূপ।

যাহা হউক মা, আমি অদ্য তোমার নিকট অনেক ভাল কথা শুনিতেছি তাহা মনে রাখিতে পারিলে হয়। আমি যে এই সকল বাক্য মনে রাখিতে পারিব তাহা বিশ্বাস হইতেছে না, কারণ আমি যখন মনোময় হইয়া রহিয়াছি, আর মন যখন আমার ভ্রান্ত তখন আমি যে ভ্রান্ত তাহাতে আর আমার কোন সন্দেহই নাই। তবে আমার এই

বর্ত্তমান ভ্রান্তভাবে এই সকল উপদেশ বাক্য অনুসারে আমার মনকে যে চালিত করিতে পারিব তাহা বোধ হইতেছে না। তবে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আমার এবং আমার বর্ত্তমান মনের কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া, তুমি যেমত ভাবে বলিলে, যে, আমার কিছু নহে, সব ভগবানের। আমিও অদ্যাবধি এই ভাব অন্তরে রাখিয়া সমস্ত করিবার চেষ্টা করিব। তাহার পর মা আমার এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—বাবা খোকা, তুমি মনের দুর্বলতা করিও না। চেষ্টা ও যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি মনের দৃঢ়তার সহিত প্রাণপণে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তাহার পর যখন তুমি গুরুপদেশে আত্মকর্মরূপ অগ্নি প্রাপ্ত হইবে সেই আত্মকর্ম তোমাকে সাহায্য করিয়া, তোমায় আত্মতুল্য করিয়া লইবে। তবে তোমার যত্ন চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকা চাহি তাহা হইলেই তুমি সর্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। অতএব তুমি রিপুকুলকে দমিত করিবার অভিপ্রায়ে আত্মকর্ম নির্বাহ অবিচলিতভাবে উৎসাহের সহিত প্রাণপণে শত্রু দমনের নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। তোমার সর্বদা মনে রাখা উচিত ইন্দ্রিয়গণ ও রিপুকুল পরম শত্রু, অপর শত্রু তোমার নাই। ইহারা জীব মাত্রকে আশু সুখের প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, তাহার পর আজীবন জীবকে নানারূপ ক্লেশ, অশান্তি ও অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের অপেক্ষায়, পরম শত্রু আর অপর কেহ নাই জানিবে।

এক্ষণে আমি তোমাকে পঞ্চম রিপু মদ সম্বন্ধে কিছু বলিব তাহা শ্রবণ কর। এই মদরূপ অসুরকে মহামোহের সহচর বলিয়া জানিবে। যাহার দ্বারায় মত্ততা জন্মায় তাহাকে মদ ভাব বলিয়া জানিবে। এই মদভাবের একটি প্রধান অনুচর আছে, তাহার নাম অসৎ সঙ্গ,—এই অসৎ সঙ্গ হইতে তোমার দূরে থাকা উচিত। তোমাকে বলিয়াছি যাহার দ্বারায় মত্ততা জন্মায় তাহাকে মদ ভাব কহা যায়। এক্ষণে কাহার দ্বারা জীবের মত্ততা জন্মায় তাহা তোমার জানা আবশ্যক। মদিরা জনিত মন বিকারকে মত্ততা কহা যায়। মদিরা সাধারণ মদকে কহা যায় এবং গাঞ্জা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন (আফিং) এগুলিও মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। অনেক ভ্রান্ত বুদ্ধি বিশিষ্ট মানব ধর্মের দোহাই দিয়া দেবতার প্রিয় বলিয়া ইহা সেবন করিয়া থাকে এবং অপরকেও ইহা সেবন করাইবার পরামর্শ দিয়া সেবন করাইয়া মাদকসেবীর দলপুষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদিগকে অসৎ সঙ্গ রোধে, ইহাদের ছায়াও কদাচ স্পর্শ করিও না। মাদকসেবী কোন অকার্য্য বা পাপ কর্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না, মদিরা পানের দ্বারা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ আশু আনন্দ বোধ করিয়া তাহার পর সেই মদিরা জনিত আনন্দ দ্বারায় সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সকল রকম পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। মদিরা কর্ত্তৃক নর হত্যা, পরদার গমণ, চৌর্য্য বৃত্তি, দস্যুতা প্রভৃতি সকল কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে। যত প্রকার উৎকট ব্যাধি আছে তৎসমুদয়ই মদিরা-সেবন করিবার পরিণাম ভোগ করিয়া থাকে। অতএব

মদিরাকে রাক্ষসী জ্ঞানে, মদিরা হইতে দূরে থাকিবে এবং মদ্য সেবনকারীকে রাক্ষস বোধে তৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। এই সকল বাহ্য জড়মদ সম্বন্ধে তোমাকে বলিলাম, ইহা অপেক্ষায় সূক্ষ্ম অপর মদ যাহা আছে তাহাও জড়মদ অপেক্ষায় কোন অংশে ন্যূন নহে। ন্যূন নহে বলিবার কারণ তাহাতেও জীব মত্ত হইয়া থাকে।

এই মদরূপ অসুরেরও তিনটি সহচর আছে—প্রথম; অহঙ্কার, দ্বিতীয়; গর্ব (দম্ভ) তৃতীয়; দর্প। দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ আপন মনে অভিমান উৎপন্ন হইয়া মনের অন্তঃকরণ দ্বারায় আপনাকে আপনি বড়জ্ঞান করাকে অহঙ্কার বলা যায়। যেমন আমি কর্ত্তা, আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমি পণ্ডিত, আমি বিদ্বান, আমি সাধু, আমার সদৃশ ভূতলে গুণবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, রূপবান আর কেহ নাই। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ মদভাবে প্রায়শঃ সমস্ত জীব মত্ত হইয়া রহিয়াছে। অথচ আমি কে তাহার বিন্দুমাত্রও অবগত নহে। তাহার পর গর্ব অর্থাৎ দৈব কর্ত্তৃক কিছু ঐশ্বর্য্যাদি লাভ জনিত নিজেকে বুদ্ধিমান বা ধনবান বা বিদ্বান বা গুণবান ইত্যাদি মনে করিয়া অপরকে অবজ্ঞা করা বা ঘৃণার চক্ষে দেখারূপ অবস্থাকে গর্ব কহা যায়। তাহার পর, দম্ভ আর গর্ব প্রায় তুল্য জানিবে। উপরন্তু গর্ব্বিতভাবে পূজাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, লোভ ও বঞ্চনা সহকারে যাহা করা তাহাকেই দম্ভ কহা যায় এবং উপরোক্ত গর্বভাবের সহিত নটের ন্যায় সাধুবেশ ধারণ করিয়া নিজের সম্মান প্রাপ্তি বা ধন প্রাপ্তির লালসায় ধার্মিকভাব বাহ্যিকে প্রকাশ করাকে দম্ভ কহা যায়। তোমার পিতার নিকট হইতে একটি শ্লোকও এ সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ কর।

ধর্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো, লোক দম্ভক। (মনু)। ধর্মধ্বজী কাহাকে বলে তাহাও বাবা খোকা তোমার জানা আবশ্যক, যাহারা ধর্মের ধ্বজ অর্থাৎ জটা কৌপনাদি বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করিয়া সমাজে সাধু বা ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে অথচ লোকের নিকট পরিচিত ও গণনীয় হইবার জন্য এরূপ বেশ ধারণ বা বাহ্যিক ভাব ভঙ্গি ও বাহ্যিক আচার দেখাইয়া ধর্মের কথোপকোথন করিয়া লোকগণকে এক আধটা মন্ত্র বা দেবতার নাম উপদেশ দিয়া প্রতারিত করিয়া থাকে তাহাদিগকে ধর্মধ্বজী কহা যায়। বাবা খোকা, তুমি সর্বদা এইরূপ প্রকৃতির বেশধারী সাধুগণের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। কারণ ইহারা ছদ্মবেশী প্রতারক, ইহারা বাহ্যিক ফল কামনার প্রলোভনে জীবকে মোহিত করাইয়া নিজের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাদিগকে দাম্ভিক ধর্মধ্বজী মনে করিবে। বলা বাহুল্য তুমি স্বয়ং কদাচ ধর্মধ্বজী হইও না।

এইবার তোমাকে দর্প সম্বন্ধে কিছু বলিব তাহা শ্রবণ কর। উপরোক্ত নিজের শ্রেষ্ঠাভিমানে উত্তেজিত হইয়া তেজের সহিত নিজের গরিমা প্রকাশ করাকে দর্প কহা যায়। এইরূপ আত্ম গরিমারূপ দর্প হইতে তোমার সাবধান থাকা আবশ্যক। কোন

রকম দর্পভাব মনে উদয় হইলে আপনাকে আপনি অণুবোধের দ্বারায়, আমি সকল বিষয়েই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠাভিমানকে নষ্ট করিবে। যেমত সুগন্ধ পুষ্পের বৃক্ষে সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে পুষ্প যেমত কাহাকেও গন্ধ গ্রহণের জন্য ডাকিতে যায় না এবং নিজের সুগন্ধের জন্যও অহঙ্কৃত না হইয়া আপন স্বভাবের ভাবেই প্রকাশ থাকে। তাহার পর বায়ু কর্ত্তৃক গন্ধ চালিত করিয়া লইয়া যায়। সেই সময় সুগন্ধ প্রিয় লোকসকল সুগন্ধ প্রাপ্তে সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য যেদিক হইতে সুগন্ধ আসিতেছে সেই দিকে সুগন্ধের অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পের নিকটে আসিয়া পুষ্পের গন্ধে আনন্দিত হইয়া গন্ধ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, আবার কেহ বা পুষ্পটি তুলিয়া লইয়া যায়, কাহার সন্তোষ অসন্তোষে পুষ্পের কোন প্রকার সন্তোষ বা অসন্তোষ ভাব থাকে না, এবং পুষ্প আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করে না। বাবা খোকা তোমার জ্ঞানরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তুমিও পুষ্পের ন্যায় ভাবে থাকিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। কোন মতে নিজেকে অহঙ্কৃত বোধ করা বা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বোধ করা তাহা কদাচ করিবে না।

জগৎ অনন্ত, এই অনন্তরূপ জগতের তুলনায় তুমি যে কত ক্ষুদ্র তাহার পরিমাপ করাও দুঃসাধ্য। এমত অবস্থায় তোমার কোন বিষয়েই মদ, অহঙ্কার, গর্ব বা দর্প করা কেবল বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র। এই অনন্ত জগতে তোমাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ যে আর কেহ নাই তাহা হইতে পারে না। যদি তুমি অহঙ্কার বশতঃ গর্বিতভাবে বল যে আমাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই তাহা হইলে তোমার অহঙ্কৃত ভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। আমি না হয় মনে করিলাম তোমাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। কিন্তু মনে কর যে মহাশক্তির দ্বারায় এই বাহ্য জগৎ চরাচর বিধি পূর্বক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চালিত হইতেছে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহা শক্তি অপেক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই যে হীনভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সেই মহা শক্তিই তোমার শরীরস্থিত স্থির প্রাণ। তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তাভাবে প্রতি ঘটে ঘটে বিরাজ করিয়া সমগ্র জীবের পোষণ করিতেছেন। সেই মহাপ্রাণশক্তির সহিত মিলিত হইবার জন্য, অকর্ত্তাভাবে থাকিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম যাহা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না করিয়া কর্মের অনুরোধে অকর্ত্তা বোধে সমস্ত কর্ম করিয়া চলা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে মহামোহের সহচর মদরূপ মহাসুর বা তদনুচরগণ বর্ত্তমান মনের আশ্রয় আপনি ত্যাগ করিবে। ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া মনে রাখিবে, কূটনীতি দ্বারায় ইহা খণ্ডন করিতে যাইবে না। কূটনীতি যাহা তোমার মনে সময় সময় উদয় হইবে তাহাকে বিভ্রম মতির সখী মনে করিয়া কূটনীতিকে দূরে পরিত্যাগ করিবে। কূটনীতিকে মনের মধ্যে স্থান দিবে না।

এক্ষণে আমি ষষ্ঠ রিপু মাৎসর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। জীবগণের পরম শত্রু আসুরিক

ভাবরূপ রিপুগণের বিষয় বলা শেষ করিব। মাৎসর্য্য ভাব কাহাকে বলে তাহা শ্রবণ কর। এই মাৎসর্য্য ভাবও বর্ত্তমান মনকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অপরের শুভ বিষয়ে বা অপরের কোন রকম ভাল হইতে দেখিলে তাহার প্রতি যে বিরাগ ভাব বা দ্বেষ ভাব, তাহাকে মাৎসর্য্য কহা যায়। অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা, এই মাৎসর্য্য ভাব কম বা বেশী ভাবে কিছু না কিছু সমস্ত জীবের মন মধ্যে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া জীবকে আসুরিক ভাবের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মাৎসর্য্য ভাবকে দমিত করিবার জন্য তুমি সর্বদা জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় এমত কার্য্যে রত থাকিবে। আসুরিক ভাব জীবের মনে থাকিতে জীবের মঙ্গল কিছুই হইতে পারে না তাহাও জানিবে। একারণ সতত চেষ্টা করিবে যাহাতে জীব সকল আসুরিক ভাবের হস্ত হইতে পরিত্রান প্রাপ্ত হয়। অর্থাদি বা কেবল সেবার দ্বারায় তুমি জীবের প্রকৃত মঙ্গল করিতে সক্ষম হইবে না। তবে যথাসাধ্য আপনাকে বাঁচাইয়া অর্থ বা সেবা তাহাও করিতে পার। অগ্রে তুমি আপনাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে, কারণ তুমিও জীবের মধ্যে। তুমি যদি আপনার মঙ্গল না করিতে পার তাহা হইলে তুমি অপরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতএব তোমার অগ্রে আপনাকে রক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সক্ষম হইলে তখন অপর জীবের সাহায্য করিতেও সক্ষম হইবে। তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তুমি সর্বত্রেই বিফল মনোরথ হইবে।

জীবের প্রতি দয়া, ধর্ম, দান, সেবা ভক্তি এই সকল মনুষ্যের আপন আপন বাটীতে বসিয়া শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রথমে নিজ নিজ বাটীতে বসিয়া শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। প্রথমে জীবের প্রতি দয়া করা, মনে কর তুমিও জীবপদবাচ্য, অগ্রে তোমার নিজের প্রতি দয়া করিয়া যাহাতে আত্মোন্নতি লাভ হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। নিজের যাহাতে স্বাস্থ্য হানি না হয়, নিজে যাহাতে কুপথে না যাও তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করা। তাহার পর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি নিজ পরিবারস্থ যাঁহারা আছেন তাঁহাদের প্রতি দয়া ভাবের কার্য্য দেখাইয়া নিজের দয়া ভাবের উন্নতি করা কর্ত্তব্য। দয়াই ধর্মের রূপ, এই দয়া যাহার অন্তরে নাই, তাহাকে ধর্মহীন পশু মনে করিবে। অনেকে নিজের পরিবারস্থ লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ না করিয়া যশঃ প্রত্যাশায় অপর লোকের প্রতি বাহ্যিক দয়ার কার্য্য স্বার্থের সহিত করিয়া থাকে। তাহাদের সঙ্গ কদাচ করিও না। কারণ যে ব্যক্তি নিজের প্রতি দয়া না করিয়া বা আপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি আত্মীয়জনের প্রতি দয়া ভাব না দেখাইয়া অপরের প্রতি দয়াভাব দেখাইতে গিয়া থাকে সে আপনিই আপনার শত্রু। কারণ যাহার আপনার প্রতি দয়া নাই বা আত্মীয়গণের প্রতি দয়া নাই তাহার বাহ্যিক ভাবের দয়া নাই বুঝিতে হইবে। তাহারা যে দয়া ভাব দেখাইয়া থাকে তাহা তামসিক ভাবের দয়া। যে আপনাকে রক্ষা না

করিয়া বা আত্মীয়গণকে রক্ষা না করিয়া আপনার অধোগতি করিয়া থাকে তাহাকে আত্ম শত্রু মনে করা উচিত। যে আত্ম শত্রু সে সকলেরই শত্রু বলিয়া মনে করিবে। অগ্রে আপনাকে এবং পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণকে রক্ষা করিয়া, তাহার পর প্রতিবেশীগণকে দয়ার কার্য্য দ্বারায় রক্ষা করিবার যত্ন পাইবে। প্রতিবেশীগণকে দয়ার দ্বারায় রক্ষার উপায় স্থির করিয়া তাহার পর গ্রামস্থ লোকের স্থিতির উপায় করিবে। তাহার পর ক্রমশঃ গ্রামান্তর হইতে গ্রামান্তরে, দেশান্তর হইতে দেশান্তরের লোকের প্রতি দয়ার কার্য্য দ্বারায় লোকের স্থিতির উপায় করিবে। এইরূপ ভাবে দানাদিও করিবে, দয়া এবং দান অগ্রে নিজবাটী হইতে আরম্ভ করিবে। কারণ, মনে কর তোমার বাটীস্থ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি পরিবারস্থ আত্মীয়গণ যদি অন্নাভাবে কষ্ট পায়, আর তুমি যদি বাহিরে অপর দেশস্থ লোকদের প্রতি অন্নদানের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে কি তোমার তাহা সৎনীতির ব্যবস্থা করা হইবে? আমার বিবেচনায় উহাকে আমি কুনীতি বলিয়াই মনে করিব। কারণ আমি যাঁহাদের কর্ত্তৃক শৈশব কাল হইতে অতি যত্নের দ্বারায় লালিত ও পালিত হইয়া আসিতেছি, যাঁহারা আমার অসমর্থ অবস্থায় নানা রকম সেবা দ্বারায় লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ, কষ্ট যদি আমি না দেখি তাহা হইলে আমার ন্যায় পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ আর কে আছে। অতএব জীব মাত্রেরই পূর্বোক্ত ভাবে দয়া, ধর্ম, দান, ভক্তি অগ্রে নিজ বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া বাটীস্থ লোকের প্রতি দয়া, ধর্ম, দান—এই সকল বিষয়ের যাঁহার যাহা অভাব আছে তাহা পূরণ করাইয়া তাহার পর সাধ্যমত পূর্বোক্ত ভাবে পর পর ভাবে প্রতিবেশী হইতে দেশ দেশান্তরের লোকের জন্য দান ধর্মের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

নিজেকে সর্বদা সন্তোষভাবে রাখিবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ পিতা মাতা ও ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখিয়া সন্তুষ্ট হন তুমিও সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। যদি দৈব কর্তৃক অতি কষ্টের অবস্থায় পতি হও তাহা হইলেও ব্যাকুল না হইয়া ধীরভাবে সেই কষ্টের অবস্থা সন্তোষের সহিত সহ্য করিয়া চলিবে। কারণ সুখ বা দুঃখ ইহারা আগমাপায়ী অর্থাৎ অনিত্য। আজ আছে পরে যাইতে পারে। যেমত রাত্র বা দিবা। রাত্রের পর দিবস আইসে, দিবার পর রাত্র আইসে—তদ্রূপ সুখ ও দুঃখ, কষ্টকে জানিবে। কারণ আজীবন সুখও কাহার থাকে না এবং আজীবন কষ্টও কাহারও থাকে না। তুমি বাহ্যিক সুখ দুঃখতে মনের হর্ষ বা বিষাদ বোধ করিও না। কারণ, ইহারা অনিত্য, চিরস্থায়ী নহে। এই সকল সন্তোষের সহিত সহ্য করিয়া চলিবে, তাহা হইলে পরিণামে তুমি নিশ্চয়ই শান্তিরূপ সুখ প্রাপ্ত হইবে। তবে আমার এই সকল উপদেশ বাক্যগুলি আত্মকর্মের অনুষ্ঠানের সহিত পালন করিয়া চলিলে জীব মাত্রেরই ইহা কার্য্যকরী হইবে। নচেৎ কথায় পরিণত হইবে। বাক্যবাগীশ সাধু অনেক আছে, তাহারা

কথায় সাধুভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকায় কার্য্যে তাহারা নরকের কীট অপেক্ষায়ও ঘৃণিত। অতএব তুমি কথার সাধু না হইয়া, আমার উপরোক্ত বাক্য সমুহ আত্মকর্ম্মরূপ কার্য্যের সহিত পালন করিবার বিশেযরূপ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে তুমি যথার্থ সাধু পদবাচ্য হইবে। ভেক বা বেশ ধারণ করিলে সাধু হয় না তাহারা ধর্ম্মধ্বজী, তুমি ধর্ম্মধ্বজী হইও না। কারণ ধর্ম্মধ্বজী জ্ঞানীগণের নিকটে অতি ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে, অতএব ধর্ম্মধ্বজী ভাব মন হইতে পরিত্যাগ করিবে, ইহাই আমার তোমার প্রতি একমাত্র অনুরোধ। রিপুগণের সম্বন্ধে যাহা যাহা তোমাকে বলিলাম এই সকল তুমি স্মরণ পথে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে।

আমার মা এই সকল কথা বলিয়া তাহার পর আমার চিবুক ধারণ করিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিলেন,—কেমন খোকা উপরোক্ত বিষয়গুলি পালন করিয়া চলিতে পারিবে ত? আমি মা'র কথার উত্তরে বালভাবের সহিত আদুরে ভাবের কথায় বলিলাম,—হাঁ, মা, তাহা আমি পালন করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। তবে তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে মনে করিয়া দিও, কি জানি যদি ভুলিয়া যাই। এমন সময় আমার বাবা, আমার যে ঘরের মধ্যে ছিলাম সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। আমি বাবাকে দেখিয়া মা'র কোল হইতে উঠিয়াই বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলাম অদ্য আমি মা'র নিকট হইতে অনেক ভাল কথা শুনিয়াছি। ইস্কুল হইতে আসার পর হইতে মা আমাকে অনেক সদুপদেশ বাক্য সকল বলিতেছিলেন। বাবাকে ইহা বলিবার পরই মা বাবাকে বলিলেন,—অদ্য যখন আপনি খোকাকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য খোকাকে লইতে আসেন, তাহার পূর্ব্বে খোকা যাহা আমাকে বলিয়াছে, তাহা শুনিয়া আপনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। বাবা ইহা শুনিয়া আমার মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা কি কথা বলিয়াছে তাহা বলনা শুনা যাক। তাহার পর মা বলিলেন, অদ্য আমাকে খোকা জিজ্ঞাসা করিল, মা আমাকে আজ কোথায় যাইতে হইবে। ইহা বলায় আমি খোকাকে বলিলাম, তোমাকে অদ্য বিদ্যালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে ইত্যাদি বাক্য আমার নিকট হইতে শুনিবার পর, খোকা বলিল, মা তবে আমি বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যালাভ করিয়া আসিয়া সেই বিদ্যাকে তোমাদের দাসী করিয়া রাখিয়া দিব। তদুত্তরে আমি বলিলাম বাবা খোকা তুমি কি আমার গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর যে, তুমি বিদ্যালাভে সক্ষম হইবে? সেই সময়ে আপনি তাড়াতাড়ি করায় আপনাকে বলিবার সময় পাই নাই। এক্ষণে আপনাকে উক্ত কথা বলিবার আমার অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিদ্যাসুন্দরের বিষয়টি ভাল করিয়া খোকাকে বুঝাইয়া দিন এবং আমিও তাহা শ্রবণ করি। বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারির চিত্র যাহা অজ্ঞ নর-নারীর হৃদয়ে অঙ্কিত আছে তাহা নিতান্ত ঘৃণার বিষয়। তাহার প্রকৃত

রহস্য, মূঢ়ভাবে খোকার জানা না থাকিলে, ভবিষ্যতে খোকার বিদ্যাসুন্দরের ঘৃণিত ভাবে আস্থা হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহার প্রকৃত গূঢ় রহস্যটা প্রকাশ করিয়া বলুন আমারও দ্বিতীয় বার শ্রবণ করা হইবে। ভাল যত অধিকবার শ্রবণ করা যায় ততই ফলদায়ক হয়। ইহা বলিয়া আমার মা চুপ করিলে পর, বাবা উহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি ও আমার মা তাহা স্থিরভাবে শুনিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"রামপ্রসাদ"

বাবা প্রথমতঃ বলিলেন, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থখানি সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেনের রচিত। রামপ্রসাদ সেন সিদ্ধ পুরুষ এবং প্রকৃত সাধু ছিলেন। তিনি বেশধারী বা বাহ্যিক ত্যাগী পুরুষ ছিলেন না। তিনি যথার্থ ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার দ্বারায় যে একটা রাজবংশের গুপ্ত কেলেঙ্কারির বিষয় প্রকাশ হওয়া ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সিদ্ধ সাধুগণের বাক্য যাহা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই আত্মভাব হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ জীবের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। জীব সমুদয়ের হৃদয়ে অভাবের ভাব বর্তমান থাকায় তাহাদের যাহার যেমত পশুভাব অন্তরে থাকে সেই পশুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন ভাব অনুযায়ী অর্থ করিয়া সিদ্ধ, মুক্ত, ঋষিগণের ভাবকে কলঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ সমাজে তাহার প্রচার করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যাভিমানে শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত সৎভাবের পরিবর্তে অসৎ ভাবের অভিনয় করিয়া কেলেঙ্কারিতে পরিণত করিয়াছে। রচয়িতা পরমাত্ম ভাবের উপর লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন, সাধারণের পরমাত্মভাবের জ্ঞান না থাকায় তাহারা রচয়িতার ভাব অবগত না থাকায় সাধারণ ভাবেই বুঝিয়া থাকে। পরমাত্মভাব শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারায় অবগত হওয়া যায় না। এবং সাধন ব্যতীত সাধকের ভাবও অবগত হওয়া যায় না। এই কারণে, সাধারণে শাস্ত্রাদি এবং সিদ্ধ মুক্তগণের বাক্যাদি বুঝিতে না পারিয়া আপন আপন ইষ্টদেবেরও অবমাননা এবং ইষ্টদেবগকে সং সাজাইয়া যাত্রা অভিনয় ইত্যাদি করিয়া জ্ঞান সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে এবং আপন আপন ইষ্টদেবগণকে পশু ভাবের চিত্রে চিত্রিত করিয়া রঙ্গ, কুৎসিত রসালাপ প্রভৃতি করিয়া থাকে। এই সব কারণে, অনেকে দেবগণের উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকে, দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখিয়াছ মানুষের বেলা অর্থাৎ সাধারণ অজ্ঞ জীব যাত্রা অভিনয়, কথকতা শ্রবণ করিয়া বা যাত্রা নাটক অভিনয় দেখিয়া তাহারা মনে করে দেবগণও আমাদের মতন ইন্দ্রিয়

চরিতার্থ বেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ বা পাপ হয় না, আর যত দোষ বা পাপ আমাদেরই হইয়া থাকে। এই কারণে, তাহারা উক্ত কথা এইরূপে বলিয়া থাকে যে "আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখিয়াছ মানুষের বেলা"। ইহারা যে ভ্রান্ত তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আরো বিশেষ, আমাদের দেশের লোকের ভেকধারী সাধু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ কথকগণের প্রতি বিশ্বাস থাকায় অজ্ঞ জীব যাহাদের জ্ঞান স্ত্রীলোকের মতন, তাহারা উহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া মনে করিয়া লয় ইহারা যাহা বলিতেছেন বা যে অভিনয় করাইতেছেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য। অথচ তাহাদের মধ্যে এবং তাহাদের পথ প্রদর্শকের মধ্যে কেহই সংযমী না থাকায় উভয়েই ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পথপ্রদর্শক তাঁহারা সকলেই ধর্মধ্বজী যাহারা দর্শক তাহারা ধর্মধ্বজী রূপ পথপ্রদর্শকের অপেক্ষায় নিতান্ত মন্দ নহে। তবে তাহারা অসংযমী থাকায় মনের ইচ্ছা দমিত করিতে না পারায় তাহাদের স্বতঃই ভোগ ইচ্ছা প্রবল হইয়া মন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম ভয়ে কোন কোন অজয় জীব কার্য্যতঃই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে ভীত হয় এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করণে বিরত হইয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া অবশেষে অযথা দেবচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া দেবগণকে বলিয়া থাকে, "আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখিয়াছ মানুষের বেলা।"

যাহা হউক, অজ্ঞ জীবের ধর্মে বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত। ধর্মধ্বজী সাধু অপেক্ষায় তাহারা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কারণ ধর্মধ্বজীগণের অন্তরে ধর্মভয়ও নাই এবং সংযত ভাবও নাই। কেবল বাহ্যিক ধর্মের ধ্বজাস্বরূপ জটা কৌপিনাদি বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করিয়া সুখে জীবিকা নির্বাহ করে মাত্র। তবে তাহাদের মুখে ধর্মের বা শাস্ত্র বাক্যের অভাব প্রায়শঃ থাকে না। ব্যবসা চালাইবার জন্য শাস্ত্র বাক্যের সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের ধর্ম ভয় না থাকায় গোপনে কোন রকম অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কারণ, নরনারী সকলের ইহাদের নিকট হইতে সতর্ক থাকা নিতান্ত কর্তব্য। মনে কর যদি কোন অসংযত অভুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে কি তাহার ভোজন বা ভোগ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই মনে উদয় হইয়া উঠে না? তবে হয়ত লোক লজ্জা ভয়ে প্রকাশ্যে ভোজন বা ভোগ না করিতে পারে, কিন্তু গোপনে যে সে তাহার রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকলই সম্ভব তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। যাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধ মুক্ত ব্যক্তি তাঁহারা বাহ্যিক বেশভূষা, জটা কৌপীন ধারণ করেন না ইহা নিশ্চয় জানিবে। যেমন সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন কোন বাহ্যিক গৈরিকাদি বেশভূষা ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি নটের ন্যায় সাধু সাজাইয়া লোকের নিকটে উপস্থিত হইতেন না বা মঠ স্থাপন করিয়া মঠধারীও হয়েন নাই বরং তাহাতে ঘৃণাই বোধ করিতেন।

সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রথমতঃ তান্ত্রিক ভাবে সাধন করিতেন, তাহাতে তিনি সফল হন নাই ইহা তাঁহার রচিত প্রসাদ সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি জড়ভাবে কালীরই উপাসনা করিতেন। তাহার পর কালী কে, তাহাও তিনি যতটা সম্ভব প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। তবে সাধকের ভাব সাধারণের প্রণিধান হওয়া অসম্ভব, কারণ তিনি তাঁহার প্রসাদ সঙ্গীতে ইহা বলিয়া গিয়াছেন। আমি চাতারে (প্রকাশ্যে) কি ভেঙ্গে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা অর্থাৎ সাধন বিষয়ে এমন গুপ্ত বিষয় অনেক আছে যাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা একেবারে অযোগ্য, কারণ কার্য্যসিদ্ধির অভাব ঘটিয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন প্রথমতঃ জড় ভাবে কালীর উপাসনা বাহ্যিকতন্ত্র মতেই বিধিপূর্বক পঞ্চমুন্ডির আসনে আসন স্থাপন করিয়া সাধন করিতেন। এই সাধন দ্বারায় তাঁহার কালী বিষয়ক জ্ঞান কিছুই লাভ না হইলেও তিনি উদ্যম রহিত হইলে পর সদ্‌গুরুদত্ত সাধন দ্বারায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কালী বিষয়ক প্রথমে যে ভাব অন্তরে ছিল সে ভাবের তখন পরিবর্তন হইয়া হৃদয়ে নূতন ভাব প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার রচিত সঙ্গীতেই প্রকাশ আছে। তাঁহার রচিত দু'-একটি সঙ্গীত তোমাদের বুঝাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর। তিনি সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তাহার পর এই সঙ্গীতটি রচনা করেন।

এবার আমি ভাল ভেবেছি, এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি,
যে দেশে রজনী নাই সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা রাত্র সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।।
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি,
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।।
সোহাগা গন্ধক মিশাইয়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি,
মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি।।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়েরে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।।

এই সঙ্গীতটি শ্রবণ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি এই সময়েই সদ্‌গুরু লাভ করেন।

রামপ্রসাদ এই সঙ্গীত বলিতেছেন, এবার আমি ভাল ভেবেছি, অর্থাৎ এবার আমি খুব ভাল ভাব (ভাব অবস্থা বিশেষ) ভাবিয়াছি আর এই ভাব আমি যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের একটি লোকের কাছে পাইয়াছি। ইহাতে অবশ্য তোমরা বলিতে পার এমন দেশ কোথায় আছে যে, যেখানে রজনী নাই, ইহাত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি, এমন একটি দেশ রহিয়াছে যেখানে দিবাও নাই রজনীরূপ রাত্রিও নাই, কেবল প্রকাশ মাত্র রহিয়াছে। যদি বল সে দেশ কোথায়,

তদুত্তরে আমি বলিতেছি, সে দেশ দূরে নাই সমগ্র জীবের অতি নিকটেই রহিয়াছে, সে দেশটিকে উপদেশ কহা যায়। আর এই দেশ প্রত্যেক জীব দেহের অতি নিকটেই রহিয়াছে। উপদেশ শব্দের অর্থ, উপ = উপরি উপরিস্থিত যে দেশ তাহাকেই উপদেশ কহা যায়। ইহা আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে, অর্থাৎ ভ্রূমধ্যের ঊর্দ্ধে, সহস্রারে, এখানে দিবাও নাই রজনীরূপ রাত্রও নাই কেবল প্রকাশ মাত্র আছে। ইহা জীবের অতি নিকটে বলিবার অভিপ্রায়, জীব দেহের ভ্রূমধ্যের ঊর্দ্ধস্থিত স্থান দূর নহে, অতি নিকটেই রহিয়াছে। এই দেশে যিনি অবস্থিতি করেন তাঁহার নিকট রজনী ও দিবা নাই, অর্থাৎ যাঁহার মন সর্বদা সহস্রারে, ভ্রূর-মধ্যে ঊর্দ্ধে রমণ করিয়া থাকে তাঁহার নিকট রজনীও নাই, দিবাও নাই, কেবল মাত্র প্রকাশরূপ অবস্থা। ঐ প্রকাশতাটি বর্তমান থাকায় তাই বলা হইয়াছে, "যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পাইয়াছি", অর্থাৎ এই প্রকার লোকই সৎগুরু পদবাচ্য, অপরে নহে এবং এই প্রকার লোকই সাধক রামপ্রসাদ সেন পাইয়াছিলেন। কোন ভেকধারী বা বেশধারী সাধু লোকের কথা তিনি বলেন নাই।

তাহার পর প্রসাদ ঐ নিজ সঙ্গীতে বলিতেছেন আমার কিবা দিবা কিবা রাত্র, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি। সাধারণে বাহ্যিক সন্ধ্যা যাহা করিয়া থাকেন তাহাতে প্রকৃত সন্ধ্যার উপাসনা করা হয় না। কারণ সন্ধ্যার অবস্থা জীব অবগত নহে, কতগুলি শব্দ আবৃত্তি করিয়া যাইলেই, সন্ধ্যার উপাসনা করা হয় না বা সন্ধ্যা করা হয় না, এবং তাহাতে মনের শান্তিও হয় না। যে অবস্থায় রাত্রও নাই দিবাও নাই তাহাই সন্ধ্যা পদবাচ্য। রাত্র বা দিবার প্রকাশ থাকিতে সন্ধ্যার উদয় হয় না। গুণ ভেদে সন্ধ্যা ত্রিকালীন হইয়া থাকে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ঈড়া, পিঙ্গলা, সুযুম্না অর্থাৎ বাম নাসিকা দিয়া যে বায়ু বহন হইয়া থাকে তাহাকে চন্দ্র নাড়ী কহা যায়, ইহা রাত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তমঃগুণ। আর দক্ষিণ নাসিকা দিয়া যে বায়ু বহন হইয়া থাকে তাহাকে সূর্য্য নাড়ী কহা যায়। ইনি দিবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ রজঃগুণ। ইহার অতীত সত্ত্বগুণ, ভ্রূর মধ্যে অবস্থিত। ইহার মধ্যে ত্রিকাল রহিয়াছে। এই ত্রিকালকে যিনি অবগত আছেন তিনিই ত্রিকালজয়। সূর্য্য নাড়ীতে শ্বাসের বহন কালকে দিবা কহা যায় অর্থাৎ যখন কেবলমাত্র দক্ষিণ নাসিকা দিয়া শ্বাসের গতায়াত হইয়া থাকে তাহাকে দিবা কহা যায়। ইহার অস্ত কাল যখন দক্ষিণ নাসিকাতেও শ্বাসের গতি হইতেছে না এবং বাম নাসিকাতেও শ্বাসের গতি আরম্ভ হয় নাই, ইহাই সন্ধ্যা পদবাচ্য। এইরূপ অবস্থার ধ্যান বা স্মরণ করাকে সন্ধ্যার উপাসনা করা বলে, বা সন্ধ্যা করা কহা যায়। এইরূপ সন্ধ্যা করা বা সন্ধ্যার উপাসনা করা জীবের মধ্যে নাই, কারণ জীবের সন্ধ্যার অবস্থা উপলব্ধি না থাকায় সন্ধ্যা করা বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়া থাকে। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেন উপরোক্ত সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করিয়াছিলেন অর্থাৎ আত্ম কর্মের অভ্যাস দ্বারায় চন্দ্র

ও সূর্য্য নাড়ীস্থিত বায়ু স্বতঃস্থির হওয়ায় এবং তাঁহার শ্বাসের 'গতি নাসাভ্যন্তরচারী হওয়ায়, চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ীর গতির চঞ্চলতা না থাকায় তাঁহার সর্বদা সন্ধ্যাই বর্তমান থাকিত এবং তৎ-ধ্যানেই মগ্ন থাকিয়া সমস্ত করিতেন।

তাহার পর তাঁহার রচিত সঙ্গীতে বলিতেছেন, ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি। অর্থাৎ সন্ধ্যার ধ্যানে মগ্ন থাকায়, আর তাঁহার মোহরূপ নিদ্রা নাই কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ধ্যানে মগ্ন থাকিলে মোহ থাকিতে পারে না, কারণ সন্ধ্যা, সন্ধ্যাস্বরূপ জ্ঞানময়, যেখানে এই সন্ধ্যারূপ জ্ঞান অবস্থা বর্তমান থাকে তথায় অজ্ঞানরূপ মোহ বর্তমান থাকিতে পারে না এবং সাধারণ নিদ্রাও তখন চলিয়া গিয়া থাকে। সাধারণ জীব যাহাকে নিদ্রা বলিয়া থাকে তাহাও আর এখন তাঁহার নাই। যেমন যুবক যুবতীর প্রেমালাপ জনিত রাত্রে নিদ্রা না হইয়া প্রেমালাপে রাত্র কাটিয়া যায়, তদ্রূপ সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেনের সন্ধ্যার সহিত মিলন হওয়ায় সন্ধ্যার রসামৃত পানে বাহ্য নিদ্রাও তখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কেন না তিনি ইহার পরই বলিতেছেন, “ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি” অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলার মিলন অবস্থাকেই যুগ কহা যায়—(কারণ দুইয়ের একত্র অবস্থিতি অবস্থাকে যুগ কহে), এই মিলন অবস্থারূপ যুগে লক্ষ্য রাখিতে হইলে জাগ্রত অবস্থার প্রয়োজন। সুতরাং সন্ধ্যার সহিত বিচ্ছেদ যাহাতে না হইতে পারে এই কারণে ঈড়া পিঙ্গলার মিলন অবস্থারূপ যুগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাগিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সন্ধ্যার মিলনে ঘুমও তাঁহার ছাড়িয়াছে এবং জাগ্রত অবস্থাও প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থারূপ চৈতন্যভাব প্রাপ্তে মোহরূপ নিদ্রাও কাটিয়া গিয়াছে।

তাহার পর বলিতেছেন, যার ঘুম তাকে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়াইয়াছি অর্থাৎ এখানে দেখিতে হইবে কাহার ঘুম। ঘুম বা নিদ্রা ইহা মূর্চ্ছা বিশেষ। ইহার উৎপত্তি তমোগুণ হইতে। তিনি তমোগুণের ফল স্বরূপ যে নিদ্রারূপ রাক্ষসী তাহা তমোগুণকেই দিয়া, নিদ্রাকেই মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ তিনি জিতনিদ্রার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর বলিতেছেন সোহাগা গন্ধক মিশয়ে সোণাতে রং ধরাইয়াছি অর্থাৎ সোহাগা টঙ্কনকে কহা যায়। টঙ্ক শব্দের অর্থ বিশুদ্ধকরণ, ন শব্দের অর্থ শিব। গন্ধককে পার্বতীর বীর্য্য বলিয়া সাধক সমাজে কথিত হইয়া থাকে। এবং পারদকে শিব বীর্য্য বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে, তন্ত্রে ইহা উল্লেখ আছে। স্বয়ং বর্তমান প্রয়াণ শক্তিরূপা দেবী দুর্গাকে পার্বতী কহা যায়। স্বর্ণস্বরূপা আত্মজ্যোতিঃকে বিশুদ্ধ করিবার মানসে সহজ ক্রিয়া যোগের দ্বারায় শিবশক্তির সংমিশ্রণরূপ উপায় দ্বারায় স্বর্ণস্বরূপা আত্মজ্যোতিঃকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাহার পর বলিয়াছেন, মণি মন্দির মেজে দিব মনে এই আশা করেছি। মণিমন্দির মণিব্রহ্মযোনির অগ্রভাগ স্থানকে মণি কহা যায় অর্থাৎ গুহা স্বরূপ গগণ মন্ডলের অগ্রভাগের স্থানকে মণি কহা যায়, ইহা আজ্ঞাচক্রের (ভূর) মধ্যে অবস্থিত

স্থান। মন্দির জীবের শরীরকে কহা যায়; কারণ প্রত্যেক জীব শরীরে স্থির প্রাণরূপ আত্মা নারায়ণ অবস্থান করিয়া থাকেন বলিয়া দেহকে মন্দির কহা যায়। প্রসাদের দেহস্থিত মন্দির মধ্যে ব্রহ্মযোনির অগ্রভাগস্থিত যে স্থান, সেই স্থান পরিষ্কৃত না থাকায় সেই স্থানকে পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার আশা হইতেছে। ব্রহ্মযোনির অগ্রভাগ হইতে বর্তমান মনের বৃত্তি সকল বহির্চিন্তারূপে বহির্গত হইয়া উক্ত স্থানকে মলিন করিয়া রাখে। একারণ উক্ত স্থানকে সহজাবস্থার স্থিতির অভ্যাসে উপরোক্ত স্থানকে পরিষ্কৃত করিবার আশা করিতেছেন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য।

তাহার পর উক্ত সঙ্গীতে বলিয়াছেন, প্রসাদ বলে ভক্তিমুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। ইহার তাৎপর্য্য, প্রসাদ বলিতেছেন উক্ত ভজ্ সেবা করা, অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মা নারায়ণের সেবারূপ সহজ ক্রিয়ার দ্বারায় সহজাবস্থা লাভে (সহজ ক্রিয়ার অতীতাবস্থাকে সহজাবস্থা বলা যায়) ঐ সহজ ক্রিয়াকরারূপ সেবা অনুরাগকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছি, অর্থাৎ আপনাকে আপনি ভালবাসা; বলা বাহুল্য দেহকে মাত্র ভালবাসা নহে। তাহার পর মুক্তিকে মস্তকে ধারণ করিয়াছি; ভক্তি ও মুক্তি একই বিষয়। ভক্তির অবস্থা ও মুক্তির অবস্থা একই অবস্থা। তবে বাহ্যিকভাবে তিলক ফোঁটা কাটিয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত টিপ টিপ করিয়া শুধু মাথা ঠোকাকে ভক্তি কহা যায় না। উহা বাহ্যিক ভক্তি মাত্র, উহার নিকটে শান্তি বা মুক্তির ছায়া মাত্র থাকে না। তবে প্রথম অবস্থায় ইহা অকরণীয় নহে, ইহা মন্দের ভাল, অর্থাৎ কিছু না করা অপেক্ষায় কিছু করা ভাল এই মাত্র। অহৈতুকি ভক্তিই একমাত্র ভক্তি পদবাচ্য। তাহা সহজ ক্রিয়ার অভ্যাসে করিতে করিতে সহজ ক্রিয়ার অতীতাবস্থারূপ সহজাবস্থা লাভ হইলে অহৈতুকি ভক্তি বা সহজাবস্থা বা মুক্তি। ইহা সবই তুল্যাবস্থা জানিবে। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাই মুক্তিপদবাচ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি রিপুগণের প্রতি যে আসক্তি থাকে সেই অসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মোচন অবস্থাই মুক্তি পদবাচ্য ইহাকেই ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তি অবস্থা কহা যায়। উক্তরূপ ভক্তি মুক্তিকে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ নিজ শরীরের উত্তম স্থান যে মস্তক, সেই মস্তকে ধারণরূপ স্থিতি করিয়াছিলেন।

তাহার পর বলিতেছেন, এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি। এই সময়ে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবী শ্যামাকেই (কলিকাকেই) ব্রহ্ম জানিয়া অর্থাৎ শ্যামারূপ কালিকাকে ব্রহ্ম স্বরূপা বোধ করিয়া বাহ্যিক ধর্ম কর্ম সব ছাড়িয়াছিলেন। কালী যে কে তাহা তাঁহার রচিত সঙ্গীতে প্রকাশ আছে।

তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীতে কালী যে কে তাহা স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গীতটিও বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ বলিতেছেন; "কে জানে গো কালী কেমন, তাঁরে ষড়দর্শনে না পায় দর্শন" অর্থাৎ কালী যে কেমন কিরূপ, তাঁকে ষড়দর্শন বেত্তা বাহ্যিক পুঁথি পড়া পন্ডিতগণ জানেন না। "মূলাধারে

সহস্রারে সদা যোগী করে রমণ" অর্থাৎ মূলাধার চক্রে, মূলাধার চক্র কোথায় অবস্থিত তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। গুহ্য দেশের যে স্থান হইতে মল নির্গত হয় তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এবং মেরুদন্ড যে স্থানে শেষ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে অর্থাৎ গুহ্যদেশ ও মেরুদন্ডের নিম্নস্থ মধ্যবর্ত্তী স্থানকে মূলাধার পদ্ম কহা যায় এবং আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে (ভ্রূ মধ্যর ঊর্দ্ধে) যে স্থান সেই স্থানকে সহস্রার কহে। এই উভয় স্থানের স্থিরত্ব ভাবের উপর যোগিগণ সর্বদা লক্ষ্যের সহিত 'রমন করেন' যোগীর অন্যতে লক্ষ্য নাই। উক্ত অবস্থায় লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা সমুদয় অন্তঃ বহিঃ কর্ম করিয়া থাকেন ইহা অপরের বোধগম্য বিষয় নহে।

তাহার পর উক্ত সঙ্গীতে বলিতেছেন, "তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ"; পদ্মবন এই শরীরেই রহিয়াছে অর্থাৎ ইহা মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মেরুদন্ডের মধ্যে অবস্থিত। মূলাধারের স্থান পূর্বেই বলিয়াছি, মূলাধার চতুর্দ্দল পদ্ম বিশিষ্ট। তাহার পর, লিঙ্গমূলের পশ্চাতে মেরুগহ্বরের মধ্যে সাধিষ্ঠান চক্র ইহা ষড়দল বিশিষ্ট। তাহার পর মণিপুর চক্র, ইহা নাভিমূলের পশ্চাতে মেরুগহ্বরের মধ্যে, ইহা দশদল বিশিষ্ট। তাহার পর অনাহত চক্র। ইহা হৃদয়ের পশ্চাতে মেরুগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত ইহা দ্বাদশদল পদ্ম বিশিষ্ট। তাহার পর বিশুদ্ধ চক্র, ইহা ষোলদল পদ্ম বিশিষ্ট এবং কণ্ঠের পশ্চাতে মেরুগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপর মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হইয়াছে (ভ্রূর পশ্চাতে) ঐস্থানে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত, ইহা দ্বিদল পদ্ম বিশিষ্ট। তাহার উপর সহস্রার এখানে সহস্র দলযুক্ত সহস্রার পদ্ম, ইহা ব্রহ্মযোনির ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহাই পদ্মবন, ইহা সাধন দ্বারায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। জীবিত শরীরেই সাধন দ্বারায় সাধকের অনুভব হইয়া থাকে। রামধনুক তোমরা যাহা দেখিয়াছ তাহা সর্বদা আকাশমার্গে দেখা যায় না; বায়ু, জল ও সূর্য্যকিরণ দ্বারায় আকাশে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ উন্নত অবস্থাপন্ন সাধকের সহজ ক্রিয়ার অভ্যাসে বায়ুতত্ত্ব ও জলতত্ত্ব এবং তেজতত্ত্ব কর্তৃক উত্তম সহজ ক্রিয়ার বিবৃদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমস্ত চক্রস্থানের চক্রস্থ বায়ু অপান বায়ুর আকর্ষণে থাকায় চক্রের পদ্ম সকল অধোমুখে রহিয়াছে। ইহাকে সহজ ক্রিয়া রূপ উত্তম প্রাণকর্ম দ্বারায় ঊর্দ্ধ মুখ করা উচিত, তবেই অনুভব হইয়া থাকে নচেৎ নহে।

সাধারণ জীব মাত্রেরই নাভি ও কণ্ঠ পর্য্যন্ত বায়ু অনুভব হইতে পারে। কণ্ঠের ঊর্দ্ধ এবং নাভির অধস্থ বায়ুর গতি সাধারণ জীবের অনুভব হয় না। সহজ ক্রিয়ার দ্বারায় মূলাধার পর্য্যন্ত বায়ুর গতি হইলে অর্থাৎ মূলাধার পর্য্যন্ত বায়ু গমন করিলে, তথায় মূলাধারে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং কখন কখন আতসি পুষ্পের ন্যায় বা রক্তবর্ণের প্রভাব ন্যায়ও দেখা যায়। এইস্থানে রজোগুণ কর্ত্তৃক, যত প্রকার ইচ্ছা আছে তাহার বীজ অবস্থিত থাকে। ইহার কর্ত্তা গণেশ, গণেশের বশে

সমস্ত বায়ুই রহিয়াছে। গণেশ ঊনপঞ্চাশ বায়ুরূপী দেবতার নায়ক, একারণ গণেশকে বিনায়কও বলা যায়। বি-না = লইয়া যাওয়া, সাধনে ইনি বিঘ্ন না করেন, একারণ ইহার পূজারূপ সম্বর্দ্ধন অগ্রে করিতে হয়। এই চক্রমধ্যস্থিত পদ্মের প্রত্যেকদলে ঊনপঞ্চাশ বায়ু থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। বায়ু সকল সূক্ষ্ম নাড়ীমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে যাহা বাহ্য চক্ষের দ্বারায় অতি কষ্টে মৃত শরীর দেখা যায়। ইহা সমস্তই মেরুগহ্বরে রহিয়াছে। বর্ত্তমান চক্ষের অগোচর যে সকল নাড়ি ও নাড়িস্থিত বায়ু তাহা জীবের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ মেরুগহ্বরের ঊনপঞ্চাশটি নাড়ি আছে ও ঊনপঞ্চাশটি প্রধান বায়ু ঐ নাড়িতে অবস্থিতি করিয়া থাকে, উক্ত ঊনপঞ্চাশটি বায়ু প্রতি পদ্মের প্রত্যেক দলে দলে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত থাকে, মূলাধার হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত (বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত) ৪৮টি বায়ু ও তাহার বর্ণ প্রত্যেক দলে সন্নিবেশিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূর মধ্যে দুই দল এক চক্ষু দ্বিভাগ হইয়া একটি বায়ু দ্বিভাগ হইয়া দুই দলে রহিয়াছে। একারণ একটি চক্ষু যদি কাহার হঠাৎ নষ্ট হয় তাহা হইলে অপর চক্ষুও নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়া থাকে, কোন কোন সময়ে একটির অভাব জনিত দুটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া যায়। এই ভ্রূর পশ্চাতে দ্বিদলের মধ্যে ব্রহ্মযোনির নিম্নস্থ ভাগে বর্ত্তমান মনের স্থান। কণ্ঠের পশ্চাতে যেখানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এবং মন স্থানের নিম্নে ভোগিকান্ত নামক বায়ু অবস্থিতি করিয়া থাকেন, ইনি কামরূপ। বর্ত্তমান মনের যাবতীয় কাম্যবস্তুর ইচ্ছা, ভোগ ইচ্ছা এই ভোগিকান্ত নামক বায়ু কর্ত্তৃক জীবনের মনে উদয় হইয়া থাকে। উপরোক্ত বায়ু ব্যতীত সহস্র সহস্র বায়ু সহস্র সহস্র নাড়ি দিয়া গতায়াত করিয়া জীব শরীরে কার্য্য করিতেছে। নদী সকল যেমত সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। সহস্রদল অর্থাৎ ব্রহ্ম রন্ধ্রে যে ত্রিকোণকার ব্রহ্মযোনি আছে (ইহাকে ম্যাডুলা অব্ লঙ্গেটা কহা যায়) তাহাতে স্থিত পঞ্চাশ প্রকার বায়ু ব্রহ্ম সদৃশ এবং মস্তক মধ্যস্থিত পঞ্চাশ প্রকার বায়ু যাহা আছে ইহারা একত্ব ভাবে উভয় স্থানের শত বায়ু দশ দশ দিকে ধাবমান হইয়া সহস্রদল পদ্ম রূপে পরিণত হইয়াছে। ত্রিকোণ যন্ত্র স্বরূপ ব্রহ্মযোনি মধ্যস্থলে একটি অণুরূপ জ্যোতির্ময় পদার্থ আছে। যিনি এই অণু স্বরূপ ব্রহ্মতে স্থিতি লাভ করায়, তাঁহার নিকট সবই অণু স্বরূপ বোধ হইয়া এ লোকের সব আশ্চর্য্য বোধ হয় অর্থাৎ বিস্মিত হইয়া যান; ইহাই সহস্রার পদ্মের যতদূর প্রকাশ সম্ভব তাহা বলিলাম।

সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, যোগিগণ মূলাধার ও সহস্রারে রমণ করেন তাহা পূর্বোক্ত মূলাধারের স্থির বায়ু এবং সহস্রারস্থ স্থির বায়ুর উপর লক্ষ্য রাখা রূপ রমণ করেন, অর্থাৎ স্থলে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে যখন আপনাকে আপনি ভুলিয়া গিয়া সব এক হইয়া গিয়া উভয় ভাব আর থাকে না তখন সব অনন্তে মিশিয়া অনন্ত স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হন। তাহার পর প্রসাদ নিজ সঙ্গীতে বলিতেছেন, "তারা পদ্ম বনে

হংস সনে হংসী রূপে করে রমণ।” প্রসারে ইষ্টদেবতা কালীকেই তারা সম্বোধন করিতেছেন। কালিকা দেবীর অপর একটি নাম তারা। প্রসাদের ইষ্টদেবী কালীরূপা তারা, ইনি যে কেবল প্রসাদের ইষ্টদেবী তাহা নহে সমগ্র জগতের ইষ্টদেব ইষ্টদেবী। এই তারা পদ্ম বনে উপরোক্ত মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যে পদ্মবন রহিয়াছে অর্থাৎ মেরু গহ্বরস্থ ষট্চক্র পথরূপ পদ্মবনে হংসের সহিত হংসীরূপে রমণ করিতেছেন। জীবের বর্ত্তমান চঞ্চলা প্রানশক্তিরূপা দেবীই হংসীরূপা, ইনিই হংস পদবাচ্য। বর্তমান চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা কালিকা দেবীর উর্দ্ধাধঃগতির শেষ ভাগে স্থির প্রাণরূপ আত্মা হংসরূপে রহিয়াছেন। এই স্থির প্রাণরূপ আত্মাকেই হংস বলা যায়, ইনি শিব স্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময়। শিব শব্দে মঙ্গল বুঝায় অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বতঃগতি বিচ্ছেদ অবস্থাই হংস পদবাচ্য। এই স্বতঃগতির বিচ্ছেদ অবস্থারূপ স্থির প্রাণ স্বরূপ হংসের সহিত অজপা রূপা চঞ্চলা প্রাণশক্তির দিবা রাত্রে ২১৬০০ বার রমণ ক্রিয়া হইতেছে। ইহার বিপরীত রমণ ক্রিয়ার দ্বারায় অর্থাৎ বর্তমানে যাহা চলিতেছে তাহা বর্হির্ভাবে রমণ হইতেছে এবং ষট্চক্র পথের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার বিপরীত রমণ ক্রিয়ার দ্বারায় মেরুগহ্বরের মধ্যে ষট্চক্র পথে অন্তর্মুখীন গতি সহজ ক্রিয়ারূপ অন্তর প্রাণায়মাদি দ্বারায় বর্তমানে উল্টা করিয়া মেরুগহ্বরস্থিত ষটচক্র পথে চালিত করিতে পারিলে জীব শিবস্বরূপ হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখ তোমাদের কালী, আর যোগী বা সাধকগণের কালীর কত পার্থক্য রহিয়াছে।

বস্তুতঃ যিনি কালী তিনি মৃন্ময়ী বা পাষাণময়ী নহেন। সাধক রামপ্রসাদ আরো স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার কালী যে ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন তাহাও বলিয়াছেন। তিনি উক্ত সঙ্গীতে আরো বলিয়াছেন, “আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন। তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।” স্থির প্রাণই আত্মা ইহা বহু পূর্বে তোমাকে শাস্ত্রীয় প্রণাম ও যুক্তি দ্বারায় বলিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই স্থির প্রাণই রাম পদবাচ্য বা শব্দে বিশ্বকে বুঝায়। ম শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের ঈশ্বর তিনি রাম পদবাচ্য, এক্ষণে দেখ এই বিশ্বের ঈশ্বর কে। ঈশ্বর এই শব্দ কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। প্রাণই ঈশ্বর পদবাচ্য তাহা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, “প্রাণোহি ভগবান ঈশ” ইত্যাদি শ্লোক যাহা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি সেই প্রাণই ঈশ্বর পদবাচ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই জানিবে। তবে জীবের আপন প্রাণেতে ঈশ্বর বোধ না থাকায় জীব বাহিরে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবল কষ্ট পাইয়া থাকে। এই প্রাণ শব্দে আত্মাকেই বুঝায়। তাহা হইলে স্থির প্রাণই আত্মারাম পদবাচ্য হইলেন। আরো দেখ যিনি রমার সহিত রমণ করেন তাঁহাকেও রাম বলা যায়, রমা আদ্যা প্রকৃতি অর্থাৎ বর্তমান চঞ্চলা প্রাণ শক্তিরূপা আদ্যা প্রকৃতিই রমা পদবাচ্য। এই রমারূপ প্রাণ শক্তিরূপা আদ্যা প্রকৃতিই আত্মারামের আত্মা কালী। ইঁহাকে কালী

বলিবার অভিপ্রায়, কালে শক্তি যুক্ত হইয়া কালীপদবাচ্য হইয়াছেন। কাল কল্‌ গমন করা; যিনি গমন করিতেছেন তিনিই কাল পদবাচ্য। প্রাণও রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রাণকে কাল বলা যায়, অর্থাৎ যম স্বরূপ প্রাণের সংযম অবস্থারূপ কালে, ঈ = শক্তি যুক্ত হওয়ায় বর্তমান চঞ্চলা প্রাণ শক্তিরূপা দেবীকে কালী কহা যায়; স্থির প্রাণের এই চঞ্চলা প্রাণ শক্তির দ্বারায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে, ইনি মহান আদ্যা শক্তি।

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠ প্রসাদ, ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতেছেন, 'প্রমাণ প্রণবের মতন'। রামপ্রসাদ প্রমাণও যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাও ইঙ্গিত মাত্র করিয়া ইসারায় প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন, ইহা সাধারণের বোধগম্য হওয়া কঠিন। কারণ রসিকের ইসারা অরসিকে বুঝিতে যেমন অক্ষম, তদ্রূপ সাধক বা যোগিগণের ইসারা সাধারণের প্রণিধান হওয়াও অসম্ভব। তিনি মাত্র এই কথা বলিয়াছেন, প্রমাণ প্রণবের মতন। ইহাতে যদি তোমরা মনে কর প্রণব ওঙ্কারকে কহা যায়। ওঙ্কারই তাহার প্রমাণ ইহাতে আমি তোমাদিগকে অনায়াসে বলিতে পারি ওঙ্কারই যদি প্রমাণ হইল তাহা হইলে ওঙ্কার কাহাকে বলিব, আর তিনিও ত' প্রণব না বলিয়া সাধারণ কথায় একেবারে ওঙ্কার শব্দও ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহাও তিনি করেন নাই। ইহাতে না হয় তোমরা বলিতে পার ওঙ্কার তাহার বাচক, ওঙ্কার ব্রহ্ম স্বরূপ ইত্যাদি অনেক কথাই বলিতে পার। কিন্তু কথায় কি পেট ভরে, কথা অনেকেই অনেক বলিতে পারেন তাহাতে না শ্রোতার পেট ভরে, না যিনি বলেন তাঁর পেট ভরে। পরস্পরেই অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অভুক্ত ব্যক্তির শান্তি কখনই থাকিতে পারে না। ওঙ্কার, ওঙ্কার করিয়া অনন্তবার চীৎকার করিলে কেহ সাড়া দিবে না। এপর্য্যন্ত কেবল মাত্র ওঙ্কার এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ দ্বারায় সাড়া কাহারও পায় নাই বা শান্তিও পায় নাই। আরো বিশেষ, তিনি কেবল প্রণবের কথাই বলিয়াছেন। তোমরা প্রণবের অর্থ ওঙ্কার বলিতেছ। প্রণবের মধ্যে যে ইসারাটুকু রহিয়াছে তাহা ওঙ্কার এই শব্দ বলায় প্রকাশ হইতেছে না। প্রকাশ না হওয়ায় বিষয়টি অপ্রকাশ অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। বিষয় প্রকাশ না হইলে পেটও ভরিবে না। বিষয় বা বস্তু প্রকাশ না হইলে সেই বিষয় বা বস্তু ব্যবহার দ্বারায় নিশ্চয় পেট ভরা রূপ শান্তি অনায়াসেই লাভ হইতে পারে নচেৎ কেবল কথা মাত্র আলোচনায় কিছুই লাভ হয় না।

এক্ষণে প্রণব কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রণবো ধনু শরহ্যাত্মা ইত্যাদি (ধ্যান বিন্দু উপনিষদ) প্রণব ধনুকে কহা যায়। জীবের বর্তমান শরীর ধনুরূপ যন্ত্র। এই শরীরে যাহা প্রাণের যাতায়াতরূপ ক্রিয়া চলিতেছে, ইহাই ইষু বা বাণ স্বরূপ। প্রসাদের ইহাই আত্মা কালী অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণ বায়ুর মতন, ইহার পরের চরণে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। "তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা

যেমন।" তারা (কালী) প্রতি ঘটে ঘটে অর্থাৎ জীবের প্রতি শরীরে অজপারূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই রামপ্রসাদের ভাব। কিরূপ ভাবে বিরাজ করিতেছেন তদুত্তরে বলিয়াছে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন, অর্থাৎ অনিচ্ছার ইচ্ছায়, ইচ্ছাময়ী কোথাও বা নররূপে কোথাও নারীরূপে প্রকাশ। তিনি নরও নহেন; এবং নারীও নহেন। যখন যেরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট ঘটে (শরীরে); অবস্থানরূপ বিরাজ করেন তখন তিনি তাঁহাই।

তাহার পর প্রসাদ বলিতেছেন, "তারার (কালীর) উদর ব্রহ্মান্ড ভান্ড, প্রকান্ড তা জান কেমন, কালীর মর্ম কাল জেনেছেন অন্য কেটা জানবে তেমন।" ইহার তাৎপর্য্য, তারার (কালীর) উদর—উদর অর্থে গহ্বর বুঝিবে, ইহাকেই গগণ গুহা বলিয়া সিদ্ধাগণে কহিয়া থাকেন, অর্থাৎ বৃহৎ কূটস্থের মধ্যে গাঢ় নীলবর্ণ যাহা দেখা যায় তাহাই গগণ গুহা। ইহাই কালীর উদর স্বরূপ গগণ গুহা (গীতা ১১ অঃ বিশ্বরূপ দর্শন দেখিও) কহা যায় এই কূটস্থ্ গহ্বর হইতে সমগ্র জীব বাহির হইতেছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মান্ড কহা যায়। ব্রহ্মণ্—বিধাতা, অন্ড—বিশ্ব গোলক, ইহাকে ডিম্ব কহা যায়। ডিম্ব হইতে শাবকসকল বাহির হয় বলিয়া অন্ডকে ডিম্ব কহা যায়। একারণ কূটস্থ্ মধ্যস্থিত গগণ গুহাকে অন্ড কহা যায়। কারণ কূটস্থ্ গহ্বর হইতে সমগ্র জীব উৎপন্ন হইয়া বাহির হইতেছে। বিধাতা বলিবার অভিপ্রায়, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ প্রকৃতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হওয়ায় প্রকৃতিকে বিধাতাও বলা যায়, প্রকৃতিও আত্মস্বরূপ। জীবের উৎপত্তিও যেমত এই গগণ গুহা স্বরূপ কূটস্থ্ মন্ডল হইতে, জীবের লয় স্থানও এই গগণ গুহা। কারণ ঐ বদন স্বরূপ কালীরূপা কূটস্থ মধ্যে সমস্ত জীব অন্তকালে প্রবেশ করিয়া থাকে। (গীতা ১১ অঃ বিশ্বরূপ দর্শন দেখিও), ইহা যেন এক প্রকার জীব নির্মাণের এবং জীব নিধনের যন্ত্রালয় বিশেষ।

উদর ব্রহ্মান্ড সম্বন্ধে যতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যায় তাহা বলিলাম। এক্ষণে ভাণ্ড সম্বন্ধে বলিব, শ্রবণ কর। ভান্ড অর্থে ভাঁড় বা মৃৎ পাত্র বুঝিও না। ভা-শব্দের অর্থ দীপ্তি পাওয়া, অন্ডন্+ক, ভূষণ, অলঙ্কার, অর্থাৎ উপরোক্ত কূটস্থ্ গহ্বর যেন প্রাণশক্তি রূপা কালিকা দেবীর, জ্যোতির্ময় কিরীটি ভূষণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। এই জ্যোতির্ময় কিরীটি ভূষণরূপ কূটস্থ গহ্বরের সম্মুখস্থ অবস্থাকেই ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড স্বরূপ অবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার পর রামপ্রসাদ শেষ চরণে বলিয়াছেন, "প্রকাণ্ড তা জান কেমন", ইহার তাৎপর্য্য, বৃহৎ কিরীটি স্বরূপ জ্যোতির্ময় বৃহৎ কূটস্থের দীপ্তি যে কিরূপ তাহা কি জান অর্থাৎ তাহা কি তোমাদের জানা আছে। প্রকাণ্ড অর্থ, প্রকৃষ্টরূপে কান্ড-কন-দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্টরূপে সর্বদা দীপ্তি পাইতেছে। তাহার পর প্রসাদ শেষ চরণে বলিতেছেন, ইহার (এই কালীর) মর্ম কাল জেনেছেন অন্য কেটা জানবে তেমন। ইহার তাৎপর্য্য, কালীর মর্ম কালই জানিয়াছেন, অপরে তাহা কিরূপে জানিবে। অর্থাৎ কাল ব্যতীত অপরে সম্যক জানা সম্ভবপর নহে। সাধারণ প্রথম অভ্যাসী সাধক স্বল্পমাত্র

অবগত হয়, সাধক ব্যতীত সাধারণ জীব কিছুই অবগত নহে। ইহাতে স্বতঃই তোমাদের মনে হইতে পারে যে তাহা হইলে আমাদের কালীর মর্ম অবগত হওয়ার আশা নাই। কারণ আমরা ত' কাল (শিব) নহি, তখন আর আমাদের উক্ত মর্ম অবগত হইবার আশা কোথায়। ইহা স্বতঃই মনে হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহা মনে করা চাহি না। কারণ যিনি নিজ শরীরস্থ চঞ্চলা প্রাণ শক্তির ঊর্দ্ধ অধঃ গতিরূপ দর্পকে চূর্ণ করিয়া বর্তমান প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে যুদ্ধে জয় করিবেন তিনিই কাল স্বরূপ (শিব স্বরূপ) হইবেন। চঞ্চলা প্রাণ শক্তিকে জয় করিয়া স্থিরত্ব সাধন করিতে পারিলে জীব শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকিতে পারে না। বর্তমান প্রাণ শক্তিও তাহাতে মিলিতাবস্থা হইয়া একাধারে পুরুষ প্রকৃতি মিলন হইবে। চণ্ডীতেও এইরূপ ভাবের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীতে দেবী উক্তি আছে—যে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে, যে আমার দর্প চূর্ণ করিবে এবং আমার তুল্য বলশালী হইবে অর্থাৎ প্রাণ তুল্য, সেই আমার স্বামী হইবে অর্থাৎ সাধন সমরে জীব জয়ী হইলে তখন আর জীব ভাব থাকে না। তখন জীব শিব হইয়া কাল স্বরূপ হওয়ায় সকল মর্মই অবগত হন, তবে দুই এক দিনে কেহই হইতে পারেন না। সাধন সমর আজীবন করিতে হয় যত দিন না সাধন সমরে জয় লাভ হয়। এই যুদ্ধ ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের সহিত করিতে হয়, এবং বর্তমান প্রাণ শক্তিরূপা দেবীর চঞ্চলভাব দূর করিবার জন্য ও সাধন সমর করিতে হয়।

প্রসাদ তাহাও কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন; যথা,—আয় মা সাধন-সমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ইত্যাদি। রামপ্রসাদ প্রথমে মাতৃভাবে সাধন করিতেন অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে মাতৃভাবে দেখিতেন। কারণ প্রাণ মাতাস্বরূপ, মাতাই প্রাণ, প্রাণকে মাতাস্বরূপ জানিবে। সাধকের ভিতর অনেক সাধক, অপর অপর ভাবের দ্বারায় ও সাধন করিয়া থাকেন। যেমন পতিভাব, পত্নীভাব, বাৎসল্য ও সখ্যভাব ইত্যাদি। যাহার মনে যে ভাব ভাল লাগিয়া থাকে তিনিই সেই ভাবেই আত্মকর্মের প্রাণশক্তি দেবীকে ভাবনা করিয়া থাকেন। তাহার পর প্রসাদ এই সঙ্গীতের সর্বশেষের চরণে বলিতেছেন, প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন অর্থাৎ ভাবসিন্ধু পার হইবার একমাত্র তরণী স্বরূপাই যে অজপারূপ প্রাণশক্তিরূপা দেবী, ইহা প্রসাদের মুখে শুনিয়া সাধারণ অজ্ঞ জীবগণ যাহারা সাধন ভজনের প্রকৃত মর্ম জানে না অথচ সাধারণ ভাবে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যাগযজ্ঞ পূজা ইত্যাদি করিয়া থাকে সেই সকল ব্যক্তি (তাহারা) হাস্য করিয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণ অজ্ঞ জীবের ধারণা বাহ্য স্বর্গাদি মাকাল ফলের কামনার সহিত যে পূজা, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, জপ, প্রার্থনা ইত্যাদি ইহাই ধর্ম এবং ইহাই ভবসিন্ধু পারের তরণী। অজ্ঞ সাধারণ জীবের এই ধারণাই বদ্ধমূল থাকে। সেই ধারণার বশবর্ত্তী

হইয়া তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ ব্যক্তিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যই করিয়া থাকে এবং অজপারূপা বর্তমান প্রাণশক্তিরূপা দেবীকে ঈশ্বরী বোধ দূরের কথা বরং সাধারণ বায়ু বোধে ঘৃণাই করিয়া থাকে। এস্থলে এটা উপদেশপূর্ণ বাক্য মনে পড়িল তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কোন সময়ে শরীরের ইন্দ্রিয়গণ মনে করিল আমরা সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি, সুতরাং আমরাই শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা বর্তমান মনের গোচর করাইয়া পরস্পরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠাভিমানে মত্ত হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। এমন সময়ে প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের একের অভাবে বা সকলের অভাবে শরীরের কার্য্যের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। তোমারা একে একে সকলে প্রস্থান করিয়া দেখ তাহাতে শরীরের অস্তিত্ব থাকে কি না। ইহা বলায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাই করিল, এবং তাহারা শরীর হইতে বাহির হইয়া যাওয়াতেও শরীরের অস্তিত্ব লোপ হইল না। শরীরের অস্তিত্ব লোপ না হওয়ায় তাহারা পুনরায় শরীরে প্রবেশ করায় প্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে বলিলেন,—দেখ তোমরা চলিয়া যাওয়াতেও শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। এইবার আমি একবার শরীর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করি। আমি সরিয়া যাইলে যদি তোমাদের অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার পর প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমারা বৃথা অভিমান বশতঃ নিজেকে শ্রেষ্ঠাভিমান করিতেছ। ইহা অজ্ঞতারই লক্ষণ, ইহা বলিয়া প্রাণ শিথিল ভাব অবলম্বন করিলেন। প্রাণ শিথিল ভাব অবলম্বন করিবা মাত্র চক্ষে ঘোলা পড়িয়া চক্ষু সরিষা ফুল দেখিতে লাগিল, কাণে তালা লাগিয়া বধিরের ন্যায় হইল, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইয়া জিহ্বার কার্য্য রহিত হইয়া বাক্য কখন শক্তি রহিত হইয়া গেল, মন বিকার গ্রস্ত রোগীর ন্যায় অজ্ঞানে নানা বীভৎস স্বপ্ন সকল দেখিতে লাগিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হাহাকার করিতে লাগিল, হস্ত পদের চলৎ শক্তি হীন হইয়া পঙ্গুর ন্যায় অবস্থায় রহিল। তখন ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন কার্য্য করণ ব্যাপারে অসমর্থ হওয়ায়, বাক্য মন ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই প্রাণের শক্তি অবগত হইয়া প্রাণকে মহান শক্তি বোধে প্রাণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রাণের স্তব করিয়াছিল, এবং আপনাদিগকে হীন বল বোধ করিয়া নিজেরাই বলিয়াছিল আমাদিগের কোন ক্ষমতাই নাই। প্রাণই আমাদের কর্তা। প্রাণ কর্তা হইয়া অকর্তা ভাবে থাকায় আমরা প্রাণের শক্তি অবগত ছিলাম না, এক্ষণে বুঝিলাম আমাদের কর্তৃত্বাভিমান ও গর্ব করা বৃথা। প্রাণের শক্তিতেই আমরা শক্তিমান হইয়া আপন আপন শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি, অতএব আমাদের অহঙ্কার করা বাতুলতা মাত্র। ইহা বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া পরিশেষে মন বাক্য প্রভৃতি সকলে বলিলেন,—হে প্রাণ তুমি জগতের আদি মাতা। মা যেমন সন্তানকে পালন করিয়া থাকে তুমিও তদ্রূপ জগতের সহিত জগতের জীবগণকে পালন করিতেছ। তুমি আমাদের প্রাণ এবং জগতেরও প্রাণ এবং সমগ্র দেবগণের প্রাণ।

দেবগণের অস্তিত্বও তোমা ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। তুমি একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছ, সিদ্ধমুক্ত ঋষিগণ তোমারই কৃপা বলে সম্পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব হে প্রাণ তুমি আমাদেরও উৎকৃষ্ট সম্পদ, যাহা তোমার স্বরূপ এবং উৎকৃষ্ট ঐ জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদিগের যে দুর্মতি তাহা নষ্ট কর। আমাদের (ইন্দ্রিয় ও মন বাক্যের) ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

এই যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের সহিত উপদেশপূর্ণ বাক্য যাহা বলিলাম ইহা ইন্দ্রিয়সেবী মানবের নিকট প্রথমতঃ হাস্যাস্পদ হইতে পারে। এই কারণে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, আমার কালী বিষয়ক উক্তি শ্রবণ করিয়া লোকে হাসে। রামপ্রসাদের কালী কে তাহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, অজপারূপা প্রাণ শক্তি দেবীই, ইনি ঘটে ঘটে বিরাজ করিয়া থাকেন। সাধারণ ইন্দ্রিয়সেবী মানব ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে ভুলিয়া ভ্রান্ত ভাবে বাক্য মন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইন্দ্রিয়ের ধর্মে আসক্ত হইয়া পড়ে, এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় অনুষ্ঠিত লৌকিক মামুলি বাহ্যিক সকাম ধর্মে আসক্ত হইয়া আজন্ম ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব দেশে এবং সর্ব জাতিতে এক এক প্রকার মামুলি বাক্য মন ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় অনুষ্ঠিত ধর্ম বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে প্রকৃত তৃপ্তি বা শান্তি কাহার নাই। ইহাদের ভিতর কেহ বা বাক্যের দ্বারায় ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর যে কে তাহার কোন তত্ত্বই অবগত নহে। অথচ মামুলি প্রথা অনুযায়ী, কেহ বা বিশ্বাসের সহিত, কেহ বা লোক লজ্জা ভয়ে অবিশ্বাস সত্ত্বেও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় একটা কিছু ধর্ম বন্ধনে না থাকিলে লোকে যে কি বলিবে এই ভয়ে ঈশ্বর ধর্ম করিয়া যায়।

আবার কেহ বা বাক্য এবং মনের দ্বারায় মামুলি প্রথা অনুযায়ী প্রার্থনা স্তুতি ঈশ্বরের নিকট করিয়া থাকে। ঈশ্বর যে কোথায় আছেন, তিনি নিকটে কি দূরে অবস্থিত তাহার কোন ধারও ধারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত কোন তত্ত্বই অবগত নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকার লোকেদের শান্তির আশা দূরের কথা, সংসারের জ্বালায় অশান্তিতে এক রকম ছট্‌ফট্ করিয়া কোন গতিকে কাল যাপন করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর অতুল অর্থ কাহার থাকিলেও, আধি এবং ব্যাধি কর্ত্তৃক এবং শোক তাপ কর্ত্তৃক জ্বালার অভাব নাই এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারায় কার্য্য করিয়া থাকে (যেমত কর দ্বারায় মালা জপ, বা কর দ্বারায় বাহ্য পূজাদি যাগ যজ্ঞ ভোগ করা ইত্যাদি) তাহাই করিয়া থাকে। করে মালা জপ হইতেছে বা করের রেখায় রেখায় অঙ্গুলি দিয়া মন্ত্র জপ করিতেছে অথচ মন চারিদিকে বিষয় চিন্তায় ব্যস্ত। এরূপ জপ পূজাদি, যাগ যজ্ঞ করা কি বিড়ম্বনা নহে? কেহ বা কোন দেবতার রূপ দর্শন করিয়া তাহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে থাকে। তাহাতেও মনঃসংযোগ না হওয়ায় দেবতার ধ্যান কালীন, মন ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের বশীভূত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়া ঐ ধ্যান

বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাও মুমুক্ষুগণের উপযোগী নহে বলিয়া জানিবে, একারণ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় যে ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহার দ্বারায় আমাকে বা আমার মনকে অন্তকালে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ আমার অন্তকাল উপস্থিত হইয়া যখন প্রাণ এবং অপান শিথিল ভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আমার কাহার দ্বারায়ও জপ হইবে না, এবং আমার জিহ্বার দ্বারায় মন্ত্র জপও হইবে না কারণ তখন জিহ্বা জড়তায় অসাড় হইয়া যাইবে এবং আমার হস্তও অসাড় হইয়া করও আর চলিবে না। চক্ষে ঘোলা পড়ায় চক্ষেও তখন আর দর্শন হইবে না। কর্ণও তখন বধির হইয়া যাইবে, শত শত ঢাকের বাদ্য বাজাইলেও আমার শ্রুতিগোচর হইবে না। তখন আমার কর্ণের নিকটে চীৎকার করিয়া নাম শ্রবণ করান আর না করান উভয়েই তুল্য নয় কি? আমার অসময়ে, আমি যে ইন্দ্রিয়ের সেবায় জীবন অতীত করিলাম, সেই ইন্দ্রিয়গণ আমাকে অসময়ে ফেলিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক্ষণে মনে কর কেবল মাত্র আমার প্রাণ আছে আর মন মাত্র আছে আর সবই গিয়াছে।

আমার জীবদ্দশায় আমার বর্তমান মনের প্রাণের প্রতি লক্ষ্য এবং আসক্তি না থাকায় আমার ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় আমার বর্তমান মনের এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে প্রাণ কিছুই নহে বা কেহই নহে। ইন্দ্রিয়গণই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং ইন্দ্রিয়গণই কর্ত্তা। বর্তমান মনের এই ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, অন্তকাল উপস্থিত হইলে বর্তমান মন ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব দেখিতে না পাইয়া এবং ইন্দ্রিয় জনিত বিষয় সমূহকেও ছাড়িতে হইতেছে দেখিয়া, বর্তমান মনের তখন শোক তাপ উদয় হওয়ায় দর্শন দ্বার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল (মৃত্যুর সময়ে অনেকেরই চক্ষে জল আসিয়া থাকে)। এমন অবস্থায় প্রাণের সহিত ভালবাসা না থাকা হেতু সে প্রাণের সহিত মিশিতে অক্ষম হওয়ায় বর্তমান মনের বিষয় চিন্তার সহিত প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিলেই মন ও তাহার সহিত দেহ ত্যাগ করিয়া (যে বিষয়ের চিন্তার সময়ে মন দেহত্যাগ করিয়া থাকে, সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করিয়া থাকে। মনের বন্ধন মোচন আর হয় না। এই কারণে সাধারণ লোকেও অনেকে বলিয়া থাকেন, জপ তপ কর কি? মরতে জানলে হয়।

ভগবান ও গীতাতে বলিয়াছেন, যাহারা যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে হে কৌন্তেয় সর্বদা সেই ভাবে আসক্তির সহিত ভাবনা করায় তাহারা সেই সেই ভাবের বা চিন্তার বিষয়ই পাইয়া থাকে। গীতা ৮ অঃ ৬ শ্লোঃ। জীবের এই জন্ম মৃত্যুর নিরাকরণ জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৮ অঃ ৭ শ্লোক বলিয়াছেন, অতএব আমাকে (প্রাণকে) স্মরণ কর (ভগবান যে প্রাণ স্বরূপ তাহা পূর্বে অনেকবার শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারায় তোমাকে বলিয়াছি তাহার আর পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক) এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠান কর। স্বধর্ম=আত্মধর্ম, প্রাণের যাহা ধর্ম তাহাই স্বধর্ম বা

আত্মধর্ম তাহার অনুষ্ঠান কর, রামপ্রসাদও তাঁহার সঙ্গীতে কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন, আয় মা সাধন সমরে দেখি মা হারে কি পুত্র হারে। প্রাণই মাতা স্বরূপ। গীতোক্ত যুদ্ধ নর রক্তে মেদিনীকে কলুষিত কর নহে। ভগবান ও তাহার প্রশ্রয় গীতাতে দেন নাই, তবে তাহারা যেমন বুদ্ধি সে আপন বুদ্ধি অনুযায়ী এবং মনের ভাব অনুযায়ী অর্থ করিয়া ভগবানকে কলুষিত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উক্ত যুদ্ধ মানুষ কাটাকাটি নহে, উহা সাধন সমর, সহজ ক্রিয়ারূপ প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারায় চঞ্চল বর্তমান প্রাণকে জয় করা এবং ইন্দ্রিয় ও মনের আসুরিক ভাব সমূহকে জয় করা—ইহাই গীতা উক্ত যুদ্ধ, ইহাকেই সাধন সমর কহা যায়। এইরূপ যুদ্ধ করিতে ভগবান বলিতেছেন অর্থাৎ প্রাণের গতি বিচ্ছেদ অবস্থাই কাল। সেই স্থির স্বরূপ কালেতে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া সহজ—প্রাণায়ামরূপ সাধন সমর কর এবং আমাতে (স্থির প্রাণেতে) মন এবং বুদ্ধি অর্পন কর ইহা করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে অর্থাৎ তুমি আমি হইয়া যাইবে।

জীব ভাব যাইয়া আমার শিব ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তোমার তুমি, আমি হইয়া যাইবে। কারণ অন্তকালে যে, যে বিষয় আসক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে, সে সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত, যেমত ভরত রাজা হরিণের ধ্যানে আসক্ত থাকায় হরিণ যোনিই প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ। গীতা ৮ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে ভগবান এইরূপই বলিয়াছেন, অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। অর্থাৎ অন্তকালে আমাকে (প্রাণকে) স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কারণেই পূর্বে বলিয়াছি, প্রাণের উপাসনা সেবা ছাড়িয়া কেবল বাক্য মনের এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় অনুষ্ঠিত উপাসনা প্রণালী যাহা যাহা যে যে দেশে মামুলি প্রথা অনুযায়ী উপাসনা, বাহ্য পূজা, যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারায় শান্তি প্রত্যাশী মুমুক্ষুগণের কোন লাভ হয় না। তবে কিছু না করা অপেক্ষায় কিছু করা ভাল। মামুলি প্রথানুযায়ী যে সকল বাহ্যিক যাগ যজ্ঞ প্রজাদির বাহ্যিক উপাসনাদি চলিয়া আসিতেছে তাহার অনুষ্ঠাতাগণ প্রসাদের বাক্য শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে। প্রসাদ বলিয়াছেন ভবসিন্ধু পারের একমাত্র তরণী অজপা প্রাণ শক্তিরূপা দেবী যিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন তিনিই কালী, তিনিই সমস্ত। ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রিয়সেবী রজস্তমো গুণের অজ্ঞ জীব সকল হাসিয়া থাকে ইহাই প্রসাদ বলিতেছেন। ইহার শেষ চরণে প্রসাদ বলিতেছেন, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হ'য়ে বামন অর্থাৎ প্রসাদের মন বুঝিয়াছে যে অজপা রূপা প্রাণ শক্তিই একমাত্র জীবের আরাধ্যা দেবী বা দেবতা, কিন্তু প্রসাদ নিজ চঞ্চলা বর্তমান প্রাণ শক্তির সহজ ক্রিয়ার অভ্যাসে স্থৈর্য্যতার সম্পাদন এখনও করিতে না পারায় বলিতেছেন, আমার বর্তমান প্রাণ এখনও

বুঝে নাই, বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ স্থির না হইলেও মন বুঝিলেও পরে ঠিক থাকিবে না। একারণ বলিতেছেন ধরবে শশী হয়ে বামন, অর্থাৎ আমি বামন হয়ে শশী (চন্দ্র, মনকে কহা যায়,) ধারণ করিবার আশা করিতেছি।

সাধকের বর্তমান মন কথঞ্চিৎ বশীভূত হইলেও যিনি বুদ্ধিমান সাধক তিনি বর্তমান মনের বশীভূত ভাব দেখিয়াও বর্তমান মনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ বশীভূত ভাব অশ্বে কোন ব্যক্তি মুখ যন্ত্রণ (লাগাম) ব্যতীত আরোহণ করিয়া বিচরণ করিলে মুখ যন্ত্রণ রহিত অশ্ব যেমন নিজ পৃষ্ঠে আরোহিত ব্যক্তিকে অনায়াসে ভূতলশায়ী করিয়া যন্ত্রণার সহিত বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বর্তমান চঞ্চল মনও সাধককে সাধন মার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া অধোগামী করিয়া থাকে। একারণ বুদ্ধিমান সাধক যতক্ষণ বিশদরূপে বর্তমান প্রাণের স্থৈর্য্যতা সম্পাদন না হয় ততক্ষণ বর্তমান মনকে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ প্রাণের সম্যক স্থৈর্য্যতা সম্পাদন না হইলে বর্তমান মনের চঞ্চল ভাব দূরীভূত হয় না। যেমত সময় বোধক ঘটিয়া যন্ত্রের নিম্নস্থ দোলক যন্ত্র যতক্ষণ দুলিতে থাকে ঘটিকা যন্ত্রের কাঁটাও ততক্ষণ চলায়মান হইতে থাকে। দোলক যন্ত্রে দোলা বন্ধ না হইলে, কাঁটার চলা বন্ধ হয় না। এখানে শরীররূপ ঘটিকা যন্ত্রের দোলক যন্ত্র বর্তমান চঞ্চল প্রাণকে বুঝিবে এবং শরীররূপ ঘটিকা যন্ত্রের কাঁটা মনকে বুঝিবে।

মন দুই প্রকার জানিবে। শরীররূপ ঘটিকা যন্ত্রের চঞ্চল প্রাণের স্বতঃ সাধন দ্বারায় বিনা অবরোধে যে স্থির অবস্থা হইতে জাত যে মন তাহাকে স্থির মন বা আত্মা কহা যায়। ইহা শিব স্বরূপ মঙ্গলময়। এই অবস্থায় বর্তমান চঞ্চল মনের বিলোপ সাধন হইয়া যায়। বর্তমান চঞ্চল বর্তমান মনের উৎপত্তি চঞ্চল প্রাণ হইতে, ইহাই জীব ভাব এবং অমঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই রামপ্রসাদ দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন ধরবে শশী হয়ে বামন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"বিদ্যাসুন্দর"

এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের গূঢ় মর্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। বিদ্যা=জ্ঞান, যাহার দ্বারা আত্ম ধর্ম প্রকাশ পায় অর্থাৎ যোগ বিদ্যা। ইহার জনক, গুরুরূপী বীরসিংহ রাজা, যিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তিনিই বীরপদ বাচ্য। সিংহ শব্দের অর্থ প্রধান, যিনি প্রধান জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অথচ দীপ্তি বিশিষ্ট। তিনিই বীরসিংহ রাজা, তাঁহার কন্যা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান। এই কন্যারূপা জ্ঞান লাভের জন্য গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর কাঞ্চিপুর হইতে বর্দ্ধমানে আগমণ করেন। গুণসিন্ধু রাজা, আত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কারণ সিন্ধু অর্থে সমুদ্রকে বুঝায়, সমুদ্রের জলরাশি এক প্রকার অনন্তবিধায় অসীম। এই অসীম গুণসম্পন্ন বিধায় নিগুর্ণ। এই আত্ম পুরুষই গুণসিন্ধু রাজা, ইনি কাঞ্চিপুরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। কাঞ্চিপুর মোক্ষস্থান। কাঞ্চি—দীপ্তি পাওয়া শরীরের মধ্যে যে স্থান দীপ্তি বিশিষ্ট সেই স্থানকে কাঞ্চিপুর বলা যায় অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল পদ্ম মধ্যে, ইহাই আত্ম রাজ্যের রাজধানী। আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলের মধ্যে উভয় কাঞ্চি রহিয়াছে একটি শিব কাঞ্চি অপরটি বিষ্ণুকাঞ্চি। এই ভূর মধ্যস্থল রূপ পুরই প্রকৃত মোক্ষ স্থান কাঞ্চিলুর অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি স্থান যথায়, লয় স্থানও তথায়। তবে জীব ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করায় জীবের লয় স্থানে স্থিতি না হইয়া পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। জীবের উৎপত্তি স্থান পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং জীবের লয় স্থানও বলিয়াছি। পূর্বোক্ত লয় স্থান জীব স্থিতি করিতে পারিলে জীবের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। জীবরূপ সুন্দর বর্দ্ধমানে (বিদ্যাকে লাভ করিবারে) বীর সিংহের আলয়ে গিয়াছিলেন অর্থাৎ [বর্দ্ধমানশীল যাঁহার জ্ঞান, এমত গুরুরূপী জিতেন্দ্রিয়] প্রধানপুরুষ যিনি বিদ্যা (অর্থাৎ জ্ঞান) এই বীরসিংহ রাজার কন্যারূপা, ইনি প্রধান পুরুষ, স্থিরমন অর্থাৎ আত্মভাব। এই স্থির মনই প্রকৃত দেহ রাজ্যের রাজা বীরসিংহ। ইনি চক্ষুষ্মান তৎপর জীবদেহে বর্তমান চঞ্চল মন অন্ধ, মোহগ্রস্ত, অবিদ্যা ভাবাপন্ন অর্থাৎ বর্তমান চঞ্চল মনও বর্তমানে দেহরাজ্যের নামে মাত্র রাজা হইয়া রহিয়াছেন। বর্তমান মনের পুত্ররূপী ও আসুরিক ভাবরূপ রিপুকুল প্রধান হইয়া নিজের সমস্ত কার্য্য করিয়া, মনেরই কৃত বলিয়া বর্তমান মনের উপর সমস্ত আরোপ করিতেছে। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া রামায়ণ, মহাভারত এবং সমগ্র পুরাণ বাহ্যিক ভাবে রচিত হইয়াছে জানিবে, যেমন বাহ্যিক ভাবে বিদ্যাসুন্দর রচিত আছে।

জীবরূপ সাধক সুন্দর, স্থির মনের কন্যারূপা আত্মবিদ্যা লাভের জন্য মালিনীর গৃহে, অর্থাৎ মালিনী শব্দের অর্থ ভাগবতী দুর্গা আদ্যা প্রকৃতি; ইঁহার গৃহ জীবের স্ব স্ব শরীর, জীবগণের আপন শরীরাভ্যন্তরের মেরুগহ্বরের মধ্যে সুষুম্না মার্গে; মেরু গহ্বরের মধ্যস্থিত মূলাধারে হইতে আজ্ঞাচক্র (ভ্রূমধ্য) পর্য্যন্ত একটি সুক্ষ্ম ছিদ্র আছে। কিন্তু বর্তমানে তাহা মলিন হইয়া রহিয়াছে, (ইহা শবচ্ছেদ করিয়া দেখা যাইতে পারে) উক্ত মেরু মধস্থিত সুষুম্না গহ্বরের পরিষ্কার সাধন জন্য জীব স্বশরীরে সহজ ক্রিয়া দ্বারায় সুষুম্না গহ্বররূপ গুহাকে সহজ ক্রিয়ারূপ সহজ বায়ু দ্বারায় যট্চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত বিদ্যা মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া বিদ্যার সহিত মিলন লাভ করেন। জীবের সহিত বিদ্যার মিলন লাভে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির নাশ হইয়া বিদ্যার গর্ভ হইল অর্থাৎ এই অবস্থায় প্রকৃষ্টরূপে আমি আমার বোধ রহিত হইয়া প্রবোধরূপ পুত্র হইয়া থাকে। প্রবোধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপ জ্ঞান লাভ, ইহাই বিদ্যা সুন্দরের সারভাগ।

রামপ্রসাদ সেনের গূঢ় মর্মে এই ভাবই ছিল, পরে তাঁহার এই ভাব লইয়া অপর রচয়িতার দ্বারায় যাত্রার পালার আকারে বাহ্যিক রসের দ্বারায় উহা রচিত হইয়া এখন উহা তামসিক ভাবে পরিণত হইয়া রাজসিক ও তামসিক লোক সমূহের চিত্তরঞ্জন করিতেছে। এইরূপ বাহ্যিক ভাবের অনেক দেব দেবীগণকে উপলক্ষ্য করিয়া যাত্রা নাটক বর্তমানে চলিতেছে। এই সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের এবং তরুণ বয়স্ক বিদ্যার্থী বালকগণের এবং নারীগণের দর্শন শ্রবণের একেবারে অযোগ্য বলিবার কারণ ইহা দর্শন শ্রবণের দ্বারায় দেবভাবে মন না যাইয়া, তামসিক ও রাজসিক ভাবের স্রোত বৃদ্ধি করিয়া জীবকে অধোগামী করাইয়া রজস্তমো গুণের দল পুষ্টি করিয়া থাকে।

আমার বাবা এই সকল কথা বলিয়া পরিশেষে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা খোকা, তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে চল। তোমার পাঠের পুস্তকগুলি সব আনান হইয়াছে, তোমাকে তাহা দিব, একারণ তুমি আমার সহিত আইস। বাবা উক্ত কথা বলিলে পর, মা বাবাকে বলিলেন, আপনি বাহিরে যান, আমি খোকার গা হাত মুছাইয়া দিয়া শীঘ্রই আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। বাবা, আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন তবে আমি বাহিরে যাইতেছি, তুমি শীঘ্র খোকাকে বাহিরে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিও, দেরি করিও না। কারণ ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, খোকার স্কুল কাকার সন্ধ্যার পূর্বেই আসিবার কথা। ইহা বলিয়া বাবা বাহিরে চলিয়া যাইলেন। তাহার পর মা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা খোকা বিদ্যাসুন্দরের গূঢ় মর্ম শ্রবণ করিলে ত'! ইহা কি তুমি মনে রাখিতে পারিবে? আমি তদুত্তরে বলিলাম, হাঁ মা, আমার সব মনে আছে এবং উক্ত ভাবগুলি আমার স্মরণ পথে রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

তাহার পর মা বলিলেন, বাবা খোকা, তুমি কি সুন্দরের ন্যায় উক্ত আত্ম বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হইবে? আমি বলিলাম, মা আমি যে উক্ত আত্ম বিদ্যা লাভে সক্ষম হইতে নিশ্চয় পারিব, তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। কারণ আমি বাবার নিকট হইতে এবং তোমার নিকট হইতে যে যে বিষয় অবগত হইলাম তাহা যে কথা মাত্র শ্রবণ করিয়া লাভ হইতে পারে তাহা বোধ করিতেছি না। তবে তোমাদের নিকট হইতে উক্ত বাক্য সমুদয় শ্রবণ করিয়া উক্ত বিষয়গুলি লাভ করিবার পিপাসা আমার বলবতী হইতেছে আমি এই মাত্র বলিতে পারি। মা, তোমার বাক্যে আমার যে প্রকৃত শত্রু কাহারা তাহা অবগত হইয়াছি সত্য, কিন্তু মা তাহারা যেন বায়ুরূপী হইয়া আমার দেহকোষ মধ্যে ব্যূহ রচনা করিয়া আমার বর্তমান মনকে মধ্যে রাখিয়া আমার শত্রুরূপী রিপুকুল এবং বর্তমান প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইহারা যেন আমার বর্তমান মনকে বেষ্টন করিয়া আপন আপন ইচ্ছা চরিতার্থ করিতেছে। এমন কি আমার বর্তমান প্রবৃত্তিও বুদ্ধির সাহায্যে আমার বর্তমান মনের মধ্যে নানা রকম কূট তর্কের দ্বারায় তোমাদের এই সকল সারগর্ভ বাক্য সমুদয়ের উপর অবিশ্বাস আনয়নের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেছে না। আমার বর্তমান কুপ্রবৃত্তি ও কুবুদ্ধি যেন স্পষ্টই বলিতেছে তোমার পিতা মাতার কথা শুনিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা আকাশ কুসুমবৎ অনিশ্চিত। তুমি কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর আশু সুখ পাইবে এবং আমার মনকে আয়ত্ত করিয়া আরো বলিয়া থাকে, তোমার এক্ষণে অত পরিণামদর্শী হওয়া চাহি না। মা, আমার বাল্য চপলতা বশতঃ আমার বর্তমান মনও যেন কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হইতে মধ্যে মধ্যে প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু মা, তোমাদের বাক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, আমি আমার মনকে এখন কুপ্রবৃত্তির অনুগামী কার্য্য করিতে দিই নাই। মা আমার বর্ত্তমান দেহের যতই ওজন বাড়িতেছে, আমার রিপুকুলের যেন ততই আধিপত্য বাড়িয়া যাইতেছে। আমার রিপুকুল যে পরম শত্রু তাহা মা তোমাদের কথায় বুঝিয়াছি। কিন্তু মা, তাহাদের দমিত করিবার কোন উপায়রূপ কৌশল কার্য্যতঃ এখন কিছু জানিতে পারি নাই। এ কারণ, আমার রিপুকুলের ব্যূহ ভেদ করিতে পারিব কি না তাহা কেমন করিয়া বলিব। পূর্বে আমি মনে করিয়াছিলাম, বিদ্যা সম্ভবতঃ কোন খুকী হইবে। তাহার পর জানিয়াছিলাম পুস্তকাদি পাঠে যাহা জ্ঞান হয় তাহাই বিদ্যা পদবাচ্য। সুতরাং সে বিদ্যা লাভ করা অনায়াস সাধ্য, বিশেষ কষ্টকর নহে। কিন্তু এক্ষণে, বাবার নিকট যে বিদ্যার কথা শুনিলাম, সে বিদ্যার সহিত বর্তমানের বিদ্যা যাহা সকল খোকাতেই পাঠ করিয়া থাকে তাহাকে এক্ষণে আমার অবিদ্যা বোধ হইতেছে এবং বর্তমানের অপরা বিদ্যাকে আমার অপাঠ্যই বোধ হইতেছে। যাহা হউক মা, আমার বাবা যে বিদ্যার

কথা কহিলেন তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য তোমাদের কথামত আমি প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিব জানিবে।

মা, আমার এই সকল কথা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বাবা খোকা আমি তোমার কথায় বড়ই আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলাম। ভগবান যেন তোমার এইরূপ বুদ্ধি দেন; এক্ষণে আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমার গা হাত মুছাইয়া দিই। ইহা বলিয়া মা, আমার গাত্রে ভিজা গামছা দিয়া আমার গাত্র হাত পা মুখ সব মুছাইয়া দিয়া, তাহার পর একটু দুগ্ধ খাইতে দিলেন। আমিও মা'র হস্ত হইতে দুগ্ধের বাটি লইয়া দুগ্ধ পান করিলাম। তাহার পর মা আমাকে কহিলেন, বাবা খোকা, এইবার বাহিরে বাবু যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানে তুমি যাও; তিনি যেরূপ বলিবেন তাহাই করিবে। আমাকে বাহিরে যাইবার কথা বলায়, আমি আমার মা'কে প্রণাম করিয়া তাহার পর বাবার নিকটে বাহিরে যাইলাম। বাবা যে ঘরে বসিয়াছিলেন আমি সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পাশে বসিলাম। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাবার নিকট দুই তিন জন লোক বসিয়া কি কি কথা কহিতেছেন; আমি ঘরের মধ্যে বাবার পাশে বসিবার পরেই তাঁহারা আপন আপন কথা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, বাবা, সরকার মহাশয়কে ডাকিলেন। সরকার মহাশয়কে আমি সরকার দাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকি। তিনিও আমাকে ছোট ভ্রাতার মতন আদর যত্ন করিয়া থাকেন। আমার বাবা সরকার দাদাকে ডাকিবার পরই সরকার দাদা কতকগুলি পুস্তক হস্তে করিয়া আসিলেন এবং সরকার দাদার সঙ্গে আমাকে যিনি নিত্য বাড়ীতে পড়াইয়া থাকেন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার বাবাকে সরকার দাদা পুস্তকগুলি দিয়া চলিয়া গেলেন, কেবল আমার শিক্ষক মহাশয় মাত্র ঘরে রহিলেন এবং আমরা রহিলাম।

আমার বাবা পুস্তকগুলি হস্তে করিয়া সবগুলি একে একে গুণিতে লাগিলেন। মোটের উপর দশখানি পুস্তক হইল। পুস্তকগুলি গণনা করিয়া তাহার পর আমার শিক্ষক মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় একবার পুস্তকের ব্যাপার দেখুন, আমার খোকার ওজনের অপেক্ষায় পুস্তকের ওজন বেশী। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন প্রায় তাহাই বটে। আমি পুস্তকগুলি নীচে সরকার মহাশয়ের নিকট বসিয়া দেখিয়াছি, তবে উহা পাঠের পক্ষে খোকার কষ্টকর হইবে না বলিয়া আশা করি। কারণ ভাষা শিক্ষা যাহা খোকাকে দিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। আমি খোকাকে মৌখিক ভাবে ব্যাকরণ ও যাহা শিক্ষা দিয়াছি তাহাতে এই লোহারাম ব্যাকরণ খানি পড়িতে খোকার অসুবিধা হইবে না। লোহারাম ব্যাকরণ খানি বাঙ্গালা শিক্ষার বেশ উপযোগী। তবে আজকাল অনেক রকম ব্যাকরণ বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য লোহারাম ব্যাকরণের

অনুকরণে হইতেছে বটে তাহা তত’ সুবিধা জনক নহে। আজকাল আবার ইংরাজি অনুকরণে অনেক ব্যাকরণ ছাপা হইতেছে। তাহাতে ভবিষ্যতে তাহা দ্বারায় ছাত্রগণের ব্যাকরণ শিক্ষা একেবারেই লোপ পাইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বস্থান অপেক্ষায় ব্যাকরণ শিক্ষার শীর্ষস্থান ছিল। বর্তমানে ইংরাজির অনুকরণে যে সমুদয় ব্যাকরণ ছাপা হইতেছে তাহার দ্বারায় ভারতবর্ষ অতি শীঘ্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে সর্বদেশ হইতে অতি নিম্নস্তরে পতিত যে হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষে লোহারাম কৃত ব্যাকরণই উৎকৃষ্ট। সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে, প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত উপক্রমণিকা ও কৌমুদী ব্যাকরণ; উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সংক্ষিপ্ত সার, মুগ্ধবোধ, কলাপ ও পাণিনি ব্যাকরণ শীর্ষস্থানীয়। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষা চলিতেই পারে না! সেই ব্যাকরণ শিক্ষার অভাবহেতু বর্তমানে আর পূর্বতন পণ্ডিতগণের সমকক্ষ কেহ হইতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, পুস্তকের সংখ্যা বেশী হইলেও আমাদের খোকার তত অসুবিধা হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। অঙ্ক শাস্ত্র পাটীগণিত, জ্যামিতি যাহা রহিয়াছে তাহাও খোকার পক্ষে কষ্টকর হইবে না। কারণ আমি খোকাকে শুভঙ্করীর সমস্ত অঙ্ক শিক্ষা দিয়াছি এবং লীলাবতী হইতে অনেক অঙ্ক কসাইয়াছি। সুতরাং খোকার পক্ষে পাটীগণিতস্থিত অঙ্ক বা জ্যামিতি কষ্টকর হইবে না। আমি সব ঠিক করিয়া লইব। তবে এক্ষণে খোকাকে পরিশ্রম কিছু বেশী করিতে হইবে।

আমি রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্য হইতে অনেক ভাল ভাল পদ্যও পাঠ করাইয়াছি। খোকা পদ্য হইতে গদ্যও করিতে পারে, এবং পদ্য রচনা করিবার প্রণালীও শিক্ষা দিয়াছি। খোকা ছোট ছোট পদ্য রচনা করিতে পারে, সুতরাং পদ্য সম্বন্ধেও খোকার বিশেষ কষ্টকর হইবে না। তাহার পর ইতিহাস ও ভূগোল যাহা রহিয়াছে তাহাও বিশেষ কষ্টকর নহে, ইতিহাসখানি আমি খোকাকে সাহিত্য পড়ার মত করিয়া পাঠ করাইয়া দিব। তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে ভূগোলখানি মুখস্থ করিতে হইবে, তাহাও কষ্টকর হইবে না। কারণ খোকার স্মরণ শক্তি বেশ আছে একবার যাহা শ্রবণ করে তাহা প্রায় ভুলিয়া যায় না। সুতরাং, তাহাতেও বিশেষ অসুবিধা হইবে না। খোকা বাড়ীতে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, যদি কোন বিদ্যালয়ে প্রথম হইতে যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ শিক্ষা হইত না, অধিকন্তু খোকার চরিত্রও অনেক পরিমাণে কলুষিত হইয়া যাইত। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিকে যমালয় বা খেলায় ও আমোদ প্রমোদের আড্ডা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তরল মতি বালকগণ নানা রকম বালকের সঙ্গ দ্বারায় নানা প্রকার কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের খোকার এখন পর্য্যন্ত কোন রকম কুশিক্ষার ভাব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

পণ্ডিত মহাশয় ইহা বলিতেছেন এমন সময় আমার স্কুল কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কুল কাকাকে দেখিয়া, বাবা বলিলেন, ভাই আসিয়াছ। আমি তোমারই আগমন

অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইহা বলিয়া বাবা, স্কুল কাকাকে বসিতে বলিলেন। স্কুল কাকা বাবার সামনে একটা চেয়ারে বসিলেন তাহার পর, বাবা আমার পন্ডিত মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পন্ডিত মহাশয় খোকার পাঠ্য পুস্তকগুলি মনস্থ হইয়াছে ত', আপনার যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আপনি এখন বলিতে পারেন। কারণ আমার ভায়াও উপস্থিত। ভায়ার একটি বিদ্যালয় আমাদের পাড়াতেই আছে। ইনি সেই বিদ্যালয়ের প্রধান পন্ডিতরূপে কার্য্যও করিয়া থাকেন। পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে তাহা হইলে ভায়ার সাক্ষাতেই বলিতে পারেন। বাবার কথা শুনিয়া পন্ডিত মহাশয় কহিলেন, আমি পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে দোষ আর কি বলিব। বর্তমানের রীতি অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক যাহা খোকা পাঠ করিবে তাহা মন্দ নহে। তবে অনেকগুলি পুস্তক হইয়াছে তাহা হইলেও খোকার পক্ষে তাহা কষ্টকর হইবে না। খোকা মাত্র এই অষ্টম বর্ষে পড়িয়াছে, কি পড়িবে, একারণ যদি কষ্টকর হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় তাহাই আশঙ্কার বিষয়। কারণ একটু বেশী পরিশ্রম না করিলে সব পাঠ্য পুস্তকগুলি আয়ত্ত হইবে না। বাবা ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ কাকার সহিত পন্ডিত মহাশয়ের অনেক সুখ্যাতি করিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহার পর বাবা, পন্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, পন্ডিত মহাশয়, আপনি পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে যাহা মত প্রকাশ করিলেন, আমারও অভিমত তাহাই। বর্তমানে সাধারণ বালকগণ যেভাবে লালিত পালিত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এত অধিক পুস্তক পাঠ করিলে যে নিশ্চয়ই তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। বর্তমানে বালকগণের আহারাদির অনিয়ম বশতঃ এবং অযথা কালে আহারাদি করায় তাহার উপর তাহাদের ওজন অপেক্ষায় পুস্তকেব ভারে অধিকাংশ বালকের প্রয়শঃ শারীরিক ও মানসিক বলহীন হইয়া ভীরু, উদ্যমশীল রাহিত্য ইত্যাদি অনেক দোষ আসিয়া পড়ে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"তিথিতে নিষিদ্ধ ভোজন"

বর্তমানে বঙ্গদেশে সাধারণ বালকগণ প্রায়শঃ আমিষ ভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আমিষ ভোজীই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মৎস্য মাত্রেই কফ্ এবং পিত্ত বর্দ্ধক। আমাদের দেশে অনেকেই মৎস্য বা মাংস ভোজনের সহিত দুগ্ধও পান করিয়া থাকেন ইহা আরো দূষণীয়। মৎস্য বা মাংস ভোজনের সহিত দুগ্ধ পান করিলে উদরস্থ যকৃতের কার্য্যকরণ শক্তি ক্রমশঃ হীন হইয়া, কালে শরীর ব্যাধি মন্দিরে পরিণত হইয়া থাকে। পূর্বেকার নিয়ম এখন আর কেহই পালন করেন না; পূর্বে শুক্ল, কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এই সকল তিথিতে ভাল লোকেরা প্রায়শঃই মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিতেন না। উপরোক্ত তিথিতে শুক্ল পক্ষে জীব শরীরে শ্লেষ্মার আধিক্য স্বাভাবতঃই হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণ পক্ষের উপরোক্ত তিথিতে পিত্তাধিক্য হইয়া থাকে। একারণ পূর্বোক্ত তিথিতে স্ত্রী, তৈল ব্যবহার এবং মৎস্য মাংস ভক্ষণ, শাস্ত্রাদিতে নিষেধ আছে। ইহা যে কেন নিষেধ আছে তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই উক্ত শাস্ত্র বাক্য অনেকেই লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত তিথি সকলে স্বভাবতঃই চন্দ্র সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি হইয়া পিত্ত বা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পায় বলিয়া পিত্ত শ্লেষ্মাকর বিষয়গুলি ভোগ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিষয়গুলি মানব শরীরে ধীরে ধীরে বিষ ভক্ষণ করার কার্য্য হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা তীব্র বিষ ভক্ষণ করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই বিষের কার্য্য প্রকাশ পাইয়া শরীর নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে, তদ্রূপ নহে। ধীরভাবে যথাকালে, ইহার ফল মানবগণকে ভোগ করিতে হইয়া থাকে। একারণ, অন্ততঃ যে সকল তিথিতে যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষেধ আছে, তাহা মান্য করা উচিত। এইরূপ মানিলে স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল থাকে।

নিত্য মাংস ভক্ষণ আমাদের দেশে একেবারেই নিষেধ হওয়া উচিত, জীব তাহা মানিতে চাহে না, বলিলেও কেহ নিত্য মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে না। এই সকল কারণেই, তন্ত্রে ভক্ষণ কমাইবার অভিপ্রায়ে তন্ত্র মতে ঐ বলি প্রদান প্রথা চলিয়াছে। এক সময়ে যবন রাজগণের রাজত্বকালে মাংস ব্যবহার বহুলভাবে ভারতের সর্বত্রে প্রচলিত হইয়াছিল। যখন রাজগণের আধিপত্য কমিবার সময়েও মাংস ভক্ষণ কমিতে

না দেখিয়া ঐ সময়ে সিদ্ধ সাধুগণের দ্বারায় পশু বলি দিয়া দেবী পূজার প্রচলন পশুভাবাপন্ন মানবগণের জন্য প্রচার হইয়াছিল অর্থাৎ বৃথা মাংস ভক্ষণ না করিয়া পূজা করিয়া পশু বলিদান দিয়া দেবীর প্রসাদ বোধে মাংস ভক্ষণ কর। ইহাতে মাংস ভক্ষণ নিষেধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, কারণ তাহা হইলে আর নিত্য মাংস ভক্ষণ করা সকলকার পক্ষে ঘটিয়া উঠে না এবং নিত্য দেবী পূজা করাও সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা ব্যয় সাপেক্ষ, সুতরাং অনেকটা পরিমাণে মাংস ভোজন কমিয়াছিল। এক্ষণে আবার পূর্ব ভাব চলিয়াছে, বর্তমানে অনেকে নিত্য বাজার করার সঙ্গে অন্ততঃ এক আধ পোয়া সামর্থ্য অনুযায়ী মাংস আনিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং পুত্র কন্যা পরিবারদিগকে ভক্ষণ করাইয়া থাকেন। ইহারা ভ্রান্তভাবে, সুখাদ্য এবং পুষ্টিকর ও বলকর খাদ্য বোধে প্রকারান্তরে বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে এ বিষও তীব্র বিষের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য প্রায় করে না। ধীরে ধীরে বিষের কার্য্য প্রকাশ করিয়া মানব শরীরকে কালে ধ্বংস ও অকর্মণ্য করিয়া থাকে।

গৃহপালিত সকল প্রকার পশু বা পক্ষী মাংস একেবারেই অব্যবহার্য্য। কারণ গৃহপালিত পশু শরীরে নানা প্রকার ব্যাধির জীবাণু বিদ্যমান থাকে। যাঁহারা গৃহপালিত পশু বা পক্ষী ভক্ষণ করিয়া থাকেন, উক্ত ব্যাধির জীবাণু অনুযায়ী ব্যাধি তাহাদের শরীরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল কারণে আমাদের দেশে আগে অল্প ক্বচিৎ কখন দুই একটি ব্যাধি ছিল, এক্ষণে অনেক স্থলেই পর্য্যাপ্ত ভাবে ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমত ক্ষয় রোগ, রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ মন্দাগ্নি, অম্ল রোগ, বহুমূত্র এবং অবিরাম বিষম জ্বর প্রভৃতি রোগে অনেককেই কষ্ট পাইতে দেখা যায়। এসকল ব্যাধি প্রাচীন কালে অবিধি মতে চলিলে হইত। বর্ত্তমানে উক্ত ব্যাধি প্রপীড়িত ব্যক্তির অভাব নাই, সর্বত্রেই অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাধি হইবার প্রধান কারণ নিত্য গ্রাম্য পালিত পশু পক্ষীর মাংস ভোজন বিধি প্রায় ছিল না। সে সময়ে শিকার লব্ধ মাংস ভোজন করাই প্রচলিত ছিল, অনেকে নিজেরাই শিকার করিতেন এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক শিকারের দ্বারায় আনিত মাংসও অনেকে ক্রয় করিয়া ভোজন করিতেন। এ কারণ উক্ত সময়ে উক্ত ব্যাধি সকলের প্রকোপ বেশী ছিল না। জঙ্গলে যে সকল পশু স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া আপন ইচ্ছামত তৃণ লতা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের গ্রাম্য পালিত পশু পক্ষীগণের ন্যায় ব্যাধির জীবাণু সকল থাকিতে পারে না। তাহাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করায় মনের প্রফুল্লতা ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গ্রাম্য পালিত পশুগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে না পারায় এবং আপন ইচ্ছামত আহার না করিতে পারায়, তাহারা কোন গতিতে ম্লানভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে। একারণ মানবের ন্যায় তাহাদের শরীরেও নানা প্রকার ব্যাধির জীবাণু (গৃহপালিত পশু পক্ষীর শরীরে) প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল গৃহপালিত

পশু পক্ষীর মাংস ভোজনে মানব শরীরেও নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া থাকে। তাই বর্ত্তমানে আমিষ ভোজীগণের মধ্যেও অনেকের উৎকট উৎকট ব্যাধি প্রায় দেখা যাইতেছে। আমিষ ভোজীগণের প্রথমতঃ কিছু আসুরিক বল দেখা যায় বটে, কিন্তু আমিষ ভোজীগণের পরিণামফল সন্তোষজনক কাহারও থাকে না। আমিষ ভোজীগণ অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু নিরামিষ ভোজীগণ অকাতরে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও বিশেষ কাতর হয়েন না। মাংসভোজী মানবেরা যেমত একটু পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই অমনি মুখ শুকাইয়া পিপাসায় কাতর হয়েন এবং সেই পিপাসা নিবারণ জন্য মধ্যে মধ্যে চা পান করিয়া পিপাসা ও ক্লান্তির অবস্থাকে নিবারণ করেন, তাহা নিরামিষ ভোজীগণের করিতে হয় না এবং চা পানও করিতে হয় না।

চা পানের অপকারিতা অনেকের জানা নাই। চা পানে অজীর্ণ মন্দাগ্নি, অম্লরোগ প্রভৃতি প্রায় হইয়া থাকে। বিশেষ আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, এদেশে চা পান বা নিত্য মাংস ভোজন একেবারেই পরিত্যজ্য বলিয়া আমার বিবেচনায় বোধ হয়। সাধারণ পশুগণের মধ্যেও দেখা যায় যাহারা মাংসভোজী তাহারা অল্প পরিশ্রম করিলেই জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু যাহারা কেবলমাত্র তৃণ, পত্র, শস্যভোজী তাহারা সমস্ত দিবা পরিশ্রম করিয়াও বিশেষ ক্লান্ত হয় না। ইহা একটু সাধারণ পশুগণের মধ্যে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমিষ ভোজী মাংসালোলুপ মানবগণের দৃষ্টি সে দিকে যায় না। মাংসের প্রধান গুণ হিংস্রক পশু ভাব ও আসুরিক ভাবকে বৃদ্ধি করায়। মাংসের য সকল গুণ আছে তাহা ব্যাধিগ্রস্ত মানবের পক্ষে সময় সময় আবশ্যক হইয়া থাকে, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে নহে, সুস্থ ব্যাক্তির পক্ষে নিত্য সেবনযোগ্য নহে ও মাংসেতে যে সকল গুণ আছে, তাহা বন্য পশুতে আছে, গৃহপালিত পশুপক্ষীতে তাহার বিপরীত গুণই দেখা যায়। একারণ গৃহপালিত পশুপক্ষী মানবের একেবারেই অভক্ষ্য বলিয়া আমার বিবেচিত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই; মনে করুন আমাদের দেশস্থ মুসলমান ভায়াগণের মধ্যে যত অধিক উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখা যায় এত উৎকট ব্যাধি অপর জাতির মধ্যে অনেক কম পরিমাণে দেখা যায়।

মহাত্মা মহম্মদ সাহেবও তাঁহার শিষ্যগণকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা মনুষ্যের উপকারে যে সকল পশু আইসে ও যে সকল পশু গৃহে পালিত হয় তাহাদিগকে কোরবানি করিও না বা আহারের জন্য হালাল করিও না। মহাত্মা মহম্মদ সাহেব মহোদয়ের বাক্য বর্তমানে কয়জন মুসলমান ভায়া পালন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ হিন্দুগণের মধ্যে দেবী সম্মুখে যে বলি প্রদান ব্যবস্থা আছে তাহাই বা কয়জন পালন করিয়া থাকেন। বলি প্রদানের পশু উৎকৃষ্ট এবং ব্যাধিহীন হওয়া চাই। বর্তমানে উৎকৃষ্ট অর্থে যাহা হৃষ্টপুষ্ট মোটা, যাহাতে মাংস ও চর্ব্বি বেশী আছে, তাহাকেই উৎকৃষ্ট মনে

করিয়া লইয়া থাকেন। বন্য পশু ব্যতীত সর্বলক্ষণাক্রান্ত পশু, গৃহপালিত পশুর মধ্যে যে পাওয়া যায় না তাহা কয়জন ব্যক্তি দেখিয়া থাকে। এই সকল বাক্যের মূলে যে মাংস ভোজন নিষেধ রহিয়াছে তাহাও হিন্দুগণের মধ্যে মাংসলোলুপ মানবগণ লক্ষ্য করেন না। যাঁহাদের মাংস ভোজনের প্রবৃত্তি বলবৎ থাকে, তাঁহাদের মাংস ভোজন নিবৃত্তি করা বড় কঠিন বোধে পশু বলি-প্রদানের ছলে প্রকারান্তরে মাংস ভোজন নিষেধই করিয়া গিয়াছেন। প্রবৃত্তি রেসা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহা ফলা। মৎস্য মাংস ভোজনের প্রবৃত্তি করা অপেক্ষায় নিবৃত্তি করাই মহা ফল। মৎস্য মাংস ভোজনের দ্বারায় যদি আমার হিংস্রক পশুগণের ভাব ও আসুরিক ভাব প্রবলই হইল এবং তাহার সহিত যদি আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তাহাতে আর আমার বিশেষ লাভ কি হইল তাহাত' বলিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় মৎস্য মাংস ভোজনের নিবৃত্তি করাই মহা ফল, কারণ তাহাতে আমার অন্ততঃ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না, ইহাই মহৎ লাভ বা মহা ফল।

পন্ডিত মহাশয় আপনি পূর্বে বলিতেছিলেন, খোকার পাঠ্যপুস্তকগুলি অনেক হওয়ায় খোকাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে। অধিক পরিশ্রম করিলে পরিণামে পাছে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় আপনার এই আশঙ্কা হইতেছে। পন্ডিত মহাশয়, আমার খোকার সম্বন্ধে সে আশঙ্কা হয় নাই হবেও না। কারণ খোকা নিজে আমিষ ভোজী নহে এবং আমিষ ভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণও করে নাই। মাংসও কখন উহার উদরস্থ হয় নাই এবং বলিতে কি খোকার অতি শৈশব কাল হইতে অদ্য পর্যন্ত কোন উৎকট ব্যাধি দূরের কথা, কোন সামান্য ব্যাধিও হয় নাই। অতি শৈশবে উহার একবার বালসা (বালসা,বালকগণের সামান্য সর্দ্দি জ্বরকে কহিয়া থাকে) হইয়াছিল, তাহা আপনিই বিনা ঔষধে সারিয়া গিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত খোকার কোন প্রকার ঔষধ উদরস্থ হয় নাই। সুতরাং অধিক পরিশ্রম করার দরুণ যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে সে আশঙ্কা নাই জানিবেন। তবে স্বাস্থ্য ভঙ্গের অপর এক আশঙ্কা হইতেছে, সে আশঙ্কা অসময়ে আহার করা। বর্তমানে বালকগণের এবং মসি জীবিগণের অসময়ে আহার করিয়া অনেকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা যায়। প্রাতে এক প্রহরের মধ্যে সামান্য জলযোগ, বালকগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং হিতকারী। বালকগণের পক্ষে দোকানের ঘৃতপক্ক জিনিষ একেবারে অভক্ষ্য বস্তু বলিয়া বালকগণের অভিভাবকগণের জানা থাকা উচিত। দোকানের খাদ্যদ্রব্য সকল কি বালক কি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সকলকার পক্ষেই অহিতকর এবং নানা প্রকার ব্যাধির আকার স্বরূপ। বিদ্যালয়ের বালকগণ বা মৎসজীবি কর্মচারীগণ অতি প্রাতে আহার করার দরুণ মধ্যাহ্নে সকলেই দু'চার পয়সা বা দু'চার আনার অম্লপিত্তের বীজস্বরূপ দোকানের কৃত জলখাবার কিনিয়া ভোজন করিয়া থাকে। ইহার দ্বারায় বর্তমানে অম্ল রোগ, অজীর্ণ উদরাময় প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যাধি অনেককে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। ইহাও স্বাস্থ্য ভঙ্গের অন্যতম কারণ। বালককাল হইতে

অসময়ে এবং দোকানের অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিতে করিতে পরিণামে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া অকালে কাল করলে পতিত হইয়া থাকে। বালকগণের জন্য খাদ্যদ্রব্য আপন আপন বাটীতে বিশুদ্ধভাবে তৈয়ার করাইয়া আবশ্যক মত তাহাদিগকে ভোজন করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

যাহাদের নিজের প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য নাই বা জানা নাই বা যাহারা অর্থাভাব বশতঃ প্রস্তুত করিতে অসমর্থ, তাহারা আপন আপন বালকগণকে এরারুটের বিস্কুট না খাওয়াইয়া মুড়ি খাইতে দিতে পারেন। মুড়িতে কোন প্রকার দোষ নাই। মুড়ি নারিকেল কোরার সঙ্গে ভোজন করিলে শরীরের পক্ষে অতি উপাদেয় বস্তু বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে মুড়ি খাইয়া অন্ততঃ দেড় ঘন্টা জল খাওয়া চাহি না, তাহা হইলে মুড়ির দ্বারা কোন প্রকার অপকার না হইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যের উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। আমাদের বঙ্গ দেশে নারিকেলেরও অভাব নাই, মহামূল্য বস্তুও নহে। বঙ্গ দেশের সর্বত্রেই ইহা অনায়াসলব্ধ বস্তু। তবে বর্তমানে প্রত্যেক বাটীর গৃহিণীর বা কর্ত্রীঠাকুরাণীরা আপন আপন বালককে মুড়ি খাইতে দিতে লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বর্তমানে মনে করিয়া থাকেন মুড়ি গরিব লোকের খাদ্যদ্রব্য ইহা আমার পুত্র বা কন্যারা ভোজন করিলে, লোকে মনে করিবে ইহারা হয়ত কৃপণ, না হয় অর্থহীন। এই মর্য্যাদা হানির জন্য কর্ত্রীঠাকুরাণীগণ কিছুতেই আপন আপন বালকগণকে মুড়ি খাইতে দেন না বরং বলিয়া থাকেন উহা সহ্য হইবে না, মুড়ি খাইলে অসুখ করিবে ইত্যাদি নানা রকম ভাবের কথা উত্থাপন করিয়া মুড়ি খাওয়া রহিত করেন। আবার কখন কখন বাদলা বা বৃষ্টি হইলে কর্ত্রীঠাকুরাণীরা মুড়ি নিজেও খাইয়া থাকেন এবং দু'এক মুঠো আপন আপন পুত্র কন্যাকেও দিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা যেরূপভাবে মুড়ি খাইয়া থাকেন তাহাতে মানবের অখাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা প্রথমতঃ মুড়িতে কাঁচা তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া তাহার পর কিঞ্চিত লবণ তাহাতে মাখাইয়া তাহার পর কাঁচা লঙ্কা বা নারিকেলের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা রসনা তৃপ্তির জন্য স্বাস্থ্যকর জিনিষকে অস্বাস্থ্যকর করিয়াই ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং উক্তরূপ মুড়ি খাইয়া তাঁহাদের নিজেদের এবং পুত্র কন্যার সহ্য না হওয়ায় মনে করিয়া থাকেন মুড়ি অস্বাস্থ্যকর জিনিষ। বস্তুতঃ খালি মুড়ি অস্বাস্থ্যকর নহে। তৈল, লবণ, লঙ্কা বা ঘৃতের সহিত মিশ্রযোগে ভোজন করায় গুরুপাক হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া যে উঠে তাহা কর্ত্রীগণ না বুঝিয়া মুড়ির বিরুদ্ধে নানারকম দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইহা প্রায় শহর বা শহরতলির কর্ত্রীঠাকুরাণীরা বলিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় আমাদের বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণীদেরও উক্ত প্রকার ধারণা যে নাই তাহা নহে।

আমাদের বঙ্গ দেশে ঘৃতপক্ক দ্রব্য নিত্য ভোজন করা ঠিক নহে। যেমন অনেকে নিজে ও পুত্র কন্যাকে অন্ততঃ রাত্রে ঘৃতপক্ক লুচি এবং নানা মসলাযুক্ত গুরুপাক

ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন, ও ভোজন করিয়া থাকেন, ইহা ঠিক নহে। ইহাতেও অনেক সময়ে স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রাত্রের ভোজন, আমাদের দেশে লঘু করাই কর্ত্তব্য। যে দেশের যেরূপ জলবায়ু আহার তদনুযায়ী হওয়া উচিত। বঙ্গ দেশে রাত্রে বা দিনে পুরাতন চাউলের অন্ন ব্যঞ্জন উপযোগী, ইহার বিপরীত আহার করিলে সাময়িক কোন ব্যাধি না হইলেও পরিণামে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে দিবা দেড় প্রহরের পর এবং আড়াই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রে এক প্রহরের মধ্যে আহার করা অনুচিত। আহারও পরিমিত করা চাহি, অপরিমিত আহার করা একেবারে অনুচিত। মধ্যাহ্নে অন্ন ব্যঞ্জন আহার করা বালকগণের এবং মসীজীবিগণের এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মসীজীবিগণের মধ্যে অনেকের সূর্য্য বর্তমান থাকিতে অন্ন ব্যঞ্জনটা আহার করা ঘটিয়া উঠে না। ইহাদের ভিতর অনেককে সূর্য্য উদয়ের পূর্বে মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া আপন কর্মস্থলে যাইতে হয়, আহার রাত্রি আটটা বা নয়টার মধ্যে নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহাতে আর স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকিতে পারে তাহা জানি না। এই সকল কারণেও মসীজীবিগণের মধ্যে অনেকে পরিণামে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। অসময়ে আহার করিয়া তাহার উপর গুরুতর পরিশ্রম করায় মনের বল নষ্ট হইয়া ইহাদিগকে আজীবন অশান্তি ভোগ করিতে হয়। পন্ডিত মহাশয় আমার খোকার ৯টার মধ্যে আহার করা অভ্যাস নাই, এই কারণে খোকার কোন রকম স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।

তাহার পর, বাবা আমার স্কুল কাকাকে বলিলেন,—ওহে ভায়া তোমরা কি বিদ্যালয়ের কার্য্য আমাদের দেশের পূর্ব রীতি অনুযায়ী করিতে পার না। তাহাতে দোষ কি আছে যে, আমরা আমাদের পূর্বরীতি পরিত্যাগ করিব। অবশ্য যদি আমাদের দেশের পাঠশালা সমূহের কার্য্যারম্ভে সময়ের দোষ থাকে বা সময় কম হইয়া পড়ে তাহা হইলে পূর্ব রীতি পরিত্যাগ করা উচিত, নচেৎ পূর্ব রীতি পরিত্যাগ না করিয়া তাহা সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কি উচিত নহে? তবে যদি পূর্ব রীতি পরিত্যাগ না করিয়া তাহা সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কি উচিত নহে? তবে যদি পূর্বরীতি যাহা ছিল তাহা অনিষ্টকর হয় তাহা হইলে অবশ্য পূর্বরীতি অনুযায়ী চলা অনুচিত। পূর্বরীতি যাহা যাহা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহা প্রায় আমাদের দেশের জলবায়ুর অনুকূলেই আছে, জলবায়ুর আবহাওয়া যে দেশের যে রকম থাকে সেই সকল দেশের আচার ব্যবহার, আহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি তদনুরূপই হওয়া উচিত তাহা না হইলে বা তাহা পালন না করিলে পরিণামে তাহার দ্বারায় কেহ সুফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না অতীব নিশ্চয়। আচার ব্যবহার আহার পরিচ্ছদাদিতে আমাদের পূর্ব রীতি যাহা ছিল তাহার পরিবর্তনে আমরা বর্ত্তমানে তাহার কুফলও কম ভোগ করিতেছি

না। কুফলের এই একমাত্র কারণ এই আমাদের পূর্বরীতি যাহা ছিল তাহার পরিবর্তনে আমরা বর্ত্তমানে তাহার কুফলও কম ভোগ করিতেছি না। কুফলের এই একমাত্র কারণ এই আমাদের পূর্ব্বরীতি পরিবর্ত্তন করার ফলস্বরূপ।

শীত প্রধান দেশের আহার পরিচ্ছদ আমরা বর্ত্তমানে প্রায় নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি মনে কর, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বালকগণের শৈশব অবস্‌তা হইতে গরম পশমী কাপড়ের জামা ঘাগরা প্রভৃতি বালক-বালিকার শোভাবর্দ্ধন করার মানসে অধিকাংশ লোকে আপন আপন পুত্র কন্যাকে প্রায় সর্বদা গাত্রে পরিধান করাইয়া থাকেন, ইহা আমাদের দেশের উপযোগী নহে। ইহা শীত প্রধান দেশের উপযোগী। এই কারণে বর্তমানে শৈশব অবস্থা হইতে প্রায় শিশুগণ যকৃত জনিত পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে অনেক শিশু যকৃত জনিত পীড়ায় কাল কবলে পতিত হইয়া থাকে, কেহ বা অতি কষ্টে রক্ষা পায়। যে সকল শিশু এই ব্যাধি হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের মধ্যে অনেককেই আজীবন প্রায় রুগ্নাবস্থায় কাটাইতে হইয়া থাকে। এই ব্যাধি শিশুগণের কেন হয় তাহার নিগূঢ় কারণ কয়জন লোক অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান না পাইয়া কেহ বলিয়া থাকেন, আজকাল গাভী খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায় না, খাঁটি দুগ্ধের অভাবে শিশুগণের এই যকৃতজনিত পীড়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাও ঠিক কথা নহে, কারণ প্রথমতঃ শিশুগণের অতি শৈশব অবস্থায় মাতৃ দুগ্ধ ব্যতীত অপর দুগ্ধ পান করা পূর্ব রীতি বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ যদিই গাভী দুগ্ধ পান করান ক্বচিৎ আবশ্যক হয় তাহা হইলে খাঁটি দুগ্ধ শিশুগণকে পান করান উচিত নহে। কারণ তাহাতেও শিশুগণের নানাপ্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। শিশুগণের পক্ষে মাতৃস্তন দুগ্ধই প্রশস্ত এবং পূর্বরীতি অনুযায়ী চলিলে মাতৃদুগ্ধের অভাব হয় না। ইহাতে যদি বলা যায় যে যদি মাতার স্তনে দুগ্ধ না আইসে বা না হয় তাহা হইলে কি করা যাইবে। তাহার উত্তরে আমি ইহাই বলিতেছি, প্রথমতঃ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সন্তান প্রসবের পর দু'চার দিন পর্য্যন্ত মাতার স্তনে দুগ্ধ আইসে না। তবে একেবারে যে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আইসে না তাহা নহে। সামান্য আইসে, এই কারণে প্রথমতঃ গাভীদুগ্ধ শিশুকে দেওয়া যায়, তাহা খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে। দুগ্ধে জল মিশাইয়া তাহার পর সেই দুগ্ধ জাল দিয়া জলভাগ মরিয়া গেলে সেই দুগ্ধ পান করান উচিত। খাঁটি দুগ্ধে যে জল মিশাইতে হইবে তাহার পরিমাণ হওয়া উচিত। এক পোয়া দুগ্ধ তিন পোয়া জল দিয়া তাহা কাষ্ঠের জ্বালে জ্বাল দিয়া এক পোয়া দুগ্ধ থাকিতে নামাইয়া পরে সামান্য গরম থাকিতে থাকিতে বালককে পান করিতে দেওয়া উচিত। তাহার পর প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ আসিলে গাভী দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল স্তন দুগ্ধই শিশুকে পান করান উচিত। ইহাতে যদি বলা যায়, স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে অগত্যা লোকে অপর দুগ্ধ আপন আপন শিশুকে পান করাইতে বাধ্য

হইয়া থাকে সে সময় উপায় কি হইবে। ইহার উত্তরে আমি ইহাই বলিব পূর্ব্বরীতি অনুযায়ী যদি প্রসূতিরা চালিত হন তাহা হইলে প্রায় স্তনদুগ্ধ দূষিত হইতে পারে না। বর্তমানে অধিকাংশ নারীগণ পূর্ব্বরীতি পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক চাল চলনে আচার ব্যবহার, আহার পরিচ্ছদ, সমস্তই প্রায় পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন।

গর্ভাবস্থা সময়ে প্রসূতির যেরূপ ভাবে আহারাদি করা উচিত ও সর্ব্বদা পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত তাহা যেসকল গৃহে অর্থাভাব নাই, তথায় গর্ভিণীরা প্রায় কোন পরিশ্রমের কার্য্য করেন না। এই কারণে প্রসবকালে ইঁহারা অত্যাধিক যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন। এবং নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য ভোজনও করিয়া থাকেন, তাহার পর গরম পশমী জামা ও অনেক সময় সর্ব্বদা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। একে কোন প্রকার পরিশ্রম নাই তাহার উপর গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং গরম জামা সর্ব্বদা ব্যবহার করায় স্বতঃই অম্লদোষ হইয়া ক্রমশঃ শরীর খারাপ হইয়া পরে প্রসব অন্তেও পূর্ব্বরীতি পালন না করায়, অর্থাৎ প্রসব অন্তে সূতিকা গৃহে প্রসূতির যে রকম নিয়মে পূর্ব্বরীতি অনুসারে থাকা উচিত তাহার কিছুই বর্ত্তমানে পালন না করায় স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়া থাকে, নচেৎ পূর্ব্বরীতি পালন করিলে প্রায় স্তনদুগ্ধ দূষিত হইতে পারে না প্রসূতির কোন প্রকার পীড়াও হইতে পারে না। তবে কোন কোন স্থানে সূতিকা গৃহের ঠিক ব্যবস্থা না থাকায় সময় সময় প্রসূতি ও শিশুকে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও প্রায় অজ্ঞতা জনিত হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বরীতির দোষ নহে; আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে গর্ভাবস্থা হইতে প্রসব কাল ও সূতিকা গৃহে থাকা কালীন অবস্থা পর্য্যন্ত যাহা বিধি আছে তাহাকে পূর্ব্বরীতি মনে করা চাহি। তবে আমাদের অজ্ঞতা নিবন্ধন আমরা তাহা না দেখিয়া, অপর দেশের রীতি অনুসারে চালিত হওয়ায় আমাদের সমস্ত বিষয়েরই ক্ষতি হইতেছে। যাহা হউক, পন্ডিত মহাশয় আমি কথার প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন, এক্ষণে কথা হইতেছে যে আমাদের খোকার স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয়।

বাবা ইহা বলিয়া স্কুল কাকার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ভায়া, স্কুল বা বিদ্যালয় এরকম তোমারই দেখিতেছি, এমতস্থলে তুমি কি তোমাদের বিদ্যালয়ের বিদ্যা আরম্ভের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, অর্থাৎ দশটায় পাঠ আরম্ভ হয় আর মধ্যে অর্দ্ধঘন্টা জল খাবারের ছুটি দিয়া তাহার পর আবার পাঠ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে চারিটার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হয়, ইহাতে বালকগণের মধ্যাহ্ন ভোজন করা আর হয় না। আমাদের দেশের যেরূপ জলবায়ু তাহাতে প্রাতে মধ্যাহ্ন ভোজনের কালটা অসময় হইয়া পড়ে, ইহাতে অকাল ভোজন দ্বারায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার প্রধান কারণ। ভায়া, তুমি কি তোমার বিদ্যালয়ে প্রাতে তিন ঘন্টা ও বৈকালে দু'ঘন্টা যেমন পূর্ব্বে নিয়ম ছিল তাহা কি করিতে পার না? আমার স্কুল কাকা কহিলেন, —না দাদা, তাহা আমি পারি না। কারণ সমগ্র

বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান কর্তৃপক্ষ তাঁহার আইন মতে আমিও চলিতে বাধ্য। যদি না চলি তাহা হইলে আমার বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন এবং বর্তমানের বালকগণের অভিভাবকগণও। বর্তমানের প্রথা অনুযায়ী চলিতে চাহেন সুতরাং বালকগণের অভিভাবকগণের মতের বিরুদ্ধে যদি আমি চলি তাহা হইলে তাঁহার আপন আপন বালকগণকে আমার বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইয়া অপর বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিবেন তাহাতে আর আমার লাভ কি হইবে?

আপনি পূর্বরীতির পাঠশালা সমূহে যাহা পাঠের নির্দিষ্ট সময় অবধারিত ছিল বলিতেছেন তাহা যে মন্দ তাহা আমি বলিতেছি না বরং তাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রের সহিত শিক্ষকগণেরও সুবিধা আছে, এবং কার্য্যকালও বেশী পাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই যে শরীর মন ভাল থাকিবে এবং শিক্ষাকার্য্যও যে ভাল হইবে তাহাতে আর আমার সন্দেহ নাই। তবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা দাদা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, যদি বালকগণের সমস্ত অভিভাবক আপন আপন বালকগণের মঙ্গলার্থী হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বরীতি অনুযায়ী সময়ে বিদ্যালয়ে পাঠারম্ভ কালের বর্তমান রীতি রহিত করিবার জন্য সকলে মিলিয়া আবেদন করেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য্যও হইতে পারে, নচেৎ দাদা আমার উহা সাধ্য নহে জানিবেন। বাবা বলিলেন,—তাহা হইলে ভায়া, আর ওসব বিষয় লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিব না। এক্ষণে তোমার প্রতি আমার একমাত্র অনুরোধ, খোকার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিও। খোকা যেন বিদ্যালয়ের অসৎ বালকগণের সঙ্গ না করে, কারণ বিদ্যালয়ে ভাল মন্দ সব রকমই ছাত্র থাকা সম্ভব। অসৎ সঙ্গে পড়িলে ভাল বালকও সঙ্গদোষে অসৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। তাহার পর খোকার পুস্তক যাহা যাহা তুমি ভাই লিখিয়া দিয়াছিলে, আমি পুস্তকগুলি সব আনাইয়াছি। এক্ষণে কোন দিন কোন কোন পুস্তক পাঠ হইবে তাহার একটা তালিকা (ফর্দ্দ) করিয়া দিয়া যাও। আর এক কথা, খোকার পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে যে যে অংশ আগামীকল্য খোকাকে অভ্যাস করিতে হইবে, তাহাও আমাদের পন্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া দাও। পন্ডিত মহাশয় সেই সকল বিষয় খোকাকে অভ্যাস করাইয়া দিবেন। বাবার কথার প্রত্যুত্তরে, স্কুল কাকা বলিলেন, আমি খোকার জন্য, খোকা যে শ্রেণীতে পাঠ করিবে সেই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কোন দিন কোন পুস্তক পাঠ হইবে তাহার তালিকা একখানি কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি তাহা আপনাকে দিতেছি এবং পন্ডিত মহাশয়কে আগামী কল্যকার যাহা পঠনীয় তাহাও পুস্তকে দাগ দিয়া বলিয়া যাইতেছি। স্কুল কাকা ইহা বলিয়া বাবাকে নিত্য পঠনীয় বিষয়ের তালিকাখানি দিয়া আমার পন্ডিত মহাশয়কে আগামী কল্যকার পাঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া পুস্তকের মধ্যে একটা একটা ঢেরার মত চিহ্ন করিয়া দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। আমার বাবা নিত্য পঠনীয় পুস্তকের তালিকাখানি পন্ডিত

মহাশয়ের হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন পণ্ডিত মহাশয় এই কাগজ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিবেন। ইহাতে খোকার নিত্য যে যে পুস্তক পাঠ হইবে তাহার ফর্দ্দ রহিল। তাহার পর, পণ্ডিত মহাশয় সেই কাগজ বাবার হস্ত হইতে লইয়া বলিলেন, এই নিত্য পাঠের তালিকাখানি আমি একটা মোটা কাগজের উপর আটা দিয়া তাহার উপর এই তালিকাখানি জুড়িয়া দিয়া,—খোকাকে যে গৃহে বসিয়া আমি পাঠ করাইয়া থাকি, সেই গৃহের মধ্যে একটু উচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিব। তাহা হইলে আর ইহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বাবা পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হাঁ, তাহাই করিবেন। তাহার পর স্কুল কাকা বলিলেন, খোকা যাহাতে অসৎ সঙ্গে না মিশিতে পারে, তাহার জন্য অবশ্য নিশ্চয় সাধ্য মত চেষ্টা করিব। আমার সকল বালকগণের প্রতি তাহা কর্তব্য তবে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা বলিতে পারি না, তবে সাধ্য মত ত্রুটি করিব না ইহা সত্য জানিবেন। অদ্য রাত্র হইয়া গিয়াছে, যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি এখন যাইতে পারি। তদুত্তরে বাবা বলিলেন, —হাঁ ভাই তুমি এখন যাইতে পার, এর পর যখন যাহা হইবে তাহা তোমাকে সংবাদ দিয়া পাঠাইব এবং মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়কেও তোমার নিকট পাঠাইতে পারি। তবে ভাই অদ্য তুমি বাড়ী যাও; স্কুল কাকা বাবাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

বাবা পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় তবে অদ্য আপনিও বাড়ী যান, আগামীকল্য একটু প্রাতে আসিয়া খোকাকে তাহার পঠনীয় বিষয়গুলি যথাসাধ্য অভ্যাস করাইয়া দিবেন। খোকাও বাড়ীতে যাক। এমন সময় টং টং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয় বাবাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। আমরা বাড়ীর মধ্যে আসিয়া, আমাদের উপরের ঘরে আসিলাম। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি আমার মা জপ করিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন, আমি মা'কে দেখিয়া, তাঁহাকে আমার পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে এবং ইহার ভিতর কত রকম সব চিত্র রহিয়াছে। মা'কে একে একে আমার পাঠ্য পুস্তকের চিত্রগুলি দেখাইতে লাগিলাম। বাবা একটু দূরে বসিয়াছিলেন, আমি মা'র সহিত যে যে বালভাবে বলিতেছিলাম বাবা তাহা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে ঈষৎ যেন হাস্য বদনে লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল; আমিও একবার বাবার দিকে দৃষ্টি করিয়া পুস্তকস্থিত চিত্রগুলির বিষয় বলি, আবার মা'র দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলি, আমার পিতামাতা উভয়েরই মনে যাহাতে সন্তুষ্ট হয় এমত ভাবে যেন আমার বর্ত্তমান বুদ্ধি কার্য্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে পিসিমা আসিয়া মা'কে বলিলেন, রান্না হইয়া গিয়াছে, দাদার এবং খোকার জায়গা করিয়া দাও। মা তাহা শুনিয়া আমাদের সামনের দালানে আমাদের জন্য আসন পাতিয়া জল ছিটা দিয়া পরে হস্তের দ্বারা স্থানটি মার্জ্জন করিয়া দিয়া তাহার পর ঘরের মধ্য হইতে দুটো গেলাসে

করিয়া পানীয় জল দিলেন। তাহার পরই মা নীচে চলিয়া গেলেন, খানিক পরেই মা ও পিসিমা দুজনে এক একখানি অন্ন ব্যঞ্জনাদির সহিত থালা আনিয়া আসনের সম্মুখে রাখিলেন এবং পিসিমা বাবাকে বলিলেন, দাদা জায়গা হইয়াছে আহার করিতে বসুন।

পিসিমার কথায় বাবা গৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়া আহার করিতে বলিলেন, আমিও বাবার পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে বসিলাম। বলাবাহুল্য, আমি এখন রাত্রে অন্নই ভোজন করিয়া থাকি, অবশ্য আমরা যে অন্ন ভোজন করি তাহা আতপ চাউলের অন্ন। সাধারণতঃ বালস্বভাব বশতঃ আমার ভোজন করিতে বিলম্বই হইয়া থাকে, আমার ভোজন করা শেষ হইবার পূর্বেই বাবা আহার সমাপন করিয়া আচমন অন্তে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে যাইলেন, আমি ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের রাত্রের আহার প্রায় রাত্র নয় ঘটিকার পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। ক্রমশঃ আমারও আহার শেষ হইল, আমিও উঠিয়া মুখ ধুইলাম। আমার মুখ হাত ধোয়া হইয়া যাইলে, আমি মা'কে বলিলাম, মা, আমার আজ বড় নিদ্রার ভাব আসিতেছে। মা ইহা শুনিয়া বলিলেন,—শয্যা প্রস্তুত আছে বাবা তুমি শয়ন করগে। চল আমি তোমাকে শয়ন করাইয়া দিয়া আসি। ইহা বলিয়া মা আমাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বলিলেন, —খোকা তুমি শয়ন কর। তুমি শয়ন করিলে আমি মশারি ফেলিয়া দিয়া যাইব। তাহার পর আমি শয়ন করিলে পর, মা শয্যার মশারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—বাবা খোকা তুমি নির্ভয়ে নিদ্রা যাও কোন ভয় নাই, আমি বাহিরে দালানেই বসিয়া ভোজন করিয়া লই। ইহা বলিয়া মা বাহিরে গেলেন, তাহার পরই আমি অকাতরে নিদ্রায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"স্বপ্ন ও খেলাঘর"

দুঃখের বিষয় আমার দেহের কোন অংশ বা আমার দেহের সহিত কে নিদ্রায় অভিভূত হইল তাহা বর্তমানে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। তবে আমার দেহেতে আমি বোধ থাকায়, আমি আমার দেহের নিদ্রাবস্থাকেই স্বভাবতঃ নিদ্রা কহিয়া থাকি বস্তুতঃ ইহা যে আমার ভ্রম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার দেহের নিদ্রাবস্থাতে আমি এখন নানা রকম স্বপ্ন দেখিতেছি। আমার যে নিদ্রা নাই, তাহা আমি আমার বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থার ফেরে পড়িয়া প্রণিধান করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমার যেন বোধ হইতেছে যে, আমি আমার বহিরিন্দ্রিয়ের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকেই যদি নিদ্রা বলি, তাহাতেই বা দোষ কি হইতে পারে, দোষ যে হইতে পারে না তাহা নহে। কারণ আমার নিদ্রাকালীন আমার বহিরিন্দ্রিয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ্যাদি নিশ্চেষ্ট ভাবে জড়ের ন্যায় পড়িয়া আছে তাহাও আমার বোধ থাকে না। এমত স্থলে আমার বহিরিন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ্যাদির জড়তা ভাবকে আমার নিদ্রা বলা ঠিক নহে। এক্ষণে আমি মহা সঙ্কটে পড়িলাম দেখিতেছি, কারণ আমার বহিরিন্দ্রিয় বা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ্যাদি জড়ভাব যখন বস্তুতঃ নিদ্রা না হইল; তাহা হইলে নিদ্রা কাহার হইয়া থাকে, ইহাত' আমার জানা নিতান্ত আবশ্যক। যদি বলি নিদ্রা আমার মনের হইয়া থাকে, ইহাও আমার বলা উচিত নহে। কারণ মনের বিশ্রাম দেখিতে পাইতেছি না, বিশ্রাম অবস্থা মনে না থাকিলে মনে নিদ্রা আছে হইয়াছে ইহা বলাও আমার যুক্তিযুক্ত কথা নহে। কারণ আমার জাগ্রতাবস্থাতেই আমার মন সুখ দুঃখের নানা রকম সদসৎ কার্য্য যেমন করিয়া থাকে, আমিও যাহাকে বর্তমানে আমার জাগ্রত অবস্থা কহিয়া থাকি, আমার বর্তমান মন আমার নিদ্রিত অবস্থাতেও তদ্রূপ কার্য্য সমুদয় করিয়া থাকে। এমত স্থলে আর আমার মনের বিশ্রাম কোথায়? বিশ্রাম অভাবে মনের নিদ্রা হইয়াছে বা হইয়াছিল তাহা বলাও যুক্তি সঙ্গত নহে। আমাদের দেহের মূর্চ্ছা ভাবকে আমি যখন আমার নিদ্রা হইয়াছে বলিতে পারি না তদ্রূপ মনের বিশ্রাম অভাবে মনেরও নিদ্রা হইয়াছে বা হইয়াছিল তাহাও বলিতে পারি না। বস্তুতঃ জীব মাত্রেরই কাহারও নিদ্রা নাই, না মনের নিদ্রা আছে না দেহের নিদ্রা আছে। দেহেরও নিদ্রাবস্থায় দেহ মধ্যস্থিত যন্ত্র সকলেরও বিশ্রাম ভাব থাকে না সুতরাং দেহেরও নিদ্রা নাই।

নিদ্রা দুই প্রকার হইয়া থাকে—মোহ নিদ্রা এবং যোগ নিদ্রা। জীব মাত্রেই মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মোহনিদ্রার ফল স্বরূপ, স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি—এই তিনটি দ্বার জীব আমি আমার বোধরূপ ফলে আসক্ত হইয়া আজীবন স্বপ্নস্বরূপ মনের কল্পিত জগতের যাবতীয় বিষয়ে আসক্ত হইয়া মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া বার বার সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। যোগনিদ্রাই প্রকৃত নিদ্রা পদবাচ্য, কারণ এই যোগনিদ্রার অবস্থাতে জীবের মনের বিশ্রাম লাভ হইয়া থাকে। যে অবস্থায় আমি আমার বোধ থাকে না অর্থাৎ আমার বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থার অতীতাবস্থার সহিত নিমিলিত ভাব অবস্থান করার নামই যোগনিদ্রা পদবাচ্য। এই যোগনিদ্রার অবস্থাই জীবের বিশ্রাম বা মুক্তাবস্থা। এই এবস্থায় থাকিয়া যিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় সমস্ত করিয়া থাকেন তিনি শিবস্বরূপ মুক্ত পুরুষ।

আমার নিদ্রাকালীন কে যেন এইসকল কথা আমাকে বলিতেছিলেন। এই সকল কথা বলা শেষ হইয়া যাইলে পর, আমি যেন তথা হইতে আমার বালস্বভাব বশতঃ আমাদের বাড়ীর নীচে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি খোকাখুকী খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিতেছে। সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে খেলাঘর পাতিয়া আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী সাংসারিক ভাবের খেলা করিতেছে; কেহ বা খেলাঘরের বৌ হইয়াছে, কেহ গিন্নি হইয়া খেলাঘরের মাটির খেলার বাসনে আপন আপন ইচ্ছামত খোকাখুকীতে মিলিয়া সাংসারিক কার্য্যের ন্যায় কেহ বা খেলাঘরের তরকারী কুটিতেছে, কেহ বা কাঁকরের চাউল করিয়া তাহাকেই জলে সিদ্ধ করিয়া ভাত রান্না করিতেছে, কেহ বা ছোট ছোট খোকাকে আপন পুত্রবোধে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে স্তন পান করাইতেছে। কেহ বা মাটির পুত্তলিকাকে (পুতুলকেই) পুত্রবোধে নানা রকম আদর যত্ন করিতেছে। খোকারা সব জিনিযপত্র যাহা খেলা ঘরের দরকার, সে সমস্ত আনিয়া দিতেছে। খেলা ঘরের গিন্নিরা এবং খেলাঘরের বধূরা সেই সকল জিনিষ পত্র আপন আপন খেলাঘরের যথাস্থানে, যেখানে যে জিনিষ রাখিলে ভাল হয় ও ভাল দেখায় সেই সেই স্থানে সব গুছাইয়া রাখিতেছে। আবার কোন কোন খেলাঘরের জিনিষপত্র কম বা বেশী, আনয়ন করার দরুণ খোকারূপী ও খুকীরূপী কর্তাগিন্নিতে বচসাও হইতেছে। বচসা শেষ হইলেই খুকীরূপী গিন্নি অমনি অভিমান ভরে খেলাঘরের ভিতর কাহার সহিত কথা না বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকিতেছে। খুকীরূপী গিন্নিকে অভিমান ভরে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, খোকারূপী কর্তা যিনি, তিনি খুকীরূপ গিন্নির মান ভঞ্জন জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আবার কোন কোন খেলাঘরের খুকীতে খুকীতেও নানা রকম কল্পিত বচসা করিতেছে। কোন খেলাঘরের শ্বাশুড়ী বধূতে ও মায়ে ঝিয়ে নানা রকম বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। মা কন্যারূপী খুকীকে ও খোকাকে শাসন

করিতেছে, কোথাও বা দু'এক ঘা চড়্টা চাপড়্টাও বসাইয়া দিতেছে। যাহারা চড় চাপড় খাইতেছে তাহারাও যেন রোদনের ছল করিয়া এ্যাঁ, এ্যাঁ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিতেছে।

আবার কোন কোন খেলাঘরের খোকা খুকীরা খেলাঘরের তৈয়ারী মাটির কাঁকরের ভাত তরকারী যেন খাইতে বসিয়াছে। সকলেই আপন আপন মাটির থালের কল্পিত ভাত তরকারী মুখে দিয়া কল্পিত ভাবে খাইবার মতন করিয়া মুখ নাড়িতেছে, ইত্যাদি নানা ভাবের ভাল মন্দ সব রকমই খেলা হইতেছে। আবার কোন খেলা ঘরের খুকী অপর খেলা ঘরের খোকা খুকীদের সহিত নিজের খোকা খুকীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া উৎসাহের সহিত ধুমধাম করিয়া নানা রকম বাদ্য রোস্‌নাই আলো ইত্যাদি করিয়া বিবাহ দিতেছে এবং নানা রকম মাটির সন্দেশ ইত্যাদির তত্ত্ব তাবাস পরস্পরের খেলা ঘরে পাঠাইতেছে এবং পরস্পরে যেন আনন্দে মাতিয়া গিয়াছে। কোথাও বা দু'চার জন খোকা ডাক্তার বা কবিরাজ হইয়া খেলাঘরের খোকাখুকীদের অসুখ হওয়ায় নাড়ী দেখিতেছে। যাঁহারা কবিরাজ হইয়াছেন, তাঁহারা খুকীদের হাত দেখিয়া মাটির বড়ি আদার রস মধু দিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। শেষে বড়ি খাইয়া কেহ বা অস্থির হইয়া কোন গতিকে পেটের জ্বালা নিবারণ করিতেছে। আর যে যে খোকারা ডাক্তার হইয়াছেন তাঁহারা নাড়ী দেখিতে জানেন না। বগলে একটা কাঁচের নল দিয়া বলিলেন একশত চার জ্বর, অমনি কাগজে কি একটা লিখিয়া দিলেন। একজন খোকা খেলাঘরের ডাক্তারখানা হইতে রং করা খানিকটা জল শিশিতে করিয়া খেলাঘরের রোগীকে খাওয়াইয়া দিল। খেলাঘরের রোগী তাহা মুখে দিয়া না গিলিতে পারে, না ফেলিতে পারে বিষম কটু তিক্ত রস থাকায় তাহা গলাধঃকরণ করিতে না পারায় ওয়াক্ করিয়া বমি করার ন্যায় মুখের বাহিরে ফেলিয়া দিল। খেলাঘরের ডাক্তার তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ঐ ঔষধ পেটে রহিল না, এবার আমি মনের মতন ঔষধ দিতেছি, আমি তোমাদের খেলাঘরের পুষ্করিণীতে ঔষধ দিয়া যাইতেছি সেই জল আধ ছটাক করিয়া তিন চার ঘন্টা অন্তর খাইতে দিও; ইহা বলিয়া তিনি একটি শিশি বাহির করিয়া, খেলাঘরের পুষ্করিণীতে শিশিস্থিত চার পাঁচ ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া দিয়া তাহার পর খেলাঘরের, খোলা ভাঙ্গা মাটির টাকা ভিজিট্ লইয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার বা কবিরাজ বাটীর বাহির হইতে না হইতে কোন কোন খেলাঘর হইতে কান্নার রোল উঠিল, কাহার বা পুত্তলি মাটির বা কাষ্ঠের খোকা মরিয়াছে বলিয়া। আহা আমার বাছা কোথায় গেলি রে, বাছার আমার একি হলো গো বলিয়া খুকীরা মহা কান্নার রোল তুলিয়া দিল। আবার কোন খেলাঘরের কর্তা ভবলীলা শেষ

হওয়া দেখিয়া, খেলাঘরের যিনি গিন্নি সাজিয়াছেন তিনি, ওগো আমার কি করে গেলে গো, ওগো আমার এই সংসার কে চালাবে গো, আমাকে কে দেখবে গো ইত্যাদি রকম ভাবে খেলাঘরের গিন্নিরা ক্রন্দন জুড়িয়া দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া অপর খেলাঘরের খোকাখুকীরা ইহাদের খেলাঘরে আসিয়া নানা রকম প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কেহ বা বলিলেন আর বাছা কাঁদিয়া কি হইবে, এখন শোক করা বা ক্রন্দন করাতে নিজেরই শরীর নষ্ট হইবে। কেহ বলিতে লাগিলেন, আহা বাছার কোলের খোকা গো, না কাঁদিয়া কি থাকিতে পারা যায় মা, পুত্র শোক কি সহ্য করা যায় গা। তাহার মধ্যে একজন পাকা রকমের খেলাঘরের খুকী বলিলেন, সহ্য সকলেই করিয়া থাকে, তবে কেহ বা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সহ্য করে, আবার হয়ত কেহ বা গুম্‌রে গুম্‌রে ভিতরে ভিতরে শোক রাখিয়া বাহিরে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া থাকে। তবে বাছা সময়ে সবই ভুলিতে হইবে, খেলাঘরের উপর মা থাকিতে, শোক তাপ সব লোকেই বরদাস্ত করিয়া থাকে। মনে ভাবে পাছে আমার সাধের খেলাঘর ভাঙ্গিয়া যায়। এখন ভগবান যাহা করিয়াছেন তাহা ভাল মনে করিয়া, অপর খোকাদের কোলে করিয়া বস। ইহা বলিয়া উক্ত পাকা খুকী একটি পুতুলের খোকাকে যে খুকী কাঁদিতেছিল, তাহার কোলে বসাইয়া দিল। তাহাতে খুকী যেন কতকটা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল মা আমিও অনেক সময় অপরের এইরূপ দুর্ঘটনা হইলে নানা রকম বুঝাইয়া থাকি, মা নিজের বেলায় গালে মুখে বক্ষস্থলে চপেটাঘাত করিয়া ধরা লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে হইতেছে। কেন কাঁদিতেছি, কাহার জন্য কাঁদিতেছি· তাহা কিছুই বুঝি না। যাহা হউক মা তোমার কল্যাণে আমি এই খোকাকে কোলে করিয়া যেন আশ্বস্ত হইলাম এবং যেন মনে কতকটা বল পাইলাম।

আমি এইরূপ স্বপ্নে নানা রকম দেখিতেছি। তবে আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা আমার বোধ হইতেছে না বরং আমার এই নিদ্রাবস্থায় ইহা সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা যে স্বপ্ন এবং ইহা যে মনের কল্পিত সমস্ত বিষয় তাহা আমার এই নিদ্রাবস্থায় বোধ করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা হউক আমি খোকাখুকীদের খেলাঘরের নানা রকম খেলা দেখিয়া আমারও খেলা করার ইচ্ছা হওয়ায় আমিও যেন তাহাদের অনুরূপ খেলা করিতে লাগিলাম। অপর খোকাখুকীরা যেরূপ খেলাতে মগ্ন হইয়া খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিতেছিল আমিও তদনুরূপ খেলাঘর পাতিয়া কয়েকটি খুকীদের সহিত খেলাঘরের খেলাতে তন্ময় হইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমার হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম আমার মা পার্শ্বেই শয়ন করিয়া আছেন, বাবা ঘরের এক পার্শ্বে মেঝেতে আসন পাতিয়া জপ করিতেছেন। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাবার পর আমি বাবাকে জপ করিতে এবং মা'কে আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি শয্যা হইতে না উঠিয়া চক্ষু বুজিয়া মনে মনে আমার নিদ্রা কালীন স্বপ্নের সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে

লাগিলাম। এমন সময় আমাদের ঘরের ঘড়িতে টং টং টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। আমি তাহা শুনিয়া আর রাত্র নাই এবং অদ্য ভোরে না উঠিলে বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস হইবে না ইহা ভাবিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া ভগবানকে, আমার পূর্ব অভ্যাস মত প্রণাম করিলাম। প্রণাম করা শেষ হইলে দেখিলাম মা উঠিয়া বসিয়াছেন। আমি মা'কে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া, মা'কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, শয্যার নীচে ঘরের মেজেতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিলাম। বাবাকে প্রণাম করার পরই বাবা আসন হইতে উঠিয়া ঘরের ভিতর অপর একটা আসনে আসিয়া খানিক বসিলেন। আমি এই সময়ে বাবাকে বলিলাম,—বাবা আমি গত রাত্রে নিদ্রাকালীন একটা খুব বড় স্বপ্ন দেখিয়াছি এবং তাহা এখন আমার সবই প্রায় মনে আছে, তাহা আপনাকে ও আমার মা'কে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহা বলায় বাবা আমাকে বলিলেন,—তবে তুমি তোমার কথা বল আমরা বসিয়া তাহা শ্রবণ করি। ইহা বলাতে আমার মা'ও তথায় বসিলেন; আমিও রাত্রের স্বপ্ন বিষয়ের সমস্ত ঘটনা বাবাকে আনুপূর্বিক যাহা যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম তৎসমুদয় বলিয়া শেষ করিলাম।

বাবা আমার স্বপ্ন বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—বাবা খোকা, আমি তোমাকে তোমার স্বপ্নের প্রকৃত ভাব বুঝাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর। তাহার পর বলিলেন,—দেখ খোকা প্রথমতঃ তুমি নিদ্রায় অভিভূত হইলে স্বপ্নে তোমার মনে যে সকল বিষয়ের চিন্তা হইয়াছিল, অর্থাৎ নিদ্রা কাহার ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা যাহা হইয়াছিল এবং যে সকল বিষয় ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য জানিবে কারণ দেহের বা মনের বিশ্রামের অভাব হেতু মনের বা দেহের নিদ্রা হইয়াছিল তাহা বলা ঠিক নহে। দেহের বাহ্য ভাবের মূর্চ্ছায় পড়িয়া থাকাকেও নিদ্রা বলা যায় না, কারণ দেহের মূর্চ্ছা ভাব অবস্থায় দেহস্থিত যন্ত্র সকলের কার্য্য বন্ধ থাকে না। দেহের কার্য্য সকল বন্ধ না থাকা হেতু দেহেরও বিশ্রাম হয় না, সুতরাং দেহের বিশ্রাম না থাকায় দেহের নিদ্রা হইয়াছিল বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে, বরং তাহা বলা অনুচিত। সাধারণে যাহাকে নিদ্রা বলিয়া থাকেন, উহা মেধ্যা নাড়ীতে প্রাণের কথঞ্চিৎ গতি হইয়া দেহের বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ্যাদির (হস্ত পদাদির) গভীর আলস্য ভাবকে নিদ্রা কহিয়া থাকে। ইহাকে প্রকৃত নিদ্রা বলা যায় না। স্বপ্ন রহিত অবস্থাই প্রকৃত নিদ্রা পদবাচ্য, এ নিদ্রা জীবের হয় না; তোমার মনের চিন্তার দ্বারায় তোমার সৌভাগ্য বশতঃ যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য জানিয়া স্মরণ পথে রাখিবে।

দ্বিতীয়তঃ তুমি যাহা খেলাঘরের স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহার মধ্যেও তোমার শিক্ষার উপযোগী উপদেশ রহিয়াছে। তবে জীব সকল মোহ নিদ্রাবশে তাহা দেখিয়াও দেখে

না, বরং স্বপ্ন বলিয়া তাহা তাচ্ছল্য করিয়া মোহবশতঃ আজীবন ঐরূপ খেলা করায় পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে। বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থা যাহার ছিল না তাহার উপস্থিতিই ভবঘোর (মধ্য অবস্থা হওয়ায় তাহার ধাঁধাঁরূপ ঘোরই ভবঘোর পদবাচ্য)। এই ভবঘোরের ফলস্বরূপ মোহরূপ নিদ্রা বা মোহরূপ স্বপ্ন। জীবের এই মোহরূপ স্বপ্নে আমি আমার বোধ থাকিতে, অর্থাৎ আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা, আমি জ্ঞানী, আমি সাধু, আমি পন্ডিত ইত্যাদি বর্ত্তমানে জ্ঞান থাকিতে জীবের এই মোহরূপ স্বপ্নের তিরোভাব হয় না জানিবে। স্থির প্রাণ স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান নারায়ণের একাংশে এই জগৎ জানিবে। এই একাংশই ব্যক্ত ভাব, অপর তৃতীয়াংশ অব্যক্ত ভাব। পৃথিবীতেও দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর একাংশ স্থল ভাগ এবং তৃতীয়াংশ প্রায় জল ভাগ এবং শূন্য স্বরূপ অব্যক্ত ভাব ইহা অনন্তভাবে সর্বত্রে রহিয়াছে। পৃথিবীর জলভাগে অনন্ত নানা জাতীয় জীব বসবাস করিতেছে। স্থলভাগ অপেক্ষায় জলভাগে জলচর জীবের সংখ্যার দ্বারায় নিরুপণ হয় না বলিয়া অনন্ত বলিতেছি; জলেতে যাহারা সর্বদা বিচরণ করে তাহাদিগকে জলচর কহা যায়। জলস্থিত জলচর জীবেরাও আপন আপন জাতীয় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মোহ নিদ্রায় আছন্ন হইয়া বংশ বৃদ্ধির সহিত নানা রকম আপন আপন জাতীয় ভাবের খেলা স্বপ্নের ন্যায় খেলিয়া বেড়াইতেছে। স্থল ভাগের নিম্নস্থ কীট পশু হইতে নর পর্যন্ত সকলেই মোহরূপ স্বপ্নে আচ্ছন্ন হইয়া আপন আপন জাতীয় ভাবের বশবর্তী হইয়া আপন আপন খেলাঘররূপ বাসা স্থাপন করিয়া স্বপ্নবৎ আসক্তির সহিত নানা ভাবে খেলা করিয়া স্থল ভাগে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা স্থল ভাগে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে স্থলচর কহা যায়। ইহারা দিবাভাগে যে সব খেলারূপ কার্য্য করিয়া থাকে তাহা যে স্বপ্ন তাহা কেহই বোধ করে না। যেমন রাত্রে, তুমি যখন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিলে সেই সময় তোমার যেমত স্বপ্ন দেখিতেছি ইহা তৎকালীন বোধ ছিল না, এক্ষণে তোমার যেমত নিদ্রা কাটিয়া যাওয়ায় দিবার প্রকাশে তোমার রাত্রের নিদ্রাকালীন ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তদ্রূপ দিবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্যের প্রকাশে দিবার যে ঘটনাবলী, তাহা স্বপ্ন হইলেও তাহাকে মোহ নিদ্রার ঘোরে অর্থাৎ বর্তমান কর্মের মধ্য অবস্থার ধাঁধাঁর ঘোরে পড়িয়া তোমার মন স্বপ্ন বলিয়া বোধ না করিয়া ইহা তোমার জাগ্রতাবস্থা বলিয়া মন উহা মানিয়া লইতেছে। একারণ তুমি বলিতেছ রাত্রের নিদ্রাকালীন যাহা দেখিয়াছ তাহা স্বপ্ন, আর নিদ্রা ভঙ্গের পর অবস্থাকে বলিতেছ জাগ্রতাবস্থা; তোমার যে উভয় অবস্থাই স্বপ্নবৎ তাহা তুমি প্রণিধান করিতে পারিতেছ না। তদ্রূপ সমস্ত মানবেরা দিবাভাগের ঘটনাকেও স্বপ্ন বলিয়া বোধ করিতে পারে

না। যাহা হউক, ইহা তোমার বর্তমানে বোধ হওয়াও অসম্ভব, কারণ, তোমার প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থার দ্বারায় তোমার এই ভ্রমরূপ স্বপ্ন উদয় হইতেছে, ইহা বর্তমান থাকিতে তোমার স্বপ্নদর্শন তিরোহিত হওয়া অসম্ভব।

তবে এই প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থা যে কাহারও তিরোহিত ভাব জীবন থাকিতে হয় তাহা নহে। বহু পূর্বে বলিয়াছি, প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থার আদি ও অন্তে তোমার স্থিরপ্রাণরূপ পরমাত্মা রহিয়াছেন, ইহাই জীবের জীবন স্বরূপ স্থির প্রাণরূপ আদিত্য (আদিত্য সূর্য্যকে কহা যায়)। ইহার প্রতি জীবের তন্ময় ভাবের অভাব, এমন কি লক্ষ্য মাত্র কাহারও নাই। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থারূপ মধ্যাবস্থার আদি অন্তে যখন তোমার লক্ষ্য পড়িয়া ক্রমশঃ যখন সেইভাবে তোমার তন্ময় ভাব আসিবে, তখন তোমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অস্তিত্ব থাকিতেও তোমার স্বপ্ন রহিত অবস্থা আপনিই প্রকাশ পাইবে। কারণ, তোমার লক্ষ্য আদি-অন্তে থাকায় স্বতঃই তোমার নিকট মধ্যাবস্থার উপর লক্ষ্যভাব না থাকাতে তোমার নিকট মধ্যাবস্থা থাকিয়াও না থাকার ন্যায় হইয়া যাইবে এবং মধ্যাবস্থার স্বভাবতঃ ধীর গতিও হইয়া যাইবে অর্থাৎ তত্ত্বে তত্ত্বে চলিবে, সাধারণভাবে চলিবে না। তত্ত্বে তত্ত্বে চলার দরুণ মনের বিক্ষিপ্তভাব বিদূরিত হইয়া আপনাতে আপনি মগ্নভাব আসিয়া স্বপ্নরহিত অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাকেই যোগ নিদ্রার অবস্থা কহা যায়। এই অবস্থায় থাকিয়া যিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় সমস্ত কার্য্য যাহা যখন আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই করিয়া থাকেন। এমত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই মনুষ্য পদবাচ্য; এইরূপ মনুষ্য কোটী কোটী নরের মধ্য দু'একজনকে দেখিতে পাওয়া যায়। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। নার জাতির মধ্যে স্বপ্নরাহিত অবস্থা প্রাপ্তির লালসা প্রায়শঃ কমই দেখিতে পাওয়া যায়। চেষ্টা সাধ্যমত করিলে সকলেই মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারেন। দুঃখের বিষয়, মোহবশতঃ স্বর্গাদি ফলকামনায় আসক্ত হইয়া মনুষ্যত্ব হীন হইয়া দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াও তাহার অপব্যবহার করিয়া থাকে। স্থলচর জীবের মধ্যে নরজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ। দুঃখের বিষয় আপনাকে আপনি না জানায় আত্মজ্ঞান অভাবে মনুষ্যত্ব হীন হইয়া মনুষ্য পদবাচ্য না হইয়া জ্ঞানিগণের নিকট নরপশু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে।

তুমি যাহা খেলাঘরের স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাদের এই বাড়ী ও সংসার সমস্তই তোমার স্বপ্নের খেলাঘরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এবং অস্থায়ী। অদ্য আছে কাল নাও থাকিতে পারে, ইহাও স্বপ্নের খেলাঘর। তবে তুমি যাহা রাত্রে খেলা ঘরের স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, ইহা তাহা অপেক্ষা বৃহৎ আকারের খেলাঘর মাত্র, পার্থক্য উভয়ে কিছুই নাই, কেবল ছোট বড়র পার্থক্য মাত্র। এই স্বপ্নবৎ খেলাঘরের খেলা ও

সকলকেই খেলিতে হইবে। মনে করিলেই বা ইচ্ছা করিলেই, এ খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কাহারও শক্তি নাই। ইচ্ছার সহিত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও অবশভাবেও এই খেলাঘরের খেলা তোমার প্রকৃতি কর্তৃক অর্থাৎ তোমার বর্তমান প্রাণকর্মের অবস্থার কার্য্য দ্বারায় তোমাকে নিশ্চয়ই অবশভাবে খেলাঘরের খেলা করাইবে। যদি বল আমি এই খেলাঘরের মাতা, পিতা, পিসিমাতা, ভাই বন্ধুর সহিত খেলাঘরের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রে গিয়া একা থাকিব তাহা হইলে তো আমার খেলাঘরের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করারূপ খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তদুত্তরে আমি বলিতেছি, তাহাতেও তোমার খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল না। কারণ তোমার বর্তমান খেলাঘর ভগ্ন হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিয়া যথায় যাইবে তথায় তোমাকে আবার নূতন করিয়া খেলাঘর পাতিতে হইবে। তাহাও যে তোমার স্বপ্নে পরিণত হইবে, তাহা তোমার অপরিণাম দর্শিতার ফলে বুঝিতে অক্ষম হইবে এবং তোমার এই অপরিণাম দর্শিতার ফলে মিথ্যাচারী ও কপটাচারী হইয়া আজীবন স্বপ্নের উপর স্বপ্ন দেখিতে থাকিবে। স্বপ্ন রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে না; স্বপ্নরহিত অবস্থা লাভ ব্যতীত জীবের কোন রকম স্থায়ী পবিত্র সুখলাভ হয় না। যাঁহারা বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তি তাঁহারা কাহাকেও বর্তমানের স্বপ্নস্বরূপ খেলাঘরও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন না, এবং তাঁহারা নিজের খেলাঘর পরিত্যাগ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কোথাও যান না। কারণ বর্তমান মনের স্বপ্নরহিত অবস্থালাভ না হইলে, খেলাঘর পরিত্যাগ বা খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলার দরুণ কাহারও স্বপ্নরহিত অবস্থালাভ হয় না। স্বপ্নাবস্থার কারণ খেলাঘররূপ সংসার নহে ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

সুপ্রকৃতির সাম্যাবস্থার অন্যথা ভাব হেতু স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। স্বপ্রকৃতি, স্ব = অর্থে আত্মা বা আপনি, প্রাণকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। প্রকৃতি, প্র = প্রথম, কৃ = করা অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ আত্মায় প্রথম। প্রাণের গতিরূপ ক্রিয়া করার আরম্ভ মুখ অবস্থাই স্বপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রাণের স্বতঃ নাসাভ্যন্তরচারি অবস্থাকেই স্বপ্রকৃতি কহা যায়। ইহা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, ইহার অন্যথা ভাবই প্রকৃতির বা প্রাণের বিকার ভাব কহা যায়, অর্থাৎ প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থায় নাসাভ্যন্তর হইতে নিম্নে যত বিস্তার ভাব বেশী হইবে সেই সেই পরিমাণে প্রকৃতির বিকার ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থারূপ প্রকৃতির বিকার ভাব হইতে স্বপ্নের উৎপত্তি, জীব সমূহ আপনাতে আপনি না থাকায় স্বপ্ন রহস্য বুঝিতে অক্ষম। আপনাতে আপনি না থাকায় স্বপ্নকে সত্য বোধে, স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করিয়া নানা প্রকার জ্বালার উপর জ্বালা, রোগ, শোক, অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। কেন যে এরূপ হইতেছে,

ইহার প্রকৃত কারণ জীব সমূহ অবগত নহে। জীব সমূহের আপন আপন প্রাণ কর্ম্মের মধ্যাবস্থায় বিকাররূপ গতি বিস্তার থাকিতে জীবের স্বপ্ন বা রোগ, শোক, অভাব, অশান্তি যাইবার নহে; জীব স্বপ্রকৃতির বিকার অবস্থারূপ অন্যথা ভাব স্বতঃরহিত করিয়া অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর রোধ না করিয়া বিনা অবরোধে কৌশলে (গুরুপদেশগম্য উপায়ে) প্রাণ বায়ুর সাম্যাবস্থা বা ইহার (প্রাণ বায়ুর) নাসাভ্যন্তারচারী অবস্থা করিতে পারিলে ক্রমশঃ স্বপ্ন রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে।

তোমাকে এই দুই প্রকার জীবের কথা বলিলাম ইহা ব্যতীত অপর দুই প্রকার জীবের কথা বলিব। জলচর ও স্থলচর জীবের কথা আমি সংক্ষেপতঃ শেষ করিলাম। এই জলচর ও স্থলচরের মধ্যে উভচর বলিয়া একপ্রকার জীব আছে ইহারা স্থলেও বিচরণ করিয়া থাকে, এবং অধিকাংশ সময় জলেও বিচরণ করিয়া থাকে। একারণ ইহাদিগকে লোকে উভচর কহিয়া থাকে; ইহারাও মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকায় ইহাদিগকেও স্বপ্নশীল বলিয়া জানিবে। ইহা ব্যতীত অপর এক প্রকার জীব দেখা যায় তাহাদিগকে খেচর বলিয়া লোকে কহিয়া থাকে। ইহারা আকাশগামী বলিয়া অর্থাৎ আকাশে অধিকাংশ সময় বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে খেচর কহা যায়, যেমন পক্ষী ইহারাও স্বপ্নশীল, মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন জানিবে। তোমাকে এই চারি প্রকার জীবের কথা বলিলাম। এই চারি প্রকার জীবের মধ্যে প্রায় অনন্ত জাতীয় জীব নানা রূপে নানা গুণে নানা আকারে রহিয়াছে। বস্তুতঃ নানা আকার ও নানা রূপ থাকিলেও যাহা জীব শব্দবাচ্য তাহার পৃথকত্ব ভাব নাই। প্রতি ঘটে ঘটে অর্থাৎ প্রত্যেক শরীররূপ ঘটে সমান সমান রূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার পৃথক আকার নাই, চঞ্চল প্রাণই জীব শব্দবাচ্য। ইঁহাকে জীবাত্মা কহা যায়। প্রাণের সাম্যাবস্থার নাম শিবভাব। প্রাণ কর্ম্মের মধ্য অবস্থাই জীবাত্মা পদবাচ্য এবং ইহাকে প্রকৃতি বলা যায়, প্রকৃতি অর্থে জীবাত্মাকেও বুঝায়। প্রাণ কর্ম্মের নাসারন্ধ্রের বহির্ভাগে গতি বিস্তার হইয়া জীবভাব ঘটিয়া থাকে, এই জীবভাবের অবস্থায় জীব মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া মোহ কর্ত্তৃক (মোহের উৎপত্তি স্থানও জীবভাবের উৎপত্তি স্থান হইতে) মোহনিদ্রার ঘোরে (নেশায়) ভেদ বুদ্ধির দ্বারায় পরস্পর পরস্পরকে পৃথক আকারে ও পৃথকরূপে স্বপ্নবৎ দর্শন করিয়া থাকে। জীবভাবে জীবভাব কর্ত্তৃক স্বভাবতঃ ভেদ বুদ্ধি থাকায় পরস্পর পরস্পরকে আপনা হইতে পৃথক জাতিবোধে, ভেদবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন ভাব কর্ত্তৃক নিজ স্বার্থরক্ষার্থে পরস্পর পরস্পরে আপনাকে আপনি না জানিয়া পরস্পরের হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি করিয়া নিজের স্বার্থরক্ষায় যত্নপর হইয়া থাকে।

জীবের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যাহা কিছু হইয়া থাকে তৎসমুদায়ই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অন্যথা ভাব হইতে জাত হইয়া স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অথচ ইহা যে স্বপ্ন তাহা জীবভাবে বোধগম্য নহে; ইহা ভগবানের অনিচ্ছার ইচ্ছায় আত্মবিস্মৃতি ভাবে এই লীলা অনন্ত কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল ইহা চলিবে। আপনাকে আপনি না জানা পর্য্যন্ত জীবের কামনা পূর্ণ হয় না। কামনা থাকিতেও স্বপ্নরহিত অবস্থা কাহারও লাভ হয় না। আপনাকে আপনি জানিবার জন্য আত্মকর্ম সাধন দ্বারায় স্বর্গাদি পার্থিব বিষয়ের কামনা রহিত হইয়া আপনাকে আপনি জানিবার চেষ্টা সাধ্যমত প্রাণপণে করিলে জীবনের মধ্যে একদিন আপনাকে আপনি জানিয়া আপ্তকাম হইলে জীবের সমস্ত অভাব বিদূরীত হইয়া স্বপ্ন রহিত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। স্বপ্ন রহিত অবস্থা লাভ না করিয়া যাহাদের দেহত্যাগ হয় ও স্বপ্ন বিদূরিত হয় না, তাহারা দেহত্যাগ কালীন যে যে রকম স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাকে তাহার স্বপ্নানুযায়ী তদনুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া খেলাঘর পাতিয়া আবার খেলাঘররূপ সংসারে নানারূপ খেলা খেলিতে হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে স্বপ্ন রহিত অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ খেলাঘররূপ সংসার যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে যদি বল, পূর্বোক্ত প্রকারে আপনাকে আপনি জানিবার জন্য আত্ম কর্মের (প্রাণকর্মের) প্রারম্ভের বিফলতা নাই। এই আত্মকর্মরূপ প্রাণকর্ম একমাত্র নিষ্কাম কর্ম। ইহা আমি করিব, করিব না, ইহার ধার ধারে না। ইহা স্বতঃই আপনা আপনি হইয়া থাকে, অপর ইন্দ্রিয়গণের কৃত বা মনের দ্বারায় কৃত যে সমুদয় কর্ম আমরা করিয়া থাকি, তৎসমুয়ই কামনা প্রসূত। এক আত্মকর্ম বা প্রাণকর্ম ব্যতীত অপর সমুদয় কর্ম কামনা ব্যতীত হয় না। আত্মকর্ম বা প্রাণকর্মের কোন কামনা না থাকায় তাহার সহিত আমি যদি রমণ করি বা তাহাতে থাকি তাহা হইলে আমিও নিষ্কাম হইয়া যাইব। যেমত অঙ্গার অগ্নির সহবাসে থাকিতে থাকিতে একদিন নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হইব নিশ্চিত। আর এই প্রাণকর্মরূপ আত্মকর্মের অল্পমাত্রও অভ্যাসে জীব মাত্রেরই যে মহৎ ভয় রহিয়াছে তাহা হইতে এই প্রাণস্বরূপ আত্মাই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। (গীতা ২য় অঃ ৪০ শ্লোক দেখিও)।

জীবের ভয়ের মূলীভূত কারণ মৃত্যু। জীবের যে মৃত্যু নাই তাহা জীব জ্ঞাত নহে। জীব দেহত্যাগকেই মৃত্যু কহিয়া থাকে। দেহের নাশে যে প্রাণস্বরূপ জীবাত্মার নাশ হয় না তাহা জীবভাবে জীব অবগত নহে। যেমত জলবিম্বের নাশে জলের নাশ সম্ভবে না তদ্রূপ দেহের নাশে, প্রাণস্বরূপ জীবাত্মার নাশ সম্ভবপর হইতে পারে না জানিবে। জীবের দেহ ত্যাগের পূর্বে জীবভাবে সৎ অসৎ যে সকল

কর্ম জীব করিয়া থাকে, সেই সকল কর্মের ফল জীবের বর্তমান অবস্থায় স্বপ্নরহিত অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়ায় বা স্বপ্নরহিত অবস্থার প্রাপ্তির জন্য আত্ম সংস্কার না হইলে জীব আপন আপন কৃতকর্ম জনিত সৎ অসৎ যোনিতে গমন করিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যাহাদের স্বপ্নরহিত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য স্থিরপ্রাণ স্বরূপ আত্মসংস্কার লাভ হইয়াছে অথচ স্বপ্নরহিত অবস্থা লাভ হয় নাই বা স্বপ্নরহিত অবস্থারূপ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীত অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই। এমত অবস্থায় সাধকের দেহত্যাগ হইলে সাধক আত্মসংস্কার হেতু নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ না করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া আত্মকর্মকারীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পূর্ব দেহ জাত আত্মসংস্কারই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকে। তিনি দেহাদিতে আমি আমার বোধ নাই যে অবস্থা ঐ স্বপ্নরহিত অবস্থাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পুনরায় প্রাণকর্মরূপ আত্মকর্মের অভ্যাস দ্বারায় বেদোক্ত কাম্য কর্ম সকলকে অতিক্রম করিয়া নিজ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থারূপ পরমব্রহ্মে যুক্তভাবে স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। ইহাই গীতোক্ত ভগবৎ বাক্যের তাৎপর্য্য; ইহা আপ্তবাক্য মনে করিয়া, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মকর্মরূপ প্রাণকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া চলিলে নিশ্চয়ই একদিন আত্মলীলারূপ স্বপ্ন রহস্য নিজবোধ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে নচেৎ নহে। মরীচিকা যেমত মরুভূমির ফলস্বরূপ, তদ্রূপ প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার ফল স্বরূপ মরীচিকা বৎ স্বপ্নময় জগৎ।

বাবা খোকা তুমি রাত্রে নিদ্রাকালীন যে সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়া থাক, তাহাতে তোমার নিদ্রা ভঙ্গের পর যেমত তুমি সেই সকল স্বপ্নে আসক্ত হও না বরং স্বপ্ন বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাক, তদ্রূপ বর্তমান জগতের যাবতীয় পদার্থকে স্বপ্নবোধে তাহাতে আসক্ত না হইয়া, কর্তব্য কর্ম সকল করিয়া চলিবে এবং যে অবস্থা হইতে স্বপ্নের উৎপত্তি হইতেছে সেই অবস্থার পরপারে অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। স্বপ্নস্বরূপ খেলাঘররূপ সংসারে থাকিয়া কদাচ কাহার কথায় এই খেলাঘররূপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অন্যত্রে যাইও না বা করিও না; কারণ আত্ম তত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণ তাঁহারা খেলাঘররূপ সংসার স্বপ্ন হইলেও ইহা পরিত্যাগ করেন না বা খেলাঘররূপ স্বপ্নের সংসারে প্রবল তুফান দেখিয়াও ভীত হন না। ভীত না হইবার কারণ, যেমত, যাঁহারা বিশেষ সন্তরণ পটু তাঁহারা নদীর বা সমুদ্রের তুফান দেখিয়া ভীত হন না। বরং সন্তরণ (সাঁতার) রূপ কৌশল দ্বারায় আনন্দের সহিত খেলা করা ভাবের মতন আপন শরীররূপ তরণীকে নদীর স্রোতে গা ভাসান দিয়া অনায়াসে বিচরণ করিতে করিতে নদীর পরপারে যাইতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কিন্তু সন্তরণ হীন ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে বরং সন্তরর হীন ব্যক্তি গভীর জল বা

জলের তুফান দেখিলেই ভীত হন। তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণ স্বপ্নবৎ ভাবসমুদ্ররূপ সংসারের বাহ্যভাব দর্শনে তাঁহাদের ঐ সন্তরণ স্বরূপ যোগ কৌশল জানা থাকায় তাঁহাদের পক্ষে সংসার ভীষণস্থল না হইয়া, খেলাঘররূপ স্বপ্নবৎ সংসার আনন্দ কাননে পরিণত হইয়া থাকে। একারণ তাঁহারা স্বপ্নবৎ খেলাঘর ছাড়িতেও চাহেন না এবং কাহাকেও ইহা ত্যাগ করিবার পরামর্শও দেন না। যাহারা নিজ ইচ্ছায় বা অপরের প্ররোচনায় এই স্বপ্নবৎ খেলাঘররূপ সংসারকে এবং খেলাঘরস্থ আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তাহারা আজীবন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যাচারী হইয়া স্বপ্নের উপর স্বপ্ন দেখিয়া ইহকাল পরকাল সবই নষ্ট করিয়া থাকেন। এ কারণ বাবা খোকা, তুমি পরের কথায় বা নিজের মন্দ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া নিজের অনিষ্ট নিজে কদাচ করিও না। তাহা হইলে তোমাকেও মিথ্যাচারী হইতে হইবে।

এই সকল কথা বাবা বলিতেছেন এমন সময়ে মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইতিপূর্বেই জলে সন্তরণের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা বলিলেন তাহা বুঝিয়াছি। কারণ আমি বাল্যকালে পিত্রালয়ে সন্তরণ শিখিয়াছিলাম। তবে বর্তমানে অভ্যাস না থাকিলেও ভুলি নাই, তবে অনভ্যাস বশতঃ এক্ষণে অল্পেতেই হাত পা যেন জড়াইয়া যায়। নচেৎ সন্তরণ খেলা বা সাঁতার দেওয়া যে ভুলিয়া গিয়াছি তাহা নহে, সন্তরণ খেলা বা সাঁতার দেওয়া একবার শিক্ষা হইলে তাহা আর বিস্মরণ হয় না। সন্তরণের যুক্তিটি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু আপনি সন্তরণস্বরূপ যোগ কৌশল যাহা বলিলেন তাহার আমি প্রণিধান করিতে পারি নাই, অনুগ্রহ করিয়া যোগ কৌশলরূপ সন্তরণ ব্যাপারটি আমি যাহাতে প্রণিধান করিতে পারি, এমতভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিন। স্বপ্নরহস্য যাহা সংক্ষেপতঃ বলিলেন তাহা আমি সম্যক প্রণিধান করিয়াছি সত্য, তবে ধারণা না হওয়ায় এখন নিজ বোধরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মা'র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাবা বলিলেন, আমি যথা সম্ভব, যে পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেখ যোগ কৌশলটিকে ধর্মজগতের চাবি স্বরূপ মনে করিবে। এবং মানব মাত্রকেই কুলুপ বা তালা মনে করিবে। মানব দেহরূপ তালা কুলুপের যন্ত্র সকল সবই এক প্রকারের, উপরের গঠন বা আকার ভিন্ন বোধ হইলেও মানব দেহরূপ কুলুপের বা তালার যন্ত্র সকল একই প্রকার। সুতরাং ইহার চাবি যাহা রহিয়াছে, তাহাও একটি। একটি চাবিতে সকল তালা বা কুলুপই উন্মোচন করা যায় অর্থাৎ খোলা যায়। চাবির ভিন্নতা নাই আর এই চাবি একটি মাত্র। এই চাবি কোন প্রকার আকার বিশিষ্ট নহে। এবং ইহা রূপ বা গুণের অতীত ইহা একটি অবস্থা মাত্র, নিজ বোধরূপ অবস্থা বিশেষ।

জলে সন্তরণ দেওয়া বা সাঁতার দেওয়া যেমন কেহ কাহাকে সাঁতারের অবস্থা

বলিতে পারেন না ইহাও প্রায় তদ্রূপ। জলে সাঁতার শিক্ষার প্রথম একমাত্র উপায় জলে যাইয়া কাহার সাহায্যে জলের উপর উপুড় হইয়া শয়ন করার ন্যায় ভাবে থাকিয়া নিজ হস্ত পদের দ্বারায় জল টানিতে টানিতে অর্থাৎ জলে ঝাঁপাই ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ক্রমশঃ সন্তরণ বা সাঁতার শিক্ষা লোকে করিয়া থাকে। অবশ্য প্রথম অবস্থায় সাঁতার শিক্ষার সময় কিছু কষ্ট আছে তাহা অপর কষ্ট নহে। হাবুডুবু খাইতে খাইতে নাকে মুখে জল ঢুকিয়া সামান্য কষ্ট হইয়া থাকে। এই সামান্য কষ্ট হইলেও যাঁহারা সন্তরণ শিক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা এ কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। তাহার পর সম্যকরূপে সন্তরণ শিক্ষা হইয়া যাইলে, তখন সন্তরণপটু ব্যক্তিগণ জলে সন্তরণ দিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। সন্তরণ শিক্ষা স্থলের উপর বসিয়া কাহার হয় না। সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইলে জলে নামিয়া শিক্ষা করিতে হইয়া থাকে। জলে নামিব না অথচ সাঁতার শিক্ষা করিব তাহা কদাচ হইতে পারে না। সাধারণতঃ জলে সন্তরণ শিক্ষার প্রথমে কিছু নাকানি চোবানিরূপ কষ্ট থাকিলেও তাহার পরিণাম আনন্দকর। জলে হঠাৎ ডুবিয়া যাইবার ভয়ও রহিত হইয়া যায়, যাহার পরিণাম সুখকর এবং যাহার দ্বারায় পরিণামে ভয় রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই জীবগণের প্রার্থনীয় হওয়া উচিত নহে কি? আমার বিবেচনায়, জলে সন্তরণ শিক্ষা করা জীব মাত্রেই কর্ত্তব্য। তবে সাবধানে উপযুক্ত সন্তরণ পটু লোকের দ্বারায় জলে সন্তরণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ বিপদের আশঙ্কা পদে পদে হইবার সম্ভব। যিনি নিজে সন্তরণ জানেন না তিনি অপরকে সন্তরণ শিক্ষা দিতে যাইলে উভয়েরই যে বিপদ অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সাধারণ সন্তরণ শিক্ষার দ্বারায় যেমন জলে স্থূল শরীরকে ভাসান যাইতে পারে, কিন্তু মনকে ভাসান যায় না। কারণ—মন জল বা শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়। জল সাধারণতঃ জড়, সুতরাং জলের দ্বারায় মনকে ভিজান যায় না, এবং যে কোন জল হউক না কেন তাহার দ্বারায় মনকে ধৌত করাও যায় না, এবং জলের দ্বারায় মনেরও সন্তরণ তাহা মনকে শিক্ষা করাইতে হইবে। জলে জলে যেমত নিজ নিজ শরীরকে গা ভাসানরূপ সন্তরণ শিক্ষা করান হইয়া থাকে, এবং জলের সন্তরণ শিক্ষা হইলে শরীরকে যেমন জলের ভিতর ও বাহিরে যথাতথা লইয়া যাইতে পারা যায়, মনকেও তদ্রূপ ভাবে শূন্যেতে সন্তরণ শিক্ষা করাইতে হইবে। মনের শূন্যস্বরূপ ব্রাহ্মে বিচরণ করিবার জন্য, শূন্যে বিচরণ করিবার উপায়রূপ সন্তরণ শিক্ষা না হইলে মনের যে দারুণ ভয় মৃত্যু, সে ভয় হইতে মন কখন ত্রাণ পাইবে না ইহা নিশ্চিত জানিবে। যোগরূপ কৌশল দ্বারায় মনের সন্তরণ শিক্ষা হইয়া থাকে। একারণ সন্তরণস্বরূপ যোগ কৌশল পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৌশল অর্থে বিশেষ উপায় বুঝিবে।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে মালিনীর উক্তিতে লিখিত আছে, বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরি গগণের চাঁদ। ইহার সাধারণ ভাবে অর্থ করিতে হইলে যেন একটা তামাসার বিষয় বলিয়া সাধারণতঃ মনে হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা নহে। বাতাস, ইহা চলিত কথায় বায়ুকেই কহা যায়। মালিনী ভগবতী-প্রকৃতি দেবী বলিতেছেন, বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরি গগণের চাঁদ। মনে কর বাহিরে যে বাতাস বা বায়ু বহন হইতেছে তাহা ও সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাতেই বা ফাঁদ পাতা কিরূপে হইতে পারে। ইহাত এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ বর্হিভাবে ইহার অর্থ করিলে ইহা হাস্যকর তামাসায় পরিণত হয়; হাস্যামোদের বশীভূত হইয়া শুনিলে মালিনীকে সাধারণ চতুরা কুট্টনী বলিয়াই লোকে মনে হওয়া সম্ভব, বস্তুতঃ তাহা নহে। বাতাস, বায়ুকে কহা যায় ইহা পূর্বে বলিয়াছি। মালিনী যে বাতাসের কথা বলিতেছেন ইহা বর্হিবায়ু নহে, এই বায়ুই জীবের আয়ু স্বরূপ প্রাণবায়ু। (বায়ু বায়ু বলং বায়ু বায়ুর্ধাতা শারীরিনাং বায়ু সর্বমিদং বিশ্ব বায়ু প্রত্যক্ষ দেবতা) এই প্রাণ বায়ুতে ফাঁদ অর্থাৎ কৌশলরূপ প্রাণের ক্রিয়া বিশেষকেই ফাঁদ বলিয়া জানিবে। প্রাণের ক্রিয়ারূপ ফাঁদের দ্বারায় (কৌশল দ্বারায়) গগণের চাঁদকে ধরা যায়। গগণ, গম্—গমন করা, যাহা গমনীয় অর্থাৎ মনোরূপ চন্দ্র যাহা সর্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করিতেছে, তাহা প্রাণ ক্রিয়ারূপ ফাঁদ দ্বারায় ধরা যায়। ইহা আত্ম পক্ষের স্বপ্রকৃতিরূপা মালিনীর, সুন্দররূপ জীবের প্রতি বিদ্যারূপ জ্ঞান লাভের উপায় বলা হইয়াছে, ইহা হাস্যামোদের কথা নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"যোগ"

যোগ কৌশলের ফাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়া কেযশল অর্থে এখানে কাহাকে বুঝায় তাহাই বলিলাম। এক্ষণে যোগ কাহাকে বলে তাহাই বলিব শ্রবণ কর। যোগ এই কথাটা সাধারণতঃ আমাদের ভারতবর্ষের অনেকেই প্রায় শুনিয়া আসিতেছেন এবং যোগ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রও আছে। যোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহাকে যোগশাস্ত্র বলিয়া লোকে কহিয়া থাকে। যোগশাস্ত্র সমুদয়ে উৎকট উৎকট যোগ ক্রিয়া সকল লিখিত আছে, তাহাতে অপকার ব্যতীত উপকারের সম্ভাবনা নাই। পুরাণেও স্থানে স্থানে অনেক যোগ বিষয়ের উল্লেখ আছে। অনেকে এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার পর আপনাকে সাধু বেশে সাজাইয়া অর্থাৎ রক্ত বস্ত্র বা গৈরিক বস্ত্রাদির সাজে সাজাইয়া, সাধু বেশে ঐ সকল যোগ শাস্ত্রের অংশ হইতে শ্লোক গ্রহণ করিয়া আপনাকে সিদ্ধ মুক্ত সাজাইয়া বা আমি গুপ্ত স্থানে সিদ্ধ মুক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং গুপ্তভাবে তাঁহাদের যোগ শাস্ত্রের পুস্তকাগার দেখিয়াছি ইত্যাদি প্রলোভন বাক্যের দ্বারায় সাধারণ মানব (যাহাদের যোগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই অথচ যোগ সম্বন্ধীয় বিষয় শিক্ষা করিবার আগ্রহ যথেষ্ট থাকে এমত লোক) সকলকে প্রতারিত করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকেন এবং তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া যোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোক সকলকে নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য আমি নিজে একজন কর্মযোগী এবং যোগশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া সকল অবগত নহেন যে, যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়া বা যোগশাস্ত্র দেখিয়া কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না; ইহা যদি সাধারণের জানা থাকিত তাহা হইলে তাহারা লোক সমাজে স্থান পাইতেন না।

সিদ্ধ মুক্তগণের বা ঋষিগণের কোন গুপ্ত স্থানে পুস্তকাগার নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তাঁহাদের পুস্তকাগার নিজের দেহ, তাঁহারা কোন চতুষ্পাঠী বা টোল খুলিয়া বকেন না এবং নিজে কোন টোলে যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রাদি পাঠ করিয়া সিদ্ধ মুক্ত বা ঋষি পদবাচ্য হয়েন নাই, তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই শাস্ত্র, তাঁহাদের বাক্য

পুঁথি। ইহাতে একটি সিদ্ধ ব্যক্তির কথা বলিতেছি যাহা পূর্বেও বলিয়াছি, তোমার স্মরণ জন্য পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর। পুঁথি মেরা থুঁথি, চারো বেদ পড়ে মজুর, কথ্‌নিকে ঘর বহুৎ হ্যায়, করনিকে ঘর দূর। আমার মুখই পুঁথি, সাধারণ লোক যাহারা, তাহারাই যোগাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাক্যপটু হইয়া থাকে কথা বলিবার লোক অনেক কিন্তু কৃতকর্মা লোক বড়ই কম। সুতরাং যাহারা বলিয়া থাকে আমি সিদ্ধ মুক্তগণের যোগশাস্ত্রের গ্রন্থাদি গুপ্তভাবে পাঠ করিয়াছি তাহারা মিথ্যাচারী। মিথ্যা কথা বলিয়া সাধারণ লোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে মাত্র। তাহাদের দ্বারায় অপর কিছুই সাধারণের লাভ হয় না, তবে সেই সকল প্রবঞ্চকগণের কথায় যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব বিষয়ে বিড়ম্বিত হইয়া পরিণামে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সাধুবেশধারী সাধুগণের ভিতরও যাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারায় বা কোন শাস্ত্রপাঠী লোকের নিকট হইতে উক্ত শাস্ত্র সমুদয়ের মত শ্রবণ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারও উৎকট অর্শ বা ভগন্দর প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, অবশেষে ডাক্তারগণের দ্বারায় অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থলাভ করিয়া থাকেন।

উপরিউক্ত শাস্ত্র সমুদয়ের উল্লিখিত কার্য্য করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় অবশেষে অধিকাংশ সাধুরাই বলিয়া থাকেন কলিকালে যোগ হয় না, ইহা বলা যে তাহাদের অপরিণামদর্শিতার ফল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যোগ শাস্ত্রে এবং তন্ত্রাদি অপর শাস্ত্রে যে সকল যোগ সম্বন্ধে কার্য্য লিখিত আছে তাহা দেখিয়া কার্য্য করিতে যাইলে বা করিলে তাহার বিপরীত ফলই লাভ হইয়া থাকে। উক্ত শাস্ত্র সকল ঋষি, মুনি বা সিদ্ধ মুক্তগণের দ্বারায় লিখিত হয় নাই। ঋষি মুনিগণের সময়ে লিখন প্রণালী সৃষ্ট হয় না, শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলিত, একারণ বেদ উপনিষদকে শ্রুতি কহা যায়। যে সময় হইতে লিখন প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে তাহার বহু পূর্ব হইতেই যোগ রহস্য আপ্তবাক্য হইয়াছে, এবং ঋষি মুনিগণের তিরোভাব হওয়ায় যোগ রহস্য অপ্রকাশ হইয়াছে। ঋষি মুনিগণের বাচনিক যে সকল উপদেশ পূর্ণ বাক্য সকল লোকের মুখে মুখে ছিল, তাহা লিখন প্রণালী চলিত হইবার পর, ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া পন্ডিতগণের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় হইতে শাস্ত্র সকল পুঁথির আকারে পন্ডিতগণের নিকট হইতে প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহাও প্রায়শঃ সাত নকলে আসল ভেস্তা যে না হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কারণ লোকের স্মরণ পথে যাহা ছিল তাহাই লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যে কিছু বাদ যায় নাই, একেবারে তাহাও বলা অসম্ভব। যাহা হউক এইভাবেই সিদ্ধমুক্ত ঋষিগণের তিরোভাব হইবার বহু পরে আপ্তবাক্য সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সিদ্ধমুক্ত ঋষিগণের বর্তমান সময়ে আপ্তবাক্য লিপিবদ্ধ হয় নাই ইহা সত্য।

চারি পাঁচশত বৎসর পূর্বে কতিপয় সিদ্ধমুক্ত মহাত্মাগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে গুরু কবির, গুরু নানক, বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্বরচিত পদ্যছন্দে অনেক কর্ম কান্ডের বিষয় আপন জাতীয় ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ বা নিজে আপন মাতৃভাষায় লিখিয়াছেন, ইহারা যে কেবল কর্মকান্ডের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নহে কর্মকান্ড ব্যতীত জ্ঞানগর্ভ কথা সকলও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে ইঁহারা যে ভাবের বশবর্তী হইয়া আপন আপন ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সে ভাব প্রকৃত সাধক ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে বলিলেও অত্যুক্তি হইতে না পারিয়া সাধারণ আপন ভাবের অর্থ করিয়া লইয়া থাকে তাহার দ্বারায় প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

বঙ্গদেশে উক্ত সময়ে কয়েকজন সিদ্ধমুক্ত লোক ছিলেন ইঁহারা তান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া লোকে কহিয়া থাকে। ইঁহারা যে বর্তমান কালের তান্ত্রিকগণের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া কেহ সিদ্ধমুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহা প্রসাদ সঙ্গীত দেখিলেই বেশ প্রণিধান হইতে পারে। বর্তমানের তান্ত্রিকগণ যাহাকে কালী বলিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন তাহা প্রসাদের কালী নহে, প্রসাদের কালী বা পঞ্চমকারের সাধন অন্যরূপ, তাহা প্রসাদ সঙ্গীতে প্রসাদের মনোভাব ব্যক্ত আছে। তান্ত্রিকগণের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা সিদ্ধমুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এক ভাব, অসাধকের নিকট সকলই পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। তন্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত বাহ্যিক পূজাপদ্ধতি, মারণ উচাটন প্রভৃতি এবং জড় পঞ্চমকারের সাধন প্রণালী মিথিলা হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিল শিবশক্তির উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্রকেই তন্ত্র কহা যায়, শিবশক্তি যে কে তাহা সাধারণ তান্ত্রিকগণ জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহা সিদ্ধ গুরু ব্যতিত সকলের জানা নাই, ইহা গুরুপদেশগম্য। যোগ রহস্য প্রকাশ ব্যতীত সকলের জানা নাই, ইহা গুরুপদেশগম্য। যোগ রহস্য প্রকাশ ব্যতীত শিবশক্তির মর্ম অবগত হওয়া যায় না, এই যোগ কর্ম মধ্যে মধ্যে প্রকাশ হয় আবার মধ্যে মধ্যে অনৈসর্গিক নিয়মানুসারে অপ্রকাশ হইয়া যায়। ইহার স্থিতি কাল বেশী দিন থাকে না, চার পাঁচ শত বৎসর বা কখন হাজার বৎসর অন্তর এক একবার প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সময় প্রকাশ পায় সেই সময়ে কতকগুলি করিয়া লোক প্রকৃত যোগ কর্মের দ্বারায় সিদ্ধমুক্ত হইয়া যান, আবার কাল কর্তৃক অপ্রকাশ হইয়া নষ্ট প্রায় হইয়া থাকে। গীতায় ভগবানও ইহা বলিয়াছেন, আর্য্য মিশন কর্তৃক প্রকাশিত গীতার ৪র্থ অঃ ১ম, ২য় ও তৃতীয় শ্লোক দেখিও। অপ্রকাশ সময়ে যে একেবারে নষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় থাকিয়া সাধারণ মানবগণের নিকট অপ্রকাশ্য ভাবে থাকে অর্থাৎ এই যোগ অবস্থা জীবভাবে অপ্রকাশই থাকে অপ্রকাশ থাকিবার কারণ গীতায় ৭ অঃ ২৫ শ্লোকে ভগবান

বলিয়াছেন, আমি যোগ মায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি, যোগ মায়া কর্তৃক যোগাবস্থা আবৃত রহিয়াছে, মূঢ় ব্যক্তিগণ যোগাবস্থা না জানার দরুণ যোগাবস্থারূপ যে আমি সেই আমাকে জীব জানিতে পারে না।

যোগ কাহাকে বলে তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধারণ যোগ শব্দের অর্থ মিলন, এক্ষণে কাহার সহিত কাহার মিলন হইবে তাহা জানা আবশ্যক। যে অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে না, তাহাই জীবাত্মা পদবাচ্য। আর যে অবস্থায় আমি আমার বোধ নাই বা থাকে না সেই অবস্থাই পরমাত্মা পদবাচ্য। এই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন অবস্থাই যোগ শব্দবাচ্য। ইহা আরো একটু বিশদভাবে তোমাদের বোধগম্য যাহাতে সহজে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে বলিয়াছি যে অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি হয় তাহাই জীবাত্মা। এই আমি আমার বোধের উৎপত্তি হইতেছে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থা হইতে; ইহাই যোগমায়া পদবাচ্য। যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব বোধ করার নামই মায়া। প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার অতীত অবস্থায় আমি আমার বোধের সহিত আমার দেহ বা বাহ্য জগৎ কিছুই ছিল না। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার উৎপত্তি হইতে স্বপ্নবৎ আমি আমার বোধের সহিত আমার দেহ বা বাহ্য জগৎ প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং ইহা মায়া। ইহার কার্য্যই মনকল্পিত, মায়িক সংসারে আমি আমার বোধের সহিত জীবকে আসক্ত করা, একারণ ইহাকে মায়া কহা যায়। তবে কেবল মায়া না বলিয়া যোগমায়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থায় আদি ও অন্ত অবস্থারূপ উভয় স্থানে স্থির স্বরূপ স্থির প্রাণরূপ পরমাত্ম ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্বে বলিয়াছি জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ভাবকেই যোগ কহা যায়, এবং যে অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাই জীবাত্মা পদবাচ্য। আর যে অবস্থায় আমি আমার বোধ থাকে না তাহাই পরমাত্মা পদবাচ্য। প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি, এই প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থায় আমি আমার বোধ থাকে না। আমি আমার বোধের সহিত প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থাকে, আমি আমার নাই যে অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থায়, মিলন করার নাম যোগ। বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণই প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা। প্রাণস্য প্রাণঃ, ইতি শ্রুতি। মিলন অবস্থাই যোগ শব্দবাচ্য বা পরমাত্মা শব্দবাচ্য। যোগ শব্দের অর্থ মিলন, মিলন হইলে আর পৃথক ভাব থাকে না। যতক্ষণ মিলন না হয় তাহাকে বিয়োগরূপ বিচ্ছেদভাব কহা যায়। উপরে বলিয়াছি বর্তমান প্রাণকর্মের আদি ও অন্তে প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ভাব রহিয়াছে। বলা বাহুল্য এই উভয় অবস্থাই তুল্য, প্রভেদ ভাব নাই। এই উভয় অবস্থারূপ যোগ অবস্থার মধ্যে চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা

মায়ারূপিণী দেবী রহিয়াছেন বলিয়া ইহাকে যোগমায়া কহা যায়। আদি ও অন্ত অবস্থা তুল্য বোধে যোগিগণ এই আদি অন্তে রমণ করিয়া থাকেন (মূলাধারে সহস্রারে সদাযোগী করে রমণ ইহা রামপ্রসাদ উক্তি)।

বর্তমান প্রাণ কর্মের, বর্তমান অবস্থার অতীতাবস্থারূপ যোগ অবস্থাটি-প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থারূপ যোগ মায়ারূপিণী মহামায়া কর্ত্তৃক (ঐ আদি অন্তর অবস্থাটি) আবৃত রাখিয়াছে। এই কারণে যোগরূপ মিল্‌ন অবস্থা (ঐ পরমাত্মভব) সকল জীবদেহে প্রকাশ নাই। সময়ে সময়ে কোন কোন ঘটে (কোন কোন মানব দেহে) প্রকাশ হইয়া থাকেন সর্বত্রে নহে। তাঁহাকে অর্থাৎ প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মাকে, প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থারূপ প্রাণশক্তিরূপা যোগ মায়ারূপিণী দেবী কাত্যায়নীর সেবা পূজা, (সেবা=আরাধনা, উপাসনা, পূজা=সংবর্দ্ধনা, সংবর্দ্ধন=সম্যক বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাণকর্মের সম্যক বৃদ্ধি, করা) ব্যতীত প্রকাশ করিবার নহে। যোগীরাও চঞ্চল প্রাণ শক্তিরূপা দেবী কাত্যায়নীরা পূজারূপে আপন আপন প্রাণকর্মের সম্বর্দ্ধন করারূপ ক্রিয়ার দ্বারায় (সম্বর্দ্ধন ক্রিয়া, গুরুপদেশগম্য) আপন আপন কর্মের নিবৃত্তি অবস্থারূপ জীবন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগ শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেহ প্রাপ্ত হন নাই এবং যোগশাস্ত্র বা তন্ত্র পুরাণাদিতে লিখিত উপায় দ্বারায়ও প্রাপ্ত হন নাই। ইহা একজনের নিকট হইতে অপর জন পাইয়া থাকেন; স্থির ও চঞ্চল প্রাণের কয়েক প্রকার ক্রিয়া কৌশল আছে তাহাকে যোগরূপ সুন্দর পরম সুকৌশল কহা যায় (যোগঃ কর্ম সুকৌশলম্, গীতা ২ অঃ ৫০ শ্লোক)। প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে তাহাই যোগ কর্ম, ইহা ব্যতীত অপর আর যোগ কর্ম নাই বলিয়া জানিবে।

বর্তমানে অনেকে নানা তন্ত্র হইতে ও অপর শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এক এক খানি যোগ শাস্ত্রের পুস্তক প্রকাশ করিয়া পুস্তক কাট্‌তির অভিপ্রায়ে নানা প্রলোভন বাক্যে লোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন, সে সকল পুস্তক অপাঠ্যই মনে করিবে। অনেক প্রকার যোগ শাস্ত্র ও তন্ত্র শাস্ত্র আমাদের দেশে প্রাচীন পন্ডিত বংশের গৃহে অদ্যপি দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় সে সকল গ্রন্থ বা পুঁথি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহা নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রায় অবগত নহেন। এরূপ অবস্থায় আমি যদি উপরোক্ত তন্ত্র বা অপর গ্রন্থাদি হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া যোগ শাস্ত্রের পুস্তক প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমি সংগ্রহ কারক ব্যতীত অপর কিছুই নাহি এবং আমার প্রকাশিত সংগ্রহ পুস্তক খানি সাধারণের নিকট আদরণীয় করিতে হইলে, আমি একটা বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার তাহার সহিত না বলিলে আমার পুস্তকও লোক সমাজে আদরণীয় হয় না। এমতস্থলে নব্য যোগশাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সিদ্ধমুক্ত যোগগণের পুস্তকাগার হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন এবং পাছে কেহ সেই গুপ্ত পুস্তকাগার দেখিতে চাহেন, তাহা লোকের বলিবার পূর্বেই বলিয়া

বলিয়াছেন, আমি যোগ মায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি, যোগ মায়া কর্তৃক যোগাবস্থা আবৃত রহিয়াছে, মূঢ় ব্যক্তিগণ যোগাবস্থা না জানার দরুণ যোগাবস্থারূপ যে আমি সেই আমাকে জীব জানিতে পারে না।

যোগ কাহাকে বলে তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধারণ যোগ শব্দের অর্থ মিলন, এক্ষণে কাহার সহিত কাহার মিলন হইবে তাহা জানা আবশ্যক। যে অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে না, তাহাই জীবাত্মা পদবাচ্য। আর যে অবস্থায় আমি আমার বোধ নাই বা থাকে না সেই অবস্থাই পরমাত্মা পদবাচ্য। এই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন অবস্থাই যোগ শব্দবাচ্য। ইহা আরো একটু বিশদভাবে তোমাদের বোধগম্য যাহাতে সহজে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে বলিয়াছি যে অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি হয় তাহাই জীবাত্মা। এই আমি আমার বোধের উৎপত্তি হইতেছে আমার বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থা হইতে; ইহাই যোগমায়া পদবাচ্য। যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব বোধ করার নামই মায়া। প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থার অতীত অবস্থায় আমি আমার বোধের সহিত আমার দেহ বা বাহ্য জগৎ কিছুই ছিল না। বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থার উৎপত্তি হইতে স্বপ্নবৎ আমি আমার বোধের সহিত আমার দেহ বা বাহ্য জগৎ প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং ইহা মায়া। ইহার কার্য্যই মনকল্পিত, মায়িক সংসারে আমি আমার বোধের সহিত জীবকে আসক্ত করা, একারণ ইহাকে মায়া কহা যায়। তবে কেবল মায়া না বলিয়া যোগমায়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থায় আদি ও অন্ত অবস্থারূপ উভয় স্থানে স্থির স্বরূপ স্থির প্রাণরূপ পরমাত্ম ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্বে বলিয়াছি জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ভাবকেই যোগ কহা যায়, এবং যে অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাই জীবাত্মা পদবাচ্য। আর যে অবস্থায় আমি আমার বোধ থাকে না তাহাই পরমাত্মা পদবাচ্য। প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থা হইতে আমি আমার বোধের উৎপত্তি, এই প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থায় আমি আমার বোধ থাকে না। আমি আমার বোধের সহিত প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থাকে, আমি আমার নাই যে অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থায়, মিলন করার নাম যোগ। বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণই প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা। প্রাণস্য প্রাণঃ, ইতি শ্রুতি। মিলন অবস্থাই যোগ শব্দবাচ্য বা পরমাত্মা শব্দবাচ্য। যোগ শব্দের অর্থ মিলন, মিলন হইলে আর পৃথক ভাব থাকে না। যতক্ষণ মিলন না হয় তাহাকে বিয়োগরূপ বিচ্ছেদভাব কহা যায়। উপরে বলিয়াছি বর্তমান প্রাণকর্মের আদি ও অন্তে প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ভাব রহিয়াছে। বলা বাহুল্য এই উভয় অবস্থাই তুল্য, প্রভেদ ভাব নাই। এই উভয় অবস্থারূপ যোগ অবস্থার মধ্যে চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা

মায়ারূপিণী দেবী রহিয়াছেন বলিয়া ইহাকে যোগমায়া কহা যায়। আদি ও অন্ত অবস্থা তুল্য বোধে যোগিগণ এই আদি অন্তে রমণ করিয়া থাকেন (মূলাধারে সহস্রারে সদাযোগী করে রমণ ইহা রামপ্রসাদ উক্তি)।

বর্তমান প্রাণ কর্মের, বর্তমান অবস্থার অতীতাবস্থারূপ যোগ অবস্থাটি-প্রাণ কর্মের মধ্য অবস্থারূপ যোগ মায়ারূপিণী মহামায়া কর্ত্তৃক (ঐ আদি অন্তর অবস্থাটি) আবৃত রাখিয়াছে। এই কারণে যোগরূপ মিলন অবস্থা (ঐ পরমাত্মভব) সকল জীবদেহে প্রকাশ নাই। সময়ে সময়ে কোন কোন ঘটে (কোন কোন মানব দেহে) প্রকাশ হইয়া থাকেন সর্বত্রে নহে। তাঁহাকে অর্থাৎ প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মাকে, প্রাণকর্মের মধ্য অবস্থারূপ প্রাণশক্তিরূপা যোগ মায়ারূপিণী দেবী কাত্যায়নীর সেবা পূজা, (সেবা=আরাধনা, উপাসনা, পূজা=সংবর্দ্ধনা, সংবর্দ্ধন=সম্যক বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাণকর্মের সম্যক বৃদ্ধি, করা) ব্যতীত প্রকাশ করিবার নহে। যোগীরাও চঞ্চল প্রাণ শক্তিরূপা দেবী কাত্যায়নীরা পূজারূপে আপন আপন প্রাণকর্মের সম্বর্দ্ধন করারূপ ক্রিয়ার দ্বারায় (সম্বর্দ্ধন ক্রিয়া, গুরুপদেশগম্য) আপন আপন কর্মের নিবৃত্তি অবস্থারূপ জীবন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগ শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেহ প্রাপ্ত হন নাই এবং যোগশাস্ত্র বা তন্ত্র পুরাণাদিতে লিখিত উপায় দ্বারায়ও প্রাপ্ত হন নাই। ইহা একজনের নিকট হইতে অপর জন পাইয়া থাকেন; স্থির ও চঞ্চল প্রাণের কয়েক প্রকার ক্রিয়া কৌশল আছে তাহাকে যোগরূপ সুন্দর পরম সুকৌশল কহা যায় (যোগঃ কর্ম সুকৌশলম্, গীতা ২ অঃ ৫০ শ্লোক)। প্রাণকর্ম যাহা চলিতেছে তাহাই যোগ কর্ম, ইহা ব্যতীত অপর আর যোগ কর্ম নাই বলিয়া জানিবে।

বর্তমানে অনেকে নানা তন্ত্র হইতে ও অপর শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এক এক খানি যোগ শাস্ত্রের পুস্তক প্রকাশ করিয়া পুস্তক কাট্‌তির অভিপ্রায়ে নানা প্রলোভন বাক্যে লোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন, সে সকল পুস্তক অপাঠ্যই মনে করিবে। অনেক প্রকার যোগ শাস্ত্র ও তন্ত্র শাস্ত্র আমাদের দেশে প্রাচীন পন্ডিত বংশের গৃহে অদ্যপি দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় সে সকল গ্রন্থ বা পুঁথি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহা নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রায় অবগত নহেন। এরূপ অবস্থায় আমি যদি উপরোক্ত তন্ত্র বা অপর গ্রন্থাদি হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া যোগ শাস্ত্রের পুস্তক প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমি সংগ্রহ কারক ব্যতীত অপর কিছুই নাহি এবং আমার প্রকাশিত সংগ্রহ পুস্তক খানি সাধারণের নিকট আদরণীয় করিতে হইলে, আমি একটা বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার তাহার সহিত না বলিলে আমার পুস্তকও লোক সমাজে আদরণীয় হয় না। এমতস্থলে নব্য যোগশাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সিদ্ধমুক্ত যোগগণের পুস্তকাগার হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন এবং পাছে কেহ সেই গুপ্ত পুস্তকাগার দেখিতে চাহেন, তাহা লোকের বলিবার পূর্বেই বলিয়া

রাখেন সে স্থান তামসিক প্রকৃতির লোকদের বা গুরুকৃপা বিহীন লোকের পক্ষে অগম্য। যে স্থানে সেই গুপ্ত পুস্তকাগার আছে তাহার চতুর্দিকে সাধারণ লোক সমূহ ঘুরিয়া বেড়াইলেও অন্ধের ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইবেন না। ইহা অপেক্ষায় আর চাতুরীর বিষয় কি হইতে পারে, তবে সাধারণ হিন্দু মাত্রেই কোন গ্রন্থে 'শিব উবাচ' দেখিলেই অর্থাৎ মহাদেব বলিতেছেন ইহা শুনিলেই আমাদের হিন্দু মাত্রেই স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে যে, ইহা সত্য, কারণ হিন্দু মাত্রেই তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় হরপার্বতী যখন বর্তমান ছিলেন তখন ছাপাখানা বা লিখনপ্রণালী সৃষ্ট হয় নাই। এমন কি লিখিবার কাগজও সৃষ্ট হয় নাই, কাগজ না থাকায় তালপাতা বা তেড়েৎ পাতায় (তেড়েৎ গাছ তাল গাছের মতন) লিখন কার্য্য চলিত, জগৎগুরু মহাদেবের প্রকাশ সময়ে লিখন প্রণালী যে ছিল না তাহা নিশ্চয় জানিবে। তাঁহাদের লিখিবার প্রয়োজনও ছিল না এবং তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষেও ছিলেন না যে দোয়াত কলম কাগজ তালপাতা লইয়া লিখিতে বসিবেন বা তিনি যোগ শাস্ত্র বলিবেন, অপর কেহ লিখিয়া লইবেন; হরপার্বতী, সকল ঘটেই পুরুষ প্রকৃতি ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তবে সকল ঘটে প্রকাশ নাই, কেন প্রকাশ নাই তাহা পূর্বে বলিয়াছি। হরি আর হর পৃথক নহেন, একই অবস্থার নাম হরি বা হর। প্রাণস্বরূপ আত্মাই হরি বা হর পদবাচ্য আর প্রাণের ক্রিয়া শক্তিই প্রকৃতি বা পার্বতী পদবাচ্য বলিয়া জানিবে।

সাধারণ যোগ শাস্ত্রাদি ও তন্ত্রাদিতে বহুল ভাবের যোগ ক্রিয়া মুদ্রা প্রভৃতি লিখিত আছে এবং তন্ত্রাদিতেও যোগ ক্রিয়া এবং মন্ত্র যোগ সম্বন্ধে বহুল ভাবে মন্ত্রাদি লিখিত আছে এবং সেই যোগ ক্রিয়ার বা মুদ্রাদির ফলশ্রুতির প্রলোভনে অনেক অজ্ঞ লোক তাহার অভ্যাস করিয়া পরিণামে কর্মভোগরূপ যন্ত্রণার সহিত উৎকট উৎকট ব্যাধিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যষ্টিহীন অন্ধ ব্যক্তি কোন পথে চলিতে গেলে তাহার যেমত পতনই সম্ভব হইয়া থাকে। তদ্রূপ যোগশাস্ত্র মতে, যষ্টিহীন হইয়া যোগ অভ্যাস করিতে যাইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী জানিবে। যোগ অভ্যাসীর একমাত্র যষ্টি যোগরূপ দন্ড। যোগরূপ দন্ড বলিবার আমার অভিপ্রায় 'দন্ড অর্থাৎ যাহার দ্বারা দমন বা শাসন করা যায়, তাহাকেই দন্ড কহা যায়। রিপু বা ইন্দ্রিয়গণকে দমন বা শাসন করিবার একমাত্র দন্ড স্বরূপ যোগ অবস্থা, যোগ অবস্থা প্রাপ্তি ব্যতীত ইন্দ্রিয় ও রিপুকুল দমিত হয় না। এই যোগ অবস্থাই চাবি স্বরূপ তাহা পূর্বে তোমাদের বলিয়াছি, যোগ নানা প্রকার নাই ইহা নিশ্চিত জানিবে। তবে যোগ অবস্থায় কয়েক প্রকার প্রকাশ সোপান আছে, তাহা অষ্টাদশ প্রকার—যাহা শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতে প্রকাশ আছে এবং যোগ ক্রিয়ার কৌশল আছে যেমত যাহারা আত্মরক্ষার্থেবাহ্যিক দন্ডচালনা (লাঠি খেলা) করিয়া থাকে। তদ্রূপ

রিপুগণের ও ইন্দ্রিয়গণের হস্ত হইতে আপনাকে আপনি রক্ষা করিবার জন্য স্থির স্বরূপ যোগাবস্থার যোগদণ্ড স্বরূপ স্থির বায়ুর ও প্রাণের ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়াও কিছু আছে। সে সমুদয় সহজ ক্রিয়ার মধ্যে এবং তাহা জীব মাত্রেরই সহজ ও সুখ সাধ্য, তাহা কষ্ট কর নহে। চাবি হারা হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে কষ্টকর হইয়া কুফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি যোগশাস্ত্র মধ্যে ও তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে বিবিধ প্রকার কষ্টসাধ্য ও ঘৃণিত ক্রিয়া সকলও লিখিত আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার বলিয়া উল্লেখ আছে। প্রথম—মন্ত্র যোগ, দ্বিতীয়—হঠ যোগ, তৃতীয়—রাজ যোগ, চতুর্থ—লয় যোগ,—এই চারি প্রকার যোগের প্রক্রিয়ার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা আছে এবং ফলশ্রুতিও অসম্ভব ভাবে বর্ণনা আছে। দুঃখের বিষয় যোগশাস্ত্র অনুযায়ী বা তন্ত্রোক্ত অনুযায়ী কার্য্যাদিকরণের পর তাহা শূন্য কলসের শব্দের ন্যায় পরিণত হইয়া থাকে, কার্য্যতঃ কিছুই লাভ হয় না। মনে কর মন্ত্র দীক্ষা বা মন্ত্র জপ বহুকাল হইতে আমাদের দেশে অনেকেই করিয়া আসিতেছেন ও এখন বর্তমানে অনেকেই করিয়া থাকেন এবং স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র সিদ্ধ হইবার জন্য তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার (ইষ্টদেবতার) মন্ত্র জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন দ্বারায় পুরশ্চরণ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ভস্মে ঘৃতাহুতি দিবার ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার দ্বারায় কর্ম কর্তার পণ্ডশ্রম মাত্র লাভ হইয়া থাকে, তবে মন্ত্রদাতা গুরুর অলাভ হয় না। দেখ আমি বাল্যকালে গ্রহণাদি সময়ে এইরূপ পুরশ্চরণ অনেকবার করিয়াছিলাম এবং তাহা আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারেই করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় তাহার দ্বারায় না আমার মন্ত্রচৈতন্য হইয়াছিল না মনেরই কিছু শান্তি হইয়াছিল, অর্থাৎ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তুমিও ইতিপূর্বে কয়েকবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলে তাহার দ্বারায় কি তুমি মনের শান্তি লাভ করিয়াছিলে বলিতে পার? মা, বাবার এই কথার উত্তরে বলিলেন,—না বাবু, শান্তি দূরের কথা, উপবাসাদি জনিত মনের কষ্ট ব্যতীত মনের আনন্দ কিছুমাত্রই প্রাপ্ত হই নাই।

বাবা ইহা শুনিয়া বলিলেন, এইরূপ ফলভোগ সকলেই করিয়া থাকেন, তবে লজ্জার বা যশঃহানির খাতিরে কেহ কিছু না বলিয়া মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখেন। দেখ যিনি মন্ত্রদাতা গুরু তিনি মন্ত্র কাহাকে বলে তাহাই তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাকে ইষ্টদেবী বা ইষ্টদেবতা বোধ করিতে লাগিল, তাহার ইষ্টদেবতার মন্ত্রের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জীবনকালের মধ্যে হইল না, মধ্যে মধ্যে পুরশ্চরণের দ্বারায় ইষ্ট মন্ত্র চৈতন্য হইবে এই আশায় বাহ্য পূজা অভিষেকাদি গুরুবাক্য অনুযায়ী করিয়াও কোন ফললাভ হইল না দেখিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া নিজেকেই পাপী মনে করিয়া মনের জ্বালায় কোন গতিকে কাল কাটাইয়া মনের শান্তিস্থলে অশান্তিই

ভোগ করিয়া থাকে। মনে কর জলের দ্বারায় স্নান অভিষেকে মনের মল বিদূরিত হয় না, তাহাতে কতকটা শরীরের মলই ধৌত হইতে পারে নিশ্চিত জানিবে। যাহার দ্বারায় বর্তমান মনের উদ্ধার বা ত্রাণ হয় তাহাই মন্ত্র। মন্ত্র শব্দের রহস্য ভেদ না হইলে জলের দ্বারায় বা বাহ্য পূজা বা হোম দ্বারায় বা অপর কোন পদার্থের দ্বারায় মন্ত্র চৈতন্য হয় না।

শাক্তগণের মধ্যে মন্ত্র চৈতন্য পুরশ্চরণ পূর্ণাভিষেক প্রভৃতি যাহা হইয়া থাকে, তাহাও তদ্রূপ; সাধারণ তান্ত্রিকগণেরা কহিয়া থাকেন, কারণ ব্যতীত অভিষেক হইতে পারে না। তান্ত্রিকগণেরা মদ্যকে কারণামৃত কহিয়া থাকেন, ইহারা কেবল মদ্যের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে। যাহারা মদ্যপ্রিয় তাহারা মদিরার নেশাজনিত কিছু আনন্দ ভোগ করিয়া সেই নেশারূপ আনন্দের ঘোরে ধর্ম বোধে নানা রকম অকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মদ্যসেবীর অকার্য্য কিছুই জগতে নাই। যাঁহারা মদ্যসেবী নহেন, তাঁহারা আপন উপদেষ্টার অনুমতিক্রমে কর্পূরের ডেলা মদ্যতে সিক্ত করিয়া লইয়া সেই কর্পূরের গুঁড়া পূজাদি দ্রব্যে এবং নিজ আহারাদির দ্রব্যে প্রদান করিয়া থাকেন; তান্ত্রিকরা কারণ (মদ্য) ব্যতীত কোন দ্রব্য ভোজন করেন না। ভোজনাদির পূর্বে এবং পরে মদ্য সেবন করিয়া থাকেন, এবং পূজার পূর্বে ও পরে মদ্য সেবন করিয়া থাকেন। মদ্য সেবন করিয়া পূজা ও জপ করিয়া থাকেন এই সকল উপায় দ্বারায় মন্ত্র চৈতন্য বা পূজা কিছুই হয় না, কেবল বাহ্য আড়ম্বর মাত্র; এই তান্ত্রিকগণেরা আপনাকে ভৈরব বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের বিবাহিতা স্ত্রী না থাকিলেও ভৈরবীর অভাব হয় না। ইঁহারা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আপন কপালে রক্ত চন্দন বা সিন্দুরের গোলাকার ফোঁটা ধারণ করিয়া থাকেন এবং কখন কখন আপনাকে বামাচারী বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের কারণ পাত্র, সাধারণতঃ কপাল অস্থি (মনুষ্যের মাথার খুলিকে কপালপাত্র কহে) বা নারিকেলের মালাতে করিয়া কারণ (মদ্য) সেবন করিয়া থাকেন, নারিকেলের মালা বা কপালপাত্রকে স্বর্ণপাত্র মনে করিয়া থাকেন। হস্তে কপাল মালা ধারণ করিয়া সেই মালায় জপ সংখ্যা রাখিয়া থাকেন। কপাল মালা মনুষ্যের অস্থি হইতে তৈয়ারী করিয়া লইয়া থাকেন, ইঁহারা তন্ত্রকেই প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়া তন্ত্রোক্ত মতে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সকল তন্ত্র সিদ্ধগণের রচিত নহে। এই সকল তন্ত্রের অধিকাংশ স্থলে শিব উবাচ বা ভৈরব উবাচ বলিয়া উল্লেখ আছে, এই সকল তন্ত্র অধিকাংশ মধ্য সময়ে কাপালিক কর্তৃক বেদ বিরুদ্ধ আচার সকল শিব উবাচ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল।

কাপালিক কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কাপালিকেরা চিতা ভস্মে নিজ দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং অস্থি মালা গলদেশে ধারণ করিয়া রাখে। কপালে অঙ্গারের তিলক ধারণ করিয়া সময় সময় ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান করিয়া থাকে এবং হস্তে

নরকপাল ধারণ করিয়া থাকে। এই নরকপালে ভোজন পাত্রেরও কার্য্য চালাইয়া থাকে এবং মুখে লোকজন দেখিলে কালী তারা, ভৈরব বিকট শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, আর মদ্যপানে আরক্ত লোচন করিয়া লোকের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া থাকে এবং নিজেকে সাক্ষাৎ ভৈবর বলিয়া প্রকাশ করিয়া, নিজেকে মুক্ত পুরুষ বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আরও নিজেকে কুলাচার্য্য, কুলাবধৌত উপাধিতে ভূষিত করিয়া লোক সমাজে নিজে সিদ্ধমুক্ত বা সিদ্ধমুক্তগণের গুপ্ত আশ্রমাদি দর্শন করিয়াছি ইত্যাদি ভাবে বলিয়া নিজের বিজ্ঞতা দেখাইয়া থাকে। ইহাদের ছায়াও স্পর্শ করা কাহারও উচিত নহে, কারণ ইহারা প্রতারক মধ্যে গণ্য জানিবে। উহারা তন্ত্র বা যোগ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবগত না থাকায় বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজেও বিপদগ্রস্থ হইয়া থাকে, এবং সাধারণকে বিপথগামী করিয়া তুলে, একারণ সাধারণ তান্ত্রিকগণের বাক্যে কাহার আস্থা স্থাপন করা বিধেয় নহে।

মনে কর তান্ত্রিকগণ কারণ অর্থে মদ্য কহিয়া থাকে, ইহা কারণ অর্থের বিপর্য্যয় অর্থ নহে! যাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কারণ শব্দের প্রকৃত অর্থ; তন্ত্রের মধ্যে কারণ শব্দ অনেক স্থলে উল্লেখ আছে সে কারণ মদ্য নহে। এক্ষণে কার্য্য কাহার দ্বারায় উৎপন্ন হইতেছে তাহা দেখিলেই কারণ শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ আপনই হইয়া যাইবে। কার্য্য কাহাকে বলে তাহা জানা চাহি। কার্য্য অর্থে যাহা করা যায় তাহাকে কার্য্য কহা যায়। হস্ত পদাদি মন ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় আমরা সে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তৎসমুদয়ই গৌণ কার্য্য ইহা পূর্বে বিশেষ ভাবে তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে কথার প্রসঙ্গে পুনরায় তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর। হস্তপদাদির দ্বারায় কার্য্য করা যখন গৌণ কারণ হইল তখন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না ইহা নিশ্চিত; তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কার্য্যের উৎপত্তি শক্তি হইতে, এমনস্থলে শক্তিই একমাত্র কারণ শব্দবাচ্য হইলেন। বাহ্যিক মদ্যেও একটা মত্ততা শক্তি আছে, একারণ ইহা নিকৃষ্ট, ভ্রান্ত তান্ত্রিকরা কহিয়া থাকেন মদ্যের দ্বারায় কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়া থাকে, ইহা মদ্যপায়ীর পক্ষে বলা অসম্ভব নহে। ধর্মের দোহাই দিয়া মদ্য পান করিবার এমন সুযোগ আর কি হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, যাহার স্বাভাবিক গুণ মত্ততাকর, তাহার দ্বারায় মনের মত্ততা নিবারণ হওয়া কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না, একারণ বাহ্যিক মদ্য জীব মাত্রেরই পক্ষে পরিত্যজ্য জানিবে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শক্তিই একমাত্র কারণ শব্দবাচ্য, যদি বল কাহাকে বলিব এবং সেই শক্তিই বা কি তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি, শক্তি অর্থে বল বা সামর্থ বুঝিও। দেখ মৃত শরীরে কোন সামর্থ্য বা বল থাকে না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণের অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণই বল বা সামর্থ্য জীবের থাকে, প্রাণের অভাবে সকল শক্তিরই অভাব হইয়া থাকে। এই প্রাণ দুই প্রকার। স্থির ও চঞ্চল। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই ক্রিয়া

শক্তি, বর্তমানে প্রাণ কর্মের ক্রিয়াশক্তি কার্য্যোৎপাদনের যোগ্য ধর্ম, ইহাই আদ্যাপ্রাণ শক্তিরূপা প্রকৃতি। ইনিই কারণ স্বরূপ শরীররূপ যন্ত্রে রহিয়াছেন এবং শরীররূপ যন্ত্রে মন্ত্রও রহিয়াছে, তাহা মুখে পাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিতে হয় না। শ্বাস ও প্রশ্বাস যাহা চলিতেছে তাহাই মন্ত্র পদবাচ্য, "শিবাদি কৃমি পর্য্যন্তং প্রাণীনাং প্রাণবর্ত্তনং, নিশ্বাস শ্বাস রূপেন মন্ত্রোয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।" ইহাও তন্ত্রে লিখিত আছে, তবে তাহা দেখে কে আর দেখায় বা কে। অনেকে তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র হইতে নানা বচন সংগ্রহ করিয়া নিজের নাম দিয়া নিজেকে লোকের নিকট সিদ্ধ যোগী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সিদ্ধমুক্তগণের গুপ্ত আশ্রম বা গুপ্ত পুস্তকাগার প্রভৃতি হইতে গুপ্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি, ইত্যাদি বলিয়া মিথ্যা ভাণ করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকের কথায় আদৌ আস্থা স্থাপন করা কাহারও উচিত নহে, উক্ত প্রকার লোকের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া কোন কার্য্য করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

মনে কর সিদ্ধমুক্ত ব্যক্তিগণের আশ্রম বা পুস্তকাগার গুপ্তভাবে রাখিবার বা গুপ্তভাবে থাকিবার কারণ কিছুই নাই। যদি বল যবন ম্লেচ্ছ বা তমঃপ্রধান লোকের ভয়ে ভীত হইয়া, তাহারা গুপ্তভাবে থাকেন ও গুপ্তভাবে তাঁহাদের পুস্তকাগার প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন, এমন বাক্য ঋষিগণের উপর বা সিদ্ধমুক্তগণের উপর প্রয়োগ করিলে তাঁহাদের কলঙ্কিত করা হয়। কারণ ভয় একটা পাশের মধ্যে, সেই ভয় যদি ঋষিগণের থাকে তাহা হইলে ঋষিরা বা সিদ্ধমুক্তগণ পাশমুক্ত হন নাই ইহা স্বীকার করিতে হয়, সামান্য লোকের কথায় যাহাতে ঋষিগণের ও সিদ্ধমুক্তগণের কার্য্যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ হইতে পারে তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। যাঁহারা আপনাকে আপনি উদ্ধার করিয়া জীবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিতে সদাই প্রস্তুত, তাঁহাদের গুপ্ত ভাবে কার্য্য করা বা থাকা অসম্ভব। অগ্নিকে ভস্ম দ্বারায় ঢাকিয়া রাখা বা সূর্য্যকে মেঘের দ্বারায় চিরকাল ঢাকিয়া রাখা যেমত অসম্ভব সিদ্ধমুক্তগণকে ঢাকিয়া রাখাও তদ্রূপ অসম্ভব জানিবেন। তাঁহাদের দেহের অস্তিত্ব কালে তাঁহারা লোক সমাজেই সাধারণ লোকের ন্যায় সামাজিক কার্য্যাদি করিয়া সামাজিক ন্যায়ই অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকাশ থাকিয়াও বর্তমানে সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশ ভাবে থাকেন। সাধারণ লোকের ভাবে থাকাই স্বাভাবিক নিয়ম; স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে চলাই পাপকার্য্য বলিয়া জানিবে। তাঁহারা স্বধর্মে (আত্মধর্মে) আসক্ত হইয়া, স্ত্রীপুত্র গৃহাদিতে আসক্ত ব্যক্তির ন্যায় লোকশিক্ষার্থ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, (আর্য্য মিশন হইতে প্রকাশিত গীতায় ৩য় অঃ ২৫ শ্লোক দেখিও) তাঁহারা হিংস্রক জন্তুর ন্যায় পর্বতে বা জঙ্গলে বাস করেন না। তাঁহারা লোক শিক্ষার্থ স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী যাহাতে লোকের ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়ই লাভ হয় এমত ভাবে নিজে কার্য্য করিয়া লোক সমাজে জীবগণের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধকাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের ধর্ম ভাবের উপর একটা অস্বাভাবিক আচার ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তাহা দেখিয়া সাধারণের সাধু সম্বন্ধে অন্য প্রকার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায় এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে যে, স্ত্রী, পুত্র, পৈত্রিক বাটী, গৃহ। আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া জটা ধারণ না করিলে কেহই সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারে না। এইরূপ ভাবের লোক দেখিলেই লোকে তাহাদিগকে সাধু বলিয়া মনে করিয়া থাকে; বেশ ধারণ বিকলেই যে সাধু হয় তাহা নহে, কর্তব্য পালন না করাই পাপ, এবং প্রকৃতির নিগ্রহ করাও পাপ বলিয়া জানিবে। মুনিঋষিগণ বা সিদ্ধযুক্তগণ কেহই স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান কালের সাধুগণের ন্যায় অস্বাভাবিক আচার গ্রহণ করেন নাই, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে; সিদ্ধমুক্তগণকে বর্তমান কালের ভেকধারী সাধুগণই সাধারণের নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিয়া থাকে। একারণ সিদ্ধমুক্তগণের আর স্বতন্ত্র গুপ্তস্থানে থাকিতে হয় না। কারণ সাধারণ লোকের মতভাবে থাকাতে তাহাদিগকে আর কেহ সাধু বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না, বরং সামান্য লোক মনে করিয়া নিজেদেরই মতন একজন মনে করিয়া লইয়া থাকে এবং এই ভাব অর্থাৎ নিজের মতন তাঁহাকে দেখে, ইহা সিদ্ধ মুক্তগণও ভালবাসেন; তবে অগ্নি বা সূর্য্য চিরদিন ভস্ম বা মেঘের দ্বারায় আচ্ছাদিত থাকে না সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সিদ্ধমুক্তগণও সাধারণভাবে থাকিলেও সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

বর্তমান কালের সাধুগণ, সিদ্ধমুক্তগণের পক্ষে মেঘ বা ভস্মস্বরূপ মনে করিবে। কারণ ইহারা সিদ্ধমুক্তগণকে গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রীপুত্র লইয়া বসবাস করিতে দেখিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে নানা প্রকার অকথা কুকথা বলিয়া সাধারণের সন্দেহ বর্দ্ধন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাদের না মন্ত্রসিদ্ধি আছে, না যোগসিদ্ধি আছে কোন সিদ্ধিই ইহাদের নাই। কারণ প্রথম হইতেই পরান্ন গ্রহণ, প্রতিগ্রহ এবং পরস্ত্রী দর্শনাদিতে ইহাদের জিহ্বা কর (হস্ত) মন, দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একারণ ইহাদের কোন সিদ্ধিই নাই, হইতেও পারে না, (কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে, জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীষু মনো দগ্ধং কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে।।) তবে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত না হইলেও বাহ্যিক ভেকের বেশ ধারণ যে নাই তাহা নহে। বাহ্যিক আচারবান বলিয়া সকলকেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাহ্যিক ভাবে তন্ত্র বা যোগ শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেকে দীক্ষা শিক্ষাও দিয়া থাকেন। ইহাদের পুঁজি তন্ত্র যোগ শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেকে দীক্ষা শিক্ষাও দিয়া থাকেন। ইহাদের পুঁজি তন্ত্র যোগ শাস্ত্র বা অপরাপর শাস্ত্র, কর্মকাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্ব ইঁহারা অবগত নহেন শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারায় বা ব্যাকরণের দ্বারায় অর্থ করিয়া কর্মকাণ্ডের নিকটে যাওয়া যে বিড়ম্বনা তাহা ইঁহারা ব্যবসার খাতিরে বুঝিয়াও বুঝেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"বঙ্গের সিদ্ধবংশ"

আমি তান্ত্রিক বংশে জন্মিয়াছি; যে বংশে জন্মিয়াছি, তাহা সিদ্ধবংশ বলিয়া অদ্যাপিও বঙ্গদেশে খ্যাত আছে। বঙ্গদেশে কয়েকটি ঘর মাত্র সিদ্ধবংশ বলিয়া এখনও লোক সমাজে অনেকে প্রায় জানেন। আগম বাগীশের বংশ ইহাও একটি সিদ্ধবংশ এবং গাং ফিরাণ ভট্টাচার্য্য বংশ ইহাও সিদ্ধবংশ। তাহার পর সর্ব্ববিদ্যার বংশ ইহাও সিদ্ধবংশ, তাহার পর অর্দ্ধকালীর বংশ, ইঁহারাও সিদ্ধবংশ। বঙ্গদেশে এই চারিটি তান্ত্রিকের প্রধান বংশই সিদ্ধবংশ। আমি এই চারিটি প্রধান বংশের মধ্যে একটি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি* তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে কি আছে তাহা আমি জানি। এ জানা আমার পুঁথি পাঠের দ্বারায় কেবল জানা নহে, আমি স্বয়ং কার্য্য করিয়া জানিয়াছি যে তন্ত্র শাস্ত্র বা যোগ শাস্ত্র বা যোগ শাস্ত্র মধ্যে যে সকল কার্য্যাদি লিখিত আছে তাহার বাহ্যিক অর্থে কোন কার্য্যই হয় না, বরং বিপরীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বংশ পরম্পরায় পুরুযানুক্রমে তন্ত্র শাস্ত্র মতে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আমাদের বংশে যিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতে আমি অষ্টম পুরুষ গণ্য। আমার পিতামহ তিনিও সাধক ছিলেন, তবে তিনি জড় পঞ্চমকারের সাধন করিতেন না। মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন ইহাকে পঞ্চমকার কহিয়া থাকে। (এই পঞ্চমকারের বিষয় আর্য্যমিশন হইতে প্রকাশিত "ধর্ম ও পূজাদি মীমাংসায়" বিশদরূপে বর্ণিত আছে তাহা দেখিও)। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাহ্যিক পঞ্চমকারকে ঘৃণিত বোধে পরিত্যাগ করিয়া নিজবংশে উহার সাধন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং আমার প্রপিতামহ হইতে কেহই বাহ্যিক জড় পঞ্চমকার দ্বারায় সাধনাদি করেন নাই। তবে আমাদের অপর জ্ঞাতিগণেরা এখন পঞ্চমকারের সাধন করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারায় কেবল তাঁহারা কুপ্রবৃত্তিই চরিতার্থ করিয়া, তাঁহাদের শিষ্যগণকেও সেই মার্গে লওয়াইয়া থাকেন, ফল গুরু শিষ্য উভয়েরই তুল্য।

আমার পিতা আত্ম ক্রিয়ান্বিত ছিলেন না কিন্তু পূজাদির সাধক ছিলেন। তিনিও নিত্য দিবারাত্রে আট দশ ঘণ্টাকাল করিয়া পূজা হোম এবং মধ্যে মধ্যে মন্ত্রচৈতন্য জন্য পুরশ্চরণ, বাহ্যিক, মদ্য রহিত পূর্ণভিষেক প্রভৃতি দ্বারা সাধন করিয়াছিলেন। পরে ক্রম দীক্ষা, ত্রিদীক্ষার কার্য্যাদিও করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তিনি কৃতকার্য্য হয়েন

নাই। আমার পিতা পৈত্রিক কোন শিষ্য বাটী যাইতেন না এবং কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। তিনি বলিতেন আমি কিছুই জানি না, এ কারণ শিষ্য করিতে কাহাকে প্রস্তুত নহি; তিনি সদ্ভাবে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারায় অর্থ উপার্জন করিতেন। তিনি রাত্রে তিনটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার পর হইতে পূজায় বসিতেন, বেলা ৯ নয়টার পর উঠিয়া বিষয় কর্ম দেখিতেন এবং রাত্রেও আপন মন্ত্র জপ সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। দর্শন শাস্ত্র স্মৃতি এবং তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, ইহা ব্যতীত তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ দখল ছিল। তিনি আমার জন্ম পত্রিকা নিজে করিয়া ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ ব্যবসা করিতেন না বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসা করিতেন না। তবে ছাত্রদের শাস্ত্রাদি পাঠ করাইতেন, বাড়ীতেই টোল ছিল, তাঁর নিকট ছাত্ররা শাস্ত্র পাঠ করিত। আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আমার পিতার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না, ইনি আমার পিতার খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমার পিতা ইহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন এবং তাঁহার কথামত সমস্ত কার্য্য করিতেন।

আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় নিজ ভূসম্পত্তির আয়ের দ্বারায় সাংসারিক ব্যয় সমস্ত চালাইতেন। আমাদের ভূসম্পত্তির আয়ও সকলের যথেষ্ট ছিল। আমার প্রপিতামহের বংশে কাহারও কোন অভাব ছিল না। আমাকে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করাইবার জন্য আমার জননীর বিশেষ আগ্রহ ছিল, দুঃখের বিষয় আমার সে আগ্রহ না থাকায় আমি বিদ্যা শিক্ষার জন্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে যাইতাম না। বলা বাহুল্য শাস্ত্র অভ্যাস করিবার জন্য আমার অপর স্থানে যাইবার আবশ্যক ছিল না। আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য আমার জননী আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইতেন। আমি সেখানে গিয়া, আমার জেঠাইমার নিকটে খানিক বসিয়া পলাইয়া আসিতাম, তাহাতে আমার জননী আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতেন। একদিন আমার জননী আমাকে প্রহার করিতেছেন এমন সময় আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আমাদের বাড়ীর ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের বাড়ীর সব আলাদা হইলেও বাড়ীর মধ্য দিয়া সব জ্ঞাতিদের বাড়ীতেই যাতায়াত করা যায়। আমার জেঠামহাশয়, আমার জননী আমাকে প্রহার করিতেছেন দেখিয়া, আমার জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সেজবৌমা কেন ওকে এত প্রহার করিতেছ? এর শাস্ত্র পাঠের আবশ্যক নাই, ও না পড়িয়া পণ্ডিত হইবে এবং সকল বিষয়ের মীমাংসকরূপে পরিগণিত হইবে এবং বহু লোকের পূজ্য হইবে, ওকে মারিও না, আমি উহার জন্মপত্রিকা নিজে করিয়াছি, ও মোক্ষ জ্ঞানলাভের সহিত উক্ত ফল সকল প্রাপ্ত হইবে। এমন সময় আমার পিতাও সেখানে উপস্থিত হইলেন, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আমার জননীকে উক্ত কথা বলিয়া,

আমার বাবাকেও বলিয়া দিলেন, তুমি বা সেজবৌমা তোমার পুত্রকে শাস্ত্র পাঠ না করার দরুণ পীড়ন করিও না। উহার দ্বারায় আমাদের বংশ উজ্জ্বল হইবে, আমার বয়স প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে আমি বোধ হয় ততদিন বাঁচিব না। তোমরা দেখিতে পাইবে, উহার ঠিকুজি কুষ্ঠির ফল যেরূপ আছে তাহাতে ও শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবে তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই জানিবে।

আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া অবধি আর আমার জননী আমাকে প্রহার করিতেন না। তাহার পর আমার উপনয়ন হইয়া যাইলে পর আমি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের নিকট পূজাদি শিক্ষা করিয়া বাড়ীতেই নিত্য পূজা, হোম ইত্যাদি করিতাম। এমন কি শ্মশানে যাইয়াও রাত্রে পূজাদি করিতাম। দুঃখের বিষয় তাহাতে বিফল মনোরথ হওয়ায়, আমি সমস্ত কথা জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে বলি। বলা বাহুল্য, আমার উপনয়নের পরই মন্ত্র দীক্ষাও হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আমার পূজাদি করার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন বাপু, বাহ্য পূজাদি বা বাহ্য জপাদি এবং মন্ত্র চৈতন্য হইবার যে সব উপায় শাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে তাহার দ্বারায় কিছুই ফল লাভ হয় না। যে সকল কার্য্য দ্বারায় সিদ্ধমুক্ত হওয়া যায়, তাহার আভাস মাত্র বোধহয় শাস্ত্রাদিতে আছে। সে আভাস সকলের বোধগম্য নহে, এই কারণে তন্ত্র শাস্ত্র বা যোগ শাস্ত্রের সর্বত্রেই গুরুপদেশ গম্য, গুরু মুখ হইতে না পাইলে কোন বিষয়ই কার্য্যকরী হইবে না। এইরূপ শাসন বাক্য সর্বত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা শাস্ত্রাদির অর্থ ব্যাকরণের সাহায্যে করিয়া সেই অর্থ মত কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার দ্বারায় কোন ফল লাভ হয় না, শাস্ত্র সকল অধিকাংশ আপ্ত বাক্য। আপ্ত বাক্যের অর্থ ব্যাকরণ সাহায্যে করিতে গেলে অধিকাংশ স্থলে, অর্থ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। বিশেষ কর্ম কাণ্ড, যে সকল স্থলে শাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে, তাহার সমস্তই অন্তর্মুখী অর্থ আছে। সে ভাব অবগত না হইয়া কার্য্য করিলে, মদ খাওয়াই সার হইয়া ঘৃণিত মাতাল হইতে হয়, অপর কিছুই লাভ হয় না। শ্মশানে গিয়া শব সাধন প্রভৃতি যাহা লিখিত আছে তাহারও গূঢ়ভাব আছে, আমরা যাহাকে শ্মশানে কহিয়া থাকি তাহা প্রকৃত শ্মশান নহে। আমরা যেখানে মৃত দেহ দাহ করিয়া থাকি তাহাকেই শ্মশান কহিয়া থাকি। বাস্তবিক ইহা শ্মশান নহে, মহাদেব ও শ্মশানবাসী ছিলেন না, তিনি কি ডোম বা মুর্দ্দফরাস ছিলেন? তাহা কখনোই নহে, দেবাদিদেব মহাদেব যে শ্মশানে বাস করিতেন সে স্থান স্বতন্ত্র তাহা সাধারণে অবগত নহে।

জীবের লয় স্থানই মহা শূন্য বা পর ব্যোম স্বরূপ মহাকাশ, দেবাদিদেব মহাদেব, সেই পরম ব্যোমস্বরূপ মহাকাশরূপ মহা শূন্যের ধ্যানে থাকায় তাঁহাকে শ্মশানবাসী কহা যায়; চিতা অগ্নির দ্বারায় জীবকে দাহ করা যায় না, আমরা যাহাকে সাধারণ

শ্মশান কহিয়া থাকি তথায় কেবল কাষ্ঠবৎ মৃত দেহই দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত শ্মশান নহে। প্রকৃত শ্মশানই শূন্য বা মহাশূন্যকে কহা যায়। আমাদের বংশে বা অপর সিদ্ধবংশে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ সিদ্ধ হন নাই, এমন কি শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না তাহাও আমরা শ্রুত আছি। তাঁহারা যে কার্য্যের দ্বারায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা বর্তমানে আমাদের বংশে এবং অপর সিদ্ধ বংশের মধ্যেও কেহ অবগত নহেন। সকলেই ভোগবিলাসিতায় আসক্ত হইয়া, সিদ্ধ বংশে জন্মিয়াছি এই অভিমানে ক্রমশঃ সাধনমার্গ হইতে চ্যুত হইয়া গুরুগিরি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হওয়ায় সকলেই বর্তমানে আর কেহ সাধনমার্গে; যায় না এবং প্রকৃত সাধনমার্গের পথও অবগত নহে, কেবল শিষ্য রক্ষার্থ বাহ্যিক আচারে গুরু সাজিয়া গুরুগিরি করিয়া থাকে মাত্র।

আমাদের বংশে বা অপর বংশে যাঁহারা সিদ্ধ ছিলেন তাঁহারা কেবল কার্য্য বলে সমস্ত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কার্য্যবলে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন আমরা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের জ্ঞাতিগণেরা এখন অনেকে বাহ্যিক আচার ব্যবহার দেখাইয়া এবং শাস্ত্রের রচনাদি আওড়াইয়া তান্ত্রিক মতে কার্য্যাদি করিয়া থাকেন এবং শিষ্যগণকে মন্ত্রাদি দীক্ষাও দিয়া থাকেন, ফল গুরু শিষ্যের উভয়েরই প্রায় তুল্য হইয়া থাকে। আমি একারণ কাহাকেও শিষ্য করিবার অভিলাষ রাখি না, তবে আমার পিতার মন্ত্রশিষ্য যাহারা, তাহাদের বাটিতে ক্বচিৎ কখন গিয়া থাকি নচেৎ অন্যত্রে কখন যাই না, ইহা তুমিও দেখিতেছ। আমার বিশ্বাস তুমি কিছু গুপ্ত কার্য্য পাইবে যাহা দ্বারায় তুমি আমাদের বংশের নাম উজ্জ্বল করিতে পারিবে এবং মোক্ষ জ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে, ইহা তোমার ঠিকুজির ফল। তোমার জন্ম পত্রিকা আমিই করিয়াছিলাম, সুতরাং সে বিশ্বাস আমার আছে। যাহা হউক যদি তুমি কোন গুপ্ত সাধনের বিষয় প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে আমি যদি তৎকাল পর্যন্ত জীবিত থাকি আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমার ইচ্ছা তাহা হইলে এই বিল্ব মূলে বসিয়া তোমার সহিত সাধন করিব। তুমি এক্ষণে যেরূপ মামুলি মন্ত্র জপ ও পূজাদি ও বাহ্য হোম করিতেছ তাহা ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত করিয়া চল, কিন্তু শ্মশানে যাইয়া বা কাহার কথায় বাহ্যিক পঞ্চমকারের (পঞ্চমকার মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন, ইহার সাধন ঘৃণিত) সাধন কদাচ করিও না। কারণ উহা অত্যন্ত ঘৃণিত ভাব এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট ইহা ভদ্রলোক মাত্রেরই পরিত্যজ্য। উহা মদ্য মাংস প্রিয় লোকে করিয়া থাকে, উহা সমস্তই ব্যভিচার পূর্ণ। তবে পঞ্চমকারের গূঢ় তাৎপর্য্য তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখের বিষয় তাহার উপদেষ্টার অভাব, যাঁহারা, তাহার উপদেষ্টা বলিয়া বাহ্যিক ভেক ধারণ করিয়া, তন্ত্র শাস্ত্রের ও যোগ শাস্ত্রের

জড় ভাবের হঠ যোগাদির উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কোন প্রকার হঠ যোগের কার্য্যাদি করিও না, কারণ তাহাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। তুমি অপেক্ষা করিয়া চল, সময় হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কথা মত তাহার পর হইতে আর শ্মশানে যাওয়া বা অপর কোন রকম বাহ্যিক কার্য্যে রত হইতাম না। আমি তন্ত্রোক্ত কার্য্য সকল নিজে করিয়া দেখিয়াছি এবং আমাদের জ্ঞাতিগণের মধ্যে অনেককেই করিতে দেখিয়াছি, সকলেই বাহ্যিক অর্থের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন এবং অপরাপর যে কয়েক ঘর সিদ্ধ বংশের কথা যাহা বলিয়াছি তাঁহাদেরও বংশধরগণ মামুলি বাহ্যিক অর্থের বশবর্তী হইয়া সমস্ত কার্য্যকলাপ করিয়া থাকেন। বর্তমানে সকলেই তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত, তবে বাহ্য আড়ম্বরের কাহারও ত্রুটি নাই। এমন কি মিথিলা প্রভৃতি স্থানের তান্ত্রিকগণকেও দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের তন্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ড করিতেও দেখিয়াছি এবং কি করিলে কার্য্যসিদ্ধ হয় তাহার বিষয়ও তাঁহাদের নিকট সমস্ত শুনিয়া করিয়া দেখিয়াছি, সবই ফাঁকা শব্দে গগণ মাতাইয়া থাকে, ফল বিষময়।

নবম পরিচ্ছেদ

"চতুর্ব্বিধ যোগ"

মন্ত্র দীক্ষাই বল, আর হঠ যোগই বল, আর রাজ যোগই বল, আর লয় যোগই বল, এই সকলের বহিরর্থ দেখিয়া কার্য করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা একেবারে নাই জানিবে। মন্ত্র যোগ, হঠ যোগ, রাজ যোগ, লয় যোগ, ইহা বহিরর্থে সবই পৃথক পৃথক বর্তমানের সাধুগণ যোগশাস্ত্র মতে বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা নহে, তবে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইলে সর্বত্রই পৃথক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে আমি বলিয়াছি শিবাদি প্রাণী মাত্রের শ্বাস রূপের নিশ্বাস অবস্থাই মন্ত্র পদবাচ্য; সাধারণতঃ লোকে শ্বাসপ্রশ্বাস, টানা ফেলা যাহা করিয়া থাকে তাহাকেই নিশ্বাস কহিয়া থাকে। ইহা অন্তর্লক্ষ্যের অর্থে তাহা নহে, অন্তর্লক্ষ্যের অর্থে নিশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস রহিত অবস্থাই নিশ্বাস পদবাচ্য। নি—শব্দে অভাব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে অবস্থায় শ্বাসের টানা ফেলা স্বতঃ বন্ধ থাকে তাহাকে নিশ্বাস কহা যায় অর্থাৎ প্রাণ কর্মের স্থির অবস্থাকে নিশ্বাস কহা যায়—এই প্রাণ কর্মের স্বতঃস্থির অবস্থাই মন্ত্র পদবাচ্য। হ্রীং ক্রিং দৃঃ ক্লিং হৌং ইত্যাদিকেই বীজ মন্ত্র বলিয়া যাহা তন্ত্রে প্রকাশ আছে, এই সকল মন্ত্র যদি কেহ শতবর্ষকাল ধরিয়া জপ করে এবং সহস্র বা লক্ষ মন্ত্র জপ নিত্য করে তাহা হইলেও কাহার মন্ত্র সিদ্ধি বা মন্ত্র চৈতন্য হইবে না। কারণ এই সকল বীজগুলি প্রকৃত মন্ত্র নহে, ইহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া কার্য্য করিতে হয়। যেমত অঙ্ক শাস্ত্রে যোগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদির সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীজস্বরূপ চিহ্ন দৃষ্টে কোথায় কি রকম স্থির প্রাণরূপ নিশ্বাসের কার্য্য করিতে হইবে ঐ সকল বীজে ইহার ইঙ্গিত ভাব রহিয়াছে, উহা কেবল মুখে জপ করিলে কোন কার্য্যকরী হয় না। এই কারণে বীজ মন্ত্র মাত্র জপের দ্বারায় কাহার কিছু হয় না। এক্ষণে মন্ত্র কি তাহা তোমাকে বলিলাম। স্থির প্রাণরূপ নিশ্বাসই একমাত্র মন্ত্র বলিয়া জানিবে এবং ইহাকেই মন্ত্র যোগ জানিবে। মন্ত্র যোগ নিকৃষ্ট নহে, যাঁহারা মন্ত্রার্থ প্রকৃত অবগত নহেন তাঁহারাই মন্ত্র যোগকে নিকৃষ্ট কহিয়া থাকেন। সাধারণতঃ প্রায় সকলকেই পূর্বোক্ত বীজ সকলকেই মন্ত্র বলিয়া জানা থাকায় এবং উক্ত বীজ সকল জপের দ্বারায় কৃতকার্য্য না হওয়ায় মন্ত্র যোগকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। মূলে তাঁহাদের নিজের বুদ্ধি বিবেচনার দোষ রহিয়াছে তাহা না দেখিয়া অযথা আপন আপন সংগ্রহ

পুস্তকে মন্ত্র যোগের দোষ কীর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করিবে।

এইবার তোমাদিগকে হঠ যোগের কথা বলিব। হঠ যোগের দ্বারাই পুর্বোক্ত মন্ত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। তবে মন্ত্র যোগের ন্যায় বহিরর্থে হঠ যোগের অর্থ বর্তমানের চঞ্চল প্রাণের ও চঞ্চল মনের, স্থির প্রাণের সহিত মিলন করার নামই হঠ যোগ বলিয়া জানিবে; ইহা তোমাদের অবগতির জন্য বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ, হ—শব্দের অর্থ সূর্য্য, ঠ—শব্দের অর্থ চন্দ্র; যোগ শব্দের অর্থও বলিয়াছি, যোগ শব্দের অর্থ মিলন, অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ পরমাত্মার চঞ্চল প্রাণরূপ জীবাত্মার মিলন হইলে পৃথকত্ব ভাব আর থাকে না। সুতরাং যোগ অর্থে মিলন বা স্থির প্রাণরূপ পরমাত্ম ভাব কহিতেছি। সূর্য্য ও চন্দ্রের মিলন করার নামই হঠ যোগ। সূর্য্য আদিত্যকে কহা যায়, আদিত্য প্রাণের উপাধি বিশেষ প্রাণকেই কহা যায়। দক্ষিণ নাসিকায় যে বায়ু বহন করিয়া থাকে তাহাকে সূর্য্য কহে এবং বাম নাসিকা দিয়া যে বায়ু বহন করিয়া থাকে তাহাকে চন্দ্র কহা যায়। চন্দ্র মনকে কহা যায়, দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়িস্থিত সূর্য্যরূপ প্রাণ এবং বামে ঈড়া নাড়িস্থিত বায়ুরূপী চন্দ্র—এই চন্দ্র সূর্য্যের মিলন করারূপ অবস্থাই হঠ যোগ। হঠ যোগ আর মন্ত্র যোগে কোন প্রভেদ নাই এবং হঠ যোগ আর রাজ যোগে কোন প্রভেদ নাই। কারণ বাম ও দক্ষিণ নাসিকাস্থিত বায়ুর গতি যখন থাকে না অর্থাৎ যখন প্রাণবায়ু বিনা অবরোধে স্বতঃস্থির থাকে তখনই চন্দ্র সূর্য্যের বা মন প্রাণের যোগরূপ মিলন হয়। যারা এই যোগরূপ মিলন অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাকে কর্ম যোগও কহা যায়। কর্ম যোগ কর্ম যাহা করা যায় তাহাই কর্মপদবাচ্য, অর্থাৎ প্রাণকর্ম যাহা স্বতঃ আপনা আপনি চলাচলরূপ কর্ম হইতেছে তাহাই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম। এই প্রাণকর্মরূপ আত্মকর্ম্মের সম্বর্দ্ধন ক্রিয়ার দ্বারায় (গুরুপদেশগম্য কার্য্যে দ্বারা) চঞ্চল প্রাণের উল্‌টো গতি করিয়া প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ ঐ স্থির স্বরূপ (স্থিরপ্রাণরূপ) পরমাত্মার সহিত মিলন করা যায় বলিয়া ইহাকে কর্ম যোগ বা হঠ যোগও বলা যাইতে পারে।

এই হঠ যোগ বা কর্ম যোগই রাজ যোগ পদবাচ্য। কারণ কর্ম যোগের অভ্যাসের দ্বারা (অর্থাৎ প্রাণকর্মের সম্বর্ধন ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারায়) প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণরূপ পরমাত্মভাব প্রকাশ বা দীপ্তি পাইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে রাজ যোগ বলা যায়। রাজ শব্দের অর্থ প্রকাশ বা দীপ্তি পাওয়া। তাহার পর এই প্রাণকে চঞ্চল প্রাণের অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণ পরমাত্ম ভাবের দীপ্তি বা প্রকাশ অবস্থায় স্থিতি করিবার অভ্যাসকেও রাজ যোগ কহা যাইতে পারে। প্রাণ কর্মরূপ আত্মক্রিয়া ব্যতীত ইহা কাহার লাভ হইতে পারে না ইহা নিশ্চয় জানিবে। তাহার পর লয় যোগের কথা বলিব।

চঞ্চল প্রাণের লয় স্থানই চঞ্চল প্রাণের অতীতাবস্থারূপ স্থিরপ্রাণরূপ পরমাত্ম ভাব, এই আত্ম কর্মের সম্বর্ধন ক্রিয়ার দ্বারায় সাধকের চঞ্চল প্রাণের লয় স্থান অনুভব হয়, ঐ লয় স্থানে স্থিতি করিবার যে অভ্যাসরূপ কৌশল তাহাই লয়—যোগ পদবাচ্য, (ইহা গুরুপদেশগম্য)।

যে সকল কথাযোগ সম্বন্ধে বলিলাম ইহা অত্যন্ত গুহ্য বিষয়, ইহার অভ্যাস নিজে আপন ইচ্ছামত করিতে যাওয়া চাহি না। যিনি আত্মকর্ম করিয়া আত্মকর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করা কর্তব্য, নচেৎ পদে পদে বিঘ্ন হওয়া অসম্ভব নহে। যাঁহার নিকট হইতে উক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করা কর্তব্য। উক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই যথার্থ গুরুপদ বাচ্য অপরে নহেন। এইরূপ গুরুর বাক্য মত, গুরু আজ্ঞামত বিধিপূর্বক কার্য্য করিলে সমস্তই প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে, নচেৎ নহে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস বিহীন লোকের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না জানিবে, অতএব গুরুবাক্যে সন্দেহ না করিয়া গুরুবাক্য অনুযায়ী বিধিপূর্বক কর্ম করা সকলেরই কর্তব্য; পূর্বোক্ত মন্ত্র যোগের দীক্ষা যিনি শিষ্যকে অনুভব করাইয়া উপদেশ দেন, তাঁহারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানিবে, ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রেও অনেক স্থলে লিখিত আছে, তোমাদের অবগতির জন্য তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর।

দীক্ষা গুরু হন কৃষ্ণ জগতের স্বামী।
শিক্ষা গুরু শ্রীরাধিকা করিবে বাখানি।।
গুরুরূপ আচার্য্য হইয়া কৃপা করে কৃষ্ণ।
অতএব ভক্তগণ তাহাতে সন্তুষ্ট।।
গুরু কৃপারূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে।।
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈতন্য রূপে।
তে কারণে শিক্ষাগুরু মোহন্ত স্বরূপে।।
শিক্ষা গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামি ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ।।
স্বভাব (আত্মভাব) অন্তর জানি অর্ন্তয্যামি নাম।
মূলাধার আধার হয় যার জ্ঞান।।
গৌরাঙ্গ শিক্ষা গুরু দেখাইতে পারে।
ভগবত কৃষ্ণভক্ত জনারে কহিবে।।

শিক্ষা গুরু রাধিকা, পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়া তার পর গৌরাঙ্গকেও শিক্ষা গুরু

বলা হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য, যিনি আপনাকে রাধা ভাবে রাখিয়া ঐ রাধা ভাবে বা গোপী ভাবে পূর্বোক্ত ভাবের মন্ত্র যোগের সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাকে রাধার তুল্য বোধে শিক্ষা গুরু কহা যায়। একারণ গৌরাঙ্গকে শিক্ষা গুরু বলা হইয়াছে। গুরুও পূর্বোক্ত অবস্থাপন্ন হওয়া চাই, নচেৎ একটা বীজ মন্ত্র কাণে কাণে বলিয়া দিলেই গুরু হওয়া যায় না।

যাহা হউক স্বপ্নের কথার প্রসঙ্গে আমায় যোগ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিতে হইল, এক্ষণে ভোর হইয়া আসিল বাহিরে যাই। এমন সময় আমাদের ঘরের ঘড়িতে টং টং টং, টং টং টং, করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল; মা আমার বাবাকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন, অদ্য খোকার স্বপ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি যাহা বলিলেন, এই সকল কথা আমি কোথাও শ্রবণ করি নাই এবং মন্ত্র সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহাতেও আমার অনেক ভ্রম দূরীভূত হইল। আমার স্ত্রীবুদ্ধি বশতঃ গুরু যে বীজকে মন্ত্র বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকেই মন্ত্র বলিয়া জানিতাম। উহার প্রকৃত তত্ত্ব না জানা থাকায় এ পর্য্যন্ত উহা জপ করিয়া কিছুই শান্তিলাভ করি নাই, কেবল পাখীর ন্যায় জপ করিতাম। এক্ষণে আপনার নিকট হইতে প্রকৃত মন্ত্রের রহস্য অবগত হইয়া আমার ভ্রম দূর হইল, ইহা বলিয়া মা বাবাকে প্রণাম করিলেন, মা'র দেখাদেখি আমিও পুনরায় বাবাকে প্রণাম করিলাম। তাহার পরই বাবা অন্দর মহল হইতে বাহির বাটীতে চলিয়া গলেন। আমিও মা'র সঙ্গে নীচে আসিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে মঞ্জন দ্বারায় দন্ত মার্জ্জন সমাপন করিয়া উপরে আসিয়া রাত্র বাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমার পাঠের পুস্তকাদি লইয়া পাঠাভ্যাস করিবার জন্য বাহির বাটীতে আসিয়া আমার পাঠের গৃহে পুস্তকাদি রাখিতেছি এমন সময় আমার শিক্ষক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে তাঁহার অগ্রে আসিতে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর তিনি আমাকে অদ্য বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তকের পাঠ দিতে হইবে, সে সকল বিষয় আমাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার কথা মত সমস্ত বিষয় অভ্যাস করিতে লাগিলাম, আমার সকল বিষয়গুলি বেশ অভ্যাস হইলে আমি আমার শিক্ষক মহাশয়কে বলিলাম, পণ্ডিত মহাশয় আমার সব অভ্যাস হইয়াছে।

তাহার পর তিনি পুস্তক দেখিয়া আমাকে আমার পাঠের বিষয়গুলি মৌখিক সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি তাহার যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলাম তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন বেশ হইয়াছে। ইহা বলিয়া, পুনরায় বলিলেন খোকা, আমি তোমাকে তোমার সাহিত্য পুস্তকগুলি যেরূপ ভাবে অর্থাদি বুঝাইয়া দিয়াছি তুমি আমাকে ঠিকভাবে বুঝাইয়া বল। মনে কর আমি যেন তোমার নিকট হইতে পাঠ অভ্যাস করিতেছি। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার সাহিত্য পুস্তকের

পাঠ্যগুলিও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলাতে তিনি আমাকে বলিলেন বেশ হইয়াছে, ইহা মনে রাখিও ভুলিও না। বিদ্যালয়ে গিয়া তথাকার শিক্ষক মহাশয়কেও এইরূপ ভাবে যেমত আমাকে সকল পাঠ্য বিষয়ের উত্তর করিলে, তদ্রূপভাবে বলিবে। অদ্য স্নান আহার করিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে যাও। বেলাও নয়টা প্রায় বাজে, আমিও আমার বাড়ীতে যাই, আবার সন্ধ্যার পূর্বে আসিব। ইহা শুনিবামাত্র আমি আমার পাঠ্য পুস্তকগুলি লইয়া আমার শিক্ষক মহাশয়ের সহিত গৃহের বাহিরে আসিয়াই দেখি বাবা আমার পাঠের গৃহের দিকে আসিতেছেন। আমাকে সম্মুখে দেখিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা, তোমার অদ্যকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলি সব ঠিক অভ্যাস হইয়াছে কি? আমি বাবার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই আমার শিক্ষক মহাশয় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, খোকার অদ্যকার পাঠ অভ্যাস অতি সুন্দররূপ হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়ের কথা শেষ হইলেই, আমি বাবাকে বলিলাম, বাবা, আমার অদ্যকার যাহা যাহা পাঠ্য ছিল তাহা আমি সমস্ত পাঠ করিয়া তাহার অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি এবং যাহা মুখস্থ বলিবার ছিল তাহাও মুখস্থ করিয়াছি, আমার সে সমস্ত বেশ মনে আছে আর ভুলিব না।

ইহা শুনিয়া বাবা বলিলেন, তবে বাড়ীর মধ্যে গিয়া স্নানাহার শেষ করিয়া আমার কাছে আসিও, আমি তোমাকে লোক দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিব। আমি ইহা শুনিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিলাম, আমার শিক্ষক মহাশয়ও আপন বাড়ীতে চলিয়া যাইলেন। আমি খোকা ভাবের বশীভূত হইয়া হেলিতে দুলিতে বাড়ীর ভিতর যাইতে লাগিলাম। বাড়ীর ভিতরে আসিয়া পৌঁছিয়াই মা মা শব্দে আনন্দে আধ আধ হাস্যের সহিত মা'কে ডাকিতে ডাকিতে, উপরে যাইতেছি। এমন সময় মা আমার ডাক শুনিয়া উপর হইতে আমার সামনে আসিয়া বলিলেন, এই যে বাবা খোকা আমি আসিয়াছি, আমাকে ডাকিতেছ কেন? আমি মা'কে দেখিয়াই, মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া আদুরে কথার ভাবে বলিলাম মা, আমার সব পড়া হইয়াছে। আজ আমার পড়া সব ভাল হওয়ায় মনেতে খুব আনন্দও হইয়াছে, সেই আনন্দের জন্য এবং তোমাকে তাহা বলিবার জন্য আনন্দভাবে মা মা করিয়া ডাকিতেছি, নচেৎ অপর কিছুই নহে। বাবা আমাকে স্নান আহার করিয়া বাহিরে যাইতে বলিয়াছেন, তাহার পর তিনি আমাকে লোক দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। তাই মা তোমাকে ডাকিতেছি, আমাকে শীঘ্র স্নান করাইয়া দাও এবং স্নানের পরই আমাকে ভাত দাও।

মা বলিলেন, অদ্য তুমি বিদ্যালয়ে যাইবে শুনিয়া তোমার জন্য ভাত ব্যঞ্জন সকাল হইতেই সব প্রস্তুত আছে। আমিই তোমার জন্য ভাত ব্যঞ্জন করিতে গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার পিসিমা আমাকে রন্ধন করিতে না দিয়া তিনি নিজেই তোমার জন্য সব প্রস্তুত করিয়াছেন। উপরে গিয়া তোমার পড়িবার পুস্তকাদি রাখিয়া

আইস, তাহার পর তোমাকে স্নান করাইয়া দিব। ইহা বলায়, আমি উপরে আমাদের গৃহে যাইলাম, মা নীচে যাইলেন। আমি ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িবার পুস্তকগুলি যথাস্থানে রাখিয়া, তাহার পর গায়ের জামা খুলিয়া নীচে আসিলাম। নীচে আসিবা মাত্র, মা আমাকে তৈল মাখাইয়া দিতে লাগিলেন। তৈল মাখানো সমাপন হইলে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। স্নানের পর গাত্র মুছাইয়া দিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া রান্না ঘরে আসিয়া আমার পিসিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —ঠাকুর ঝি, খোকার স্নান হইয়া গিয়াছে, খোকাকে ভাত দাও। আমিও পিসিমাকে বলিলাম,—পিসিমা আমায় শীঘ্র ভাত দিন, আমি স্কুলে পড়িতে যাইব, বেলা হইয়াছে। আমার কথায় পিসিমা বলিলেন,—বাবা আমি তোমার জন্য ভাত তরকারী বাড়িয়া (প্রস্তুত করিয়া) রাখিয়াছি, বাবা তুমি খাইতে বইস। খাইবার জায়গাও পিসিমা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে ভাত দিলেন, বলা বাহুল্য, পিসিমা আমাকে তাঁর পুত্র অপেক্ষাও ভালবাসেন। আমি বাড়ীতে পিসিমার নিকট হইতে যথেষ্ট আদর পাইয়া থাকি, এমন কি হঠাৎ কোন দোষ করিলেও আমাকে মা ও বাবা, পিসিমার ভয়ে কেহ কিছু বলেন না।

যাহা হউক, আমি ভাত খাইতে আরম্ভ করিলাম। মা ও পিসিমা আমার সামনে বসিয়া আমার খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। আমার খাওয়া দেখিবার উদ্দেশ্য, আমি যাহাতে অল্পমাত্র খাইয়া উঠিয়া না যাই। যাহা হউক আমি আমার উপযুক্ত আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। তাহার পর হাত মুখ ধুইয়া, মা'র সহিত আমাদের উপরের ঘরের ভিতরে আসিলে, মা আমাকে ভাল কাপড় জামা পরাইয়া দিয়া বলিলেন, এইবারে তোমার পুস্তকাদি লইয়া তোমার পিতার নিকটে যাও, তিনি তোমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। আমি আবার তোমার জন্য মধ্যাহ্নকালের জল খাবার লোক দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিব। বিদ্যালয়ে কোন বালকের সহিত ঝগড়া করিও না এবং যদি কোন বালকে তোমার সহিত কোন রকম অনর্থক ঝগড়া করে, তাহা হইলে তুমি নিজে কিছু না বলিয়া তোমার স্কুল কাকাকে বলিয়া দিও। তাহার পর আমি মা'কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উপর হইতে বাহির বাটীতে বাবার নিকটে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলাম। খানিক পরেই বাবা আমাদের বাড়ীর গোমস্তা, সরকার দাদাকে ডাকিতে একজন লোককে বলিলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের বাড়ীর গোমস্তাকে আমি ছেলেবেলা হইতে সরকার দাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকি। খানিক পরেই সরকার দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরকার দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, বাবা তাহাকে বলিলেন, সরকার মহাশয়, আপনি খোকাকে লইয়া স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুন এবং আমার ভায়ার জিম্মা করিয়া দিয়া আসিবেন এবং তাঁহাকে ইহাও বলিয়া আসিবেন, খোকাকে যেন একলা ছাড়িয়া না

দেন, মধ্যাহ্নে যে লোক জলখাবার লইয়া যাইবে, সেই লোক তথায় থাকিবে তাহার সহিত যেন খোকাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন।

সরকার দাদা ইহা শুনিয়া, আমার বাবাকে নমস্কার করিয়া আমাকে বলিলেন,—এস খোকাদাদা। আমি তোমাকে স্কুল পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। ইহা শুনিয়া আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া, সরকার দাদার হাত ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে নীচে আসিলাম। নীচে আসিবামাত্র আমাদের দ্বারবান আমার হস্ত হইতে পুস্তকাদি লইয়া সেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমি সরকার দাদার হস্ত ধারণ করিয়াই চলিতে লাগিলাম। বিদ্যালয়কে যে স্কুল বলে তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না, তাহা অদ্য বাবা ও মা'র নিকট শুনিয়া জানিয়াছি যে বিদ্যালয়কে স্কুল কহে। যাহা হউক, আমি সরকার দাদার হাত ধরিয়া রাস্তার পার্শ্বদিক দিয়া যাইতে লাগিলাম। অদ্য রাস্তায় খুব ভিড় বোধ হইতে লাগিল, পূর্বদিনে মধ্যাহ্নকালে গিয়াছিলাম সেই কারণে তত' লোকের ভিড় ছিল না। অন্য অনেক লোকই যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে অনেক খোকারাও পুস্তক বগলে করিয়া আপন আপন ভাবে মগ্ন হইয়া যাইতেছে, আবার দু'চারজন খোকা একত্রে মিলিয়া পরস্পরে নানা রকমের কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে। আমি সরকার দাদার হাত ধরিয়াই যাইতেছি এবং মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক নজর দিতেছি। এইরূপ যাইতে যাইতে খানিক পরেই আমরা স্কুল বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সরকার দাদা আমাকে বলিলেন, খোকাদাদা, এইবারে আমরা স্কুল আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি তদুত্তরে বলিলাম, হাঁ, সরকার দাদা আমি জানি এই স্কুল, আমি গতকল্য বাবার সহিত আসিয়া স্কুলবাড়ী চিনিয়া গিয়াছি।

তাহার পর সরকার দাদা আমাকে আমার স্কুল কাকার নিকটে লইয়া গিয়া, আমার বাবা যাহা যাহা স্কুল কাকাকে বলিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, সরকার দাদা তৎসমুদয় বলিলে পর, স্কুল কাকা সরকার দাদাকে বলিলেন, আপনি এখন যান, আমি সব তাঁর কথামত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। বাড়ী গিয়া এই কথা তাঁহাকে বলুন, তাহার পর সরকার দাদা আমাকে স্কুল কাকার নিকটে রাখিয়া এবং আমাদের দ্বারবানকে আমার নিকটে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বারবানকে বলিয়া গেলেন, তুমি স্কুল বসিলে খোকা দাদাকে পুস্তক দিয়া বাড়ী যাইও। ইহাতে আমার স্কুল কাকা বলিলেন, দ্বারবানের আর থাকিবার দরকার কি, ও এখন যাইতে পারে। এর পর স্কুল বন্ধের পূর্বে একবার আসিয়া খোকাকে লইয়া যাইবে, ইহা বলায় দরবান (দ্বারবান) আমাকে আমার পুস্তকগুলি দিয়া সরকার দাদার সঙ্গে চলিয়া গেল। উহারা সকলে চলিয়া গেলে, আমার স্কুল কাকা আমাকে তাঁর নিকটে বসাইয়া রাখিলেন।

আমি তাঁর নিকটে বসিয়া আছি বটে, কিন্তু আমার কেমন এটা ভয়ের সঞ্চার আসিয়া মনের মধ্যে একটা যেন ভয়ানক গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। আমার

মনের এ গোলমালের একমাত্র কারণ, আমার একা অজানা জায়গায় আসার দরুণ। মনে মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে ইহাতে আমার মনে ভাবনার উদয় হইয়া ক্রমশঃ যেন আমাকে শঙ্কিত ও জড়সড় ভাবে থাকিতে হইতেছে। তবে মধ্যে মধ্যে আমার স্কুল কাকাকে দেখিয়া সে ভাবও কতক যাইতেছে। বলা বাহুল্য, এখানে আমার এক স্কুল কাকা ব্যতীত অপর কেহই পরিচিত নাই, স্কুল কাকার ভরসায় মধ্যে মধ্যে বেশ মনের জোরও হইতেছে। এমন সময় স্কুলের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ক্রমান্বয়ে দশটা বাজাইয়া তাহার পর কতকগুলো আবার উহার সঙ্গে ঢং ঢং করিয়া বাজাইয়া দিল। দশটা বাজিবার পর কতকগুলা ঘড়ির শব্দ কেন হইল ইহা স্কুল কাকাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, সাড়ে দশটা বাজিল এইবার স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। তাহার পরই স্কুল কাকা আমাকে বলিলেন, খোকা তুমি আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তুমি যে শ্রেণীতে পাঠ করিবে তথায় বসাইয়া দিয়া আসি। আমি স্কুল কাকার এই কথা শুনিবামাত্র আমার পুস্তকাদি লইয়া স্কুল কাকার হাত ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে লইয়া যে গৃহে আমি পাঠ করিব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয়কে বলিলেন, এই বালকটি আমার সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র, গতকল্য আপনার এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয় আমার স্কুল কাকার কথা শুনিয়া বলিলেন, হাঁ, আমি তাহা জানি। আপনাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না, আমি সব ঠিক করিয়া লইব এবং যাহাতে উহার কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয় তাহাও লক্ষ্য রাখিব। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন খোকা তুমি এইখানে বসিয়া পুস্তকাদি পাঠ কর। আমি আবার সময়ে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব। ইহা বলিয়া আমার স্কুল কাকা তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

স্কুলের শিক্ষক মহাশয় আমাকে বলিলেন, এক্ষণে প্রথম ঘণ্টা। এই প্রথম ঘণ্টার প্রথমে বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ হইবে। অতএব তুমি পুস্তক পাঠ বাহির করিয়া অপর বালকেরা যাহা পাঠ করিবে তাহা শ্রবণ কর এবং তোমাকেও অদ্যকার পাঠ দিতে হইবে। আমি তাহা শুনিয়া আমার পুস্তক বাহির করিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, আমি অদ্য সকলের নিম্নভাগেই বসিয়াছি, আমার উপর ভাগে অপর খোকা বসিয়াছে। আমার ঠিক পার্শ্বের খোকারা আপন আপন পুস্তক সম্মুখে মাত্র রাখিয়াছে। দুঃখের বিষয় তাহারা আপন আপন খোকা ভাবের নানা গল্প করিতেছে তাহার মধ্যে অশ্লীল কথাও ব্যবহার করিতেছে। আমাকে নূতন বোধে তাহারা আমাকে সঙ্গী করিবার অভিপ্রায়ে আমার পার্শ্বের একজন খোকা আমাকে জিজ্ঞাস করিল ভাই তোমার নাম কি? আমি তদুত্তরে বলিলাম, ভাই আমার নাম খোকা। ইহা শুনিয়া সেই খোকাটি তাহার পার্শ্বের একজন খোকাকে বলিল, ভাই এর নাম খোকা। তাহার পর ঠাট্টার

ছলে আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তুমি কি এখন ঝিনুকে করিয়া দুধ খাও। আমি তদুত্তরে তাহাকে বলিলাম, না ভাই ঝিনুকে করিয়া দুখ খাইব কেন। ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইলেই কি খোকা হয়, আর বাটিতে করিয়া দুধ খাইলে কি খোকা হয় না। তাহা নহে, বাটিতে করিয়া দুগ্ধ পান করুক আর ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ পান করুক উভয়ই তুল্য, পার্থক্য কেবল ভাই ওজনে। যে যত ওজনের বড় হয় তার তত' খোকা ভাব অসৎ ভাবে পরিণত হইয়া মনে একভাব থাকে মুখে অপর ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ভাই তুমিও খোকা, তবে তুমি আর তোমাকে খোকা বলিয়া মনে না করিয়া নিজেকে মানুষ হইয়াছি বলিয়া মনে করিয়া থাক, যদি তুমি তাহা মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার তাহা বাতুলতা মাত্র।

আর যদি তুমি নিজেকে মানুষ বলিয়া মনে না করিয়া নিজেকে বালক মনে কর, তাহা হইলে সে বালক সকলেই। কারণ বালক শব্দের অর্থ অজ্ঞ, যাহার হিতাহিত বোধ থাকে না তাহাতে অজ্ঞানীও বলা যায়, অর্থাৎ যাহার কোন জ্ঞান নাই তাহাকেই অজ্ঞ কহা যায়। তাহা হইলে বালকে আর খোকাতে প্রভেদ কি রহিল। তবে খোকা শব্দটা দেশীয় বুলি, আর বালক শব্দটা সংস্কৃত বুলি, জ্ঞানহীনতা দোষ উভয়েই রহিয়াছে, সুতরাং উভয়ই তুল্য। যে জীব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অথচ সর্বদা ইচ্ছার বশীভূত এবং স্বার্থপর, আমি তাহাকেই খোকা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। একারণ আমি আমাকে খোকা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি এবং আমাকে বাল্যকাল হইতে সকলে খোকা বলিয়া ডাকিয়া থাকে। একারণ আমি জানি আমার নাম খোকা। বাস্তবিক আমি খোকা কিনা তাহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কারণ আমি আমাকে বিশদরূপে জানি না, সুতরাং এভাবেও আমি আমাকে খোকা বলিতে পারি। যে পর্য্যন্ত আমার আমিকে জানিবার জন্য ব্যাকুল ভাব না আসিবে ততকাল আমার এই খোকাত্ব ভাব দূরীভূত হইবে না এবং ততকালই আমি ওজনে বড় হইলেও যে খোকা সেই খোকাই থাকিব।

আমার পার্শ্বের খোকাটি, আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তাহার পার্শ্বের খোকাকে বলিল, ভাই, এ খোকাটা বড় পাকা খোকা, এ বড় পাকা পাকা সব কথা বলিতেছে, কি কতকগুলো কথা সব ব'ল্লে, আমি সব বুঝিতে পারিলাম না। তবে মোটের উপর এই বুঝিলাম, ও তো খোকা, ও আমাদের সকলকে খোকা বলিতেছে। ওর কথায় কেন আমরা কোকা হব, আমরা এখন বড় হইয়াছি; আমরাও কি ভাই এখন আর খোকা আছি। এক্ষণে ত' আমরা আমাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি, আমাদের পক্ষে খোকা কথাটা গালাগালি বা উপহাসজনক। আমাকে ও যখন খোকা বলিয়া ঠাট্টা করিতেছে তখন আমি ছ্যারকে (স্যার শব্দ মুখে ভাল রকম উচ্চারণ না হওয়ায়, ছ্যার বলিতেছে) বলিয়া দিব। ইহা বলিয়াই আপন আসন হইতে উঠিয়া শিক্ষক মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল ছ্যার, আমাকে খোকা বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে।

শিক্ষক মহাশয়কে স্যার বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না। স্যার শব্দটা ইংরাজী শব্দ। যদিও আমি স্যার শব্দের অর্থ জানি তাহা হইলেও ইহা হইলেও ইহা শিক্ষককে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক ঐ খোকাটির বাক্য শুনিয়া স্যার বলিলেন, কে তোমাকে খোকা বলিতেছে? স্যার এই পাকা খোকাটা আমাকে খোকা বলিতেছে, এই ত' তুমিই উহাকে আমার সামনে খোকা বলিয়া সম্বোধন করিলে? না, স্যার ওর নামই যে খোকা, সুতরাং উহাকে খোকা না বলিয়া আর কি বলিব। আমার নামত' আর খোকা নহে, ও কেন স্যার আমাকে খোকা বলিবে। আপনি যদি কিছু না বলেন উহাকে, তাহা হইলে ও আমাকে রোজই খোকা বলিয়া ঠাট্টা করিবে। তদুত্তরে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ দেখি না। ঐ ত' স্যার আপনিও যদি আমাকে খোকা বলেন তাহা হইলে ত' সকলেই আমাকে খোকা বলিয়া ঠাট্টা করিবে। না স্যার তাহা আমি কদাচ সহ্য করিতে পারিব না এবং তাহাকে আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইবে। কারণ আমি ত' আর এখন খোকা নহি; আপনি উহাকে শাসন করিয়া দিন ও যেন আমাকে খোকা বলিয়া না ডাকে।

শিক্ষক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হে বাপু, তুমি কি মোহিনীরঞ্জনকে খোকা বলিয়াছ? আমি তদুত্তরে বলিলাম না স্যার, আমি উহাকে কেন খোকা বলিব, আমার উহাকে খোকা বলিবার কোন কারণ নাই। তবে ও আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি উহাকে বলিলাম, আমার নাম খোকা, আমার নাম খোকা শুনিয়া ও আমাকে বিদ্রূপ ভাবে ঠাট্টা করিয়া বলিল, তুমি কি এখন ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া থাক। এই কথার উত্তরে আমি উহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তৎসমুদয় আমি আমার শিক্ষক মহাশয়কে বলিলাম। শিক্ষক মহাশয় আমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মোহিনী আখ্যাধারী খোকাকে বলিলেন, দেখ মোহিনী খোকা যাহা বলিয়াছে, তাহাকে আমি উহার কোন বিশেষ দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। কারণ প্রথমে উহার নাম যখন খোকা ইহা শুনিয়াও উহাকে রহস্য ভাবে ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ পান কর, না বলিলে, সম্ভবতঃ খোকা এত কথা বলিত না। তুমিই প্রথমে গণ্ডগোল পাকাইয়াছ, ও যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা যথার্থ কথাই বলিয়াছে, তুমি নিজে কেন মানিয়া লইতেছ যে আমাকে খোকা বলিয়াছে। ও তোমাকে তোমার নাম করিয়া খোকা বলে নাই, তুমি নিজে তাহা মানিয়া লইয়া উহাকে দোষী করিতেছ।

যাহা হউক, খোকা তুমি মোহিনীকে খোকা বলিও না। না স্যার, আমি উহাকে খোক বলি নাই। তবে ও নিজের নাম মোহিনীরঞ্জন জানিয়া অহঙ্কারের সহিত আমার নাম খোকা শুনিয়া আমাকে পূর্বোক্ত কথা বলিয়া বিদ্রূপ ভাবে ঠাট্টা করিয়াছিল। ও নিজের নামেরই অর্থ জানে না তাহা জানিলে উহার অহঙ্কার ভাব থাকিত না। উহার

যখন আমার নাম ভাল এই বোধে অহঙ্কার রহিয়াছে তখন ও নিশ্চয়ই খোকা। মোহিনীরঞ্জন এক নারায়ণ ব্যতীত অপরকে বুঝায় না। নরবপু নারায়ণ নহেন, যাহারা নরনারীর শরীরে মাত্র অনুরাগ বিশিষ্ট তাহারা নারায়ণ হইয়াও মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া খোকা ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। ভগবান নারায়ণের নারীরূপই মোহিনীরূপ। এই মোহিনীরূপের প্রভাবে জগতের যাবতীয় খোকারূপী অজ্ঞ লোক সকল উক্ত নারীরূপে মোহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। যাহারা নারায়ণকে ভুলিয়া অর্থাৎ আপনাকে আপনি ভুলিয়া অনুরাগভরে নারীরূপে দর্শন করিয়া থাকে তাহার নাম মোহিনীরঞ্জন বলিলেও আমি তাহাকে খোকা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যথা "মোহিনীনাং রঞ্জনং রাগো যস্য স মোহিনীরঞ্জন" অর্থাৎ যাহার মোহিনীরূপা নারীগণের প্রতি অনুরাগের সহিত আসক্তি থাকে, সেই খোকা, তাহার নাম মোহিনীরঞ্জন হইলেও সে খোকা ব্যতীত অপর কিছু নহে।

আমার কথা বলা শেষ হইবার পরই, উক্ত খোকারূপ মোহিনীরঞ্জন স্যারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঐ দেখন স্যার ও আবার কি কত কথা বলিল, কতগুলো শব্দ যাহা বলিল তাহার একটাও বুঝিতে পারিলাম না। তবে ও যে এখন আমাকে শেষ কথা পর্য্যন্ত খোকা বলিয়াছে তাহাতে আর আমার সন্দেহ নাই। আপনি উহাকে শাসন করিয়া বলিয়া দিন ও যেন আমাকে খোকা না বলে। মোহিনীর এই সব কথা শেষ হইলে আমার শিক্ষক মহাশয় খানিক চক্ষু বুজিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল মোহিনীর এই কথা শেষ হইলে তিনি যেন স্বগতঃ মনে মনে বলিতেছেন ও বাবা এ যে দেখিতেছি ভারি খোকা, ইহাকে খোকা বলা ঠিক নহে। কারণ ইহার বয়স কম হইলেও, এ আমাপেক্ষায় জ্ঞানে বৃদ্ধ খোকা মোহিনীরঞ্জন শব্দের যে অর্থ করিল তাহাতে আমরা উহার সামনে সবই খোকা; যদিও আমার বিবেচনায় এ অর্থ কষ্ট কল্পনা বলিয়া আমার পান্ডিত্য অভিমানে বোধ হয়, কিন্তু ভাব দেখিয়া বলিতে গেলে মোহিনীরঞ্জন শব্দের অর্থ বর্তমানে এই অর্থই সংলগ্ন। কারণ নারীরূপে অনুরাগ বিহীন কে আছেন তাহা ত' বলিতে পারি না, অন্ততঃ আমি আমাকেও বলিতে পারি না যে আমার বর্তমান মনের নারীরূপে অনুরাগ নাই। যদি বলি যে আমার নারীরূপে অনুরাগ মাত্রও নাই, তাহা হইলে আমার মিথ্যা কথা কহা হয়। কারণ আমার মনের অবস্থা আমি ত' নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তবে লোক লজ্জা ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

যাহা হউক, আমার বিবেচনায় এ খোকা সামান্য খোকা নহে, এ বিষম খোকা। এ খোকাকে আমায় শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা ত' আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। কারণ খোকা যে সকল কথা বলিল, এতদূর লক্ষ্য আমার নাই। মোহিনীরূপা নারীজাতি যে ভগবানের অবতার বিশেষ ইহা আমার জানা থাকিলেও ধারণা না হওয়ায় উহাকে

উপভোগের বিষয়ই বলিয়া মনে হওয়ায় দেব ভাবের অনুরাগ না হইয়া স্বতঃই পুত্রভাবের অনুরাগ সাধারণতঃ হইয়া থাকে। যাহা হউক, খোকার বাক্যগুলি শ্রমণ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম, এখন হইতে উহাকে বিশেষ সতর্ক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ কি জানি কখন কোন কথা ধরিয়া ও কি বলিবে তাহার প্রকৃত উত্তর না হইলে উহার নিকট অপদস্থ হওয়াই সম্ভব। তাহার পর প্রকাশ্যে আমার শিক্ষক মহাশয় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ওহে বাপু (বৎস) খোকা, তুমি যাহা যাহা বলিলে আমি সমস্তই অবগত হইলাম। বাপু এখানে বিদ্যালয়ে আসিয়াছ, বিদ্যালয়ের সত্বাধিকারী মহাশয়ের অনুমতি আছে, এখানে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা একেবারে নিষেধ, অতএব তুমি এখানে ধর্ম বিষয়ের আলোচনা কদাচ করিও না। তাহাতে অপর বালকগণের পাঠের বিঘ্ন হওয়া সম্ভব এবং মোহিনীরঞ্জনকে খোকা বলিয়া সম্বোধন করিও না। মোহিনী যাও, তুমি আপন আসনে বইস, খোকা আর তোমাকে খোকা বলিবে না। খোকা তোমাকে যদিও খোকা বলে নাই, তুমি খোকার কথা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আপনি খোকা মনে করিতেছ, তাহাতে আর খোকার বিশেষ দোষ কি। খোকার খোকা বলিবার অভিপ্রায়, যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই অজ্ঞ তাহারাই খোকা। তুমি খোকা না হইলেও চেষ্টা কর যাহাতে ভগবান হইতে পার তাহা হইলে তুমি আর খোকা থাকিবে না। মানব জীবন লাভ করিয়া জ্ঞানবান না হইতে পারিলে সকলেই খোকাতে পরিণত হয়। অতএব তুমি যাহাতে জ্ঞানবান হইতে পার তাহার চেষ্টা কর। বিদ্যালাভ না হইলে তোমার জ্ঞান লাভ হইবে না। অতএব বিদ্যালাভের জন্য আপন পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ সহকারে পাঠ অভ্যাস করিবে। যাও এখন আপন স্থানে বসিয়া পাঠ্য বিষয় সকল শ্রবণ কর; আমার শিক্ষক মহাশয়ের কথা শেষ হইলে মোহিনী আপন স্থানে আসিয়া বসিল।

তাহার পর, শিক্ষক মহাশয় যে খোকাটি পাঠ বলিতেছিল, তাহাকে পুনরায় পড়িতে বলিলেন। সে খোকাটি আপন পুস্তক দেখিয়া সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে আমাকে বলিলেন খোকা তুমি এই বার বল দেখি। আমি শিক্ষক মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া, আমার পাঠ্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলাম। শিক্ষক মহাশয় যেন আমাকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক শব্দের অর্থ, বানান, ব্যাকরণের ধাতু, সমাজ সমস্ত এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমিও প্রত্যেক বিষয়ের যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলাম। আমার একটিও ভুল না হওয়ায়, শিক্ষক মহাশয় আমাকে বলিলেন, খোকা তোমার অদ্যকার পাঠ্য বিষয় সাহিত্য, খুব ভালই অভ্যাস হইয়াছে। আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। শিক্ষক মহাশয় স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন আমি খোকাকে মনে করিয়াছিলাম যে খোকা হয়ত কেবল ফাজিল

জেঠা খোকা। পাঠ্য বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন কাজেরই হইবে না এবং সম্ভবতঃ বোধ হয়, একটা শব্দেরও উত্তর করিতে পারিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা আমার ভ্রম, কারণ আমার এই শ্রেণীতে খোকার ন্যায় একটিও ভাল বালক নাই যে পাঠ্য বিষয়ে সমকক্ষ হইতে পারে। যাহা হউক আমিও ইহাকে পাঠ্য বিষয় শিক্ষা দিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।

তাহার পর শিক্ষক মহাশয় প্রকাশ্যে অপর খোকাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ তোমরাও খোকার ন্যায় আপন আপন পাঠ নির্ভুল ভাবে বলিতে যত্ন করিবে। ইহা বলিয়া তাহার পর আরো পাঁচ ছয় জন খোকাকে আমাদের শ্রেণীর মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এক এক জন করিয়া পাঠ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাঁচ ছয় জনের পড়া লইতে লইতে এমন সময় দ্বিতীয় বারের ঘন্টা ঢং ঢং করিয়া সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। ঘন্টার শব্দ হইবা মাত্র, খোকারা সকলে যেন আনন্দ ভরে গোলমাল করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয়ও ঘন্টার শব্দ শুনিয়া আগামী কল্যকার জন্য পাঠ নির্ণয় করিয়া দিতেছেন এমন সময় অপর একজন শিক্ষক আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমবার শিক্ষক মহাশয় ঘন্টা হওয়ায়, তিনিও ঘন্টা দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বা কি করেন তার মোটের উপর এক ঘন্টা মাত্র সময়। ঘন্টা আরম্ভ মুখে কার্য্য আরম্ভ করিতেও প্রায় পাঁচ সাত মিনিট গিয়া থাকে, তাহার পর খোকাদের মামলা মোকৰ্দ্দমা শুনিতেও দশ পনর মিনিট গিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে খোকাদের পরস্পরের গোলমাল গল্প-গাছা বন্ধ করিবার জন্যও আট দশ মিনিট প্রায় গিয়া থাকে। সময় মোটের উপর ষাট মিনিট মাত্র। আমাদের শ্রেণীতে চল্লিশটি খোকা পাঠ করিয়া থাকে, ইহার ভিতর সকলের সম্যক ভাবে পাঠ হওয়া অসম্ভব। বলিতে কি গল্প আমোদেই অধিকাংশ সময় হইয়া থাকে, পাঠ অভ্যাস করিতে আসা ছলনা মাত্র।

শিক্ষকগণের উপরও কাহার শ্রদ্ধা প্রায় নাই, তবে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা প্রহার খাইবার ভয়ে। সময় সময় খোকারা একটু শান্তভাব থাকে, শিক্ষক মহাশয়েরও লক্ষ্য সকল বালকের প্রতি থাকাও অসম্ভব। কারণ তাঁহার দুটি চক্ষু এক দিকে লক্ষ্য করিতে গেলে অপর দিকের খোকারা নিতান্ত অশান্ত তাহারা প্রায়শঃই শিক্ষক মহাশয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া থাকে, এমত অবস্থায় সকল খোকার প্রতি লক্ষ্য তিনিও রাখিতে পারেন না। খোকাদের শিক্ষকগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না থাকিবার প্রধান কারণ, খোকাদের পাঁচজন শিক্ষক থাকায় একায়িক কাহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি থাকিতে পারে না। তাহারা যদি একজনকে শিক্ষক বলিয়া জানিত, ও একজনের নিকট হইতে সমস্ত ঘন্টার পাঠ অভ্যাস করিত, তাহা হইলে একজনের নিকট বেশীক্ষণ সঙ্গ করার ফলেও স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহাদের শিক্ষকের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাইত এবং শিক্ষক

মহাশয়ও একায়িক পাঁচ ঘন্টা সময় পাইলে, তিনিও যাহার যাহা অভাব আছে তাহার চেষ্টা করিয়া কিছু না কিছু খোকাদের উপকার করিতে পারিতেন এবং কে কেমন স্বভাবে খোকা তাহাও তিনি অবগত হইতে পারিতেন এবং তাঁহারাও খোকাদের প্রতি একটা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে স্নেহ ও যত্ন থাকিত। এখানে দেখিতেছি, খোকাদেরও শিক্ষকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নাই এবং শিক্ষকেরও খোকাদের প্রতি স্নেহ বা বিশেষ যত্নের অভাব। শিক্ষক মহাশয়ের লক্ষ্য থাকে ঘন্টার উপর খোকাদেরও লক্ষ্য থাকে ঘন্টার উপর। একবার ঘন্টা বাজিলেই যেন পরস্পরের ঘাম দিয়া জ্বল ছাড়িয়া যাওয়ার মতন হইয়া থাকে। ইহাতে আর কাহার কি হইতে পারে লাভের মধ্যে নানা রকম খোকার সঙ্গে পড়িয়া নানা রকম কুভাবই শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার যে তাহা হইবে না তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহা হউক, দেখা যাক্ কি হয়।

তাহার পর দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় আপন আসনে বসিয়া ছাত্রগণের পাঠ লইতে লাগিলেন। আমি শেষের দিকে বসিয়াছিলাম। আমার দিকে এখন তাঁর নজর পৌঁছায় নাই, খানিক পরে, আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গত কল্য না ভর্ত্তি হইয়াছ? আমি তদুত্তরে বলিলাম আজ্ঞা হাঁ স্যার, আমি গতকল্য ভর্ত্তি হইয়াছি। শিক্ষক পাঠ লইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে এক একজন খোকার নাম করিয়া বলিতেছেন, এই চুপ কর গোল করিও না শিক্ষক মহাশয় যখন বলেন চুপ কর, সেই সময় খানিক একবার সকলে চুপ করে মাত্র। তাহার পর আবার যেমত পূর্বে পরস্পরে গোলযোগ করিতেছিল সেই ভাবেই পরস্পরে খোকা ভাবের গল্প গাছা করিতে লাগিল। ইহারা নামে মাত্র বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিয়াছে, পিতামাতার ভয়ে মাত্র বিদ্যালয়ে আসিয়াছে। বাড়ীতে এত সাথী পায় না এবং পিতা মাতার ভয়ে কিছু করিতে পায় না। বিদ্যালয়ে আসিয়া আপন সঙ্গী বালকের সহিত আপনা আপন ইচ্ছা চরিতার্থ করিতেছে; সুতরাং তাহাদের পাঠে মনোযোগ নাই। যাহা হউক শিক্ষক মহাশয় যে বালকটির পাঠ লইতেছিলেন তাহার পাঠ সমাপন হইয়া গেলে, আমাকে নূতন খোকা বোধে আমার পাঠ্য বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্ন অনুযায়ী একে একে উত্তর প্রদান করিতে লাগিলাম। এমন সময় অপর খোকারা একটু বেশী গোলযোগ করায়, আমার স্কুল কাকা, পুলিশের জমাদারেরা যেমন রাত্রে রোঁদ দেয় সেইরূপ ভাবে আমাদের শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এই স্থির হও, চুপ কর, বড় গোলমাল করিতেছ তোমরা। ইহা শুনিবামাত্র সকলে যেন একেবারে নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিল। তাহার পর স্কুল কাকা আমার নিকটে আসিয়া আমি কিরূপ পাঠ্য বিষয়গুলি বলিতেছি ও কিরূপভাবে উত্তর করিতেছি তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমার পাঠ সমাপন হইয়া গেলে, স্কুল কাকা অপর একজন খোকাকে বলিলেন তুমি বলত; তাহাতে সেও আপন পাঠ্য বিষয় বলিতে লাগিল, বলা বাহুল্য পাঠ্য বিষয় সকলেরই একই রকম।

যাহা হউক সেই খোকাটি নিজ পাঠ্য বিষয় ভাল বলিতে না পারায় স্কুল কাকা তাহাকে বসিতে বলিলেন। শেষে বলিলেন, ভাল করিয়া আপন আপন পাঠ্য বিষয় নিত্য অভ্যাস করিয়া আসিবে, তাহা না হইলে আমি বিশেষ শাস্তি প্রদান করিব ও বিশেষ অসন্তোষ হইব জানিবে। ইহা বলিয়া তিনি আমাদের শ্রেণী হইতে বাহির হইতেছেন, ওদিকে কোন কোন খোকা পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি তাহা দেখিয়া স্কুল কাকাকে বলিলাম স্যার আপনাকে ঐ খোকাটি কলা দেখাইতেছে। তাহাতে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে আমাকে কলা দেখাইতেছিল, খোকা তাহাকে দেখাইয়া দাও তো। আমি তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম এই আপনাকে কলা দেখাইতেছিল।

তাহার পর স্কুল কাকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে কলা দেখাইতেছিলে? সে তদুত্তরে বলিল, না স্যার আমি কেন আপনাকে কলা দেখাইব, ও স্যার মিথ্যা কথা কহিতেছে। ওই স্যার আপনাকে, আপনি পিছন ফিরিলেই কলা দেখাইতেছিল। আমি ইহা শুনিয়া ক্ষণিক স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ বলে কি, নিজেই দোষ করিল, আবার তাহা স্বীকার না করিয়া মিথ্যা কথা কহিয়া আর একটা দোষ করিতেছে। এমন সময় স্কুল কাকা গোপাল নামক খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপাল তুমি সত্য বল ত', কে আমাকে কলা দেখাইয়াছিল। মিথ্যা বলিলে আমি তোমাকে সাজা দিব। গোপাল তদুত্তরে বলিল, স্যার আমি নূতন খোকাকে কলা দেখাইতে দেখিয়াছি। এ আপনাকে কলা দেখায় নাই, এ আমার পার্শ্বেই বসিয়া আছে। আমি, প্রথম খোকা যাহা মিথ্যা কথা বলিল, তাহা শুনিয়াই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তাহার পর গোপাল নামক খোকা যাহা সাক্ষ্য দিল তাহাও তদপেক্ষায় আশ্চর্য্য। এরা এই অল্প বয়সেই মিথ্যা কথা কহা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সমস্তই অভ্যাস করিয়াছে। এরা যখন বড় খোকা হইবে ইহাদের দ্বারায় যে কি না হইতে পারিবে তাহা বলা অসম্ভব, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই দেখিতেছি।

যাহা হউক, তাহার পর গোপাল নামক খোকার কথা শুনিয়া স্কুল কাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা এরা বলিতেছে তুমিই আমাকে কলা দেখাইয়াছ, ইহা কি সত্য? আমি তদুত্তরে বলিলাম না স্যার আমি উহা করি নাই। আপনি আমার কাকা হন, আমি কেন আপনাকে ওরকম করিব। তাহার পর স্কুল কাকা উক্ত খোকাদ্বয়কে বলিলেন দেখ তোমরা সাবধান হও, আমি বুঝিলাম ইহা তুমিই করিয়াছ এবং গোপাল তোমার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে। খোকার বালক কাল হইতে উহার স্বভাব জানি উহার দ্বারায় কদাচ এরূপ ঘৃণিত কার্য্য হইতে পারে না। খোকা এসকল বিষয় জানেই না, খোকা কখনও কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই। তোমরা পাঁচ বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, অসৎ সঙ্গের দ্বারায় এই সকল বিষয় যাহা গুরুজনের উপর করা বিধেয় নহে, তৎ সমস্ত বিষয় তোমরা শিক্ষা করিয়া আমার বিদ্যালয়ে অল্পদিন মাত্র ভর্ত্তি হইয়াছ।

আমার বিশ্বাস ইহা তোমাদের উভয়ের ষড়যন্ত্রে হইয়াছে। অদ্য আর আমি তোমাদের উভয়কে বেশী কিছু না বলিয়া কেবল মাত্র বেঞ্চির উপর এক ঘন্টা কাল দন্ডায়মান হইয়া থাকিবার আদেশ করিলাম। পুনরায় যদি তোমাদের এইরূপ অপরাধ শ্রবণ করি, তাহা হইলে তোমাদিগকে গুরুতর দন্ড দিব বা আমার বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। ইহা বলিয়া স্কুল কাকা আমাকে বসিবার স্থানে বসিতে বলিয়া এবং উক্ত খোকাদ্বয়কে বেঞ্চির উপর দন্ডায়মান করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর উক্ত খোকাদ্বয় বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া আপন মুখের সামনে পুস্তক দিয়া মুখ ঢাকিয়া, মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিল এবং আমার দিকে মধ্যে মধ্যে কট্ মট্ করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আপন পাঠ দেখিয়া যাইতে লাগিলাম। এমন সময় ঢং ঢং করিয়া দ্বিতীয় বারের শেষ ঘন্টা সাড়ে বারোটা বাজিয়া গেল। সাড়ে বারোটার ঘন্টা যেমন বাজিল, অমনি শিক্ষক মহাশয় আগামী কল্য যাহা পাঠ হইবে তাহা বলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়, অপর একজন শিক্ষক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগমনশীল শিক্ষক মহাশয়কে দেখিয়া যিনি আমাদের পাঠ লইতে ছিলেন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, গোপালকে ও সুধীরকে কর্ত্তৃপক্ষ এক ঘন্টা বেঞ্চির উপর দাঁড়াইবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন, অতএব উহারা যেন দেড়টা পর্য্যন্ত, এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তাহার পর, তৃতীয় বারের শিক্ষক মহাশয় পাঠ লইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্ষান্ত করিলেও খোকারা তাহা শুনে না, সকলেই প্রায় আপন আপন ভাবে মগ্ন। পুস্তক খানি নাম মাত্র হস্তে আছে, অধিকাংশ খোকাই গল্প গাছাতেই প্রায় মগ্ন। তবে লক্ষ্য আছে যাহাতে শিক্ষক মহাশয় তাহাদের ব্যাপার না বুঝিতে পারেন। এই কারণে তাহাদের লক্ষ্য অনেক সময় শিক্ষক মহাশয়ের দিকে থাকে। শিক্ষকের উপর ভক্তি বা শ্রদ্ধা কাহার প্রায় দেখিতে পাইতেছি না, অধিকন্তু, প্রায়ই সময় সময় বিদ্রূপ ভাবে চুপি চুপি শিক্ষক সম্বন্ধে কত কথাই বলাবলি চলিতেছে এবং নিজেদেরও কথা সব বলাবলি করিতেছে। কেহ ভাল রকম পাঠ্য বিষয় বলিতে না পারিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী খোকা পুস্তক দেখিয়া চুপি চুপি বলিয়াও দিতেছে, শিক্ষক মহাশয় সব সময় ইহা ধরিতে পারেন না। অপর কোন খোকা তাহা বলিয়া দিলে তাহাকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিয়া থাকে। কারণ এখানে মিথ্যা খোকার অভাব নাই। তাহারা এই সকল বিদ্যালয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার শিক্ষা যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে কারণ কুসঙ্গের অভাব এখানে নাই। এই স্থানকে কুসঙ্গের আলয় স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যালয় বা বিদ্যালাভের স্থান বলা তাহা ভাণ মাত্র। অবশ্য শিক্ষকগণের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, কার্য্যতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ এক একটি শ্রেণীতে চল্লিশটি ছাত্র বা কোন কোন শ্রেণীতে ত্রিশটি ছাত্র পাঠ অভ্যাস জন্য পাঠ করিতে আসিয়া থাকে। ইহাদের ত্রিশ দ্বিগুণে ষাটটি চক্ষু, আর যিনি শিক্ষক মহাশয় পাঠ লইয়া থাকেন,

তাঁহার দুইটি মাত্র চক্ষু। তাঁহার পক্ষে ত্রিশটি বালকের উপর সমভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব পর হইতে পারে না। তাহার উপর শিক্ষক মহাশয়ের কোন ছাত্ররূপী খোকাদের উপর শাসন করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ দেন নাই। শাসন জন্য খোকারা বিদ্যালয় ত্যাগ করিলে স্বাত্বাধিকারী মহাশয়ের সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকায় খোকারা মন্দ কার্য্য করিলেও প্রায়শঃ তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না।

কোন শিক্ষক ছাত্ররূপী খোকাকে শাসন করিলে, তাঁহার চাকরি থাকা দায় হইয়া উঠে, সুতরাং এমত অবস্থায় এতগুলি খোকার পালকে ঠিকভাবে বিনা শাসনে চরান শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষে অসম্ভব। বরং শিক্ষক মহাশয় কোন কথা বলিলে, তাঁহাকেও ইহারা মারিতে বা অন্ততঃ মাথা নাড়া দিয়া ভয় দেখাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে ক্রুটি করে না। সুতরাং শিক্ষক মহাশয়ও ঘন্টা বাজিলে আসেন আবার শেষে ঘন্টা দেখাইয়া চলিয়া যান। নাম মাত্র দু'পাঁচজন খোকা কিছু কিছু আপন আপন পাঠ্য বিষয় পাঠ করিয়া থাকে, ইহারা পাঠ করিলেও সময় সময় সঙ্গ দোষে পড়িয়া অমনোযোগী হইয়া থাকে। যাহা হউক দ্বিতীয় ঘন্টার মতন কাহার কাহার পাঠ দেওয়া হইল, আমাকেও পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও শিক্ষক মহাশয়কে আমার পাঠ যথাযথভাবে বলিলাম, তাহাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আমার পাঠ শেষ হইবা মাত্র, তৃতীয় ঘন্টা ঢং ঢং করিয়া দেড়টা বাজায় একটা মহা কোলাহলের সহিত হো হো শব্দ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল। শিক্ষক মহাশয়ও উঠিয়া আগামী কল্যের জন্য পাঠ্য বিষয় বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরই সকল খোকা বাহিরে যাইতে লাগিল; এমন সময় আমার দ্বারবান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে কহিল খোকা বাবু বাহিরে আসুন, জলখাবার খাইবেন। বাড়ী হইতে জলখাবার আসিয়াছে। আমি দ্বারবানের কথা শুনিয়া তাহার হস্তে আমার পুস্তক খাতা পেনসিল সব দিয়া তাহার সঙ্গে খাবার খাইতে যাইতেছি, এমন সময় আমাদের শ্রেণীর একটি খোকা আমার নিকটে আসিয়া বলিল খোকা কোথায় যাইতেছ, আমি তাহাকে বলিলাম, আমি জল খাবার খাইতে যাইতেছি। তাহাতে সে আমাকে বলিল চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। তাহার পর দরওয়ান যথাস্থানে আমাকে আনিয়া আমাদের চাকরের হস্ত হইতে জল খাবার লইয়া আমাকে খাইতে দিল। একখানি রেকাবিতে দুটি রসগোল্লা ও কিছু সাময়িক ফল ছিল তাহা আমাকে দিবামাত্র আমি তাহা হইতে একটি রসগোল্লা লইয়া, আমার সঙ্গে যে খোকা আসিতেছিল তাহাকে দিয়া বলিলাম এই রসগোল্লাটি খাও। সে প্রথমে খাইতে সম্মত হইল না তাহাতে আমি আবার তাহাকে খাইতে বলায় সে আমার হস্ত হইতে লইয়া খাইতে লাগিল। আমিও রেকাবিখানি হস্তে করিয়া জল খাবার যাহা ছিল তাহা সব খাইয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমার চাকর আমাকে

একটা ঘটিতে দুগ্ধ ছিল তাহা খাইতে দিল, আমি দুগ্ধ পান করিয়া বলিলাম আমাকে জল দাও খাইব। সে সোরাই (কুঁজা) হইতে জল ঢালিয়া প্রথমে ঘটিটি ধুইয়া তাহার পর আমাকে পানীয় জল দিল, আমি অগ্রে জলপান না করিয়া পূর্বোক্ত বালককে তাহা পান করিতে দিলাম। সেও খাইল, তাহার পর আমার চাকর আবার ঘটিটি ভাল করিয়া ধুইয়া তাহাতে জল ভরিয়া আমাকে খাইতে দিল। আমি জলপান করিয়া সেইখানে একটু বেড়াইতেছি বালকটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই তোমার নাম কি? সে আমাকে বলিল, আমার নাম গুরুদাস। আমি বলিলাম, ভাই তোমার নামটি বেশ হইয়াছে, ইহা বলিয়া একবার চারিদিকে বেড়াইতেছি, গুরুদাস আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। আমি বুঝিলাম ইহার আমার সহিত ভাব করিবার ইচ্ছা।

আমিও উপস্থিত তাহাকে সে বিষয়ে কোন বাধা না দিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম সকল খোকারাই হো হো শব্দে ছুটোছুটি করিতেছে, কেহ বা চোর হইয়া অপরকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আবার কোন খোকা হস্তে করিয়া বল লোফালুফি করিতেছে। কোন কোন খোকারা আবার কয়েক জনে মিলিয়া ব্যাটবল খেলিতেছে। সকলেই আপন আপন খেলাতেই মগ্ন, মরিব কি বাঁচিব সে জ্ঞান যেন শূন্য হইয়া খেলিতেছে। আবার যাহারা ওরি মধ্যে একটু বড় খোকা তাহারা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া, কত রকম রসালাপ করিতে করিতে মনের আনন্দে হেলিতে দুলিতে বেড়াইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে হো হো রবে হাসির স্রোত চালাইতেছে। আমরা যে বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাসের জন্য আসিয়াছি, এ সময় তাহা কাহারও স্মরণ পথে আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। এমন সময় আমার স্কুল কাকা, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, খোকা তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, তুমি যাও আমার ঘরে গিয়া বইস, আমি যাইতেছি। ইহা বলিয়া আমার দরওয়ানকে বলিয়া দিলেন, খোকাকে আমার ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইয়া রাখ, আমি একটু পরেই যাইতেছি। তাহার পর আমি দরওয়ানের সঙ্গে স্কুল কাকার ঘরে যাইয়া বসিলাম, তথায় আরো কতকগুলি শিক্ষক মহাশয়েরাও বসিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা আমাকে বসিতে বলায় আমি একটা চেয়ারে বসিলাম। তাহার পরেই স্কুল কাকা সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিলেন, খোকা, তুমি নিত্য জল খাবারের ছুটি হইলে খাবার খাইয়া এইখানে আসিয়া বসিবে। অপর কোন বালকের সঙ্গে মিশিবে না। তাঁহার কথা শেষ হইবা মাত্র, ঢং ঢং করিয়া দু'টা বাজিল। দু'টা বাজায় স্কুল কাকা আমাকে বলিলেন খোকা এইবার তুমি তোমার শ্রেণীতে যাও। আমার দরওয়ান উপস্থিত ছিল, সে আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার পাঠ করিবার শ্রেণীতে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহিরে গেল। এখনও সব খোকারা আসিয়া পৌঁছায়

নাই, যাহারা আসিয়াছে তাহারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া আপন আপন স্থানে বসিতেছে, সকলেই যেন দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় শিক্ষক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিক্ষক মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া দুটি খোকা শিক্ষক মহাশয়কে বলিল, স্যার আমার বই (পুস্তক) খাতা কে লইয়াছে আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের পুস্তক খাতা কে চুরি করিয়া লইয়াছে, শিক্ষক মহাশয় ইহা শ্রবণ করিয়া সকল খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, না স্যার, আমরা লই নাই; এই দেখুন স্যার, আমাদের নিকট নাই। শিক্ষক মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিলেন তাহাতে পাওয়া গেল না। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, যে চোর চুরি করে, সে কি আর চুরি করা বিষয় নিজের নিকটে রাখে নিশ্চয় সে অপর কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া থাকে। ইহা বলিয়া তিনি একটা কাগজে কি লিখিয়া উক্ত খোকাদ্বয়ের হস্তে কাগজখানি দিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা কাগজখানি হস্তে করিয়া কর্তৃপক্ষ মহাশয়ের নিকটে গিয়া তোমাদের সমস্ত কথা বুঝাইয়া বল গে। আমি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছি, দেখিতেছি এখানে চোরেরও অভাব নাই, অথচ সে চোর কে তাহাও প্রায় জানা যায় না। জানা না থাকায় চোরের সঙ্গ আমাকে সম্ভবতঃ করিতে হইবে, এখানে থাকিলে পরিণামে আমার যে কি দশা হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ এখানে কোন রকম কুসঙ্গের অভাব নাই দেখিতেছি। যাহা হউক অদ্যকার ঘটনাবলী বাড়ীতে গিয়া বলিব, তাহার পর আমার বাবা যাহা বলেন তাহাই করিব।

আমি মনে মনে এইসব ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের শিক্ষক মহাশয় সকলকে বলিলেন তোমরা সকলে আপন আপন খাতা বা শ্লেট পেনসিল লও। এইবার আমি তোমাদিগকে অঙ্ক কসিতে দিব, আমাকে নুতন দেখিয়া আমাকে বলিলেন, তুমিও খাতা পেনসিল বা শ্লেট পেনসিল লইয়া ঠিক হইয়া বইস। আমি যে অঙ্ক বলিব তাহা কসিতে হইবে এবং যে বালক অঙ্ক ঠিক কসিয়া অগ্রে দিবে, সেই বালক সকলের উচ্চ আসন অধিকার করিবে। আমি তাহা শুনিবা মাত্র আমার খাতা ও পেনসিল বাহির করিয়া প্রস্তুত হইলাম, তাহার পর শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক শাস্ত্রের পুস্তক হইতে একটি অঙ্ক বলিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অঙ্ক বলার সঙ্গে সঙ্গে খাতায় সেই অঙ্কটি লিখিয়া লইতে লাগিলাম। তাঁহার অঙ্ক বলা যেমন শেষ হইল, আমারও সেই সঙ্গে সঙ্গে খাতায় সেই অঙ্কটি লেখা শেষ হইয়া গেল। তাহার পর আমি অঙ্কটি কসিতে আরম্ভ করিলাম। শিক্ষক মহাশয় তাহার পর একটু খড়ি লইয়া সেই অঙ্কটি আবার, এখখানা কাল রং-এর বড় কাষ্ঠ ছিল তাহাতে লিখিয়া দিয়া সকলকে বলিলেন ইহা দেখিয়া ও সকলে কসিতে পার। আমার

এই অঙ্কটি পূর্ব হইতে জানা থাকায়, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা কসা হইয়া গেল। আমার অঙ্ক কসা শেষ হইলেও তাহা আর একবার দেখিলাম, কারণ কি জানি যদি কোথাও ভুল হইয়া থাকে। দেখিলাম কোথাও ভুল নাই ঠিক হইয়াছে, তাহার পরই আমি খাতা খানি শিক্ষক মহাশয়ের হস্তে সকলের অগ্রেই দিলাম। শিক্ষক মহাশয় খাতা খানি আমার হস্ত হইতে লইয়া তাঁহার সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ সকলে আপন আপন খাতা দিতে লাগিল, আমি বসিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। সকলের খাতা দেওয়া হইলে পর শিক্ষক মহাশয় সকল খাতা গুলিকে উল্টাইয়া খাতা দেখিতে লাগিলেন। যাহার যে নাম তাহা খাতায় লেখা থাকায় তিনি সেই নাম ধরিয়া এক এক করিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও খাতায় যাহা অঙ্ক নির্ভুল হইয়াছে তাহার খাতায় নিঃ এই মাত্র লিখিয়া দিতেছেন, আর যাহার অঙ্ক ভুল হইয়াছে তাহার খাতায় একটা ঢেরা কাটার মতন দাগ দিতেছেন এবং পর পর উঠাইয়া দিতেছেন, আমাকে সকলের প্রথম স্থানে বসিতে বলিলেন।

তাহার পর শিক্ষক মহাশয় আমাকে বলিলেন, খোকা। এই অঙ্কটি যাহা বোর্ডে লেখা আছে তাহা তুমি নিজে কসিয়া বুঝাইয়া দাও। আমি তাঁহার কথা মত তাহা করিয়া বুঝাইয়া দিলাম, তাহার পর আমাকে বসিতে বলায় আমার স্থানে আসিয়া বসিলাম। বলা বাহুল্য, খোকাদের ভিতর অনেকেই প্রায় পরস্পরে দেখাদেখি করিয়াও অঙ্ক কসিয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে শিক্ষক মহাশয় একজন খোকাকে ডাকিয়া অঙ্কটি বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। সে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিল না, অথচ সে আপন খাতায় যে অঙ্ক করিয়াছে তাহা ঠিক আছে। ইহাতেই শিক্ষক মহাশয় সেই খোকাকে বলিলেন তুমি অপরের দেখিয়া অঙ্ক কসিয়াছ, ইহা বড় অন্যায়, ইহাও এক প্রকার চোরের কার্য্য, তুমি কাহার অঙ্ক দেখিয়া কসিয়াছ, সত্য করিয়া বল, আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। সে খোকাটি বলিল, না স্যার, আমি কাহার দেখি নাই। আমি এখন ভয় পাইয়া বোর্ডের অঙ্ক বুঝাইতে পারিলাম না। শিক্ষক মহাশয় এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন, দেখ তুমি প্রথমতঃ, একটা গুরুতর দোষ করিয়াছ, তাহার পর আবার মিথ্যা কথা কহিয়া একটা দোষ করিতেছ এইরূপ ভাবের অনেক কথা বলায়, শেষকালে সে স্বীকার করিল যে, সে পার্শ্ববর্তী বালকের কাগজ দেখিয়া সব লিখিয়াছিল। তাহাকে শিক্ষক মহাশয় সকলের নীচে নামাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন এরূপ যেন আর না হয়, পুর্নবার এইরূপ দোষ করিলে তুমি বিশেষ সাজা পাইবে।

শিক্ষক মহাশয়ের কথায় সেই বালকটি সকলের নীচের আসনে যেখানে আমি প্রথমে আসিয়া বসিয়াছিলাম, তথায় গিয়া আনন্দ ভাবেই বসিল। ইহাতে সে কিছুমাত্রও অপমান বা লজ্জা বোধ করিল না। এইরূপ ভাবে আরও তিনটি অঙ্ক কসা হইল।

আমার সকল অঙ্কগুলি কসা ঠিক হওয়ায় শিক্ষক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পরই আমার স্কুল কাকা যে যে খোকাদের পুস্তক চুরি গিয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া উক্ত বালক দু'টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কোথায় আপন আপন পুস্তক রাখিয়াছিলে আমাকে দেখাইয়া দাও। বালক দু'টি যথা আপন আপন পুস্তক রাখিয়াছিলে তাহা দেখাইয়া দিল; তাহার পর স্কুল কাকা সমস্ত খোকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ইহাদের পুস্তক দেখিয়াছ। তাহারা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, না স্যার আমরা উহাদের পুস্তক দেখিও নাই এবং জানিও না যে কে লইয়াছে। পুস্তক চুরির কোন সন্ধানই আমাদের শ্রেণীতে হইল না। তিনি ঐ বালক দু'টিকে বলিলেন, আচ্ছা তোমরা এখন আপন শ্রেণীতে বইস আমি অনুসন্ধান করিতেছি। অনুসন্ধান করিয়া যদি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদিগকে সংবাদ দিব। ইহা বলিয়া স্কুল কাকা আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। তাহার পরই ঢং ঢং ঢং করিয়া পেটা ঘড়িতে তিনটা বাজিল। তিনটা বাজা হইবা মাত্র শিক্ষক মহাশয়ও আপন আসন হইতে উঠিয়া আগামী কল্যকার জন্য যে সকল অঙ্ক বাড়ী হইতে কসিয়া আনিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। তাহার পরই অপর একজন শিক্ষক মহাশয় আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমেই একখানি খাতা বাহির করিয়া খোকাদের সকলের দৈনিক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হাজিরা লইতে লাগিলেন। এক এক জনের নাম ডাকিতে লাগিলেন, যার নাম যখন ডাকা হয়, সে তখন স্যার বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন উপস্থিতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। যে খোকা অনাগত হইয়াছে, তাহার নাম ডাক হইলেই কোন না কোন খোকা অনাগত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। আমার নাম ডাক হইবা মাত্র বলিলাম, স্যার আমি উপস্থিত আছি। আমার নাব সর্ব শেষে ছিল, আমার নাম হইয়া গেলেই শিক্ষক মহাশয় পাঠ লইতে আরম্ভ করিলেন। এটা শেষ ঘণ্টা হইতেছে, এই শেষ ঘণ্টায় ইংরাজি পড়া আরম্ভ হইল আমি প্রথম স্থানেই বসিয়াছিলাম, সুতরাং প্রথমেই আমাকে পাঠ বলিতে বলিলেন।

আমি শিক্ষক মহাশয়ের বাক্য অনুযায়ী পাঠ বলিতে আরম্ভ করিলাম, ক্ষণিক পরেই আমার পাঠ সমাপন হইয়া যাইলেই আমাকে বসিতে বলিলেন এবং আমার একটিও ভুল না যাওয়ায় এবং আমাকে নূতন বোধে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষক মহাশয় আমাকে বলিলেন খোকা তোমার পাঠ্য বিষয় তুমি খুব ভাল বলিয়াছ, তাহাতে আমি বড়ই তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা আমাকে বলিয়া অপর খোকাকে পড়িতে বলিলেন, অপর একজন খোকা পাঠ আরম্ভ করিল। সে কি বলে তাহা আমি শুনিয়া যাতে লাগিলাম, তবে এই ঘণ্টাটি শেষ ঘণ্টা থাকায়, সকল খোকাই ঘণ্টার উপর লক্ষ্য রাখিয়া কতক্ষণে ঘণ্টা বাজে তাহার আশায় বসিয়া থাকিয়া

নাম মাত্র পুস্তকখানি সম্মুখে রাখিয়া প্রায় সকলেই গল্প করিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, অধিক খোকা শ্রেণীতে থাকায় সকলের পাঠ লওয়া হয় না তাহা খোকারা সকলেই জানে। মধ্যে মধ্যে মধ্য হইতে কোন খোকাকে পাঠ বলিতে বলা হইতেছে; যাহাকে পাঠ বলিতে বলা হইয়া থাকে সে দাঁড়াইয়া পাঠ বলিতে আরম্ভ করিলে তাহার পার্শ্বস্থিত খোকা যেটা তার জানা নাই তাহা প্রায় বলিয়া দিয়া থাকে। এমন সময় একটা ছোট ঘণ্টার টুন টুন করিয়া শব্দ আরম্ভ হইতে লাগিল। এই ছোট ঘণ্টার শব্দ হইবা মাত্র আমি আমার নিম্নস্থ গুরুদাস নামক খোকাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই এ ঘণ্টা বাজান হইতেছে কেন। তাহাকে সে উত্তর করিল এইবার ছুটি হইবে এ কারণ ছোট ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জানান হইতেছে।

তাহার পর আবার কিছুক্ষণ বাদে পূর্বেকার বড় পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। চারিটা বাজিবামাত্র একটা মহা কোলাহলের সহিত হো হো শব্দ করিয়া সকল খোকারাই আপন আপন পুস্তক হস্তে করিয়া আপন আপন শ্রেণী হইতে দৌড়িয়া বাহির হইতে লাগিল। এসময় সকল খোকারাই প্রায় হাস্য বদনে আপন আপন বাড়ীতে যাইবার জন্য কেহ বা দৌড়িয়া যাইতেছে কেহ বা আপন পুস্তক খাতা লইয়া পরস্পরে কথা কহিতে কহিতে আপনার আপনার বাটীর অভিমুখে চলিয়াছে। আমিও আপন শ্রেণীর সকল খোকাদের বাহির হইতে দেখিয়া আপন পুস্তক খাতা ইত্যাদি গুছাইয়া লইতেছি এমন সময় আমার দরওয়ান আমার নিকট আসিয়া আমার নিকট হইতে পুস্তকাদি লইয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। আমি বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমার স্কুল কাকাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, কাকা আমি এখন তবে বাড়ী যাই। তাহাতে তিনি বলিলেন ভাল তুমি এখন বাড়ী যাও। আমি তাহার পর অপর শিক্ষক মহাশয়েরা যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিয়া তাহার পর আমার দরওয়ানের হাত ধরিয়া আমাদের বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা এখন রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি, স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে লোকে সব চানাচুর বিক্রি করিতেছে। স্কুলের খোকারা তাহা পয়সা দিয়া কিনিতেছে, কেহ তথায় দাঁড়াইয়াই চানাচুর কিনিয়া খাইতেছে। কোন খোকা চানাচুরের ঠোঙ্গা হাতে করিয়া দুটী দুটী করিয়া খাইতে খাইতে আপন আপন বাটী অভিমুখে চলিতেছে। আমি আমার দরওয়ানের হাত ধরিয়া রাস্তার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে বাটী অভিমুখেই আসিতেছি। ক্ষণিক পরেই বাটীতে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। আমি বাটীর ভিতর ঢুকিয়াই দরওয়ানের নিকট হইতে পুস্তকাদি লইয়া তাড়াতাড়ি আমার পড়িবার ঘরে রাখিতে যাইতেছি এমন সময় আমার পিতা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিতাকে প্রথমে দেখিয়াই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পর পিতাকে

সম্বোধন করিয়া বলিলাম, বাবা আমি অদ্য সকলের উপরের আসন অঙ্ক করিবার সময় অধিকার করিয়া লইয়া ছিলাম। আর আমাকে কেহ তথা হইতে নিম্নে নামাইতে পারে নাই। ইহা শুনিয়া বাবা আমাকে আদর করিয়া বলিলেন, আমি তোমার কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। এইরূপ নিত্য প্রথম আসন যাহাতে তুমি সকল বিষয়েই অধিকার করিয়া থাকিতে পার তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। এক্ষণে পুস্তকাদি রাখিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া তোমার মা'র সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি তোমার আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় ভাবিতে ছিলেন এবং তোমাকে আনিতে পাঠাইবার জন্য আমাকে আবার আলাদা লোক পাঠাইতে বলিতেছিলেন। আমি ইহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি পাঠ করিবার গৃহে পুস্তকাদি রাখিয়া, দৌড়াইতে দৌড়াইতে গিয়া, মা আমি আসিয়াছি ইহা চেঁচাইয়া বলিয়া, মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমার মা'ও আমার শব্দ পাইয়া দ্রুত পদ বিক্ষেপে আমাকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য যেন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মা আমার নিকটস্থ হইলে পর, আমিও শীঘ্র গতিতে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, আমি মা'কে জড়াইয়া ধরিলে পর, মা আমাকে একেবারে নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া স্নেহের সহিত বার বার আমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, বাবা খোকা, তোমার বাটী আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় আমি বিশেষ ভাবিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। তোমাকে বাটিতে আনাইবার জন্য আবার তোমার স্কুলে লোক পাঠাইবার কথা বলিতে ছিলাম। যাহা হউক তোমাকে দেখিয়া এখন যেন আমার মন ও প্রাণ শীতল হইল; এমন সময় আমার পিসিমা আমার জন্য কিছু দুগ্ধ ও জল খাবার নিজ হস্তে করিয়া আমাদের নিকটে লইয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা খোকা তোমার অদ্য স্কুল হইতে আসিতে কেন এত দেরি হইল বাবা। তোমার মা এবং আমরা সকলেই বড় ভাবিত হইয়া, দাদাকে বলিয়া তোমাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতেছিলাম। আমি পিসিমাকে বলিলাম, পিসিমা আজ প্রথম দিন বলিয়া একটু দেরি হইয়া গিয়াছে এবং আসতে আসতে একটু আমার দেরি হইয়াছে। আগামী কল্য হইতে আর দেরি হইবে না। তাহার পর আমাকে মা'কে পিসিমা বললেন, সেজ বৌ, খোকাকে খাবার খাওয়াইয়া দাও। তাহার পর মা আমার স্কুলের কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া গা মুছাইয়া দিয়া আমাকে জল খাবার খাইতে বলিলেন। আমি মা'র কোলে বসিয়া জলখাবার খাইতে খাইতে অদ্যকার স্কুলের ঘটনাবলি, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় মা'র নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলাম। আমার মা তাহা শুনিতে শুনিতে কখন বা হাস্য করেন আবার কখন বা স্কুলের খোকাদের কার্য্যাবলি শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া

আমাকে বলেন, বাবা খোকা তুমি কাহার সহিত মিশিও না। আমি শুনিয়াছি স্কুলের খোকারা প্রায়ই কেহ চরিত্রবান নহে। তাহারা মুখে এক রকম বলিয়া থাকে, কার্য্যে অপর রকম ব্যবহার করিয়া থাকে, অতএব তাহাদের সঙ্গ কদাচ করিও না। এইরকম নানা প্রকার কথাও হইতেছে, আমিও ধীরে ধীরে খাবার খাইতে খাইতে ক্রমশঃ সমস্ত ঘটনাবলি আমার মা'কে বলিয়া শেষ করিলাম।

আমার জল খাবার খাওয়া শেষ হইলে আমি বলিলাম, মা আমি এইবার এই সকল কথা বাবাকে বলিবার জন্য বাহির বাটীতে যাইব। বাবাকেও এই সকল বিদ্যালয়ের ঘটনাবলি যতক্ষণ না বলিতেছি ততক্ষণ যেন আমার মনের মধ্যে তৃপ্তি হইতেছে না, যদিও মা তোমাকে এই সমস্ত কথা বলায় আমার যেন একটা বোঝা নামানর মতন কতকটা হালকা বোধ হইল, তত্রাচ বাবাকেও সমস্ত কথাগুলি বলাও যেন আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। মা ইহা শুনিয়া আমাকে বাবার নিকটে যাইবার অনুমতি দিলেন, আমিও আনন্দের সহিত মা'র নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে আমাদের বাহির বাটীতে আসিয়া বাবা যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের মধ্যে গিয়া বাবাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম; বাবাকে প্রণাম করিবার পর, বাবা আমার হাত ধরিয়া তাহার পার্শ্বেই আমাকে আদর করিয়া বসাইলেন। আমি বাবার পার্শ্বে বসিলে পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা অদ্য বিদ্যালয়ে কিরূপ পাঠাদি করিলে তাহা বল, শ্রবণ করি। আমি পূর্ব হইতেই বিদ্যালয়ের ঘটনাবলী এবং অদ্যকার পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে বাবাকে বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম সাহস করিয়া প্রথমে বলিতে না পারিয়া কেবল অবসর খুঁজিতেছিলাম।

বাবা স্বয়ং উক্ত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমিও তাঁহাকে বিদ্যালয়ের ঘটনাবলি বলিবার সুবিধা পাইয়া, অদ্য শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট যাহা পাঠ দিয়াছিলাম তৎসমুদয় আনুপূর্বিক বলিয়া তাহার পর অপর খোকাগণের সহিত আমার যে সব কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাও বলিলাম, এবং বর্তমানের বিদ্যালয়ে যে কোন প্রকার কুসঙ্গের এবং কুকার্য্য শিক্ষা করিবার অভাব নাই তাহাও বলিলাম। পরিশেষে বলিলাম বাবা, শিক্ষকগণ সকলেই বেশ সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। আমার প্রথম ঘন্টায় শিক্ষক মহাশয় আমাকে বলিয়া দিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষেধ। অতএব, তুমি এখানে কোন রকম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা বা ভগবৎ গুণানুকীর্তন করিবে না, তাহাতে অপর পাঠের বিঘ্ন হইবে। আমি বাবাকে এই সব কথা বলিতেছি, এমন সময় স্কুল কাকা, আমরা যে ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছিলাম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বাবাকে নমস্কার করিলেন। বাবা স্কুল কাকাকে দেখিয়া সাদরে বলিলেন

ভায়া তোমার বাটীর সব খবর ভাল? বস ভাই, এই আমিও খোকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অদ্য বিদ্যালয়ে গিয়া কোন কোন বিষয়ে পাঠ করিলে এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত অপরাপর সংবাদও খোকার প্রমুখাৎ শুনিতেছিলাম। তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, কারণ খোকা যাহা যাহা বলিল তাহা সত্য কি মিথ্যা তোমার নিকট হইতেও খোকার ঐ সকল কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। যদিও আমার বিশ্বাস খোকা আমার নিকট উহার কোন রকম মনের ভাব গোপন করিয়া সত্যকে মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করে না। তত্রাচ বালক স্বভাব প্রযুক্ত কি জানি যদি কোন কথা বুঝিতে না পারায় ভ্রম বশতঃ আমাকে বিপরীত ভাবে বলে, তাহা হইলে তোমার নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন আমার সংশয় দূর হইবে।

আমি যে সকল কথা বাবাকে বলিতেছিলাম তৎসমুদয় কথাগুলি এক এক করিয়া বাবা স্কুল কাকাকে বলিতে লাগিলেন। স্কুল কাকাও তাহা সমর্থন করিয়া যাইতে লাগিলেন। বাবা স্কুল কাকাকে বলিলেন, ভায়া খোকা আর একটা কথা বলিতেছে যে, বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী তোমার বিদ্যালয়ে নাকি কোন প্রকার ধর্ম্ম বিষয়ের চর্চা বা ভগবৎ গুণানুকীর্তন করা নিষেধ আছে। ইহা কি সত্য? আজ্ঞা হাঁ দাদা, এ কথাও খোকা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। ইহা নিয়মবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এখনকার বিদ্যালয়ে নানা বর্ণের (জাতির) বালকেরা অধ্যায়ন করিতে আইসে এবং তাহাদের ধর্ম্মও সব পৃথক পৃথক, এমত অবস্থায় ধর্ম শিক্ষা দিতে যাইলে বিড়ম্বনায় পরিণত হয় না কি? এই সব কারণে বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ের প্রায় ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেবল খৃষ্টানী স্কুল যেখানে যেখানে আছে তথায় তাহারাই মাত্র বালকগণকে যিশু ভজাইবার জন্য ধর্ম্মের ভাণে যিশুরই গুণগান করিয়া থাকে। তাহা ও আর আমরা হিন্দু হইয়া হিন্দু বালকগণকে খৃষ্টানী শিক্ষা দিতে পারি না, সুতরাং কোন ধর্ম্মই শিক্ষা দেওয়া হয় না।

বাবা বলিলেন, দেখ ভায়া তুমি যেমত খৃষ্টান ধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ আমি তদ্রূপ খৃষ্টান ধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখি না। যাঁহারা যিশুকে মান্য করিয়া এবং যিশুর আজ্ঞা পালন করিয়া বলেন, সম্ভবতঃ তোমরা বোধ হয় তাঁহাদিগকেই খৃষ্টান বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক? স্কুল কাকা আমার বাবার এই কথার উত্তরে বলিলেন,— আজ্ঞা হ্যাঁ, আমরা তাহাকেই খৃষ্টান মনে করিয়া থাকি। তাহার পর বাবা বলিলেন,— দেখ ভায়া, বর্তমানে খৃষ্টান কেহ নাই বলিলেনও অত্যুক্তি হয় না, কারণ যিশুর যে সকল আজ্ঞা ও উপদেশ বাক্য আছে তাহা প্রায়শঃ খৃষ্টানেরা পালন করেন না। যিশুর উপদেশ বাক্য মধ্যে অনেক সুদপুদেশ আছে, সেই সকল সদুপদেশ খৃষ্টানগণের পালন করা যে নিতান্ত কর্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেমন মনে

কর যিশুর আজ্ঞা নরহত্যা কার নিষেধ, ব্যভিচার করা নিষেধ, মিথ্যা কথা বলা নিষেধ, নিজ প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া নিষেধ, নিজ প্রতিবাসীর গৃহাদি বিষয়ে লোভ কার নিষেধ, প্রতিবাসীর ভার্য্যাতে বা প্রতিবাসীর দাস দাসীতে কিংবা গবাদি ও রত্নাদিতে লোভ করাও নিষেধ ইত্যাদি এইরূপ অনেক নীতি বিষয়ক উপদেশ আছে, থাকিলে কি হইবে, নীতিবাক্য সকল মৌখিক উপদেশ দ্বারায় রক্ষা হয় না, কর্ম ব্যতীত নীতিবাক্য সকল ইন্দ্রিয়গণের স্রোতে ভাসিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইয়া থাকে। বাহ্যিক নীতিবাক্য সকল কেবল কথায় থাকে, অন্তরে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের লালসা বৃদ্ধি গোপনে বা প্রকাশ্যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইয়া থাকে।

কর্ম ব্যতীত কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা মৌখিক উপদেশ দ্বারায় রক্ষা করা জীব মাত্রেরই অসাধ্য। মনে কর খৃষ্টানগণের ধর্ম পুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর সদা প্রভু সমস্ত সৃষ্টি করিয়া অবশেষে মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি আদমের পাঞ্জর হইতে নারী জাতির সৃষ্টি করিয়া আদমের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে ইহা অনুমান করা উচিত যে, মনুষ্য একাকী না থাকিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষে একত্রে মিলিত ভাবে বাস করাই যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। কারণ তাহা তাহাদের ধর্মপুস্তকেই লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় খৃষ্টান প্রধান দেশে বিবাহ করিয়া দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে সহজে চাহেন না, ইহাতে কি ব্যভিচারের স্রোত বাড়িয়া যাইতে পারে না। এইরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা ঈশ্বরের বা যিশুর আজ্ঞা বলিয়া খৃষ্টানদিগের ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে তাহা কয়জন খৃষ্টানে তদনুরূপ ভাবে যিশুর বাণী মানিয়া চলিতে পারেন।

আরও বিশেষ বর্তমানে জড় বা বাহ্য বিজ্ঞানের উন্নতি পাশ্চাত্য দেশে বহুল প্রকাশ হওয়ায় লোক সকল কেবলমাত্র ফাঁকা শব্দের উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, ধর্ম কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক সুখ বড় হইয়া থাকে। এই সব কারণেই ভায়া, আমাকে দেশেও অনেকে বাহ্য বা জড় বিজ্ঞান পাঠ করিয়া ধর্মে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। সিদ্ধমুক্ত ব্যক্তিগণের উক্ত বাণী সকলের কোন পার্থক্য নাই। সকল দেশের সিদ্ধমুগ্ধগণেরই এক ভাব, তাঁহাদের বাণী সাধারণ মানবের বোধগম্য হওয়া বড়ই কঠিন, যাহার যেমন ভাব বর্তমান থাকে, সে তদ্রূপ ভাবব্যঞ্জক বাণীর অর্থ করিয়া থাকে। তাহাতে বিপরীত ফলই লাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধমুক্তগণের সমস্ত উল্‌টা বাণী এবং তাঁহাদের কর্মের গতিও উল্‌টা, তাহা সাধারণের প্রণিধান করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁহাদের বাণী প্রণিধান করিতে হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত কর্ম কার চাহি। তাঁহাদের প্রদত্ত কর্ম করিয়া যিনি যতটুকু অগ্রসর হইবেন তিনি ততটুকু তাঁহাদের উক্ত ভাবব্যঞ্জক বাণী বুঝিতে সক্ষম হইবেন নচেৎ নহে। যিশু যে ভাল

লোক ছিলেন তাহাতে ভায়া, আমার সন্দেহ নাই, তবে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহই বর্তমানে তাঁহার ভাব বাণীর ইঙ্গিত প্রণিধান করিতে সক্ষম নহেন ইহাই আমার বিশ্বাস।

দেখ ভায়া, যিশু বলিতেন, আমি ঈশ্বরের পুত্র, সাধারণ মূর্খ লোকগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, এমন কি অনেকে এখনও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। ভায়া মনে কর ঈশ্বরের পুত্র কে নহে তাহাত আমি বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস এবং ধারণা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। অজ্ঞ জীব সমূহ তারা অবগত না থাকায়, অপরকে ঈশ্বরের পুত্র ইহা বলিতে শুনিলে অবজ্ঞা করিয়া থাকে বা সময়ে সময়ে কষ্টও দিয়া থাকে। জীব সমূহ চন্ডালরূপ ইন্দ্রিয়গণের সহবাসে থাকিয়া চন্ডালত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আপনাকে আপনি চন্ডাল বোধ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমার একটি গল্প মনে পড়িল, ভায়া তাহা তোমাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি শ্রবণ কর।

দশম পরিচ্ছেদ

"বিজয় কুমারের গল্প"

কোন দেশে এক রাজা বাস করিতেন। প্রথমতঃ তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভ সম্ভাবনা হইলে, তিনি ভাল ভাল জ্যোতিষীকে আনয়ন করাইয়া ভাবী পুত্রের শুভ অশুভ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। অবশেষে জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! রাণীর গর্ভে সে সন্তান আছে সেই সন্তানের মুখ দর্শন করা আপনার পক্ষে বড়ই অমঙ্গলের বিষয়। আমরা গণনা করিয়া দেখিলাম, আপনার পুত্র জন্মিলে পর আপনি সন্তানের মুখদর্শন করিবামাত্র আপনার মৃত্যু হইবে। রাজা সমস্ত জ্যোতিষীগণের এই বাক্য শ্রাবণ করিয়া, আনন্দ ও বিষাদে মগ্ন হইয়া নিজ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রীবর, এক্ষণে ইহার সদযুক্তি কি তাহা আমাকে বল। আমার সন্তান সম্ভাবনা জানিয়া অবধি আমার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানের মুখ দর্শন মাত্রেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা অপেক্ষা আর আমার নিরানন্দের বিষয় কি আছে। অতএব এমতঅবস্থায় আমার কি করা কর্তব্য, মন্ত্রিবর, তুমি আমাকে তাহার সদযুক্তি প্রদান কর। মন্ত্রী রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, জ্যোতিষীগণ যখন বলিতেছেন সন্তানের মুখ দর্শন হইলে মহারাজের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, এমত অবস্থায় আমার বিবেচনায় যাহা কর্তৃক মহারাজের মৃত্যু হইতে পারে, তাহাতে রাজ শত্রু মনে করা উচিত। রাজশত্রুকে বধ করিলে পাতক হয় না, অতএব সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে বধ করা কর্তব্য।

মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন দেখ মন্ত্রীবর, আমি পুত্র হত্যা কিরূপে করিতে পারি। পুত্র হত্যা করা অপেক্ষা যদি আমার মৃত্যু হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, অতএব তাহা আমি করিতে পারিব না। পরিশেষে সমস্ত রাজ পারিষদবর্গ সকলেই এক বাক্যে মন্ত্রীর পোষকতা করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনার অবর্তমানে আপনার রাজ্য সমুহ বহিঃশত্রুর দ্বারায় আক্রান্ত হইলে তখন এই বিশাল রাজ্য কে রক্ষা করিবে। আপনার শৈশব পুত্র নিশ্চয় রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ, সুতরাং অপর বহিঃশত্রু কর্তৃক আপনার রাজ্য আক্রান্ত হইলে রাজ্য রক্ষা না হইয়া মহারাজের প্রজা সমূহের ধন প্রাণ ধর্ম কিছুই রক্ষা হইবে না। আপনার শৈশব পুত্রের

দ্বারা এই সমস্ত রক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব এবং আমরাও যে এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিব সে ক্ষমতাও মহারাজ আমাদের নাই। কারণ রাজবুদ্ধি বা রাজনীতি বিষয়ক বুদ্ধি আমাদের আপনার মতন নাই এবং তাহা আমাদের হইতে পারে না। কারণ রাজ্য সম্বন্ধে কি করা ভাল বা কি করা অন্যায় তাহা প্রজাবৎসল রাজার যেরূপ জ্ঞান থাকা সম্ভব তাহা অপরের পক্ষে একেবারে অসম্ভব, কারণ নিজের ব্যথা নিজে যতটা বোধ করা যায় অপরে ততটা বোধ করিতে পারে না। সুতরাং এমত অবস্থায় মহারাজের জীবন রক্ষা করা অগ্রে প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দাতা মাত্র, আমরা রাজ আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্য শৃঙ্খলাভাবে করিতে অসমর্থ। আমাদের একক কাহার দ্বারায় বা সকলে মিলিয়াও কোন কার্য্য সুচারু রূপে নির্বাহ হওয়া সুদূর পরাহত। কারণ আমরা পাঁচজনে মিলিয়া কোন কার্য্য করিতে যাইলেই নানা মুনির নানা মত হইয়া কার্য্য ভ্রষ্ট হওয়াই সম্ভব। আমরা বিশেষ, জীব স্বার্থপর যে যার আপন স্বার্থ রক্ষার্থে আপন আপন মতের পোষকতা সমর্থন করিতেই ব্যস্ত। তাহার পর রাজার অবর্তমানে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া আপন আপন স্বার্থ রক্ষার্থে যত্নপর হওয়াও অসম্ভব নহে এবং প্রজাকুলও তখন রাজ বিধান অমান্য করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না এবং প্রজাগণ স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরের হিংসা দ্বেষ করিতেও ভীত হইবে না। তখন যাহা যতটুকু বল আছে সে তাহার সেই বল অপরের প্রতি প্রয়োগ করিয়া অপরের যথা সর্বস্ব হরণ করিতে দ্বিধা বোধ না করিয়া নিজেই প্রধান হইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে তাহা আর সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের বর্তমান রাজশক্তির অবর্তমানতা নিশ্চয়ই আমাদের কাহার অভিপ্রেত নহে জানিবেন। মহারাজ বর্তমান থাকিলে মহারাজের পুত্র পুনরায় হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু মহারাজের সদ্য প্রসূত শৈশব পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া যদি মহারাজের দেহত্যাগ হয় তাহা হইলে মহারাজের রাজ্যের সহিত মহারাজের শৈশব পুত্র ও অপর শত্রু কর্তৃক নিহত হইতে পারে। তখন রাজ্যও যাইবে, পুত্রও যাইবে এবং অরাজকতা সকলের এবং মহারাজের প্রজাবৃন্দের অনুরোধ মহারাজ আমাদিগকে মহারাজের পুত্র বধের আজ্ঞা প্রদান করিয়া মহারাজের প্রজাকুলকে রক্ষা করুন।

রাজা মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে কহিলেন, মন্ত্রীবর! এমত অবস্থায় আর আমি কি বলিব, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহা আমার অগোচরে করিও, তবে আমার রাজ্য মধ্যে আমার পুত্রকে বধ না করিয়া আমার রাজ্যের বহির্ভাগে পুত্রকে লইয়া গিয়া তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। রাজা এইরূপ আজ্ঞা মন্ত্রিবরকে প্রদান করিয়া অশ্রুবিগলিতনেত্রে স্তম্ভিতের ন্যায় মৌনভাবে ক্ষণিক বসিয়া তাহা পর অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিতে করিতে রাজসভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে রাণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, মন্ত্রী, রাণীকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া পুত্র প্রসবকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সময়ে দৈব-প্রসাদাৎ রাণী পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান প্রসব হইলে জ্যোতিষীরা বলিল দেখুন, আমরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলাম পুত্র হইবে তাহা হইল, তখন এই পুত্রের মুখ দর্শন করিলে রাজারও মৃত্যু হইবে। ইহাতে মন্ত্রীবরেরও জ্যোতিষীগণের উপর কথঞ্চিৎ বিশ্বাসও হইল, কিন্তু মন্ত্রীবর জানেন না যে "ঝড়ে কাকা মরে পীরের কেরামত বাড়ে"। ঝড় দৈব বশতঃ হইয়া থাকে, পীর অমনি বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম ঝড়ে কাক মরিবে, তাই কাক মরিল। জ্যোতিষীগণের বাক্যও তদ্রূপ, কিন্তু দুঃখের বিষয় মন্ত্রী তাহা না বুঝিয়া—সন্দেহের বশবর্তী হইয়া রাণীর নিকট হইতে, রাজপুত্রের নাভিচ্ছেদ করা হইলে পর ধাত্রীর দ্বারায় কৌশলে আনয়ন করাইয়া, তাহার পর কয়েকজন ঘাতককে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন দেখ, তোমরা এই সদ্য প্রসূত রাজপুত্রকে রাজাজ্ঞমত আমাদের রাজ্যের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া ইহাকে বধ করিয়া ইহার রক্ত আনিয়া আমাকে দর্শন করাইবে। তবে সাবধান, আমাদের রাজ্যমধ্যে যেন বধকার্য্য করিও না। আমাদের রাজ্যমধ্যে রাজশিশু মারা না যায়, একারণ কিছু দুগ্ধ ইহাকে পান করাইতে করাইতে লইয়া গিয়া রাজ্যের বহির্ভাগে ইহাকে বধ করিও। ইহা বলিয়া মন্ত্রীবর রাজশিশুকে ঘাতকের হস্তে অর্পণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

ঘাতকেরা রাজশিশুকে অতি যত্নের সহিত রাত্রে তথা হইতে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং রাত্রের মধ্যে বহুদূরে আসিয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইলে, রাস্তার একস্থানে তাহারা সকলে আহারাদি করিয়া লইল এবং বালকের জন্য কিছু দুগ্ধ ও সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বালককে কোলে করিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দশ পনর দিনের পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা তাহাদের রাজার রাজত্বের বাহিরে আসিয়া পড়িল। এই কয়দিন তাহারা বালকের সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে আসায় বালকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বালকের প্রতি তাহাদের সকলেরই বিশেষ স্নেহভাব হইয়াছে। ঘাতকগণের মধ্যে যে ঘাতকটি সর্বপ্রধান, সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভাই সকল! এই রাজশিশুকে আমরা কয়েকদিন ধরিয়া যত্নের সহিত লালন পালন করায় ইহার প্রতি কেন কি জানি একটা স্নেহভাব আমার আসিয়া পড়িয়াছে; বিশেষ এই শিশু রাজকুমার, ইহার শ্রী ও রাজোচিত, ইহাকে আমার বধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। রাজা ও মন্ত্রী, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত জ্যোতিষীগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইহাকে বধ করিবার জন্য আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। রাজা ও মন্ত্রীর মাথা খারাপ হওয়ায় বুদ্ধি শূন্য হইয়াছে, তাহা না হইলে দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। সাধারণ লোকে কহিয়া থাকে দৈবজ্ঞি (দৈবজ্ঞ) খায় ভাঁড়িয়ে (ঠকাইয়া) ইহা আমরাও জানি,

আর আমাদের রাজা ও মন্ত্রী এত বিবেচক হইয়াও দৈবজ্ঞির কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজপুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই বালককে বধ না করিয়া ইহাকে কাহাকেও দিয়া তৎপরে একটা কুকুর বা অপর কোন জন্তুকে মারিয়া তাহার রক্ত লইয়া গিয়া মন্ত্রীকে সেই জন্তুর রক্ত দেখাইয়া বলিব যে, এই রাজপুত্রের রক্ত দেখুন, ইহাতে ভাই তোমাদের কি মত তাহা বল।

প্রধান ঘাতকের এই বাক্যে শ্রবণ করিয়া অপর ঘাতকেরা বলিল, ভাই আমরাও পূর্ব হইতে পরস্পরে তুমি যাহা বলিলে তাহাই ভাবিতেছি, তবে তোমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই। এই রাজপুত্রকে দর্শন করিলে সাধারণতঃ ইহার প্রতি হিংসা করিতে কাহার ইচ্ছা হয় না। আমরা ঘাতক, রাজ হুকুমে আমাদিগকে নিত্যই প্রায় প্রাণদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত মানবকে বধ করিতে হয়, তাহাতে আমাদের কোন রকমই মমতা প্রায় আসে না। কিন্তু এই বালকের মুখ দর্শন করা পর্য্যন্ত দিন দিন যেন কেমন একটা মমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। আহা! ইহার মুখ কান্তি যেন কলঙ্ক হীন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, ইহার চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই অতি পাষন্ডেরও মন দ্রবীভূত হয়। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য, আমাদের মত পাষন্ড আর জগতে কে আছে, কারণ আমাদের জীব হত্যা করাই ব্যবসা, সুতরাং আমাদেরই যখন ইহার প্রতি দয়াভাব আসিতেছে তখন অপরের সম্বন্ধে আর কথা কি আছে। ইহার আকর্ণ বিস্তারিত চক্ষু দু'টি যেন আরক্তবর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়; ইহার চক্ষু দর্শন করিয়া মৃগকুল যেন লজ্জিত হইয়া থাকে। আহা কিবা ভ্রূযুগলের গঠন, বিধাতা যেন তুলির দ্বারায় অঙ্কিত করিয়াছেন। আজানুলম্বিত বাহু, করকমল দুখানিও আরক্তবর্ণ, ইহাকে পদ্ম হস্ত লোকে কহিয়া থাকে। আবার দেখেছো ভাই, ওষ্ঠাধর দু'খানিতে যেন অরুণাভা দিতেছে, গাত্রবর্ণও যাহা দেখিতেছি তাহাও যেন অপরূপ ও অতুলনীয় এরূপ বর্ণও কাহার ত' দেখি নাই, বিধাতা যেন নির্জ্জনে বসিয়া এই বালককে গঠিত করিয়াছেন। যাহা হউক ভাই, এই বালককে হত্যা করা হইবে না। তুমি যাহা বলিয়াছ একটা কোন জন্তু মারিয়া মন্ত্রিকে দেখান, আমাদের মতও তাহাই। এই রাজকুমারকে বধ করিয়া বিধাতার অপূর্ব চিত্রপুত্তলি নষ্ট করা বিধেয় নহে। ভাই তবে আর বিলম্ব না করিয়া ঐ অনতিদূরে যে একটি কুটির দেখা যাইতেছে (উহাতে নিশ্চয় লোকের বাস আছে) চল এই বেলা আমরা ঐ কুটিরের দ্বারদেশে বালকটিকে রাখিয়া প্রস্থান করি। ভগবান নিশ্চয় এই বালককে (তথায় কেহ না থাকিলেও) রক্ষা করিবেন। এরপরে বেলা হইয়া গেলে লোকে জানিতে পারিবে ও গোলযোগ হইতে পারে, সবে মাত্র এই ভোর হইতেছে, এক্ষণেই প্রশস্ত সময়। ইহা বলিবামাত্র সকলে এক মত হইয়া শিশুটিকে কোলে করিয়া সেই কুটিরাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছুক্ষণ পরেই তারা কুটিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কুটির অভ্যন্তর হইতে একটি অর্দ্ধ প্রাচীনা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিতেছে।

প্রধান ঘাতক মনে করিল এ অবস্থায় কুটীরের দ্বারদেশে শিশুকে ফেলিয়া যাইলে যদি ঐ স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে তাহা হইলে লোকজন আসিয়া একটা গোলযোগ করিতে পারে এবং মন্তব্য বিষয়ও প্রকাশ হইতে পারে। এই কারণে প্রধান ঘাতক স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া বলিল, বাছা! তুমি একটি পুত্র সন্তান লইবে; ইহা বলিবামাত্র স্ত্রীলোকটি মনে ভাবিল, আমাকে ইহারা বিদ্রূপ করিতেছে। একটু রাগান্বিতভাবে বলিল, কেন, আমার পুত্র কন্যা নাই বলিয়া তোমরা আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ। ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দু'চারটা কটু বাক্য বলিতে লাগিল। তাহাতে প্রধান ঘাতক বলিল, না মা আমরা তোমাকে বিদ্রূপ বা রাগান্বিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলিতেছি না। সত্যই বলিতেছি, আমরা এই শিশুটিকে পাইয়াছি। আমরা দূরদেশে যাইব, এ শিশুটিকে লইয়া আমরা কোথায় যাইব। আরো বিশষ আমরা পুরুষ মানুষ, শিশুর সেবা শুশ্রূষা ও ঠিকভাবে করিতে না পারায় হয়ত শিশুটি মারা যাইতে পারে, অতএব তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। তোমার পুত্র কন্যা যখন নাই বলিতেছ তখন এই শিশুটিকে পুত্রবৎ মানুষ কর, আরো বিশেষ ইহাকে অল্প বয়স হইতে মানুষ করিলে, পরে ইহার বয়স হইলে তোমাকেই মা বলিয়া জানিবে। কারণ ইহার জন্মদাতা কে এবং ইহার মাতাই বা কে তাহা এক্ষণে কিছু অবগত নহে। এখন যাহাদের নিকট প্রতিপালিত হইবে তাহাদিগকেই পিতা মাতা বলিয়া জানিবে, অতএব বাছা তুমি এই শিশু গ্রহণ কর। ইহা বলিয়া প্রধান ঘাতক নিজ ক্রোড় হইতে শিশুটিকে তাহাকে দিয়া দ্রুত পদ বিক্ষেপে তথা হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর একটা ছাগলের রক্ত একটা পাত্র করিয়া লইয়া গিয়া কিছুদিন পরে মন্ত্রকে বলিল এই শিশুর রক্ত দর্শন করুন। ইহা বলিয়া তাহারা ক্রন্দন করিতে লাগিল, মন্ত্রীবরও ক্রন্দন করিলেন, তাহার পর ঘাতকেরা আপন স্থানে চলিয়া গেল, মন্ত্রীবর ও প্রজাবর্গ সকলেই নিশ্চিন্ত হইল, কেবল রাজা ও রাণী কিছুকাল পর্য্যন্ত শোকে অধৈর্য্য ভাবে রহিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ শোক সম্বরণ করিয়া রাজকর্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ওদিকে স্ত্রীলোকটি যখন দেখিল তাহারা শিশুকে তাহার নিকট রাখিয়া ক্রমশঃ দৃষ্টিপথের অতীত হইল, তখন সে শিশুটিকে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার স্বামী এই ঘটনার পূর্বরাত্র হইতে বাটীতে ছিল না, তাহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়াছিল। ইহারা জাতিতে চাঁড়াল (চণ্ডাল), স্ত্রীলোকটি কুটীর মধ্যে আপন শয়ন গৃহে আসিয়া শয্যার মধ্যে শিশুটিকে শয়ন করাইয়া গাত্রে বস্ত্রাদি ঢাকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে যাইল। দোহনান্তে তাহা গরম করিয়া (জ্বাল দিয়া) শিশুকে কোলে লইয়া দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিল। শিশুও বেশ আনন্দের সহিত দুগ্ধ পান করিতেছে এবং বালস্বভাব প্রযুক্ত শিশুটি এক একবার ক্রন্দনও করিতেছে। এমন সময় স্ত্রীলোকটির স্বামী আসিয়া

উপস্থিত হইয়া কুটীর মধ্য হইতে ছোট শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ভাবিতে লাগিল, ঘরের মধ্যে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি হইতেছে কেন। কোন স্থান হইতে কি কেহ আমার কুটীরে অভ্যাগত আসিয়াছে, যাহা হউক, ইহা ভাবিয়া সে আপন কুটীর দ্বারে আঘাত করিয়া তাহার স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিল; স্ত্রীলোকটি তাহার পতির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, কুটীরের বহির্ভাগে আসিয়া বাহিরের দিকের দ্বার খুলিয়া দিয়া সে আপন পতিকে বলিল, দেখুন, অদ্য এক মহারত্ন পাইয়াছি। ইহা বলিয়া শিশু প্রাপ্তির সমস্ত ঘটনা আপন স্বামীকে জ্ঞাপন করিয়া শেষে বলিল ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া এই অমূল্যরত্ন প্রদান করিয়াছেন।

যে চারিজন লোক এই পুত্রটি দিয়া গেল, তাহারা দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল, তাহার পর আমি গাভী দোহন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ জ্বাল দিয়া শিশুকে খাওয়াইতেছি। এমন সময় আপনার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুত্রটিকে কোলে করিয়াই আপনার নিকটস্থ হইয়াছি। এ আমাদের ঈশ্বর দত্ত ধন, আপনিও ইহাকে পুত্রবোধে কোলে করিয়া জীবন সার্থক করুন। ইহা বলিয়াই পুত্রটিকে আপন ক্রোড় হইতে চন্ডালের ক্রোড়ে দিল, চন্ডাল অপুত্রক থাকায় তাহার মনে পূর্ব হইতে একটা পুত্র অভাব জনিত দারুণ কষ্ট ছিল। সে পুত্র কোলে করিয়া অপত্যবৎ স্নেহের সহিত অনিমেষ লোচনে কিয়ৎক্ষণ পুত্রটিকে অবলোকন করিয়া পরিশেষে পুত্রটির মুখচুম্বন করিতে করিতে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেখ তুমি অদ্য হইতে মাস খানেক বাটীর বাহির হইও না, আমি সকলকে বলিব ভগবৎ প্রসাদাৎ আমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। আমাদের বাড়ীতে সচরাচর কেহ প্রায় আইসেও না, কারণ গ্রাম হইতে আমাদের বাড়ী প্রায় দুক্রোশ ব্যবধান হইবে। মধ্যে মাঠ থাকায় লোক সমাগম প্রায় হয় না, তত্রাচ তুমি একমাস কাল ঘরের মধ্যেই থাকিও কি জানি যদি কেহ দেখিতে পায়। তাহার পর দু তিন মাস গত হইলে আর কাহার কোন রকম সন্দেহ হইবে না। তখন সকলেই জানিবে যে সন্তান আমাদেরই এবং তখন আর কাহার কোন রকম সন্দেহের কারণ থাকিবে না।

চণ্ডালপত্নী নিজ পতির কথামত সেই দিন হইতে আর গৃহের বাহিরে যাইত না। বাড়ীর মধ্যে থাকিয়াই শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিল এবং চণ্ডালও সকলকে জানাইতে লাগিল যে আমি অপুত্রক ছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। সাধারণ ভদ্রলোক মাত্রেই সামাজিক নিয়মানুযায়ী চণ্ডালের বাটিতে প্রবেশ করিলে অপবিত্র হইতে হয়, এই আশঙ্কার বশবর্তী থাকায় কেহই তাহাদের বাটীতে প্রবেশ না করাই সকলেই ভাবিল সম্ভবতঃ তাহার পুত্র সন্তান হইয়াছে। এখন হইতে আর তাহাকে অপুত্রক বলিয়া (আঁটকুড়ো ইত্যাদি বলিয়া) অপরের রহস্য করা বন্ধ করিয়া দিল। ওদিকে রাজপুত্রও চণ্ডাল গৃহে শশীকলার

ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয় চণ্ডালের জমি জমা কিছু থাকিলেও তাহা পূর্বে প্রায় অজন্মা হইয়া সামান্য মাত্র জীবন ধারণের উপযোগী যাহা ফসল হইত তাহাতে কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটাইত। তাহার দশ বিঘা ধান্য জমি ছিল এবং পাঁচ বিঘা বাড়ী জমি অর্থাৎ রবি ফসলের জমি ছিল এবং দু'টি হালের বলদ ও দু'টি মাত্র গাভী ছিল। পুত্রটি আসার পূর্বে গাভী দু'টির এক সের পাঁচ পোয়া মাত্র দুগ্ধ হইত এক্ষণে পুত্রটি প্রাপ্ত হইবার পর হইতে গাভী দু'টি দু'বেলায় আট দশ সের দুধ দিতে লাগিল এবং চাষের জমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার বাড়ীর চারি পাশে যে সকল আম্র কাঁঠাল ইত্যাদির বৃক্ষ ছিল তাহাতে প্রায়শঃ ফল উৎপন্ন হইত না। এক্ষণে ভগবৎ কৃপায় ঐ সকল বৃক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট নানাবিধ ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সকলেই ভাবিল চণ্ডাল এতদিন অপুত্রক থাকায় তাহার সকল দিকেই অভাব ছিল, এক্ষণে পুত্র ভাগ্যে তাহার বৃক্ষাদি এবং চাষের জমি ফলপ্রদ হইতেছে।

যাহা হউক এক্ষণে চণ্ডালের গৃহে আর অন্নকষ্ট নাই এবং ক্ষেত্রজাত ফসল বর্তমানে যাহা উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহা হইতে সে আপন সম্বৎসরের মত খোরাকির উপযুক্ত ফসল গৃহে গোলাজাত করিয়া বাকী ফসল বিক্রয় দ্বারা ক্রমশঃ আর্থিক উন্নতি করিতে লাগিল; বর্তমানে চণ্ডাল গৃহে আর কোন রকম অভাব নাই। এক্ষণে তাহার বাড়ীতেই বাজার এবং খাবারের দোকান; কারণ চণ্ডাল পত্নী দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখন উৎপন্ন করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক আহার্য্য দ্রব্য সকল আপনাদের আবশ্যক মত তৈয়ার করিয়া থাকে। কোন দ্রব্যই বাজার হইতে খরিদ করিতে হয় না। তাহার গৃহেই রাজ ভোগের উপযুক্ত আহারীয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পুত্রটিও উৎকৃষ্ট দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি আহার করিয়া ভগবৎ ইচ্ছায় এক্ষণে পঞ্চম বৎসরে উপনীত হইয়াছে। পুত্রটিকে যে দেখে সেই বলিয়া থাকে, আহা! চণ্ডালের পুত্রটির ন্যায় এমন সুন্দর পুত্র প্রায় দেখা যায় না। চণ্ডালের গৃহে এমন পুত্রত' কখন দেখি নাই। পুত্রটিকে দেখিলেই কোলে করিয়া আদর করিতে ইচ্ছা হয়; তবে চণ্ডালের পুত্র অস্পৃশ্য সুতরাং কেহ স্পর্শ করে না। পুত্রটি যেন অজাতশত্রু। প্রাণী মাত্রেই তাহার শত্রু নাই বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাহার সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ, পুত্রটির কন্দর্প সদৃশ্য দেহের গঠন, আকার্ণায়ত চক্ষু, ভ্রূযুগল দেখিলে বোধ হয় যেন কোন চিত্রকর নিজ তুলিকার দ্বারা নির্জনে বসিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার আজানুলম্বিত বাহু, নাতিস্থূল নাতিকৃশ দেহ। বালকের গাত্র বর্ণ দেখিয়া সুবর্ণ চম্পক লজ্জিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় এবং কপোলদ্বয় যেন অলক্তক দ্বারা সর্বদা স্বাভাবিক ভাবে রঞ্জিত হইয়া আছে এবং বদন মন্ডলে ছটা বিকশিত হইয়া সদাই প্রফুল্ল ভাবে চণ্ডালের গৃহ আলোকিত করিতেছে। নন্দ-যশোদার গৃহে শ্রীগোপাল যেমন প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তদ্রূপ রাজপুত্র চণ্ডালের গৃহে লালিত-পালিত হইয়া নিজেকে চণ্ডালপুত্র

বোধে পিতামাতার বশে চলিতে লাগিলেন। তিনি যে রাজপুত্র তাহা তাঁহার বা অপর সাধারণের জানা ছিল না।

একদা বালকটি বাটীর বহির্ভাগে মাঠের ধারে একাকী বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে একজন সাধু বালকটির সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি। সে বলিল "আমার নাম বিজয়"। সাধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন জাতীয়"। বালক উত্তর করিল, "আমরা চাঁড়াল।" পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় বালক উত্তর করিল "ভীমদাস চাঁড়াল"। সাধু ক্ষণকাল স্থির ভাবে তাঁহার অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া বালকটিকে বলিলেন, "না বাপু! তুমি চণ্ডাল পুত্র নহ, তুমি রাজপুত্র"। বালকটি সাধুর কথার উত্তরে বলিল, "আপনাকে বিজ্ঞ ও সাধুর মত দেখিতেছি আপনি কেন আমাকে উপহাস করিতেছেন। আমি আপনার বাক্যে লজ্জাবোধ করিতেছি। আমি রাজপুত্র নহি। আমার পিতা সমস্তই বর্তমান আছেন আমার বাড়ী ঐ সম্মুখে, আপনি আমাকে রাজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। কারণ আমি রাজার জাতীয় নহি এবং রাজপুত্রও নহি। আমার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর হইয়াছে। ইহা আমার পিতামাতার নিকট শুনিয়াছি। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি পিতা মাতার নিকট শুনি নাই যে আমার পিতা রাজা। আমার পিতা কৃষি কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি এবং জাতি হিসাবে আমরা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য, সমাজে আমাদিগের ছায়া পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করে না। এমত স্থলে আপনি আমাকে রাজপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। তাহাতে আমার মনে দারুণ কষ্ট বোধ হইবে"।

সাধু, বালকের ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি সত্যই রাজপুত্র, তুমি তাহা অবগত নহ। কারণ বর্তমানে তুমি যাহাদিগের গৃহে লালিত পালিত হইতেছ তাহাদিগকেই পিতা মাতা বলিয়া জানিয়াছ। তোমার ঐ পিতামাতা তোমাকে অতি শিশুকাল হইতেই লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। তোমার পূর্ববৃত্তান্ত তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই এবং তুমি যে রাজপুত্র তাহাও তাঁহারা জানেন না। তোমার মাতা তোমাকে অযাচিত ভাবে দৈব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া অপত্য নির্বিশেষে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। তোমার বর্তমান পিতামাতা বা অপর সাধারণ কেহই এ রহস্য অবগত নহেন। সাধুর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঠাকুর! আমার অপরাধ লইবেন না, আমার মনে কিছুতেই আপনার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন হইতেছে না বরং আপনার বাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া কষ্টই অনুভব করিতেছি। অতএব আপনি আমাকে রাজপুত্র না বলিয়া চণ্ডালপুত্র বলিয়া সম্বোধন করুন তাহাতে আমার মনে আনন্দ হইবে। আরো বিশেষ আমি যদি সত্যই রাজপুত্র হই, তাহাতে আমার কি লাভ হইবে? তাঁহারা ত' আমাকে গ্রহণ করিবেন না; কারণ আমি চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং চণ্ডালের

সহবাসে থাকায় ও তাহাদের অন্নজল পান করায় আমি চণ্ডালত্বই প্রাপ্ত হইয়াছি; এখানে আমার কোন প্রকার কষ্ট নাই বরং আমি বর্তমানে রাজসুখেই আছি। আমার বর্তমান পিতা সত্যই চণ্ডাল হন আমার পক্ষে তিনিই রাজা; আমি অপর কোন রাজাকে পিতা বলিতে প্রস্তুত নহি।

সাধু, বালকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি অজ্ঞান বশতঃ এসকল বাক্যপ্রয়োগ করিতেছ। যাহা হউক আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের বাটীতে যাইয়া তোমার পিতামাতার নিকট এসকল কথা বলিয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিব। এই বলিয়া সাধু বালকের সঙ্গে চণ্ডাল গৃহে যাইলেন। বালকের বাড়ী অতি নিকটেই ছিল; অল্প সময়ের মধ্যেই বালক সাধুকে সঙ্গে লইয়া আপন বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে, বালকের পিতাও বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। বালক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। চণ্ডাল ও চণ্ডালপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; পুত্রের ডাক শুনিয়া উভয়েই গৃহের বাহির আসিয়া দেখিল পুত্রের সঙ্গে একটি সাধু আসিয়াছেন। সাধুকে দর্শন করিবামাত্র তাহারা উভয়ের সাধুর পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং পুত্রকেও তদ্রূপ প্রণত করাইল ও চণ্ডালপত্নী বালককে স্বীয় ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। তৎপরে উভয়ে যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া সাধুকে অতিথি বোধে বলিল, আজ আমাদের ভিটাতে আপনার পদধুলি পড়ায় আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ধন্য হইলাম; আজ্ঞা হইলে আপনার সেবা কার্য্যে আমরা সাধ্যমত ব্রতী হই। সাধু চণ্ডালের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের বিনয় নম্র ব্যবহারে অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। আমি সাধু নহি; যাঁহারা সাধন দ্বারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু পদবাচ্য, অপরে নহেন। আমি সাধু, এই অভিমান যাঁহাদের আছে এবং যাঁহারা নিজেকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন বা শিষ্য কর্ত্তৃক সাধু বলিয়া অভিহিত ও অপরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারাও সাধু পদবাচ্য নহেন। আমি সাধু কি অসাধু তাহা জানি না; তুমিও তাহা জান না; সাধু না হইলে কেহ সাধু চিনিতে পারে না। আমি বর্তমানে তোমাদের নিকট অতিথি মাত্র; আমার সেবার জন্য তোমাদের ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই; আমার সেবারও প্রয়োজন নাই আমি সেরূপ আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের নিকট করি না। তবে আমি তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত আছি, কারণ তোমাদের অন্তরে সাধু ভাব দেখিতেছি। তোমাদের আতিথ্য গ্রহণের পূর্বে একটি বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদানে তোমরা স্বীকৃত হইলে তাহার পর আমি তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিব, নচেৎ নহে।

সাধুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া—চণ্ডাল বিনীত ও নম্রভাবে সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ঠাকুর, যাহা আপনার জিজ্ঞাস্য আছে তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ

করিয়া বলুন আমরা কিছুই গোপন না করিয়া তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিব ইহা আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; অতএব জিজ্ঞাস বিষয় বলিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ইহাই আমাদের নিবেদন। তৎপরে সাধু বলিলেন, "এই বালকটি তোমার ঔরসজাত পুত্র কি না ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়।" সাধুর বাক্য চণ্ডাল ও চণ্ডালপত্নী শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ চিত্রপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সাধুকে সম্বোধনপূর্বক চণ্ডাল বলিল—ঠাকুর! অদ্য যে বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করিলেন অবশ্য ইহার যথার্থ উত্তর আমরা আপনাকে প্রদান করিব তাহাতে আর কোন সন্দেহমাত্র নাই, তবে এই প্রশ্ন অপরে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে অদ্য একটা মহা বিভ্রাট নিশ্চয়ই ঘটিত। কারণ আমরা জাতিতে চণ্ডাল, লোকে সাধারণতঃ কহিয়া থাকে রাগ চণ্ডাল। স্বভাবতঃই আমাদের উগ্র প্রকৃতি, সামান্য কারণে হঠাৎ ক্রোধিত হইয়া পড়ি। আমি বহুকাল হইতে অপুত্রক ছিলাম, একারণ আমাদিগকে কেহ আঠকুঁড়ো (অপুত্রক) বলিলে আমরা তাহার উপর ক্রোধিত হইয়া মারিয়াও বসিতাম। আজ কেন যে সেভাবে আমাদের উদয় হইল না তাহা এক্ষণে বুঝিতেছি। আপনার সম্মুখে আমরা উপস্থিত থাকায় আমাদের চণ্ডালত্ব ভাব থাকিলেও সেই চণ্ডালের ক্রোধ ভাব উদয় হয় নাই। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আপনি সমস্তই অবগত আছেন, আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্যই উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সাধু, বালকের পিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ সহকারে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ, তুমি বা তোমরা চণ্ডাল নহ, কারণ জীবমাত্রই শিব স্বরূপ; জীবন কখনও চণ্ডাল হইতে পারে না। জীবদেহে যে ক্রোধভাব এবং হিংসাভাব রহিয়াছে সেই ক্রোধভাবই চণ্ডাল পদবাচ্য এবং হিংসা ভাবই চণ্ডালিনী পদবাচ্য। ক্রোধের কার্য্যকারণ শক্তি হিংসা; জীবনের প্রতি এই হিংসাভাবই চণ্ডালিনী। যে, হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসা কার্য্যে রমণ করিয়া থাকে, হিংসাতে রমণ করা হেতু সেও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র প্রাণী বধ করাকে যে হিংসা কহা যায় তাহা নহে। প্রাণী বধ করাও হিংসা এবং জীবনের ক্ষতি করিবার চেষ্টা এবং অপকার, দ্বেষ ও ঈর্ষা করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা করাও হিংসা পদবাচ্য। এইরূপ ক্রোধযুক্ত হইয়া যাহারা হিংসা বা অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে সামাজিক উচ্চবর্ণ হইলেও তাহারা অস্পৃশ্য চণ্ডাল। তোমরা তাহা নহ; কারণ তোমাদের মধ্যে অনেক সদগুণ দেখিতেছি; জীবনের প্রতি তোমাদের দয়াভাব রহিয়াছে। যেখানে দয়াভাব সতত বিরাজ করে, সেখানে হিংসা ভাবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তোমাদের অন্তঃকরণে ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছাও বলবৎ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তোমরা অস্পৃশ্য চণ্ডাল হইতে পার না। যাহারা পূর্বোক্তরূপ সতত হিংসার কার্য্যে রত থাকে, তাহারাই ক্রোধের এবং হিংসার বশবর্ত্তী হওয়ায় চণ্ডালভাব প্রাপ্ত

হইয়াছে। ক্রোধ ভাবই প্রকৃত 'চণ্ডাল' এবং হিংসা ভাবই প্রকৃত চণ্ডালিনী পদবাচ্য। জীব যে চণ্ডাল, তাহা কদাচ হইতে পারে না। শাস্ত্রকার যাঁহারা, তাঁহারা ঋষি পদবাচ্য; তাঁহারা জীবকে রিপুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার মানসে, যে সকল জীবেতে রিপু এবং রিপুগণের অনুচর বর্গের কার্য্যাধিক্য দেখিয়াছেন সেই সকল জীবনের সঙ্গ রহিত করিবার মানসে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে অস্পৃশ্যজাতি হইলে তাহাদের সঙ্গ ভাল লোকে আর কেহ করিবে না। ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়, জীব যে চণ্ডাল তাহা তাঁহাদের বলিবার অভিমত নহে। শাস্ত্রাদিতে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যে কেহ চণ্ডাল স্পর্শ করিবে, গঙ্গাস্নান বা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিলে সে শুদ্ধ হইবে। কোন একটি শাসন বাক্য ধর্মের সহিত যোগ থাকিলে ভাল লোকে তাহা অবশ্য পালন করিবে বলিয়া গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা বা গঙ্গাজল স্পর্শের বিধি করিয়াছেন। গঙ্গাস্নান যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহা সাধারণ জীবনের প্রায়শঃ হয় না। বাহ্যিক যে নদীকে গঙ্গা কহস যায়, তাহাতে অবগাহন করিলে মনোমালিন্য দূর হয় না। তবে তাহাতে শরীরের মলমাত্র ধৌত হইয়া থাকে।

জ্ঞানই গঙ্গাপাদবাচ্য। এই জ্ঞান গঙ্গা ত্রিলোকে তিনটি প্রশস্ত স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল— এই তিনটিকে ত্রিলোক কহা যায়। মানব শরীরেই ত্রিলোক রহিয়াছে। মানবদেহে কণ্ঠের ঊর্দ্ধে ভ্রূ স্থান পর্য্যন্ত স্বর্গ; নাভির ঊর্দ্ধ কণ্ঠের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত মর্ত্যলোক; নাভির অধোভাগ্যে গুহ্যদেশ হইতে পতদল পর্য্যন্ত পাতাল। এই তিন স্থানে তিন প্রকার জ্ঞানরূপ গঙ্গা রহিয়াছেন। কণ্ঠের অধঃ নাভির ঊর্দ্ধে এই স্থানের মধ্যে যাঁহাদের লক্ষ্য থাকে তাঁহাদের রাজসিক জ্ঞান মাত্র থাকে। তাহাতে অর্থাৎ মধ্যাবস্থার স্রোতে যাঁহারা অবগাহন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা মধ্য অবস্থার স্রোতে পড়িয়া—রাজসিক ভাবে ডুবিয়া কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের রাজসিক জ্ঞান থাকা হেতু তাঁহারা বাহ্যিক গঙ্গানদীকেই গঙ্গা মনে করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আপনাকে আপনি ক্ষণিক শুদ্ধ মনে করিয়া তারপর যথা পূর্ব্বং তথাপরং অর্থাৎ মনোমালিন্য দূর না হওয়াতে পূর্বেও যেমন অবস্থায় ছিল পরেও সেই মত থাকে অর্থাৎ রাজসিক ভাবেই থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক ভাবে স্বর্গরূপ জ্ঞান গঙ্গায় অবগাহনরূপ ডুব না দেওয়া হেতু মনোমালিন্য দূর না হওয়াতে আপনাকে আপনি সর্বদাই অশুচি বোধ করিয়া থাকে এবং পাপের নাশ না হওয়ায় পাপতাপে তাপিত হইয়া নানা জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। মর্তলোকে রাজসিক জ্ঞানরূপ গঙ্গা রজোগুণ ব্রহ্মার কুক্ষি গহ্বররূপ কমন্ডলু মধ্যে বাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ নাভিমন্ডলের দক্ষিণ ভাগে কুক্ষি স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ইনি মোক্ষপ্রদ নহেন অর্থাৎ রাজসিক জ্ঞান মোক্ষপ্রদ নহেন। তাহার পর অপর দুটি জ্ঞান গঙ্গার বিষয় বলিব শ্রবণ কর।

গঙ্গা বায়ুরূপী নদী বিশেষ। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সকলেই জানেন; পাদপদ্ম হইতে

উদ্ভব হইয়াছেন। বিষ্ণু সত্বগুণ ইহার স্থান পূর্বে বলিয়াছি; কণ্ঠের ঊর্দ্ধে ভ্রূ পর্য্যন্ত এই স্থানই স্বর্গ বলিয়া সাধুগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই স্থানে সত্বগুণ বিশিষ্ট; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ স্থির প্রাণ। স্থির প্রাণের ব্যাপকত্ব হেতু স্থির প্রাণের উপাধি বিষ্ণু; এই স্থির প্রাণই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন একারণ ইহাকে বিষ্ণু বলা হইয়া থাকে। কণ্ঠের ঊর্দ্ধে স্থির প্রাণের মন্দাগতি থাকায় এই স্থানের যে নিজবোধ রূপ জ্ঞান তাহাকেই মন্দাকিনী নামক স্বর্গ গঙ্গা কহা যায়। ইহাতে যে জীবন মন অবগাহন করে তাহার সর্বপাপ ক্ষয় হয়; নচেৎ নহে। এখানে সাত্ত্বিক জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে; কোটি চন্দ্র ও কোটি সূর্য্যের তেজ বিশিষ্ট জ্যোতিঃ অথচ কোমল দেখিলে বোধ হয় যেন কোমল জ্যোতিঃ সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাকেই জ্ঞানাগ্নি কহা যায়। সাধারণ অগ্নিতে যেমন সকল পার্থিব ভস্ম রাশিতে পরিণত হইয়া থাকে তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা জন্মজন্মার্জ্জিত মনের পাপ রাশি দগ্ধ হইয়া মন আত্মরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে "জ্ঞানাগ্নিনা পাপং সর্বং দহতি বেদবিদ্"। বেদ, উপনিষদের পুস্তক পাঠে মাত্র কেহ বেদবিদ্ হইতে পারে না বা বেদমন্ত্র কেবল মাত্র উচ্চারণ দ্বারাও কেহ বেদবিদ্ হইতে পারে না ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। আত্মকর্ম দ্বারা যাঁহার পরমাত্ম জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে তাঁহাকেই একমাত্র বেদবিদ্ বলা যায়। মুখ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ মাত্র করিলে কেহ বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না। ইহা নিশ্চয় জানিবে। যাহা হউক, তোমাদের স্বর্গগঙ্গা এবং মর্ত্যগঙ্গার বিষয় বলিলাম, এক্ষণে পাতাল গঙ্গার বিষয়ে বলিব। গঙ্গা অর্থে তোমরা একমাত্র জ্ঞানকেই বুঝিবে; জ্ঞাত ব্যতীত কাহার মুক্তি বা মনোমালিন্য দূর হয় না, উক্ত জ্ঞানও সাত্ত্বিক জ্ঞান হওয়া চাহি। পাতাল গঙ্গাকে তামসিক জ্ঞান কহা যায়।

পূর্বে বলিয়াছি, নাভির অধোদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত স্থানকে পাতাল কহা যায়। পাতাল শব্দের অর্থ অত্যন্ত পতন, পাত অর্থে পতন ও অর্থে অত্যন্ত বুঝায়। প্রাণই আত্মা পদবাচ্য, সেই নভঃপ্রাণরূপ আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ এবং ইহাই মানব মাত্রের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। সেই নভঃপ্রাণরূপ আত্মার স্বস্থান সহস্রার হইতে আপন রূপে নাভির অধোদেশে অত্যন্ত পতন হওয়ায়, নাভির, অধোদেশ সমূহকে পাতাল কহা যায়। এই স্থলে নভঃপ্রাণ স্বরূপ আত্মার আপন রূপে কার্য্য হওয়ায় জ্ঞান স্বরূপ আত্মার জ্ঞান স্থান মাহাত্ম্যে তামসিক রূপে পরিণত হইল; ইহাকেই ভোগবতীরূপা তামসিক জ্ঞানগঙ্গা কহা যায়। এই ভোগবতীরূপা তামসিক জ্ঞান রজো গুণের নিকটে থাকায় সময় সময় মানবের রজস্তমঃভাব দেখা যায়। রাজসিক জ্ঞান হইতে কামনার উৎপত্তি, রজোগুণকে কামনার বীজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাজসিকজ্ঞান হইতে কামনার সহিত সমস্ত কার্য্য করণের ইচ্ছা সততই প্রণোদিত হইয়া থাকে

এবং তৃষ্ণা বিষয়াসক্তির দ্বারায় ও নানা বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা মানবকে রাজসিক জ্ঞানে ডুবাইয়া রাখিয়া সাত্ত্বিক জ্ঞান হইতে দূরে রাখিয়া সাত্ত্বিক জ্ঞানরূপ গঙ্গাতে অবগাহন করিতে না দিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ তামসিক জ্ঞান দ্বারা গঙ্গাদিতে পবিত্র বারি বোধে কামনার সহিত অবগাহন করাইয়া থাকে। পশুভাবাপন্ন মানবগণের কার্য্য সমুদয় রাজস্তমোগুণের মিশ্রভাবে প্রায়শঃ কার্য্য হইয়া থাকে যেমন গঙ্গাদিতে গঙ্গা বোধ, ইহা তামসিক জ্ঞান তাহার পর কামনার সহিত তাহাতে অবগাহন করাটা রাজসিক জ্ঞান, এইরূপ মিশ্র জ্ঞানে কার্য্য হইয়া থাকে। তবে ইহা অতীব নিশ্চিত যাঁহারা পশুভাবাপন্ন এবং সতত রজস্তমো গুণের বশীভূত হইয়া সমস্ত পার্থিব বিষয় কার্য্যাদি আসক্তির সহিত ও কামনার সহিত করিয়া থাকেন অথচ মুখে ব্রহ্মবাদি হইয়া বা অদ্বৈত বাদের পোষকতা করিয়া মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা উপরোক্ত গঙ্গাস্নান করাটা রাজসিক তামসিক হইলেও পশুভাবাপন্ন জীব যতদিন কর্মী আত্মজ্ঞান সম্পন্ন গুরুর নিকট আত্ম কর্ম না পান ততদিন ইহা অকারণীয় নহে। কারণ কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করাই ভাল। যেমন মুখে আত্মা আত্মা বা ব্রহ্মাস্মি বা নিরাকার ঈশ্বর বোধে বাহ্যিক প্রার্থনা মাত্র করা অপেক্ষা বাহ্যিক গঙ্গায় ভক্তিভাবে অবগাহন করাটা যে শত শত গুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

যাহা হউক আমি তোমাদের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া এত কথা বলিলাম, এক্ষণে আমার পূর্বোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া বালকের সন্দেহ ভঞ্জন কর। সাধুর এবম্বিধ ধর্মোপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া সাধুকে গলদশ্রুলোচনে প্রণাম করিয়া চণ্ডাল বলিল, ঠাকুর আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। গুরুরূপে অদ্য চণ্ডাল গৃহে উপনীত হইয়াছেন, ইহা কেবল আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমরা আপনার চরণ দর্শণে এবং আপনার সার গর্ভবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম আমাদের বালক সম্বন্ধে যে গুহ বিষয় রহিয়াছে তাহা আমরা ব্যতীত অপর কেহই জানে না, সকলেই জানে বালক আমাদেরই পুত্র। সেই জন্য গুহ্য বিষয় আপনার নিকট প্রকাশ হইলে আমাদের এবং বালকের কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং মঙ্গলই হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ইহা বলিয়া চণ্ডাল বলিতে লাগিল এই বালকটী আমার ঔরসজাত পুত্র নহে। এটীকে আমরা অতি শৈশব কাল হইতে লালন পালন করিয়া আসিতেছি। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে একদিন আমি আমার বাটীতে ছিলাম না। সেই দিবস অতি প্রত্যুষে আমার পত্নী যেমন আমার বাটীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, ঠিক সেই সময় আমার পত্নী আমাদের বাটীর দিকে দুইটী নবাগত লোক আসিতেছে দেখিতে পাইল। ক্ষণিক পরেই তাহারা আমার পত্নীর সম্মুখে আসিয়া সম্বোধন করিয়া কহিল, আমরা এই পুত্র রত্নটীকে তোমাকে দিতে আসিয়াছি তুমি ইহাকে গ্রহণ কর এবং

ইহাকে অপত্য নির্বিশেষে পুত্রবৎ লালন, পালন করিও। আমার পত্নী তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে বোধ করিয়াছিল যে তাহারা সম্ভবতঃ তাহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য উক্ত বাক্য কহিতেছে। সে ভ্রম তাহার মুহূর্তে দূরীভূত হইল, কারণ তাহারা পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াই পুত্রটিকে আমার পত্নীর চরণতলে রাখিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য হইলে পর আমার পত্নী বালকটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বাটীর মধ্যে যত্নের সহিত আনিয়া স্বহস্তে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া বালকটীকে দুগ্ধ পান করাইতেছে, এমন সময় আমি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সমস্ত শুনিলাম এবং বালকটীকে দেখিলাম। সেই অবধি আমরা বালকটীকে পুত্রবৎ পালন করিয়া আসিতেছি, আমি বালকের জন্মদাতা নহি এবং আমার পত্নীরও গর্ভস্থ বালক নহে, তবে বালকটী প্রকৃত কাহার পুত্র তাহা আমরা জানি না। যাহারা বালকটীকে দিয়াছিল, তাহাদিগকে আর আমি অদ্যাবধি একদিনও দেখি নাই। ইহাই বালকের ঘটনাবলি। ইহার অতিরিক্ত আর আমরা কিছুই অবগত নহে।

সাধু চণ্ডালের বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডালকে ও চণ্ডাল পত্নীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকটে বালকের পূর্ব ঘটনাবলি অকপটে প্রকাশ করায় আমি তোমাদের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম এবং সেই সত্য প্রকাশে তোমাদের অচিরে সর্ব বিষয়ে মঙ্গল হইবে। তাহার পর সাধু বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন বৎস! এক্ষণে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল কি? আমি তোমাকে পূর্বে যে বলিয়াছি তুমি রাজপুত্র, তাহা তোমার এক্ষণে বিশ্বাস হইল ত'? বালক এই সময়ে মাতৃক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া করজোড়ে সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রভু! আমি যে কাহার পুত্র তাহা আমার এখন বোধ নাই, বিশেষ আমার বর্তমান পিতামাতার বাক্যে আরও সংশয় বৃদ্ধি হইতেছে। তবে আমি কাহার পুত্র! আমি এ পর্য্যন্ত যাঁহাদিগকে পিতামাতা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি অদ্য তাঁহাদের মুখেই শুনিলাম যে, আমি তাঁহাদের পুত্র নহি। ইহাতে ঘোর সন্দেহ হইতেছে, তবে আমি কাহার পুত্র। (এ সন্দেহ আমার মনে স্বতঃই উদয় হওয়া সম্ভব)। আমি বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার মাতৃদেবীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, মা যাঁহাকে আমার জন্মদাতা বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকেই পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছি। ইহা যে কেবল আমিই একা করিয়া আসিতেছি তাহা নহে, জগতের সমস্ত মানবই তাহা করিয়া থাকে। আমার বা অপর কাহারও জন্মদাতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, সকলকেই মাতৃবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পিতৃ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়া থাকে। এই মাতৃবাক্যে বিশ্বাসও আমার এবং অপর সকলেরই করা উচিত। মাতৃবাক্যে অবিশ্বাস করিলে সন্তানেরই সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে, মাতার বাক্যে অবিশ্বাস হেতু পিতৃস্নেহে ও পিতৃ ঐশ্বর্য্যে সন্তানকে বঞ্চিত হইতে হয় এবং মাতৃবাক্যে অবিশ্বাস হেতু সেই বালক ভগবৎ কৃপা লাভেও বঞ্চিত হইয়া থাকে। মাতৃভক্ত সন্তান কদাচ

কষ্ট পায় না। আমি আমার বর্তমান পিতামাতার নিকট শুনিলাম আপনি স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য (আমরা নীচ জাতি হইলেও) দয়া করিয়া আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনি যখন গুরু স্থানীয়, তখন আপনি আমার এবং আমাদের সকলের মাতা স্বরূপ, সুতরাং আপনার বাক্যে বিশ্বাস না করিলে আমি আমার জন্মদাতা পিতাকে এবং পরম পিতা পরমেশ্বরকেও কদাচ জানিতে পারিব না। আপনার বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া চলিলে আমি পিতৃস্নেহেও বঞ্চিত হইব এবং পরম পিতাকে না জানায় তাহারও কৃপা লাভে বঞ্চিত হইব। মাতৃবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া পিতাকে পিতা স্বীকার না করিলে সন্তান যেমন পিতৃ ঐশ্বর্য্যাদিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করিলেও তদ্রূপ ফলই লাভ হইয়া থাকে।

অতএব ঠাকুর, আমি আপনার বাক্যে অবিশ্বাস না করিলেও আমার মন মানিতেছে না। আমি শৈশব কাল হইতে যাঁহাদের নিকট লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি ও যাঁহাদের নিকট হইতে স্নেহ, ভালবাসা, সুখ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি এবং আমি যাঁহাদের পুত্র বলিয়া আমার মন মানিয়া চাহিতেছে না এবং অপর কাহাকেও পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছে না; আমি আপনার দাস, আমার পক্ষে যাহাতে মঙ্গল হয়, এমন ব্যবস্থা করিয়া আমার বর্তমান মনের সংশয় দূরীকরণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন, ইহাই আমার আপনার চরণে একমাত্র মিনতি। আর আমার এই বর্তমান পিতা মাতার প্রতি আমার যেন কোন রকম অভক্তি না হয় এবং আমি যেন আজীবন ইঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে পারি এমত মনের বল ও উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। আমি যে রাজপুত্র তাহা আপনার বাক্যে আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি, কিন্তু আমার বর্তমান মনের সন্দেহ দূর হইতেছে না। আমার মনের সন্দেহ দূর না হইবার কারণ আমি ইঁহাদের ক্রোড়ে শৈশব কাল হইতে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়া এত বড় হইয়াছি। আমার এই পিতামাতা এখন পর্য্যন্ত অনেক সময় আমাকে কোলে করিয়া আদর যত্ন করিয়া থাকেন; আমি যদি সত্যই রাজপুত্র হই তাহা হইলেও যতক্ষণ না আমি রাজক্রোড়ে আসীন হইতেছি বা রাজ্য আমাকে যতক্ষণ না আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, ততক্ষণ আমি আপনার বাক্য মানিয়া লইলেও আমার বর্তমান মনের সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে না। ইহা বলিয়া বালক অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

সাধু বালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ বৎস বিজয়, তুমি যে সকল বাক্য বলিলে, তাহা রাজপুত্র তুল্য বুদ্ধিমানের ন্যায় যুক্তিপূর্ণ কথা সকল বলিয়াছ। ইহাতে আমি বড় প্রীতিলাভ করিলাম। আমি অদ্য তোমাকে এবং তোমার বর্তমান পিতামাতাকে আহারাদি সমাপনান্তে রাজ সন্নিধানে লইয়া যাইব। তাহা হইলে তোমার এবং তোমার পিতামাতার সন্দেহ দূর হইবে। ইহা শুনিয়া চণ্ডাল

ও চণ্ডাল পত্নী উভয়েই ক্রন্দন করিতে করিতে সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঠাকুর! তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইবে! পুত্রকে রাজ সন্নিধানে লইয়া যাইলে রাজা আপন পুত্র পাইয়া আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিতেও পারেন, তাহা হইলে পুত্র মুখ অদর্শন হেতু নিশ্চয়ই আমাদিগকে মরিতে হইবে। কারণ আমাদের ইহাকে অতি শৈশবকাল হইতে লালন পালন করায় ইহার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা এক মুহূর্ত ইহার অদর্শন সহ্য করিতে পারি না, সর্বদা আমাদের চক্ষুর সন্নিধানে রাখিয়া থাকি। এক মুহূর্ত ইহার অদর্শনে বিশেষ কাতর হইয়া থাকি। এমত অবস্থায় ইহার দর্শন একেবারে অভাব হইলে আমরা নিশ্চয়ই মারা যাইব বা পাগল হইয়া যাইব। অতএব, ঠাকুর! আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমাদের মঙ্গল বিধান হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হয়। সাধু তদুত্তরে বলিলেন, তোমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। তোমরা এক্ষণে পুত্রসহ পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছ, ভবিষ্যতে রাজ অট্টালিকায় পুত্রসহ রাজ সম্মানে, রাজমাতা ও রাজপিতার ন্যায়, স্বচ্ছন্দভাবে ও স্বাধীনভাবে বাস করিবে। কোন বিষয়েরই অভাব থাকিবে না। ইচ্ছা হইলে ধর্ম, কর্ম, সমস্ত করিতে পারিবে; তোমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা আমি অগ্রেই করিয়া দিব। তোমাদের ভীত হইবার বা কোন প্রকার দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। বরং তোমাদের সুখরবি প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া তোমাদের আনন্দই করা উচিত। তোমরা সকলে আনন্দ ও প্রফুল্ল মনে আমার সঙ্গে চল। তোমাদের কোন রকম ভয়ের বা দুর্ভাবনার কারণ নাই জানিবে, আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার সহিত রাজ সন্নিধানে চল।

তৎপরে চণ্ডাল ও চণ্ডালপত্নী সাধুকে বলিল, ঠাকুর! এক্ষণে আমরা আপনার বাক্যে আশ্বস্ত হইলাম। অদ্য আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার পর আমরা এখান হইতে যাত্রা করিলে এখানকার গ্রামবাসীরা আমরা কোথায় যাইলাম তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়েই রাত্র্যাগমে যাত্রা করিবার মানস করিতেছি, তাহার পর আপনি যেমত আজ্ঞা করিবেন সেই মতই কার্য্য হইবে। তদুত্তরে সাধু তাহাদিগকে বলিলেন, ভাল, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে। রাত্রেই এখান হইতে বাহির হওয়া যাইবে, তাহাতে আর দোষ কি। তবে এক্ষণে আহারাদির আয়োজন কর, আমি স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া লই, তোমরাও স্নানাদি কর। তাহার পর ক্রমশঃ সকলে স্নানাহার সমাপন করিয়া, সকলেই একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন। পরে চণ্ডালপত্নী আপন গৃহে দ্রব্য সামগ্রী সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া নিজ বাড়ীর নিকটস্থ অপর একজন কৃষকের জিম্মায় গাভী দু'টিকে এবং চাষের বলদ দু'টিকে রক্ষা করিবার জন্য দিয়া আসিল। এদিকে দিবাও প্রায় অবসান হইয়া সন্ধ্যা আগত প্রায় হইয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সাধুকে আহারের জন্য বলায়, সাধু বলিলেন,

আমি আর রাত্রে কিছু আহার করিব না। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মাত্র পান করিব; চণ্ডালপত্নী সাধুকে দুগ্ধ আনিয়া দিলেন ও সাধু তাহা পান করিলেন। তাহারা বালককে আহার করাইয়া আপনারাও সামান্য কিঞ্চিৎ আহার করিল; তাহার পর রাত্রি এক প্রহরের পর চণ্ডাল ও চণ্ডালপত্নী বালককে সঙ্গে লইয়া সাধু সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। বালক চলিতে অশক্ত থাকায় বালকের পিতা পুত্রকে আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া চলিতে লাগিল; এইরূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি চলিয়া প্রভাত সময়ে একটা স্থানে আসিয়া লোকালয় দেখিতে পাইল এবং থাকিবার সরাই থাকায় সরাইয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় বাসা লইল। দিবাভাগে তথায় স্নানাহার সমাপন করিয়া রাত্রি জাগরণের জন্য এবং আতপতাপে বালকের সমূহ কষ্ট হইবে ভাবিয়া সমস্ত দিবাভাগ তথায় বিশ্রাম করিয়া তৎপরে রাত্রি এক প্রহরের পর বালককে স্কন্ধে করিয়া যাত্রা করিল। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে সপ্তম দিবস গত হইয়া গেল। অষ্টম দিবসের প্রভাত সময়ে সাধু তাহাদিগকে বলিলেন, এইবার আমরা মহারাজ বিজয় প্রতাপ ভূপের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এই রাজ্যের সীমা উত্তরে ও দক্ষিণে আড়াই শত ক্রোশ এবং বিস্তার পূর্ব পশ্চিমে তিনশত ক্রোশ।

ঐ দেখ সম্মুখেই মহারাজের রাজধানী দেখা যাইতেছে; রাজধানীর চতুর্দ্দিকেই প্রায় পর্বত মালার দ্বারায় বেষ্টিত এবং তদুপরি পর্বত শিখরের স্থানে স্থানে বড় বড় দুর্গ দ্বারায় রাজধানী রক্ষিত হইয়া থাকে। দুর্গ সকল নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারায় সর্বদা সুসজ্জিতভাবে থাকিয়া, দুর্গ প্রহরী সৈন্যগণ কর্তৃক এমনভাবে রক্ষিত হয়, যাহাতে শত্রুগণ কদাচ রাজধানীতে প্রবেশ করিতে না পারে। রাজধানীর ব্যবধান চতুর্দ্দিকে পঞ্চক্রোশ। রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য মর্মর প্রস্তরের দ্বারায় সুদৃঢ়রূপে গঠিত নবম সংখ্যক অত্যুন্নত তোরণ বিদ্যমান আছে এবং বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ সৈন্যগণ আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারায় সর্বদা সজ্জিত থাকিয়ে নিজ নিজ তোরণ এমতভাবে রক্ষা করিয়া থাকে, যাহাতে শত্রুপক্ষ কেহ তোরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ দেখ, আমাদের সম্মুখ দেশেই একটু অত্যুন্নত তোরণ দ্বার দেখা যাইতেছে; আমরা এইখানে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া লইয়া তাহার পর উক্ত তোরণ দ্বার দিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিব। সাধু ইহা বলিবা মাত্র চণ্ডাল ও চণ্ডালপত্নী, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া আপন পুত্রেরও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করাইয়া দিয়া, বালককে কিছু খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে দিল। বালক তাহা ভোজন করিয়া জল পান করিল। তাহার পর সাধু প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া উহাদের নিকটে আসিলেন। ওদিকে পূর্বাকাশে উদয়াচল বিহারী গগণধ্বনি আদিত্যদেব, রাজপুত্রের উদয়োন্মুখ দেখিয়াই তিনি যেন নিজ কিরণ মালারূপ ধ্বজা দ্বারায় আপনাকে আপনি গগণধ্বজ নামে অভিহিত করিয়া নিজ আরক্তবর্ণ কিরণ ধ্বজা দ্বারা রাজপুত্রের

মঙ্গল গান করিতে করিতে উদয়াচল হইতে প্রকাশ হইতেছেন। সাধু এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া ও শুভকাল বুঝিয়া, চণ্ডালকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, চল, এইবার আমরা রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করি। চণ্ডালবর বলিলেন, আমরাও প্রস্তুত আছি, আজ্ঞা করিলেই যাত্রা করি।

তাহার পর সাধুবাক্যে সকলেই চলিতে আরম্ভ করিল, বিজয় এইবার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বাবা আমি আর এখন আপনার স্কন্ধে উঠিয়া যাইব না, আমি এইবার আপনার হস্ত ধারণ করিয়া আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইব। তদুত্তরে বিজয়ের পিতা বলিল, বাবা, তুমি কি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে? তোমার ত' রাস্তা হাঁটা অভ্যাস নাই, হাঁটিতে হাঁটিতে হয় ত' রাস্তার কঙ্কর বা কণ্টক তোমার পাদে বিদ্ধ হইয়া কষ্ট হইতে পারে। ভাল, তুমি বলিতেছ হাঁটিয়া যাইবে, আচ্ছা আমরা নগর তোরণের নিকটবর্তী হইলে তোমাকে নামাইয়া দিব, এখন তুমি আমার স্কন্ধে যেমত আসিতেছ সেই মতই চল।

বিজয় তাহাতেই সম্মত হইয়া পিতার স্কন্ধে উঠিল। ইহারা এক্ষণে মাঠের রাস্তা দিয়াই সকলে চলিয়া যাইতেছেন। বিজয় পিতার স্কন্ধে উঠিয়া নগরের ও পর্বতমালার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। একে প্রভাত সমীরণ, তাহার উপর প্রভাতী সূর্য্যের বালকিরণ পর্বত মালার উপর পতিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করতঃ পথিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। পর্বতের উপর বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে, বৃক্ষশাখাগুলি মৃদু মৃত্যু বায়ুভরে হেলিতে দুলিতে রাজপুত্রের আগমন দেখিয়া যেন আনন্দভরে পত্রপুষ্প সহ রাজপুত্রকে সম্বর্দ্ধন করিবার মানসে কখন কখন বায়ু কর্তৃক অবনত ভাব অবলম্বন করিতেছে, আবার যেন বায়ু কর্তৃক মস্তক উত্তোলন করিয়া পুনরায় অবনত ভাব দেখাইতেছে, বৃক্ষের শাখা সকল বায়ু কর্তৃক যখন উপরে উঠিতেছে তখন মনে হইতেছে যেন তাহারা ইঙ্গিত দ্বারা রাজপুত্রকে আহ্বান করিতেছে।

বিজয় পর্বতমালার এবং পর্বতোপরি বৃক্ষের ও প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতেছে। এই সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া কখন মনে মনে হাসিতেছে, আবার কখনও বা তাহার মন যেন বিষাদ ভাব অবলম্বন করিতেছে। বিজয়ের বিষাদ হইবার কারণ বিজয় যে রাজপুত্র তাহা নিঃসংশয় ভাবে তাহার মনে প্রতিফলিত এখনও হয় না। মনে এখনও সংশয় ভাব রহিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে আমার মাতাপিতা যখন বলিলেন যে, বালক আমাদের ঔরসজাত সন্তান নহে তখন হয়ত সাধু যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য। সাধু বাক্য যদি সত্যই হয় তাহা হইলেই আমি রাজপুত্র আমি নিশ্চিত হই, তাহা হইলেই আমি রাজপুত্র এবং নিকটে যে রাজধানী দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা আমারই হইবে। যদি এই রাজ্যের রাজপুত্র আমি নিশ্চিত হই, তাহা

হইলে এ রাজ্যের রাজা একদিন আমাকেই হইতে হইবে। যদি আমি এই রাজ্যের রাজা হইতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রথম কর্তব্য হইবে, আমার বর্তমান মাতাপিতা যাঁহারা আমাকে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ববিধ অভাব মোচন করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা। দ্বিতীয় কর্তব্য, আমার জন্মদাতা এবং আমার জননীর দেবভাবে সেবা করিয়া ও দাসভাবে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহাদের প্রিয়কর এবং মনোনীত কার্য্য করিয়া চলা। এই সকল বিষয় যখন বিজয়ের মনে উদয় হইতেছে, তখন তাহার মনে হর্ষ ভাব উদয় হইয়া বদন কমল যেন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে।

আবার যখন সাধু বাক্যে সন্দেহ আসিতেছে, আমার মাতাপিতা যখন বলিতেছেন আমি তাঁহাদের ঔরসজাত নহি এবং আমি কাহার পুত্র তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এইভাব উদয় হইয়া বিষাদ ভাব প্রকাশ হইয়া বিজয়ের মনে হইতেছে তাহা হইলে আমি কাহার পুত্র। আমার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি বেশ সুখেই ছিলাম। সাধু আসিয়া আমার মনের মধ্যে যত গন্ডগোল ও সংশয় আনিয়া দিয়াছেন। আমি জানিতাম আমি ইঁহাদেরই পুত্র, ইনি যে আমার জন্মদাতা পিতা নহেন এবং আমার বর্তমান মাতা যে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন নাই এসকল বিষয় পূর্বে আমি অবগত না থাকায় আমার কোন সংশয় ছিল না। এক্ষণে রাজা যদি বলেন বালক আমার পুত্র নহে তাহা হইলে আমাকে আজীবন সংশয়ে কাল কাটাইতে হইবে এবং আমি যে কাহার পুত্র তাহারও নিরাকরণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এই সকল ভাব অন্তরে উদয় হইয়া দারুণ বিষাদ ও অনুতাপ আসিতেছে।

যাহা হউক মাঠের রাস্তার উপর দিয়া যাইতে যাইতে সাধু বলিলেন, সম্মুখে যে বড় রাস্তা দেখা যাইতেছে, উহাই নগরে যাইবার রাস্তা, এইবার আমরা মাঠের রাস্তা ছাড়িয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইব। ইহা বলিয়া সাধু সদর রাস্তার দিকে চলিলেন, বিজয়ের পিতাও সাধুর অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। বিজয় এই সময়ে তাহার পিতাকে বলিল—বাবা আমাকে এইস্থানে নামাইয়া দিন, এক্ষণে দেখিতেছি আমরা নগরের নিকটেই আসিয়াছি। আমি আপনার হাত ধরিয়া রাস্তার দু'ধার সব দেখিতে দেখিতে বেশ আনন্দের সহিত যাইব। নগরের সদর রাস্তায় বহু নাগরিক যাতায়াত করিতেছে। উহারা আমাকে আপনার স্কন্ধে চাপিয়ে যাইতে দেখিলে সকলে বলিতে পারে যে, বুড়ো ছেলেটাকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ছেলেটার বিবেচনা নাই। অত বড় ছেলে বাপের স্কন্ধে চড়িয়া যাইতেছে। বাবা, তাহাতে আমার লজ্জা বোধ হইবে অতএব আমাকে নামাইয়া দিন। আমি আপনার বা আমার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া আপনাদের সহিত পদব্রজে যাইব। তদুত্তরে বিজয়ের পিতা বলিল, "দেখ বাবা, লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া সব সময়ে কার্য্য

করা ঠিক নহে, মনে কর আমি তোমাকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছি, কিন্তু লোকে ত' ইহাও বলিতে পারে, আহা এমন সুন্দর পুত্রকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা অনায়াসে পুত্রটিকে কোলে করিয়া বা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহাদের পুত্রের প্রতি স্নেহ বা দয়া একেবারে নাই; সকলে এই কথা বলিলে তখন আমরা কি করিব?" বিজয় তদুত্তরে বলিল "ও সকল কথা শুনিবার আবশ্যক নাই, এখন আমাকে নামাইয়া দিন। আমি যতটা দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারি ততটা হাঁটিয়া যাইব।

আরও বিশেষ আপনি আমাকে সমস্ত রাস্তাটাই স্কন্ধে করিয়া লইয়া আসিতেছেন, আপনার স্কন্ধে বেদনাও হইয়া থাকিতে পারে এবং এতক্ষণ স্কন্ধে চড়িয়া আসায় এক্ষণে যেন পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহাতে আমার আরাম হইবে। চলিতে না পারিলে আবার তখন আপনার স্কন্ধে চড়িয়া যাইব।"

বালক এই বাক্য বলিবার পর বিজয়ের পিতা স্কন্ধ হইতে তাহাকে নামাইয়া দিল। বিজয় তাহার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া সকলের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণিক পরেই তাহারা সদর (বড়) রাস্তার উপর আসিয়া পৌছিল। রাস্তায় পথিকের ভিড় অত্যধিক, অনেক লোক রাজধানী অভিমুখে চলিতেছে, সকলেই যেন খুব আনন্দোৎসাহে চলিয়াছে। পথিপার্শ্বে ইহারা আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র পথিকগণের দৃষ্টি যেন বালক বিজয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে কেহ কেহ অনিমেষ লোচনে বালকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া উহার রূপলাবণ্য অবলোকনে বলিতে লাগিল; "আহা! এমন সুন্দর বালক ত' কখনও দেখি নাই, যেন দেব কুমারের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া দন্ডায়মান রহিয়াছে" পথিকগণের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা তোমারা কোথায় যাইবে?" সাধু বলিলেন, "আমরা রাজদর্শনে যাইতেছি, তোমরা সকলে কোথায় যাইবে? রাজপথে এত অধিক জনতাই বা কেন দেখিতেছি? রাজধানীতে অদ্য কি কোন রকম উৎসব হইবে?"

সাধুর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পথিকগণের মধ্য হইতে একজন প্রাচীন পথিক বলিল, "ঠাকুর! এই পথটি রাজধানীতে যাইবার প্রশস্ত পথ যদিও অপর পথ আরও আছে সত্য, তাহা হইলেও এই পথে অনেক লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। এই কারণে প্রায়শঃ লোকের জনতা এই পথেই হইয়া থাকে। অদ্য পূর্বাপেক্ষা জনতা বেশী হইবার কারণ আজ রাজধানীতে একটী উৎসব থাকায় রাজবাটী অভিমুখে অনেকেই গমন করিতেছে"। ইহা শ্রবণ করিয়া সাধু পথিককে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য রাজ বাটীতে কি উপলক্ষে উৎসব হইবে? তদুত্তরে পথিক বলিল, "ঠাকুর, মহারাজা বৎসরান্তে একদিন সস্ত্রীক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার পুত্রতুল্য প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দিয়া থাকেন এবং নিঃস্ব প্রজাগণকে অর্থাদি দানও করিয়া

থাকেন। এই কারণে নিঃস্ব ব্যক্তিগণ রাজদর্শনে গিয়া থাকে এবং যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারাও রাজদর্শন পূণ্যজনক বলিয়া গমন করিয়া থাকেন। অবশ্য রাজদর্শন লাভ অনেক সময় হইতে পারে সত্য কিন্তু আমাদের রাজমাতা বা রাজলক্ষ্মী বৎসরের মধ্যে এই একদিন মাত্র রাজসিংহাসনে মহারাজের বামপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পুত্রতুল্য প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দিয়া থাকেন, একারণ অদ্য রাজপথে জনতা অত্যধিক দেখা যাইতেছে। আপনারাও যখন রাজদর্শন অভিলাষে যাইতেছেন, তখন চলুন আমরাও আপনাদের সহিত গমন করি। কারণ লোকে বলে 'সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে নরকে বাস,' এমত অবস্থায় আপনার সহিত গমন করাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল জনক। আরও বিশেষ এই বালকটী আমাদের চিত্ত হরণ করিয়াছে, ইহার অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অবধি ইহাকে আমাদের চক্ষের অগোচর করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। অতএব চলুন সকলে মিলিয়া একত্রেই যাওয়া যাউক আর বিলম্ব করা উচিত নহে।"

পথিক ইহা বলিবার পর সাধু কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বেশ তবে চল"। ইহা বলিয়া পথিকগণের সহিত সকলে যাইতে লাগিলেন। বিজয় কখন তাহার পিতার হস্ত ধারণ করিয়া চলিতেছে, কখন বা তাহার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া পথের চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিতেছে। বলা বাহুল্য, বিজয় কখনও তাহার বাটীর-বহির্ভাগ ব্যতীত অপর কোন স্থান দর্শন করে নাই। সুতরাং বিজয়ের পক্ষে সমস্তই নূতন ও অত্যাশ্চার্য্য বোধ হইতেছে। বিজয় যে পথ দিয়া গমন করিতেছে সেই পথের উভয় পার্শ্বে বৃহদাকার বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক অত্যুচ্চভাবে দন্ডায়মান রহিয়াছে এবং পথিকগণকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিবার মানসেই যেন তাহাদের মস্তকে ছত্র ধারণের ন্যায় শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতঃ তাহাদিগকে নিজ ছায়া বিতরণ করিয়া তাহাদের পথশ্রম নিবারণ করিতেছে। কোন কোন পথিক পথশ্রম নিবারণ মানসে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে। বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাগুলি, বায়ু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াই যেন পথিকদিগকে ব্যজন করিবার মানসে মৃদুমন্দ ভাবে চালিত হইতেছে; পাদপকুল যেন দৈব কর্তৃক রাজপুত্রের আগমন বার্তা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়া, রাজপুত্রের পথ চলিতে চলিতে পাছে তাহার পদতলে পথের কঙ্করাদি বিদ্ধ হয় এই আশঙ্কায় পুষ্প সকল পাতিত করিয়া পথটি যেন পুষ্পের দ্বারা রচিত করিয়া রাখিয়াছে। একারণ পথের ধূলা বা কঙ্করাদি কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। একে প্রাতঃসমীরণ তাহার উপর নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভে পথিকগণের মন ও প্রাণ বিভোর হইয়া আনন্দ মনে সকলেই নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

অলিকুল পরমানন্দে বকুলাদি পুষ্পের মধু লোভে মত্ত হইয়া গুণ গুণ রবে যেন

রাজকুমারের আগমন হেতু জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে এবং সমস্ত অলিকুলের গুঞ্জন ধ্বনি সকল একত্রিত হইয়া ঠিক যেন অনাহত ধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছে। বিজয় নিজ মাতার হস্ত ধারণ করিয়া আনন্দের সহিত পথের অপূর্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিতেছে, এমন সময় একটি ভ্রমর আসিয়া প্রস্ফুটিত কমল পুষ্প ভ্রমে বিজয়ের মুখমন্ডলের চতুর্দ্দিকে গুঞ্জণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রমর পাছে দংশন করে এই ভয়ে বিজয় ভীত হইয়া কমল কোষ সদৃশ নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা ভ্রমরকে তাড়না করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় অবশেষে বিজয় তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিল। তখন বিজয়ের মাতা তাহাকে বলিল, ভয় নাই ভ্রমর দংশন করিবে না আমি ভ্রমরকে তাড়াইয়া দিতেছি; এই বলিয়া বিজয়ের মাতা ভ্রমরকে তাড়াইয়া দিয়া, বিজয়কে আপন কোলে তুলিয়া লইল। ভ্রমর ছাড়িবার পাত্র নহে সে তত্রাচ মধ্যে মধ্যে বিজয়ের বদন কমলের সন্নিধানে আগমন করিয়া গুণ গুণ শব্দ দ্বারায় যেন বিজয় রূপ কমল প্রস্ফুটিত হইবার সময় অতি নিকট হইয়াছে এই বার্তা ইঙ্গিত দ্বারা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। এমন সময় পথিকগণের সহিত একটা পরিখার নিকটে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিজয় পরিখা দেখিবার জন্য মাতৃক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, এটা কি নদী?" সাধু উত্তর করিলেন, হাঁ বৎস! ইহা স্বাভাবিক নদী। পরিখারূপে রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া আছে। পর্ব্বতের ঝরণা হইতে জল আসিয়া ইহা পূর্ণ নদী হইয়াও পরিখারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।" বিজয় বলিল, "ঠাকুর! পরিখা কাহাকে বলে?" সাধু বলিলেন, "বৎস! রাজধানী বা দুর্গ সকলকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজধানী বা দুর্গের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে যে খাদ খনন করিয়া জলরাশি দ্বারা পূর্ণ করিয়া গড়খাইরূপে রাখা হয়, তাহাকে পরিখা কহা যায়। এই পরিখার উপর যে সেতু রহিয়াছে ইহার উপর দিয়া সকলে যাতায়াত করিয়া থাকে। চল আমরাও সেতু পার হইয়া তোরণ দ্বারে উপস্থিত হই।" ইহা বলিয়া সাধু সকলের সহিত সেতু পার হইয়া তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, নগর প্রবেশের তোরণ দ্বারের সন্নিধানে প্রহরিগণ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া নবাগত ব্যক্তি দেখিলে, বা কোন প্রকারের কোন লোকের প্রতি সন্দেহ হইলে সে কোথা হইতে এবং কি অভিপ্রায়ে আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইয়া থাকে। রাজ শত্রু বলিয়া সন্দেহ হইলেই তাহাকে নগরে প্রবেশ করিতে না দিয়া রাজাকে সংবাদ দিয়া থাকে। তৎপর রাজঅনুমতি হইলে রাজা বা রাজ অমাত্যগণের নিকট সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। বিজয় তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল ঐ দ্বারে সশস্ত্র প্রহরিগণ অসিচর্ম হস্তে করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে পদচারণ করিয়া পাহারা দিতেছে। ভীম সদৃশ মল্লগণ গলদেশে স্বর্ণের কণ্ঠাভরণ এবং মস্তকে রক্ত বস্ত্রের শিরোপা (পাগড়ী) ধারণ

করিয়া ভীমনাদে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্রের ক্রীড়া কৌশল পথিকগণকে দেখাইতেছে।

ইহারা বিজয়কে দেখিয়াই আপন আপন ক্রীড়া কৌশল দেখান স্থগিত রাখিয়া, অনিমেষ লোচনে বিজয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন মল্ল পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিল; “ভাই, ঐ দেখ কেমন একটী অপরূপ সৌন্দর্য্যবান বালক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমাদের বলদর্প খর্ব করিবে। বর্তমানে ইহার শরীরের গঠন যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে এখনই ইঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে সাহসে কুলায় না। মল্লগণের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি?” বিজয় বলিল “আমার নাম বিজয়।” মল্ল মনে মনে ভাবিল বিজয়ই বটে, এ বালক সর্ব বিষয়েই বিজয়লাভ করিবে বলিয়া বোধ হয়। যেমন রূপ, তদ্রূপ দেহের গঠন, যেন করভের (হস্তী শাবকের) ন্যায়। বালক যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া আমাদের রাজধানীতে ইহার বলের এবং রূপের প্রতিযোগিতা করিতেই আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর মল্ল বালককে জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কোন জাতি?” বালক তদুত্তরে বলিল “আমরা চাঁড়াল (চণ্ডাল) জাতি”। বালকের উত্তর শুনিয়া মল্ল মনে মনে স্বগতঃ বলিল “ও, বাবা এ চাঁড়ালের ঘরের ছেলে, এ যদি ভাল রকম মল্ল বিদ্যা শিক্ষা করে, তবে এ ভবিষ্যতে একজন প্রধান মল্লরূপে পরিগণিত হইতে পরিবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।” তাহার পরে মল্ল প্রকাশ্য ভাবে বলিল “তুমি আমাদের রাজ সরকারে মল্ল গিরি কার্য্যে জন্য যদি চাকুরী কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ভাল রকম মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিব। তুমি ভবিষ্যতে একজন প্রধান মল্ল হইবে এবং রাজ সরকার হইতে তোমার বেতন ও পুরস্কার লাভ হইবে। তদুত্তরে বালক বলিল “আমরা রাজ দর্শন মানসে আসিয়াছি, চাকুরীর প্রার্থী হইয়া আসি নাই এবং তাহাতে আমার পিতামাতার মত হইবে কিনা তাহা আমি জানি না, উহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে অগ্রে আমরা রাজদর্শন করিয়া আসি তাহার পর আমার পিতামাতা যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে। এক্ষণে আমরা রাজ দর্শনে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিতেছি।” মল্ল তদুত্তরে বলিল, অদ্য রাজ দর্শনে যাইবার কাহারও বাধা নাই, সকলের পক্ষে অবারিত দ্বার; তোমরা অনায়াসে গমন করিতে পার। আমাদের অনুমতি লইবার আবশ্যক নাই। দেখিতেছি তোমরা সাধুর সঙ্গে আসিয়াছ, সাধুগণের পক্ষে নিত্যই অবারিত দ্বার এবং মহারাজা বিশেষ সম্মানের সহিত সাধুগণের পূজা করিয়া থাকেন। তোমরা এই পথিকগণের সহিত না যাইয়া, সাধুর সহিত রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইও, তাহা হইলে তোমরাও সাধুসঙ্গে রাজ সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে, আর তোমরা বিলম্ব করিও না, এক্ষণে যাত্রা কর।

মল্লর এই উক্তি শেষ হইতে না হইতে এমন সময় একটা মেঘ গর্জনের ন্যায়

ভয়ানক ধ্বনি হইল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, “এ কিসের শব্দ হইতেছে।” মল্ল বলিল “মহারাজ ও মহারাণী রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ইহা তোপধ্বনি দ্বারায় প্রজাগণকে জ্ঞাপন করা হইল”। তাহার পর বিজয় সাধুসঙ্গে পিতামাতার সহিত তোরণ দ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নগরের সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে পথিকগণের চলিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র পথ রহিয়াছে এবং এই পথ পদচারী পথিকগণ গমনাগমন করিয়া থাকে, মধ্যভাগের পথে গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি যাতায়াত করিয়া থাকে। এই মধ্যভাগের পথের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান রহিয়াছে। বিজয় কখনও কোন নগর বা রাজধানী দেখে নাই, সে তাহার পিতামাতার নিকট স্বর্গ রাজ্যের ইন্দ্রপুরীর গল্প অনেক সময় শ্রবণ করিয়াছিল। সে নগরে প্রবেশ করিয়া ভাবিল আমি পূর্বে পিতার নিকট যে ইন্দ্রপুরীর কথা শুনিয়াছিলাম, এই নগর কি সেই ইন্দ্রপুরী, সে কখনও ভাল অট্টালিকাও দেখে নাই। কারণ সে যে গ্রামে বাস করিত, সেই গ্রামে কাহারও অট্টালিকা ছিল না। সমস্তই কাঁচা মৃত্তিকা নির্মিত খড়ের চালাঘর সুতরাং পথের উভয় পার্শ্বে রাজ প্রাসাদের ন্যায় কারুকার্য্য নির্মিত অট্টালিকা সমূহ দর্শন করিয়া তাহার মনে স্বতঃই উদিত হইতে লাগিল সম্ভবতঃ এ নগর স্বর্গপুরীই হইবে। মনে মনে কিছু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর! ইহাই কি স্বর্গরাজ্যে বা স্বর্গধাম? আমি মাতার নিকট ইন্দ্রের রাজ্য এবং তাহাকে স্বর্গপুরী কহিয়া থাকে এইরূপ শুনিয়াছি, এই স্থান দর্শন করিয়া ইহাকেই আমার স্বর্গ বা ইন্দ্রপুরী বলিয়া বিবেচনা হইতেছে, আমার যাহা মনে হইতেছে তাহা কি সত্য? এই সংশয় দূর করিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

“স্বর্গ ও সুদর্শন চক্র”

বিজয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু বলিলেন, “বৎস! স্বর্গ এবং নরক, লোকে যাহা অনুমান করিয়া থাকে, উহা মনের কল্পনা মাত্র! নিরবচ্ছিন্ন যে সুখ তাহাকেই স্বর্গ বলা যায়, অর্থাৎ সে সুখের বিচ্ছেদ নাই তাহাই স্বর্গ পদবাচ্য, তুমি যেন স্বর্গের কথা বলিতেছ তাহার অধিপতি ইন্দ্র। সেই ইন্দ্রেরই বা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কোথায় হইয়াছিল, তাঁহাকেও স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অসুরগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইত এবং কখন কখনও পরাস্ত হইয়া নানা ক্লেশও ভোগ করিতে হইত। পাপকার্য্য দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখন কাহারও অর্জন হয় না, ইন্দ্রেরও পাপকার্য্যের অভাব ছিল না। গুরুপত্নী হরণ করায় গুরুশাপে তাঁহার গাত্রে সহস্রযোনি হইয়াছিল। লজ্জা ও ঘৃণায় কাহারও নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইয়া পরে সাধনা দ্বারা গুরু শাপ হইতে মুক্ত হয়েন, এরূপ অবস্থায় স্বর্গরাজ্যের যিনি রাজা ইন্দ্র, তাঁহারই যখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন উক্ত স্বর্গে অপরের নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ সম্ভবপর নহে। তুমি যে স্বর্গরাজ্যের কথা শুনিয়াছ তাহা আকাশ কুসুমের ন্যায় কবির মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। আর যদিই তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেটি ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ভোগের স্থান মাত্র, তাহা মুমুক্ষুগণের অভিলষিত বিষয় নহে। পার্থিব বিষয়লোলুপ সুখ দুঃখ ভোগী জীবের প্রার্থনীয় হইতে পারে। প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে জীবের তাহা ধারণা না থাকায় ক্ষণিক কোন বিষয় প্রাপ্তি হইলে যে আনন্দ বা হর্ষ হয়, জীব তাহাকেই সুখ বোধে তাহাতেই রমণ করিয়া থাকে। আশু সুখকর বিষয়েরই জীব মুগ্ধ; প্রকৃত সুখ ভোগের ধারণা জীবের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ জীবকে স্বর্গ কোথায় আছে বলিলে, বলিয়া থাকে, আকাশের উপর স্বর্গ আছে এবং তথায় স্বর্গসুখ আছে, জীবভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিষয়াদি জনিত যে সুখের ধারণা আছে, জীব মনে মনে স্বর্গ সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা করিয়া কিম্ভুত কিমাকার একটা স্বর্গস্থান মনে রচনা করিয়া তাহার প্রাপ্তি লালসা করিয়া থাকে। জীব মনে করে এখানেও যেরূপ রাজগণের রাজ্য রহিয়াছে স্বর্গেও ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বর্গরাজ্য নিশ্চয় আছে, এই ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তি বা স্বর্গসুখ প্রাপ্তি কামনা জীব অহরহঃ করিয়া থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি জীবনের প্রকৃত সুখের ধারণা বা সুখ শব্দের অর্থ বোধ আদৌ

নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে তোমাকে সুখ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রমথতঃ মানবগণ যে বলিয়া থাকে আকাশের উপর স্বর্গ আছে এবং স্বর্গ সুখও আছে, তাহা যে একেবারে মিথ্যা তাহা নহে। সুখ শব্দের অর্থ সু-উত্তম, খ-শব্দের অর্থ শূন্য বা আকাশ, এক্ষণে উত্তম শব্দে অর্থ বলিতেছি শ্রবণ কর সাধারণতঃ উত্তম শব্দের অর্থ লোকে "ভাল" ইহাই কহিয়া থাকে। উত্তর শব্দের অপর অর্থও আছে, যথা উত্ত-ম, উত্ত-শব্দের অর্থ (উন্দ্, আর্দ্র হওয়া) ম-শব্দের অর্থ চন্দ্র। চন্দ্র মনকেই বলা যায় অর্থাৎ বর্তমান মনের বর্তমানে আপনার প্রতি আপন কাঠিন্য ভাব থাকায় নিজের প্রতি নিজে দয়া না করিয়া আপন উদ্ধার আপনি করিতেছে না। নিজের প্রতি নিজের কঠিনভাব শূন্য হইয়া দয়ার্দ্র ভাব হওয়ার নামই আর্দ্র হওয়া, ইহাই উক্ত শব্দের ভাবার্থ বুঝিতে হইবে, এই ভাবার্থই উত্তম পদবাচ্য। মনের এই অবস্থা লাভ, খ রূপ আকাশে স্থিতি হইলে বা গুরু উপদেশে শূন্য স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতি করিবার অভ্যাস সাধন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাই সুখ শব্দ বাচক। এই সুখের বিচ্ছেদে মনের যাবতীয় দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, (দুঃখে শব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ খ-শূন্য স্বরূপ ব্রহ্মের দূরে মন থাকিলেই দুঃখ) ও জীব নানা জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে স্বর্গ এবং স্বর্গরাজ্যের অধিপতি ইন্দ্র সম্বন্ধে বলিব শ্রবণ কর; দিব্ শব্দের অর্থ আকাশ বা স্বর্গ। এই শূন্য স্বরূপ আকাশের যিনি অধিপতি তিনিই দেবরাজ পদবাচ্য পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এবং দিব্ শব্দে আকাশ বা স্বর্গ, রাজ শব্দে দীপ্তি পাওয়া, যিনি হৃদয়াকাশরূপ স্বর্গের অধিপতি তিনিই আত্মা। আত্মা অর্থে মনকেও বুঝায়। মন দুই প্রকার,—স্থির ও চঞ্চল। প্রাণের স্বতঃ অবস্থাই আত্মা বা স্থির মন; এবং প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই চঞ্চল মন। ইন্দ্র অর্থে আত্মা, স্বয়ং যিনি ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়গণের রক্ষক তিনি ইন্দ্র পদবাচ্য।

এই ইন্দ্রও দুই প্রকার, অর্থাৎ আত্মার যেমন দুইটী অবস্থা রহিয়াছে স্থির এবং চঞ্চল, ইন্দ্রও তদ্রূপ। স্থির প্রাণরূপ আত্মার স্থির ভাব অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি হইয়া সংযত ইন্দ্রিয় অবস্থারূপে যেভাবে তাহাই আত্মারূপ স্বয়ং ইন্দ্র। ইনি ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণও আত্মতুল্য হইয়া জীবের হিতার্থ অর্থাৎ সমগ্র জীব যাহাতে আত্ম ভাবপ্রাপ্ত হয় এমত কার্য্যে রত থাকিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জীবনের মনও ইন্দ্র পদবাচ্য, পূর্বে বলিয়াছি মনও আত্মা পদবাচ্য। আত্মা বা মন এই উভয়বিধ উপাধি প্রাণের অবস্থা ও কার্য্যভেদে হইতেছে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই জীবের বর্তমান চঞ্চল মন। ইন্দ্রিও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং রক্ষক হইয়াও মোহ বশতঃ আমি এবং আমার জ্ঞানে, আপনাতে আপনি না থাকায় (অর্থাৎ মনেতে মনকে না রাখায় চন্ডালরূপী ইন্দ্রিয়গণকে এবং তৎতৎ বৃত্তি

সকলকেই পরম আত্মীয় বোধে তাহাদেরই সঙ্গ করিয়া কামনার সহিত সৎ অসৎ কার্য্য অহরহঃ করিয়া থাকে। এই মনোরূপ ইন্দ্র সমগ্র জীবদেহে থাকিয়া, ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া গুরুপত্নী গুরুকন্যা হরণ এমন কি স্থানে স্থানে নিজ কন্যা ও বিমাতা হরণ প্রভৃতি যত পাপকার্য্য আছে অধিকাংশ লোক (ইন্দ্রিয় চরিতার্থে) কার্য্যতঃ কিম্বা মনে মনে করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তবে সময় সময় রাজদন্ড বা লোক লজ্জা ভয়ে কার্য্যতঃ পাপকার্য্য সকল, কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া গোপনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার অবসর অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সাধারণ স্বর্গাদি সুখভোগ লাভের জন্য কামনার সহিত কার্য্য করণে বর্তমান মনোরূপ ইন্দ্র, জীব দেহে থাকিয়া কোন জীবকেই বাধা প্রদান করে না বরং উৎসাহ প্রদানই করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কেহ মোক্ষ প্রাপ্তি মানসে আত্মকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তপোলোক (ভ্রূর পশ্চাতে) স্থিত হইবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করে, তাহা হইলে মনোরূপ ইন্দ্র নিজে দেহে থাকিয়াই (আপনার অনিষ্ট আপনিই) ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় তপঃ বিঘ্ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ আপনাতে আপন বা তপোলোকে (ভ্রূর মধ্যে) থাকিতে না দিয়া প্রলোভন দ্বারায় ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের চিন্তায় মগ্ন করাইয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহাতে বর্তমান ইন্দ্ররূপ মনোরাজ্যের উচ্ছেদ না হয় তাহার জন্য প্রাণপণে বল প্রয়োগ দ্বারা চেষ্টা করিয়া থাকে। সৎ অসৎ কার্য্য করণের বল বর্তমান মনের অসাধারণ মত মত্ত হস্তীর বল একামনরূপ ইন্দ্র ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে জয় করিতে না পারিলে প্রকৃত স্বর্গ যাহা (যে স্বর্গের কথা তোমাকে বলিলাম) তাহা কাহারও লাভ হয় না। ইহাকে জয় করিতে হইলে, আত্মকর্মের দ্বারায় বর্তমান মনকে ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে বিরত করিয়া বর্তমান মনের উৎপত্তি স্থানে স্থিতি করিতে পারিলে, তবে মনকে জয় করিতে পারা যায় নচেৎ নহে।

আমাদের দেশের লোকের অনেকের ধারণা বা লোক পরম্পরায় শুনিয়া জানা আছে যে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার রক্ষক ও অধিপতি যিনি, তিনিই ইন্দ্র বা দেবতাগণের প্রভু। তাঁহার রাজ্যকে ইন্দ্ররাজ্য বা ইন্দ্রপুরী কহিয়া থাকে। লোকে যে ইহা বলিয়া থাকে ইহার কোন প্রত্যক্ষ ভিত্তি নাই কারণ হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম উল্লেখ কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। দশ কোটি না হয় না হইল এক কোটিই হউক, তাহাও কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি একলক্ষ দেবতার নামও পাওয়া যায় কিনা তাহাও সন্দেহ, এমত স্থলে জীব মাত্রেই মনে দারুণ সন্দেহ হওয়া সম্ভব। তবে সাধারণ মানব এ সকল তথ্য না জানিয়া একটা উপন্যাসের ন্যায় গল্প স্বরূপ কথার কথা বলিয়া থাকে মাত্র।

দেখ বিজয়, আমাদের এই দেশকে আর্য্যভূমি বলিয়া থাকে, আর্য্যগণ এই দেশে বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে আর্য্যভূমি বলা হইয়া থাকে। আর্য্যাগণ সকলেই কর্ম এবং ধর্মবীর ছিলেন, সকলেই এক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের বংশ ক্রম বৃদ্ধি দ্বারায় ক্রমশঃ আর্য্যগণের সংখ্যা এক সময়ে তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছিল। শূদ্রাদিগণ ইঁহাদিগকে দেবতা বলিত, ইঁহাদের রক্ষক এবং অধিপতি যিনি হইতেন, তাঁহাকেই ইন্দ্র বলা হইত। এই ইন্দ্রের সহিত অনার্য্যরূপ আসুরিক ভাবাপন্ন মানবের সহিত মধ্যে মধ্যে ঘোর সংগ্রাম হইত। কখন কখন ইন্দ্রের নিকট অনার্য্যগণ পরাস্ত হইত আবার কখনও আর্য্যগণের রাজা ইন্দ্রও পরাস্ত হইতেন। এই আর্য্যগণের বসবাসের স্থানকে স্বর্গ কহা যাইত, এই ইন্দ্র যেস্থানে নগর পত্তন করিয়াছিলেন সেই নগরকে ইন্দ্রপুরী কহা যাইত। তারপর কালবশে সেই নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ধার্মিকবর আর্যচূড়ামণি যুধিষ্ঠির সেই স্থানে পুনরায় নগর স্থাপন করিয়া নিজ নামে নগরের নামকরণ না করিয়া, কার্য্যারাজ ইন্দ্রের স্মরণার্থ নিজের প্রতিষ্ঠিত নগরের নামকরণ করিলেন ইন্দ্রপস্থ। ইন্দ্র যেখানে আধিপত্য করিয়াছিলেন তাহাকেই ইন্দ্রপ্রস্থ কহা যায়। প্রস্থ অর্থে যে প্রভুত্ব বা আধিপত্য করে তাহাকে প্রস্থ কহা যায়। এই ইন্দ্রপ্রস্থকে বর্তমানে দিল্লী কহা যায়। দিল্লী নাম হইবার কারণ, সৌর্য বংশীয় ডিলু নামক একজন রাজা (যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের বহু পরে ইহা আবার ধ্বংস প্রায় হইলে উক্ত ডিলু রাজা) এই স্থানে আপন রাজধানী স্থাপন করেন বলিয়া; ইন্দ্রপ্রস্থের নাম উঠিয়া গিয়া দিল্লী নাম হয়, তদবধি ইহাকে দিল্লী কহা যায়। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে পুরাকালে যিনি যখন যেখানে রাজ্য স্থাপন করিতেন, প্রায়শঃ আপন আপন নামেই রাজধানীর নামকরণ করিতেন। তুমি যে, ইন্দ্রের কথা বলিতেছ তিনি আর্য্যদের চূড়ামণি ইন্দ্র নামধারী মানব বিশেষ, তাঁহার রাজধানী বা রাজবাটী অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালী থাকায়, তাহাকে ইন্দ্রপুরী বা স্বর্গপুরী বলিয়া লোকমুখে কথিত হইত। শ্রেষ্ঠ অর্থে অত্যন্ত সুখজনক এবং আনন্দকর স্থান, তাই স্বর্গ বলা হইত, ইহা প্রকৃত স্বর্গ পদবাচ্য নহে।

প্রকৃত স্বর্গ কাহাকে কহা যায় তাহা তোমাকে বলিয়াছি। তুমি তোমরা যে স্বর্গ বা নরকের কথা শুনিয়াছ, তাহা এই পৃথিবীর মধ্যে রহিয়াছে যেমন স্বর্গগিরি বলিতে সুমেরু পর্বতকে বুঝায়। সুমেরু পর্বত দৃশ্যমান, এই পৃথিবী মধ্যস্থিত পর্বতকে সুমেরু পর্বত কহা যায়। আকাশ বা শূন্য স্বরূপ স্বর্গে পর্বত বা পাহাড় থাকিতে পারে না। স্থূল বস্তু শূন্যে অবস্থিতি করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুমেরু শব্দেরও তাৎপর্য্য আছে, জপমালার যেস্থানে জপ সংখ্যা শেষ হয়, মালা মধ্যস্থ শেষ গুটিকাকে সুমেরু কহা যায়। অজপারূপ মালা যাহা প্রতি ঘটে ঘটে চলিতেছে, তাহাকে যট্ চক্র পথে প্রতি পর্বতে পর্বতে মালার ন্যায় জপ করিতে করিতে যেস্থানে জপ সংখ্যা শেষ হয় সেই স্থানই সুমেরু পদবাচ্য, অর্থাৎ ভ্রূদেশের পশ্চাতে ব্রহ্মযোনির শীর্ষ

দেশে, উচ্চ স্থানে ত্রিকোণাকার পর্বতের ন্যায় আছে—(মেডুলা অবলঙ্গেটা), ইহাকে ব্রহ্মযোনি কহে, ইহাই সুমেরু। বাহিরে পৃথিবীতেও ব্রহ্মযোনি পাহাড় আছে, তাহা গয়াতে অবস্থিত। এই পাহাড় প্রকৃত ব্রহ্মযোনি নহে জানিবে, উক্ত সুমেরুকে পর্বত কহিবার তাৎপর্য্য পর্বত শব্দের অর্থ, পর্বন্ শব্দজ, যাহার পূর্বেতে ভাগ ভাগ আছে তাহাকে পর্বত কহা যায়। মেরুদন্ডের নিম্ন মুলাধার গ্রন্থি (পর্ব) হইতে মেরুদন্ড যেন স্থানে শেষ হইয়াছে, ইহার মধ্যে পর্বরূপ গ্রন্থি থাকায় মেরুদন্ডের শীর্ষস্থান ব্রহ্মযোনিকে সুমেরু পর্বত কহা যায়, ইহা স্বর্গ স্থানই অবস্থিত। তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি দেহের মধ্যে কণ্ঠের উর্দ্ধে ভ্রূ পর্য্যন্ত স্বর্গস্থান, এই স্থানটিই শূন্য তত্ত্বের স্থান। এই স্থানে যাহার মনের স্থিতিরূপ বসবাস হয় তাঁহারই প্রকৃত সুখভোগ কহিয়া থাক তাহা উপরোক্ত স্বর্গের নিকট অকিঞ্চিৎকর হেয় পদার্থ বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানিগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন।”

এই সকল বাক্য বিজয় শ্রবণ করিয়া সাধুকে বলিল, “ঠাকুর আমি এরূপ কোন কথা এ পর্য্যন্ত কখনও শ্রবণ করি নাই, আমার মাতাপিতার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতেই আমার জ্ঞান ছিল আকাশের উর্দ্ধে স্বর্গরাজ্য আছে। এক্ষণে বুঝিলাম তাহা ঠিক নহে, স্বর্গ সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা শুনিয়াছি, এক্ষণে বুঝিলাম তাহা মানব দেহের মধ্যেই জীবকে আছে, বাহিরে সাধারণ জীবকে তাহার আভাষ প্রদান করিবার জন্য বর্হিভাবে অজ্ঞ জীবকে প্রবোধ দিয়া ধর্মে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে গল্পচ্ছলে আর্য্যদেবগণের কীর্ত্তি লোকে বর্ণন করিয়া থাকে। যাহা হউক আমি ভিতরের ভাব আপনার নিকট হইতে অবগত হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিলাম।” সাধু বিজয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন; “বিজয় তুমি যাহা বলিলে প্রকৃত ঐরূপই বটে, পুরাণ শাস্ত্রগুলি পূর্ব আর্য্যারাজগণের ইতিহাস মাত্র, বহির্ভাবে পুরাণ শাস্ত্র সকলে উল্লিখিত দেবগণের কার্য্যকলাপ বাহ্যিক বাহ্যিক চক্ষে বা বাহ্যিক অর্থে পাঠ করিলে দেবগণের প্রতি সকলকেই বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। কারণ দেবগণের যে লীলা বর্ণন আছে, অনেকস্থলে তাহা ঘৃণার্হ বলিয়াই সাধারণ লোকের ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু উহার ভিতরের ভাব অবগত হইলে তখন ঘৃণা হওয়া দূরের কথা, অপার আনন্দই লাভ হইয়া থাকে, যেমন তুমি বা তোমরা স্বর্গরাজ্য এবং স্বর্গরাজ্যের রাজা ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভই করিয়াছ, ঘৃণার উদয় হয় নাই তদ্রূপ।

দেখ বিজয়, পুরাণাদি শাস্ত্র যে সকল (গুণাদি) দেব দেবীগণের এবং (কামাদি) অসুরগণের বিষয় লিখিত আছে ইঁহারা কেহই দেহধারী নহেন। ইঁহারা সকলেই অনঙ্গ, অবয়ব বিহীন। অবয়ব বিহীন হইয়াও ইঁহারা জীব দেহেতে আশ্রয় করিয়া দেহ ধারীর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। জীবদেহে দেবভাব প্রায় দেখিতে পাইবে না ক্বচিৎ লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে দুই একটি দেবভাব প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহার মধ্যে ঐ লক্ষ লক্ষের ভিতর দুই একটি দেব ভাবের অতীত অর্থাৎ গুণাতীত ভাবযুক্ত নর বপুধারী মনুষ্য দেখা যায়। বাকী জীব সমূহ আসুরিকভাবে যুক্ত থাকায় অসুর বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাণে দেবলীলা এবং সেবাদুরের যুদ্ধ ব্যাপার যাহা বর্ণিত আছে, তাহা সমস্তই অলীক অথচ সমুদয় সত্য। অলীক অথচ সত্য বলিবার অভিপ্রায়, বাহ্যিকভাবে দেখিতে গেলে দেবগণ বা দেবশক্তিগণ, স্ব স্ব দেহ ধারণ করিয়া দেহধারী অসুরগণের সহিত যে বাহ্যিক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা অলীক বাক্য। কারণ বাহ্যিক ভাবে কোন কোন রাজায় রাজায় যেরূপ যুদ্ধ হয় তদ্রূপ যুদ্ধ হয় নাই ইহা নিশ্চয় জানিবে। যদি বল যুদ্ধ হয় নাই তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য বর্তমানে ইহার যুক্তি ব্যতীত অপর প্রমাণ কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও তাহা কর্ম বা জ্ঞান সাপেক্ষ। মনে কর দেবাসুরের যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ শরযুদ্ধ এবং সেই সকল বাণযুদ্ধ সাধারণ ধনুকে সাধারণ শর সংযোগ করিয়া হইয়াছিল তাহা নহে। মনে কর তাহাই যদি হইয়াছিল, তাহা হইলে যে সকল তীর বা ধনুক কোথায় গেল; এক একটি এর নিক্ষেপ দ্বারায় কোটি কোটি নাগ, নর, গন্ধর্ব, অসুর প্রভৃতি নিহত হইত। এক্ষণে সেই সকল বরুণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি শর শিক্ষা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত শর সকলের অদ্ভুত ক্ষমতা বর্ণিত আছে। যদি তাহা সত্য হইত, তাহা হইলে যে সকল রাজগণের সহিত অসুরগণের পরস্পরের যুদ্ধাদি হইত অদ্যাপিও সেই সকল রাজবংশধরগণ বিদ্যমান থাকিয়াও সেরূপ বাণরূপ হয় না কেন। উহার একটি মাত্র শর কাহারও জানা থাকিলে সে যে এক্ষণে ধরাতলের একমাত্র অধিপতি হইতে পারিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি বল সেই সকল শর মন্ত্র দ্বারা ক্ষেপণ করা হইত এবং মন্ত্র বলে সেই সকল শর মহান শক্তি ধারণ করিয়া শত্রু ক্ষয়ে সমর্থ হইত, তাহা হইলে রাজগণ আপন আপন পুত্রকে অন্ততঃ একটি শরেরও মন্ত্র শিক্ষা করাইয়া যাইতেন। তাহা বর্তমানে কাহারও নাই। ইহা সত্য হইলে নিশ্চয় রাজগণ আপন আপন রাজ্য রক্ষার্থে পুত্রগণকে শিক্ষা দিয়া যাইতেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। রামায়ণ মহাভারত ও অপরাপর পুরাণের অদ্ভুত শর সকলের বিষয় বর্ণিত আছে, তৎব্যতীত অপরাপর যে সকল যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, তাহাতে অধিকাংশই অসি তরবারি, সাধারণ বাণযুদ্ধ এবং কোন কোন স্থলে আগ্নেয় অস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় পুরাণোক্ত গন্ধবাদি অস্ত্রের ব্যবহার আর দেখিতে পাওয়া যায় না, উক্তরূপ শর যুদ্ধ অলীক হইলেও উহার মূল রহস্য সত্য। তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্বে বলিয়াছি দেবদেবী এবং কামাদি অসুরগণ সকলেই অনঙ্গ, অবয়ব বিহীন। জীব দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বর্তমান মনের দ্বারায় আপন আপন কার্য্য সমাধা

করিতেছে। দেবাসুরে যুদ্ধ ইহা নিত্য যুদ্ধ, প্রতি জীবদেহে সর্বদাই হইতেছে। যেমন মনের ভিতর সুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তি এই উভয়বিধ বৃত্তি রহিয়াছে। কুপ্রবৃত্তিগুলি সমস্তই আসুরিক ভাব, সুপ্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া মনকে নিজের বশীভূত করিতেছে, আবার কখনও বা দেবভাব সুপ্রবৃত্তি সাহায্যে ক্ষণিক মনকে নিজের বশীভূত করিতেছে। এইরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ সর্বদাই জীবদেহে অহর্নিশি হইয়া থাকে। জীবদেহে যে সকল দেবভাব আছে তাহাও জীবভাবকে প্রকারান্তরে আসুরিকভাবে আবদ্ধ করিয়া থাকে। কারণ দেবগণও গুণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইঁহারা তিনগুণ—এই তিনগুণও জীবকে আপন আপন গুণে আবদ্ধ করিবার জন্য ত্রুটী করে না। তবে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা হেতু জীব গুণাতীত অবস্থার ভাব কতকটা অনুভব করিতে পারে, কিন্তু উপায় ব্যতীত সত্ত্বগুণের অতীত অবস্থা যাহা, জীব তাহা প্রাপ্ত না হইয়া, সত্ত্বগুণের যে ধর্ম অর্থাৎ সুখ সঙ্গের দ্বারায় ও বাহ্য জ্ঞান সম্বন্ধের দ্বারায় আবদ্ধ হইয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ রজঃস্তমঃগুণে আসিয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। কোন কোন ভাগ্যবান জীব প্রথমতঃ সত্ত্বগুণের বশীভূত হইয়া সাত্ত্বিক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপন দেহস্থিত যে আসুরিকভাবে সকল রহিয়াছে, তাহাদের সহিত শরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কারণ শরযুদ্ধ ব্যতীত আপর কোন প্রকারে ইহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশা নাই। উপরে বলিয়াছি সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতাহেতু জীব গুণাতীত অবস্থা আংশিক অনুভব করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য সত্ত্বগুণের শেষ সীমায় শুদ্ধ সত্ত্ব জ্যোতিঃ স্বরূপ কূটস্থ মন্ডল অবস্থিত, ইহাই সুদর্শনচক্র (দর্পন) স্বরূপ। ইহা দ্বারায় আত্মভাব সুন্দররূপে দর্শন হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে সুদর্শনচক্র বলা হয়। বর্তমানে জীবদেহে তিন গুণ কর্ত্তৃক ইহা আবৃত থাকায়, জীব আত্ম রহস্য অবগত হইতে পারিতেছে না। না পারায় জীব কখনও নিজেকে গুণাদি দেবগণের অধীন বলিয়া বিবেচনা করিয়া গুণাদি দেবগুণের উপাসনা দ্বারায় আপনাকে আসুরিক ভাবের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে।

আবার কখনও বা কামাদি অসুরগণের ভাবে বশীভূত হইয়া অহংকর্তা বোধ আসুরিক ভাব সকলকে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া গুণাদি দেবগণকে তুচ্ছজ্ঞানে তাহাদিগকে আসুরিক ভাবের বশীভূত করিয়া থাকে এবং গুণাদি দেবগণকে আসুরিক ভাবে বশীভূত করিয়া, জীব যাহাতে জীব ভাব হইতে মুক্ত না হইতে পারে, আসুরিক ভাবে অনুমোদিত ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত নানাবিধ সৎ অসৎ কার্য্য করণে প্রবৃত্ত করাইয়া জীবকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ যুদ্ধরূপ সমর সমস্ত জীবদেহে আমরণকাল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। অবশ্য এই সকল ব্যাপার জীবদেহে প্রথমতঃ মনে মনেই হইয়া পরে সদসৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। এই সকল ভাবকেই অবলম্বন করিয়া চণ্ডী রামায়ণ ও মহাভারতাদি এবং অপর অপর পুরাণাদিতে যে সকল

দেবাসুরের যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত আছে তৎসমুদয়ই জীবদেহস্থিত দেবাসুরের যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। একারণ দেবগণেরও কার্য্যে সময় সময় কলঙ্ক কালিমা দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু (গুণাদি) দেবগণ গুণের অতীত কেহই নহেন, একারণ সৎ অসৎ কার্য্য, গুণের দ্বারায় হওয়া অসম্ভব নহে, তিন গুণের ভাব হইতেই দেবগণেরও ভাব রচিত হইয়াছে। বাস্তবিক নর রক্তে ধরাকে প্লাবিত করা হয় নাই। যদি বল দেবাসুর যুদ্ধে রক্তপাতও হইয়াছিল। তদুত্তরে আমি বলিতেছি যে রক্ত বাস্তবিক নর রক্ত নহে। রক্ত শব্দের অর্থে অনুরক্তি বা আসক্তি, সেই অনুরক্তি বা আসক্তিরূপ রক্তেরই পতন হইয়াছিল, উহা সাধারণ রক্ত নহে বুঝিতে হইবে।

সাধুর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয় সাধুকে সম্বোধনপূর্বক বলিল "ঠাকুর! পুরাণে শরযুদ্ধ যাহা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আপনি ত' কোন বিষয় বলিলেন না, অথচ আপনি ইতিপূর্বে বলিয়াছেন শরযুদ্ধ ব্যতীত অন্য অস্ত্রযুদ্ধে দেবাসুরকে কোন জীবই জয় করিতে পারিবে না। ইহার রহস্য (ভাব) অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়া আমাদের ভ্রম দূর করত আনন্দ বর্ধন করুন।" সাধু বিজয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! শরযুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ শর কাহাকে বলিয়া থাকে তাহাও তোমাদের জানা থাকা আবশ্যক। প্রণবরূপ ধনুতে মন্ত্রপূত শর যোজনা করিয়া তাহার পর বিধি অনুযায়ী শর ক্ষেপণ করা চাহি। প্রণব অর্থাৎ ওঁকার রূপ মানব শরীর, ইহাকে ওঁকাররূপ রথও কহা যায়। জীব ওঁকার শরীররূপ রথে আরূঢ় হইয়া আছে। এই ওঁকাররূপ ধনুতে শর সংযোগও রহিয়াছে। শরৎ আত্ম পাদবাচ্য অর্থাৎ জীব শরীরের প্রাণ যাহা রহিয়াছেন তিনিই আত্মা, ইহা শাস্ত্রাদিতেও প্রমাণ আছে। প্রাণ দুই প্রকার—স্থির ও চঞ্চল। চঞ্চল প্রাণই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যাতায়াত করিতেছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকেই শর চালনা কহা যায়। মানব শরীরে শ্বাসক্রিয়া লক্ষ্যচ্যুত অবস্থায় ও মন্ত্রহীন অবস্থায় সর্বদাই আপনা আপনি চলিতেছে। জীবের বর্তমান অবস্থা দ্বারায় পরমাত্ম বা ব্রহ্মভাব অনুভব বা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ওঁকাররূপ শরীরেই পরমাত্মা রহিয়াছেন, যেমত তিল মধ্যে তৈল আছে, কিন্তু তিলের বহির্ভাগে তৈলের প্রকাশ নাই। দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত আছে কিন্তু দুগ্ধেতে ঘৃত দেখা যায় না। তিলকে ক্রিয়া বিশেষ দ্বারায় পীড়ন করিলে তাহার পর তিল হইতে তৈল প্রকাশ হইয়া থাকে, ঐরূপ দুগ্ধকেও মথন ক্রিয়া দ্বারায় মন্থন করিয়া তাহার পর ক্রিয়া বিশেষ দ্বারায় দুগ্ধ মধ্যস্থিত ঘৃত প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে তুমি যদি মনে কর, তিলকে যেমন পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ মানব শরীরকে বা ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া কি ব্রহ্মভাব প্রকাশ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি, না তাহা করিতে হইবে না। কারণ শরীর বা ইন্দ্রিয়গণের পীড়ন দ্বারায় পরমাত্মভাব প্রকাশ

না হইয়া বিড়ম্বনাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মন এবং গুণাদি ইন্দ্রিয়গণ ও আসুরিক ভাব সকলের উৎপত্তি, মানবের বর্তমান প্রাণের মধ্যাবস্থা রূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্ম্মুখ গতি হইতে এবং ইহারা সকলেই অনঙ্গ। জীবদেহে অবস্থান করিয়া সৎ অসৎভাবে কার্য্য করিতেছে, এমতস্থলে মানব দেহস্থিত কর্ণেন্দ্রিয়ের নিরোধে বা পীড়নে উহাদের সংযতভাব না হইয়া সমস্তই মনের মধ্যে ভোগাভোগ হইয়া জীবকে দারুণ কষ্ট দিয়া থাকে। তবে যিনি বাক্য কর্মেন্দ্রিয়ের নিরোধ বা পীড়ন করিয়া আপনাকে আপনি সংযতেন্দ্রিয় বলিয়া মনে করেন বা বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে মিথ্যাচারী বলিয়াই মনে করা উচিত। বাহ্যিক শমদমাদির দ্বারাও মনাদি ইন্দ্রিয়গণ জীবের বশীভূত হয় না, কারণ যাহাদিগকে আমি বাহ্যপ্রক্রিয়া দ্বারা বা স্তব স্তুতি দ্বারা বশীভূত করিতে যাইব, তাহাদের মধ্যে এক মনই শত মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে, তাহার পর আসুরিকভাব সকল এবং ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি সকলও তদ্রূপ বলশালী। মনে কর লোক কথায় বলে 'চোরা' (চোর) না শোনে ধর্মের কাহিনী,' তাহাদের যাহা স্বভাব তাহারা তাহা করিবেই করিবে। স্তবস্তুতির সাহায্যে বাহ্যিক পীড়ন দ্বারায় তাহাদের কার্য্য বাহ্যিকে রহিত হইলেও (মনের মধ্যে) মনে মনে সমস্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থের কার্য্য হইয়া থাকে। যাহার বলে, ইহারা বলীয়ান তাহার বল দর্প চূর্ণ না করিলে ইহাদিগকে কিছুতেই দমিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যাহার বলে, ইহাদের বল বৃদ্ধি পাইয়া সৎ অসৎ কার্য্য হইয়া থাকে প্রথমতঃ তাহারই বল স্বতঃ রহিত করা আবশ্যক, নচেৎ মনাদি ইন্দ্ররূপী ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বলাবল বন্ধ হইবার নহে।

পূর্বে বলিয়াছি ইহাদের উৎপত্তি স্থান বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থা হইতে, ইন্দ্রিয়রূপী মনাদি ইন্দ্রিয়গণ ও আসুরিক ভাবসমূহ, বর্তমান প্রাণকর্মের বহির্ম্মুখ গতিশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া. বর্তমান প্রাণকর্মের মধ্যবস্থার ন্যায় শক্তিশালী হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং অপর কোন রকম সাধারণ উপায় দ্বারা ইহাদিগকে দমিত করা অসম্ভব, কারণ কানে জল প্রবেশ করিলে. লোকে যেমত জল দিয়াই কানের জল বাহির করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইহাদেরও দমিত, শান্ত বা বশীভূত করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাসরূপ শর ক্রিয়ার দ্বারাতেই ইহাদের সাম্যভাব আনয়ন করিবার একমাত্র উপায়। কারণ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার মধ্যাবস্থা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি এবং শ্বাস প্রশ্বাসরূপ ক্রিয়া শক্তির বলেই ইহারা বলীয়ান। একারণ শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়াশক্তির বল দর্প খর্ব ব্যতীত মনাদি ইন্দ্রিয়গণের ও আসুরিক ভাব সকলের বল দর্প খর্ব হইয়া সাম্যভাব বা শান্ত ভাব প্রাপ্তি ও পরমাত্মভাবে মিলিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে জানিবে। অতএব দুগ্ধকে যেমত মথন ক্রিয়া দ্বারা মন্থন করিয়া দুগ্ধ হইতে প্রথমে ননী (মাখন) বাহির করিয়া পরে ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ননী হইতে ঘৃত বাহির করিতে হয়, তদ্রূপভাবে শ্বাস ক্রিয়ার প্রাণায়াম রূপ মন্থন ক্রিয়া দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য হইতে ননীরূপ

ব্রহ্মবীজকে বাহির করিতে হয়। আবার প্রাণায়ামরূপ মথন ক্রিয়া দ্বারা ননী (মাখন) রূপ ব্রহ্মবীজ প্রকাশ হইলে সতর্কতা অভাবে উহা গোপাল (গোপাল অর্থাৎ সত্ত্বগুণ) কর্তৃক চুরি না যায় বা গোপাল চুরি করিয়া খাইয়া না ফেলে; কারণ সত্ত্বগুণের ধর্ম, সুখ ভোগের (সঙ্গের) ইচ্ছা দ্বারায় ও বাহ্যিক জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারায় আসক্ত করিয়া, জীবকে ননীপ্রাপ্ত হইতে দেয় না; না দিয়া সুখ ভোগের প্রলোভনে ও লালসায় রত করিয়া নিজের অধিকারে রাখিবারই প্রয়াস পাইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের আশ্রয় ব্যতীত প্রাণায়াম রূপ মথন ক্রিয়ার নদী বাহির হইবে না ইহাও সত্য তবে যাহাতে ননী চুরি না যায়, সে কারণ উক্ত সময়ে গুণাতিত অবস্থার উপর স্থিতিলাভ জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা হইলে আর ননী চুরি না হইয়া ননী হইতে তখন ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ঘৃত স্বরূপ পরমাত্মভাব প্রাপ্তি হইবে নচেৎ নহে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"ওঁকাররূপরথ ও বৃহৎ কূটস্থ বর্ণনা"

পূর্বে বলিয়াছি, মানব শরীরে মাত্রকেই প্রণব রূপ ধনুও কহা যায়; এবং এই মানব শরীকে ওঁকাররূপ রথও কহা যায়, তোমার এবং তোমাদের বিশ্বাস জন্য ইহার শাস্ত্রী প্রমাণও পরে কহিব। এক্ষণে যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর। মানব শরীরস্থ ওঁকাররূপ রথের ছয়টি চক্র আছে, এই চক্রগুলি মেরুদণ্ডের নিম্ন হইতে মেরুদণ্ডের উর্দ্ধের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্থানে মেরুগহ্বরে অবস্থিত আছে। মানবের জীবিতাবস্থা পর্যন্ত মনের দ্বারা দ্রষ্টব্য হইয়া থাকে, ইহা সুক্ষ্মতা বশতঃ দেহান্তে বিলীন হইয়া যায়। কিরূপ ভাবে শর চালনা দ্বারায় আসুরিকভাবের সহিত (সমররূপ) যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহার মর্ম তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ওঁকার রূপ রথে অর্থাৎ মানব শরীরে, দেহস্থিত মনরূপ অশ্বকে (মনকে অশ্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অশ্ব শব্দের অর্থ, অশ্—ব্যাপা, বেগ গামিত্ব হেতু যে বহু ভূভাগ ব্যাপে তাহাকে অশ্ব কহা যায়, বর্তমান মন চঞ্চলতাহেতু অসাধারণ বেগবান থাকায় মন বহু বিষয়ে এবং বহুদেশে অল্প সময়েই ভ্রমণ করিয়া থাকে, একারণ মনকেই অশ্ব বলিতেছি) অর্থাৎ মনকে, দেবী সম্পদরূপ ভূষণে (সৈন্য সামন্তে) ভূষিত করিয়া ওঁকার রূপ শরীর রথের অন্তর্ভাবে সংযুক্ত করিয়া এই মনরূপ অশ্ব বিষয়ে ধাবিত না হয় এমত সতর্কতাপূর্বক উপরোক্ত শরীররূপ রথের চক্রপথে শ্বাস প্রশ্বাসরূপ শর চালনা করিতে হইবে। যিনি এইরূপ ভাবে শর চালনা দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন, তাঁহার সেই শর চালনা দ্বারা পরমাত্মায় লক্ষ্য বিদ্ধ হয় এবং তাঁহার নিজের শরেতে অর্থাৎ প্রাণেতে তন্ময় ভাব আসিয়া সর্বং ব্রহ্মময়ং ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে, নচেৎ নহে জানিবে।

আমি তোমাকে বা তোমাদিগকে এই সকল কথা যাহা বলিলাম, কেবলমাত্র ইহা শ্রবণ করিয়া তোমাদের উক্ত অবস্থা লাভ হইবার নহে। উক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইলে গুরূপদেশের পূর্বোক্ত কর্ম ব্যতীত উহা লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ বাক্যের দ্বারা বা লেখনি দ্বারায় সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেও কার্য্য করণ দেখাইয়া না দিলে উহা লাভ হইবার নহে। তাহার পর পূর্বে বলিয়াছি, বর্তমান মানব শরীরই ওঁকার রূপ রথ, উহার বিষয়ও কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।

"ওঁকার রথমারুহ্যবিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোক পদান্বেষী, রুদ্রোরা ধনতৎপরঃ॥"

অর্থাৎ মানব শরীর মাত্রকেই ওঁকার রূপ রথ কহা যায়। রথ শব্দের অর্থ শরীর; যথা—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথ মেবচ"। প্রাণরূপ আত্মাই এই শরীর রূপ রথের রথী, বর্তমানে মনই এই মানব শরীর রূপ রথে আরূঢ় হইয়া রথস্থ যোদ্ধারূপে অবস্থিত রহিয়াছে, মনকে আত্মা কহা যায়। বর্তমান ওঙ্কার রূপ মানব শরীর চক্রযুক্ত যুদ্ধযান। ওঁকারকে মানব শরীর বলা হয় কেন তাহাও জানা আবশ্যক। ওম্ শব্দ না লিখিয়া লিখলেন ওঁ শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। ওম্ শব্দই ওঁকার পদবাচ্য। ওঁকার শব্দের অর্থ—ওম্=সম্মতি সূচক শব্দ, কার=যে করে, অর্থাৎ যে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করে। মানব শরীর জীবের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ মানব শরীরের- দ্বারা এবং শরীরস্থ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল কার্য হইয়া থাকে, তৎসমুদায় কর্মই জীবের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে বলিয়া শরীরকে ওঁকার কহা যায়। জীব শরীরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণও রহিয়াছে, সত্ত্বগুণ বিষ্ণুকে কহা যায়, রজঃগুণ ব্রহ্মাকে কহা যায়, তমঃগুণ শিবকে কহা যায়, "ত্রয়োদেবীস্ত্রয়োগুণাঃ"—এই তিনগুণ ত্রিবর্ণাত্মক। অ, উ, ম; অ সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, উ রজঃগুণ-ব্রহ্মা, ম তমঃগুণ-শিব—ইঁহারা বায়ুরূপী দেবতা ঈড়া, পিঙ্গলা সুষুম্নারূপী নাড়ীত্রয়ে বায়ুরূপে রহিয়াছেন। এই ত্রিগুণের সাম্য অবস্থায় আত্মা সংযম হইলে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের চঞ্চলতারূপ দর্প বলে চূর্ণ হইলে, তখন স্থির প্রাণরূপ ঈশ্বরের বাচক ওম্ এই ধ্বনি স্বতঃ হৃদয়াকাশে শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে, ইহাকে ওঁকার ধ্বনি কহে। অ, উ, ম, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণের মিলনরূপ সন্ধিদ্বারা আত্মসমীপে মনের মিলন হইলে তখন হৃদয়াকাশে স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা হইতে ওম্ এই সম্মতি সূচক স্বস্তি বাক্য প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বস্তি অর্থাৎ শুভ হউক ইহার সঙ্কেতরূপ ওম্ ধ্বনি তখন স্বতঃ ধ্বনিত হইতে থাকে। ইহাকেই ওঁকার ধ্বনি বা অনাহত ধ্বনি কহা যায়। ইহা নিজ বোধরূপ অবস্থা। প্রাণায়ামরূপ শরক্রিয়ার অতীতাবস্থায় ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা অতি গূঢ় বিষয়, সাধন দ্বারা লব্ধ। নচেৎ মুখে ওম্ ওম্ শব্দ লক্ষ লক্ষ বার বলিলেও ইহার রহস্য ভেদ হইবার নহে।

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বা পরমাত্ম জ্ঞান লাভের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণ-বিষ্ণুকে (সত্ত্বগুণ এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক) পূর্বোক্তভাবে মনের সারথি করতঃ মনকে চক্রপথে চালিত করিয়া রুদ্রের সাধনে তৎপর হইতে হইবে অর্থাৎ রুদ্র শব্দের অর্থ প্রাণ (যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ ইত্যাদি), সেইরূপ স্বরূপ নিজ প্রাণের আরাধনায় রত থাকিয়া, গুণাতীত অবস্থার অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরপ্রাণ আত্মার তেজোময়

কূটস্থ মণ্ডল (ভ্রূ মধ্যে বিরাজিত) যাহা সেই রুদ্রস্বরূপ প্রাণের আরাধনা এবং সেবা (প্রাণায়ামাদিক্রিয়া) ও স্তুতি দ্বারায় ঈশ্বর বোধে নিজ প্রাণের প্রতি প্রেম রাখিয়া সতর্কতার সহিত বর্তমান মধ্যাবস্থারূপ প্রাণকর্মের অতীতাবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইবে। (সতর্কতার আবশ্যক এই হেতু যে, আসুরিক সম্পত্তি দ্বারা মনকে আসুরিক বিষয়ে রত করাই উক্ত প্রাণের অতীতাবস্থা হইতে বা আত্মারূপ প্রাণের তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ কূটস্থ মন্ডলের চিন্তা হইতে বহির্বিষয়ে মনকে না লইয়া যায় এই হেতু বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক) সাধনরূপ সমর আরম্ভ হইলে শ্বাস প্রশ্বাসকে মনের সহিত অন্তর্মুখীন গতি করিয়া মেরুগহ্বরস্থিত চক্রপথে প্রাণকর্মের ক্রিয়া (কৌশল) দ্বারা আসুরিক ভাবের উচ্ছেদ মানসে সাধনরূপ সমর আরম্ভ করিতে হইবে। মনকে দৈবী সম্পদরূপ কবচে আবরিত করিয়া রাখা সত্ত্বেও যদ্যপি মন্ত্রশক্তি দ্বারায় মনকে মন্ত্রপূত না করা যায় তাহা হইলে আসুরিকভাব সমূহ ক্ষণকাল মধ্যেই দৈবী সম্পদরূপ কবচ ভেদ করিয়া আপন অধিকারে মনকে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, একারণ বর্তমান মনকে মন্ত্রশক্তি দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া শর চালনার (প্রাণকর্মরূপ ক্রিয়ার) অভ্যাস করা চাহি, নচেৎ ব্যর্থ হইবে। বর্তমান চঞ্চল মনের উৎপত্তি চঞ্চল প্রাণ হইতে, অর্থাৎ বর্তমান শ্বাস প্রশ্বাস হইতে; মনকে মন্ত্র দ্বারা পবিত্রিত করার নামই পূত করা। মনকে মন্ত্র পবিত্রিত করিতে হইলে, সাধারণ বীজ মন্ত্র যাহা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার দ্বারায় মন পবিত্র হয় না। কারণ বীজ সকল সমস্তই বায়ু ক্রিয়ার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, যেমত অঙ্কশাস্ত্রে একটা × ঢেরা ইত্যাদি চিহ্ন থাকলে গুণ ইত্যাদি করিতে হইবে বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধারণতঃ যে সকল বীজ মন্ত্ররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে তৎসমুদায়ই বায়ু ক্রিয়ার সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আর এই সকল বীজকে মন্ত্র বা দেবতারূপে মনে করা, ইহাও আসুরিক ভাবের প্রলোভন দ্বারায় হইয়া থাকে, সাধারণ জীব তাহা বুঝিতে অক্ষম। শ্বাস প্রশ্বাসের নিবৃত্তি অবস্থারূপ নিশ্বাসই মন্ত্র পদবাচ্য। সাধারণ লোকে শ্বাস প্রশ্বাসকেই নিশ্বাস বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে, বস্তুতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের স্বতঃ নিবৃত্তি অবস্থাই নিশ্বাস, উহাই মন্ত্র পদবাচ্য অর্থাৎ বর্তমান প্রাণ কর্মের অতীতাবস্থাই মন্ত্র পদবাচ্য। যে অবস্থায় আপনা আপনি শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইয়া টানা বা ফেলার আবশ্যক থাকে না, সেই স্বতঃস্থির অবস্থাই মন্ত্র পদবাচ্য। উক্ত অবস্থার দ্বারা মনকে পবিত্রিত করিয়া ঐ অবস্থার স্মরণের সহিত (যাহাতে স্মরণের ভুল না হয়, এমতভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া) ওম্ এই শুভ সূচক শব্দ—(আমাদের সংস্কার হেতু) চক্র পথে গমনাগমন সময়ে প্রত্যেক চক্রে স্মরণ করিতে করিতে সাধকের শর চালনা রূপ প্রাণের ক্রিয়া করা আবশ্যক।

উক্ত বিধি অনুযায়ী কার্য্য না হইলে সমস্তই আসুরিক ভাবের অধিকারে যাওয়া

অসম্ভব নহে, তবে একেবারে সাধন সমর সম্যক বিধিপূর্বক হওয়াও অসম্ভব। ক্রমশঃ অভ্যাসে কার্য্য সিদ্ধি হওয়া সম্ভব, উক্তরূপ সাধন সমর ব্যর্থ যায় না, ইহাও ধ্রুব সত্য। সাধক একদিন না একদিন আসুরিক ভাব সমুহকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইয়া থাকে। যতদিন গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হওয়া যায় ততদিন এই সাধন সমর করিতে হইবে। ইহার দ্বারা আধি ও ব্যাধি নষ্ট হইয়া থাকে (আধি ও ব্যাধি সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে); সাধন সমর জীবের আজীবন করা উচিত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চক্র পথে (শ্বাসের চলাচল থাকিবে), বায়ু স্থির না হইলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধন সমর চলিবে। স্থির প্রাণেতে স্থিতিরূপ গতি একটি অনির্বচনীয় অবস্থা, ইহা নিজ বোধরূপ (নিজ অনুভূতি দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধি হয়)। আসুরিক ভাব সমূহকে দমন করিবার জন্য শর চালনা (ক্রিয়া)-রূপ যুদ্ধের আরম্ভ মুখে বাহ্যিক ও আন্তরিক উপদ্রব অনেক হইয়া থাকে। সে সকলকে আগমাপায়ী বোধে সহ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ সাধনের প্রথমাবস্থায় মনের মধ্যে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান ইত্যাদি উদয় হইয়া সাধনে বিঘ্ন হইয়া থাকে। শীতভাব অর্থাৎ মন শৈত্যগুণ যুক্ত হওয়ায় আলস্য ও জড়তা ভাব আসিয়া সাধনাকালে বিঘ্ন হইয়া থাকে, আলস্য কর্তৃক সাধনের সময় নষ্টরূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া পূর্বোক্ত বিধি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইলে, আলস্য বা জড়তাভাব কাটিয়া গিয়া স্বচ্ছন্দভাব আসিয়া থাকে। উষ্ণভাব অর্থাৎ সাধন কালীন মনে হইয়া থাকে, যেন নিজ মনের শীতলভাব রহিত হইয়া, মন ও শরীর উষ্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া, শরীরে যেন জ্বালা বোধ হইতেছে এবং শরীরের সহিত নিজ মন যেন উত্যক্ত হইয়া, সাধন হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। এ অবস্থায় সাধন হইতে বিচ্যুত না হইয়া (পূর্বোক্তভাবে) উষ্ণভাব মনের যাহা হইতেছে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধন করিয়া যাইলে ক্ষণিক পরে বেশ স্বচ্ছন্দময় আনন্দজনক ভাব, সাধন কর্তৃক স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে সুখ দুঃখ বোধ ভাবকেও অগ্রাহ্য করিয়া শর সাধনরূপ ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণকর্মের অভ্যাস করিয়া যাইলে, কার্য্যের অবসানের পর মনের স্বচ্ছন্দভাব স্বতঃই আসিয়া থাকে। অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ের লাভে অলাভে বা অভাবে, জীব যে সকল মানসিক সুখ দুঃখ বোধ করে তাহাও আগমাপায়ী (আজ আছে পরে কাল থাকিবে না); সুখ দুঃখ চিরদিন সমান থাকে না, কখন সুখ, কখন বা দুঃখ, এইরূপ চলিয়া থাকে; সুতরাং উহা আগমাপায়ী। একারণ উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সুখ দুঃখের অতীতাবস্থা লাভ করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের কর্তব্য। মান অপমান সুখ দুঃখের তুল্য, কারণ মানাপমানের দ্বারাও জীবের মনে সুখ দুঃখ বোধ হইয়া থাকে। ইহারও আগমাপায়ী, চিরস্থায়ী নহে।

মন কখন বা মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইয়া সুখ বোধ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই কাহার নিকট হইতে মর্য্যাদাহানি জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইতেছে, এইরূপ অহরহঃ

হইয়া থাকে, ইহার দ্বারা জীব চিরশান্তি প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং ইহাকেও আগমাপায়ী বোধে অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া চাহি। সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, শোক, মোহ ইত্যাদি এই সকল, আসুরিক ভাবের আসুরিক সম্পত্তিরূপ সৈন্য। পূর্বে বলা হইয়াছে জীবদেহস্থিত মনকে, দৈবী সম্পদরূপ সৈন্য দ্বারায় বেষ্টিত (ভূষিত) করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে হইবে। সাধনকালে (দৈবী সম্পদরূপ বিচার কর্তৃক) দুঃখাদি আসুরিক ভাব সমূহকে শর ক্ষেপণরূপ প্রাণকর্ম দ্বারায় (আত্মভাবরূপে শরে) বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পদদলিত করিতে হইবে। পদদলিত অর্থাৎ হংসরূপ পদের দ্বারায় প্রপীড়িত করিয়া, তাহাদিগকে আত্মভাবের বশীভূত করিতে হইবে। শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখাদি ইহারা আসুরিক চর হইয়া মানব দেহস্থির মনের মধ্যে আপন আপন সুখ দুঃখ ভোগাদি রূপ আশু সুখ বোধ দ্বারায় মানবকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইয়া থাকে। অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের চিন্তা দ্বারা মানবকে আপন আপন অধিকারে রাখিবারই চেষ্টা প্রাণপণে করিয়া থাকে। একারণ সাধকেরও পূর্বোক্ত ভাবে (পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে) গন্তব্য স্থানে লক্ষ্য রাখিয়া শর চালনা করা কর্তব্য। এইরূপে শর চালনারূপ ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে পারিলে ক্রমশঃ একদিন নিশ্চয় সাধন সমরে জয়লাভ করিতে পারিবে। তাহার পর সাধন সমর আরম্ভ সময়ে সাধকের প্রথমতঃ একটি মহান বিঘ্ন অনুভব হইয়া থাকে অর্থাৎ শর ক্রিয়ারূপ প্রাণকর্মের অনভ্যাস বশতঃ শর চালনার গতি ঠিক পথে সম্যক না যাওয়ায় এবং শরীরস্থ রথচক্র তমোগুণরূপ শ্লেষ্মায় আবৃত থাকায়, সাধক রথচক্রেও সম্যক লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না এবং গুরুপদিষ্ট কূটস্থ মণ্ডলেও সম্যক লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিতেছে না, তখন শ্বাস প্রশ্বাসরূপ শরের গতি অন্তর্ম্মুখীন না হওয়ায়, তমোগুণ শ্লেষ্মাধিক্য হেতু শরের সহিত শ্লেষ্মার সংঘর্ষণ হইয়া, সাধকের নিজ শরীরস্থ শরের গতির শব্দ রথচক্রের শব্দের ন্যায় ঘর্ঘর শব্দে হইতে লাগিল, অর্থাৎ মোটা শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শ্বাস প্রশ্বাসরূপ শরের গতি অন্তর্ম্মুখীন (সম্যক) না হইয়া বহির্গতি থাকায়, মন কূটস্থ জ্যোতিঃতে সম্যক লক্ষ্য রাখিতে না পারিয়া মনের স্বতঃই বহিরিন্দ্রিয় বিষয়ে লক্ষ্য পড়িয়া বোধ হইতে লাগিল যেন একটা কোলাহল ধ্বনির সহিত তুরী, ভেরি ও অপরাপর শব্দ হইতেছে। এই সময় উভয় নাসা হইতে যেন শঙ্খধ্বনির ন্যায় শব্দ সকল অনতিদূরে শ্রুত হইয়া থাকে। সাধকের কূটস্থ মণ্ডলে স্থিত জ্যোতিঃ সামান্য ভাবে যাহা মধ্যে মধ্যে ফলিত হইতেছিল তাহাতেও কখন কখন লক্ষ্য যাইতেছে, আবার উহাতে লক্ষ্য স্থির না থাকায় এবং প্রাণের গতি বহির্ম্মুখীন থাকায়, মধ্যে মধ্যে মনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয় বিষয় জনিত চিন্তা আসিয়া, তখন আসুরিক ভাবের চিন্তারূপ শরজাল দ্বারা মনকে জর্জ্জরিত করিতেছে। এই সময়ে মনের স্বতঃই বহিরিন্দ্রিয়গণের প্রতি দয়ার্দ্রভাব আসিয়া, মন তখন বিষাদযুক্ত

হইয়া (মনোভঙ্গ হেতু) সাধন সমরে শিথিলতা করিয়া বিষাদের কারণ চিন্তা করিতে থাকে। মনের বিষাদের কারণ এই যে, দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকায় মন আপন শরীরস্থ বহিরিন্দ্রিয়গণের প্রতি দয়ার্দ্রভাব আসিয়া, মন তখন বিষাদযুক্ত হইয়া (মনোভঙ্গ হেতু) সাধন সমরে শিথিলতা করিয়া বিষাদের কারণ চিন্তা করিতে থাকে। মনের বিষাদের কারণ এই যে, দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকায় মন আপন শরীরস্থ বহিরিন্দ্রিয়গণের প্রতি আত্মীয়বোধে এবং ইহাদের দ্বারায় বর্তমানে ইন্দ্রিয় চরিতার্থজনিত নানা প্রকার আশুসুখকর বিষয় ভোগ করিয়া বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি মমতা বশতঃ তাহাদের নিরোধ করিতে হইবে ভাবিয়া এবং তাহাদের নিরোধে যদি আমার (মনের) বর্তমান অবস্থার ও অবস্থান্তর হইয়া যায় তাহা হইলেই বা আমার কি সুখ হইবে? আর আমার বর্তমান অবস্থারই যদি অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে ত' সুখভোগ বোধ করিবারও লোকাভাব হইয়া যাইবে। এইরূপ বৃথা আশঙ্কা আসিয়া সাধকের মনোভঙ্গ জন্য উৎসাহ রহিত হইয়া, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্যাপারে মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে ইহা ভাবিয়া এবং অজ্ঞতাবশতঃ ও ইন্দ্রিয়গণের প্রতি মমতাবশতঃ কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত না করিতে পারিয়া সাধক তখন মনোভঙ্গহেতু বিষাদযুক্ত হইয়া সাধন সমরে অর্থাৎ প্রাণকর্মের শরচালনা ক্রিয়ারূপ যুদ্ধে, শিথিলভাবপন্ন হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় পুনরায় আসুকির ভাবেরই অনুগত হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ বিষয়ে রত হইয়া থাকে।

এমত অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেমত ভাবে চলিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কার্য্য করা বিধেয়। জ্ঞানীগণ অর্থাৎ যাঁহারা আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছেন; যেমত মহর্ষিগণ, ইঁহারাই জ্ঞানীপদবাচ্য অর্থাৎ যাঁহারা পূর্বোক্তরূপ কর্ম করিয়া কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞানী এবং ঋষিপদবাচ্য। এইরূপ জ্ঞানীরা কেহই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন না, কারণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করাও পাপ বলিয়া তাঁহাদের বিবেচিত হইয়া থাকে। তাঁহারা স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপই কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া আত্মবশে থাকিয়া অনাসক্ত ভাবে (ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে এইরূপ ভাবে) লোক হিতার্থ ও লোক শিক্ষার্থ তাঁহারা কর্ম করিয়া থাকেন।

একারণ আত্মভাবে যে শান্তি সুখ রহিয়াছে তাঁহারা পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্ত হেতু পরমাত্মভাবে যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় শান্তিসুখ প্রাপ্ত হন। উক্ত জ্ঞানিগণ পার্থিব কর্ম সমুদায় অনাসক্ত ভাবে করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় বাহ্যিকে সমস্ত কর্মই করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্বকর্মেই আসক্তি শূন্য। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে আসক্ত হইয়া কার্য্য করার দরুণ নানা জ্বালা ও অশান্তি ভোগ করিয়া ইহকালে এবং পরকালে (ফলাসক্ত হেতু) বিড়ম্বনাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানিগণের বা ঋষিগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়া এবং পূর্বোক্ত সাধনরূপ সমরে শিথিলতা ভাব না করিয়া সাধন সমরে জয়ী হইব এইরূপ উদ্যম সহকারে গুরুপদেশ মত পূর্বোক্ত কর্ম যাহা বলিয়াছি, তাহা করিয়া যাওয়া জীব মাত্রেরই

একমাত্র কর্তব্য কর্ম বলিয়া জানিবে। ইহা না করিলে শরীর যাত্রাও সুখশান্তিতে চলিবে না, এই কারণেও ইহা কর্তব্য বলিয়া জানিবে। যে যে স্থলে সাধকের পূর্বোক্ত ভাবে মনের শিথিলতা আসিবে, তথায় সাধকের কর্তব্য বর্তমান মনকে বিকারী রোগী বিবেচনা করা। বিকারী রোগী যেমত বৃথা আশঙ্কা জনক অনেক প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে এবং নানা উপদ্রব্য করিয়া থাকে, সুস্থ হইবে জানিয়াও বিকার বশতঃ ঔষধাদি খাইতে চাহে না, মানব দেহস্থিত বর্তমান মনও তদ্রূপ। বিকারগ্রস্থ রোগীকে যেমত সুস্থ করিবার মানসে তাহার আত্মীয়গণেরা মিষ্ট বাক্য বা প্রলোভন দ্বারা কিম্বা সময় সময় ভয় দেখাইয়া বা তাড়না করিয়া রোগীর সুস্থতা লাভের জন্য রুচিকর অনুপান দ্বারা ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপভাবে বিকারগ্রস্থ মনকে শান্তি প্রদান মানসে সুস্থ করিবার জন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ অনুপানের সহিত আত্মকর্মের প্রাণায়াম ক্রিয়ারূপ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রাণের বহির্ম্মুখ গতিতে যে শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে তাহাকে বর্তমান মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুবাক্য মত অন্তর্ম্মুখীন করিয়া অন্তর্ম্মুখ গতিরূপ ক্রিয়া করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ বিকারগ্রস্থ মনের দ্বারায় জীবকে আজীবন শোক তাপাদি নানা রকম জ্বালা অশান্তি ভোগ করিয়া, অবশেষে অকালে কালের ভক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হইতে হয়। এই প্রাণকর্মরূপ শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াই একমাত্র সাত্ত্বিককর্ম, অপর যাবতীয় কর্ম সমস্তই রজস্তমঃ গুণের দ্বারায় কৃত হইয়া থাকে; রজস্তমঃ গুণের দ্বারা কৃত যে কর্ম, তাহার পরিণাম সুখ জনক বা শান্তি জনক নহে ইহা ধ্রুব সত্য।

আমি পূর্বোক্ত ভাবে সাধনের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহার অভ্যাস বিধিপূর্বক হইলে, অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকল হৃদায়াকাশে প্রকাশ পাইয়া, আত্মনন্দ ভাবোদয়ে ক্রমশঃ আসুরিক ভাব সকল দমিত হইয়া যায়। পূর্বোক্ত ভাবে সাধন আরম্ভ কালে, বর্তমান মনের সাধন কর্ম করণে, অনিচ্ছা, বিষাদ প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধক (বাধা) যাহা হইয়া থাকে, এ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া গুরু বাক্যেতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক সাধন করিলে, মনের প্রত্যক্ষ বিষয় সকল দর্শন হইয়া অবিশ্বাস, ভ্রান্তি, অনিচ্ছা প্রভৃতি সব আপনা আপনিই রহিত হইয়া যায়। প্রাণের অন্তর্ম্মুখীন গতি সম্যক না হওয়া পর্য্যন্ত বর্তমান মন ইন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তাতেই রত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক মনের ধর্ম। যেমত সাধারণ জীব মাত্রেরই শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গত থাকায়, মনও বহির্বিষয়েই ধাবিত হয় এবং নানা বিষয়ের চিন্তা (মনে মনে) করিয়া তৎপরে মন চিন্তাপ্রসূন বিষয় কার্য্যে পরিরত করিবার প্রয়াস পাইয়া অবশেষে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। তদ্রূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্যকভাবে প্রাণের অন্তর্ম্মুখীন গতি না হয়, ততক্ষণ মন বহির্ব্বিষয় চিন্তা করিলেও মনকে সাধন পথ হইতে বিচ্যুত না করিয়া, বিকারী রোগীর ন্যায় উহাকে আত্মজ্যোতিঃ রূপ অনুপানের সহিত অন্তর্ম্মুখীন প্রাণকর্ম

(শরক্রিয়া) রূপ ঔষধ সেবন দ্বারা শরীরস্থ চক্রপথে মনকে প্রবেশ করাইয়া স্থিরপ্রাণরূপ পরমাত্মভাবের অনুসন্ধানে রত করা এবং সাধনরূপ যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত করা নিতান্ত কর্তব্য। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিতে করিতে, সাধক আপন হৃদয়াকাশে কোটি সূর্য্য এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় কোমল শুভ্রবর্ণ জ্যোতিঃ দেখিতে পান। উহা প্রথমতঃ দেখিলে বোধহয় যেন জ্যোতিঃ সমুদ্রের ন্যায়, তাহার মধ্য হইতে বৃহৎ কূটস্থের রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা দেখিতে চতুর্দ্দিকে পীতবর্ণের জ্যোতিঃ মণ্ডলের মধ্যবর্তী একটি গাঢ় নীল বর্ণের গোলকবৎ। এই গোলকটী গহ্বর বিশেষ, ইহাকেই গগণ গুহা কহা যায়। গগণ গুহারূপ গোলকের মধ্যস্থিত স্থানে একটি শুক্ল বর্ণের অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র থাকে, তাহার পর উক্ত জ্যোতির্ময় বৃহৎ কূটস্থ মধ্যে জগতের জীব সমূহের এবং মানবের স্ব স্ব প্রতিকৃতি (প্রতি আকৃতি) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ জ্যোতির্ময় অবস্থার তেজ সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া সাধকের মনে হয় যেন নিজের দেহ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় সাধকের সমর ভীতও হইতে হয়, কিন্তু গুরু স্মরণ মাত্রেই ভীত ভাব কাটিয়া গিয়া, কূটস্থ মণ্ডলের সাম্যভাব পুনরায় দর্শন হইতে থাকে এই সময় অনবরত স্বস্তিবাক্য স্বরূপ প্রণব (ওম্) ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধকের হৃদয় ও মন আনন্দে আপ্লুত হইয়া সাধনার জয়সূচক দীর্ঘ ঘণ্টার বাদ্যের ন্যায় ধ্বনি পুনর্বার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই স্থানে অনেক সাধক মনে করিয়া থাকেন যে, আর আমার সাধনের আবশ্যকতা নাই, সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, ঐরূপ মনে হওয়া সত্ত্বগুণের প্রলোভন মাত্র। মনের এই ভাবই আসুরিক ভাবের গুপ্তদূতি। বর্তমান বুদ্ধি-দূতীগিরি করিয়া সত্ত্বগুণের ভাবেই আসক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া, সাধককে সত্ত্বগুণের গুণকীর্তন দ্বারা সত্ত্বগুণেই স্থিতি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু বিশিষ্ট সাধকের কর্তব্য, এই প্রলোভনের বশীভূত না হইয়া সত্ত্বগুণের অতীত (গুণাতীত) পদপ্রাপ্তির চেষ্টা করা অর্থাৎ কূটস্থ গহ্বরে মন দ্বারা প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে কি আছে, তাহার অনুসন্ধান করা বিশেষ কর্তব্য। এই কূটস্থ গহ্বরে প্রবেশ জন্য শরসাধনরূপ ক্রিয়া বন্ধ না করিয়া চলিতে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গন্তব্য স্থান না পাওয়া যায়, ততক্ষণ গন্তব্য স্থান প্রাপ্তির জন্য কার্য্য করিতে হইবে।

নিজ গন্তব্য স্থান কোথায় এবং তাহা কি, ইহাও জানা থাকা আবশ্যক। সত্ত্বগুণের অতীতাবস্থা অর্থাৎ কূটস্থের বহির্ভাবের ও অতীত অবস্থাকে (কূটস্থ গহ্বরের ভিতর স্থিত অবস্থাকে) সকলের স্থিতিরূপ গন্তব্যস্থান বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত অবস্থায় অর্থাৎ যে স্থানে দীর্ঘ ঘণ্টার ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল এবং ঐ ধ্বনির অন্তর্গত কূটস্থ জ্যোতিঃ যাহা দর্শন হইতেছিল, সেই দর্শন অবস্থাতেই মনকে রাখিয়া হংসরূপ পদাঘাত দ্বারায় (সত্ত্ব গুণের হৃদয়ে অর্থাৎ আদিত্য হৃদয়ে ঠোকররূপ ক্রিয়া বিশেষের দ্বারায়) কূটস্থের দ্বার উন্মোচন করিলেই কূটস্থ গহ্বরে (উপরোক্ত রূপ) এক অপূর্ব ভাব দর্শন হইয়া

থাকে। যেন জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে শুক্লবর্ণ আকাশের ন্যায়, দ্বিভূজ দেহধারী মনুষ্য বসিয়া আছেন। ইহার মস্তকের কেশও শুক্লবর্ণ এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে যেন তৎতুল্য অপর পুরুষ সকল অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ধ্যানাবস্থায় গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না। পূর্ব্বোক্ত স্বস্তিবাচক মঙ্গলজনক ওম্ ধ্বনি যাহা অনবরত ধ্বনিত হইতেছিল, সাধক তখন ঐ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে এবং আত্ম জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে তাহার পর এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থারূপ স্থিতির অবস্থা পাইয়া থাকেন। এই অবস্থা সাধক যাহা পাইয়া থাকেন, ইহা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মময় ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা,—ইহা নিজ বোধরূপ অব্যক্ত ভাব, কর্ম্ম করিয়া অবগত হইতে হয়। দেখ বিজয়! জীব মাত্রেই সুখ বা আনন্দের ভাব এবং অভাব মোচন অবস্থা চাহিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় জীব তাহা চহিয়াও সম্যক প্রাপ্ত হয় না; জীবের দু'টো পয়সা বা দু'ক্রোর পাঁচক্রোর টাকা পাইলে সুখ বা আনন্দ হইবে এবং অভাব যাইবে, এইরূপ আশায় জীব তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু উহা পাইলেও জীবের তাহাতে সুখ বা আনন্দ বা অভাব রহিত অবস্থা ক্ষণিক কালের জন্য। জীব উহা দ্বারা প্রকৃত সাত্ত্বিক সুখ বা সাত্ত্বিক আনন্দ লাভ করিতে পারে না। যোগী ঋষি যাঁহারা, তাঁহারাও কষ্ট বা অভাব চাহেন না। তাঁহারা সাধন দ্বারায় অক্ষম সুখ, অক্ষয় আনন্দ, অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়া সকল অভাব দূর করেন এবং শিবস্বরূপ হইয়া জীবের মঙ্গল জন্য ও সর্বভূতের হিতের জন্য, জীব যাহাতে রক্ষা পায় এমত কার্য্যে আজীবন রত থাকিয়া জীবগণকে সদুপদেশ দিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থা লাভ করা কি জীবের কর্তব্য নহে? যাহা লাভ হইলে আর অপর লাভের ইচ্ছা থাকে না এবং যাহা লাভে সকল অভাব বিদূরিত হয়, তাহা কাহার না পাইবার ইচ্ছা হয়?

তাহার পর সাধু বিজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বিজয়। ইহাই শর যুদ্ধ। পুরাণে দেবাসুর সংগ্রামে যে সকল শর যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়ই মানব দেহস্থিত দৈবী সম্পদ ও আসুরিক সম্পদের সহিত যে নিত্য যুদ্ধ চলিয়াছে, এই যুদ্ধকেই অবলম্বন করিয়া গল্পচ্ছলে রচিত হইয়াছে। পুরাণাদির মূলে সত্য আছে। বাহ্যিক ভাবে সত্য নাই। পুরাণ রচয়িতার উদ্দেশ্য মহৎ, দুঃখের বিষয় বর্তমানে দেশে কর্মীর অভাব হওয়ায় পুরাণের রহস্য কেহ অবগত না হইয়া পুরাণের বাহ্যিক ভাব দেখিয়া কেহ বা বিদ্রূপ ভাবে পুরাণকে দেখিতেছেন, কেহ বা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। যাঁর যেমন চক্ষের দৃষ্টি বা যাঁর যেমন মনের ভাব, তিনি তদ্রূপ ভাবে পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহাতে গ্রন্থ কর্তার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কর্ম্মজ জ্ঞান ব্যতিরেকে পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহাতে গ্রন্থ কর্তার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কর্ম্মজ জ্ঞান ব্যতিরেকে পুরাণের রহস্য ভেদ হইবার নহে জানিবে।

সাধুর এই বাক্য শেষ হইবা মাত্র বিজয়ের পিতা সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

ঠাকুর! আমাদের সম্মুখে পরিখা বেষ্টিত উজ্জ্বল নানা বর্ণের স্ফটিকের দ্বারায় কারুকার্য্যে খচিত অট্টালিকাটি কাহার? সাধু বিজয়ের সহিত কথা বলিতে বলিতে কথার প্রসঙ্গে আসিতেছিলেন, একারণ তাঁহাদের লক্ষ্য অপর কোন দিকে তত' ছিল না। বিজয়ের পিতার বাক্য শুনিয়া সাধু যেন কতকটা চমকিত ভাবে অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ওঃ আমরা যে রাজ অট্টালিকার সম্মুখেই আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাজবাটির চিহ্ন স্বরূপ রাজপ্রাসাদের শীর্ষোপরি রাজপতাকা রাজার বল এবং যশঃ গৌরব ও জয় ঘোষণার উদ্দেশ্যে আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইতেছে, হাঁ ইহাই রাজবাটী। এক্ষণে আমরা প্রসাদের মধ্যে গিয়া রাজদর্শন করিব। ইহা বলিয়া সাধু বিজয় ও বিজয়ের পিতামাতার সহিত পরিখার ধারে রাজবাটীর তোরণ দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তোরণ দ্বারের লোকের জনতা অত্যধিক রহিয়াছে, সকলে রাজদর্শনের জন্য রাজবাটীর মধ্যে যাইতেছে। সাধু ইহা দেখিয়া পরিখার সন্নিকটে আসিয়া যেখানে লোকের জনতা কম আছে, এমত একটি জায়গায় বিজয় প্রভৃতির সহিত উপরিতন স্থানে উপবেশন করিলেন। উদ্দেশ্য একটু জনতা কমিলেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। বিজয় পরিখার উপরিস্থিত শ্যামলবর্ণ তৃণের উপর বসিয়া দেখিতে লাগিল পরিখাস্থিত জল মধ্যে নানা জাতীয় জলচর পক্ষী আপন আপন ভাবে মগ্ন হইয়া জলক্রীড়া করিতেছে এবং পরিখার উপর রাজপ্রাসাদের চতুঃসীমায় অশোক বৃক্ষরাজি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যেন অশোক বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ অশোক বৃক্ষ সমূহ নারীকুলের শোক নিবারণার্থ পীতাভযুক্ত অল্প আরক্তিমপর্ণ পুষ্প প্রসব করিয়া নারীকুলকে যেন পুষ্প ভক্ষণের জন্য আহ্বান করিতেছে। অশোকরাজির ছায়ায় শিখিকুল আনন্দমনে বিচরণ করিতেছে এবং কোন কোন শিখি আপন আপন পুচ্ছ প্রসারণ করিয়া কেকা রবে নৃত্য করিতেছে। শিখিগণের কেকা রব (ধ্বনি) দ্বারা যেন গগন মন্ডল পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিয়া তাহার প্রতিধ্বনিতে নারীগণের হৃদয় ও তাপিত প্রাণকে (সুমিষ্টরবে) সুশীতল করিতেছে! এমন সময় একজন দ্বারপাল আসিয়া সাধুকে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, মহর্ষি! আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি? সাধু বলিলেন আমরা রাজদর্শনের জন্য আসিয়াছি। জনতা বেশী থাকায় এইখানে বিশ্রাম করিতেছি। দ্বারপাল তদুত্তরে কহিল মহর্ষি! আপনি আমার সমভিব্যাহারে আসুন; আমি সঙ্গে করিয়া আপনাদিগকে রাজদরবারে লইয়া যাইতেছি; জনতার জন্য আপনাদের কোন রকম ক্লেশ হইবে না।

সাধু দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমরা রাজাজ্ঞা ব্যতীত রাজসভায় গমন করিব না, অতএব তুমি আমাদের আগমন বার্তা রাজসমীপে জ্ঞাপন করিয়া রাজার নিকট হইতে আমাদের রাজদর্শন জন্য অনুমতি লইয়া আইস। দ্বারপাল

করজোড়ে পুনরায় কহিল, প্রভো! অদ্য রাজদর্শনে সকলেরই অনুমতি আছে, সুতরাং কাহারও জন্য বিশেষ অনুমতি লইবার আবশ্যক নাই। সাধু তদুত্তরে বলিলেন, না, আমি বা আমরা বিনা রাজ অনুমতিতে রাজপুরে প্রবেশ করিব না। অতএব তুমি রাজসমীপে গমনপূর্বক আমার আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিয়া আমাদের রাজদর্শন লাভের অনুমতি লইয়া আইস। দ্বারপাল ইহা শ্রবণান্তে সাধুকে প্রণাম করিয়া তদাজ্ঞা পালন জন্য রাজসমীপে গমন করিল। বিজয় সমস্তই শুনিতেছিল, এক্ষণে দ্বারপালের বাক্যে বুঝিতে পারিল, ইনি সাধারণ বেশধারী সাধু নহেন। ইনি একজন মহর্ষি পদবাচ্য। যাহা হউক অশোক বনের দৃশ্য দেখিয়া ও যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে তিনি মহর্ষি পদবাচ্য বুঝিতে পারিয়া বিজয় মনে মনে কখন আনন্দভরে মৃদুমন্দভাবে হাস্য করিতেছে, আবার কখন বা বিমর্ষ ভাবাপন্নও হইতেছে, আনন্দের কারণ, পরিখাস্থিত জলচর পক্ষীগণের আনন্দভরে জলক্রীড়া এবং অশোকরাজির মনোহর দৃশ্য ও শিখিগণের কেকা রবের সহিত শিখিপুচ্ছের প্রসারণরূপ ক্রিয়া ও নৃত্য দেখিয়া এবং সাধুকে মহর্ষি বিশেষ জানিয়া বিজয়ের মনে আনন্দ ভাবেরই সঞ্চার হইতেছে। আবার বিমর্ষের কারণ, সাধুমুখে বিজয় শুনিয়াছে যে, বিজয় রাজপুত্র; সাধুবাক্য যে বিজয়ের বিশ্বাস নাই তাহা নহে, তবে বিজয় যে রাজপুত্র তাহা বিশ্বাস হইলেও বিজয়ের উহা প্রত্যক্ষ অভাবে ধারণা হইতেছে না। বিজয়ের মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, আমি রাজপুত্র হইলেও চন্ডালের সহবাসে থাকায়, পিতা যদি আমাকে রাজপুত্র বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার সমূহ মনঃকষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল বিষয় যখন মনে মনে চিন্তা করিতেছে, সেই সময়ে বিজয় কিছু বিষণ্ণ ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। এমন সময় পূর্বোক্ত দ্বারপাল সাধু সমীপে উপস্থিত হইয়া সাধুকে প্রণামান্তে রাজার অনুমতি (বার্তা) জ্ঞাপন করিয়া কহিল, প্রভো, মহারাজ আপনাকে প্রণাম দিয়া আমাকে কহিলেন, দ্বারপাল! তুমি সত্বর মহর্ষিকে এবং মহর্ষি সমভিব্যাহারে যাঁহারা আসিয়াছেন তাহাদিগকে সমাদরের সহিত আনয়ন কর; যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। অতএব আপনারা রাজপুরে পদধুলি দিয়া আমাদিগকে এবং মহারাজকে কৃতার্থ করুন। জনতা হেতু আপনাদের কোন রকম ক্লেশ হইবে না, আপনারা গাত্রোত্থান করিয়া আমার সঙ্গে আসুন।

দ্বারপালের কথা শুনিয়া সাধু বিজয় প্রভৃতিকে বলিলেন; তবে এইবার চল আমরা সকলে রাজদর্শন জন্য রাজপুরে গমন করি; ইহা বলিয়া সাধু গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়রা প্রভৃতিও উঠিয়া সাধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্বারপাল ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। রাস্তায় জনতা খুবই ছিল, কিন্তু দ্বারপাল সঙ্গে থাকায় জনতা জনিত ইহাদের কোন ক্লেশ বোধ হইল না। ইহারা যাইতেছে দেখিয়া ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর অনেক লোক যাইতে লাগিল। আবার অনেকে রাজ-দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে তাহাও দেখিলাম। ইহারা পরিখার সেতু পার হইয়া রাজতোরণের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া দেখিল, দ্বারপালগণ বর্ম পরিধান করিয়া অসিচর্ম হস্তে শ্রেণীবদ্ধভাবে তোরণের উভয় পার্শ্বে দন্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বাররক্ষকগণ ইহাদিগকে দেখিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। ইহারা তোরণ মধ্যস্থিত পথ অতিক্রম করিয়া অপর একটি সুপ্রশস্ত পথে আসিয়া উঠিল, এই পথটি রাজবাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পথটি জলদ্বারায় সিক্ত থাকায় পথে ধুলার লেশ মাত্র নাই। পথের চতুর্দ্দিকে একটি সমতল ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের মধ্যভাগের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাসাদের প্রায় চতুর্দ্দিকে সমতল ক্ষেত্রের উপরে হরিৎ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণরাজি দ্বারায় শোভিত হইয়া নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে এবং স্থানে স্থানে মর্ম্মর প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইহারা এক্ষণে যে পথ দিয়া যাইতেছে, এই পথের উভয় পার্শ্বে চোপ্‌দারগণ বিচিত্র বসন ভূষণে পরিধান করিয়া কনক নির্ম্মিত আসা হস্তে করিয়া (যেন কাম দেবের কনক আশা হস্তে) শ্রেণীবদ্ধভাবে দন্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ পথের এক পার্শ্বে লতাবৃতি দ্বারায় পরিবেষ্টিত লতাগুলিতে আকাশবর্ণের ন্যায় অল্প নীলাভাযুক্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পথিকগণের মনপ্রাণ শীতল করিতেছে! পথের উভয় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে আলোক স্তম্ভগুলি লতা পুষ্পে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করতঃ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান রহিয়াছে।

ইহারা (বিজয় প্রভৃতি) দ্বারপালের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। বাল্যচপলতা হেতু বিজয়ের দৃষ্টি প্রায়শঃ পথের চারিদিকের শোভার পানে বিশেষ ভাবে ধাবিত হইতেছে। চারিদিকের দৃশ্য পদার্থগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিজয়ের মনোরূপ ভৃঙ্গ প্রকৃতির নানাবিধ শোভা দর্শনে আকৃষ্ট ও গুণে সংমূঢ়চিত্ত হইয়া বর্তমান প্রকৃতি জনিত সুখ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, বিজয়ের পূর্ব ভাবকে বিস্মরণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমান মনের এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া বিজয় আশ্চর্য্য হইতেছে ও ভাবিতেছে যে আমি কখন কোন রাজপ্রাসাদ বা রাজধানী দেখি নাই। পূর্বে আমার মন যে স্থানে বাস করিত এবং যে অবস্থায় থাকিত, তাহাতেই বেশ সন্তোষ ভাবেই থাকিত। এক্ষণে নানা বিষয়ে দেখিয়া প্রকৃতির নানা রকম শোভায় আমার মন পূর্ব ভাব বিস্মৃত হইয়া, আর যেন পূর্ব অবস্থার ভাবে থাকিতে সম্মত হইতেছে না। বর্তমান মনের কার্য্য দেখিয়া নিজের মনের প্রতি তাহার ঘৃণা ভাব আসিয়া মনকে তাহার পূর্ব অবস্থার ভাবে সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বর্তমান মনকে প্রবোধ দিয়া বলিল, আমি বাল্যকাল হইতে যে অবস্থায় কালাতীত করিয়া আসিতেছি, সেই ভাবকে স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিয়া চলিলে আমার সকল বিষয়েই মঙ্গল হওয়া সম্ভব, নচেৎ আমাকে পদে পদে অমঙ্গল ভোগ করিতে হইবে। রাজা যদি আমাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও আমি রাজ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইতে কদাচ চাহি না। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব যাহাতে আমার পূর্বভাব স্মরণ থাকে। বিজয় চলিতে

চলিতে মনে মনে ঐ সকল চিন্তা করিয়া যাইতেছে, এমন সময় দ্বারপাল তাহাদিগকে রাজার পুরঃপ্রবেশের দ্বারদেশের অতি নিকটে আনিয়া কহিল "এই সম্মুখেই রাজপুরে প্রবেশ করিবার উত্তর দ্বার, এই দ্বার দিয়াই আপনাদিগকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে হইবে; এইরূপ পুরঃপ্রবেশের চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে, যে দিকে যে দ্বার আছে, তাহাকে সেই দিকের দ্বার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দ্বারপালের কথায় মহর্ষি হুঁ হুঁ করিয়া জবাব দিয়া যাইতেছেন, উহা শ্রবণ করিয়া বিজয়ের লক্ষ্য দ্বারের দিকেই ধাবিত হইল। দ্বারের দিকে লক্ষ্য হইবা মাত্র দেখিল দ্বারের সম্মুখে পথের উভয় পার্শ্বে দুইটি অতি বৃহদাকার শ্বেত বর্ণ হস্তী সুসজ্জিত ভাবে দন্ডায়মান রহিয়াছে। হস্তীযুগলের বৃহৎ দন্তের মধ্যভাগ সুবর্ণ দ্বারা জড়িত রহিয়াছে। বিজয় ইতিপুর্বে যদিও হস্তী অনেকবার দেখিয়াছিল কিন্তু এরূপ বৃহদাকার শ্বেত বর্ণের হস্তী কখনও দেখে নাই; সে যাহা দেখিয়াছে তাহা সমস্তই কৃষ্ণ বর্ণের বা ধূসর বর্ণের। ইহা একেবারে উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ। বিজয় হস্তী যুগলকে দেখিয়াই মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! একি হস্তী? আমি ত' কখন এরূপ বর্ণের হস্তী দেখি নাই এবং এরূপ বৃহদাকারের হস্তীও দেখি নাই, এ হস্তী কোন জাতীয়? বিজয়ের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি কহিলেন, বৎস! ইহাকেই ঐরাবত হস্তী কহা যায়। ইহা পূর্ব দিকের হস্তী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব দেশজাত।

মহর্ষির বাক্য শেষ হইবার পরই সকলে রাজপুরদ্বারের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দ্বারদেশে আসিয়া দেখিল, তথায় কতিপয় রাজ অমাত্য মহর্ষিকে যেন অভ্যর্থনা করিবার জন্যই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য রাজপুরঃদ্বারের উপরিভাগে একটি গৃহমধ্য হইতে প্রাতঃকালের উপযুক্ত অতি শ্রুতি মধুর মঙ্গলজনক সানাইয়ের ধ্বনি তালে তালে বাদ্যের সহিত বাজান হইতেছে। তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র পূর্ব কথিত অমাত্যগণ মহর্ষিকে অভিবাদনের সহিত দন্ডবৎ প্রণাম করিল। মহর্ষি তাঁহাদিগকে স্বস্তি বাক্যে প্রতি নমস্কার করিলেন। যে দ্বারপাল ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছিল, সে মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রভো! ইনিই আমাদের মহারাজের অমাত্যগণের সর্বপ্রধান অমাত্য। ইঁহার পশ্চাতে যাঁহারা দন্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ের অমাত্য; ইহা বলিয়া দ্বারপাল তাহাদের সকলের পশ্চাতে আসিয়া দন্ডায়মান রহিল। তৎপরে মহর্ষি প্রধানমন্ত্রীকে কহিলেন, আমি আপনাদের সকলের শিষ্টাচারে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম, আপনারা সকলেই প্রশংসার যোগ্য; একারণ আমি আপনাদিগকে বিশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, আপনারাই ধন্য পুরুষবাচ্য। মন্ত্রীপ্রবর মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া করজোড়ে মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহর্ষি! আমরা আপনার নিকট হইতে প্রশংসাবাদের যোগ্য নহি, কারণ আমরা আমাদের মহারাজের আজ্ঞানুযায়ী তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে কর্তব্য কার্য্যই

পালন করিয়াছি। আমাদের মহারাজা এবং আমরা আপনার কৃপারই অভিলাষী, ধন্যবাদের পাত্র নহি। মহর্ষি ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রধান মন্ত্রীকে কহিলেন, ভাল, তবে আপনি পথপ্রদর্শক হইয়া রাজদর্শন করাইয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন। মন্ত্রীপ্রবর মহর্ষিকে করজোড়ে বলিলেন, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে আপনারা আমার সহিত শুভাগমন করিয়া মহারাজকে এবং আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন, তবে চলুন, আমরাও আপনার সহিত যাইতেছি। মহর্ষি বিজয়কে বলিলেন, তোমরাও আমার সঙ্গে আইস। মহর্ষি মন্দ মন্দ গতিতে যাইতে লাগিলেন। বিজয় প্রভৃতিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অমাত্যগণ মহর্ষির পার্শ্বে পার্শ্বে ভদ্রতাসূচক বাক্য কহিতে কহিতে চলিলেন। বলা বাহুল্য দ্বারপাল তাঁহাদিগকে যে পথ দিয়া আনয়ন করিল, এই পথে জনতা তত নাই; এই পথে সামন্ত নৃপতিগণ এবং অপর মাননীয় লোকেরাই গমনাগমন করিয়া থাকেন। দ্বারপাল ইঁহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া, আপন কার্য্যে চলিয়া গেল। বিজয় মাতার হস্ত ধারণ করিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাজপুরের প্রবেশ করিল; রাজপুরের সৌন্দর্য্য বিজয়ের বর্ণন করা সাধ্যাতীত। কারণ এই অপরূপ দৃশ্য তাহার দর্শন করা অনেক দূরের কথা, কখন শ্রবণও করে নাই। তবে স্বর্গরাজ্য বা ইন্দ্রপুরী যাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় গল্পচ্ছলে শুনিয়াছিল, উহার বহিরর্থ যে সত্য নহে, তাহা মহর্ষি বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে বিজয় যে পুরী দেখিতেছে, ইহাকেই তাহার ভূস্বর্গ বা ইন্দ্রপুরী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। পুরীটী স্বর্ণপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাহার দৃষ্টি যখন যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকেই নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুবর্ণে মন্ডিত দেখিতেছে এবং তাহাতে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া দীপ্তি সহকারে চমক দিতেছে। তাহার সুবর্ণের জ্ঞান আছে এবং সুবর্ণ যে মূল্যবান পদার্থ তাহা বিদিত আছে; কিন্তু এত অধিক সুবর্ণ একত্রে কখনও তাহার নয়ন গোচর হয় নাই; তাই এই অপূর্ব সুবর্ণ নির্ম্মিত পূরী দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। তাহার এক্ষণে বাকশক্তিও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এমত সময় মহর্ষি তাহাদিগকে মৃদু নীরবে বলিলেন, এইবার আমরা রাজ সভায় প্রবেশ করিব, অতএব তোমরা আমরা সন্নিকটে করজোড়ে বিনীতভাবে দন্ডায়মান থাকিও; রাজা বা আমি বসিতে না বলিলে বসিও না। ইহা বলিয়া মহর্ষি অমাত্য সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন, ক্ষণিক পরেই সকলে রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন।

সভায় প্রবেশ করিয়া বিজয় দেখিল দ্বাদশটা সুবর্ণ নির্মিত সিংহের স্কন্ধোপরি সুবর্ণের পাতের উপর হীরক, পান্না, চুনি, বড় বড় মণি এবং মণিকা দ্বারায় শোভিত রহিয়াছে। তাহার উপর সুবর্ণের মণি মাণিক্য দ্বারা খচিত দুইটি সুখাসন রহিয়াছে। একটিতে রাজা উপবেশন করিয়া আছেন, অপরটিতে রাজলক্ষ্মী স্বরূপ রাণী মহারাজের

বাম পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং পশ্চাৎদেশ হইতে একটি সুন্দর পুরুষ রাজোচিত পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া রাজশিরে ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহাকে দেখিয়া তাহার বোধ হইল, ইনি সামন্ত নৃপতিগণের মধ্যে একজন প্রধান। রাজসিংহাসনের উভয় পার্শ্বে দশ বার হস্ত দূরে রজত নির্মিত সুখাসনে সামন্ত নৃপতিগণ বীরাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন দেবগণের মধ্যে কনকাসনে দেবরাজ শচীসহ বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। রাজসিংহাসনের নিম্নে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে মন্ত্রীগণের রজতাসন রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই কয়েকখানি স্বর্ণ নির্মিত কনকাসন মহর্ষিগণের জন্য রহিয়াছে; কয়েকজন মহর্ষিও তাহাতে উপবেশন করিয়া আছেন এবং পদস্থ সেনানায়ক এ বিভাগস্থ সেনাপতিগণ বীরোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে সতর্কভাবে স্থানে স্থানে রাজজ্ঞা পালন জন্য দন্ডায়মান রহিয়াছেন। সভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি বিজয়ের দিকেই পতিত হইয়াছে। তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইবা মাত্র রাজা এবং রাণী সিংহাসন হইতে নগ্নপদে অবতরণ করিলেন। রাজা করজোড়ে মহর্ষির চরণে আপন কিরীট সদৃশ মুকুট স্থাপন করতঃ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মহর্ষিকে সম্বর্ধনা করিলেন। রাণীও করজোড়ে, ভক্তিভরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মহর্ষিকে প্রণাম করতঃ রাজপার্শ্বে দন্ডায়মান রহিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময় সভাস্থ সকলেই নগ্নপদে করজোড়ে আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন।

রাজা মহর্ষিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরিশেষে যখন অবশিষ্টকে পাদ্য অর্ঘ্য দিবার জন্য উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে মহর্ষি রাজাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, রাজন! উহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য দিবার প্রয়োজন নাই। উহারা আপনার আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষী; আপনি রাজ্ঞীসহ আসনে উপবেশন করুন। মহর্ষি ইহা বলিয়া ভূমিতল হইতে রাজমুকুট উঠাইয়া উভয় হস্তদ্বারা আশীর্বাদ স্বরূপ রাজার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর রাজা মহর্ষিকে বলিলেন, আপনি এই আসনে উপবেশন করুন। আপনি উপবেশন না করিলে আমি আমার আসনে বসিতে পারি না। রাজার এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি স্বর্ণময় সুখাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা বিজয় প্রভৃতিকে বসিবার জন্য অনুরোধ করায় মহর্ষির আজ্ঞা প্রাপ্তির জন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবা মাত্র তিনিও উহাদিগকে বসিবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা উভয়ের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উভয়কে করজোড়ে নতভাবে প্রণাম করতঃ মহর্ষির পার্শ্বেই স্বর্ণনির্মিত সুখাসনে উপবেশন করিল। তাহার পর রাজা এবং রাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা উপবেশন করিয়া সামন্ত নৃপতি এবং অমাত্যগণকে ও অপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই আপন আপন আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি রাজসভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি বিজয়ের দিকেই নিপতিত হইতেছিল,

এখনও সকলেই তাহার দিকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত (বিশেষরূপে) করিতেছেন। রাজাও তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করিতেছেন না; সকলের অপেক্ষায় রাজলক্ষ্মী রাণীমাতা অনিমেষ লোচনে যেন স্নেহব্যঞ্জক ভাবে তাহাকে অবলোকন করিতেছেন। বিজয়ের অন্তরে কোন একটি শক্তি কর্তৃক মাতার প্রতি অনির্বচনীয় ভালবাসার ভাব আসায় আর যেন তাহার লক্ষ্য অপর কোন দিকে যাইতেছে না। মাতাকেই দেখিবার ইচ্ছা স্বতঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমত সময় মহর্ষি তাহার এবং রাণী মাতার ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজাকে প্রশ্ন করিলেন, রাজন! আপনার রাজপুরস্থ সর্বাঙ্গীণ কুশল জানিতে ইচ্ছা করি এবং রাজপুত্রের কুশলও আপনার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে মহর্ষিকে বলিলেন, মহর্ষি! আপনার আশীর্বাদে রাজপুরস্থ সকল বিষয়েই মঙ্গল। পুত্রের মঙ্গল আর কি বলিব, আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। জ্যোতিষী বাক্যে আপন মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া আমি নিজ প্রাণতুল্য পুত্রকে ঘাতক দ্বারা বধ করাইয়াছি; আমাপেক্ষা মহা পাতকী অপর কেহ ইহজগতে আছে কি না, তাহা আমি জানি না। আমার বিশ্বাস পাতকীগণের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা মহাপাতকী। কারণ আমি পুত্রহন্তা। এক্ষণে আমি বুঝেতেছি, আমার পুত্রমুখ দর্শন করিয়া মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ছিল, কারণ তাহা হইলে এই অসহ্য পুত্রশোক জনিত দারুণ কষ্ট আমাকে সহ্য করিতে হইত না। আমাদের অতুল বিভব সত্ত্বেও কোন বিষয়ে মানসিক আনন্দ লাভ করিতে পারি না। রাণীও পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতরা, কোন দৈবশক্তি কর্তৃক জীবিত আছেন মাত্র। বর্তমানে আর আমার পুত্র কন্যা নাই, এমত স্থলে পুত্রের মঙ্গল সমাচার আর কি জানাইব! এই বলিয়া রাজা অশ্রু বিসর্জন করিলেন। রাণীও তদ্রূপ রাজার ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাণী মাতা অশ্রু বিসর্জন করিলে বিজয়ের প্রতি তাঁহার যে লক্ষ্য ছিল, এক্ষণেও তিনি সে লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।

রাজা নিজ বস্ত্র দ্বারা অশ্রু মোচন করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্যোতিষী কহিয়াছিল, পুত্রমুখ দর্শন মাত্রেই আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমার মন্ত্রিবর্গ এবং অপরাপর সকলেই রাজ্য রক্ষার্থে আমাকে পুত্রবধের পরামর্শ দেওয়ায় পুত্রহত্যারূপ ভীষণ শোকাবহ কার্য্যে আমায় লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে যাহাতে আমরা উভয়ে করিয়া তাহার প্রতিবিধান করুন। আমরা পরমপদে আপন আপন স্থির রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। এক্ষণে আমরা আপনার শরণাগত, আমাদের যাহাতে মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই করুন! আমরা আর পুত্রপ্রার্থী নহি। রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, রাজন! আপনার জ্যোতিষী বাক্যে প্রথমতঃ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত হয় নাই। কারণ সাধারণ জ্যোতিষীগণ বঞ্চক বিশেষ, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক রকম মিথ্যা বাক্য বলিয়া থাকে। জ্যোতিষীগণের মধ্যে প্রায়শঃ তাহারা চতুর হইয়া থাকে;

যাহারা গণনা করাইবার জন্য জ্যোতিষীগণের নিকটে গিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মন্দ অবস্থাপন্ন। যাঁহাদের ভাল অবস্থা থাকে এবং কোন ক্লেশ নাই, তাঁহারা প্রায় জ্যোতিষীর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। ইহা বর্তমানের জ্যোতিষীরা বিলক্ষণ অবগত থাকায় তাহারা তাহাদের মনোমত কথা বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যাহা হউক ওসব কথায় আমার প্রয়োজন নাই। মহারাজ আপনি শোক করিবেন না, আপনার দৈবপ্রতিকূল থাকায় আপনাকে পুত্রবিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। রাজপুত্র ঘাতক কর্তৃক হত হয় নাই, আপনার পুত্ররত্ন জীবিত আছে। মহর্ষি যখন এই সকল বাক্য বলিতেছেন, সেই সময় সভাস্থ সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া মহর্ষির মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি উদ্‌গ্রীব হইয়া শ্রবণ করিতেছে। এই সময় মহর্ষির মুখে পুত্র জীবিত আছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী চুপি চুপি রাজাকে কহিলেন, মহর্ষি যখন বলিতেছিলেন, পুত্র জীবিত আছে, তখন ইহা নিশ্চয় সত্য। ঋষি বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। আরও বিশেষ মহর্ষির সহিত যে পুত্ররত্নটি আসিয়াছে, উহাকেই আমার গর্ভজাত পুত্র বলিয়া অনুমিত হইতেছে, কারণ পুত্রটিকে দর্শন করিয়া অবধি আমার কেমন একটা অন্তর হইতে স্নেহভাব উদয় হইয়া আমার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা বিগলিত হইতেছে, আমার বক্ষস্থলের বস্ত্র স্তনদুগ্ধে সিক্ত হইয়া যাইতেছে। রাজা বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অসম্ভব নহে। যাহা হউক একটু স্থির হইয়া মহর্ষির বাক্য শ্রবণ কর, তাহার পর যাহা কর্তব্য করা যাইবে। বিজয় রাজসিংহাসনের অতি নিকটে থাকায় এবং তাহার তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য থাকায় ঐ বাক্য সে স্পষ্ট শ্রবণ করিল।

তাহার পর রাজা মহর্ষির বাক্য শ্রবণান্তে আনন্দাশ্রুলোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা অবশ্যই সত্য হইবে; কিন্তু দেব! ঘাতক আমার পুত্রের বধকার্য্য সমাপন করিয়া আমার প্রধান মন্ত্রীকে পুত্রের রক্ত আনয়ন করিয়া দেখাইয়াছিল, ইহা আমি ঐ মন্ত্রী কর্তৃক অবগত আছি; সুতরাং আমি আপনার বাক্য বিশ্বাস করিলেও সভাসদগণের মনে কি রূপ বিশ্বাস হইবে তাহা বলিতে পারি না। প্রভো! আমাদের সকলের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সভাসদগণের সন্দেহ ভঞ্জন করুন, ইহাই আপনার চরণে আমার একমাত্র মিনতি। তৎপরে রাজার এবং মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য সভাস্থ সকলে তখন নিতান্ত আগ্রহের সহিত ব্যাকুলভাবে রহিয়াছে। রাজার বাক্য সমাপনান্তে মহর্ষি কহিলেন, রাজন! আপনার পুত্রকে ঘাতক বধ না করিয়া রাজপুত্রকে অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়া তাহার পর একটা পশু বধ করিয়া সেই রক্ত আনিয়া আপনার প্রধান অমাত্যকে দেখাইয়াছিল। ইহা সত্য কি না আপনার ঘাতককে এই রাজসভায় আনায়ন করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল রহস্য এখনি প্রকাশ পাইবে। রাজা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান অমাত্যকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মন্ত্রীবর! ঘাতককে একবার অতিশীঘ্র সংবাদ দাও—সে যেন আজ্ঞামাত্র রাজ সভায় এখনি উপস্থিত হয় কালবিলম্ব না করে। মন্ত্রীবর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া একজনকে ইঙ্গিত করিবার মাত্র সে ঘাতককে আনয়ন করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। ক্ষণিক পরেই ঘাতককে সঙ্গে করিয়া সে ব্যক্তি সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ঘাতককে বলিলেন, ঘাতক! আমি তোমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যাহা সত্য তাহা তুমি নির্ভয়ে আমার নিকটে প্রকাশ করিবে, অন্যথা বলিলে দণ্ডিত হইবে। ঘাতক রাজবাক্যে নত শিরে সম্মতি প্রকাশ করিলে পর, রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঘাতক! তুমি সত্য কথা বলিলে বিশেষ পুরস্কৃত হইবে। আমার পুত্রকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে মন্ত্রীর আজ্ঞায় উহার বধকার্য্য করিয়াছিলে কি না এবং কোন স্থানে উহার বধকার্য্য সমাধান করিয়াছিলে তৎসমুদায় আমাকে এবং এই সভাগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিয়া বল।

ঘাতক করজোড়ে বলিলেন, প্রভো! আমি প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি অনুসারে আপনার রাজ্যের বর্হিভাগে বধজন্য শিশুটিকে লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আপনার রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে—আমাদের কয়েকদিন সময় অতিবাহিত হয়, ইহাতে আমাদের সকলেরই রাজকুমারের উপর কেমন একটা স্নেহ ভাব আসায় এবং অকারণ রাজপুত্র বধে মহাপাতক হইতে পারে ভাবিয়া, এই উভয় কারণে আমরা রাজপুত্রকে বধ না করিয়া একটি অপুত্রক স্ত্রীলোককে প্রদান করিয়া, একটা ছাগ শিশুকে বধ করতঃ তাহার রক্ত আনয়ন করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম, ইহাই রাজকুমারের রক্ত। ভবিষ্যতে এই ঘটনা প্রকাশ হইলে, পাছে আমাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় আমি যাহাদিগকে শিশুটি দিয়া আসিয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে নিজে তাহাদের বাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিয়া তাহারা যে চণ্ডাল জাতি আমি তাহা প্রথমে জানিতাম না, পরে জানিয়াছি। উঁহারা চণ্ডাল হইলেও বিশেষ শুদ্ধাচারী। নিজ পুত্রবোধে তাহারা রাজকুমারকে লালনপালন করিয়া আসিতেছে এবং প্রথম হইতেই তাহারা নিজ গ্রামের লোকসমূহের নিকট প্রকাশ করিয়াছে যে, আমাদের একটি পুত্র জন্মিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গ্রামের সকলেই অবগত আছে যে, চণ্ডাল আর অপুত্রক নহে। তাহারা প্রাণান্তেও কাহার নিকট প্রকাশ করে না যে, পুত্র অপরের প্রদত্ত। লোকেও কোন প্রকার সন্দেহ করে না; পুত্রও জানে যে, সে চণ্ডালের পুত্র। চণ্ডাল পত্নীর যত্নে ও আদরে পুত্র স্বচ্ছন্দ মনে, সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিতেছে। মহারাজের পুত্র আমাদের হস্তে হত হন নাই, সম্ভবতঃ এখনও তিনি জীবিত আছেন। মহারাজ অভয় প্রদান করায় অদ্য প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করিলাম। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু যাহা অপরাধ হইয়াছে, তাহা মার্জনা করিয়া আমাদের জীবন দান করুন, ইহা

বলিয়া কম্পিত কলেবরে ঘাতক করজোড়ে দন্ডায়মান রহিল।

বিজয় প্রভৃতি—উহারা রাজার দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়াছিল, ঘাতক তাহাদের পশ্চাতে কিঞ্চিত দূর হইতে আপন কথা বলিতেছিল। উহাদের প্রতি তাহার লক্ষ্যও ছিল না, কারণ তাহার দেহের পশ্চাৎ ভাগ দেখিয়া চিনিতেও পারা যায় না, আর উহারা যে রাজ সভায় আসিয়া রাজ সম্মুখে সুখাসনে বসিয়া থাকিবে, ইহাও অসম্ভব বোধে তাহার লক্ষ্য বিজয়দের প্রতি পড়েই নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাণী আনন্দাতিশয্যে পুত্রস্নেহের অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঘন ঘন স্নেহ ব্যঞ্জক ভাবে পুত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তিনি প্রস্ফুটিত অশোক পুষ্পের ন্যায় শোক রহিত মানসে ও উৎকলিতভাবে ঘাতকের মুখনিঃসৃত বাক্য সকল শ্রবণ করিলেন। ঘাতকের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ঘাতককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঘাতক! তোমার সত্য বাক্যে আমি অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত তোমার পাঁচ শত টাকা অর্থদন্ড করিলাম এবং তুমি সত্য কথা প্রকাশ করিয়াছ ও পুত্রকে হত্যা কর নাই, ইহার জন্য তোমাকে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিবার অনুমতি করিলাম। ঘাতক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করজোড়ে পুনরায় পূর্বভাবে দন্ডায়মান রহিল।

রাজা ঘাতককে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘাতক, তুমি আমার পুত্রকে এবং আমার পুত্র যাহাদের আশ্রয়ে আছে, তাহাদিগকে দেখিলে কি চিনিতে পার? ঘাতক তদুত্তরে পুলকিত হইয়া সহাস্যবদনে উত্তর করিল, আজ্ঞা হাঁ, হুজুর? আমি তাহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারি; কারণ আমি মধ্যে মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদিগকে দেখিয়া আসি; তবে তাহারা জানে না যে, আমি মহারাজের ঘাতকের কার্য্য করি বা মহারাজের রাজত্বে বাস করি। ঘাতক ইহা বলিলেন পর মহারাজ ঘাতককে বলিলেন, ভাল, তুমি আমার সভার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ কি? ঘাতক চারিদিকে অবলোক করিয়া বলিল, মহারাজ! সভাস্থ সকলের মধ্যে এই তিন জন ব্যতীত বাকি লোক সমূহের মধ্যে তাহারা নাই। এই তিন জনের পশ্চাৎ দেশ আমি দেখিতেছি, সম্মুখ দিক না দেখিলে ইহারা যেন কে, তাহা বলিতে পারি না; ঘাতক ইহা বলিলে পর, মহর্ষি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ঘাতকের দিকে সম্মুখে হইয়া দন্ডায়মান হও, মহর্ষির আজ্ঞা বিজয় এবং তাহার পালক পিতা ও মাতা তিনজনেই ঘাতকের দিকে সম্মুখীন হইয়া দন্ডায়মান হইল। তাহার পরই ঘাতক আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হাঁ মহারাজ, হাঁ মহারাজ, ইহারা স্ত্রীপুরুষে সেই চণ্ডাল ও চণ্ডালপত্নী এবং এই পুত্রই রাজপুত্র। এরূপ বারংবার বলিতে বলিতে আনন্দে বিভোর হইয়া ঘাতক সর্বসমক্ষে মূর্চ্ছপন্ন হইয়া ধরাতলে মৃতের ন্যায় পতিত রহিল। তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে মস্তকে জলসিঞ্চন ও তাল বৃন্তের (তালপাতার পাখার) দ্বারা

ব্যজন করায় ঘাতক অনেকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। অপরদিকে মহারাণী সিংহাসন হইতে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অবতরণ করিয়া আনন্দাশ্রু লোচনে পাগলিনীর ন্যায় পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরেই আপন অঙ্গ রক্ষণী দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া স্তনদুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। বিজয় স্তনদুগ্ধ জন্মাবধি কখন খাইতে পায় নাই, তাহার বয়স হইলেও সে মাতার স্তনদুগ্ধ আনন্দের সহিত পান করিতে লাগিল। অমৃত কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না—তবে অমৃত এই শব্দ মাত্র শুনিয়াছিল। মাতৃ স্তনদুগ্ধকেই তাহার অমৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষণিক স্তনদুগ্ধ পান করা হইলে, জননী তাহার গাত্র হইতে নিজ অঙ্গরক্ষণী উন্মোচন করতঃ সর্বসমক্ষে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। মাতার আনন্দশ্রুতে পুত্রের গাত্রের কতকাংশ এবং মস্তকের কেশ সিক্ত হইয়া গিয়াছে, তত্রাচ মাতা তাহাকে কোলে লইয়াই ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

বিজয় দেখিল সভাস্থ সকলে নগ্নপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় স্তব্ধভাবে দন্ডায়মান রহিয়াছেন। কেবল মহর্ষি এবং রাজা আপন আপন আসনে উপবিষ্ট আছে। এমত সময়ে মহর্ষি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! এই পুত্ররত্ন আপনার ঔরসজাত পুত্র, তাহাতে আর আপনি কোন প্রকার সন্দেহ করিবেন না। আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার পুত্ররত্নকে গ্রহণ করুন, আপনার প্রতি ইহাই আমার অনুরোধ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"রাজভক্তি"

মহর্ষি রাজাকে বলিলেন, আপনি আর্য্য কুলোদ্ভব প্রজাবৎসল রাজা! আর্য্যধর্ম সংরক্ষণে যত্নবান মহাপুরুষ; আপনাতে দৈবী সম্পদ সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বত্বেও আপনি পুত্ররত্ন অভাবে পুত্রশোকে ম্রিয়মান থাকিতেন, পুত্ররত্ন স্বত্বে আপনার পুত্রশোকে কাতর অবস্থা দেখিয়া আপনার প্রতি আমার স্বতঃই দয়াভাব আসায়, আমি আপনার পুত্রের সহিত মিলন করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে আপনার পুত্র রত্নকে সঙ্গে করিয়া রাজপুরীতে আগমন করিয়াছি। আমার অপর স্বার্থ কিছুই নাই, যাহাতে আপনাদের পিতা পুত্রে মিলন হয়, ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আরও বিশেষ এই প্রকার অপরূপ আজানুলম্বিত বাহু বিশিষ্ট পুত্র, সাধারণ মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। বালকের রাজচিহ্ন সমস্তই বর্তমান রহিয়াছে। রাজপুত্র বা রাজা পৃথক নহে, রাজা বা রাজপুত্র মানব মাত্রেরই পূজ্য কারণ রাজা ঈশ্বরের (মানবাকারে) অবতার বিশেষ, ঈশ্বর নরের মধ্যে নরাধীপরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। রাজা বালক হইলেও তাহাকে সাধারণ মানব বোধে অবজ্ঞা করা কাহারও উচিত নহে। যেহেতু রাজা বা রাজপুত্র অনির্বচনীয় মহান শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া মানবাকারে অবস্থান করিয়া থাকেন। একারণ যে পামর ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ রাজার প্রতি বা রাজপুত্রের প্রতি দ্বেষ করে, রাজা বা রাজপুত্রের হিংসা সাধন করিয়া তাহাদিগকে বধ করে, অথবা রাজার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং রাজারও কর্তব্য-সত্বর তাহার বিনাশের জন্য মনোযোগ করা। একারণ ঘাতক রাজপুত্রকে বধ না করিয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়াছে এবং ধর্মশাসন হইতে পরিত্রান পাইয়াছে, কারণ রাজা বা রাজপুত্র মানবের বধ্য নহেন। এস্থলে ঘাতক আপনার পরম বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছে।

আপনি ঘাতকের রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত দোষে যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা ন্যায়তঃ হইয়াছে, কেন না রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে ঈশ্বর বিরূপ হইয়া থাকেন। ঈশ্বর সকল ঘটেই অবস্থান করিতেছেন সত্য, তবে সর্বত্রে তাঁহার প্রকাশভাব নাই। রাজশক্তিতে তাঁহার প্রকাশ ভাব থাকায় রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর প্রতি রাজা কুপিত হইয়া দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এইরূপ দণ্ডবিধান করাও রাজার নিতান্ত কর্তব্য কর্ম একারণ রাজবিধি বা রাজ আজ্ঞা পালন করা মানব

মাত্রেরই নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া আমি বিবেচনা করিয়া থাকি এবং ইহা ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত। আপনি জ্যোতিষী বাক্য বিশ্বাস করিয়া আপনার পুত্রকে হত্যা করিবার যে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ন্যায়তঃ ধর্মসঙ্গত হয় নাই। কারণ সাধারণ মানবের জ্যোতিষী বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন কার্য্য করা বা নিজ মনে সুখ দুঃখ আনয়ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে; জ্যোতিষীরা (নিজ মুখে) তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাহারা প্রকৃতসর্বজ্ঞ পদবাচ্য নহে। (সাধারণ কথায় লোকে বলিয়া যে, "যে বলে, সে জানে না, যে জানে সে বলে না।") ইহা আপনি পরিশেষে পারিয়া ঘাতকের প্রতি যে লঘুদণ্ডাজ্ঞা ব্যবস্থা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ঘাতক যে প্রকার রাজপুত্রকে বধ না করিয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়াছে তজ্জনিত তাহার যাহা পুরস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেও, ঘাতকের প্রতি যথেষ্ট স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ঘাতকের ইহা মনে করা উচিত নয় যে, রাজা আমার প্রতি স্নেহশীল, কারণ আমি রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও লঘু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছি, আমার পুরস্কার যাহা হইয়াছে তাহার তুলনায়, এই দণ্ড কিছুই নহে, ইহা ভাবিয়া ঘাতক নিজে অহঙ্কৃত না হয়। বর্তমান ঘটনা হেতু ঘাতক রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত গুরুদণ্ড না পাইয়া লঘুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ ঘটনাও অতি বিরল; প্রায়শঃ এরূপ ঘটে না, এই প্রকার ভ্রান্তি বশতঃ রাজা কোন কার্য্য করিলে তৎকার্য্যের জন্যই লঘু দণ্ড হওয়া সম্ভব, নচেৎ নহে, ইহাও ঘাতকের স্মরণ রাখিয়া ভবিষ্যতে কার্য্য করা উচিত। ঘাতক ইহা বিস্মরণ হইলে তাহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকার ঘটনা ঘটিলে ঘাতক যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, উক্ত নীতি অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত, এইরূপ নীতি প্রশংসনীয়।

রাজন! আপনি রাজধিরাজ সম্রাট, আপনি অমর পুরুষ পাদবাচ্য। যেমত ঈশ্বর কোন জাতি বিশিষ্ট নহেন অথচ অমর পদবাচ্য। ঈশ্বরও যখন যে ঘটে থাকেন, তখন তিনি তাহাই, ঘটের জাতিবর্ণ অনুযায়ী উপাধি হইয়া থাকে, রাজাও তদ্রূপ। অবশ্য আমি রাজ শরীরকে অমর বলিতেছি না, কারণ দেহের বিনাশ একদিন সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, জগতে এরূপ নিশ্চয় সত্য, অপর আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা জানিয়াও রাজাকে অমর বলিবার উদ্দেশ্যে, রাজ শব্দের অর্থদীপ্তি পাওয়া, অর্থাৎ যে শক্তি বা দণ্ড দ্বারা দেশ ও নগর প্রভৃতি শোভারূপ দীপ্তিশালী হইয়া থাকে, সেই শক্তিকেই রাজশক্তি বলা যায়। উক্ত রাজশক্তি বা দণ্ড যিনি ধারণ করিয়া প্রজাসমূহকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পক্ষপাত শূন্য হইয়া যথা বিধানে চালনা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজাপদবাচ্য। রাজশক্তি, রাজবিধি এবং রাজদণ্ড অমর পদবাচ্য, রাজদেহে অমর পদবাচ্য নহে। একারণ রাজশক্তি এবং রাজ দণ্ডই প্রকৃত রাজা। উক্ত রাজশক্তি বা রাজদণ্ড যিনি যখন ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই রাজা বলা যায়। এমত রাজদণ্ডধারী

এবং রাজমুকুটধারী রাজা যিনি, তিনি মানব মাত্রেরই পুজ্য। তাঁহাকে দর্শনেও পুণ্য আছে। তাঁহাকে অমর পুরুষ বলিয়া সকলেই মনে করা উচিত, একারণ পূর্বে আপনাকে অমর পুরুষ বলিয়াছি। আমি আপনার জাতি বা বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলি নাই, আপনি যে জাতি বা বর্ণ হউন কেন, সাধারণের তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই, কারণ আপনি মানবকারে ঈশ্বরের অবতার বিশেষ। উপরন্তু আপনি আর্য্যকুলোদ্ভব এবং আর্য্য কুলচূড়ামণি, সুতরাং আপনি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকল জাতিরই প্রনম্য। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বলিবার আমার অভিপ্রায় এই যে, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ"; ব্রাহ্মণ গুরুস্বরূপ, তবে কেবল যজ্ঞোপবিত মাত্র ধারণ করিলেই বা ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যেমত পণ্ডিতের পুত্র বিনা বিদ্যাভ্যাসে পণ্ডিত হইতে পারেন না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ পুত্রও সাধন দ্বারায় পরমাত্ম জ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন, ব্রাহ্মণ পুত্র মাত্র। ব্রাহ্মণ পুত্র অপর বর্ণের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত অবশ্যই লইতে পারেন এবং সম্মান করাও অপর বর্ণ মাত্রেরই কর্তব্য, কারণ যেমত রাজপুত্র রাজসিংহাসন প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই (রাজা না হইলেও) রাজ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিলেও সম্মানের যোগ্য নহেন বা গুরুর ন্যায় সম্মান প্রাপ্তিরও যোগ্য নহেন।

গুরু কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি; গুরু শব্দের অর্থ আত্মা, "আত্মাবৈ গুরুরেকঃ।" সেই আত্ম ধর্মের এবং আত্মকর্মের পথ প্রকাশ করিয়া যিনি আত্ম জ্ঞান রূপ আলোক দর্শন করাইয়া দিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি আত্মতুল্য হওয়ায় তিনি গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন, অপরে নহে এবং যিনি আত্মকর্মের অভ্যাস দ্বারায় আত্মাতে তন্ময় হইয়া (অর্থাৎ আপনাতে আপনি তন্ময় হইয়া) আগম নিগমাদি তন্ত্র মন্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া সর্বভূতের মঙ্গল জন্য আত্ম ধর্ম এবং আত্মকর্মের পথ প্রকাশ করিয়া তৎকার্য্যেই রত থাকেন, তিনিও গুরুপদবাচ্য এবং তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, অপরে নহে। পূর্বে বলিয়াছি রাজশক্তি এবং রাজদণ্ডই রাজা। এই রাজদণ্ড ধারণকারী রাজবংশ সম্ভূত হওয়া চাহি। কোন সাধারণ মানবের হস্তে এই রাজশক্তি বা রাজদণ্ড অর্পিত হওয়া চাহি না, কারণ যেমত "নির্ধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ," অর্থাৎ ধনহীন ব্যক্তি যেমত বহু ধন ঐশ্বর্য্য হঠাৎ প্রাপ্ত হইলে জগৎকে তৃণবৎ মনে করিয়া অবিবেক বশতঃ নিজের এবং অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজবংশজাত পুত্র ব্যতীত অপর সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা রাজদণ্ড চালিত হইলে সাধারণ প্রজা সমূহের অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী হইয়া থাকে। একারণ রাজপুত্রেই রাজদণ্ড ধারণের একমাত্র যোগ্য পাত্র। অবশ্য রাজপুত্রকেও দণ্ডাধরণের উপযুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য। রাজনীতি শিক্ষা ও ধর্ম ব্যতীত কার্য্যকরী হইতে পারে না। এ কারণ রাজপুত্র ও যাহাতে ধর্ম কর্মে আস্থাবান হইয়া আত্মকর্মের দ্বারা সংযতেন্দ্রিয় হইতে

পারেন, তৎপ্রতি রাজার লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অসংযত ভাবাপন্ন মানবের নিকট কোনপ্রকার সৎনীতির বা সৎকার্য্যের আশা করা যায় না; একারণ যাহাতে রাজপুত্র সংযতেন্দ্রিয়ও ধার্মিক হইতে পারেন তাহার যত্নই অগ্রে করা কর্তব্য।

সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই বীরপদবাচ্য অপরে নহেন; এইরূপ অবস্থাপন্ন রাজপুত্রের হস্তে রাজদণ্ড অর্পিত হওয়া বিশেষ এবং বিধিপূর্বক দণ্ডচালনা করিবার নীতিও রাজপুত্রকে শিক্ষা করান বিশেষ বিধেয়। কারণ দণ্ডই রাজা, এই রাজদণ্ডই সমগ্র প্রজা সমূহকে শাসন করিয়া থাকে। দণ্ডভয় ব্যতীত পশুসদৃশ নরকুল পরস্পর পরস্পরের হিংসাদ্বেষ এবং গর্হিত কার্য্য সমূহ দ্বারায় সমাজের নানা প্রকার অমঙ্গল সাধিত করিয়া থাকে। একারণ দণ্ডই শাসন কর্তা; এই দণ্ডই প্রজাকূলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের পক্ষে এই দণ্ড শাসন দণ্ড স্বরূপ, সৎব্যক্তির পক্ষে এই দণ্ড রাজার আর্শীবাদ স্বরূপ। প্রজাকুল নিদ্রিত হইলে এই দণ্ডই ধর্মস্বরূপ সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। কারণ দণ্ডভয়েও লোকে ধর্মকার্য্য করিয়া থাকে এবং দণ্ড দ্বারা রাজা, জাতি নির্বিশেষে প্রজার ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকেন; লোকে রাজদণ্ড ভয়ে সাধারণের ধর্মনষ্ট করিতে সাহসী হয় না এবং কাহার ধর্ম নষ্ট করিলে রাজা বিচার করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করতঃ রাজদণ্ড দ্বারাই দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়া থাকেন, ইহা রাজার কর্তব্য কর্ম। সুতরাং দণ্ডই ধর্মস্বরূপ। বিধিপূর্বক এবং ন্যায়সঙ্গত সম্যক বিবেচনা করিয়া প্রজাদিগের দেহ ও রত্নাদিতে উক্ত দণ্ড চালিত করিলে, সমুদায় প্রজারা রাজাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে। রাজা যদি আলস্যের বশীভূত হইয়া অপরাধী ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে বলশালী ব্যক্তিরা দুর্বল প্রজার সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একারণ অপরাধী ব্যক্তিগণের পক্ষে দণ্ডবিধান করা রাজার অবশ্য কর্তব্য কর্ম। জীব মাত্রেই দণ্ডভয়ে সুপথে চলিয়া থাকে; দণ্ডভয় যদি না থাকিত তবে জীব সমূহ কুপথে গমন করিয়া নিজের এবং অপরের অনিষ্ট করিত এবং সাধারণ ইতর পশুর ন্যায় হইয়া পশু ভাবেই কালাতিপাত করিত তাহার কোন রকম উন্নতির আশা জীবনে থাকিত না।

জীব কেবল দণ্ড ভয়েই ধর্ম জীবন লাভ করিয়া থাকে; একারণ যে রাজা সম্যকরূপে (যাহার যে মত পাপ বা দোষ হইয়াছে তাহাকে তদনুযায়ী) বিধিপূর্বক দণ্ডবিধান করেন, সেই রাজা ধর্মজীবন লাভ করিয়া ইহকালে এবং পরকালে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা বিলাসিতার বশবর্তী হইয়া রাজকার্য্যে উদাসীনতা বশতঃ পাপ কার্য্যকারী বা দোষী ব্যক্তির দণ্ডবিধান করেন না, তিনি কাল কর্তৃক স্বকৃত দণ্ড দ্বারায় আপনিই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি আপনাকে বিনয়ী দেখিতেছি, ইহা রাজার রাজ্য রক্ষা পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অনেক রাজা উগ্রতা হেতু রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনাতে অবিনয় ভাব দেখিতেছি না। আপনি বিনয়ের সহিত সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড এই চারিপ্রকার নীতির বশবর্তী হইয়া যেরূপভাবে এই দেশ শাসন

করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, ইহা ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত। ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই আপনি এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছেন। রাজন! মনু প্রভৃতি রাজগণ এইরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া রাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন। আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সৎস্বভাবান্বিত প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করি।

আমি পূর্বে বলিয়াছি, ঘাতক আপনার বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে, আপনার দ্বিতীয় বন্ধুর কার্য্য,. এই চণ্ডাল ও চণ্ডাল পত্নীর দ্বারায় কৃত হইয়াছে; ইহারা জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ঈশ্বরের ভক্ত নিবন্ধন ইহারা অনেক দ্বিজ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ; এই চণ্ডাল পেটের দায়ে বা স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণে অসমর্থ হেতু ভেক্ ধারণ করতঃ অন্তরে পাপভাব গোপন রাখিয়া বাহিরে ঈশ্বরের ভক্ত বলিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বা কোন একস্থানে বসিয়া কাহার নিকট ভিক্ষা বা প্রতিগ্রহ করে না, এই ব্যক্তি কায়িক পরিশ্রম দ্বারায় কৃষিকর্ম করিয়া আপনি জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। এ ব্যক্তি কপটাচারী নহে, যথার্থ ঈশ্বর ভক্ত, সুতরাং অনেক দ্বিজ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। রাজপুত্রকে ইহারা অপত্য নির্বিশেষে লালন পালন করিয়া আসিতেছে, ইহার সহিত আপনি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন, ইহাও আপনার প্রতি আমার একটি অনুরোধ। এক্ষণে যদি আমার বাক্য আপনার বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে আপনি আপনার পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পুত্রশোক জনিত জ্বালা হইতে অব্যাহিত লাভ করুন ইহা বলিয়া মহর্ষি নীরব হইলেন। তাহার পরই সভাসদগণ এবং সামন্ত নরপতিগণ সকলে আনন্দ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন মহারাজ, এই পুত্ররত্ন আপনার, ইহাতে আর কোন সন্দেহ আমাদের কাহার নাই। আপনি মহর্ষি বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার পুত্ররত্নকে গ্রহণ করিয়া প্রজাবর্গের আনন্দ বর্ধন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রাণীমাতা পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া মহর্ষির বাক্যগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন; বলা বাহুল্য, মহর্ষির মুখ নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ সময়ে তাঁহার সস্নেহ লক্ষ্য পুত্রের প্রতি সমভাবেই ছিল। মহর্ষির বাক্য শেষ হইলে রাণীমাতা বিজয়কে কোলে লইয়া রাজ সিংহাসনে (যেখানে রাজা বসিয়া আছেন) নামাইয়া দিয়া বলিলেন, বৎস! এই আর্য্যপুত্র তোমার জন্মদাতা পিতা, আমি তোমার গর্ভধারিণী মাতা, তোমাহারা হইয়া পাগলিনী প্রায় কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছি। তোমার জনক ও পুত্রশোকে কাতর হইয়া কোন রকমে সেই শোককে ঢাকিয়া রাখিয়া (না করিলে নহে বলিয়া) রাজকার্য্য দেখিয়া যাইতেছেন। আর্য্যপুত্র পুত্রশোকে অতীব কাতর আছেন, তুমি, আর্য্যপুত্রের শোক অপনয়ন কর। বিজয়ের মাতা ইহা বলিবার পর, পুত্র পিতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, পিতঃ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, ইহা বলিয়া বিজয় সিংহাসন তলে পড়িয়া রহিল। তখন পিতা সিংহসন হইতে নামিয়া আসিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে পুত্রকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরই বিজয়কে সর্বসমক্ষে ক্রোড়ে করিয়া মহর্ষির পদতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তৎ চরণতলে পড়িয়া রহিলেন।

এই সময় একটা আনন্দ সূচক শব্দ হইল "জয় মহারাজ বিজয় প্রতাপ ভূপ্ কি জয়", "জয় মহারাজ কুমারকি জয়", এইরূপ শব্দ পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। এমত সময় মহর্ষি বিজয়ের পিতাকে আশীর্বাদ সূচক স্বস্তিবাক্য বলিয়া মহারাজকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, রাজন! গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আপন সিংহাসনে উপবেশন করুন। বিজয়ের মাতাও তাহার পিতার বামপার্শ্বে ভূমি লিপ্তভাবে পতিতা ছিলেন, তাঁহাকেও মহর্ষি বলিলেন, 'মাতঃ! আপনিও গাত্রোত্থান করিয়া রাজসিংহাসনে রাজার বামে গিয়া উপবেশন করুন। আপনি প্রজা সমূহের মাতা স্বরূপা, তাঁহারাও আপনাকে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি গাত্রোত্থান করুন। ইহা বলিবার পরই পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং জননীও গাত্রোত্থান করিয়া পিতার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা বিজয়ের পালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বন্ধুবর! আপনার বিষয় আমি মহর্ষি সমীপে সমস্তই অবগত হইলাম। আপনি চণ্ডাল জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও চণ্ডাল নহেন। বোধ হয় কোন দৈব কারণ বশতঃ চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। প্রকৃত চণ্ডাল আপনি নহেন, আমিই প্রকৃত চণ্ডাল পদবাচ্য। কারণ আমি আপন জীবন রক্ষার্থে জ্যোতিষী বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঘাতককে নিজ পুত্র হত্যার জন্য অনুমতি দিয়া চণ্ডালের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছি। সুতরাং আমিই প্রকৃত চণ্ডাল পদবাচ্য। আপনার নামটি কি, তাহা কি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিবেন? তদুত্তরে চণ্ডাল বলিল, আমার নাম ভীমদাস। রাজা তাহা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পুত্রকে কি নামে ডাকিতেন? তদুত্তরে তাহার পালক পিতা বলিলেন, আমরা পুত্রকে বিজয়কুমার বলিয়া ডাকিতাম। ইহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে আনন্দধ্বনী করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, মহারাজ! দৈব কর্তৃকই যেন পূর্ব হইতে সমস্ত সূচনা হইয়া রহিয়াছে। আপনার নামানুসারে পুত্রের ও দৈব কর্তৃক বিজয়কুমার নাম হইয়াছে। আপনার নাম বিজয় প্রতাপ; পুত্রের নাম বিজয়কুমার হইয়াছে। ইহাতে দৈবশক্তির পরিচয় স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, রাজকুমারের নাম শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। তাহার পর রাজা বিজয়ের পালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বন্ধুবর! বিজয় আপনাদেরই পুত্র রহিল, আমরা কেবল পুত্রের দর্শন সুখ ভোগ করিব। আমরা পুত্রশোকে এতকাল মৃতপ্রায় হইয়া কোন রকমে দৈব কৃপায় জীবন ধারণ করিয়াছিলাম মাত্র; অদ্য আমরা মহর্ষির কৃপায় মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত অবস্থায় দর্শন করার ন্যায় বোধ করিতেছি। আপনারা পূর্বে পুত্রকে যেরূপভাবে স্নেহ মমতা করিতেন, আশাকরি বর্তমানেও তাহার কোনপ্রকার ত্রুটি

করিবেন না। আমরা স্ত্রী পুরুষে আপনাদের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিব। রাজা ইহা বলিবার পর, বিজয়ের পালক পিতা-মাতা রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে ঐ পালক পিতা করজোড়ে বলিলেন, রাজন! আপনি যেমত অনুমতি করিবেন, আমরা তদনুযায়ী ভাবেই চলিব। আমাদেরও এই পুত্র ব্যতীত অপর অবলম্বন নাই। ইহাকে না দেখিতে পাইলে আমাদের জীবন সংশয় হওয়াও বিচিত্র নহে। কারণ আমরা প্রায় সদ্যপ্রসূত অবস্থা হইতেই এই বালককে পুত্রবৎ লালন পালন করিয়া আসিতেছি, সুতরাং আমাদের নিজপ্রাণ অপেক্ষাও পুত্রটির প্রতি মমতা জন্মিয়াছে। একারণ যাহাতে আমরা সর্বদা বিজয়কুমারের মুখদর্শন করিতে পারি, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন, ইহাই আমাদের রাজচরণে একমাত্র প্রার্থনা। তদুত্তরে রাজা ঐ পালন পিতাকে বলিলেন বন্ধুবর! আমি ত' পূর্বেই বলিয়াছি, পুত্রের প্রতি আপনাদের পূর্ববৎ সমস্ত অধিকারই রহিল এবং আমার অমাত্যগণ, পরিষদগণ এবং সৈনিক বিভাগের কর্মচারিগণ ও সাধারণ বিভাগের কর্মচারিবৃন্দ সকলেই আপনাদিগকে রাজোচিত সম্মান প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, কর্মচারিগণের প্রতি ইহা আমার অনুমতি রহিল। মহারাজ ইহা বলিয়া আপন গলদেশ হইতে বহুমূল্য হীরক খচিত মণিমালা খুলিয়া ঐ পালক পিতার গলদেশে পরাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিভাবে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং রাণীমাতা নিজ গলদেশ হইতে বহুমূল্য মণিহার খুলিয়া বিজয়ের পালক মাতার গলদেশে পরাইয়া দিয়া তাঁহার কর স্পর্শ করিয়া বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তখন পালক পিতা মহারাজকে প্রণামান্তর করজোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! আমরা রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলাম, আমাদের মণিমুক্তায় কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, বিজয়কুমারই আমাদের মণিমুক্তা। বিজয়কুমারকে আমরা পূর্ববৎ স্নেহ যত্ন করিতে পাইব ইহা শ্রবণ করিয়া অবধি আমাদের আনন্দের পরিসীমা নাই। রাজপ্রসাদ যাহা প্রাপ্ত হইলাম ইহাও আমাদের (বা আপনার) বিজয়কুমারের প্রাপ্তব্য বিষয় হইবে, কারণ আমাদের অন্ধের যষ্টিস্বরূপ বিজয়কুমার ব্যতীত অপর অবলম্বন নাই।

এই সময় মহর্ষি হাস্য বদনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! আপনি রাজসিংহাসনে বিজয়কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করুন রাজলক্ষ্মী রাণীমাতা আপনার বামপার্শ্বে উপবেশন করুন। এই দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য সভাসদগণ সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, রাজা মহর্ষির আজ্ঞা শ্রবণান্তর মহর্ষিকে প্রণামান্তে পুত্রকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং রাণীমাতা মহারাজের বামপার্শ্বে উপবিষ্ঠ হইয়া রাজলক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, এ সময়ে চারিদিক হইতে পুনঃ পুনঃ জয়-ধ্বনি ঘোষণা হইতে লাগিল। বিজয়কে রাজক্রোড়ে আসীন দেখিয়া মহর্ষি হাস্য বদনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বিজয়কুমার! আর কি এখন তোমার মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রভো! এক্ষণে আপনার

কৃপায় আমার আর কোন প্রকার সন্দেহ আসিতেছে না। সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়ায় এবং রাজা আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লওয়ায় আমি যে রাজপুত্র তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে আর আমার কোন সন্দেহ নাই। তবে প্রভু আপনি আমাদের বাটীতে বসিয়া এবং রাস্তায় আসিবার কালীন বলিয়াছেন কাম ক্রোধাদি রিপুগণই প্রকৃত চণ্ডাল পদবাচ্য, জীব চণ্ডাল নহে। এক্ষণে যাহাতে আমি রিপুগণের সহবাসে না থাকি, তাহার উপায় আমাকে উপদেশ করিতে হইবে এবং সেই সকল উপদেশ আমার পালক পিতা মাতাকে ও আমার জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতাকে দান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে, ইহাই আপনার চরণে আমার একমাত্র নিবেদন। অদ্য রাজক্রোড়ে আসীন হইয়া আমি আমাকে রাজপুত্র বলিয়া বোধ করিতেছি, এইরূপ আমরা যাহাতে পরম পিতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিলীন হইতে পারি তাহার সদুপদেশ প্রদান করুন। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ কৃপবান, তাহাতে প্রার্থনা করি, আপনি কৃপা করিয়া পূর্বোক্ত উপদেশ বাক্য কার্য্যে পরিণত করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন। আপনার নিকট আমার ইহাই বিনীতভাবে প্রার্থনা।

বিজয়ের এই কথা শেষ হইলে, মহর্ষি বলিলেন, ভাল, তাহাও হইবে। এক্ষণে সে সময় নহে, সমায়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিব; মহর্ষি এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে রাজসভায় সম্মুখস্থ অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রধান অমাত্য মহাশয় এই সময় গাত্রোত্থান করিয়া রাজ সমীপে করজোড়ে বলিলেন, মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমিও জ্যোতিষীর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ বাক্য সত্য বোধে মহারাজের জীবন রক্ষার জন্য মনে করিয়াছিলাম যে, এই পুত্র নষ্ট হইলে মহারাজের পুনরায় পুত্র হইতে পারে, কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন হেতু মহারাজের দেহত্যাগ হইলে আপনাকে আর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এই বোধে আমাকেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্র হত্যার পোষকতা করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে বুঝিলাম জ্যোতিষীরা সব ভ্রান্ত। যাহা হউক আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া আসিতেছিলাম, এত দিন পরে মহর্ষির কৃপায় মহারাজ কুমারকে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার আমরা যেন পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে পূর্বে যাহা আমার অপরাধ হইয়াছিল এক্ষণে তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। রাজা মন্ত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মন্ত্রীকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! আপনার কোন অপরাধ নাই, আপনি সৎ উদ্দেশ্যে ও আমার জীবন রক্ষার্থেই আমাকে পুত্র বিনাশের পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আমি জানি। যাহা হইবার তাহা হইয়া থাকে, গত বিষয়ের চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এক্ষণে আপনি গত বিষয় বিস্মরণ হইয়া রাজকার্য্যে মনোযোগী হউন, আপনি কিছু মনে করিবেন না।

তাহার পর মন্ত্রীবর মহারাজকে জানাইলেন, অদ্য এই সকল শুভ সংবাদ তাড়িৎ

বার্তায় ন্যায় রাজধানীতে প্রকাশ হওয়ায়, রাজধানীস্থ নরনারী সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত পদবিক্ষেপ রাজপুত্রকে দর্শন জন্য রাজবাটী অভিমুখে আসিতেছে। এমন কি যে সকল নারীগণের মুখদর্শন করা সূর্য্যদেবের ভাগ্যেও ঘটে নাই এমত অন্তঃপুরে চারিণী মহিলাগণও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে আসিতেছেন। এই বার্তা আমি দূত মুখে এখনি প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ সমীপে জ্ঞাপন করিতেছি। অতএব মহারাজ যদি কোন উচ্চস্থান হইতে রাজকুমারের সহিত সকলকে দর্শন দান করেন, তাহা হইলে সকলে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। সামন্ত নৃপতিগণ আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, মহারাজ অদ্য কোন সময়ে রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন, তাহা হইলে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মহারাজ কহিলেন, মন্ত্রীবর! প্রথমতঃ আমি কুমারকে লইয়া অট্টালিকার উচ্চস্থানে যাইতেছি, তাহাতে কুমারকে দর্শন করিবার সকলের সুবিধা হইবে। আর সকলকে বলিয়া দিন আমি অদ্য আহারাদির পর এক প্রহর দিবা থাকিতে কুমারের সহিত ও সামন্ত নৃপতিগণের সহিত শোভাযাত্রায় বাহির হইব; আপনি তাহার আয়োজনাদি করুন উপস্থিত যে সকল লোক রাজকুমারকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, দেখিবেন, তাঁহাদের প্রতি প্রহরীগণ কোনও রকম উৎপীড়ন না করে, প্রহরীগণ কোনও রকম উৎপীড়ন করিতেছে ইহা আমি জানিতে পারিলে তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দণ্ড ব্যবস্থা করিব; তাহার পর অদ্য কুমারের শুভাগমণ জন্য কারাগারের কারারুদ্ধ কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা সৎচরিত্র কারাবাস করিতেছে তাহাদের সকলকে মুক্ত করিয়া দিন। আপনি এই আদেশগুলি পালন করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

রাজা বিজয় ও রাণীর সহিত সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষিকে অনুনয় সহকারে বলিলেন, আপনিও একবার আমার প্রজাবৃন্দকে দর্শন দান করুন। মহর্ষি ও রাজার সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা বিজয়ের পালক পিতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, বন্ধুবর! আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন, ইহা শুনিয়া তিনি রাজার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণীমাতা ও ঐ পালক মাতার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রথমতঃ সভার সম্মুখস্থ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন সভার অঙ্গণে লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অঙ্গণে আর স্থান নাই। বহির্দ্দেশ হইতে জনতা ঠেলিয়া আরও লোক অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিজয় প্রভৃতি ইঁহাদের সম্মুখস্থ হইলে সকলেই পুনঃ পুনঃ ইহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। পরিশেষে জয়, মহর্ষি মহারাজকী জয়, এইরূপ ধ্বনি হইতে লাগিল; মন্ত্রীবর্গ এবং সামন্ত নৃপতিবর্গ সকলেই রাজার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা প্রধান অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর! আপনি এই লোক সকলকে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে যাইতে বলুন, আমরা

উপস্থিত দ্বিতল গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠে যাইতেছি। তাহা হইলে সকলেরই রাজকুমারকে সুন্দররূপে দর্শন করিবার সুবিধা হইবে এবং এই সমস্ত লোকেরা কেহ যেন রিক্তহস্তে গমন না করেন। যাঁহারা অর্থ গ্রহণ করিবেন না তাঁহাদিগকে অন্ততঃ রাজপ্রসাদ স্বরূপ মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। মিষ্টান্ন সকলকেই প্রদান করা চাহি; ইহা বলিবার পর সকলে উপরের গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠে যাত্রা করিলেন।

মন্ত্রীবর সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে বাহিরের প্রাঙ্গণে যাইয়া মহারাণী ও মহারাজ এবং মহারাজকুমার প্রভৃতিকে দর্শন কর; তোমাদের সকলের দর্শন করিবার সুবিধার জন্য মহারাজ এক্ষণে দ্বিতল গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমন করিবেন। সকলে উপরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সেখানে দেখিলেন রাজা ও রাণীর বসিবার জন্য এক এক খানি স্বর্ণসিংহাসন রহিয়াছে এবং মহর্ষির বসিবার জন্য একখানি স্বর্ণের সুখাসন রহিয়াছে, আর বিজয়ের পালক পিতামাতার জন্য আরও দুইখানি স্বর্ণের সুখাসন রহিয়াছে; সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা মহর্ষিকে অগ্রে তাঁহার আসনে উপবেশন করাইয়া, বিজয়ের পালক পিতামাতাকে তাঁহাদের আসনে বসাইলেন। তৎপরে মহর্ষি রাজাকে ও রাণীমাতাকে সিংহাসনে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; রাজা মহর্ষির বাক্যে অনুরুদ্ধ হইয়া রাণীমাতাকে সিংহাসনোপরি আপন বামভাগে বসাইয়া তাহার পর পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিজে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সকলে সিংহাসনে উপবেশন করিবামাত্র বজ্রনিনাদে ঘন ঘন আগ্নেয় অস্ত্রের (কামানের) ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল এবং সৈনিক পুরুষগণ কর্তৃক জয় সূচক রণবাদ্য সকল সুমধুর স্বরে বাদিত হইতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ সকলেই সমস্বরে পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতে লাগিল, তৎপরে মহর্ষিগণ (ফুল পুষ্প সহিত) ওম্ স্বস্তি এই বাক্যে প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে আর্শীবাদ করিলেন। সামন্ত নৃপতিগণ সুবর্ণ পাত্রে স্বর্ণমুদ্রা ও পুষ্পগুচ্ছ উপঢৌকন দিতে লাগিলেন, নিম্নতল হইতে সকলেই জয়োল্লাসে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পরাজি বিজয়ের প্রকোষ্ঠে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সকলে প্রায় চারি পাঁচ দণ্ড তথায় উপবেশন করিয়া রহিলেন। পরে রাজা মহর্ষিকে বলিলেন, সময় প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, অনুমতি হইলে এক্ষণে উঠিতে পারি, দর্শকবৃন্দ ও সকলে দর্শন পাইয়াছে, আর অধিক বেলা করিবার প্রায়োজন বোধ হইতেছে না। মহর্ষি বলিলেন, হ্যাঁ সকলেই বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছে, ক্রমশঃ জনতা আরও, বেশী হওয়া সম্ভব, বিশেষ যখন শোভাযাত্রা করা হইবে, তখন আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

মহর্ষি বলিবামাত্র রাজা পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া উঠিলেন এবং রাণীমাতা ও রাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া রাজার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে অবতরন করিব মাত্র পুনরায় আগ্নেয় অস্ত্র বজ্র নিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। রাজা মহর্ষিকে

পুত্রকে ও বিজয়ের পূর্ব পিতাকে লইয়া রাজ অন্তঃপুরে গমনোদ্যত হইলে রাণীমাতা বিজয়ের পূর্ব মাতাকে সখীসম্বোধন করিয়া তাঁহার হস্তধারণ করতঃ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজ অন্তঃপুরে গমন করিতে লাগিলেন। সকলে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে, অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ আনন্দে শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিল। সকলে উপর মহলে আসিলে রাজা মহর্ষিকে লইয়া একটি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজয় প্রভৃতিও তাঁহার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিল, মহর্ষি বিজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস বিজয়! তুমি এক্ষণে রাজাকে পিতৃ সম্বোধন করিবে, তোমার গর্ভধারিণী রাণীমাতাকে মাতৃ সম্বোধন দ্বারায় তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং তোমার জন্মদাতা পিতা বা গর্ভধারিণী মাতার কদাপি অবাধ্য হইবে না। তোমার পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য প্রাণপণে যত্নবান হইবে। তাহার পর রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! বিজয় কুমারের অন্নপ্রাশনাদি কোন ক্রিয়াই হয় নাই। আপনাদের কুলপ্রথা অনুযায়ী উপনয়নের সময় অন্নপ্রাশন চূড়াকরণাদি সমস্ত বিধিপূর্বক করিবেন। তাহার পর পুনরায় বিজয়কে বলিলেন, তোমার পালক পিতামাতাকে পিতৃ-মাতৃ ভাবে শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহাদের মনে কোন প্রকার কষ্ট হয়, এমত কার্য্য করিবে না এবং উহারা তোমার অতি শৈশবকাল হইতে তোমার মল-মুত্র পরিষ্কার করিয়া তোমাকে পুত্রভাবে অতি যত্নের সহিত অপত্য নির্বিশেষে লালন পালন করিয়াছেন, তাহা তুমি কদাপি বিস্মরণ হইবে না, ইহা স্মরণ রাখিয়া সদয়ভাবে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সকল কষ্ট দূর করিবে।

বিজয়ের পূর্ব মাতা তাহার গর্ভধারিণী জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর্য্যা! বিজয়কে তাহার অতি শৈশবকাল হইতে লালন পালন করিয়া আমাদের অপুত্রক জনিত কোন কষ্ট বর্তমানে নাই, তবে আমাদের আর্থিক অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকায় বিজয় সম্বন্ধে আমাদের যাহা কর্তব্য ছিল তাহা করিতে পারি নাই। বিজয়ের শারীরিক গঠন রাজপুত্রের তুল্য, সেকারণ আমরা বিজয়ের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া ভগবৎ সমীপে কামনা করিতাম, আমাদের বিজয় যেন রাজা হয়। ভগবান আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আমাদের বিজয়ের অদ্য রাজপুত্রে পরিণত করিলেন। আজ আমরা আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছি, আমাদের যাহা কামনা ছিল, তাহা মহর্ষির কৃপায় পূর্ণ হইয়াছে। আর্য্যা! বিজয় এক্ষণে আমাদের নহে, অদ্য হইতে বিজয় কুমার আপনার; আমি বন্ধ্যা, সেকারণ বিজয়কে স্তন্য দুগ্ধ পান করাইতে পারি নাই। বিজয়ের সে ক্ষোভ থাকিতে পারে, এক্ষণে আপনি বিজয়ের ক্ষোভ নিবারণ করিবেন।

বিজয়ের গর্ভধারিণী মাতা কহিলেন, সখী! আমি যখন রাজসিংহাসন উপবিষ্ট ছিলাম, সেই সময় প্রথমে বিজয়কে দেখিবামাত্র দৈবশক্তি দ্বারায় আমার অন্তরে স্নেহের উদয় হইয়া আমার স্তন যুগল হইতে অনর্গল দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়া বক্ষস্থলের

বস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। বহুদিবস গত হইয়াছে, আমার স্তনে আদৌ দুগ্ধ ছিল না, বিজয়কে দেখিয়া স্তনযুগল হইতে অনর্গল দুগ্ধ ক্ষরণ হওয়ায় তখনি আমার মনে বিশ্বাস হয় যে বিজয় আমারই গর্ভজাত পুত্র, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সখী! আমি তন্মুহূর্তে আর্য্য পুত্রকে (সিংহাসন বসাইয়াই) জনান্তিকে এই কথা বলিয়াছিলাম। তাহার পর যখন আমি সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া বিজয়কে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া লই, সেই সময় আমার বিজয়কে আপন অঙ্গ রক্ষণী দ্বারায় ঢাকিয়া বক্ষে ধারণ করতঃ স্তন দুগ্ধ পান করাইয়াছি। বিজয় স্তন দুগ্ধ পান করার পর আমার হৃদয়ের বেদনা দূর হইয়া শীতল হইয়াছি। সখী! পুত্রশোক জনিত হৃদয় বেদনা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে।

যাহা হউক তোমাদের কৃপায় আমার পুত্রসুখ স্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হইয়াছে জানিয়া অদ্য যে কি আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা আমি মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। সখী! আমরা আজীবন তোমাদের নিকট ঋণী রহিলাম, এ ঋণ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। একমাত্র মহর্ষির কৃপাতেই অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম। ভগবান মহর্ষিরূপে প্রকাশ হইয়া আমাদিগকে পুত্রশোক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং তোমাদেরও যাহা কামনা ছিল (পুত্র রাজা হউক), সে কামনাও পূর্ণ করিয়াছেন। সখী! অদ্য বেলাও অধিক হইয়াছে আরও বিশেষ তোমাদের পথশ্রান্ত জনিত ক্লেশ হইয়াছে, এক্ষণে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া একটু সুস্থ হও; রাণীমাতার ইঙ্গিতে অপর একজন মহিলা ঐ পালক মাতাকে সম্মানের সহিত হস্ত ধারণ করিয়া, হাত মুখ ধৌত করিবার জন্য স্নানাগারে লইয়া গেল। তিনি যাইবার সময় রাণীমাতাকে বলিলেন, বিজয়ের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে আপনাদের রাজ বিধি অনুযায়ী বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন হইবে। আশা করি সেই কার্য্যের ভারার্পণ আমাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া আমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। রাণীমাতা বলিলেন, আমার বিজয় আজীবন তোমাদেরই পুত্ররূপেই থাকিবে, ভাল তুমি যাহা বলিতেছ তাহাও হইবে।

মহর্ষি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! এক্ষণে আপনার পুত্রের সহিত মিলন হইল। ইহাতে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, আমি এক্ষণে বিদায় ভিক্ষা করিতেছি, অদ্যই আশ্রমে যাইতে ইচ্ছা করি। ইহা শ্রবণ করিবামাত্রই রাজা এবং রাণীমাতা মহর্ষির পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! অদ্য আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিতে পারিব না। যদি একান্তই যান, তাহা হইলে আমাদিগকে বধ করিয়া যাইতে পারেন। বিজয়ও পিতা মাতার উক্তি শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে বলিল, ঠাকুর! আপনি আমাকে রাজপুত্র করিলেন, এক্ষণে আমার রাজপুত্রোচিত শিক্ষাও আপনাকে দিতে হইবে, আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া অদ্য যাইবেন না। আমার প্রতি যখন এতদূর দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমাকে সৎশিক্ষা

ও সদুপদেশ দানের জন্য আরও কয়েক দিন থাকিতে হইবে! মহর্ষি বিজয়ের চিবুক ধারণ পূর্বক আদরের সহিত বলিলেন, বৎস বিজয়! ভাল তাহাই হইবে, আমি দুই চারি দিবস থাকিয়াই যাইব। ইহা শ্রবণে বিজয়ের পিতামাতা আশ্বস্ত হইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। পিতা মহর্ষিকে কহিলেন ঠাকুর! স্নানের উদ্যোগ প্রস্তুত আছে, অনুমতি হইলে আমরা তৎকার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হইতে পারি। মহর্ষি বলিলেন, হ্যাঁ। যখন আমার গমন করা স্থগিতই হইল, তখন স্নানের আর বিলম্বের প্রয়োজন বিধেয় নহে। পিতার ইঙ্গিতে জনৈক লোক সুবাসিত তৈল আনয়ন করিল। রাজা তৈল লইয়া নিজ হস্তে মহর্ষি চরণে মর্দ্দন করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি নিষেধ করিয়া বলিলেন, না, আমি স্বয়ং তৈল মর্দ্দন করিতেছি, আপনাকে কষ্ট করিতে হইবে না। ইহা বলিয়া তিনি নিজ অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষির তৈল মর্দ্দন সমাপন হইলে রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্নানাগারে গমন করিলেন, বিজয়ও তাঁহাদের সঙ্গে যাইল। তথায় চন্দনাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত বারিপূর্ণ সুবর্ণ কলস সজ্জীকৃত রহিয়াছে। মহর্ষি স্নানাসনে উপবেশন করিলে, বিজয়ের পিতা নিজ হস্তে সুবর্ণ কলস ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বারি সেচন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি বলিলেন, না, না, আপনাকে পরিশ্রম করিয়া আমার মস্তকে জল ঢালিতে হইবে না, আমি স্বয়ংই আমার গাত্রে এবং মস্তকে জল দিতেছি। বিজয়ের পিতা বলিলেন, দেব! আমার মনে বাসনা হইতেছে, আমি নিজ হস্তে আপনার মস্তকে জলধারা সিঞ্চন করিয়া কৃতার্থ হই। মহর্ষি বলিলেন, না, না, তাহা করিতে হইবে না। ভাল তবে অল্পমাত্র জল আমার মস্তকে প্রদান করিয়া আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। রাজা "ওম্ নমঃ শিবায়" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষির মস্তকে ধীরে ধীরে বারি ধারা সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। পরে মহর্ষি নিজে মস্তক ও গাত্রে জল দিয়া গাত্র মার্জনি দ্বারা গাত্র মার্জন করিতে লাগিলেন। মহর্ষির স্নানান্তে রাজা একখানি উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র লইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, ঠাকুর! এই পট্টবস্ত্র খানি শুদ্ধ, ইহা আপনি পরিধান করুন।

মহর্ষি বলিলেন, পট্টবস্ত্র আবার শুদ্ধ কিরূপে? এই বস্ত্র ত' লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এমত স্থলে ইহা বিশুদ্ধ বস্ত্র হইতেই পারে না, তবে অজ্ঞানী লোকে আপন ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য ইহাকে শুদ্ধ বস্ত্র বলিয়া থাকে মাত্র। বস্তুতঃ ইহা শুদ্ধ নহে। বরং ইহা পরিধান প্রাণিবধের প্রশ্রয় জনিত পাতক হওয়াই সম্ভব। আমার বিবেচনায় 'কার্পাস সূত্র নির্মিত বস্ত্রই প্রকৃত শুদ্ধ বস্ত্র; ঊর্ণা নির্মিত পট্টবস্ত্র নিশ্চয়ই শুদ্ধ বস্ত্র নহে। ইহা বলিয়া মহর্ষি নিজ কার্পাস সূত্রে নির্মিত বস্ত্র বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। তাহার পর রাজা মহর্ষিকে সঙ্গে লইয়া পূর্বোক্ত গৃহে আগমন করিলেন। তথায় রাণীমাতা রাজভোগের উপযুক্ত নানা বিধ ফল মূলাদি এবং মিষ্টান্নাদি একটি সম্মুখে সজ্জিত করিয়া বসিয়া আছেন।

মহর্ষি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, রাণীমাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া আপন মস্তকের কেশ দ্বারা তাঁহার পদতল মুছাইয়া দিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, মা! আপনার মস্তক বা মস্তকের কেশ ত' আর পাপোষ নহে, যে আমি উহাতে আপনার পদতলস্থ ধুলা বা জল মুছিব। ইহা লোকাচার হইলেও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, কারণ মস্তকে পরম গুরু পরমাত্মার অবস্থিতির স্থান, সুতরাং মস্তক বা তৎসংলগ্ন কেশ গুচ্ছের দ্বারা পদধূলি পরিষ্কার করা ন্যায় সঙ্গত নহে। অতএব মা! আপনি এই কার্য্য হইতে বিরত হউন। আমি আপনার সৌজন্যে এবং নম্রতায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি, ওসব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বাহ্যিক লোকাচার রক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। তাহার পর বিজয়ের পিতা মহর্ষিকে বলিলেন, ঠাকুর স্নানের পর কিছু জলযোগ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, আপনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়াছি, আপনি ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

মহর্ষি কহিলেন, আমি দিবা রাত্রের মধ্যে দুইবার কোন প্রকার আহার করি না; আমি দিবাতে মধ্যাহ্নকালে একবার আহার করিয়া থাকি এবং রাত্রে সন্ধ্যার পর এক প্রহরের মধ্যে একবার কিছু আহার করিয়া থাকি। স্বতন্ত্র জলযোগরূপে কোনপ্রকার আহারীয় দ্রব্য ভোজন করি না, ইহাই আমার নিয়ম। মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যতীত এইরূপ জলযোগ বা জলখাবার বারে বারে ভোজন করিলে তাহাতে পাকস্থলীর বিশ্রামের অভাব হেতু নানা রকম আধি ব্যাধি ও শরীরে নানা প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইয়া মানব দেহের পশুভাব বৃদ্ধিই করিয়া থাকে, একারণ বহুবার ভোজন করা উচিত নহে। রাজা বলিলেন, ঠাকুর! আমরা সাংসারিক জীব; পশুতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আমরা পশু অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে ঘৃণিত। পশুর ন্যায় বার বার ভোজন করি, অথচ পশুর ন্যায় পাকস্থলীর গঠন ও কার্য্য আমাদের না থাকায় বহুবার ভোজন জনিত উদরাময়, অজীর্ণ, মন্দাগ্নি ও বহুমুত্র প্রভৃতি রোগে আমাদের অনেকেই আক্রান্ত হইয়া অকালে বৃদ্ধের ন্যায় অকর্মণ্য হইয়া কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন। নিম্নশ্রেণীস্থ অনেক লোক অর্থাভাব বশতঃই হউক বা ইচ্ছা বশতঃই হউক তাহারা বহুবার ভোজন না করায় ক্রমশঃ বলশালী এবং কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যে অনেকে মিতাহারী থাকায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় অর্থশালী লোকের মধ্যে প্রায়শঃই চিররুগ্ন হইয়া কালাতিপাত করেন, কেহ বা অকালে কালের ভক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েন।

আমাদের আর্য্যাবর্তে বহুবার ভোজন করা বিধি সঙ্গত নহে, ইহার পরিণাম ফল যে অনিষ্ট জনক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক; দেব! মধ্যাহ্নকালও উপস্থিত

অতএব অনুমতি হইলে মাধ্যাহ্নিক আহারের উদ্যোগ করাই; আহারিয় দ্রব্য সমুদায় ও প্রস্তুত হইয়াছে। মহর্ষি কহিলেন, রাজন! আমার আপত্তি নাই। মহর্ষি ইহা বলিবামাত্র রাজার ইঙ্গিত মাত্রে দেবভোগ্য আহারীয় দ্রব্য আনীত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করা হইল। বলা বাহুল্য, আহারীয় অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্তই ঘৃত পক্ক। রাজা মহর্ষিকে করজোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর! এক্ষণে আপনি ভোজন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন; মহর্ষি আসনে উপবেশন করিয়া বিজয়কে বলিলেন, বিজয়! তুমিও কিছু খাও, ইহা বলিয়া বিজয়ের হস্তে কিছু মিষ্টান্ন দিলেন। বিজয় মহর্ষির প্রদত্ত মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলে পর মহর্ষি আচমন করিয়া ভোজন করিত আরম্ভ করিলেন। বিজয়ও মহর্ষির প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে লাগিল। মহর্ষি ভোজনান্তে পুনরায় আচমন করিয়া উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন।

তৎপরে রাজা মহর্ষিকে তাম্বুলাদি প্রদান করতঃ বিশ্রামার্থ স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া পূর্বোক্ত সেই গৃহে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং রাণীমাতাকে বলিলেন, এইবার তোমরা আহারাদি কার্য্য সমাপন কর ও বিজয়ের পূর্ব মাতাকেও আহারাদি করাও; বিজয়কে লইয়া গিয়া রাজপুত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাণীমাতা বলিলেন, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু অদ্য আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি নিজ হস্তে কুমারকে সজ্জিত করিয়া দিব। আমার যাহা মনোগত ভাব তাহা আপনাকে নিবেদন করিলাম, যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই করিব। রাজা কহিলেন, বেশ, তাহাই হইবে। তোমার যাহা বাসনা হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিক, আমি ইহাতে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিজয়ের জন্য রাজপুত্রোচিত বসন ভূষাণাদি (পরিচ্ছদাদি) তোমার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইব। আমি এক্ষণে বিজয়ের পূর্ব পিতাকে লইয়া আহারাদি সমাপন করি।

বিজয়ের মাতা বলিলেন, আর্য্যপুত্র! আমি আপনার এবং কুমারের পালক পিতার আহার স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি এবং কুমারেরও সেই সঙ্গে আহারের স্থান প্রস্তুত করা আছে। আমার বাসনা, আমি আপনার সম্মুখে বসিয়া কুমারের নিজ হস্তে ভোজন করাইয়া দিই। সমস্তই প্রস্তুত রহিয়াছে কেবল আপনার অনুমতি অপেক্ষা। রাজা বলিলেন, আর্য্যা! তাহাতে আমার কোন অমত নাই, কারণ আমরা মহর্ষির কৃপায় একপ্রকার মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলাম। এমত অবস্থায় পুত্রকে নিজ হস্তে ভোজন করাইবার বাসনা ও অস্বাভাবিক নহে। আর্য্যা! তাহা তুমি অনায়াসে করিতে পার। পুত্র স্নেহ বশতঃ আমারই তাহা করিতে যখন ইচ্ছা হইতেছে, এমতস্থলে তোমার উক্ত বাসনা হওয়া বিচিত্র নহে। উহা প্রত্যেক পুত্রের মাতৃগণের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব; বিশেষ তুমি অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইয়াছ। পুত্রের প্রতি তোমার এবং আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমাদের উভয়েরই পালন করা ধর্ম সঙ্গত কার্য্য; তাহার অপালনে

কর্তব্য ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। পুত্রের লালন, পালন, ভোজনাদি সমস্তই গর্ভধারিণী মাতার কর্তব্য-কর্ম; আর্য্যা! এ বিষয়ে আমার অনুমতি লইবার আবশ্যকতা নাই। ইহা তুমি আপন ইচ্ছানুসারে করিতে পার। এক্ষণে আমাদের বিলম্ব করা বিধেয় নহে, মাধ্যাহ্নিক কার্য্য শেষ করা যাউক।

তৎপরে গাত্র মার্জ্জনা দ্বারা মাতা বিজয়ের গাত্র মুছাইয়া বস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ভোজন গৃহে লইয়া গেলেন। বিজয় গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল তিনখানি উৎকৃষ্ট আসনের সম্মুখে তিনখানি সুবর্ণ নির্ম্মিত ভোজন পাত্রে নানাবিধ আহারীয় সকল সজ্জিত রহিয়াছে এবং ব্যঞ্জনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ পাত্রে করিয়া ভোজন পাত্রের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতভাবে সাজান রহিয়াছে। প্রত্যেক ভোজন পাত্রের পার্শ্বে সুবর্ণ নির্ম্মিত জলপাত্রে পানীয় জলও রক্ষিত হইয়াছে। বিজয়ের এখানকার সমস্ত দৃশ্য পদার্থই নূতন। বলা বাহুল্য, সে ইহা কখন স্বপ্নেও দেখে নাই; তাহার পক্ষে এসমুদায়ই অপূর্ব দৃশ্য; তাহার মধ্যে মধ্যে মনে হইতেছে, যে, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আবার তন্মুহুর্তেই মনে উদয় হইতেছে, না, ইহা স্বপ্ন নহে; বস্তুতঃ ইহা স্বপ্ন কি সত্য আমি অজ্ঞ বালক তাহা প্রণিধান করিতে পারিতেছি না; তবে তাহার মহর্ষি বাক্যে বিশ্বাস থাকায় এবং রাজা তাহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করায় সে যে রাজপুত্র ইহা ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে এবং তাহার অন্তরে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দভাব উদয় হওয়ার যাহা কিছু দেখিতেছে বা শুনিতেছি তাহাতেই যেন তাহার সহাস্য ভাব আসিতেছে। একারণ তাহাকে সকলেই বলিতেছেন, আহা কুমারের সর্বদাই কেমন হাস্যবদন।

যাহা হউক সকলে গৃহের মধ্যে যাইবার পর রাজা বিজয়ের পালক পিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বন্ধুবর! আহার প্রস্তুত হইয়াছে। এই আসনে উপবেশন করিয়া আহার করুন। আমিও আহার সমাপন করি। ঐ পালক পিতা বলিলেন, রাজন! আপনি প্রথমে উপবেশন করুন, তাহার পর আমি বসিতেছি। বিজয়ের পিতা বুঝিলেন, তিনি না বসিলে বিজয়ের পালক পিতা বসিবেন না, সুতরাং অগত্যা রাজা আপন ভোজনাসনে পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন করতঃ ঐ পালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বন্ধুবর! এইবার আপনি আপনার ভোজনাসনে উপবেশন করিয়া ভোজন করুন, আমিও ভোজন করি। পালক পিতা বলিলেন, দেব! আমি আপনার বন্ধুর দাসেরও যোগ্য নহি। আপনি আমাকে বন্ধুবর বলিয়া সম্বোধন করায় আমি বিশেষ লজ্জিত হইতেছি এবং প্রত্যেক কথার প্রসঙ্গে আমাকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করায়ও আমি লজ্জিত হইতেছি। দেব! আপনি আমাকে "তুমি, তোমার" বলিয়া সম্বোধন রিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। মহারাজ! বিজয়ও যেমন আপনার পুত্র, আমাকেও আপনি তদ্রূপ পুত্রভাবে দেখিবেন ইহাই আমার একমাত্র নিবেদন।

রাজা বলিলেন, ভাল তাহাই হইবে। অভ্যাস বশতঃ আমি অপর সকলকেই আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি, তাহাতে কিছু মনে করিবেন না। আপনাকে 'তুমি' বলিতে চেষ্টা করিব, উভয় সম্ভাষণ বাক্যের মধ্যে (তুমি আপনি) যখন যাহা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। ভ্রাতঃ এক্ষণে আহার করুন। বিজয়ের পালক পিতা দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। ইঁহারা ভোজন আরম্ভ করিলে পর মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ভোজনাসনে বসিয়া নিজ হস্তে করিয়া আহার করাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, বিজয় তাহার পিতার সম্মুখে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া ভোজন করিতে লাগিল। তাহাদের ভোজন কার্য্য শেষ হইলে, পিতা পুত্রকে বলিলেন, বৎস বিজয় তুমি আহার কর। আমাদের আহার শেষ হইয়াছে আমরা বাহিরে যাই। ইহা বলিয়া তাঁহারা বাহিরে যাইলেন।

ক্ষণিক পরেই বিজয় মাতাকে কহিল মা, আর আমি ভোজন করিতে পারিতেছি না। আমার উদর পরিপূর্ণ হইয়া বেশ তৃপ্তিলাভ হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া মাতা নিজ হস্তে তাহার মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই গৃহেই (পুত্রকে কোল করিয়া) তাহার পূর্ব মাতাকে ডাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে বসাইলেন এবং স্বয়ংও ভোজন করিতে বসিলেন। ক্ষণিক পরে তাঁহাদের ভোজন কার্য্য শেষ হইলে পুত্রকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া উভয়ে মুখ প্রক্ষালন করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় বিজয়কে ক্রোড়ে লইয়া বিশ্রাম গৃহে যাইলেন। রাজপুরীতে গৃহের অভাব নাই, পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ রহিয়াছে। বিজয়ের পূর্ব মাতা-পিতাকে রাজ অন্তঃপুরের মধ্যস্থিত একটি স্বতন্ত্র মহল দেওয়া হইয়াছে। মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া একটি আস্‌মান রঙের নানা বর্ণে সুসজ্জিত বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রাচীরে নানাবিধ চিত্র সকল শোভা পাইতেছে, গৃহস্থিত টানা পাখার দ্বারা গৃহাভ্যন্তরের উষ্ণতা নাশ করিতেছে। গবাক্ষ সকল বীরণ মূল (খস্ খস্) নির্ম্মিত পরদা দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহাতে গৃহের বহির্ভাগ হইতে পিচকারী জল দেওয়ার অতি স্নিগ্ধকর বোধ হইতেছে। বীরণ মূলের সুগন্ধে গৃহটীকে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে যেন স্বতঃই বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা বোধ হয়।

যাহা হউক মাতা পুত্রকে একখানি সুবর্ণ নির্মিত পর্য্যঙ্কে সুকোমল শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দিয়া তাহার পার্শ্বেই নিজেও শয়ন করিয়া তাহার গায়ে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। এমন সময় ঐ বিশ্রাম গৃহের মধ্যে রাজপুর মহিলাগণ আগমন করিয়া রাণী মাতার সহিত নানা প্রকার আনন্দ জনক বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। বিজয়ের পূর্ব মাতাও এই গৃহের একখানি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন। রাজপুর মহিলাগণ গৃহের মধ্যে আসিলে পূর্বমাতা উঠিয়া বসিলেন।

বিজয়ের এই সময় যেন একটু তন্দ্রাভাব আসিবার উপক্রম হইতেছে বলিয়া তাহার বোধ হইল, তন্দ্রাভাব আসা তাহার বিচিত্র নহে। কারণ সে যে গৃহে বিশ্রাম করিতেছে, এরূপ গৃহে যাহাদের বসবাস করা অভ্যাস নাই বা সুরম্য গৃহ যিনি দর্শন করেন নাই, এমত ব্যক্তি এই গৃহে উপবেশন করিলে স্বতঃই তন্দ্রাভাব আসিয়া থাকে। তাহারও এরূপ গৃহে শয়ন করা অনেক দূরের কথা কখন দর্শনও করে নাই, সুতরাং তাহারও এইরূপ মনোহর গৃহে সুখ শয্যায় শয়ন করিয়া যে তন্দ্রাভাব আসিবে না তাহা হইতেই পারে না, যাহা হউক তাহার তন্দ্রাভাব আসিলেও সে তন্দ্রাভাব স্থায়ী হইল না; কারণ তাহার মাতা রাজপুর মহিলাগণকে আদর আপ্যায়িত করিবার জন্য যেমন উঠিয়া বসিলেন, তাহারও সেই সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাভাব কাটিয়া গেল। বিজয়ও মার পার্শ্বেই উঠিয়া বসিল। তাহার পরই অপর দুইজন পরিচারিকা একটি বাক্স ধরাধরি করিয়া আনিয়া বিজয়ের মা'র সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এই বাক্সে রাজকুমারের পরিচ্ছদাদি পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন যে, শোভাযাত্রার সময় প্রায় আগত। ইহা বলিয়া পরিচারিকাদ্বয় চলিয়া গেল।

মাতার আজ্ঞায় অন্য পরিচারিকা সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত সকলকে তাম্বুল প্রদান করিতে লাগিল। তাহার পর মাতৃদেবী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বেশভূষা পরিধান করাইবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহে চলিলেন এবং একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, পরিচ্ছদের বাক্সটি আমার সঙ্গে লইয়া আইস। মহিলাগণকে বলিলেন, ভগিনীগণ! আপনারা একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি কুমারকে বেশভূষা পরিধান করাইয়া পুনরায় কুমারের সহিত আসিতেছি। মাতা পুত্রকে লইয়া বেশ পরিবর্তনের গৃহে প্রবেশ করিলেন, কেবল দুইজন পরিচারিকামাত্র সঙ্গে রহিল।

বিজয় গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহটির চর্তুর্দিকে প্রাচীরের গাত্রে বৃহদাকার দর্পন সকল সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক দর্পনের সম্মুখে এক একখানি রৌপ্য নির্মিত উচ্চাসন। আসনের উপরিভাগ মর্মর প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং তদুপরি বেশ বিন্যাসের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সকল ও নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত তৈল সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই উৎকৃষ্ট অঙ্গমার্জ্জনীও এক একখানি রহিয়াছে। মাতা পুত্রকে এই গৃহে আনয়ন করিয়া দর্পণের সম্মুখে সুখাসন বসাইলেন এবং তাহার গাত্রমল দূর করিবার অভিলাষে দুগ্ধের সর বেশম মিশ্রিত করিয়া তাহার গাত্রে মাখাইয়া দিয়া তৎপরে গাত্র হইতে উক্ত সর ও বেশম মিশ্রিত পদার্থকে হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে উঠাইয়া দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাহার গাত্রে বেশী ময়লা ছিল না, কারণ তাহার পূর্ব মাতা অতি যত্নে প্রায়ই পরিষ্কার করিয়া দিতেন। যাহা হউক মাতা তাহার গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিয়া সামান্য পরিমাণে সুগন্ধ তৈল গাত্রে এবং তাহার বদনে মাখাইয়া দিয়া, গৃহের পার্শ্বস্থিত স্নানাগারে পরিচারিকা সহ তাহাকে

লইয়া প্রবেশ করিলেন। মাতা কোমল অঙ্গ মার্জ্জনী দ্বারা তাহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিয়া, শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র মুছাইয়া দিলেন এবং স্নানাগার হইতে পূর্বোক্ত পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত দ্রব্য সকল তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার হারানিধি। তোমাকে হারাইয়া আমি পাগলিনীর ন্যায় অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলাম। অদ্য মহর্ষির কৃপায় তোমার বদন কমল সন্দর্শন করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছে; এক্ষণে এই সকল রাজ ঐশ্বর্য্য তুমি দীর্ঘজীবি হইয়া ভোগ কর। আমরা দর্শন করিয়া সুখলাভ করি।

মাতা বাক্স হইতে একে একে পরিচ্ছদাদি বাহির করিয়া অন্ডাকৃতি মর্মর প্রস্তরের উপর রাখিতে লাগিলেন। সমস্ত পরিচ্ছদগুলি এবং রাজ মুকুট বাহির করা হইলে, মাতা পুত্রকে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন! প্রথমে তাহার চক্ষে শলাকা দ্বারা অঞ্জন দিয়া দিলেন। তাহার পর ললাট দেশে চন্দনের বিন্দু সকল অঙ্কিত করিয়া দিয়া পরে উৎকৃষ্ট আর্য্যোচিত রাজপরিচ্ছদ তাহাকে পরাইয়া দিয়া উৎকৃষ্ট (জরি নির্মিত) বিনামা পরাইয়া দিলেন। তাহার পর লৌহ নির্মিত সিন্দুক খুলিয়া নানাবিধ অলঙ্কার বাহির করিয়া প্রথমে বিজয়কে শুভ্র মুক্তা খচিত সুবর্ণ নির্মিত তারের কুন্ডল পরাইয়া দিলেন। গৃহস্থিত দর্পণের প্রতিবিম্বতে তাহার নিজেকে দেখিবার সুবিধা হইল। মাতা তাহার গলদেশে বড় বদরী ফলের ন্যায় মুক্তার মালা এমত ভাবে সাজাইয়া দিলেন তাহাতে তাহার গলদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্তই মুক্তায় ঢাকিয়া গেল। হীরক, পান্না নির্মিত অনন্ত, বাজু প্রভৃতি হস্তাভরণ সকল গাত্রের পোষাকের উপরে পরিধান করাইয়া দিয়া গলদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত বহু মূল্যবান মণিমালা এবং রত্নমালা পরাইলেন। পরিশেষে মস্তকের মুকুট হস্তে করিয়া লৌহময় সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর মস্তকের কেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন। এমন সময় বিজয়ের পিতা মহর্ষি ও তাহার পূর্ব পিতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। পুত্রের জননী বলিলেন, কুমারকে আমি সাজাইয়া দিয়াছি, এক্ষণে কুমার যাইতে পারে; ইহা শুনিয়া বিজয়ের পিতা পুত্রের মস্তকের মুকুটটি মহর্ষির পদতলে অর্পণ করিয়া বলিলেন, দেব! আপনি দয়া করিয়া নিজ হস্তে আশীর্বাদ স্বরূপ বিজয়কুমারের মস্তকে এই মুকুটটি পরাইয়া দিন। ইহাই আমার প্রার্থনা।

পিতার অনুরোধে মহর্ষি ভূমিতলে হইতে মুকুটটী লইয়া মস্তকে পরাইয়া দিলেন। বিজয় মুকুটটী হস্তে ধারণ করিয়া মহর্ষির চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মহর্ষি তাহার হস্তধারণ করিয়া উঠাইয়া আশীর্বাদ করিলেন; পরে পুত্র জননীকে প্রণাম করিলে তিনি চিবুক ধারণ করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। পরে পিতাকে প্রণাম করিলে, পিতাও চিবুক ধারণ করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া আর্শীবাদ করিলেন। তাহার পর পালক পিতাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি বাধা দিয়া তাহাকে ক্রোড়ে জড়াইয়া

ধরিয়া আদর করিলেন। তৎপরে পুত্রের জনক একটী সুবর্ণ নির্মিত মণি রত্ন খচিত উৎকৃষ্ট দণ্ড মহর্ষির চরণতলে প্রদান করিয়া বলিলেন, দেব! এই রাজদণ্ডটিও আপনি আশীর্বাদ স্বরূপ আমার বিজয়কুমারের হস্তে প্রদান করুন। বিজয়কুমারের পরে রাজা হইয়া যথাবিধি বিচার করিয়া দোষীকে দণ্ড প্রদান এবং নির্দোষীকে অব্যাহিত দিবে। আপনার হস্ত হইতে আশীর্বাদ স্বরূপ এই দণ্ড গ্রহণ করিলে বিজয়কুমার নিশ্চয়ই দণ্ডের অপব্যবহার করিবে না। ধর্মভয়ে আপনার প্রদত্ত দণ্ডের সদ্‌ব্যবহারই করিবে ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার বাসনা বিজয়কুমারকে অদ্য সিংহাসন প্রদান করিয়া আমি বিজয়কুমারের সাহায্যকারী রূপে কিছুদিন থাকিয়া সৎসঙ্গে ধর্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান সহ যিনি রাজার রাজা (আত্মাই রাজা এবং পরমাত্মাই রাজার রাজা) সেই পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিব। বর্তমান আমার এই বাসনা। আপনি যখন দয়া করিয়া আমার পুত্র রত্নকে পুনঃ প্রদান করিয়াছেন, তখন যাহাতে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারি, সেই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন, ইহাই আপনার চরণ যুগলে আমার একমাত্র প্রার্থনা।

মহর্ষি বলিলেন, রাজন! পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে হইলে রাজ কার্য্য যে পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা নহে। যাহারা অজ্ঞ জীব, তাহারাই মনে করিয়া থাকে কর্ম ত্যাগ ব্যতীত বা সংসার ত্যাগ ব্যতীত পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়া যায় না। ইহা ভ্রান্ত জীবের প্রলাপ বাক্য মাত্র। জনকাদি রাজর্ষিরা কেহ কখন কর্ম বা সংসার ত্যাগ করেন নাই। বহির্ভাব হইতে অন্তর্মুখীন ভাবে সমস্ত কার্য্য করিয়া চলিলে একদিন নিশ্চয়ই পরমাত্মার সহিত জীবগণ মিলিত হইতে পারে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"আত্মধর্ম্ম"

আত্মধর্ম কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ করুন। দেহরূপ সাম্রাজ্যের রাজাই আত্মা, এই আত্মা আসুরিক ভাবরূপ যবন বা ম্লেচ্ছ রাজগণ কর্তৃক আত্মরাজ্য হইতে চ্যুত হওয়ার সকল মানবই জীবভাবে পরিণত হইয়াছে। জীব, যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য নহে ইহা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিবেন। আসুরিকভাব সমূহই যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য। জীব দেহস্থিত আসুরিকভাব সমূহ, আত্মসেবী নহে এবং ইহারা জীবকে আত্মসেবা বা আত্মকর্ম হইতে বিরত করিয়া, নিজেদের পক্ষীয় গুণাদিদেবগণের সকাম উপাসনায় রত করাইয়া, জীবকে আপন অধিকারে রাখিয়া তাহার দ্বারা ভোগাদি চরিতার্থ করিয়া থাকে। আসুরিক ভাবরূপ অসুর সমূহ সকলেই অনঙ্গ, ইহারা জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়া নিজেদের অভিলষিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকে। ইহারা আত্মদ্বেষী এবং আত্মসেবা বিহীন। আত্মার পরম শত্রু ও আত্মকর্মের বিরোধী। ইহারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ববিদ নহে, তবে মনের ও বাক্যের দ্বারায় আত্মবাদী বা ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র। ইহারা জীবকেও কার্য্যতঃ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে দেয় না। ইহাদিগকে আত্মধর্ম পরিত্যাগ হেতু যবন বা ম্লেচ্ছ কহা যায়, যে মানব আত্মকর্ম পরিত্যাগী তাহাকেও যবন বা ম্লেচ্ছ কহা যাইতে পারে। তাহারা নামে বা পরিচয়ে আর্য্য বলিয়া বর্ণিত হইলেও প্রকৃত আর্য্যপদবাচ্য নহে। কারণ আমি মুখে আত্মবাদী বা ঈশ্বরবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, আত্মা বা ঈশ্বর কি তাহা অবগত নহি। কার্য্যাকার্য্যের কোনও বিচার নাই। আসক্তির সহিত আসুরিক ভাবের অনুমোদিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেও গোপনে বা প্রকাশ্যে বিরত হই না। ইহাকে আর্য্যোচিত ধর্ম বা আত্মধর্মের লক্ষণ বলে না, এ কারণ আসুরিক ভাবাপন্ন মানবকে বা জীবকে যবন পদবাচ্য কহিতেছি।

পূর্বে কতকগুলি লোক্ আত্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কদাচারী হওয়ায় আর্য্যকুলতিলক সগররাজা তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া আর্য্যভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। দেশ ও আলয় ত্যাগের পর উহাদের যবন নাম হইয়াছিল। য-শব্দের অর্থ ত্যাগ, বন-শব্দের অর্থ আলয়। আলয় ত্যাগ করার দরুণ ইহাদিগকে যবন কহা হইত। এই বাক্য, শাস্ত্রেও উল্লেখিত আছে। যথা—

"সগররাজনৈ যায়াং সর্ব্বশিরোমুণ্ডণম্
সর্ব্ব ধর্ম্মারাহিত্যঞ্চ কৃতং তে
চাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুরিতি"।
ইতি বিষ্ণুপুরাণো তত্ত্বাৎ।

পূর্বে বলিয়াছি জীব যবন বা ম্লেচ্ছ নহে, যাঁহারা আত্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আসুরিকভাবের বশতাপন্ন হইয়া আত্মার অধোগতির সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করেন, তাঁহারা আর্য্যবংশসম্ভুত হইলেও যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য। আত্মা বা ঈশ্বর, ঈশ্বর—এই শব্দমাত্র মুখে উচ্চারণ করিলেই যে আত্মধর্ম রক্ষা হয় তাহা নহে। আত্মধর্ম কার্য্যতঃ রক্ষা করা চাহি, নচেৎ নহে। আত্মধর্ম কাহাকে বলে কহিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্বে বলিয়াছি আত্মা এই শব্দমাত্র আত্মা নহে। আত্মা অর্থে স্থির প্রাণকেই বুঝায়, অর্থাৎ প্রাণের বিনা অবরোধে স্বতঃ স্থির অবস্থাই আত্মাপদবাচ্য। শাস্ত্রাদিতে বহুলভাবে প্রাণকেই আত্মা বলিয়াছেন (তাহা এই গ্রন্থেও বহু স্থানে বলা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক) অতএব প্রাণকেই আত্মা বলিয়া জানিবেন। তাহার পর ধর্ম কাহাকে বলে তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। ধর্ম—ধৃ-পোষণ করা, ম—ক, যিনি সকল জীবকে বা মানবকে পোষণ করেন তিনিই ধর্ম। এক্ষণে কাহার দ্বারায় জীবের সম্যক পোষণ হয় তাহাও জানা আবশ্যক, মানবের সহিত স্থাবর জঙ্গম, জলচর, খেচর, ভূচর ইহাদের প্রাণ ব্যতীত অপর বিষয়ের দ্বারা পোষণ কার্য্য হওয়া কি সম্ভবপর বলিয়া আপনি বিবেচনা করিতে পারেন? বিজয়ের জনক বলিলেন, দেব! তাহাও কি সম্ভব হইতে পারে। এক প্রাণের অভাবে সকলেই শবে পরিণত হয়, প্রাণের বিকারে বা প্রাণকার্য্যের শিথিলতাতে মানবদেহ বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জড়বৎ হইয়া যায়। প্রাণের বিকারে শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রও অকর্মণ্য হইয়া ক্রমশঃ মানবদেহ ব্যাধি মন্দিরে পরিণত হইতে দেখা যায়। আপনার বাক্যে আমার প্রতীয়মান হইতেছে যে, মানবের সহিত স্থাবর, জঙ্গম, জলচর, খেচর, ভূচর ইত্যাদি জগতের সমস্ত প্রাণীবর্গের প্রাণই একমাত্র পোষণ কর্তা, ইহাতে আর আমার সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বলিলেন, রাজন! আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধ্রুবসত্য জানিবেন। প্রাণ যখন পোষণ কর্তা, তখন (পোষণ কর্তা হেতু) প্রাণই ধর্মপদবাচ্য। বর্তমানে উক্ত প্রাণ আসুরিকভাব সমূহ দ্বারায় সম্যক বর্দ্ধন না হওয়াতে বহির্মুখীন গতি বিস্তার হেতু জীব আসুরিকভাবে মত্ত হইয়া আসুরিক কার্য্য করিয়া অশান্তি এবং জ্বালাপ্রাপ্ত হইয়া রোগ শোকাদি ভোগ করতঃ বার বার যাতায়াতরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণ, ধর্মস্বরূপ হইয়া সকল দেহে অবস্থান করিতেছেন। জীবন আপন প্রাণকে ধর্ম বলিয়া অবগত না থাকায় ভ্রান্ত ভাবে বাহ্যিক লোকাচার মতের ধর্মকেই ধর্ম বলিয়া

তাহাতেই রত হইয়া থাকে। মূলে আসুরিক ভাব বিদ্যমান থাকায় ইহাও আসুরিক ভাবের নেতৃত্বে ঘটিয়া থাকে। নিজ প্রাণে লক্ষ্য না থাকায় এবং প্রাণেতে ধর্ম বোধ না থাকায় জীব অহরহঃ কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণরূপী ধর্মের দুইটি অবস্থা আছে। একটি স্থির, অপরটি চঞ্চল। স্থির প্রাণই আত্মাস্বরূপ। চঞ্চল প্রাণ যাহা বহির্ম্মুখীন গতি, ইহাই জীবভাব। এই জীবভাব আসুরিক ভাবের দ্বারায় আচ্ছাদিত থাকায় জীব ধর্মস্বরূপ আত্মাভাবে বা আত্মধর্মের লক্ষ্যচ্যুত হইয়া, বহির্বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়িতেছে। স্থির প্রাণরূপ আত্মধর্মের সংস্কার না থাকা হেতু জীবের পোষণ কার্য্যও সুচারুরূপে হইতেছে না। জীবের আত্মপূজা দ্বারা জীবদেহের এবং জীবদেহস্থিত মনের পোষণকার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে। পোষণ অর্থে বর্দ্ধন বুঝিতে হইবে। প্রাণের বর্ধন ক্রিয়া যাহা বর্তমানে হইতেছে, তাহা সম্যকরূপ না হওয়ায় বহির্ম্মুখীন ভাবে গতি হইয়া জীবন সমস্তই আত্মধর্মের বিপরীতভাবে কার্য করিতেছে, এবং তজ্জনিত জীব আত্মধর্মের বিপরীত আসুরিক ভাবে চালিত হইতেছে, প্রাণের সংবর্দ্ধন করাকেই আত্মপূজা কহে, কারণ পূজা অর্থে সংবর্দ্ধন বলা যায়, আত্মা অর্থে স্থির প্রাণকে বুঝিতে হইবে, শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ চঞ্চল প্রাণের বহির্ম্মুখীন গতি ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখীনভাবে ইহার সম্যক বৃদ্ধি করাকেই প্রাণকর্ম কহা যায়। সম্যক পারদর্শী গুরুর উপদেশে ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া উচিত। নচেৎ বিপর্য্যয় হওয়া সম্ভব। কার্য্যের বিপর্য্যয়ে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। উক্ত প্রাণকর্মরূপ ক্রিয়াই জীবের একমাত্র মহাধর্ম। ইহা ব্যতীত যে ধর্ম তাহাই আসুরিক বা ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম আসুরিক বা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কৃত যে ধর্ম তৎসমুদয়ই মানবের পর ধর্ম বলিয়া উক্ত হয়; এই পরধর্ম সকল, সর্বদাই ভয়াবহ, ইহা মোক্ষদায়ক বা শান্তিপদ নহে বলিয়া ধ্রুবসত্য জানিবেন।

প্রাণকর্মরূপ প্রাণায়ামাদি যে মহাধর্ম, তাহা পূর্বতন ঋষিগণেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যথা—

> "প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ।
> সর্ব্বপুণ্যস্যসারোহি পাপরাশিঃ তুলানলঃ॥
> মহাপাতক কোটীনাং তৎকোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতম্।
> পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং নানা দুষ্কর্ম্ম পাতকম্।
> নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোঽভ্যাস যোগতঃ॥"

অর্থাৎ প্রাণায়ামই মহাধর্ম, উহা হস্তলিখিত বেদশাস্ত্রেরও অগোচর। প্রাণায়াম সকল প্রকার পুণ্য কর্মের সার এবং পাপরাশি নাশক। প্রাণায়াম দ্বারা কোটি কোটি মহাপাতক কোটি কোটি দুষ্কর্ম এবং পূর্বজন্মার্জ্জিত পাপ সকলও নানা দুষ্কর্ম জনিত পাতক ধ্বংস হইয়া থাকে। যিনি এই প্রাণায়াম বিধিপূর্বক অভ্যাস করেন, তিনি জগতের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য। মন্বাদি ঋষিরা সকলেই প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণায়াম ধর্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা আত্মধর্ম এবং আত্মক্রিয়া পরিত্যাগ হেতু যবন বা ম্লেচ্ছত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও বিধিপূর্বক প্রাণায়ামরূপ আত্মধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। কারণ বিধিপূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারায় প্রাণায়াম পরায়ণ হইলে, যেমন কণিকামাত্র অগ্নি সংযোগে কার্পাসরাশি ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হয় তদ্রূপ অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়ামরূপ আত্মধর্ম দ্বারায় মানবের যাবতীয় পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া মন আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে। রাজন! আপনিও যেমত এই বহিঃসাম্রাজ্যের রাজা হইয়া সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারি প্রকার রাজনীতির দ্বারায় আপনার সাম্রাজ্যের প্রজাকুলকে সাম্যভাবে রাখিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেছেন। তদ্রূপভাবে প্রাণায়ামভ্যাসী সাধকেরও সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারিটি নীতি অবলম্বন করিয়া আসুরিকভাব সমূহের বিরুদ্ধে প্রাণায়ামরূপ সাধন সমরে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, নচেৎ বিফল মনোরথ হইতে হয়। আপনিও যেমত বহিঃসাম্রাজ্যের রাজা বা অধিপতি, তদ্রূপ দেহরূপ সাম্রাজ্যের রাজা বা অধিপতি আত্মা। বর্তমানে আত্মা জীব ভাবাপন্ন হইয়া মন উপাধি ধারণ করতঃ নামে মাত্র দেহরাজ্যের রাজা হইয়া রহিয়াছেন; বস্তুতঃ আসুরিক ভাবের প্রধান নেতা মোহই রাজার ন্যায় হইয়া আপন ইচ্ছা ও কামের (কামনার) দ্বারায় নিজ অভিলষিত কার্য্য করাইয়া লইতেছে। বর্তমান মন অন্ধবৎ আসুরিক ভাবের বশীভূত হইয়া তাহার ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়গণের অধীনে ও তিনগুণের অধীনে সৎ অসৎ কার্য্য করিয়া আপনিই আপনার ফাঁদে আবদ্ধ হইবার উপায় করিয়া চলিতেছে। কার্য্য হইতেছে আসুরিক ভাব সমূহের দ্বারা, দোষ হইতেছে মনোরূপ রাজার; মন গুণাদি দ্বারায় রঞ্জিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি বশতঃ বর্তমানে আসুরিক ভাবের ছলনা প্রণিধান করিতে অক্ষম।

মানবরূপী জীবের প্রথমতঃ দৈবী সম্পদরূপ ভূষণে ভূষিত হইয়া নিজের বর্তমান মনকে সাম (ভাব) দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে অর্থাৎ পাপ এবং বিরোধকে নাশ করিবার জন্য সান্ত্বনা দ্বারায় প্রিয়বাক্য বলার নাম সামভাব। সাম এবং দণ্ড এই দুইটি প্রধান ও প্রশংসনীয়; যাহার দ্বারায় দমন করা যায়, তাহাকেই দণ্ড কহে। সাধন সমরে মনকে দমন করিতে হইবে; চিত্ত বা মনকে যষ্টি দ্বারা বা অসি দ্বারা দমন করা অসম্ভব। এ দণ্ড অসি বা যষ্টি নহে। তাহার পর দান, এদান ও অর্থাদি দান নহে, কারণ মন অনঙ্গ-বায়ুরূপী, তাহার অর্থ রাখিবার স্থান নাই, অর্থাদি দান প্রাপ্তে মনের ত্রাণ হয় না। আত্মবিষয়ক উপদেশ দানই মনের পক্ষে প্রকৃত দান পদবাচ্য। প্রথমতঃ মনের আত্ম রতি বৃদ্ধি করিবার জন্য বর্তমান মনকে তাহার হিতকর, শান্তিপদ, প্রিয় ও সান্ত্বনাজনক আত্মোপদেশ দান করাই প্রকৃত

দান পদবাচ্য। একমাত্র আত্মোপদেশ লাভ করিয়া আত্মক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা মনের ত্রাণ বা বর্তমান মনের শান্তিলাভ হইতে পারে নচেৎ নহে।

তাহার পর ভেদভাব সম্বন্ধে কিছু বলিব, শ্রবণ করুন। বর্তমান মনের আসুরিক ভাব সমূহের প্রতি অভেদভাবে আত্মীয় বোধ থাকা, বর্তমান মন ঐ আসুরিক ভাবের উপর মোহ বশতঃ সতত কৃপা পরায়ণ। একারণ সাধকরূপী জীবের কর্তব্য, ভেদ বুদ্ধির দ্বারা আসুরিক ভাবাপন্ন মনকে হিতোপদেশের সহিত আত্মকর্মে নিয়োজিত করা, জীবরূপ সাধকে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আত্মক্রিয়া ব্যতীত কেবলমাত্র হিতোপদেশে আসুরিক ভাব হইতে ভেদবুদ্ধি দ্বারা মনকে পৃথক করিবার আয়াস করিলে উহা বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। একার সাধন সমরে সাধকের সাম ভাবের সহিত প্রাণপণে দণ্ড চালনা করিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়ামই সাধন সমরের একমাত্র দণ্ডস্বরূপ মহাধর্ম।

মৌনানী হ্যনিলায়ামাঃ দণ্ডোবাদেগহচেতসাম্।
নহ্যতে যস্য কর্ত্তাঙ্গ, বেণুভির্ণ ভবেদ যতিঃ॥

অর্থাৎ মৌন, অনিহা, (নিস্পৃহতা) এবং অনিলায়াম (প্রাণায়ম) এই তিনটি বাক্য, দেহ এবং চিত্তের দণ্ড (নিয়ামক)। এই তিনটি যাঁহার নাই, তিনি যতি নহেন। বংশ দণ্ড ধারণ করিলেই দণ্ডী বা যতি হওয়া যায় না। যাঁহার মন আপনাতে আপনি থাকিয়া ব্রহ্মেলীন হইয়া বাক্যের সংযম হওয়ায় নিজের ইচ্ছার কোন কথা ব্যক্ত হয় না, তিনিই প্রকৃত মৌনীপদবাচ্য, অপরে নহেন। জোর করিয়া বা লোক ভুলাইবার জন্য কথা বলা বন্ধ করিয়া, ইঙ্গিত দ্বারায় মনোভাব যিনি প্রকাশ করেন, তিনি মৌনীপদবাচ্য কদাচ নহেন। কারণ তাহা হইলে দুগ্ধপোষ্য বালক অথবা যাহারা মূক (বোবা) তাহারাই বা মৌনী না হইবে কেন? বাস্তবিক ইহারা কেহই মৌনীপদবাচ্য নহে। যাঁহার মন ব্রহ্মেতে অর্থাৎ আপনাতে আপনি লীন হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত মৌনীপদবাচ্য (মৌনসংলীনমানসঃ); ইহাই প্রকৃত মৌনভাব। প্রাণায়ামরূপ অনিলায়াম দ্বারা মনে সংযম হইলে তবে বাক্যের সংযমরূপ মৌনভাব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর, নচেৎ নহে। অনীহা (নিস্পৃহতা) অর্থাৎ লোভ শূন্যতা। এই লোভ শূন্যতা ও অনীহাভাব ও প্রাণায়ামরূপ অনিলায়াম দ্বারা ব্রহ্মেতে চিত্তের লয় সাধন হইলে তবে হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপনাতে আপনি স্থিতি হওয়ায় বর্তমান চিত্তের লয় সাধন হইয়া সমস্ত কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহভাব স্বতঃই হইয়া থাকে। প্রাণায়ামরূপ অনিলায়াম ব্যতীত কেহই মৌনতা বা নিস্পৃহতা বা চিত্তের সংযম ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। একারণ প্রাণায়ামই একমাত্র দণ্ড স্বরূপ মহাধর্ম। প্রাণায়ামে বায়ুবোধ নাই তাহাও জানিবেন। যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই বায়ুবোধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া থাকে, তাহারা সকল বিষয়েই বিফল মনোরথ হইয়া থাকে জানিবেন।

পূর্বে বলিয়াছি, দেহরূপ সাম্রাজ্যের আত্মাই রাজা, সেই আত্মা আত্মবিস্মৃতি হইয়া জীবভাবে পরিণত হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া আসুরিক ভাবে কার্য্য বোধে আসুরিক ভাবের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। রাজা যেমত আপন শত্রুকে এবং দুষ্ট ও অশান্ত প্রজাগণকে রাজদণ্ড দ্বারা দমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দেহসাম্রাজ্যের জীবরূপ রাজা, আপন শত্রু আসুরিকভাব সমূহকে বর্তমান মনের সহিত দমিত করিবেন। প্রাণায়ামরূপ আত্মক্রিয়ায় আসুরিক ভাব সকল দমিত হইলে তাহার পর গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য গুণাদি দেবত্রয়কে এবং ইন্দ্রিয়রূপী দেবগণকেও তৎশক্তিগণকে স্থির প্রাণের ক্রিয়া কৌশল দ্বারা শুদ্ধস্বত্ত্বে মিলন করিয়া দেবার পর তখন আপনা আপনি স্বতঃই যাহা গুণাতীতভাব (নিজ বোধরূপ অবস্থা) তাহা লাভ করিয়া পরমানন্দভাবে পরমাত্মার স্বরূপতাপ্রাপ্তে দেহরূপসাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খল ভাবে আপনা আপনি কার্য্য হওয়ায়, মন অক্ষয় বিশ্রামলাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কর্ম ইন্দ্রিয়গণ ব্যাভিচার শূন্য হইয়া করিয়া থাকে, মন আত্মাস্বরূপে পরিণত হইয়া চির বিশ্রামরূপ-শান্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবের হিতার্থ যাহাতে মঙ্গল হয় এমত কার্য্য সকল অনাসক্ত ভাবে অনিচ্ছার ইচ্ছায় করিয়া থাকেন। রাজন! আপনি পুত্রস্নেহ বশতঃ অদ্যই বিজয়কুমারকে রাজ্যাভিষেক করিবার মানসে আমার দ্বারা বিজয়কুমারের হস্তে রাজদণ্ড অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, বর্তমানে তাহা স্থগিত রাখুন। কারণ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার যে সকল নিয়ম আপনার বংশে পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তদনুযায়ী অভিষেক কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। বিজয়কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংযমতার সহিত রাজনীতি বিজয়কুমারকে আপনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রাজনীতির সহিত রাজকার্য্যের শিক্ষা প্রদান করুন। কুমার যাহাতে সংযমশীল হইতে পারে সেজন্যও আপনার যত্ন করা আবশ্যক। কারণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বীর পদবাচ্য এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যতীত কেহ বীরও হইতে পারে না, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তিনি স্বতঃই সর্ববিষয়ে অধীর হইয়া আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়া থাকেন; একারণ বিজয়কুমারের সংযতেন্দ্রিয় হইবার জন্য কর্মযোগের অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক।

কর্মযোগ সর্বপ্রকার পার্থিব এবং অপার্থিব জ্ঞানের আধার স্বরূপ, শাস্ত্রাদি, পাঠদ্বারা যে জ্ঞান ও নীতি লোকে অর্জন করিয়া থাকে, তাহা কার্য্যকরণ কালে কার্য্যকারী না হইয়া তদ্বারা ঘটনাচক্রে নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া সাধারণতঃ তাহাতে বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব বিজয়কুমার কর্মযোগের অভ্যাস দ্বারা সর্বজ্ঞানময় ও সর্বপ্রকার নীতিময় এবং কর্মযোগের অতীতাবস্থারূপ জ্ঞান যাহাতে প্রাপ্ত হয়, তৎবিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে বিজয়কুমার একদিন নিশ্চয়ই পূর্বতন রাজর্ষিগণের মধ্যে গণ্য হইবে। আপনি বিজয়কুমরাকে অর্পণ করিবার জন্য যে রাজদণ্ড আমার হস্তে দিয়াছেন, ইহা আমি এক্ষণে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি,

বিজয়কুমার বয়ঃপ্রাপ্তের সহিত উপযুক্ত হইলে যখন তাহার রাজ্যাভিষেক কার্য্য হইবে, সেই সময় আমি পুনরায় আগমন করিয়া কুমারকে রাজমুকুট এবং রাজদণ্ড ধারণ করাইয়া দিব। এক্ষণে আপনি রাজদণ্ড গ্রহণ করুন, ইহা বলিয়া মহর্ষি রাজহস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা মহর্ষিকে প্রাণামান্তর করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন, দেব! আপনি আমার প্রতি যখন এতদূর কৃপালু, তখন বিজয়কুমারের সহিত আমাদিগকে উক্ত কর্মযোগের শিক্ষা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। মহর্ষি কহিলেন, রাজন! আমি আপনার বাক্যে এবং আপনার কার্য্য পরিদর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি, আপনি আমার নিকট হইতে কর্মযোগের শিক্ষা মানসে যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, আমি তাহা প্রদান করিব। আপনি তৎবিষয়ে আশ্বস্ত হউন।

রাজা মহর্ষি কহিলেন, আমি আপনার আজ্ঞামত বিজয়কুমারকে যুবরাজপদেই অধিষ্ঠিত করিব এবং কর্মযোগের অভ্যাসে বিজয়কুমারের কোন প্রকার বাধা না জন্মায় তাহার জন্যও বিশেষরূপে সর্বদা যত্ন করিব। অদ্য শোভাযাত্রার সময় উপস্থিত, আপনি অনুমতি করিলে আপনার সহিত আমরা সকলে শোভাযাত্রায় গমন করিব, সমস্তই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কেবল আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। মহর্ষি ঈষৎ হাস্য বদনে বলিলেন, ভাল তাহাই হউক, আপনাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। মহর্ষি গমনোদ্যত হইলে রাণীমাতা মহর্ষিকে বলিলেন, দেব! কুমারকে রাজবেশে দেখিবার মানসে রাজপুর মহিলাগণ এবং সামন্ত রাজগণের বাটীস্থ মহিলাগণ বিশ্রাম গৃহে বসিয়া আছেন, যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি একবার কুমারকে তাঁহাদের দর্শন করাইয়া আনয়ন করি। মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলে, মাতা পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বিশ্রামগৃহে উপস্থিত হইলে রাণী মাতার সম্মান রক্ষার জন্য মহিলাগণ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিশ্রাম গৃহটি মহিলাগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিজয় এই গৃহ হইতে জননীর সহিত রাজপরিচ্ছদ পরিধানার্থে গমন করিলে তাহার পর অনেকে আসিয়াছেন। মাতা প্রথমে বিজয়ের আত্মীয়া মহিলাগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়া তাহার পর যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, একে একে সমস্ত বলিয়া দিলেন।

যে সকল সামন্ত নৃপমহিলারা আগমন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য সকলেই প্রায় সধবা, বিধবার ভাগ কম ছিল, জননী পুত্রকে তাঁহাদের নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন বৎস কুমার! ইঁহারা সকলেই স্থানীয় সামন্ত নৃপতিগণের রমণী, তোমাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে শুভাগমন করিয়াছেন। জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয় নম্রতা সহকারে সকলকেই সম্বর্দ্ধনা করিল। ইঁহাদের ভিতর প্রাচীনা নাই বলিলেও হয়, সকলেই প্রায় তরুণী; প্রৌঢ়া ও অষোড়শী, অত্যল্প। বিজয় তাঁহাদিগকে বিনীত নম্রতা সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিলে, তাঁহারা স্বর্ণপাত্রপূর্ণ মণি মুক্তার অলঙ্কার উপঢৌকন প্রদান করিলেন;

পুত্রকে জননী রাজপ্রথানুযায়ী তাহা স্পর্শ করিতে বলায় জননীর বাক্য অনুযায়ী বিজয় তাহার হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারায় প্রত্যেক পাত্রস্থ দ্রব্য স্পর্শ করিল। তৎপরে বিশ্বস্ত দাসীগণ তাহা উঠাইয়া রাজকোষে লইয়া গেল। জননী সকলকে মিনতি সহকারে বলিলেন, শোভাযাত্রার সময় প্রায় উপস্থিত, সুতরাং এখানে আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে, মহর্ষি এবং আর্য্যপুত্র বহির্দেশে কুমারের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। তখন আত্মীয়া মহিলাগণ একবাক্যে বলিলেন, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শোভাযাত্রা শুভ হউক; অদ্য কুমারের পুনরাগমনে রাজপুরী শোভাযুক্ত হইয়াছে, আমরা যে রাজপুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইব যে আশা কাহারও ছিল না; রাজপুরী অন্ধকারাবৃত রজনীর ন্যায় নিরানন্দময় হইয়াছিল, অদ্য কুমারের পুনরাগমনে আনন্দময় হইল। যে ভগবান কুমারকে আমাদের নয়ন পথে পুনরায় আনয়ন করাইলেন, তিনি কুমারকে দীর্ঘজীবি করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা; বিজয়ের খুল্লতাত পত্নী রাণী মাতাকে বলিলেন, দিদি! আপনি কুমারকে রাজহস্তে অর্পণ করিয়া আসুন, আমরা আনন্দ মনে কুমারের শোভাযাত্রার গমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিতেছি। জননী সামন্তবর্গের মহিলাগণের নিকট হইতে বিনীতভাবে অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুত্রকে রাজসমীপে আনয়ন করতঃ মহর্ষিকে বলিলেন, এইবার আপনারা কুমারকে লইয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীমানকে লইয়া আসিয়াছি।

মহর্ষি বলিলেন, রাজন! আপনি কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রে গমন করুন। আমরা আপনাদের সঙ্গেই যাইতেছি। বিজয় জনকের হস্ত ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল, মহর্ষি এবং বিজয়ের পালক পিতা সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ক্রমশঃ উপরতল হইতে অন্তপুরের নিম্নতলের একটা গৃহের মধ্য দিয়া রাজোচিতভাবে সজ্জিত বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে এই গৃহে প্রবেশ করিলে, বিজয়ের জনক মহর্ষিকে ও বিজয়ের পালক পিতাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। মহর্ষি তাঁহাদেরও বসিতে অনুমতি করায় বিজয়ের জনক তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করিলেন। তৎপরে রাজা আহ্বানসূচক ঘন্টাধ্বনি করিলে একজন নিম্নপদস্থ দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে কহিলেন, প্রধান মন্ত্রীবরকে আমার নমস্কার দিয়া আমার আগমন বার্তা-জ্ঞাপন করাও। রাজ আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া দূত দ্রুতপদে গমন করিল। ক্ষণিক পরেই প্রধান মন্ত্রী রাজসমীপে আগমন করিয়া বীরাসনে (হাঁটু নিম্ন করিয়া উভয়পদে বসা, যাহাতে উভয়পদ সম্মুখের ব্যক্তি দেখিতে না পায়) করজোড়ে বসিয়া পুত্রকে এবং তাহার জনককে প্রণাম করিলেন।

জনক মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শোভাযাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে কি? মন্ত্রীবর করজোড়ে বলিলেন দেব! আমাদের রাজসংসারের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী সকলেই গমনের জন্য সজ্জিত হইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। সামন্ত নৃপতিগণ

ও মহর্ষির জন্য এবং রাজকুল পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণের জন্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের জন্য গমনোপযোগী যথাযোগ্য যান সকল প্রস্তুত রহিয়াছেন। রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন আমি আপনার কার্য্য তৎপরতায় বড় প্রীতিলাভ করিলাম। আমি রাজসভায় গমন করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে আপনি সভাস্থ ব্যক্তিগণকে জ্ঞাপন করিয়া দিবেন যে, অদ্য মহর্ষির বাক্যে আমি কুমারকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছি এবং আমার অধিকৃত সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজ প্রতিনিধিগণকেও এই সংবাদ পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করাইয়া দিবেন। মন্ত্রী করজোড়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। রাজন! কুমার যে অদ্য মহর্ষি কর্ত্তৃক রাজমুকুট ধারণ করিয়া যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, আমি এই বার্তাপূর্বেই অবগত হইয়া আপনার অধিকৃত রাজ সমূহের রাজপ্রতিনিধিগণকে এই সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছি, কেবলমাত্র আপনার সাক্ষর করিবার অপেক্ষায় পত্র সমূহ যথাযথ স্থানে প্রেরণ করা হয় নাই. পত্র মধ্যে ইহা লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক রাজ্যে যুবরাজের মঙ্গল জন্য মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানের সহিত প্রজাগণকে ধন দ্বারা ও সম্মান দ্বারা সকলের ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা যেন পূরণ করা হয় এবং সপ্তাহকাল ব্যাপী যেন উৎসবাদি করা হয়। কারাবাসীগণের মধ্যে যাহার যাহারা সচ্চরিত্রভাবে কারাবাসে কাল যাপন করিতেছে, তাহাদিগকে যেন অর্থাদি দান করিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রজাগণকে ভূরি ভোজন দ্বারা যেন পরিতৃপ্ত করা হয় এবং একটি শুভদিন নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি, সেইদিন হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত উৎসবাদি সর্বত্রেই আরম্ভ হইবে।

রাজা হাস্য বদনে কহিলেন, মন্ত্রীবর! আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্যের উপর এতদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ দেখিয়া আমি অতীব সন্তোষলাভ করিলাম, আমাকে পত্র সকল প্রদান করুন, স্বাক্ষর করিয়া দিই, তখন মন্ত্রীবর সাঙ্কেতিক ঘন্টাধ্বনি করিবামাত্র একজন দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রী তাহাকে কহিলেন, লিপিকরকে আহ্বান কর। তৎপরে একখানি খাতা লইয়া লিপিকর তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজকে প্রণাম করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিল। রাজা ও তাঁহাকে নমস্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। মন্ত্রী লেখকের হস্ত হইতে খাতাখানি লইয়া তন্মধ্য হইতে পত্র সমূহ বাহির করিয়া রাজহস্তে প্রদান করিলেন, রাজা একখানি পত্র পাঠ করিয়া তাহার পর প্রত্যেক পত্রে সাক্ষর করিয়া মন্ত্রীকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, আপনি যেদিন স্থির করিয়া পত্রে লিখিয়াছেন, উক্ত দিনে শুভক্ষণে বিজয়কুমার যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজসভায় সর্বসমক্ষে আমার বাম পার্শ্বে যুবরাজের উপযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিবেন এবং সেইদিন হইতে এখানে ও উৎসবাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে সেইদিন সমস্ত রাজপ্রাসাদে এবং রাজধানীর সর্বস্থান রাজব্যয়ে আলোক মালার দ্বারা সজ্জিত হইবে। আপনি পত্রে যে সমস্ত-ব্যাপারে লিখিয়াছেন তৎসমুদায় কার্য্যও আমার রাজধানীতে হইবে।

অনাথা দরিদ্রগণকে এমতভাবে দান করিবেন যাতে তাহাদের অবস্থানুযায়ী অভাব মোচন হয় এবং তাহারা সন্তোষ লাভ করে এজন্য আমার রাজকোষ শূন্য হইলেও আমি ক্ষতি বোধ করিব না। কারণ আমি নির্বংশ হইতে বসিয়াছিলাম, কেবলমাত্র মহর্ষির কৃপায় আমার বংশ রক্ষা এবং রাজ্য রক্ষা হইল। আমার এ শুভদিন যে পুনরায় আগমন করিবে তাহা স্বপনেও কখনও ভাবি নাই। আমার নষ্ট প্রায় পুত্ররত্ন রত্নমণি অপেক্ষায় হারানিধি পুত্রকে নিজ ক্রোড়ে প্রাপ্ত হইয়া আমরা সস্ত্রীক কি পর্য্যন্ত যে আনন্দানুভব করিতেছি, তাহা মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

যাহা হউক এক্ষণে আমরা রাজ সভায় গমন করিয়া উপবেশন করিলে পর, আপনি আমার বাক্য ও পত্র মর্ম সভাস্থ সামন্ত নৃপতিগণ ও সভাসদগণকে বাচনিক অবগত করাইবেন।

তৎপরে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া করজোড়ে অনুনয়ের সহিত মহর্ষিকে কহিলেন। ভগবান! একবার রাজসভায় ও শোভাযাত্রায় গমন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। নাগরিকগণ (কুমারসহ) আপনার চরণ দর্শন করিয়া ধন্য হউক। নগরস্থ নাগরিক ও নাগরিকাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে নিজ নিজ গৃহ হইতে দেখিতে পায় তাহাই আমার একমাত্র ইচ্ছা; নচেৎ আমার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার বাসনা আদৌ নাই। আপনি ইতিপূর্বেই শোভাযাত্রায় গমন করিবেন সম্মতি দিয়াছেন, এক্ষণে উহা সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ করুন। মহর্ষি বলিলেন, বেশ চলুন, যাওয়া যাউক। তাহার পর সকলে মহর্ষির সহিত রাজসভায় গমন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিবামাত্র নকিব চীৎকার সহকারে মহারাজের যশোকীর্তন করিতে করিতে রাজ-আগমন-বার্তা সকলকে জ্ঞাপন জন্য সকলের অগ্রগামি হইয়া যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য মন্ত্রিবরও সকলের সহিত মহর্ষির পার্শ্বে আসিতে লাগিলেন।

সকলে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র সভাস্থ সকলেই আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া দণ্ডামান হইলেন। রাজা সকলকে বিনয়ের সহিত বসিতে বলিলেন, সকলেই আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন। তাহার পর রাজা মহর্ষিকে সুবর্ণ নির্ম্মিত সুখাসনে উপবেশন করাইয়া বিজয়ের পালক পিতাকে ও একটি সুখাসনে উপবেশন করাইলেন; তৎপরে মহর্ষি বিজয়ের সহিত রাজাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। রাজা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। উভয়ে এক সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সেই বার্তা ঘোষণা জন্য বড় বড় কামান সকল বজ্রনিনাদে মুখরিত হইল। সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে রাজ অট্টালিকা নিনাদিত হইয়া উঠল। ধ্বনিপ্রশমিত হইলে মন্ত্রীবর পূর্বকথিত রাজ আজ্ঞা সভাস্থ সকলকে জ্ঞাপন করিলে সকলেই মঙ্গলসূচক জয়ধ্বনি করিলেন।

মন্ত্রীবর করজোড়ে বিনীতভাবে রাজাকে কহিলেন, এক্ষণে তৃতীয় প্রহর গত হইল,

রাজা এইবাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার সহিত সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। সামন্ত নৃপতিগণও আপন আপন আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মহর্ষিও বিজয়ের পালক পিতা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপর ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং রাজকুলপুরোহিত সকলেই শোভাযাত্রায় গমন জন্য আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বলা বাহুল্য, রাজা সিংহাসন হইতে অবতরণ করিবামাত্র পুনরায় তোপধ্বনি হইতে লাগিল, সকলেই আনন্দসহকারে রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই রাজবাটীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের মধ্যে কয়েকটি হস্তী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি শ্বেতবর্ণের ঐরাবত যাহা প্রথমে মহর্ষির সহিত আসিবার সময় রাজবাটীর তোরণদ্বারের প্রবেশপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে দৃশ্যমান হইয়াছিল, উক্ত হস্তীদ্বয়কে বিচিত্র ভূষণ দ্বারা সজ্জিত করিয়া সভাগৃহ প্রাঙ্গণের সোপানের নিম্নভাগের উভয়াপার্শ্বে রক্ষা করা হইয়াছে। সুবর্ণ নির্মিত এবং বহুমূল্য মণি রত্ন দ্বারা খচিত চতুষ্ক প্রত্যেক ঐরাবতের পৃষ্ঠদেশে রাজার বসিবার উপযোগী করিয়া রক্ষিত হইয়াছে এবং চতুষ্কের সম্মুখে ও ঐরাবতদ্বয়ের মস্তকের পশ্চাতে মহামাত্র বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করিয়া অঙ্কুশ হস্তে বসিয়া আছে।

রাজ পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষির সহিত সোপানের নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়া অগ্রে মহর্ষিকে সোপানের দক্ষিণভাগের ঐরাবতের উপর চতুষ্কোপরি বসাইয়া তৎপরে রাজকুল পুরোহিতকেও উপস্থিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে হস্তী পৃষ্ঠে চতুষ্কোপরি বসাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ঐরাবতের চতুষ্ক ব্যতীত অপর সমুদায় হস্তীর চতুষ্ক রজতনির্মিত। তৎপরে রাজা বিজয়ের পালক পিতাকেও একটি রজত নির্মিত চতুষ্কোপরি বসাইয়া দিয়া মন্ত্রীবরকে কহিলেন, মন্ত্রীবর! এক্ষণে আপনি সামন্ত নৃপতিগণকে যথোপযুক্ত যানে সম্মানের সহিত উপবেশন করাইয়া আমাকে সংবাদ প্রেরণ করুন।

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, রাজন! আপনার বর্তমান আজ্ঞা পালন করা হইয়াছে, সামন্ত নৃপতিগণও প্রধান প্রধান রাজ অমাত্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে যথোপযুক্ত যানে আরোহন করান হইয়াছে। তাঁহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া আপন আপন যানে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া বিজয়কে ঐরাবতের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। রাজ হস্তী ঐরাবত নিকটে কুমারকে দেখিমাত্র নিজ শুণ্ড দ্বারা ধারণ করিয়া মস্তকোপরি বসাইয়া লইল, এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কুমারকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দের সহ বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। মহামাত্র বিজয়কে প্রণাম করতঃ ক্রোড়ে লইয়া চতুষ্কোপরি অতি যত্নের সহিত উপবেশন করাইয়া দিল। ছত্রধারক মস্তকোপরি রাজছত্র বিস্তার করিয়া ধরিলে বিজয়

বীরাসনে আপন ইচ্ছামতই বসিল। তাহার পর রাজা সোপান দ্বারা ঐরাবতের উপর উঠিয়া পুত্রকে নিজ বামে রাখিয়া হস্তী পৃষ্ঠ হইতে মহর্ষিকে প্রণাম জানাইয়া উপেবেশন করিলেন। পুনরায় বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল।

রাজা মহর্ষিকে এবং রাজকুল পুরোহিতকে ও অপর ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আপন দক্ষিণভাগে রাখিয়া শুভযাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, বিজয়কুমার কখনও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই, তত্রাচ তিনি অতুল সাহসের সহিত নির্ভয়ে বীরাসনে অটল, অচলভাবেই বসিয়া আছেন; এই সময় রাজা বিজয়কুমারকে ঐরূপ ভাবে উপবেশন করিতে দেখিয়া এবং ঐরাবতের ঘটনাবলি দর্শন করিয়া হর্ষ চিত্তে কহিলেন; বৎস বিজয়! দর্শনাকাঙ্ক্ষীগণ আমাকে এবং তোমাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলে, নমস্কারের দ্বারায় তাঁহাদের প্রণাম প্রত্যর্পণ করা চাহি; অতএব আমি তাঁহাদিগকে যেরূপ নমস্কার দ্বারা প্রণাম প্রত্যর্পণ করিব, তুমিও সেই অনুকরণে কার্য্য করিও। বিজয়কুমার কহিলেন, পিতঃ আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শিরোধার্য্য করিলাম, আপনার আজ্ঞা মতই কার্য্য করিব। তৎপরে সকলে রাজবাটীর তোরণ দ্বার পার হইয়া, সম্মুখস্থ পথের উপর আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র ঐরাবত মহামাত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল; মহর্ষির ঐরাবতও ইহাদের দক্ষিণ ভাগে এইরূপ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। পথের উভয় পার্শ্বে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনগণ সশস্ত্রে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইঁহারা সকলেই সৈনিক নিয়মানুসারে রাজাকে ও বিজয়কে অভিবাদন করিল; রাজা তাহাদিগকে নমস্কার করিলে পুত্রও পিতার অনুকরণে তাঁহাদের অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিল। এইবার ইঁহাদের হস্তীযুগল মহামাত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

এখানে রাজার উভয় পার্শ্বে উৎকৃষ্ট রথ সকল অশ্বযুগল দ্বারা যুক্তভাবে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই রথ সকলের উপরিভাগ আচ্ছাদন রহিত; রথের উপর কোন রকম আচ্ছাদন দেখা যাইতেছে না, আচ্ছাদন থাকিলেও উপস্থিত সম্ভবতঃ তাহা নামাইয়া রাখিয়া থাকিবে। রথ চালক সারথি উৎকৃষ্ট ঊর্ণনির্মিত লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং মস্তকোপরি শিরোপা ধারণ করিয়া রথাশ্ব চালনা করিবার জন্য যথোপরি অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। দুইজন অশ্বরক্ষক উক্তরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া চামর হস্তে রথ চক্রের পশ্চাতে রথ ধারণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, রথের আরোহী সকল অধিকাংশই নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ইঁহারা সকলেই রাজাকে এবং বিজয়কে অভিবাদন করিলেন, বিজয়ও রাজ অনুকরণে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইতে লাগিল। প্রত্যেক রথেই চারিজন করিয়া লোক পরস্পর সম্মুখীন ভাবে উপবেশন করিয়াছেন।

রথের সংখ্যাও কম নহে, পথের উভয় পার্শ্বে প্রায় পাঁচ ছয়শত রথ হইবে।—

সমস্ত রথগুলি বেশ শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে। বিজয়দের ঐরাবত ক্রমশঃ ধীরভাবে অগ্রগামী হইতেছে। রথ শ্রেণী শেষ হইলেই বিজয় দেখিলেন, রথ সকল যেরূপ শ্রেণীরূপ ভাবে রহিয়াছে বৃহদাকার হস্তী সকলও সেইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, বলা বাহুল্য, এসকল শ্বেত হস্তী নহে, সাধারণ হস্তী, এই সকল হস্তী পৃষ্ঠে উর্ণানির্মিত লোহিত বর্ণের বনাতের উপর জরির বিচিত্র কারুকার্য্য বিশিষ্ট গাত্র বস্ত্রোপরি রজত নির্মিত চতুষ্কো রহিয়াছে, প্রত্যেক চতুষ্কোপরি এক একজন আরোহী রাজবেশে উপবেশন করিয়া আছেন, এই সময় রাজা পুত্রকে বলিলেন, হস্তীপৃষ্ঠে চতুষ্কোপরি যাঁহারা উপবেশন করিয়া আছেন তাঁহারা সকলেই সামন্তনৃপতি। প্রত্যেক হস্তীর স্কন্ধদেশে একজন করিয়া মহামাত্র বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অঙ্কুশ হস্তে বসিয়া আছে। মহারাজের ঐরাবত মধ্যপথ ধরিয়া যাইতে যাইতে যখন যে হস্তীর নিকটস্থ হইতে লাগিল, তখন সেই হস্তীরপৃষ্ঠে চতুষ্কোপরি যিনি উপবেশন করিয়া আছেন তিনি রাজার দর্শন মাত্রেই জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। রাজা আর বিজয়ও রাজগণকেও বিশেষ নম্রতার সহিত সম্মান দেখাইতে দেখাইতে যাইতে লাগিলেন।

রাজার ঐরাবত ধীর ও মন্থর গতিতে গমন করিতেছে, পিতাপুত্রও যখন উভয় পার্শ্বের হস্তী আরোহিগণের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় রাজার ঐরাবত মহামাত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজার পশ্চাদ্দেশে প্রথম হস্তীতে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বসিয়া আছেন। তাহার পর কয়েকটি হস্তীতে কয়েকজন রাজপ্রতিনিধি উপবেশন করিয়া আছেন। তৎপরে প্রধান সেনাপতি মহাশয় ও সামন্ত নৃপতিগণ হস্তীপৃষ্ঠে চতুষ্কোপরি উপবেশন করিয়া আছেন। মহারাজের অগ্রে দুইজন সহকারী সেনাপতি অশ্বারূঢ় হইয়া রাজপতাকা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই সময় রাজার ঐরাবত ধীর ও মন্দগতিতে মহামাত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী চলিতে লাগিল, সে দুইজন অশ্বারূঢ় সহকারী সেনাপতি রাজরা অগ্রে রাজ পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শকরূপে চলিতে লাগিলেন। প্রাতে বিজয় মহর্ষির সহিত রাজবাটির পরিখা পার হইয়া রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণের যে রাস্তা দিয়া রাজবাটীতে আসিয়াছিল এক্ষণে সেই রাস্তা দিয়াই যাইতে লাগিল, কার্য্যতঃও তাহাই হইল। রাজবাটীর ছাদের উপর এবং গবাক্ষ সমূহ চিক দ্বারা এমত ভাবে আচ্ছাদন করা হইয়াছে যে, বহির্ভাগ হইতে গৃহের বা ছাদের উপরের কোনও লোককে বাহিরের লোক যাতে দেখিতে না পায়। রাজা এবং কুমার রাজবাটীর নিকটস্থ হইলে রাজা স্বীয় উষ্ণীষ মস্তক হইতে নামাইয়া তদ্বারা রাজপুরস্থ মহিলাগণকে সম্মান দেখাইতে লাগিলেন। পুত্রও তদ্রূপ ভাবে রাজ অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় শোভাযাত্রায় সমস্ত যাত্রীগণ আপন আপন বহুমূল্য শিরোপা মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া অনাবৃত মস্তকে রহিলেন।

সকলে এইরূপ ভাবে রাজা অট্টালিকা প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া রাজবাটীর বহিপ্রাঙ্গনের সম্মুখস্থ তোরণদ্বার দিয়া পরিখার পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই সুবৃহৎ ইষ্টক নির্মিত রাজপথ, পথটির মধ্যবর্তী স্থান প্রায় পঞ্চাশ হস্ত পরিসর। ঐ পথের উভয় পার্শ্বে পদচারী পথিকগণের জন্য স্বতন্ত্র পথ রহিয়াছে। তাহার পরিসরও প্রায় আন্দাজ ছয় সাত হস্ত হওয়া সম্ভব। মধ্যবর্তী পথের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পদচারী পথিকগণের পথের উপর অসংখ্য সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত প্রজাসমূহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজপথের উভয়পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা সমূহের ছাদের উপর এবং বাতায়ন পথে লোকে লোকারণ্য, অনেকে অট্টালিকার উপর হইতে পতাকা উড্ডীন করাইয়া রাজ সম্মান দেখাইতেছে এবং সকলে যখন যে অট্টালিকার নিকটবর্তী হইতেছেন সেই অট্টালিকার বহিঃপ্রকোষ্ঠের ইন্দ্রকোষ হইতে সুগন্ধ (পুষ্প ও পুষ্পমালা) পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। রাজা রাজ অট্টালিকা প্রদক্ষিণ করার সময় হইতে স্বীয় মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়াছিলেন, বিজয় এখনও তদ্রূপভাবে উষ্ণীষ খুলিয়া সকলকে সম্মান দেখাইতেছে; বিজয় তদ্রূপভাবে রাজ অনুকরণে নিজ মস্তকের উষ্ণীষ হস্তে ধারণ করিয়া অভিবাদন করিয়া যাইতেছেন। এইরূপে সকল নগরের প্রধান প্রধান পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সর্বত্রই জনাকীর্ণ; প্রজাগণ সর্বত্রেই সাধ্যমত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। রাজা প্রভৃতি নগরের প্রধান পথ সকল অতিক্রম করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্বে পুনরায় রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

প্রাসাদে উপস্থিত হইলেই পুনরায় বজ্র নিনাদে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে রাজা সামন্ত নৃপতিগণকে এবং অপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে সম্মানের সহিত বিদায় দিলে, তাঁহারা সকলেই আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। রাজা মহর্ষিকে প্রণামকরণান্তর মহর্ষির সহিত বিজয়কে এবং তাহার পালক পিতাকে সঙ্গে লইয়া রাজপুর মধ্যে প্রবেশ জন্য গমনোদ্যত হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে কহিলেন, সমান্ত নৃপতিগণের যেন কোন বিষয় ত্রুটি না হয়। তাঁহারা রাজ অতিথি, একারণ সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা আপনার একান্ত কর্তব্য। মন্ত্রী বলিলেন, দেব! তাঁহাদের আবশ্যক মত ফলমূলাদি দ্রব্য সম্ভার ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি রাজোচিত ভাবে প্রত্যহই প্রেরণ করা হইতেছে এবং আমি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। আমার প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকজন লোকও নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং লোক দ্বারা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করাইতেছেন, কোন প্রকার বন্দোবস্তের ত্রুটি হইতেছে না। আপনি উক্ত বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীবরকে ধন্যবাদ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রীও আপন কার্য্যে গমন করিলেন।

রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র, রাণী সখীগণ সমভিব্যাহারে আগমন করতঃ

মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া কুমারের মুখচুম্বন করিতে করিতে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন! রাজা মহর্ষিকেও বিজয়কুমারের পালক পিতাকে সঙ্গে লইয়া বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিলেন, রাণীমাতা কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া পরিচ্ছদাদি পরিবর্তন করিবার গৃহে গিয়া কুমারের বস্ত্রাদি পরিবর্তন করাইয়া দিতে লাগিলেন। যদিও দাসদাসীর অভাব নাই, তাহা হইলেও রাণীমাতা অদ্য স্বয়ং নিজ হস্তেই ঐ সকল কার্য্য করিয়া দিয়া অবশেষে সিক্ত গাত্র মার্জ্জনি দ্বারায় কুমারের গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিলেন, পরে অপর একখানি সুগন্ধ বাসিত কোমল শুষ্ক গাত্র মার্জ্জনি লইয়া গাত্রের সিক্ত স্থান মার্জ্জন করিয়া দিলেন, তাহার পর কুমারকে স্নেহভরে ক্রোড়ে করিয়া অপরাহ্নিক খাদ্যাদি ভোজনাগারে আগমন করিয়া একখানি মেষ লোম রচিত নানা বর্ণের বিচিত্র শোভা বিশিষ্ট আসনোপরি কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করিলেন, পরিচারিকাগণ সম্মুখেই রাণীমাতার আজ্ঞা পালন জন্য করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

পরে একজন পরিচারিকা দুইটি সুবর্ণ নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া নানাবিধ সুপক্ক ফল, ক্ষীরজাত নানাবিধ মিষ্টান্ন, ঘৃতপক্ক গোধুম চূর্ণের পিষ্টকাদি, বেসম নির্ম্মিত লড়ুক এবং সুমিষ্ট ও এলাচি কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধিকৃত লপ্‌সিকাদি (মোহন ভোগ) প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করিল। বলা বাহুল্য, এই পরিচারিকা নিম্ন জাতি নহে, আর্য্যবংশীয়া; ইঁহার সঙ্গে অপর একজন পরিচারিকা সুবর্ণপাত্রে করিয়া কতকটা গাঢ় দুগ্ধ এবং কর্পূর বাসিত পানীয়জল আনয়ন করিল। তৎপরে কুমারকে স্নেহভরে ভোজন করাইতে লাগিলেন। কুমার মাতৃহস্তে পরিতোষরূপে ভোজন করিতে এক একবার মাতৃমুখ অবলোকন করিতেছেন আবার ভোজনের দ্রব্য সমূহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, কখন বা গৃহের মধ্যে কোন স্থানে কি রহিয়াছে তাহাও দর্শন করিতেছেন; তবে অধিকাংশ সময়েই মাতার কলঙ্কহীন শশধরের ন্যায় বদন মণ্ডলের উপর অকৃত্রিম ভক্তিযুক্ত ভালবাসার সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। বিজয়কুমারের ভোজন কার্য্য সমাপন হইলে রাণী একজন পরিচারিকাকে মুখ প্রক্ষালনার্থ বারি আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইবামাত্র একজন পরিচারিকা এক হস্তে একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত জলঝারি, এবং অপর হস্তে একটি নিষ্টিবন পরিত্যাগ করিবার সুবর্ণপাত্র আনয়ন করিয়া কর্পূর বাসিত জল, রাণীর হস্তে ঢালিয়া দিতে লাগিল, নিষ্টিবন পাত্র নিম্নে থাকায় মুখ প্রক্ষালনের বারি এবং হস্ত ধৌতের বারি উক্ত পাত্রে পতিত হইতে লাগিল।

বিজয়কুমারের মুখ প্রক্ষালন সমাপন হইলে, পরিচারিকা একখানি সুকোমল, সুগন্ধযুক্ত হস্ত মার্জ্জনী রাণীর হস্তে দিল, রাণী তদ্দ্বারা কুমারের মুখমণ্ডলস্থিত বারি মার্জ্জন করিয়া কুমারকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে যাইতেছেন এমন সময় একজন পরিচারিকা রাণীকে বলিল, আর্য্যা! কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া যাইতে আপনার কষ্ট

হওয়া সম্ভব, অতএব অনুমতি হইলে আমি কুমারকে লইয়া যাইতে পারি, রাণী পরিচারিকাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, দেখ লোকে কথায় বলিয়া থাকে, গাছের কি ফল ভারী লাগে? তা বাছা কুমার আমার গর্ভজাত সন্তান, আমি যাহাকে দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে ধারণ করিয়া বহন করিতে পারিয়াছি, তাহাকে আর ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বহন করিতে পারগ হইব না? ফল ভরে বৃক্ষ কখন পতিত হয় না, অতএব আমার হারাধন রত্নমণি কুমারকে ক্রোড়ে করিতে আমার কোন প্রকার ক্লেশ হইবে না। এতদিন পরে মহর্ষির কৃপায় আমি হৃদয়ের ধন কুমারকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাকে বহন করিতে ক্লেশ হওয়া দূরের কথা অনির্বচনীয় পুত্রস্নেহ বশতঃ আনন্দই হইতেছে, অতএব বাছা, তোমাকে ক্রোড়ে করিতে হইবে না, আমি স্বয়ংই আমার অমূল্য রত্নকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইব। এই বলিয়া রাণীমাতা বিজয়কুমারকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া আপন বিশ্রামাগারে আসিয়া সুখাসনে উপবেশন করিলেন। রাজপুরস্থ মহিলাগণ এবং সামন্ত রাজমহিলাগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্য রাজমহিলাগণ বলিলেন, আর্য্যা! আমরা এক্ষণে আপন আপন আলয়ে গমন করিবার জন্য আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি। রাজ্ঞী কহিলেন সখীগণ! তাহা হইবে না, রাত্রে ভোজনাদি সমাপন করিয়া তাহার পর আপনারা গমন করিবেন, ইহাই আমার বাসনা। মহিলাগণ কহিলেন, না আর্য্যা! অদ্য রাত্রে আর ভোজন করিতে হইবে না আমরা সকলেই যাহা ভোজন করিয়াছি, রাত্রে আর ভোজন করিতে হইবে না আমরা না হয় আগামী কল্য উপস্থিত হইব। রাণী কহিলেন, ভগিনীগণ! আগামী কল্য ত' নিশ্চয়ই আসিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কল্যই আমি কিম্বা আমার দেবর পত্নী আপনাদিগকে আহ্বান করিতে নিশ্চয়ই গমন করিবে, রাজকুমারের আগমন জন্য সপ্তাহকাল ব্যাপী উৎসব হইবে, সম্ভবতঃ উহা আগামী কল্য হইতেই আরম্ভ হইবে। আপনাদিগকে সপ্তাহকাল রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করতঃ আমায় উৎসাহিত করিতে হইবে। ভাল আপনারা গৃহে গমন করুন। ইহা বলিয়া রাজ্ঞী দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সাদর সম্ভাষণের সহিত বিদায় দিলেন। তাঁহারা রাজ্ঞীও কুমারকে অভিবাদন করিয়া গমন করিলেন; বিজয়কুমারের খুল্লতাতপত্নী তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া তাঁহাদিগকে রাজঅন্তঃপুরের মধ্যস্থিত অঙ্গণে চতুর্দ্দোলোপরি উঠাইয়া দিয়া রাণীকে সংবাদ প্রদান করিলেন।

বিজয়কুমার এবং রাজ্ঞী পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া আছেন দুইজন চামর গ্রাহিকা চামর হস্তে ব্যজন করিতেছে, রাজ্ঞী বিজয়কুমারের খুল্লতাতপত্নীর সহিত কুমারের আগমন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে বিজয়কুমারের খুল্লতাতপত্নী রাজ্ঞীকে কহিলেন, দিদি! আমি মহর্ষির মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলি অন্তরাল হইতে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, মহর্ষি আপনাদিগকে আত্মকর্মের উপদেশ যথা সময়ে প্রদান করিবেন বলিয়া

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ইহা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। দিদি! আমি এবং আপনার দেবর যাহাতে উক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার উপায় আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।

আমি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী। অবশ্য আপনি অনুমতি করিলে আমরাও মহর্ষিকে বলিতে পারি। তবে আমার এবং আপনার দেবরের এবিষয় মহর্ষিকে বলিতে সাহসে কুলায় না। আপনি স্বয়ং দয়া করিয়া না বলিলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব না এই বলিয়া রাণীর চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রাণী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করতঃ আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, ভগ্নী! রোদন করিও না, স্থির হও; আমি তোমার জন্য এবং আমার দেবরের জন্য মনোযোগী আছি, অমি দেবরকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিয়া থাকি, তিনি লক্ষণের ন্যায় আর্য্য পুত্রে এবং আমার আজ্ঞাকারী। ভগ্নী! বহুকাল পূর্বে আমাদের রঘুবংশে ভগবান রামচন্দ্রের রাজ্যকালীন মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কূল পুরোহিত ছিলেন। রঘুবংশাবতংস মহারাজ রামচন্দ্রের অন্তকালের কিছুদিন পরে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও মানব চক্ষে অগেচর হন, তাহরা পর কালক্রমে ক্রমাবনতির সহিত সূর্য্যবংশে আত্মধর্মের ও অবনতি হইয়া, কেবলমাত্র বাহ্যিক আচারে পরিণত হইয়া, পরিচয়ে আর্য্য নাম মাত্র বর্তমান রহিয়াছে। ভগিনী! ভগবৎ কৃপা এবং আমার বিজয়কুমারের সুকৃতি বলে মহর্ষিরূপে ভগবানকে পাইয়াছি, ইনিও ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ সদৃশ; শুনিয়াছি, ইঁহারা সময়ে সময়ে আমাদের ন্যায় জীবের মঙ্গল জন্য প্রকাশ হইয়া থাকেন। যাহা হউক ভগ্নী, দেবর জয়ধ্বজ এবং তুমি যাহাতে আত্মকর্মের শিক্ষা পাও, তদবিষয়ে মহর্ষিকে বিশেষ অনুরোধ করিব। তবে মহর্ষির দয়া আর তোমাদের ভাগ্য। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। বিজয়কুমার আপন খুল্লতাতপত্নীর ক্রন্দন দেখিয়া ব্যতিত অন্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, কাকিমা! যাহাতে আপনাদের আত্মধর্মের (শিক্ষা) লাভ হয়, তদ্‌বিষয়ে মহর্ষির চরণ ধারণ করিয়া আপনাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন। আপনি ক্রন্দন করিবেন না, আমার জননীর বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সাম্যভাব অবলম্বন করুন।

তিনি এবম্বিদ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যবদনে কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, বৎস! তোমার মুখ নিঃসৃত মধুমাখা আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া আমার মনের এবং প্রাণের ব্যাকুলতা ভাব অন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৎস! তুমি আমাদের কুলের একমাত্র উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। আমরা তোমাকে হারাইয়া অজ্ঞানান্ধকাররূপ সংসার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দিশা হারাবৎ শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলাম। নিশাকালীন পদচারী পথিকগণের এবং জলযানস্থিত নাবিকগণের দিক নির্ণয় করিবার একমাত্র অবলম্বন ধ্রুবতারা। উহারা ধ্রুবতারাকে

লক্ষ্য করতঃ আপন গন্তব্য স্থানের দিক নির্ণয় করিয়া গমন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, কিন্তু যদি দৈববশতঃ তাহাদের ধ্রুবতারার অদর্শন ঘটে তাহা হইলে তাহারা দিক নির্ণয়ে আশক্ত হেতু পথভ্রষ্ট হইয়া বিজাতীয় কষ্ট পাইয়া থাকে,—বৎস! আমরাও তোমাকে হারাইয়া তদ্রূপ বিজাতীয় শোকে, তাপে কষ্ট পাইতে ছিলাম, অদ্য আমরা ধ্রুবতারার ন্যায় তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছি। ধ্রুবতারা উত্তর দিকেই প্রকাশ থাকে, জীবের উত্তরদিক স্থির হইলে অপর দিক নির্ণয় করিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না। বৎস! তোমাকে ধ্রুবতারার ন্যায় বলিবার অভিপ্রায়, ধ্রুবতারা নিরন্তর উত্তর দিকে বিরাজ করায় পথিকের দিক ভ্রম না হইয়া প্রকৃত পথে চলিয়া থাকে, তদ্রূপ আমরা তোমারূপ ধ্রুবতারার কল্যাণে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার কাণ্ডারী স্বরূপ আত্মোপদেষ্টা ভগবান মহর্ষির দর্শন লাভ করিয়াছি। আমরা এতদিন দিশাহারা পথিকের ন্যায় গন্তব্য স্থান করিতে পারিতেছিলাম না; বৎস! তোমার আশ্বাস বাণীতে আমি আশ্বস্ত হইলাম। আমার পক্ষে তুমিই ধ্রুবতারা স্বরূপ। ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, বৎস! তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ধ্রুবতারার ন্যায় অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিয়া আমরা যাহাতে উত্তর কালরূপ অন্তঃঅবস্থায় স্থিতি লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করিতে থাক।

কুমারের পিতৃব্যপত্নী এই সকল বাক্য কুমারকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিতেছেন, এমত সময়ে একজন পরিচারিকা শশব্যস্ত ভাবে আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা সহোদরের সহিত আগমন করিতেছেন, রাণী পরিচারিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন, সত্বর আর্য্যপুত্রের ও তৎসহোদরের বসিবার আসন আনয়ন কর। বিজয়কুমারের পিতৃব্য পত্নী রাজার আগমন বার্তা শ্রবণমাত্র কুমারকে ক্রোড় হইতে অবতরণ করাইয়া অঙ্গ রক্ষণী দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাজ্ঞীর পশ্চাদ্দেশে অবগুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরিচারিকাগণ রাজার এবং তৎসহোদরের বসিবার উপযুক্ত সুবর্ণ নির্মিত সুখাসনদ্বয় রাণী সম্মুখেই স্থাপন করিয়া রাখিল, তৎপরেই রাজা সহোদরে সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা উপস্থিত হইবামাত্র রাণী সাদর অভ্যর্থনার সহিত রাজাকে করজোড়ে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আসন গ্রহণ করুন! রাজা আসন গ্রহণ করিলে রাণী দেবরকে বলিলেন, বৎস জয়ধ্বজ! তুমি ও আসনে উপবেশন কর। রাজানুজ, রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর্য্যা! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম, আপনাদের সম্মুখে আমি আসনে উপবেশন করিতে অশক্ত, আমাকে ক্ষমা করুন। ইহা বলিয়া রাজানুজ রাজা ও রাজ্ঞীর সম্মুখে যেন রাজাজ্ঞা পালনের জন্য করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৎপরে রাজা বিজয়কুমারকে কহিলেন, বৎস বিজয়কুমার! তোমার নিকটে আমার সহোদর ভ্রাতা আর্য্যবংশাবতংস জয়ধ্বজ অপরিচিত ভাবে তোমার সম্মুখেই দণ্ডায়মান

রহিয়াছেন, ইনি তোমার পিতৃব্যদেব। বিজয়কুমার পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ আপন পিতামাতাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন পরে আপন পিতৃব্যদেবকে পূর্বোক্তভাবে প্রণাম করাণান্তর করজোড়ে কহিলেন, দেব! আমি আমার আত্মীয়গণের নিকট অপরিচিত এবং তাঁহারও আমার নিকট অপরিচিত, আমি জন্মাবধি অজ্ঞাতকুলেও অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করায়, আমার নিকট আত্মীয়গণ সকলেই অজ্ঞাত, এতাবৎকাল আমার আত্মকাহিনী পর্য্যন্ত আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল। অদ্য মহর্ষির কৃপায় আমার আত্মকাহিনী অবগত হইয়া, পরম আনন্দ লাভ করিতেছি, আপনি যে আমার পিতৃব্য দেব, তাহা এইমাত্র জনকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম। দেব! পুত্রবোধে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করতঃ কৃপাকটাক্ষে দৃষ্টিপাত করুন। তৎপরে পুনরায় পিতৃব্য ও পিতৃব্য পত্নীর চরণে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

বিজয়কুমারের পিতৃব্য, কুমারকে সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কুমারের মুখ চুম্বন করতঃ আপন ক্রোড়ে লইয়া কহিতে লাগিলেন। বৎস বিজয়কুমার! আমিও অপুত্রক, তোমাকে যে পুত্রবৎ দেখিব তাহা বলাই বাহুল্য। তুমি আমাদের বংশের একমাত্র নক্ষত্র ভূষণ চন্দ্র স্বরূপ। তোমাকে হারাইয়া আমরা শোকান্ধকারে জীবন্মৃতের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছিলাম। বৎস! তোমার জনক জননীর কথা আর কি বলিব, তুমি ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গত কল্য পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল মধ্যে একদিন ও তাঁহাদের হাস্য বদন দেখিতে পাই নাই। আমরা নানারকম জ্ঞানগর্ভবাক্য দ্বারায় ও নানাপ্রকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বারায় বা নানাপ্রকার স্তব স্তুতির দ্বারায় ও তোমার পিতামাতার আনন্দোৎপাদন করিতে সক্ষম হই নাই।

রাজা দশরথের মৃত্যু জনিত এবং রামচন্দ্রের বনগমন জনিত অযোধ্যাপুরী যেমন এক সময়ে নিরানন্দময় হইয়াছিল, তোমাভাবে আমাদের রাজপুরী ও তদপেক্ষা অত্যাধিক পরিমাণে শোকাচ্ছন্ন ও নিরানন্দময় হইয়াছিল। যদি বল, অযোধ্যার ঘটনাপেক্ষা অধিক নিরানন্দভাব হইবার কারণ কি? তদুত্তরে আমি বলিতেছি, অযোধ্যাবাসীগণের এবং রামচন্দ্রের পিতামাতার ধারণা ছিল যে, একদিন রামচন্দ্র পুনরাগমন করিবেন; কিন্তু আমাদের মনে সে ধারণা কাহারও ছিল না, কারণ আমরা নিশ্চিত জানিয়েছিলাম, বুদ্ধি দোষে আমাদের কর্তৃকই পুত্ররত্ন বিনষ্ট হইয়াছে, আমরাই পুত্রকে হত্যা করিয়াছি। সুতরাং অযোধ্যার ঘটনাবলির সহিত আমাদের ঘটনার তুলনা হয় না, একারণ আমি অযোধ্যার শোকাবহ ঘটনাপেক্ষা আমাদের বংশের ঘটনাকে অত্যধিক শোকাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তোমাকে পুনঃ পাইবার আশা আমাদের ছিল না; অদ্য আমাদের ছিল না; অদ্য আমাদের পুরীতে বিজয়চন্দ্ররূপ নক্ষত্র ভূষণ পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ হওয়ায় অমানিশা সদৃশ শোকান্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় চকোর যেমত পূর্ণচন্দ্রের কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া সুধাবারি পানের আশায় চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে তদ্রূপ আমরাও পুরবাসী সকলে বিজয়কুমাররূপ কলঙ্কবিহীন চন্দ্রের মুখকান্তি অবলোকন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছি। এ আনন্দ মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। বৎস বিজয়! আমাদের বংশের রীতি আছে, রাজটীকা ব্যতীত কেহ রাজ আখ্যা প্রাপ্ত হন না। তোমা বিহনে তাহা লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এক্ষণে যাঁহার কৃপায় নির্বাণ প্রায় বংশপ্রদীপ পুনরায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল, তাঁহার চরণে আমার একমাত্র নিবেদন তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। ইহা বলিয়া বিজয়কুমারের পিতৃব্যদেব বারম্বার কুমারের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র। আমার একটি প্রার্থনা আছে; আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে আপনার পাদপদ্মে নিবেদন করি। রাজা কহিলেন, রাজ্ঞী! তোমার ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা সাধ্যমত পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। রাণী কহিলেন, আর্য্যপুত্র! মহর্ষি আমাদিগকে উপদেশ দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমার বাসনা, বৎস জয়ধ্বজ ও সস্ত্রীক মহর্ষির নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হন, ইহা আপনার ভ্রাতৃজায়ারও একান্ত ইচ্ছা, আমি তাঁহারই নিকট হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে আমার পুত্রতুল্য দেবর এবং কনিষ্ঠা ভগিনীতুল্য দেবরপত্নী উপদেশ প্রাপ্ত হন আপনি মহর্ষিকে বলিয়া তাহার উপায় বিধান করুণ। ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।

রাজা রাণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাহস্যে কহিলেন, আমি অনুজ জয়ধ্বজকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষির সান্নিধ্যে গিয়াছিলাম, শ্রীমানের সহিত মহর্ষির পরিচয় করিয়া দিয়া শ্রীমান যাহাতে সস্ত্রীক উপদেশ প্রাপ্ত হন তদ্‌বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করায় মহর্ষিও ইহাদিগকে উপদেশ দান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাণী, বিজয়কুমার ও বিজয়কুমারের পিতৃব্যপত্নী আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে রাজা রাজ্ঞীকে বলিলেন যে, অদ্য রাত্রেই মহর্ষি আমাদিগকে উপদেশ দিবেন। তোমরা প্রস্তুত থাকিও, মহর্ষির আজ্ঞা পাইলেই তোমাদিগকে সংবাদ দিব। সংবাদ পাইবামাত্র তোমরা মহর্ষি যে গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন তথায় উপস্থিতি হইও। এক্ষণে আমরা কার্য্যান্তরে গমন করি; ইহা বলিয়া রাজা অনুজ ভ্রাতার সহিত গমন করিলেন। রাজানুজ জয়ধ্বজ রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া রাজার সহিত গমন করিলেন।

বিজয়কুমারের পিতৃব্যপত্নী রাজমুখে মহর্ষির আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল নলিনীর ন্যায় প্রশান্ত অন্তঃকরণে কুমারকে আপন ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাজ্ঞী পার্শ্বে উপবেশন করতঃ বলিতে লাগিলেন, দিদি! অদ্য আপনার কৃপায় এবং বিজয়কুমারের কল্যাণে আমার জন্ম সার্থক! মহর্ষি আমাদিগকে উপদেশ দান করিবেন, ইহা শ্রবণ করিয়া

আমি যে কত আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা মুখে প্রকাশ করিতে অক্ষম। দিদি আপনার চরণে আমার ইহাই মিনতি সহকারে নিবেদন যে, এইরূপ কৃপা যেন আমার প্রতি চিরদিন বর্তমান থাকে। রাণী কহিলেন, প্রিয় ভগিনী! তোমার প্রতি আমার স্নেহ চিরকালই থাকিবে এবং তোমাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিয়াও আসিতেছি, তোমার উপদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমি আর কি বলিয়াছি, আমার বলিবার পূর্বেই আর্য্যপুত্র মহর্ষিকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করায়, মহর্ষি কৃপা করিয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া আমিও বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা মহর্ষির কৃপায় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সফল কাম হও, ইহাই ভগবান সমীপে প্রার্থনা করি।

কথোপকথন করিতে করিতে দিবা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, এমত সময়ে একজন পরিচারিকা একটি বেণু শাখার উপরে বক্রাকৃতি লৌহ শলাকার নিম্নভাগে সংলগ্ন প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, ও গৃহ মধ্যস্থিত প্রাচীর গাত্রে যে সকল উভয় শাখাযুক্ত কাঁচ নির্মিত দীপাধারগুলিতে মোমবর্ত্তিকা সজ্জিত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেই সকল দীপাধারগুলি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া পরিশেষে গৃহের উপরিভাগে কড়িকাষ্ঠে সংলগ্ন কারুকার্য বিশিষ্ট বহু শাখাযুক্ত দীপাধার মধ্যস্থিত মোমবর্ত্তিকাগুলিও ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল, ইহাতে গৃহটি অপূর্ব শোভাধারণ করিল। বিজয়কুমার অনিমেষলোচনে দীপাধারগুলির চাকচিক্যশতা অবলোকন করিতেছেন, আর স্বীয় অদৃষ্ট চক্রের অভাবনীয় ঘটনাবলি মনে মনে ভাবিতেছেন; মনে করিতেছেন যে, এক্ষণে আমার আর কোন ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, পার্থিব সকল ঐশ্বর্য্যই লাভ হইয়াছে সত্য কিন্তু বর্তমান রাজ ঐশ্বর্য্য আমার ভবিষ্যতে রক্ষা করা কি সম্ভব হইবে, কারণ আমার যৌবন এবং প্রভূত্ত্ব যে সময় আগমন করিবে, সে সময় আমার অবিবেকতা বর্তমান থাকিলে এই অতুল রাজ ঐশ্বর্য্য আমর যৌবনরূপ স্রোতে ভাসিয়া গিয়া পরিণামে আমাকে এবং ধনের সহিত আমার প্রাণকেও বিনষ্ট করিবে, একারণ অবিবেক হেতু এই বর্তমান রাজ ঐশ্বর্য্য আমার পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করিবে বলিয়া অনুমান হইতেছে। এক্ষণে যাহাতে বিবেকরূপ রত্নলাভ করিতে পারি, তদবিষয়ে আমার সতত চেষ্টা থাকা চাহি। এই বর্তমান রাজ ঐশ্বর্য্য বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে।

বিজয়কুমার এই সকল বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময়ে রাজঅন্তঃপুরচারিণীরা শঙ্খধ্বনি দ্বারা সন্ধ্যা সমাগম জ্ঞাপনের সহিত সন্ধ্যার উপাসনার জন্য সকলকে যেন সাঙ্কেতিক বার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। রাণী শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবৎ উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, বিজয়কুমারও পিতৃব্যপত্নীর সহিত প্রণাম করিলেন। কুমার প্রণামান্তর জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। বলা বাহুল্য, বিজয়কুমারের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অদৃষ্ট চক্রের গতি শক্তি কর্তৃক তাহার

মনও শুভ বিষয়েই ধাবিত হইতেছে, এক্ষণে মাতৃক্রোড়ে আসীন হইয়া নিজ অদৃষ্ট বিষয়েই ভাবিতেছেন। বিজয়কুমার মনে মনে ভাবিতেছেন, অদৃষ্টচক্র পরিবর্তনশীল। সুখ দুঃখ চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে, কখন সুখ, কখন বা দুঃখ, ইহা অবশ্যম্ভাবী জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে, দুঃখও কাহার চিরস্থায়ী নহে, সুখও কাহার চিরস্থায়ী নহে, ধর্মাধর্ম, পাপ, পুণ্য, ইহাও অদৃষ্টের ফল স্বরূপ, ইহাও চক্রবৎ পরিবর্তনশীল। জীব মাত্রেরই জীবনের মধ্যে কোন এক সময় নিশ্চয় ভাল অবস্থা অদৃষ্ট কর্ত্তৃক আসিয়া থাকে। অদৃষ্ট—যাহা দেখা যায় না, তাহাই অদৃষ্ট, ইহা সাধারণ জীবের লক্ষ্যের অতীত, এই (বর্তমান) দৃষ্টির অগোচর রূপ অদৃষ্ট কর্ত্তৃকই জীবের যাবতীয় বিষয় নির্বাহ হইতেছে; জীবের ভাল অবস্থা আগমন করিলে জীব ভাবিয়া থাকে, আমার এই ভাল অবস্থায় আজীবন কাটিবে, অদৃষ্টের প্রলোভনে পড়িয়া অসৎ উৎসাহের বশীভূত হইয়া পুনরায় কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয় বিষয়ে এবং আসুরিক ভাবে আসক্তিই অসৎ ভাব, তাহাতে রমণ করার দরুণ, কোন সময় অদৃষ্ট কর্ত্তৃক শুভ অবস্থা আসিলেও অসৎ পুরুষকার কর্তৃক ঘুর্ণায়মান চক্র দণ্ডের পরিবর্তনে শুভ অবস্থা পরিবর্তন করাইয়া জীবকে পুনরায় যথা পূর্বং তথা পরং করাইয়া থাকে। অদৃষ্ট সৎ পুরুষকার ব্যতীত চালিত হইলে, জীবের শুভ অবস্থা ও অশুভে পরিণত হইয়া থাকে। পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র অদৃষ্ট কর্ত্তৃক শুভ বা অশুভ কোন ফল পাওয়া যায় না, সৎ পুরুষকার দ্বারায় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসৎ ইচ্ছারূপ অসৎ পুরুষকার দ্বারা জীবন অশুভফলই পরিণামে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈবই একমাত্র অদৃষ্ট পদবাচ্য। কারণ দৈব আকাশের অন্যায় বর্তমান মনের এবং দৃষ্টির অগোচর বিষয় হওয়ায় দৈবকেই অদৃষ্ট কহা যায়। অর্থাৎ যাহা সাধারণের অদৃষ্ট (ন-দৃষ্ট) পদার্থ, তাহাই দৈব। এই দৈবকে সাধারণে অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রান্তভাবের বশতা প্রযুক্ত ইহাকেই অদৃষ্ট (অলক্ষিত বিষয়) বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ দৈবই একমাত্র অদৃষ্ট বিষয়। তাহার পর ভাগ্য ভজ্— ভাগ করা, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় শূন্য স্বরূপ স্থির প্রাণ, যে ঘটে যেরূপ ভাবে প্রকাশ আছেন তাহাকেই (স্থির প্রাণের প্রকাশ ভাবকেই) ভাগ্য কহা যায়। ইহা দ্বারাই জীবের শুভাশুভ কর্ম পুরুষকার সংযোগে হইয়া থাকে। বিজয়কুমারের মনে এইরূপ নানারকম তর্কবিতর্ক হইতেছে।

বিজয়কুমার ভাবিতেছেন, যদি পুরুষকার সংযোগেই দৈব বা অদৃষ্টে কার্য্যে হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার (বিজয়কুমারের) রাজপুত্রে পরিণত হওয়াতে কোন পুরুষকারের কার্য্য দেখিতে পাইতেছি না। ইহা সম্পূর্ণ আমার অদৃষ্ট কর্তৃকই হইয়াছে। বিজয়কুমার আবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে ইহাতেও পুরুষকার রহিয়াছে, কারণ দৈব এবং পুরুষকার দ্বারাই আমার (বিজয়কুমারের) জনম হইয়াছে, রাজার পুত্রই

রাজা হইয়া থাকে, রাজা দৈব এবং পুরুষকার সংযোগে আমাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, রাজা দূরদৃষ্ট বশতঃ এবং অসৎ পুরুষকারের বশীভূত হইয়া আমাকে ঘাতক হস্তে অর্পণ করেন, আমার অদৃষ্ট বশতঃ এবং আমার রূপলাবণ্য ও বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া ঘাতকগণ আমাকে বধ করিতে বিরত হয়। এখানে রূপলাবণ্যই আমার পুরুষকার, কারণ দৈবের কোন রূপ নাই, দৈব রূপাতীত। যাহা দ্বারা কার্য্য হয়, তাহাই পুরুষকার বা প্রকৃতি। প্রকৃতিই পুরুষকার পদবাচ্য। প্রকৃতি রূপাতীত বা গুণাতীত নহেন। ঘাতকগণ আমার রূপলাবণ্য দেখিয়াই আমাকে বধ করে নাই; সুতরাং আমার রূপলাবণ্য আমার অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের কার্য্য করিয়াছে, বালকের অপর পুরুষকার থাকা অসম্ভব। পুরুষকার অদৃষ্টের সহিত নানা ভাবে মিলিত হইয়া এক দেহ হইতে অপর দেহেও কার্য্য করিয়া থাকে, যেমন আমরা রাজপুত্রে পরিণত হইয়া ইহা আমার অদৃষ্ট; কিন্তু পুরুষকার ব্যতীত ইহা হইবার নহে বলিয়া এতদিন ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই, ইহাও কাল সাপেক্ষ, সময় উপস্থিত হইলে, অদৃষ্টের সহিত পুরুষকার সংযোগ হইয়া শুভাশুভ কার্য্য হইয়া থাকে। আমার রাজপুত্রের পরিণত হইবার সময় উপস্থিত হইলে, আমার অদৃষ্টের সহিত মহর্ষির পুরুষকার সংযোগ হইয়া আমি রাজকুমাররূপে আজ রাজলক্ষ্মীরূপা জননীর ক্রোড়ে আসীন হইতে পারিয়াছি। নচেৎ যদি আমার অদৃষ্টের সহিত মহর্ষির পুরুষকার সংযোগ না হইত, তবে নিশ্চয়ই যে আমার বর্তমান অবস্থা সুদূর পরাহত হইত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

বিজয়কুমার মনে মনে এই সকল ভাবিতেছেন এবং অদৃষ্টও পুরুষকারের অসাধারণ অঘটন, ঘটন পটুকতা সন্দর্শনে বিস্মৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে উভয় শক্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া গৃহস্থিত প্রজ্জ্বলিত দীপগুলির শোভা দেখিতেছেন, এমত সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া রাজ্ঞীকে করজোড়ে সম্বোধন করতঃ কহিল; আর্য্যা! মহারাজ অনুমতি করিলেন, আপনি মহারাজের ভ্রাতৃজায়ার সহিত যুবরাজকে এবং যুবরাজের পালক মাতাকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষির সন্নিধানে গমন করুন। রাজ্ঞী পরিচারিকাকে বলিলেন, তুমি আর্য্যপুত্রকে আমার প্রণাম জানাইয়া জ্ঞাপন করিবে, আমরা শীঘ্রই মহর্ষি সন্নিধানে গমন করিতেছি, পরিচারিকা রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া মহারাজকে সংবাদ দিবার জন্য চলিয়া গেল।

তৎপর রাজ্ঞী অপর একজন পরিচারিকার নাম উল্লেখ করিয়া কহিলেন, বিজলী! তুমি কুমারের পালকমাতাকে তাঁহার মহল হইতে সম্মানের সহিত আমার নিকটে আনয়ন কর। বিজলী রাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ রাণীকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে কুমারের পূর্বমাতাকে আনয়ন জন্য গমন করিল। রাজ্ঞী বিজয়কুমারকে আপন ক্রোড় হইতে নামাইয়া কুমারের পিতৃব্যপত্নীকে কহিলেন, ভগ্নী এইবার আমাদিগকে মহর্ষি

সন্নিধানে যাইতে হইবে, সম্ভবতঃ মহর্ষি এই সময়ে আমাদিগকে উপদেশ দান করিবেন। দেখ ভগ্নী! যিনি উপদেশ দান করিয়া থাকেন, তিনি গুরু; তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করা এবং তিনি যাহা বলিবেন তাহা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করা চাহি, উপদেশ গ্রহণ করা নিতান্ত সহজ মনে করিবে না। অনেক সময় অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়া উপদেশ মত কার্য্য করেন না, কারণ উপদেশ গ্রহণ কালীন যদি পার্থিব পদার্থে মন গমন করিতে থাকে, তাহা হইলে গুরুবাক্যয় (শ্রদ্ধার সহিত) মন না থাকায়, গুরুবাক্য সম্যক প্রণিধান হয় না, মনের চঞ্চলতা বশতঃ গুরু প্রদত্ত বিষয়গুলি উপলব্ধি না হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে উপদেশ গ্রহণ করা হয় না। অতএব ভগ্নি, উপদেশ গ্রহণ কালীন যতটা সক্ষম হও, মনকে সংযতভাবে রাখিয়া গুরু উপদেশ বাক্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে। রাণী কুমারকেও সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমিও উক্ত প্রকারে গুরুপদেশ প্রাপ্তি সময়ে মনকে পূর্বোক্ত মত রাখিবার চেষ্টা করিবে। বিজয়কুমার মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা বলিলেন, আমি সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিব। বিজয়কুমারের পিতৃব্যপত্নীও রাজ্ঞীকে কহিলেন, দিদি, আপনি যাহা বলিলেন আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম এবং সাধ্যমত আপনার বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট থাকিব।

তাহার পর পূর্বোক্ত বিজলী নামক পরিচারিকার সহিত বিজয়কুমারের পালক মাতা আসিয়া রাজ্ঞীকে প্রণাম করিল, তৎপরে বিজয়কুমারকে সস্নেহে আদরের সহিত মুখচুম্বন করিতে করজোড়ে রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আর্য্যা! দাসীকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করুণ। দাসী আপনার আজ্ঞা পালনে সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে। রাণী কহিলেন, ভগ্নী, আমি তোমাকে দাসী বোধ করি না, তুমি আমার সহোদরা ভগ্নীর ন্যায়। তোমা কর্তৃক আমি প্রাণতুল্য হারাধন অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমা কর্তৃক আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে, অতএব তুমি আমার সোদরা ভগ্নী। যাহা হউক তোমার বিনীত বাক্যে আমি অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছি। ভগ্নী! তুমি আর কখনও আপনাকে আপনি দাসী বোধ করিও না, ইহাই আমার অনুরোধ। ভগ্নী! আর্য্যপুত্র আমাদের সকলকে মহর্ষি সন্নিকটে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, চল আমরা সকলে বিজয়কুমারের সহিত মহর্ষি সন্নিধানে গমন করি।

রাজ্ঞী, বিজয়কুমারের পিতৃব্যপত্নীও পালক মাতার হস্ত ধার করিয়া চলিলেন। বিজয়কুমারের পালক মাতা কুমারকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া রাজ্ঞীর হস্ত ধারণপূর্বক যাইতে লাগিলেন, তাঁহারা সকলে সম্মুখস্থ বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিজয়কুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে (বারান্দায়) আসিয়া দেখিলেন, অন্তঃপুর রক্ষিকা যামিকাগণ অসি হস্তে স্থানে স্থানে আপন রক্ষা কার্য্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; ইহারা দিবাভাগে

এরূপ থাকে না, রাত্রির প্রথম যাম যাইতে চতুর্থ যাম পর্যন্ত আপন আপন পর্য্যানুযায়ী অন্তঃপুর রক্ষা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, প্রধান মন্ত্রী এবং কোন আত্মীয় পুরুষ ব্যতীত অপর পুরুষের অন্তঃপুর প্রবেশাধিকার নাই। বিজয়কুমার এই সময়ে তাঁহার পালক মাতাকে কহিলেন, মা আমাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিন, আমি পদব্রজেই গমন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া বিজয়কুমারের পালক মাতা কুমারকে নিজ ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া রাজ্ঞীর সহিত চলিলেন। চারজন পরিচারিকা ও রাজ্ঞীর সহিত আজ্ঞা পালন জন্য যাইতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী যাইতে যাইতে ক্ষণিক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়কুমারের পালক মাতাকে কহিলেন, ভগ্নী, অদ্য এই সকল স্থান দীপালোক দ্বারায় আলোকিত হইয়াছে, এই সকল স্থান আমার কুমারের জন্মের পর দুর্ঘটনার সময় হইতে গতকল্য পর্য্যন্ত প্রায় অন্ধকারেই থাকিত, কোন রকমে কার্য্য চালাইবার মত দুটি একটি মাত্র দীপালোক থাকিত। উজ্জ্বল আলোক দেখিলে মনে বড়ই কষ্ট হইত, একারণ দীপালোক সামান্যমাত্র প্রজ্জ্বলিত থাকিত। ভগ্নী, সেদিন গত হইয়া আজ শুভদিন হইয়াছে, অদ্য আমার প্রাণধন কুমারের আগমনে দীপালোক দেখিয়া মান পুলকিত হইতেছে। এই সকল যামিকগণও আনন্দ মনে প্রহরীর কার্য্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের মুখেও একদিনের জন্য আনন্দ ভাব প্রকাশ হইত না। অদ্য আমাদের কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। চল ভগ্নী, এক্ষণে মহর্ষি সন্নিকটে গমন করি, ঐ সম্মুখস্থ গৃহেই মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন।

বিজয়কুমারের পূর্বমাতা রাণীকে বলিলেন, 'আর্য্যা! আপনাদিগের চরণ দর্শন করিয়া আমারও জন্ম সার্থক হইল; আমার ভাগ্যে যে এই রাজসম্মান প্রাপ্তি হইবে তাহা আমার মন এবং বুদ্ধির অগোচর। আমি এরূপ রাজ অট্টালিকা কখনও দেখি নাই এবং আমার অদৃষ্টে যে এই রাজ অট্টালিকায় বাস করা ঘটিবে, তাহা স্বপনেও কখনও ভাবি নাই বৎস বিজয়কুমারের প্রারব্ধ বশতঃই আমাদের এই শুভ সংযোগ হইয়াছে, ভগবান মহর্ষির কৃপায় বিজয়কুমার দীর্ঘজীবন লাভ করুক। বিজয়কুমারের পূর্বমাতা এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে কতকগুলি রাজপুরমহিলা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীকে অভিবাদনপূর্বক কুমারের মুখ চুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। রাণী ইহাদিগকে শিষ্টাচারের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আমরা এক্ষণে মহর্ষিকে প্রণাম করিতে যাইতেছি, তথা হইতে আসিয়া আপনাদের সহিত কথাবার্তা করিব। ইহা বলিয়া একজন পরিচারিকাকে কহিলেন, তুমি ইহাদিগকে সম্মানের সহিত আমার রম্যগৃহে লইয়া গিয়া উপবেশন করাও, আমি শীঘ্র আসিয়া ইহাদের সহিত যোগদান করিব। পরিচারিকা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রম্যগৃহে লইয়া গেল।

তৎপরে সকলে মহর্ষির গৃহে উপনীত হইয়া, ভূমিলিপ্ত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম

করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি সকলেই সস্নেহ অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহারা পার্শ্বস্থ গৃহে গিয়া বসিয়া রহিলেন। তৎপরে মহর্ষি বিজয়কুমারকে কহিলেন, বৎস বিজয়! তুমি আমার নিকটে উপবেশন কর, বিজয়কুমার মহর্ষির নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন। গৃহ মধ্যে কেবলমাত্র বিজয়কুমারের পালক পিতা, পিতৃব্যদেব ও পিতা (রাজা) উপস্থিত ছিলেন; অপর কেহই মহর্ষি সন্নিকটে ছিল না, সকলে গৃহ মধ্যে উপবেশন করিলেন পর মহর্ষি কহিলেন, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও; মহর্ষির আজ্ঞামাত্রে বিজয়কুমারের পিতৃব্যদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে মহর্ষি রাজাকে কহিলেন, আপনি বিজয়কুমার এবং আপনার ভ্রাতার সহিত আমার সম্মুখে উপবেশন করুন। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই মহর্ষির সম্মুকে আসমোপরি উপবেশন করিলেন এবং বিজয়কুমারের পালক পিতা তাঁহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন।

মহর্ষি প্রথমতঃ বিজয়কুমার, বিজয়কুমারের পালক পিতা, রাজা এবং রাজভ্রাতাকে তিনটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন, প্রথম প্রতিজ্ঞা—পর স্ত্রী মাতৃবৎ জ্ঞান করা, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—মহর্ষি যে যোগ ক্রিয়া দেখাইয়া দিবেন আজীবন সেই কার্য্য করিয়া চলা, তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—সাধন সমরে জয়ী না হওয়া পর্য্যন্ত এবং মহর্ষির আজ্ঞা ব্যতীত, ক্ষুর দ্বারা কণ্ঠ ছেদন করিলেও অপরকে এই যোগ ক্রিয়া না বলা। গোপনে এই ক্রিয়া না করিলে কার্য্যসিদ্ধ বিষয়ে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া কার্য্য ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। একারণ বিশেষ সতর্কভাবে অতি গোপনে কার্য্য করা বিশেষ আবশ্যক নচেৎ বৃথা প্রয়াস জানিবেন। মহর্ষি এই কথা বলিয়া পরে বলিলেন, যে কার্য্য আমি দেখাইয়া দিব ইহা বিশেষ গোপন ভাবে করিবেন। মহর্ষির বাক্য শেষ হইলে রাজা এবং রাজার ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, আমরা আপনার বাক্য মত তিনটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

তৎপরে মহর্ষি বলিলেন, ঋতু রক্ষার্থে আপন ভার্য্যাতে গমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নারীগণের ঋতুকাল ষোড়শদিন পর্যন্ত, তন্মধ্যে শ্রাবযুক্ত তিন দিবারাত্র অতিশয় নিন্দিত, এই সময়ে গমন করিলে পতির আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে এবং পতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্তও হইতে পারেন, একারণ প্রথম তিন দিবস গমন নিষিদ্ধ জানিবেন। উক্ত তিন দিবস ব্যতীত অপর দিন ঋতু রক্ষার্থ প্রশস্ত কাল। প্রশস্ত কালই হউক আর অপ্রশস্ত কালই হউক, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, একাদশী প্রভৃতিতে গমন একেবারে নিষিদ্ধ, উক্ত তিথিতে গমন করিলে চন্দ্র সূর্য্যের গুণাদি কর্ত্তৃক আয়ুঃ তেজ এবং বলের হানি হইয়া থাকে এবং নারীগণও রুগ্না হইয়া থাকেন, একারণ উহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কামে উন্মত্ত হইলেও রজোদর্শনের কালে তিন দিবস গমন নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসেও শ্রাবযুক্ত থাকিলে গমন নিষিদ্ধ, নারীগণ চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া

শুদ্ধ হইলে গমন চলিতে পারে, কিন্তু চতুর্থ দিবসও প্রশস্ত কাল নহে। ঋতু একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রিও প্রশস্ত কাল নহে, একারণ নিষিদ্ধ। এই সকল দিনে উত্তম পুত্র জন্মে না। পুত্রার্থীগণের উক্ত অপ্রশস্ত দিনে গমন না করাই যুক্তিযুক্ত। তিন দিন রাজোশ্রাবযুক্ত অবস্থায় গমন একেবারে নিষেধ জানিবেন এবং তিনদিন পত্নীর সহিত এক শয্যাতে শয়নও করিবেন না, কারণ অসংযমী পুরুষের পক্ষে তাহা শ্রেয় নহে, অমঙ্গলকর; সংযমী, জিতাত্মা পুরুষের পক্ষে কোন নিষেধ বিধি নাই, তত্রাচ তাঁহারাও লোক শিক্ষার জন্য যথা বিধি কার্য্য করিয়া দেখাইয়া থাকেন। যে পুরুষ পুষ্পিতা পত্নীতে গমন করেন, তাঁহার বুদ্ধি, তেজ, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস ও বলহানি হইয়া থাকে এবং শুক্র তারল্য বশতঃ উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া ক্রমশঃ আয়ুক্ষীণ হওয়ায় অকালে কালকবলেও পতিত হইয়া থাকেন। পর দারার প্রতি আসক্ত না হইয়া আপন ভার্য্যার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকা মানবের একান্ত কর্তব্য। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রার্থী হইয়া অবশ্যই ঋতু রক্ষার্থ ভার্য্যা গমন করিবে, নচেৎ পাপ আশ্রয় করিবে।

সাধারণ ব্যক্তিই হউন কিম্বা সাধকই হউন, সকলেরই সস্ত্রীকভাবে থাকা নিতান্ত কর্তব্য নচেৎ ব্যভিচার গ্রস্ত হওয়া সম্ভব। একেবারে স্ত্রী বিহীন অবস্থায় থাকিলে স্বপ্ন দোষাদি বশতঃ ধাতু ক্রমশঃ তরল হইয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত নিশ্চয়ই হইতে হয়, স্ত্রী পুরুষ জড়িতভাবে থাকা পরমাত্মার অভিপ্রেত-বিশেষ সাধকের পক্ষে; পত্নী সময়ে পতিকে রক্ষা করেন এবং পতিও সময়ে স্ত্রীকে পাপকর্মরূপ ব্যভিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করেন, স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নচেৎ কাহার ব্যভিচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের পর উপায় নাই। ভার্য্যার প্রীতির জন্য পতি অনাসক্ত ভাবে ঋতুকাল ভিন্ন ও গমন করিতে পারেন, তাহাতে সাধনা বা ব্রহ্মচর্য্যের হানিরূপ পাপ হইবে না। গ্রীষ্মকাল হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত মাসান্তে একদিন, নিতান্ত অশক্ত পক্ষে মাসান্তে দু'দিন। শরৎকালে বা হেমন্তে বা বসন্তে সপ্তাহে একদিন, অশক্ত পক্ষে দু'দিন হইতে নরনারীগণের আয়ু, তেজ, বল, বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সাধকের সাধন মার্গের কোন ক্ষতি হয় না, বরং উপকারী। উক্ত ভাবে গমনে কোন প্রকার স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। নারীজাতি বন্ধের কারণ নহে, নারী জাতির প্রতি আসক্তির সহিত ব্যভিচারই বন্ধের কারণ। সাধন কালীন আপন পত্নীকে বামে বসাইয়া সস্ত্রীক আত্মকর্মের সাধন করা সাধকের নিতান্ত কর্তব্য। স্ত্রী বিহীন অবস্থায় সাধকের সাধন সম্বন্ধে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া, সাধন হইতে সাধককে বিচ্যুত করিবার সম্ভাবনা বেশি, একারণ সস্ত্রীক সাধন করাই কর্তব্য— "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। অতএব স্ত্রী সম্বন্ধে এই সকল উপদেশ বাক্য স্মরণ রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন। সর্বদা আপনাকে আপনি অনুরোধে জীবমাত্রেই আমার গুরু, এইরূপ বিবেচনা করিবেন।

মহর্ষি এই সকল উপদেশ বাক্য বলিয়া, বিজয়কুমারকে রাজধানী আগমন কালে যে সকল কার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয় মৌখিক বলিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের কার্য্য যৌগিক বিধি অনুযায়ী নিজে করিয়া একে একে যোগ কৌশলরূপ ক্রিয়া সকল দেখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে আত্মধর্ম করণের অভ্যাস করাইয়া, কার্য্যের অবস্থা সকল অনুভব করাইয়া দিলেন। রাজা পরীক্ষিতকে শুকদেব যেমত আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করাইয়া দিয়াছিলেন, সেই ভাবে মহর্ষিও সকলকে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করাইয়া দিলেন।

তাহার পর মহর্ষি বিজয়কুমার প্রভৃতিকে একটি ক্রিয়ার অভ্যাস করাইয়া তাহার অবস্থা অনুভব করাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহাই ব্রহ্মযোনি স্বরূপ দ্বারযন্ত্রের (কুলুপের) উদঘাটনী কুঞ্চিকা বা চাবিস্বরূপ জানিবে। দেহের উর্দ্ধে যে স্থানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে, ঐ মেরুদণ্ডের শেষ সীমার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে (যাহা অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করাইলাম) ইহা অবস্থিত। উক্ত স্থানে মনের স্থিতি হইলে ঐ কুঞ্চিকারূপ অবস্থা উপলব্ধি হইয়া থাকে। শব ছেদ করিয়া এই ব্রহ্মযোনি (মেডুলা অবলঙ্গেটা) এবং দ্বিদলপদ্ম আজ্ঞাচক্র—অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাওয়া সম্ভব। ইহার সন্ধিস্থলকেই গুরুদ্বার বা হরিদ্বার কহা যায়, এই স্থানকে ত্রিবেণী সঙ্গমও কহা যায়, বেণী অর্থে প্রবাহ বা ধারা বুঝিতে হইবে। উক্ত সন্ধিস্থলের উর্দ্ধের দ্বার রোধ থাকায়, বায়ুর গতি ঐ সন্ধিস্থলের বাম ভাগ দিয়া যাহা হইতেছে, এই বাম মার্গকে ঈড়া নাড়ী কহে, এই ঈড়া নাড়ীস্থিত বায়ুর প্রবাহ যাহা নদীরূপে চলিয়াছে, উক্ত প্রবাহকে গঙ্গা কহে; মধ্যে সুষুন্না নাড়ীস্থিত গুপ্ত বেণীকে সরস্বতী কহা যায়। উপরোক্ত সন্ধিস্থলের দক্ষিণ দিকরূপ পিঙ্গলা নাড়ীতে যে বায়ুর প্রবাহ নদীরূপে চলিয়াছে, এই প্রবাহ অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা মধ্যস্থিত বায়ুর প্রবাহ যমুনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থলেই সুষুন্না বা সরস্বতী।

এই সুষুন্নার উর্দ্ধে (সুষুন্নার শেষ সীমায়) ব্রহ্মযোনি অবস্থিত; এই ব্রহ্মযোনিরূপ দ্বার চন্দ্র (শরীরস্থ বায়ুর বর্হিভাগে গতি থাকা হেতু) সঙ্কোচ হইয়া রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, পূর্বোক্ত অবস্থা লাভরূপ কুঞ্চিকা (চাবি) দ্বারায় ব্রহ্মযোনি দ্বারযন্ত্র (কুলুপ) খুলিতে হইবে; উপরোক্তরূপ কুঞ্চিকা (উক্ত অবস্থারূপ চাবি) অন্তর্ম্মুখীন শব চালনারূপ প্রাণায়াম ক্রিয়া ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি কেবল ঐ (কুঞ্চিকারূপ) অবস্থার আভাস মাত্র অনুভব করাইয়া দিলাম, আপনাদের যখন অন্তর্ম্মুখীন প্রাণকর্ম দ্বারা বর্তমান প্রাণ কর্মের মধ্যাবস্থার অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হইবে বা উক্ত অবস্থা যখন বিশেষরূপে অনুভব হইবে, তখন আপনাদের এই অবস্থারূপ কুঞ্চিকা (চাবি) দ্বারা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে কোনরূপ ক্লেশ হইবে না। পরমাত্মা সমীপে যাইবার পথের দ্বার উদ্‌ঘাটনযন্ত্র যাহা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা উক্ত অবস্থারূপ দ্বার উদ্‌ঘাটনী কুঞ্চিকাই আপনা আপনি দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে। তৎপরে অন্তর্ম্মুখীন প্রাণকর্ম

যেরূপ উজান ভাবে ষট্‌চক্রের পথে গমনাগমন করিতে হইবে, তাহা মহর্ষি নিজে কার্য্য করিয়া সকলকে দেখাইয়া দিলেন এবং অপর কয়েকটি কৌশলও দেখাইয়া দিয়া সারগর্ভ উপদেশ বাক্য সকলকে বলিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, আপনারা এই কর্ম কামনা রহিত হইয়া করিবেন, কারণ ইহা নিষ্কাম কর্ম, এই কর্মের কোন কামনা নাই, ইহা স্বতঃই কামনা রহিত হইয়া আপনা আপনি কৃত হইয়া থাকে! এই কর্মই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম, ইহা ব্যতীত সমস্ত কর্মই রাজসিক বা তামসিক কর্ম; বাহ্যিক কর্ম, কামনা ব্যতীত নাই, সুতরাং তৎসমুদায় সকাম কর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত অবস্থাকে (যে অবস্থাকে কুঞ্চিকা শব্দে উল্লেখ করিলাম) পরমাত্মা বোধে উহার উপর প্রেম রাখিয়া কার্য্য করিবেন। আমি যে কর্ম দেখাইয়া দিলাম, তাহা যাহাতে সুখ বোধ হয়, এমত আসনে ও যাহাতে মনঃস্থির হয় এমত বিঘ্ন রহিত স্থানে উপবেশন করিয়া নিত্য সাধন করিয়া চলিবেন। সাধন কার্য নিত্য প্রাতে সূর্য্য উদয়ের এক প্রহর পূর্বে এবং স্নানের পর মধ্যাহ্নে ও সূর্য্য অস্তের পর সন্ধ্যা সময়ে, এই ত্রিকালে তিনবার সুখসানে উপবেশন করিয়া পূর্বোক্ত ভাবে করিয়া যাইবেন। সাধনকালীন রাজসিক এবং তামসিক আহার বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন; সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিবেন। অধিক ভোজনও করা চাহি না এবং অত্যল্প আহারও করা চাহি না, বা উপবাস করাও উচিত নহে; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবেন না এবং ইন্দ্রিয়ের সেবা আসক্তির সহিতও করিবেন না। পূর্বোক্ত অবস্থাতে মনকে রাখিয়া ইন্দ্রিয় সমুদায়ের কার্য্য সকল পূর্বোক্ত অবস্থাকে লক্ষ্য রাখিয়া করিলে কোন ক্ষতি হয় না; অযথা শুক্রক্ষয় করা চাহি না এবং একেবারে শুক্র ধারণ ও করিবেন না। প্রথমতঃ শুক্র ধারণ একেবারে কাহারও হয় না, তবে ব্যভিচারী ও হওয়া চাহি না; বিধি অনুযায়ী পুত্রার্থী হইয়া পুত্র উৎপাদন করা উচিত। সাধন কালীন সস্ত্রীক সাধন করা উত্তম; ইহাতে বিঘ্ন (বাধা) অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সাধনকালীন ইহা স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, আমি সাধনরূপ সমরে আসুরিকভাব সমূহ দমন করিতে বসিয়াছি, মনে মনে গল্প বা বিষয় চিন্তা করিতে বসি নাই।

প্রাণকর্মরূপ শরযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, আসুরিক ভাব সমূহের মধ্যে যখন যে ভাব দ্বারায় নিজ মন আক্রান্ত হইবে, সেই সময়ে গুরুপদেশ মত আত্মস্মরণের সহিত শরের দ্বারায় সেই ভাবকে বিদ্ধ করিয়া দমিত করিতে হইবে; এইরূপ ক্রম অভ্যাস দ্বারা সমস্ত আসুরিক ভাব দমিত হইলে, তৎপরে গুণাদি দেবতাত্রয়কে এবং ইন্দ্রিয়রূপী দেবগণ সমূহকে সাধন দ্বারা জয় করিয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে, গুণাতীত অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত সাধকের সাধন পথ হইতে বিরত হওয়া চাহি না। কারণ গুণ বর্তমান থাকিতে সম্যক জিতেন্দ্রিয় অবস্থা কাহার লাভ হয় না, বরং

পুনরায় আসুরিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া সাধকের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। সাধকের সাধন অবস্থায় নিত্য ত্রিকালীন সাধন অন্তে, আপন গুরু বা উপদেষ্টার স্বগ্রামে বাস থাকিলে তাঁহাকে সাধনের সময়ে যে যে প্রকার মনের অবস্থা হইবে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ এবং সৎ অসৎ প্রকারের চিন্তা মনে যাহা হইবে, তৎ সমুদায় কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্তব্য মনে করা চাহি। উপদেষ্টা গুরু তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বিঘ্ন (বাধা) নিবারণের যে সকল উপায় বা সদুপদেশ দিবেন, তাহা পালন করতঃ উপদেষ্টার আজ্ঞা মত চলিলে সাধক অচিরে শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি গুরুধাম হইতে সাধকের একক্রোশ মধ্যে বসতি হয়; তাহা হইলে, দিবসের মধ্যে একবার তাঁহার নিকট গমন করিয়া সাধনের ফলাফল এবং নিজ মনের সমস্ত ভালমন্দ অবস্থা অগোপনে প্রকাশ করা কর্তব্য। যদ্যপি অর্দ্ধ যোজন মধ্যে পরস্পরের বাসের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক পক্ষে অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণপক্ষের প্রত্যেক পক্ষে, পঞ্চদিন করিয়া গুরু সমীপে গমন করিয়া সমস্ত মনোভাব এবং সাধন সম্বন্ধের বিষয় জ্ঞাপন করা চাহি। এক যোজনের অধিক (যোজন, চারি ক্রোশকে কহা যায়) এবং দ্বাদশ যোজনের মধ্যে বসবাস হইলে মাসান্তে একদিন, কিম্বা তিন মাসের মধ্যে একদিন গুরুধাম অবশ্য দর্শন করিয়া গুরু সমীপে সমস্ত মনোভাব এবং সাধনের ফলাফল ও কার্য্য সমূহ গুরুকে দেখান এবং বলা কর্তব্য। ইহার অধিক দূরবর্তী স্থান হইলে অনন্তঃ বর্ষে বর্ষে একবার গুরু সমীপে গমন করা নিতান্ত কর্তব্য, কিম্বা সূর্য্যের উত্তরায়ণ কালে একবার এবং দক্ষিণায়ণ কালে একবারও অন্ততঃ গুরু সমীপে গমন করিয়া, শরীরস্থ উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ মার্গের কার্য্যে সম্বন্ধে কিরূপ হইতেছে, না হইতেছে, তাহা দেখাইয়া লওয়া অতীব আবশ্যক। ইহাতে কার্য্যোন্নতি হইয়া থাকে; নচেৎ কার্য্য হানি সম্ভব জানিবেন।

প্রাণকর্মরূপ শরচালনা কার্য্য অন্তর্ম্মুখীন কি বহির্ম্মুখীন গতিতে হইতেছে, তাহা সাধক নিজে বুঝিতে অক্ষম; একারণ মধ্যে মধ্যে গুরুর নিকট সাধন মার্গ দেখাইয়া লওয়া বিশেষ কর্তব্য। প্রাণকর্মরূপ এই শর চালনায় মানব শরীর বেশ সুস্থ থাকে; শরীরের এই ভাব দর্শন করিয়া সাধকের মনে স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে যে, তাহা হইলে আমার সাধন ভালই হইতেছে, সাধকের আসুরিক ভাব কর্তৃকই মনে এইরূপ উদয় হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র শরীরের উন্নতিতে সাধনের উন্নতি হইতেছে মনে করা বিশেষ ভ্রান্তি। কারণ আত্মোন্নতি না হইলে সকলই বৃথা শরীরের উন্নতিমাত্র দেখিয়া আশ্বস্ত হইলে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা জন্মিয়া থাকে। একারণ শরীরের প্রতি আসক্ত না হইয়া পূর্বোক্ত অবস্থার উপর (যে অধ্যাত্ম অবস্থা ইতিপূর্বে উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছি, সেই কুঞ্চিকা স্বরূপ অবস্থার উপর) আসক্ত হইয়া আত্মোন্নতি বিষয়ে

অগ্রসর হইবার চেষ্টা সতত করা চাহি। সাধনকালীন সাধকের বিলাসিতা (বাবুয়ানা) পরিত্যাগ করা কর্তব্য এবং বাহ্যিক সকাম পূজাদিতে আসক্ত হওয়া চাহি না, বাহ্যিক মন্ত্রজপাদিতেও তদ্রূপ। বাহ্যিক অগ্নিতে হোমাদি বিষয়েও রত থাকা চাহি না। প্রাতঃকালে স্নান বর্জন করা চাহি, সূর্য্য উদয়ের পরে এক প্রহরের মধ্যে স্নান করা বিধেয়। বাহ্যিক আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি তামসিক ও রাজসিক কার্য্যে যোগদান করা চাহি না, এই সকল নিয়ম পালন করা কর্তব্য! অবশ্য ইহা সাধন কালীন পালন কর্তব্য। গুণাতীত অবস্থার কোন বিধিও নাই, নিষেধও নাই। তখন বিধি নিষেধ বর্জ্জিত ভাব স্বতঃই হইয়া থাকে। উপস্থিত আপনাদিগকে আমি সাধনের সহিত যে সকল মৌখিক উপদেশ দিলাম, ইহা পালন করিয়া চলুন, তাহার পর ক্রমশঃ আপনাদের যখন যেরূপ অবস্থা দেখিব, অবস্থানুযায়ী তখন অপর ক্রিয়া কৌশল স্থিরত্ব বিষয়ে আবার বলিয়া দিব। ইহা বলিয়া মহর্ষি নিরস্ত হইবার পর, রাজা এবং বিজয়কুমার প্রভৃতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি"

রাজা মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ ভাবে প্রাণকর্ম দেখাইয়া দিলেন, তাহা ত' আমাদের হইতেছে না। কৃষ্ণের বংশীধ্বনির কথা পূর্বে লোক মুখে শুনিতাম, এক্ষণে আপনার প্রাণকর্মের ধ্বনি যাহা শুনিলাম তাহা সমধুর বংশীধ্বনির ন্যায়। আমাদের ত' ওরূপ ভাবে প্রাণ ক্রিয়ার ধ্বনি হইতেছে না; প্রভো! আমাদের কর্মের কিরূপে ঐ প্রকার ধ্বনি হইবে? তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন, রাজন! ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা ধ্বনি প্রকাশ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি যাহা আপনি বলিলেন, সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ইহা জানিয়া রাখিবেন; শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মন ভুলাইবার অভিপ্রায়ে বা কাম চরিতার্থ জন্য ইঙ্গিত ভাবে বংশীধ্বনি করিতেন না; ইহা আপনাদের জানা বিশেষ আবশ্যক। পূর্বে বলা হইয়াছে, যাঁহারা গোপনে পতিভাবে ভগবৎ সাধন করেন, তাঁহাদিগকে গোপী কহা যায়। স্বয়ং কৃষ্ণ কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন। প্রাণায়ামরূপ কৃষি কর্মের নিবৃত্তি অবস্থারূপ যে ব্রহ্মময় ভাব ঐ অবস্থাকেই কৃষ্ণ কহা যায়। (ইহা পূর্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক); যেমন এখন অনেক কৃষ্ণ নামীয় পুরুষ দেখা যায় তাহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণ নহে বুঝিতে হইবে,

অথচ উপরোক্ত অবস্থারূপ কৃষ্ণ সকল ঘটেই রহিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উক্ত অবস্থা সকল ঘটে প্রকাশ থাকিয়াও অপ্রকাশভাবে রহিয়াছেন। (নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ গীতা ৭ম অঃ ২৫ শ্লোক) যে জীব সাধন দ্বারা নিজ শরীরস্থ (উপরোক্ত) ঐ অবস্থা প্রকাশ করিয়া উহা উপলব্ধি করতঃ নিজ মনের গোচর করাইয়াছেন এবং তাহাতে মনের স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তিনিই শিবতুল্য। গুরুরূপী কৃষ্ণ বা গুরুরূপী শিব স্বরূপ অপরে নহেন। যাঁহাকে বাহ্যিক চক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কহা যায় তিনি গুরুরূপী কৃষ্ণ। সাধরণ মানবে যেরূপ কাষ্ঠনির্মিত বা বেণু নির্মিত বংশী বুঝিয়া থাকে, সেরূপ বংশীধ্বনি করিয়া তিনি সাধারণ লোকের বা গোপীগণের মন ভুলাইতেন না, ইহা ধ্রুবসত্য জানিবেন।

বংশী শব্দের অর্থ,—বন্—শব্দ করা, বায়ু দ্বারা যে শব্দ হয়। (বেণু বা বংশদণ্ডকে পৃষ্ঠদণ্ড বা মেরুদণ্ড কহা যায়), শী—শয়ন করা, অর্থাৎ মেরুদণ্ড পথে পদ্ম বনে যে বায়ুরূপী হংস শয়ন করিয়া আছেন সেই বায়ুরূপী হংসের চলাচলে যে ধ্বনি হইয়া থাকে সেই ধ্বনিই সাধারণ বংশীধ্বনি; ইহা মোটা এবং ফাঁকা শব্দ বিশিষ্ট; ইহা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি পদবাচ্য নহে। বংশীধ্বনি দুই প্রকার হইয়া থাকে; বহিঃপ্রাণায়াম কর্তৃক যে ধ্বনি হইতে থাকে, তাহা মোটা শব্দ বা ফাঁকা শব্দ, ফাঁকা শব্দ অনিষ্টকর। ইহা দ্বারা সাধকের মন প্রাণ শীতল হয় না, বরং নানা বিষয় চিন্তা আসিয়া সাধককে বিচলিত করিয়া থাকে। অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামের যে ধ্বনি, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি পদবাচ্য। সাধারণ বাঁশের বংশীতে সাতটি গোলাকার ছিদ্র দেখা যায়, সর্ব উপরিভাগে ছিদ্রটি অপেক্ষাকৃত বড়, ইহাই সাধারণ বাঁশের বাঁশী। এ বাঁশী শ্রীকৃষ্ণ বাজাইতেন না, বা সাধকরূপী গোপীরা ইহাতে মোহিত হইতেন না, ইহাতে পশুবৎ জীবই মোহিত হইয়া থাকে। দেহস্থিত মেরুদণ্ডের মধ্যে ছয়টি চক্র আছে; যাহাকে ষটচক্র কহা যায়; ঐ ষট্‌চক্রের উপরিভাগে (মেরুদণ্ডের উর্দ্ধোভাগে) যে একটি চক্র আছে, তাহাকে সহস্রার পদ্ম বা সপ্তম চক্র কহা যায়। এই সপ্তম চক্রের কিঞ্চিৎ নিম্ন স্থানে এবং ষট্‌চক্রের উর্দ্ধে ব্রহ্মযোনির স্থান; ইহার মধ্য দিয়া হংসরূপ প্রাণের গতি হইলে এক প্রকার ধ্বনি হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি অতি চিকণ অর্থাৎ সরুশব্দ; যেমত কুঞ্চিকাতে (চাবিকাটিতে) ফুঁ দিলে কন্‌ক'নে বংশীর ন্যায় আওয়াজ হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মধ্বনি; যাহা শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন শব্দ ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে চক্রপথে চলিয়াছে। ইহাকেই অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়ামের ধ্বনি বা শ্রীকৃষ্ণের—(ঐ প্রাণায়ামরূপ)—বংশীধ্বনি কহা যায়।

এইরূপ প্রাণায়ামের ধ্বনি শ্রবণ করিলে, সাধকরূপী গোপীগণের মন প্রাণ শীতল হইয়া এক অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, উক্তরূপ বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দবিশিষ্ট বহু অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়াম দ্বারা অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ প্রাণায়াম দ্বারা, সাধকের মন্ত্র চৈতন্য

হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ দ্বারা মনের ত্রাণ হয়, সেই অবস্থার প্রকাশরূপ মন্ত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহার অভ্যাস যদি একদিন বিচ্ছেদ করা হয়, অর্থাৎ একদিন যদি কর্ম না করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব অভ্যাস সব বিনষ্ট হইয়া কার্য্যকরী হয় না। মন্ত্র চৈতন্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মন্ত্র কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ আপনাদিগকে ইতিপূর্বে যে অবস্থা উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছি, তাই মন্ত্র পদবাচ্য (ঐ অবস্থায় স্থিতি লাভ হইলেই মনের ত্রাণ হইয়া থাকে; হ্রীং ক্রীং দুং ক্লীং ইত্যাদি বর্ণ সকল মন্ত্রপদবাচ্য নহে, ইহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; পূর্বোক্ত অবস্থাকে কোন কোন স্থান দিয়া লইয়া যাইতে হইবে, বর্ণ সকল তাহারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যতীত অপর কিছুই নহে জানিবেন। বলা বাহুল্য, রাজন! আপনিও এই মন্ত্র বহুকাল হইতে নিয়ম মত জপ করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে আপনার মনের কি শান্তিলাভ হইয়াছে?

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমি নিত্য বিধিপূর্বক, (অবশ্য যাহা সাধারণ মামুলি বিধি তদনুযায়ী) শাস্ত্র মতে চলিয়া আসিতেছি; আমি পুত্রশোক নিবারণার্থ মামুলি বিধি অনুসারে ওঁ হ্রীং ওঁ এইরূপ মন্ত্র পুটিত করিয়া নিত্য দিবারাত্রে দশ সহস্র সংখ্যক জপ করিতাম, তাহাতে আমার পুত্রশোকও অপনয়ন হয় নাই শান্তি প্রাপ্তিও হয় নাই। অধিকন্তু এই বিশাল রাজ্য আমার অভাবে সমস্তই শত্রু হস্তে পতিত হইয়া নাম, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য 'সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় আমাকে অহরহঃ দগ্ধ হইতে হইয়াছে, আমার শান্তি কিছুমাত্র ছিল না। এক্ষণে আপনি যে অবস্থাটি দেখাইয়া দিলেন, ঐ অবস্থাটি আমার যতক্ষণ স্থায়ী ছিল, ততক্ষণ আমি বর্তমান মনের অস্তিত্বই বোধ করিতে পারি নাই। ইহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, উক্ত অবস্থাকে সাধন দ্বারা প্রকাশ করিয়া লইয়া ঐ অবস্থাতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে আমার চিরশান্তি লাভ হইবে। তবে মহাত্মন্! আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমি এমন অমূল্যরত্ন লাভ করিয়া পরিশেষে যেন বিষয়াসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ আসুরিক ভাবের প্রলোভনে বা যশঃপ্রলোভনে অথবা ব্যক্তিগত লোকের দ্বারা আমার গুণকীর্তন শ্রবণে পদস্খলিত না হই। কারণ অনেক স্থলে মানুষ মানুষকে নষ্ট করিয়া থাকে, তাহারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধি অভিপ্রায়ে কোন প্রকার সদ্‌গুন বা কোন প্রকার সিদ্ধির লক্ষণ না থাকিলেও অযথা গুণকীর্তন করিয়া সাধককে নষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল অযথা নিজ গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া মনের ঘৃণা না হইয়া মন আরও সময় সময় আত্মগরিমা শ্রবণ করিয়া স্বতঃই অহঙ্কৃত হইয়া থাকে ও আমি শ্রেষ্ঠ, আমি কর্তা ইত্যাদি ভাবের বশীভূত হয়। প্রভো! ইহার প্রতিকারের জন্য কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় মানব আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, বা সর্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ইত্যাদি মনে করিয়া থাকে। তৎকালীন কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে তাহার মনে স্বতঃই উদয় হয় যে, তবে আমি সকল বিষয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছি। অথচ উক্ত মানবগণের "আমি" যে কে, তাহার জ্ঞানই নাই। সে জ্ঞানের অভাব হেতু স্বতঃই উপসর্গ সংযোগে আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সর্বদা অহঙ্কৃত ভাবে আত্মগরিমায় মগ্ন থাকে, ইহা জীবের জীবভাবের স্বাভাবিক ধর্ম। রাজন! জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় বা জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থায় এসকল ভাব থাকে না। বারিপূর্ণ কলসে আঘাত করিলে কোন শব্দ হয় না, কিন্তু শূন্য কলসে আঘাত করিলে গভীর শব্দ হইয়া থাকে। তদ্রূপ বারিরূপ জ্ঞানের অভাব হেতু শরীররূপ কলসস্থিত মন নানা বিষয়ে আসক্ত থাকায় মানবের নিজের শ্রেষ্ঠতা ভাব সর্বদা মনে মনে জাগরূপ থাকে, তৎ সহিত বহিঃ সঙ্গরূপ উপসর্গ যোগ হইলে বাক্যরূপ শব্দের ঘাত প্রতিঘাতে অহঙ্কারের কার্য্য সকল বাক্যের দ্বারা বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাবভাব দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই প্রকার মানবগণ কেহই জ্ঞানী পদবাচ্য নহে, (এই পুস্তকে চণ্ডি রহস্য মধ্যে এইসব বর্ণনা বিশদ রূপে বিবৃত আছে এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যে ব্যক্তির আত্মকর্ম দ্বারা পরমাত্ম জ্ঞান নিজ বোধরূপে (স্বতঃ) উপলব্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবস্থা আপনাদিগকে যাহা অনুভব করাইয়া দিয়াছি যিনি তাহাতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী পদবাচ্য, অপরে নহেন; অপর মানব শরীররূপ ঘট সমূহকে শূন্য কলসবৎ জানিবেন। উপরোক্তরূপ ব্যক্তি সর্বদা আপনাকে আপনি থাকার কারণ সর্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন; উক্ত ব্যক্তি কর্তা হইয়াও মনে মনে অকর্তার ন্যায় কার্য্য করিয়া মানবগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আপনরা 'আপনাকে আপনি' অণু বোধের সহিত পূর্বোক্ত অবস্থাতে মন রাখিয়া সাধন কার্য্য এবং অপর সমুদায় কার্য্য করিয়া যাইবেন। এইরূপ অভ্যাসে ক্রমশঃ আপনা আপনি অহঙ্কারাদি সব বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আপনাদিগকে কিছু করিতে হইবে না। আপনাদের কার্য্য কেবল আত্মকর্ম শ্রদ্ধার সহিত আজীবন করিয়া যাওয়া। ইহার মধ্যে একদিন এমন দিন আসিবে, যেদিন শত্রুকুল নির্মুল হইয়া আত্মস্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হইবেন। তবে কর্ম সকল বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত না হইলে কার্য্যকরী হয় না, অতএব আমি যাহা যাহা বলিলাম এবং যে সকল কার্য্য নিজে করিয়া দেখাইয়া দিয়া আপনাদিগকে করিতে বলিলাম, তৎ সমুদায় কার্য্য আমার বাক্য মত করিয়া চলাকেই বিধিপূর্বক কার্য্য করা বলিয়া জানিবেন।

বলা বাহুল্য, আমি যে যে কার্য্য আপনাদিগকে বলিয়াছি, পূর্বতন ঋষিগণ ও উক্ত কার্য্য করণ দ্বারা ব্রহ্মবিদ হইয়া সাধারণ মানবগণকে শিক্ষা দান করিতেন।

যিনি ব্রহ্মবিদ তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ এবং তদ্‌বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য মনে করিয়া তাঁহার কথিত মত কার্য্য করা উচিত। অতএব আপনার আলস্য এবং সংশয় রহিত হইয়া সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া চলুন, তাহাতে অচিরে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া পরমাত্ম জ্ঞান লাভ হইবে, নচেৎ নহে। সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে বলিবার অভিপ্রায়, মনে করুন—প্রথমতঃ কোন অপরিচিত দেশে পদচালনা করিয়া (হাঁটিয়া) যাইতে হইলে, লোকে সতর্কতার সহিত পথের লক্ষ্য করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। কারণ পথে নানা প্রকার দস্যু তস্কর প্রভৃতি থাকার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কারণ,—পথে লক্ষ্য করিয়া না চলিলে, পথস্থিত প্রস্তরাদি পদে আঘাত লাগিয়া (হোঁচট লাগিয়া) গন্তব্য স্থানে যাইতে বিলম্ব হইতে পারে বা অধিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে পদস্খলিত হইয়া পতন হইতে পারে; পতন হইলে দস্যু তস্করগণ আসিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে পথিককে লইয়া কৃতদাসের ন্যায় আজীবন রাখিতে পারি। তদ্রূপ আপনাদিগকেও যে উপদেশে (ঊর্দ্ধদেশে) যাইতে হইবে, সেই উপদেশের পথে লক্ষ্য রাখিয়া গমন না করিলে পতন সম্ভাবনা। একারণ আপনাদিগকেও পথের উপর লক্ষ্য করিয়া সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক পদচালনা করিতে হইবে, লক্ষ্য বা সতর্কহীন হইলে, পতন সম্ভবপর হইয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইতে পারে। আপনাদিগকে আমি উপদেশের স্থান দেখাইয়া দিয়াছি। এই উপদেশ বা দীক্ষা দিতে হইলে, ইহাতে বাহ্য আড়ম্বর নাই। কেবল মাত্র বাহ্য আড়ম্বরে তৃপ্তি কাহারও হয় না। উপদেশ অর্থে—উপ—উপরি, দেশ অর্থে—রাজ্য বা বাসস্থান; দীক্ষা অর্থেও উপদেশ। দীক্ষা স্বতন্ত্র বিষয় নহে, অর্থাৎ জীব শরীরস্থ মেরুদণ্ডের উপরিভাগে ব্রহ্মযোনিস্থিত গগণ গুহার মধ্যে চিদাত্মার বাসস্থান; এই স্থান হইতে স্থির প্রাণস্বরূপ চিদাত্মার অনিচ্ছার ইচ্ছায় গতি হইয়া কণ্ঠের নিম্নে আসিয়া আত্মবিস্মৃতিতে নারায়ণ (স্থান মাহাত্ম্যে) জীবভাবে পরিণত হইয়াছেন। এই জীব পুনরায় উপরোক্ত স্বদেশরূপ উপদেশে স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত, জীব শিবস্বরূপ-মঙ্গলময়-চিদাত্ম ভাব প্রাপ্ত হইবেন না, ইহা ধ্রুবসত্য। একারণ জীবস্বরূপ নিজের আত্মাকে উপরোক্ত স্থানে স্থিতি করতঃ জীবাত্মাকে পরমাত্মায় পরিণত করিয়া আপনার উদ্ধার (আত্মোদ্ধার) আপনাকেই করিতে হইবে।

মানবগণ সাধারণ অস্থি মাংসের পদ দ্বারা পথ চলিয়া আপন আপন ইচ্ছামত স্থানে গমন করিয়া থাকে। মানবের ধর্মপথে চলিবর ইচ্ছা হইলে, এই অস্থি মাংস বিশিষ্ট পদদ্বারা চলা যায় না বা ধর্মস্থানেও যাওয়া যায় না। মানবের এই অস্থি মাংস বিশিষ্ট যে দুইটি পদ রহিয়াছে, ইহা সাধারণ পদমাত্র। ইহা ব্যতীত মানবের শরীর মধ্যে অপর আরও দুইটি পদ রহিয়াছে, তাহাকে হংসরূপ পদ কহে ("পদহংস মুদাহৃতম্"); যাহা মানব শরীরে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে উভয় নাসা দিয়া চলাচল করিয়া

থাকে, তাহাকেই হংসরূপ পদ কহা যায়। চিতাত্মধামে জীবকে গমন করিতে হইলে হংসরূপ পদ ব্যতীত গমনের অপর উপায় নাই জানিবেন। বর্তমান মানব শরীরে এই হংসরূপ পদ বহির্মুখীন ভাবে চলাচল করিতেছে। জীবকে আপন স্বদেশরূপ উপদেশে যাইতে হইলে, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত পথ ধরিয়া পদ চালনা করিতে হইবে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে নিম্ন হইতে মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত একটি সূক্ষ্ম ছিদ্ররূপ পথ রহিয়াছে। জীবের স্বদেশরূপ উপদেশে স্থিতিলাভ করিবার জন্য এই পথ ধরিয়া জীবকে পদ চালনা (হংসরূপ পদের চালনা) করিতে হইবে। উক্ত মেরুদণ্ড পথের মধ্যে স্থানে স্থানে চক্ররূপী কয়েকটি আংশিকদেশ আছে। এই চক্র অংশে লক্ষ্য করিয়া না চলিলে পদরূপ হংসে ঠোকর লাগিয়া হংসস্থিত মনও ঠোকরাঘাতে বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষিপ্ততাহেতু আসুরিক ভাবরূপ দস্যু তস্কর দ্বারা মনের আত্মপ্রাপ্তি ইচ্ছারূপ দৈবী সম্পদস্থ ধন রত্নাদি এবং দৈব বল ইত্যাদি সব অপহৃত হয় ও মন পুনরায় আপ্তবিস্মৃতি ভাবে পতিত হইয়া, আসুরিক সম্পদ প্রাপ্তি চিন্তায় রত হইয়া সাধন সমরে বিরত হইবার চেষ্টা করে! একারণ মনকে দস্যু তস্করগণ অপহরণ করিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে না লইয়া যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়া সতকর্তার সহিত গমন করা কর্তব্য। তাহা হইলে স্বদেশে অর্থাৎ চিদাত্মদেশে স্থিতি লাভ হইয়া থাকে।

এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ রজস্তমঃ প্রধান মানবগণকে বর্হিভাবে ধর্মপথে মতি রাখাইবার অভিপ্রায়ে রূপকছ'লে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পর্ব হইয়া থাকে। জীবের জীবনই প্রাণকৃষ্ণ বা জগন্নাথ; তাঁহার, শরীররূপ রথে, সংসারে প্রবৃত্তিরূপা মাসির বাড়ী আগমনই (সংসারে আগমনই) রথযাত্রা। ইহাই আত্মানারায়ণের রথারোহণ করিয়া সংসার লীলা। পুনরায় সাধন দ্বারা আপ্তবিস্মৃতি ভাব কাটাইয়া অর্থাৎ যোগমায়ারূপ সংসার ছেদন করিয়া স্বস্থানে (উপরোক্ত চিদাত্ম স্থানে) গমনরূপ যাত্রাকে লোকে জগন্নাথের পুনর্যাত্রা বা উল্টা রথ কহিয়া থাকে। জীবদ্দশায় সাধন দ্বারা পূর্বোক্ত অবস্থায় স্থিতি লাভ করিতে না পারিলে, জীবের দেহত্যাগ হইয়াও স্থিতি অভাবে সংসারে ত্বরায় পুনরাগমন হইয়া থাকে; ইহার প্রধান কারণ, জীবের পূর্বোক্ত অবস্থারূপ রুদ্ধদ্বারে কুঞ্চিকা স্বরূপ অবস্থা যাহা আপনাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি) ঐ পরমাত্ম ভাবের জ্ঞান না থাকায়, জীব দেহত্যাগ কালীন সাধারণ ভোগ ইচ্ছায় বদ্ধতাহেতু ভোগ চরিতার্থ মানসে ইচ্ছাশক্তির শক্তি কর্তৃক আপন ইচ্ছার ধ্যানানুযায়ী পুনরায় সদসৎ দেহ ধারণ করতঃ ভোগ চরিতার্থ করিতে থাকে। পূর্বোক্ত অবস্থায় মনের স্থিতি ব্যতীত ভোগ ইচ্ছার নাশ হয় না; ভোগ ইচ্ছার নাশ ব্যতীত ও জীবের শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া গমনাগমন রূপ সংসার লীলার বিরাম হয় না।

আপনাদের ইহা জানা থাকা উচিত, সাধক যদি কোন দৈব কারণ বশতঃ সাধন

দ্বারা পূর্বোক্ত অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলেও সাধকের অধোগতি হয় না। তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কারণ সাধক পূর্বোক্ত অবস্থা (যাহা আপনাদিগকে উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছি) অবগত থাকা হেতু দেহত্যাগ কালে স্বভাব কর্তৃক তাঁহার ঐ অবস্থা আপনি স্মরণ হইয়া থাকে। এই স্মরণ দ্বারা উক্ত অবস্থাই তাঁহাকে উত্তম গতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ইহাতে যদি আপনারা বলেন যে, উক্ত অবস্থা যখন সাধককে উত্তম গতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, তখন তাঁহাকে পরমাত্মভাবে (আপনাতে আপনি) স্থিতি না করা হয় কেন? তদুত্তরে আমি বলিতেছি, সাধকের দেহত্যাগ কালীন পূর্ব অবস্থা স্মরণ হইলেও ভোগ ইচ্ছার সহিত স্মরণ হওয়ার দরুণ পূর্বোক্ত অবস্থায় স্থিতি হয় না; ভোগ ইচ্ছা রহিত হইয়া স্মরণ করিতে না পারায়, পরমাত্মায় স্থিতি না হইয়া উত্তম যোনিতে গতি হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া, কিছুদিন ভোগ ইচ্ছা চরিতার্থ করিয়া, তৎপরে আবার পূর্বকৃত সাধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ঐ সাধনারূপ অভ্যাস দ্বারা পরমাত্ম অবস্থায় স্থিতিলাভ করতঃ তদ্-ভাবাপন্ন হইয়া ইচ্ছা রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইচ্ছা রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিষয়াদিতে "আমি আমার" বোধ রহিত অবস্থা স্বতঃই আসিয়া থাকে। এই অবস্থাতে তত্ত্বমসি অবস্থা প্রতিপাদন হইয়া থাকে অর্থাৎ স্থিরীকরণ হইয়া থাকে। আপনাতে আপনি তন্ময় হইয়া পরমাত্ম স্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) হইয়া থাকেন, অথচ মুখে 'আমি ব্রহ্ম' ইহাও বলেন না। কারণ উক্ত অবস্থায় নিজ ইচ্ছায় বলিবার কিছুই থাকে না। ইচ্ছাই যখন নাই তখন বলে কে, অপরের ইচ্ছার ইচ্ছায় আকার ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্র।

তত্ত্বমসি এই বাক্য মাত্র যাঁহারা শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়া থাকেন, তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম, অতএব তুমি 'আমিই সেই ব্রহ্ম' ইত্যাকার ধ্যান করিয়া চল, এরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহান মূর্খ। কারণ "আমি ব্রহ্ম" ইহা বলা এক প্রকার বাতুলতা মাত্র; যাহার আমি বোধ থাকে, তাহার ব্রহ্মধ্যান সম্ভবপর নহে। প্রথমতঃ ধ্যান করিব কাহার? বর্তমানে যাহা মন এবং বুদ্ধির অগোচর, তাহার ধ্যান কিরূপে করিব? "আমি আমার" বোধ থাকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মের ধ্যান করিতে যাইলেই রূপ বা গুণ আসিয়া পড়িবে। রূপ গুণ আসিলেই সাকার বল দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়িবে, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ রহিল না, একারণ অদ্বৈতবাদীরা ভ্রান্ত। পূর্বোক্ত অবস্থা যাহা আমি দেখাইয়া দিয়াছি, ঐ অবস্থাই প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মভাব। উক্ত অবস্থায় সাধক তন্ময়ত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্থিতিলাভ করিলে, রূপাতিত এবং গুণাতীত রূপ এক অনির্বচনীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এই ভাবকে কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না বলিয়া ইহাকে অব্যক্ত অবস্থা বলা হইয়া থাকে, ইহা নিজ বোধরূপ (নিজ অনুভূতি দ্বারা বোধগম্য) অনির্বচনীয় আনন্দের

অবস্থা। এ অবস্থা দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের অতীতাবস্থা; ইহাকে বাদাতীত অবস্থাও বলা যায়। উক্ত অবস্থা যখন কর্ম ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন কথা দ্বারায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। বায়ুরোধ রহিত উত্তম অন্তর্ম্মুখীন বহু প্রাণায়াম ব্যতিরেকে উক্ত অবস্থায় কাহারও স্থিতিলাভ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব জানিবেন। গুরুপদেশ দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ (প্রত্যক্ষ) হইলেও উক্ত অবস্থাতে স্থিতিলাভ করিবার জন্য বহু প্রাণায়াম দ্বারা ঐ অবস্থার সংবর্দ্ধন করিতে হইবে, নচেৎ স্থিতি হইবে না। এই প্রাণায়াম করা রূপ সম্বর্দ্ধন অবস্থার কালকে দ্বৈত ভাব কহা যায়; ইহার (প্রাণকর্ম্মের) অতীতাবস্থাকে (যে অবস্থায় সাধকের আমি আমার বোধ রহিত হইয়া ইচ্ছা রহিত অবস্থা হয় সেই অবস্থাকে) সাধারণে অদ্বৈত ভাব বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বলিয়া থাকে।

সাধারণে বাদ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ করিয়া থাকে, তাহা বিতণ্ডা মাত্র। তাহার দ্বারা কাহার কিছুই লাভ হয় না, বরং সম্যক অনিষ্টই হইয়া থাকে। করণ পরস্পরে বাক বিতণ্ডা করায়, বহু বাক্য প্রয়োগ হেতু, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাণশক্তির বল স্বরূপ স্থিরত্বের হানি হইয়া আসুরিক ভাবের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই আসুরিকভাব বৃদ্ধিতে বক্তার দাম্ভিকতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া বক্তাকে রজস্তমোগুণের অধীনে আজীবন কাটাইতে হইয়া থাকে। অন্তর্ম্মুখীন ভাবে দেখিলে কোন বাদই খণ্ডনীয় বিষয় নহে; অন্তর্দৃষ্টির অভাব হেতু সাধারণ লোকে নিজ নিজ রজস্তমোগুণের রুচি অনুযায়ী দ্বৈতাদ্বৈত বাদদ্বয়ের মধ্যে একের সমর্থন করিয়া অপর বাদকে খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে এবং যশোপ্রত্যাশায় বা ধনাদি প্রত্যাশায় বিতণ্ডারূপ বাগযুদ্ধ করিয়া নিজের ও সাধারণের অনিষ্ট করিয়া থাকে। আপনারা উক্তবাদের চর্চায় মনোনিবেশ না করিয়া কেবল মাত্র এই কর্ম (যাহা আমি দেখাইয়া দিলাম) অভ্যাস করিয়া চলিবেন, আর অবকাশ মত শ্রীমদ্ভাগবদগীতা নিত্য নিত্য পাঠ করিবেন। তাহার পর মহর্ষি বিজয়কুমার প্রভৃতি সহিত আগমনকালে সাধনের অঙ্গ দর্শনাদি সম্বন্ধে বিজয়কুমারকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎ-সমুদায় আনুপূর্ব্বিক রাজাকে কহিলেন। তৎপরে (সাধন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের মধ্যে চণ্ডীরহস্যে যেরূপ ভাবে সাধন সমর বর্ণিত আছে, সেই ভাবে) যে সকল আসুরিক শত্রু দমন করিতে হইবে তৎ সমুদায় বলিলেন।

মহর্ষি বলিলেন, প্রাণকর্ম্মরূপ শরচালনা (যাহা আপনাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি) যতদিন না রিপুকুল দমন হয়, ততদিন বিধিপূর্ব্বক লক্ষ্য স্থির করিয়া সাধন সমরে তাহার অভ্যাস করিয়া চলুন। শর চালনা দ্বারা লক্ষ্য বিষয়ে শরক্ষেপণ করতঃ লক্ষ্য স্থিরের অভ্যাস করা সাধন সমরের প্রথম কার্য্য! লক্ষ্য স্থির হইলে, তাহার পর স্থির প্রাণের অপরাপর ক্রিয়া শক্তি দ্বারা আসুকির ভাবের অধিকার হইতে মনকে

উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণকর্মরূপ ক্রিয়া (যুদ্ধ) চলিবে। উপস্থিত আপনাদিগকে যে সকল উপদেশ দিলাম, এক্ষনে তাহারই অভ্যাস বিধিপূর্বক করিয়া চলুন। তৎপরে অপরাপর ক্রিয়া যোগের উপদেশ প্রদান করিব। সাধনের যেমন যেমন উন্নতি হইবে, সেই মত তাহার পর পর অপর কার্য্য পাইবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে কালে একদিন নিশ্চয়ই আসুরিক ভাবরূপ শত্রুগণকে জয় করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তৎপরে মহর্ষি বলিলেন, এইবার মহিলাগণকে আনয়ন করুন।

মহর্ষির আদেশ ক্রমে বিজয়কুমার পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে রাণীমাতা তাঁহার পালক মাতা ও খুল্লতাত পত্নীকে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা মহর্ষি সমীপে আগমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি, রাজ্ঞী প্রভৃতিকে বসিতে অনুমতি করিলে, তাঁহার আসনে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি যথাক্রমে পূর্বোক্তভাবে তিনজনকে উপদেশ দিলেন। আত্মকর্মের উপদেশ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ কোন পার্থক্য নাই, কেবল পুরুষগণকে পরস্ত্রী মাতৃমৎ জ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন। রমণীগণকে সেই স্থলে স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষ মাত্রকেই পুত্রবৎ এবং পিতৃবৎ জ্ঞান করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা করাইলেন। অপর প্রতিজ্ঞা পুরুষগণের তুল্য।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

"নরনারীর কর্তব্য"

মহর্ষি নারীগণকে কর্তব্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, আপনারা স্ব স্ব পতিকে আপন গুরুবৎ মনে করিবেন; কারণ নারীগণের পতিই একমাত্র গুরু। অতএব পতির আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না এবং পতির অবাধ্যও কদাচ হইবেন না। নারীগণের পতি সেবা একান্ত কর্তব্য জানিবেন। পতি উৎকট রাগ গ্রস্ত হইলেও ঘৃণা না করিয়া তাঁহার সেবায় রত থাকা কর্তব্য। যে নারী পতি সেবায় বিরত, তাহার ইহকালে ও পরকালে কোন মঙ্গল হয় না, বরং নানা প্রকার অমঙ্গল, অশান্তি, জ্বালা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিজ পতির অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পতির অনিচ্ছা মত কোন কার্য্য নারীগণের করা উচিত নহে। পতিকে অপ্রিয় বাক্য কদাচ প্রয়োগ করা চাহি না। নিজ পতিকে সর্বদা মধুর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সন্তুষ্ট করা চাহি। যে নারী ইহা পালন না করেন, তিনি ইহকালে অযশভাগিনী হইয়া পরিণামে অশান্তিই ভোগ করিয়া থাকেন। পতির অগ্রে কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা চাহি না, পুত্র বা পুত্রতুল্য

ব্যক্তি ব্যতীত পতির নিকট অপর কোন ব্যক্তি বা পতির গুরুজন উপস্থিত থাকিলে লজ্জা নম্রভাবে থাকা উচিত। পতি, পুত্র, পিতা বা পুত্রতুল্য এবং উপদেষ্টা গুরু ব্যতীত অপর পুরুষের পদের ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করা চাহি না। নারীগণের আপন আপন শ্বশুরকে নিজ পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদাজ্ঞা পালন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য এবং শ্বশুরকে পরম গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা নিতান্ত কর্তব্য। নারীগণের শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে আপন জননীর ন্যায় দেখা কর্তব্য, কারণ কন্যা দানের পর কন্যার পিতা মাতার কন্যার উপর স্বত্ব থাকে না।

কন্যার বিবাহের পর তৎ পিতামাতার কন্যার উপর স্বত্ব থাকিলে কন্যা দান অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। একারণ কন্যাগণের বিবাহের পর আপন পতির পিতা মাতাকেই নিজ পিতা মাতার স্বরূপ বোধ করা নিতান্ত কর্তব্য; কন্যাগণ অবিবাহিতাবস্থায় যেমন পিতা মাতার অনুকরণে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন এবং কোন সৎ কার্য্যে অমনোযোগী হইলে পিতা মাতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া ও তাহাতে বিশেষ মনোকষ্ঠ বোধ না করিয়া তাঁদের অনুমোদিত কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্রূপ বিবাহের পর আপন পতির পিতামাতার অনুমোদিত সাংসারিক কার্য্যে আনন্দের সহিত সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানিয়া রাখা উচিত। আপন দেবরকে পুত্রতুল্য দর্শন করা উচিত। নিকৃষ্টা নারীগণ যেমত আপন আপন দেবরকে কুৎসিত রহস্যাদি করিয়া থাকেন, সৎস্বভাবান্বিতা নারীগণের তাহা বর্জ্জন করিয়া দেবরকে পুত্র ভাবে দর্শন করা নিতান্ত কর্তব্য। আপন পুত্রকে যেমন কোন নারীই কুৎসিত ভাবের রহস্য বা ঠাট্টা করেন না, তদ্রূপ দেবরকেও কোন প্রকার কুৎসিত ভাবের রহস্যাদি করা বিধেয় নহে। নারী জাতির পতির অনুমতি ব্যতীত পিত্রালয়েও গমন করা কদাচ উচিত নহে, নারীগণের সর্বতোভাবে পতি আজ্ঞা পালন করা বিশেষ কর্তব্য। গুরুজনের বাক্য খণ্ডন করিবার জন্য তর্ক বিতর্ক করা একবারেই অবিধেয়। আপন পতিকে গোপন করিয়া নারীগণ পিত্রালয়ে বা অপর কাহাকেও পত্র ব্যবহার করিবেন না।

নারীগণ সংসারে গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা, সুতরাং তাঁহাদের সাধ্য মত সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করা চাহি তাহাতে আলস্য বোধ করা উচিত নয়। দাস দাসীগণকে আপন কন্যা পুত্র বোধে তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র ভাব রাখাই কর্তব্য। আপন দাসদাসীকে কটু ভাষা কদাচ প্রয়োগ করা চাহি না। মিষ্টবাক্য দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে আবশ্যকীয় কর্ম সম্পন্ন করাইয়া লওয়া চাহি। সাধ্য মত অতিথি অভ্যাগতজনের সম্মান করা এবং তাঁহাদিগকে যথাসময়ে আহারীয় বস্তু প্রদান করা কর্তব্য। মাতা যেরূপভাবে উৎকৃষ্ট আহারীয় বস্তু নিজ সন্তানকে প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপভাবে

যথাসময়ে নিজ পতিকে স্বপক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি যত্নের সহিত ভোজন করান, নিতান্ত কর্তব্য। আয়ু, সত্ব, বল, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়, এমত ভোজ্য বস্তু যত্নের সহিত ভোজন করান উচিত। ভোজনকালে পতি যাহাতে আনন্দের সহিত ভোজন করেন, এমত মধুর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পতিকে ভোজন করান কর্তব্য। ভোজনকালে পতির বিরক্তিকর কোন কথা প্রয়োগ করা চাহি না। মিতব্যায়ী হইয়া সাংসারিক কার্য্য সমূহ সুচারু রূপে সম্পন্ন করা, নারীগণের কর্তব্য কর্ম। পতির উপার্জ্জিত ধন, রত্ন পরিণামের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখাও নারীগণের কর্তব্য। পতি সামর্থ্য অনুযায়ী বসন ভূষন যাহা প্রদান করিবেন, তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য। পতিকে বসন, ভূষণ ইত্যাদির জন্য বিরক্ত পীড়ন করা নারীগণের অবিধেয়।

পতি নিজ পত্নীকে যেরূপ বসন ভূষণ দিয়া সন্তোষ লাভ করেন, নারীগণের তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। পতি অসমর্থ হেতু যদি বহুমূল্য বসন ভূষণ না দিতে পারেন, তাহাতে পতির প্রতি অভক্তি বা পতির সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করা কদাচ উচিত নহে। কারণ পতিই নারীগণের অলঙ্কার স্বরূপ। পতি বিহীনা (নানাবিধ অলঙ্কার গাত্রে থাকিলেও) নারীকে অলঙ্কার দ্বারা শোভান্বিত করা যায় না, বরং পতিহীনা নারী নিজ অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিলেন, কুলটার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে এবং লোকেও তাহাকে ভ্রষ্টা বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। একারণ সাধ্যা নারীগণের পতিই একমাত্র অলঙ্কার স্বরূপ। নারীগণের নিজ পতির কোন দোষ থাকিলে, সে দোষ কীর্তন করা চাহি না, অপরের মুখে নিজ পতির দোষ শ্রবণ করাও চাহি না; যে স্থলে নিজ পতির দোষ কীর্তন হইতেছে সে স্থান পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যদি পতির কোন দোষ থাকে, তজ্জন্য পতিকে কিছু না বলিয়া, সেবা দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার দোষ সংশোধন করা বুদ্ধিমতী নারীগণের কর্তব্য। মন্ত্রৌষধি দ্বারা নিজ পতিকে বশীভূত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে কুফলই লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় পতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সেবা দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়। ভালবাসার সহিত সেবাই পতিকে তুষ্ট করিবার প্রধান মহৌষধি জানিবে।

নারীগণের অপর কোন নারীর নিন্দা অপবাদ ইত্যাদি দোষ অনুসন্ধান করিয়া কুৎসা করা কদাচ কর্তব্য নহে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভাব প্রকাশ করা চাহি না। আপনাকে আপনি রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী, ধনবতী মনে করিয়া অহঙ্কার করা কদাচ উচিত নহে। গুরুজন সন্নিধানে ও প্রতিবাসীগণের নিকট সদাই বিনীতভাব প্রদর্শন করাই নিতান্ত কর্তব্য। কাহার সহিত কদাচ কলহ করা চাহি না, অপরে কটু কাটব্য বাক্য বলিলে সহ্য করাই শ্রেয়ঃ। এজগতে যাহার যতটুকু সহ্যগুণ আছে, তিনি সেই পরিমাণে

সুখলাভ করেন। সন্ধ্যার পূর্বে আপন গাত্র প্রক্ষালন ও মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কৃত ধৌত বস্ত্র পরিধান করা নারীগণের কর্তব্য। রুক্ষকেশে থাকা নারীগণের কর্তব্য নহে। পতিকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে গাত্র প্রক্ষালন করিবার পূর্বে যথাসাধ্য কেশ বিন্যাস করাও উচিত। সেবা দ্বারা নিজ পতিকে তুষ্ট রাখাই নারীগণের একমাত্র ধর্ম। গৃহকার্য্য অবহেলা করিয়া নারীগণের পুরুযোচিত কার্য্য করিবার বাসনা মন হইতে পরিত্যাগ করা উচিত। নারীজাতি বাল্যকালে পিতামাতার অধীন থাকিয়া গৃহস্থালির যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা করিবেন এবং বাল্যকালে আপন জননীর নিকট হইতে পতির প্রতি কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য এবং মাতার আচরণ দেখিয়া শিশুপালন ইত্যাদি শিক্ষা করিবেন। পিতার নিকট হইতে ধর্মের সহিত নীতি শিক্ষা করিবেন, আর নারীগণের উপযোগী সদাচার আপন জননীর কার্য্য করণ দেখিয়া শিক্ষা করিবেন। নারীগণের জননীরাও আপন আপন কন্যাগণকে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

বাল্যে কন্যাগণ যাহাতে কুরুচি সম্পন্না না হয় তৎবিষয়ে জননীদের আপন আপন কন্যাগণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এইরূপে নারীগণ বাল্যকালে আপন পিতার অধীন থাকিয়া কার্য্য শিক্ষা করিবেন! তৎপরে কন্যাগণ বিবাহিতা হইলে পতির অধীন হইয়া পতির অনুমোদিত এবং প্রীতিকর কার্য্য সকল পতির আজ্ঞানুযায়ী সম্পাদন করিবেন। নিজ পতির অপ্রীতিকর কার্য্য বা অননুমোদিত কার্য্য অথবা নিজ স্বেচ্ছাচারিতা ভাবের কোন প্রকার কার্য্য কদাচ করিবেন না। বিবাহের পর যৌবনকাল পর্য্যন্ত এবং যতকাল সধবা অবস্থা থাকিবে, ততকাল পতির অধীনে থাকিয়া পতি সেবা করিয়া চলিবেন। বার্দ্ধক্যে বা যৌবনে পতিহীনা হইলে পুত্রের অধীন (অর্থাৎ পুত্রের রক্ষার অধীন) হইয়া থাকিবেন। পুত্র ও আপন মাতাকে ঈশ্বরী বোধে সেবা করিবেন; যে পুত্র নিজ মাতাকে ঈশ্বরী বোধে তাঁহার সেবা ও তৎআজ্ঞা পালন করিয়া চলেন, তিনি ইহকালে লোক সমাজে শ্রেষ্ঠ পদলাভ করেন এবং পরকালেও উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে পুত্র মাতৃসেবাহীন বা মাতৃ আজ্ঞা পালন করেন না, তিনি ইহকালে লোক সমাজে নিন্দাভাজন হয়েন এবং পরকালে নিকৃষ্ট যোনিত জন্মগ্রহণ করিয়া অতীব কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। যে নারী পতি, পুত্র, আত্মীয় ও পিতৃমাতৃহীনা, তিনি সংযমী বাল্মিকী সম গুরু সমীপে গমন করিয়া গুরুর অধীনে (গুরু গৃহে) থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যরূপ আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিবেন।

পুত্র কন্যা পালন করা, যাবতীয় গৃহকার্য্য নির্বাহ করা এবং গৃহের ধন রত্ন, শস্য ও গৃহস্থাশ্রমের অপর দ্রব্য সামগ্রী যথাস্থানে রক্ষা করিয়া মিতব্যয়িতা ভাবে সংসারের কার্য্য নির্বাহ করা স্ত্রী জাতির কর্তব্য। গুণহীনা নারী অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী

হইলেও তিনি মাকাল ফলের তুল্য। মাকাল ফলের যেমন কেহই আদর করে না, তদ্রূপ গুণিগণ সন্নিধানে গুণহীনা নারীগণের কোনই আদর নাই, বরং ঘৃণার পাত্রীই হইয়া থাকে। নারীগণের কোপন স্বভাব হওয়া চাহি না, অন্তঃকারণে সদাই দয়াভাব রাখা নিতান্ত আবশ্যক এবং আপনাকে আপনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে না করিয়া সকল বিষয়েই হীন মনে করা উচিত। কাহারও নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত হর্ষান্বিত হওয়া চাহি না এবং কাহারও নিকট হইতে অবমাননা সূচক বাক্য শ্রবণ করিলে ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত নহে, উহা অগ্রাহ্য করাই উচিত। যে নারী আপনাকে আপনি সম্মানিতা করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি পতি সেবা করিয়া পতিকে এবং অপর গুরুজন ও আপন অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠাদিগকে সম্মান প্রদান করিলে, কালে নিজে সকলের শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্রী হইয়া থাকেন, নচেৎ নহে। তবে অনেক কারণে অনেক সময় গুণহীনা নারীও সাধারণ মানবের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বাস্তবিক অন্তরের সহিত সম্মান প্রদান নহে। যেমন পিতার উপরোধে লোকে বিমাতাকে প্রণাম করিয়া থাকে উহাও তদ্রূপ; স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ লোকে গুণহীনা নারীকেও অনেক সময় বাহ্যিক সম্মান দেখাইয়া নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকে, তাহা প্রকৃত সম্মান নহে। নারীগণের ত্রিবিধ লক্ষণ বর্ণিত আছে, যথা—সাধ্বী, ভোগ্যা, কূলটা। উপরোক্ত গুণশালিনীই সাধ্বী পদবাচ্য, গুণশালিনী নারী শ্রীরূপা গৃহলক্ষ্মী বিশেষ এবং সকলের পূজনীয়া। যে নারীতে উপরোক্ত গুণের অভাব থাকে, তিনি ভোগ্যা বা কুলটাবৎ, পাপ কার্য্যানুসক্তা নারী ব্যালী বিশেষ! আমি নারীগণের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে সংক্ষেপতঃ যাহা যাহা বলিলাম তাহা স্মরণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

মহর্ষি একবার রাজার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি নারীগণের যাহা কর্তব্য বিষয় তাহা বলিলাম, নারীগণের প্রতি পতির কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। মহর্ষি বিজয়কুমারের মাতা প্রভৃতিকে বলিলেন, আপনারা যে গৃহে বসিয়াছিলেন, সেই গৃহেই যাইয়া উপবেশন করুন; আমি ইঁহাদিগকে পত্নীর প্রতি পতির কর্তব্য সম্বন্ধে বলিব। ইহা বলিবামাত্র বিজয়কুমারের মাতা প্রভৃতি পার্শ্বস্থ গৃহে গিয়া বসিলেন। মহর্ষি বলিলেন, রাজন! নারীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা ভাবে যথা তথা বিচরণ করিবার আজ্ঞা প্রদান করা, পতির কদাচ উচিত নহে। কারণ তাহাতে নারীজাতির অমঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। পতিগণ আপন আপন পত্নীগণকে মন্দ স্বভাব বিশিষ্টা নারীগণের এবং মন্দ স্বভাব মানবগণের সঙ্গ হইতে সর্বদা রক্ষা করিবেন। মন্দ লোকের সঙ্গ কদাচ করিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ নারীগণকে মন্দ সঙ্গ

হইতে রক্ষা না করিলে, দুঃশীলতায় পিতৃকুল, ভর্তৃকুল উভয় কুলেই সন্তান জন্মিয়া থাকে। কারণ আত্মধর্ম হীনা নারীগণ আত্মধর্মের আশ্রয়ে না থাকায়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের ধর্মে প্রায়ই আসক্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম সর্বদা ভয়াবহ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের ধর্মে আসক্ত, তাঁহাদের সঙ্গ নারীগণ যাহাতে না পান বা না করিতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা পতির কর্তব্য। পত্নীরক্ষণরূপ ধর্ম সকল ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। একারণ মানব মাত্রেরই পত্নীকে স্বধর্মে (আত্মধর্মে) রক্ষণ করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পত্নী দুর্বল বা রুগ্ন হইলেও তাহাকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করা পতির একান্ত কর্তব্য।

আপন পত্নীকে যত্নসহকারে রক্ষা করিলে, তৎগর্ভে সাঙ্কর্য্যাদি দোষ শূন্য ধর্ম ও কর্মবীর পুত্র প্রায়শঃ হইয়া থাকে। জগতে বিশুদ্ধ ধর্ম ও কর্মবীর সন্তানের বড়ই অভাব। বিশুদ্ধ সন্তান দ্বারা স্বধর্ম (আত্মধর্ম) রক্ষা হইয়া থাকে; নারীগণের পুষ্পদর্শনের পূর্বেই বিবাহ হওয়া কর্তব্য, পুষ্পদর্শনের পূর্বাবস্থাই বিশুদ্ধ নারী। এইরূপ বিশুদ্ধ নারীকেই পুরুষ বিবাহ করিবেন। পুষ্পদর্শন হইলে নারীগণ বিবাহের অযোগ্যা। করাণ নারীগণের পুষ্পদর্শন হইবার পর বিবাহ হইলে, তাহাদিগের মনে মনে মলিনতা ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। একারণ তাহারা বিশুদ্ধ নারী নহে! (এই গ্রন্থে বালিকা বিদ্যালয় উপলক্ষে বিশেষভাবে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক) উপরোক্ত বিশুদ্ধা নারীর পুষ্পদর্শন হইলে যথাকালে পতি আপন পত্নীকে গর্ভাধান সংস্থাপন করিয়া পুত্র উৎপন্ন করিবেন। পতি, বীজরূপে আপন ভার্য্যাতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পত্নীকে জায়া কহা যায়। এই হেতু জায়াকে সর্ব আপদ হইতে রক্ষা করা মানব মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য কর্ম্ম। নারীজাতি পূর্বোক্ত বিধি অনুযায়ী পতিতে তন্ময়ভাবে পতি সেবা করিলে, উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিয়া থাকেন। আর নিষিদ্ধ ঘৃণাকর পরপতি সেবা দ্বারা বা পরপুরুষে মন থাকিলে কিম্বা অন্তর পরপুরুষে আসক্ত থাকিলে, নিকৃষ্ট সন্তান লাভ হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট সন্তান দ্বারা জগতের কাহারও বিশেষ লাভ হয় না। কারণ পত্নীকে যত্নের সহিত সর্বতোভাবে আত্মবশে রাখিবে।

রমণ বা সম্যকরূপে আবদ্ধ রাখিয়া অথবা তাড়না বা লাঞ্ছনা দ্বারা কখন কেহ নারীগণকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। একারণ যোগ কৌশলরূপ আত্মক্রিয়ার শিক্ষা দেওয়া অতীব কর্তব্য, তাহা হইলে তদ্দারা নারীগণকে সৎভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হওয়া যায়, নচেৎ নহে। পতি আপন সামর্থ্য অনুযায়ী পত্নীকে বসন ভূষণ অবশ্য প্রদান করিবেন, কারণ অধিকাংশ স্থলে বসন ভূষণ নারীজাতির প্রিয় হইয়া থাকে। কারণ তাহা প্রদান করা পতির অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। নারীজাতিকে প্রহার করা কদাচ কর্তব্য নহে। যে পতি আপন পত্নীকে প্রহার করেন, অলক্ষ্মীরূপা অশান্তি

সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে বিরাজ করিয়া থাকে। নারী বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত না হইলে পতির হর্ষোৎপাদন করিতে নিশ্চিত অক্ষম হইয়া থাকেন, কারণ নিজের মনের সুখ না থাকিলে অপরের মনের সুখ উৎপাদন করা বড়ই কঠিন। অবশ্য ইহা সাধারণ নারীগণের সম্বন্ধে কহিতেছি। প্রকৃত সাধ্যা নারী যিনি, তিনি বস্ত্রাভরণ গ্রাহ্য করেন না, তাঁহার পতিই বস্ত্রাভরণ স্বরূপ। সাধ্যা আপন পতিতে তন্ময় থাকায়, বাহ্য বসন ভূষণের সন্তোষলাভ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া থাকে। পতিতে তন্ময়ত্ব হেতু পতিপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ থাকায়, মনে কোন বিষয়েরই অভাব বোধ থাকে না। এইরূপ নারীই জগতের আদর্শ স্বরূপা। এই আদর্শ স্বরূপা নারী জগতের সকল মানবের এবং দেবগণের পূজ্যা হইয়া থাকেন। সাধারণ নারীগণেরও এইরূপ আদর্শ নারী মধ্যে পরিগণিত হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

যে কুল স্বামী পত্নীতে এবং পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই কুলে নিশ্চয়ই সর্বদা মঙ্গল বিরাজিত থাকে, অবশ্য ওই সন্তোষ ভাব আন্তরিক স্বার্থশূন্যভাবে হওয়া চাহি। যদি পত্নীর প্রতি পতির রুচি না থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে পত্নীর ব্যভিচারিতা দোষ স্পর্শ হইতে পারে, একারণ বাহ্য রূপ না থাকিলেও গুণ দেখিয়া নিজ পত্নীর প্রতি যাহাতে রুচি হয়, তাহাই চেষ্টা করা পতির কর্তব্য। নারীগণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য— গুণ না থাকিলে বাহ্যিক মাকাল ফলে ন্যায় রূপ, কোন কার্য্যেরই নহে। কারণ নারীজাতি অত্যন্ত সুন্দরী হইলেও সে রূপ কতদিনের জন্য স্থায়ী হইতে পারে? নরনারীর বাহ্য সৌন্দর্য্যে পরস্পর কাহারও মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। যাঁহার অন্তরে সৌন্দর্য্য আছে, তিনিই প্রকৃত সুন্দর বা সুন্দরী পদবাচ্য, অপরে নহে। যে বংশে নারীগণ অসম্মানিতা হইয়া মনোকষ্ট পান, তাঁহাদের সেই মনস্তাপ বশতঃ সেই বংশের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া শ্রীহানি হইয়া থাকে। একারণ অর্থকামী লোকেদের আপন আপন নারীগণকে সামর্থ অনুযায়ী বসন ভূষণাদি দিয়া তাঁহাদিগের মনোকষ্ট নিবারণ করতঃ আনন্দ বর্দ্ধন করা উচিত। সাধ্যা নারী ব্যতীত সাধারণ নারীগনের স্বার্থপরতা দোষে গৃহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সংসারে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে, এমন কি সময় সময় মানবগণ সহোদর ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক হইয়া পরস্পর মুখ দর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রত্যেক মানবের আপন আপন পত্নীকে বিবিধ ধর্মোপদেশ দিয়া স্বার্থপরতা দোষ নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করা বিশেষ কর্তব্য। অবশ্য ইহা উভয় পক্ষ হইতে চেষ্টা করা চাহি, অর্থাৎ পরস্পর ভ্রাতৃগণ আপন আপন জায়ার দোষ সংশোধনে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। এস্থলে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলে, ভ্রাতৃ বর্জন অপেক্ষা দুষ্টা স্ত্রী বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। দুষ্টা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বংশজাত কোন সুশীলা কন্যাকে পুনর্বার বিবাহ করা উচিত, তত্রাচ নারীগণের

কথায় ভ্রাতৃ বর্জন বা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করা উচিত নয়।

পত্নীকে অযথা তাড়না বা কটুবাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাহাতে পতির ধর্মহানি হইয়া থাকে এবং পত্নীও ধর্মচ্যুত হইয়া পতি সেবায় বিমুখ হয়। তাহাতে পতি নানাপ্রকার লোকাপদবাদও অশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ কন্যাগণের মধ্যে প্রায়শঃ চপলতা, বাচালতা, অপ্রিয় ভাষিতা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ ঘটিয়া থাকে। এই সকল দোষ কন্যাগণের পিত্রালয়ে সংশোধিত হইয়া তাহার পর বিবাহ হওয়া উচিত। যদি উক্ত দোষ সমূহ সংশোধিত না হইবার পূর্বে কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে পত্নীর রূপে মুগ্ধ না হইয়া সদুপদেশ, মিষ্টবাক্য এবং যত্নের দ্বারা পত্নীকে আপন বশীভূত করিয়া উপরোক্ত দোষ সমূহ মোচনের জন্য চেষ্টা করা পতির একমাত্র কর্তব্য। যে পতি ইহা না করেন, অর্থাৎ কামান্ধ হইয়া পত্নীর দোষ সমূহ মোচনের জন্য যত্ন ও প্রয়াস না করেন তিনি পরিণামে নানাপ্রকার অশান্তি ও জ্বালা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পতি চেষ্টা করিয়াও যদি পত্নীর দোষ স্খলন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে দোষ সংশোধনার্থে পত্নীকে তাঁহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করাই উচিত। যতদিন দোষ সংশোধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পত্নীকে পিত্রালয়ে রাখাই উচিত। প্রথমে পতির কর্তব্য আপনাকে আপনি আত্মধর্ম্ম দ্বারা সর্বসদ্‌গুণে ভূষিত করিবার চেষ্টা করা। কারণ পতি যেরূপ সদ্‌গুণযুক্ত হন, পত্নীও তদনুরূপ হইয়া থাকেন। লতা যেমন আশ্রিত বৃক্ষের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পত্নীও তদ্রূপ জানিবেন। পতি আসুরিক ভাবযুক্ত হইলে পত্নীও সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং পতি দেবভাবের হইলে পত্নীও দেবী বিশেষ হইয়া থাকেন। পতি সুরাদেবী, পরদারানুরক্ত হইলে পত্নীর মনও পরপুরুষে ধাবিত হইয়া থাকে, অবসর বা সুবিধা প্রাপ্ত হইলে গোপনে বা প্রকাশ্যে পরপুরুষে আসক্ত হইতে কুণ্ঠিত হয় না। একারণ প্রথমে আপনাকে আপনি দৈবী সম্পদে ধনী করিয়া আত্মভাবাপন্ন হইয়া, তৎপরে নিজ নিজ পত্নীকে রক্ষা করা মানবগণের নিতান্ত কর্তব্য।

পিতা মাতার কর্তব্য সৎপাত্রে কন্যাদান করা। যিনি আত্মবান সংযতেন্দ্রিয় এবং দৈবী সম্পদযুক্ত, তিনিই প্রকৃত সৎপাত্র পদবাচ্য। যিনি দৈবীসম্পদে আসক্ত হইয়া আত্মবান ও সংযতেন্দ্রিয় হইবার জন্য আত্মকর্মের অভ্যাসশীল হইয়া, সাধন পথে কতক অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি মধ্যম শ্রেণীর পাত্র বলিয়া গণ্য এবং যাহারা আত্মজ্ঞান হীন ও অসংযতেন্দ্রিয়, তাহার নানা ভাষাবিদ্ হইলেও অধম শ্রেণীর পাত্র বলিয়া গণ্য। এই লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিগণ, জ্ঞানীর মত কথা কহিয়া থাকে এবং কার্য্যকালে অজ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; আত্মকর্মের অনুষ্ঠান না থাকা হেতু, ইহারা

আত্মকর্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মভাবের জ্ঞানে সম্যক অন্ধ, একারণ ইহারা কার্য্যকালে গোপনে বা প্রকাশ্যে আসুরিকভাবের কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ অধম পাত্রে কন্যাদান করিলে কন্যার জীবনে কোন প্রকার সুখশান্তি লাভ হয় না, বরং কন্যা নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পতি অনুরোধে অনেক সময় অনেক কুকার্য্যে ব্রতী হইয়া, পরিণামে বিষময় ফল লাভ করেন এবং মনে মনে আজীবন পিতামাতাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই মানসিক অভিশাপের ফলে কন্যার পিতামাতা অন্তঃকালের পর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া নিরয়গামী হইয়া থাকেন; একারণ প্রথমোক্তরূপ সৎপাত্রে বা মধ্যমপাত্রে কন্যাদান করা পিতামাতার একান্ত কর্তব্য।

সৎপাত্রে কন্যাদান করিলে নিজবংশের এক দেশের উপকার সাধিত হয়, কারণ পূর্বোক্ত সৎপাত্রে কন্যাদান করিলে সেই কন্যার গর্ভ হইতে দেবভাবাপন্ন ধর্ম এবং কর্মবীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। অধম পাত্রে কন্যাদান হইলে আসুরিক ভাবাপন্ন পতির সহযোগে, আসুরিক ভাবাপন্ন পশুবৎ মানবকুলেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই পুত্রের দ্বারা পিতৃকুল বা মাতৃকুল, কোন কুলেরই উপকার সাধিত হয় না অর্থাৎ কোন কুলেরই আত্মোন্নতি লাভ হয় না, উপরন্তু দেশের ও কোন লাভ না হইয়া লোকে বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে অধমপাত্রে কন্যাদান করা মানবগণের কর্তব্য নহে। প্রকৃত কর্তব্য পালন না করিলে মানবকে পরিণামে অনুতাপ, জ্বালা ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। একারণ কর্তব্য পালন করা মানব মাত্রেরই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ জানিবেন।

কর্তব্য নির্ণয় করাও সাধারণ মানবের বুদ্ধির অতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বরং কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য ইহা সাধারণ লোকে জানিয়াও জানে না। একারণ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে মানবের আপন আপন কর্তব্য কর্মের নির্ণয় করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। সাধারণ লোকে কর্তব্য, অকর্তব্য জানিয়াও জানে না বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আত্মকর্মের অনুষ্ঠান হীন মানবগণের ইন্দ্রিয় সংযমতার অভাব হেতু, তাহারা কার্য্যকরণ কালে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া অকরণীয় কার্য্য সকল অধিকাংশ সময়ে করিয়া থাকে; তাহারা অনেক সময় কর্তব্য কর্ম অপরকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নিজে অকরণীয় কার্য্য করিয়া থাকে। যে কর্ম করণে প্রত্যবায়, হানি বা অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহাকেই অকর্তব্য কর্ম বলা হইয়া থাকে, আর যে সকল কর্ম করণে হানি বা অমঙ্গল হয় না, তাহাকেই কর্তব্য কর্ম কহিয়া থাকে! বিষয়াসক্তির সহিত যে কর্ম কৃত হয়, তাহার পরিণাম নিশ্চয়ই অমঙ্গল প্রদ হইয়া থাকে, সেজন্য ইহাকে অকর্তব্য কর্ম বলা যায়। আর যে কর্ম সম্পাদিত হইলে পরিণামে শুভ হয় এবং অমঙ্গল, অশান্তি শূন্য হয়, তাহাকে কর্তব্য কর্ম কহা যায়

অর্থাৎ আত্মকর্ম। আত্মাতে মন রাখিয়া আত্মকর্ম করিলে এবং স্থির প্রাণরূপ আমাতে লক্ষ্য রাখিয়া ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্ত ভাবে সকল কর্ম সম্পাদন করিলে, অশুভ বা অমঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এইরূপ ভাবে সম্পাদিত সাংসারিক কর্ম ও কর্তব্য কর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সংসারে সকলকেই একদিন কর্তা সাজিয়া কর্ম করিতে হয়; এই কর্তা ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; সংসারে সাত্ত্বিক কর্তা অতি বিরল। সাত্ত্বিক কর্তার লক্ষণ,—আসক্তি এবং অভিমান শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত, ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা শূন্য, সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ বিষয়ে বিকার শূন্য অর্থাৎ কোন কার্য্য সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইলে, তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ শূন্য, এইরূপ কর্তাকেই সাত্ত্বিক কর্তা কহা যায়। কণ্ঠের উর্দ্ধে আপন স্থির প্রাণকে মনের সহিত যিনি স্থিতি করিতে সক্ষম হন, তিনি উক্তরূপ সাত্ত্বিক কর্তা হইয়া থাকেন। এই সময়ে মহর্ষি একটি অবস্থা দেখাইয়া (উপলব্ধি করাইয়া) দিয়া কহিলেন, ইহাই কণ্ঠের উর্দ্ধে স্থির প্রাণের সহিত মনের স্থিতির অবস্থা। আপনাদের ইহা উত্তম প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা লাভ হইবে। মহর্ষি এই কথা বলিয়া রাজসিক কর্তার লক্ষণ বলিতে লাগিলেন।

রাজসিক কর্তা সাধারণতঃ আসক্তির সহিত বিষয়ানুরাগী হইয়া থাকেন এবং কর্ম ফলাভিলাষী, লাভাকাঙ্ক্ষী, লম্পট, লোভী, অপরের দ্বেষ এবং হিংসাপ্রিয়, আত্মাতে না থাকিয়া সদা ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়ে থাকা হেতু অশুচিভাবাপন্ন, সামান্য কারণে কখন হর্ষ কখন বা বিষাদযুক্ত, অল্প কারণে রুষ্ট, অন্তরে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য ব্যাকুলতা হেতু আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা বিহীন হইয়া থাকেন। রজো গুণ প্রধান এই প্রকার কর্তাকেই রাজসিক কর্তা কহা যায়। আপনারা উপরোক্ত ভাব সকল হইতে সর্বদা নিজেকে পৃথক রাখিতে অভ্যাস করিবেন। আর যাহারা আত্মজ্ঞান লাভের বিরোধী এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং শঠতাপূর্ণ, ছল বিশিষ্ট, আলস্য পরায়ণ, সর্বদা বিলাসযুক্ত, মাদকসেবী, দীর্ঘসূত্রী, আলস্য প্রিয়, জড় প্রকৃতি লক্ষণযুক্ত মানবকে তামসিক কর্তা কহা যায়। আপনারা এই সকল গুণাক্রান্ত মানবের সঙ্গ হইতে পৃথক থাকিবার চেষ্টা করিবেন এবং উক্ত তামসিক গুণ সকল হইতেও নিজ নিজ মনকে পৃথক করিয়া 'আপনাতে আপনি" রাখিতে চেষ্টা করিবেন, অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ আত্মাতে মনকে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। আপনারা যাহাতে সাত্ত্বিক কর্তা হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।

সংসারে যাঁহাকে যখন কর্তা সাজিতে (সংসারের অভিভাবক হইতে) হইবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যিনি কর্তা হইবেন, তাঁহাকে কর্মজ্ঞান শিক্ষা কয়া কর্ম করা চাহি, নচেৎ কর্তা কর্মজ্ঞ না হইলে তাহার দ্বারা আপন আপন সংসারের পরিবার বর্গ বিড়ম্বরা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্মজ্ঞ শব্দের অর্থ—যাহার কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, অর্থাৎ

কোন কর্ম কর্ত্তব্য বা কোন কর্ম অকর্ত্তব্য ইহা যিনি সম্যক বুঝিয়া কার্য্য করেন অথবা কোন কর্ম কোন বিধি অনুযায়ী করিতে হইবে এবং কি উপায়ে কোন কর্ম সমাধা করিতে পারা যায়, এই প্রকার সকল কর্মের গতি বুঝিয়া যিনি কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কর্মজ্ঞ কহা যায়। সাধারণ মানবের মধ্যে কর্মজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল; সাধারণতঃ যাহা করা যায় তাহাকে কর্ম কহিয়া থাকে; কোনটা কর্ম আর কোনটা অকর্ম ইহা আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ মানব বিদিত নহে, কারণ সাধারণ পণ্ডিত বা শোক তাপাদিজনিত বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানবের পক্ষে কর্মের গতি নির্ণয় করা দুর্জ্ঞেয়! কর্ম দুই প্রকার, সৎ কর্ম আর অসৎ কর্ম। সৎ কর্মই কর্ম পদবাচ্য, অসৎ কর্মই অকর্ম পদবাচ্য। উপরে উক্ত হইয়াছে যাহা করা যায় তাহাকেই কর্ম বলে। যেমন চক্ষের দ্বারা দর্শন করা, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আসক্তিপূর্বক কৃত যে সকল কর্ম, তাহাই অকর্ম পদবাচ্য। ইহা মোক্ষপ্রদ নহে এবং ইহা গৌণ কর্ম পদবাচ্য। আত্মকর্মরূপ প্রাণকর্মের অভাবে ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করিতে সক্ষম নহে, একারণ ইন্দ্রিয়গণের কৃত কর্মকে আমি গৌণকর্ম বলিতেছি। প্রাণের যে কর্ম স্বতঃ (আপনা আপনি) কামনা রহিত হইয়া হইতেছে, তাহাই একমাত্র সৎকর্ম বা সাত্ত্বিক কর্ম বাচ্য। অপর যে সমস্ত কর্ম কামনা পূর্ণ এবং স্বার্থের সহিত কৃত হইয়া থাকে, তাহা রাজসিক কর্ম এবং ইহার সহিত হিংসাযুক্ত যে সকল কর্ম তাহাই তামসিক কর্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ মানব হইতে সিদ্ধমুক্তগণ পর্য্যন্ত—কর্ম কাহারও পরিত্যজ্য বিষয় নহে। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সকল কর্মই করা মানব মাত্রের অবশ্য কর্তব্য। কারণ মহর্ষিগণও নিজে কর্ম করিয়া জীবের মঙ্গলার্থে কর্ম করিতেই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। পূর্বতন মহর্ষিগণও আপন আপন স্ত্রী পুত্র রক্ষণ করিয়া লোকহিতার্থে কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কর্ম ফলের প্রত্যাশাই বন্ধের কারণ, কর্ম কদাচ বন্ধের কারণ নহে। ভগবান গীতাতেও কর্মের ফল ত্যাগ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম ত্যাগ করিতে বলেন নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সকল কর্মেরই অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কর্ম কখন পরিত্যজ্য বিষয় নহে, যাহারা অভাবজনিত বা শোক তাপজনিত বা অজ্ঞানজনিত অথবা নিজ বুদ্ধির দোষে পরিবার বর্গের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ বোধ করিয়া কর্মত্যাগ বা পিতামাতা পরিবারাদি ত্যাগ করিয়া থাকে, অথচ মনে মনে কর্ম সকল চিন্তা করে আবার আপনাকে আপনি ত্যাগী বলিয়া বিবেচনা করে, এরূপ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বা মিথ্যাচারী। যিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া অনাসক্ত ও সংযতভাবে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতি সাধন করতঃ সকল কর্ম করিয়া থাকেন, তিনি তিনিই লোক মধ্যে বিশিষ্ট লোক এবং লোক সমূহের পুজ্য।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ এইরূপে সংসারে কর্ম্ম সমুদায় করিয়া এবং পুত্র; কন্যা উৎপন্ন করিয়া যথাবিধি স্ত্রী পুত্র রক্ষণ করিতেন; অবিধি পূর্বক কার্য্য করিলেই তাহাতে হানি বা অমঙ্গল হইয়া থাকে। বিধিপূর্বক অনাসক্ত ভাবে কর্তব্য কর্ম সকল পালন করিলে কাহাকেও আবদ্ধ হইতে হয় না, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য মহর্ষিরা কর্মফলে কখনও আবদ্ধ হন নাই। তাঁহারা সংসারে থাকিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কর্ম সম্যকরূপে করিয়া কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করতঃ মহর্ষি পদবাচ্য হইয়াছিলেন। সাধারণ মানবগণ তাঁহাদের অনুকরণে কর্ম করিয়া চলিলে, সংসারে শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন নচেৎ নহে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ এবং তৎ তৎ পত্নীগণ সকলেই নক্ষত্র লোকে গমন করিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছিলেন। নক্ষত্র শব্দের অর্থ, ন—ক্ষি=ক্ষয় পাওয়া+অত্র (অত্রন)+ক। যে ক্ষয় পায় না। অর্থাৎ যে লোকের ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই নক্ষত্র কহা যায়। সত্য স্বরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মার সহিত মিলন অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া থাকার নামই নক্ষত্র লোকে স্থিতি। কূটস্থ গহ্বর মধ্যে যে তারকা স্বরূপ নক্ষত্র আপনাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি, আপনারাও আত্মকর্মদ্বারা ঐ তারকারূপ তারকব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়াবার জন্য বিধিপূর্বক কর্মের (যে কর্ম আমি আপনাদিগকে দিলাম সেই কর্মের) অনুষ্ঠান করিয়া চলুন। এই প্রাণকর্মই আপনাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া পূর্বোক্ত স্থানে স্থিতিলাভ করাইয়া দিবে। এই প্রাণকর্ম একমাত্র সাত্বিক কর্ম, অপর যাবতীয় কর্ম সমুদায়ই রাজসিক বা তামসিকের মধ্যে গণ্য।

মহর্ষি কহিলেন, সাধনের প্রথম সোপানের সৎ উপদেশ সকল আমি আপনাদিগকে প্রদান করিলাম; তাহার পর সাধন পথে যেমন অগ্রসর হইবেন, তৎপরবর্তী আপনাদের যোগ্য অনুসারে অন্যকর্ম পুনরায় প্রদান করিব। অবশেষে আমার বক্তব্য, আপনাদিগকে যে সকল কর্মের উপদেশ প্রদান করিলাম তাহা বর্তমানে (যতদিন না সম্যক অভ্যাস হয় ততদিন) দিবসে ত্রিকালীন অভ্যাস করিবেন, অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর শুদ্ধ বস্ত্রপরিধান করিয়া আসনে উপবেশন করতঃ এক প্রহর পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত (প্রাণের ক্রিয়ারূপ) প্রাণ কর্মের অভ্যাস করিবেন, তৎপরে স্নানের পর মধ্যাহ্নকালের পূর্বে একবার অভ্যাস করিবেন। পরে সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আর একবার প্রাতঃকালের ন্যায় অভ্যাস করিবেন। উপস্থিত এই ত্রিকালীন যথাসাধ্য বিধিপূর্বক সাধন করিয়া চলুন। আহারাদি ও আপনারা আর্য্যোচিত ভাবে করিবেন। সাত্বিক আহারই করিবেন। মৎস্য মাংস ভোজন না করাই ভাল, আপনাদের পূর্ব হইতেই যখন মৎস্য মাংস ভোজন করা অভ্যাস নাই তখন আর তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছু নাই। মৎস এবং মাংস, রাজসিক বা তামসিক আহারের মধ্যে গণ্য। দধি পরিত্যাগ করিয়া দধি হইতে উৎপন্ন যে সকল দ্রব্য,

তাহা ভোজন করিতে পারেন। দধিমাত্র নিষেধ জানিবেন। সদ্যোজাত তক্র পান করিতে পারেন, দুগ্ধ, ঘৃত উত্তম দ্রব্য, ইহা নিত্য আবশ্যক মত ব্যবহার করিবেন। ফল, মূল যত কম ভোজন হয়, ততই ভাল; দাড়িম্ব ব্যতীত অপর বহুবীজযুক্ত ফল পরিত্যজ্য হওয়াই ভাল। নারিকেল উৎকৃষ্ট ফল। গলিত ফল অভক্ষ্য মনে করাই উচিত। পুর্যসিত (বাসি), পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত বা অত্যন্ত উষ্ণ অথবা অত্যন্ত শীতল বা যাহা এক প্রহরের অতীত কালে পাকদ্রব্য, তাহা ভোজনের অনুপযুক্ত। দিবসে এক প্রহরের পরে আড়াই প্রহরের মধ্যে মধ্যাহ্ন আহারের প্রশস্ত কাল এবং রাত্রে এক প্রহরের পরে আহারের নিষিদ্ধ কাল জানিবেন। তৎপরে মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া রাজা বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যথাসাধ্য প্রাণপণে আপনার বাক্য মত চলিতে চেষ্টা করিব। যে সকল সারগর্ভ উপদেশ বাক্য আপনি প্রদান করিলেন তাহা আমি সর্বদা পালন করিতে যত্নশীল থাকিব এবং আত্মকর্ম সাধনে কোন ক্রমে ত্রুটি করিব না। যে যে কালে অভ্যাসের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যথাকালে উহা সম্পাদন করিব। তৎপরে সকলে মহর্ষির পাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

যোগ-গ্রন্থ

যোগাচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রণীত
ক্রিয়াযোগের বহু বিখ্যাত গ্রন্থ
জগৎ ও আমি

সুরধুণী দেবী প্রণীত
মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সহ
সুরধুণীগীতা

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত যোগ-সাধনার
অমূল্য সচিত্র গ্রন্থ
সরল যোগ-সাধন

যোগীবর বরদাচারণ মজুমদার প্রণীত
ক্রিয়াযোগের অনুশীলন পদ্ধতি সমন্বিত
পথহারার পথ ও দ্বাদশ বাণী

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

শ্রীকালিকানন্দ অবধূত প্রণীত
কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব ও সাধনা

অযাচক প্রণীত

* **ধ্যান**
* **জপ**
* **ওঙ্কারসাধনা**
* **আকাশব্রহ্ম**
* **বেদমন্ত্র**
* **দীক্ষাপ্রসঙ্গে**

অযাচক প্রণীত মূল, অনুবাদ, টীকা-ভাষ্যসহ
সুবিশাল বেদাঙ্গ-সাহিত্যের মূল নির্য্যাস
রামগীতা

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
মূল ও গদ্যানুবাদ সহ
পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ

তন্ত্র-গ্রন্থ

মহাত্মা রামদাসজী তপস্বী প্রণীত
শতাধিক যন্ত্রের চিত্রসহ
কল্পতরু কামধেনু গ্রন্থ

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল প্রণীত
দশদেবীর রঙিন চিত্র, মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি,
ধ্যান, যন্ত্র, স্তোত্র ও কবচ সহ
দশমহাবিদ্যাতন্ত্র

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
মূল ও গদ্যানুবাদ সহ
ষট্‌কর্ম্মদীপিকা

জ্যোতিষ-গ্রন্থ

যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
প্রাচীন ও প্রামাণ্য সচিত্র গ্রন্থ
জ্যোতিষ-সমীরণ

যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত বিনা সাহায্যে
জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য
জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা

যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত রত্নবিষয়ক
শতাধিক বৎসরের প্রামাণ্য গ্রন্থ
মণিরত্ন বিজ্ঞান

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী প্রণীত
জ্যোতিষ শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণালব্ধ গ্রন্থ
ঘরে বসে ভাগ্য জানুন

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী প্রণীত
জীবনের কোন্ সময়ে কি ঘটবে তা' জানতে
আপনার সময় কেমন যাবে?

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী প্রণীত
বাস্তু, জ্যোতিষ ও ফেংশুই সহ সম্পূর্ণ বাস্তু গ্রন্থ
ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষ

অধ্যাপক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
ভাগ্যচক্র তৈরী ও জ্যোতিষ শিক্ষার অনবদ্য গ্রন্থ
আধুনিক জ্যোতিষ

সন্তোষ সরকার প্রণীত
দৈনন্দিন জীবনে ও রোগ প্রতিকারে
রঙের প্রভাব

জীবনী-গ্রন্থ

শ্রীসন্তোষ কুমার সরকার প্রণীত
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
দিব্যজীবন কাহিনী ও বাণী

শ্রীরামানন্দ সরস্বতী প্রণীত
শ্রীশিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের জীবন ও দর্শন
উমাচলের মহাযোগী

শ্রীরঞ্জিত কুমার মজুমদার প্রণীত
অমরকণ্টকের
বরফানী দাদাজি মহারাজ
শ্রীরঞ্জিত কুমার মজুমদার প্রণীত
বাবাজী মহারাজ—কলিযুগের
মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবতার

বৈষ্ণব-গ্রন্থ

শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী প্রণীত ২২ খণ্ডে
মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যা সহ
শ্রীমদ্ভাগবতম্
শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত মূল, টীকা ও গদ্যানুবাদ সহ
শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রণীত মূল, টীকা
টিপ্পনী ও গদ্যানুবাদ সহ
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণ শর্মা সম্পাদিত
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ
শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত মূল, টীকা, গদ্যানুবাদ সহ
দানকেলিকৌমুদী
ডঃ বিজন গোস্বামী সম্পাদিত
দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ, সচিত্র
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীনিত্যানন্দ দাস প্রণীত চৈতন্যভাগবত ও
চৈতন্যচরিতামৃত'র পরিশিষ্ট গ্রন্থ স্বরূপ
প্রেম বিলাস
ডঃ বিজন গোস্বামী সম্পাদিত মূল ও গদ্যানুবাদ সহ
মুরারিগুপ্তের কড়চা
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত লেখকের প্রেম ও
সংগীত গ্রন্থ সহ **ভক্তিযোগ**
শ্রীরামানন্দ সরস্বতী প্রণীত লীলাময়
শ্রীকৃষ্ণের বহু অজানা কাহিনী সমন্বিত
গল্পে গল্পে কৃষ্ণকথা
শ্রীমধুসূদন প্রণীত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-পরিক্রমা
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণ অভিসার

বিবিধ

শ্রীকালিকানন্দ অবধূত সম্পাদিত
মূল সংস্কৃত ও বাংলা বিশদ অর্থ-ব্যাখ্যাসহ
উপনিষদ সমগ্র
শ্রীগৌতম কুমার ঝা প্রণীত
নিজের পুজো নিজে করুন
ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ প্রণীত
হিন্দুক্রিয়াকর্মের পথিকৃৎ গ্রন্থ
হিন্দুক্রিয়া কল্পদ্রুমঃ (অখণ্ড সংস্করণ)
ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ প্রণীত
বড় বড় হরফে কালিকাপুরাণোক্ত
দুর্গোৎসব তত্ত্ব ও পদ্ধতি
ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত
স্তবকবচমালা
শ্রীকৃপাশঙ্কর প্রণীত
রহস্যতত্ত্বে পূজাতন্ত্র ও পূজা পদ্ধতি
অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ
সাধক-কবি জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ প্রণীত
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি
ডঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর রায় সম্পাদিত
দাশরথি রায়ের পাঁচালী
গৌতম বিশ্বাস প্রণীত ৫১ পীঠের বিবরণ
শক্তিপীঠ পরিক্রমা
গৌতম বিশ্বাস প্রণীত পরিক্রমণ বিবরণ সমৃদ্ধ
উপ ও সিদ্ধপীঠ পরিক্রমা
গৌতম বিশ্বাস প্রণীত
পরিক্রমণ বিবরণ সহ পুরীর যাবতীয় তথ্য সমন্বিত
শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা
বাংলাদেশের প্রখ্যাত মনীষী শ্রীকিরণ প্রণীত
সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ
মানবের জীবন-ধর্ম

গিরিজা লাইব্রেরী ২২/সি কলেজ রো, কলকাতা - ৯ ফোন : ২২৪১-৫৪৬৮

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি কিংবদন্তীসম গ্রন্থ

॥ বাংলা ভাষায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম সংস্করণ ॥

প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রবর্ত্তিত ও ব্যাখ্যাত

২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতম্

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, শ্রীধরস্বামী-কৃত "ভাগবতভাবার্থদীপিকা" টীকা ও দশম স্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী-কৃত " বৈষ্ণবতোষণী" (টীপ্পনী) মূলসহ এবং প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামী-কৃত "শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী" ব্যাখ্যা সমেত। দ্বাদশস্কন্ধে সম্পূর্ণ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' মোট বাইশটি খণ্ডে বিভক্ত। ১ম হইতে ৯ম স্কন্ধ পৃথক পৃথক নয়টি খণ্ডে এবং ১১শ ও ১২শ স্কন্ধ একত্রে একটি খণ্ডে আর, ১০ম স্কন্ধ বারটি খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত-পিপাসু পাঠক প্রতিটি স্কন্ধ/খণ্ড পৃথকভাবেও সংগ্রহ করতে পারেন।

রঞ্জিত কুমার মজুমদার প্রণীত

বাবাজী মহারাজ

কলিযুগের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবতার

শ্রীকালিকানন্দ অবধূত প্রণীত

কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব ও সাধনা

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য
যোগাচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের
ক্রিয়াযোগের ব্যাখ্যা সমন্বিত

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

বা সুরধূণী গীতা
নামেই যে গ্রন্থ বহু বিখ্যাত।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত শ্রীচন্দ্রনাথ বসু অনূদিত
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

অযাচক প্রণীত **ধ্যান**

ধ্যানের প্রণালী, ব্যবহারিক জীবনে ধ্যানের উপযোগিতা, স্মৃতিশক্তি ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে, রোগারোগ্য সহজ করতে, পড়াশুনা ও ইন্টারভিউ-এ কৃতকার্য হতে ধ্যানের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা সন্নিবিষ্ট।

অযাচক প্রণীত **জপ**

এই গ্রন্থে জপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উন্মোচিত।

অযাচক প্রণীত **ওঙ্কারসাধনা**

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু এই সাধনধারা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যে সমৃদ্ধ।

শ্রীকালিকানন্দ অবধূত সম্পাদিত
মূল সংস্কৃত শ্লোক, বাংলা বিশদ অর্থ-ব্যাখ্যা সহ

উপনিষদ সমগ্র

রঞ্জিত কুমার মজুমদার প্রণীত

অমরকণ্টকের
বরফানী দাদাজি মহারাজ

নজরুল, নেতাজিসহ বহু ব্যক্তিত্ব যাঁর অসামান্য
যোগ-জীবনের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন সেই
যোগীবর বরদাচরণ মজুমদারের
ক্রিয়াযোগের অনুশীলন পদ্ধতি সমন্বিত
যোগ-সাধনার দু'টি অমূল্য গ্রন্থ একত্রে

পথহারার পথ ও [illegible]

মহাত্মা রামদাসজী তপস্বী প্রণীত
প্রায় দেড়শত যন্ত্রের চিত্রসহ

কল্পতরু কামধেনু গ্রন্থ

এতে রয়েছে—সাধন বিষয়ক বিবিধ নির্দেশ, বিবিধ ভজন, গায়ত্রী, দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা, যাত্রার সিদ্ধযোগ, মামলায় জয় লাভ, চিরযৌবনলাভ, লটারীতে সাফল্য, গর্ভধারণরোধ, বন্ধ্যাত্বরোধ, স্ব-ইচ্ছায় পুত্র বা কন্যা লাভ ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্র, মন্ত্র, জরিবুটিসহ প্রক্রিয়া।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত
দশ দেবীর রঙিন চিত্র এবং মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি, ধ্যান, পূজামন্ত্র, স্তোত্র ও কবচসহ

দশমহাবিদ্যাতন্ত্র

গিরিজা লাইব্রেরী ২২/সি কলেজ রো, কলকাতা - ৯ ফোন : ২২৪১-৫৪৬৮